শারদীয় ১৪০৬
পরিচয়

আসানসোল পৌর নিগম
আসানসোল

।। আবেদন ।।

১। নির্দিষ্ট সময়ে পৌর কর জমা দিন ও রিবেটের সুযোগ গ্রহণ করুন ও নিগমের উন্নয়নের ধারা অক্ষুন্ন রাখতে সাহায্য করুন। মনে রাখবেন কর না দেওয়া আইন অনুযায়ী দণ্ডনীয় অপরাধ।

২। কর সংক্রান্ত বা অন্যান্য বিষয়ে কোনো অভিযোগ থাকলে তা বিশদভাবে জানান।

৩। বাড়ীর বা রাস্তার কলে যেখানেই দেখবেন জল পড়ে পড়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, সেখানে তৎক্ষণাৎ সেটির কল (Bib Cock) বন্ধ করে জলের অপচয় রোধ করুন।

৪। বে-আইনীভাবে কেউ জলের সংযোগ নিয়ে রাখলে খবর দিন। রাস্তার কল বা Main Pipe থেকে Pump লাগিয়ে বা অন্য অসাধু উপায় জল টেনে নেওয়া প্রতিরোধ করুন। পৌরনিগমে খবর দিন।

৫। আসন্ন শারদীয়া উৎসবের দিনগুলিতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও শান্তি বজায় রাখুন।

শ্যামল কুমার মুখার্জী
মেয়র
আসানসোল পৌর নিগম

VICTORIA MEMORIAL HALL

(An Institution of National Importance)

1, Queens Way, Calcutta 700 0071

TEL : 223-1889-91/5142. FAX : 223-5142

A : SOUND AND LIGHT SHOWS AT VICTORIA MEMORIAL GROUND ON PRIDE AND GLORY–"THE STORY OF CALCUTTA" SHOWING TIMES

October '99 to 15 February 2000
From 6-15 p.m. – 7 p.m. (Bengali Show)
From 7-15 p.m. – 8 p.m. (English Show)
16th February 2000 to June 2000
From 7-15 p.m. – 8 p.m. (Bengali Show)
From 8-15 p.m. – 9 p.m. (English Show)
Rate of Tickets : Rs. 5/- and Rs. 10/-
Children above three years full tickets. Entry form Church Gate.
Ticket Counter Opens at 12 noon/1 p.m.

B : Recent Publications :

No.	Title		Price
1.	Charles D'oly's Calcutta–Album I and II @		Rs. 40.00 each
2.	J. B. Fraser's Calcutta		Rs. 35.00
3.	Calcutta in the eyes of Thomas Daniell		Rs. 35.00
4.	Indian in the eyes of Daniells'		Rs. 40.00
5.	Indian as seen by Simpson		Rs. 40.00
6.	Select views of India		Rs. 40.00
7.	Picture Post Card Set A, B, C, D	A–	Rs. 3.50
		B–D–@	Rs. 10.00 each
8.	Picture Folio No. 2		Rs. 1.00
9.	Picture Folio No. 3		Rs. 2.00
10.	Ceramic Tiles (View of St. Andrew's Church)		Rs. 32.00
11.	Bulletin of the Victoria Memorial. VII-XIII @		Rs. 7.50 each
12.	Chakraborti, Hiren	: an urban Historical Perspective for the Calcutta Tercentenary.	Rs. 35.00
13.	Greig, Charles	: Landscape Painting in the Victoria Memorial	Rs. 150.00
14.	Ray, N. R.	: Bengal Nawabs	Rs. 20.00
15.	Gopa, Choudhuri and Bhaskar Chunder : A Comprehensive Catalogue of Water Colours, Pencil Sketches and Pen and Ink drawings in the collection of Victoria Memorial.		Rs. 15.00
16.	Urdu Guide Book		Rs. 5.00
17.	Ganguly. K. K.	: Modern Masters	Rs. 35.00
18.	Catalogue of Busts and Statuary		Rs. 2.50
19.	Calcutta Gallery–India's first City Gallery		Rs. 50.00
20.	The First Spark : Story of the Revolt of 1857		Rs. 75.00
21.	Contemporary Art of Bengal		Rs. 375.00
22.	Hillscape of India		Rs. 70.00

শত্রু যখন

সাম্প্রদায়িকতা

প্রতিবাদ

না করাই তখন অপরাধ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই. সি. এ—৪৭৮৬/৯৯

সঠিক জনসংখ্যাই প্রগতির পথ

পরিবারকে সীমিত রাখুন

পরামর্শের জন্য যোগাযোগ

করুন নিকটবর্তী

স্বাস্থ্যকেন্দ্রে

বা

জনকল্যাণ কেন্দ্রে

দেশ ও দশের কল্যাণে প্রয়োজন

পরিকল্পিত পরিবার

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই. সি. এ—৪৭৮৬/৯৯

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থে গড়ে তুলুন দূষণমুক্ত পৃথিবী

বিভিন্ন ধরণের পরিবেশ দূষণ বর্তমান যুগে আমাদের সামনে কঠিন সমস্যার সৃষ্টি করেছে। এই পরিস্থিতি কিন্তু একদিনে তৈরী হয়নি। প্রাকৃতিক নিয়মগুলিকে অগ্রাহ্য করে মানুষ আধুনিক জীবনের ক্রমবর্দ্ধমান ও জটিল চাহিদার সামাল দিতে নানাভাবে প্রকৃতির কাজে হস্তক্ষেপ করেছে। উন্নততর জীবনযাত্রার প্রয়োজনে মাটি, জল, অরণ্য ও খনিজ সম্পদকে অবাধে মানুষ ব্যবহার করেছে। অতিব্যবহারের ফলে যে ক্ষতি তা পূরণের ব্যবস্থা না করেই। ফলশ্রুতি হিসাবে এই গৃহে আমাদের অস্তিত্ব আজ বিপন্ন।

অবাধ বৃক্ষচ্ছেদন কলকারখানার বর্জ্য পদার্থ ঢেলে নদীর নির্মল স্রোতকে রুদ্ধ করা, যানবাহন ও কারখানা থেকে নিঃসৃত বিষাক্ত গ্যাস এবং ধোঁয়া ও কর্কশ উচ্চগ্রামের শব্দ আমদের পরিবেশ দূষণের শিকার করে তুলেছে।

কিন্তু আমরা কি সম্ভাব্য এই বিপদ সম্বন্ধে অবহিত?

যদি এই অবস্থা চলতে থাকে তাহলে অচিরেই পৃথিবী থেকে অরণ্য লুপ্ত হয়ে যাবে, খরা এবং বন্যার কবলে পড়বে পৃথিবী, প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতের অসংখ্য প্রজাতি চিরদিনের মত বিলুপ্ত হবে, আমাদের এই সুন্দর গ্রহের বাতাস হয়ে পড়বে নিঃশ্বাস নেবার অযোগ্য এবং এ সমস্তই ঘটছে আমাদের অপরিনামদর্শিতা লোভ ও প্রাকৃতিক সম্পদের ক্রমবর্ধমান চাহিদার জন্য।

উন্নয়নমূলক কাজকর্ম আমাদের চালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু তা করতে হবে প্রাকৃতিক ভারসাম্যের হানি না ঘটিয়ে নিষেধমূলক আইনের যথাযথ প্রায়োগ এবং আধুনিক প্রযুক্তি বিদ্যার সাহায্যে আমরা এই বিপদের মোকাবিলা করতে পারি।

পরিবেশ সংরক্ষণের কাজে ব্রতী হতে হবে আমাদের সকলকেই, প্রস্তুত হতে হবে দূষণমুক্ত পৃথিবী গড়ার উদ্দেশ্যে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের জন্য।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই. সি. এ—৪৭৮৬/৯৯

না বিজ্ঞাপন নয়—আমাদের অতীত দিনের ইতিহাস, হারিয়ে যাওয়া নানা তথ্য। আমরা হেঁটেছি দীর্ঘপথ পায়ে পায়ে, স্বাধীনতার অনেক অনেক আগে সেই ১৯১২ সাল থেকে। হেঁটেছি মানুষের হাতে হাত রেখে আসানসোলের সর্বত্র রাণীগঞ্জ থেকে বরাকর, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। হেঁটেছি বাঁকুড়ার লালমাটির পথে পুরুলিয়া ও বীরভূমের প্রান্তরে।

ঘৃণায় নয় ভালবাসার হাত বাড়িয়েছি কুষ্ঠরোগীদের জন্যে, কলেরা বসন্ত ম্যালেরিয়া দূরীকরণে, পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার কঠোর অতন্দ্র প্রচেষ্টায়।

এসেছে সূর্যোদয়, প্রার্থিত প্রিয় স্বাধীনতা। জনকল্যাণে, শ্রমিকস্বার্থে বেড়েছে আরও দায়িত্ব। সীমিত ক্ষমতায় সীমিত অর্থভাণ্ডার নিয়ে নেমেছি পথে প্রান্তরে গ্রাম থেকে গ্রামে, হাটে বাজারে খনিতে শহরে।

চাই স্বাস্থ্য, চাই সুস্থ পরিবেশ, চাই প্রিয় পরমায়ু মানুষের —হাতে হাত এগিয়ে চলেছি—চলবোই।

আসানসোল মাইনস বোর্ড অফ হেলথ্
কোর্ট কম্পাউণ্ড : আসানসোল : ফোন : ২৫-২২২৭

পরিচয়

আগস্ট—অক্টোবর ১৯৯৯
শ্রাবণ—আশ্বিন ১৪০৬
১—৩ সংখ্যা ৬৮ বর্ষ

প্রচ্ছদ : পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়

সম্পাদনা দপ্তর : ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭

রঞ্জন ধর কর্তৃক বাণীরূপা প্রেস, ৯-এ মনোমোহন বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ থেকে
মুদ্রিত ও ব্যবস্থাপনা দপ্তর ৩০/৬, ঝাউতলা রোড, কলকাতা-১৭ থেকে প্রকাশিত।

যাঁকে যা দেয়

অশোক মিত্র

ঘুটঘুটে অন্ধকারে হঠাৎ দেশলাই কাঠির জ্বলে উঠে প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে নিভে যাওয়ার মত, মধ্যবিত্ত বাঙালির বিবেকবোধের ক্ষণিক বিস্ফোরণ। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক চৌহদ্দির মধ্যে গোটা দশেক কোটি বাঙালির অধিবাস, তাদের ভাষা আর খুব বেশিদিন টিকবে বলে মনে হয় না। তার কারণগুলি এখানে ঘাঁটাঘাঁটি করার বিশেষ সার্থকতা নেই। বাংলা বইয়ের বাজার কমছে, কয়েকটি বিশেষ শ্রেণীর বাঙালিরা নিজেদের ছেলেমেয়েদের মাতৃভাষায় কথোপকথনে উৎসাহ দেওয়া থেকে নিবৃত্ত থাকছেন। প্রাথমিকস্তরে বাংলাভাষার একক প্রয়োগ নিয়ে যে উত্তেজিত আন্দোলন হলো তা থেকেও অনুমান করা সম্ভব : শিগ্‌গিরই হয়তো, ব্যাকুল বাদল সাঁঝের আয়োজন ছাড়া, আস্তে-আস্তে, পশ্চিম বাংলায় এবং আশেপাশে, বাংলা ভাষার ব্যবহার মিলিয়ে যাবে, প্রত্নতাত্ত্বিক ইতিহাসে উল্লেখ থাকবে মাত্র। আজ থেকে চার-পাঁচ দশক আগে যে-বাঙালি সাহিত্যিকরা সৃষ্টিকর্মের শীর্ষবিন্দুতে ছিলেন, হুমড়ি খেয়ে যাঁদের লেখা গল্প-উপন্যাস পাঠককুল পড়তেন, তাঁদের নাম এখন কচিৎ-কদাচিৎ উচ্চারিত হয়, তাঁদের রচনাবলী সব সময় বাজার টুঁড়েও মেলে না। তবে, মধ্যবিত্ত বাঙালি সংস্কারে বিশ্বাসী, সেই সঙ্গে হুজুগেও। এই সাহিত্য-মহারথীদের তিনজনের জন্মের শততম বছর এটা। একটু সভা-সমিতি না করলে, সমারোহ সহকারে এই উপলক্ষ্যে স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ না করলে, নিজেদের কাছেই লজ্জাবোধ হওয়ার আশঙ্কা। অতএব, আগে-পরে তারিখ যাচাই করে, বিভূতিভূষণ-তারাশঙ্কর-বনফুলের বন্দনা। আমার অন্তত কোন বিভ্রান্তির শিকার হওয়ার আগ্রহ নেই, প্রায় হলফ করেই বলতে পারি অনুষ্ঠানের ঋতু অতিক্রান্ত হলেই বাঙালি পাঠকসমাজ এই মহান লেখকত্রয়ীকেও ফের বিস্মৃতির অন্ধকার কুলুঙ্গিতে নিক্ষেপ করবেন।

এরই মধ্যে বিভূতিভূষণ একটু বেশিদিন টিকবেন, কারণ খোলাখুলি বলা ভালো, তাঁর রচনার অন্তঃস্থিত উৎকর্ষহেতু নয়, সত্যজিৎ রায় তাঁর দুটি উপন্যাস থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে 'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত', 'অপুর সংসার' এই তিনটি চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছিলেন বলে। মনকে চোখ ঠেরে লাভ নেই, সত্যজিৎ রায়ের মধ্যবর্তিতা ব্যতীত, বিভূতিভূষণে প্রকৃতিপ্রেম নিয়ে আদিখ্যেতা হালের পাঠকসমাজের নিছক বিরক্তিই উৎপাদন করতো। তবে, তারাশঙ্কর-বনফুলের ক্ষেত্রে সেরকম কোনো সৌভাগ্যের অভিজ্ঞতা হয়নি। তারাশঙ্করের বিভিন্ন লেখায় ছড়ানো-ছিটোনো যে, যুগচেতনা-সমাজচেতনা-শ্রেণীচেতনা ইত্যাদি, তা নিয়ে

বিশ্ববিদ্যালয়ে উঁচু ডিগ্রী অন্বেষণকারী কিছু-কিছু গবেষক হয়তো এখনো খানিকটা উৎসাহ দেখাবেন। তেমন পড়ে-পাওয়া সৌভাগ্যেরও কিছু বক্কেড়াসড়ের আশার ভরসা আমি কিন্তু দিতে পারছি না।

বনফুলের হাল আরও শোচনীয়। এন্তার গল্প-উপন্যাস লিখেছিলেন তিনি, বর্ণনা ও বিন্যাসের এমন চমৎকার জাদু সমসাময়িক, পূর্ববর্তী কিংবা পরবর্তী কোনো লেখকের রচনাতেই সমপরিমাণ চোখে পড়েনি। তা হলেও ভাগ্যচক্র বলুন, অথবা অন্য-কোনো গালভরা বিশেষ্য দিয়ে বাক্য পূরণ করুন, বনফুলের গল্প-উপন্যাসাদি নিয়ে তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো চলচ্চিত্রও রচিত হয়নি। ব্যতিক্রম আছে, 'কিছুক্ষণ' উপন্যাসটি উপলক্ষ্যে পরে ছবি তৈরি করবার উদ্যোগ একদা নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পরিচালনার স্খলন বা অসম্পূর্ণতার জন্য সাধারণ মানুষ সে-সব ছবি, ঐ চলিত ভাষায় যাকে বলে, খায়নি।

সত্যজিৎ রায় প্রমুখদের আগ্রহ কুড়োতে অসফল হয়েছেন বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়। তার একটা বড়ো কারণ মনে হয়, বনফুলের প্রকৃতিচর্চার হ্রস্বতা ছেড়ে দিলেও, তাঁর জীবন-জিজ্ঞাসা মধ্যবিত্ত বাস্তবতার গণ্ডি ছাপিয়ে যায়নি। চলচ্চিত্র পরিচালক হিশেবে যাঁরা কল্পনার ফানুস বুনেছেন, তাঁর রচনাদি চুঁড়ে তাঁরা চমকপ্রদ উৎসাহব্যঞ্জক কিছু তাই আবিষ্কার করতে অসমর্থ হয়েছেন। বনফুল মরিয়া হয়ে বন্ধু শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে অনুসরণ করে রহস্যরোমাঞ্চ কাহিনী রচনাতেও প্রবৃত্ত হননি, বরাবরই বিবেচনা করেছেন, স্বধর্মে নিধন শ্রেয়। তারাশঙ্করের ভূম্যধিকারীচেতনার পাপবোধভারাক্রান্ত ঐতিহ্যও পরিচালক সম্প্রদায় তাঁদের সৃষ্টিকর্মের পরিধির থেকে নিরাপদে দূরত্বে রেখে দিয়েছেন।

অথচ, বনফুলের সৃষ্টি প্রতিভার বৈচিত্র্য ঐশ্বর্য আদৌ হেলাফেলার বস্তু নয়। চারশো-পাঁচশো পংক্তির মধ্যে সীমিত অথচ স্বয়ংসম্পূর্ণ তাঁর গল্পগুলির তুলনা বাংলা সাহিত্যে আদৌ নেই। বাক্‌সংযমের পরাকাষ্ঠার উদাহরণ প্রতিটি কাহিনী, প্রতিটি গল্পের সমাপ্তিমুহূর্ত আমাদের বুকের মধ্যে মোচড়, হয়তো বিষাদের, হয়তো আনন্দের, হয়তো আশ্চর্য এক মনোভূমিতে তলিয়ে যাওয়ার বিস্ময়কর অনুভূতিও সেই সঙ্গে।

'দ্বৈরথ' উপন্যাসটির কাঠামো নিয়ে কিছু দায়সারা পার্শ্বমন্তব্যেই কি আমাদের কর্তব্য শেষ? কোথায় যেন পড়েছিলাম, এই কাহিনী রচনায় বনফুল কোন বিদেশী গল্পের ছায়ার ঈষৎ আশ্রয় নিয়েছিলেন। হয়তো এই লোকপ্রবাদের বাস্তবভিত্তি আছে, হয়তো বা নেই। কিন্তু, আমার বিবেচনায়, যদি খানিকটা বহিঃপ্রেরণা থেকেও থাকে, 'দ্বৈরথ' তা হলেও অতি দক্ষ রচনা, তারাশঙ্করের সৃষ্টিকর্মের সমীপবর্তী পরিমণ্ডলে যেন প্রবৃষ্ট হয়ে যান বনফুল এই কাহিনীর অধিকারে। ক্ষয়িষ্ণু সামন্তযুগ,

দুই জমিদার, দিনের বেলা লেঠেল দিয়ে একে অপরের রক্তাক্ত সর্বনাশের ছক কাটেন, অথচ সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হলেই তাঁরা দুই শত্রুসখা পরস্পরের সঙ্গে দাবা খেলতে নিমগ্ন হয়ে পড়েন, কোন্‌টা আসল যুদ্ধক্ষেত্র তা বোঝা যথার্থই দুরূহ। আমার মাঝে-মাঝে কল্পনা করতে ভালো লাগে, যদি যথাযথ মুহূর্তে 'দ্বৈরথ' উপন্যাসটি তাঁর দৃষ্টিগোচর হতো, সত্যজিৎ রায়, কে জানে, হয়তো প্রেমচাঁদের পিছনে ধাওয়া করতেন না, 'শতরঞ্চ কি খিলাড়ী'-র অন্যতর একটি বয়ান পেতাম আমরা।

যা ঘটলো না, তা নিয়ে অনুশোচনায় লাভ নেই। বরঞ্চ আমি বনফুলের দীর্ঘ উপন্যাস 'জঙ্গমে'র প্রসঙ্গে একটি-দুটি কথা সংযোজন করছি। কোনো অর্থেই 'জঙ্গম' মহৎ সৃষ্টি কর্ম নয়। উপন্যাসের শেষ দুই খণ্ড অত্যন্ত দুর্বল। সন্দেহ হয়, কিস্তির দায় মেটাতে, দায়সারাভাবে কোনোক্রমে শেষ করে দিয়েছিলেন উপন্যাসটি। অথচ তা হলেও আমি 'জঙ্গমে' বাংলা সাহিত্যের একটি আলাদা চরিত্রলক্ষণ খুঁজে পাই। বাংলা ভাষায় উপন্যাস হিসেবে যে ধরনের রচনা পরিচিতি লাভ করেছে, সেগুলি বড়ো বেশি একমাত্রিক, একপাক্ষিক। মাত্র গুটিকয় চরিত্রের সমাবেশ, এদের বৃত্তের বাইরে যে-ভূমণ্ডল, তা যেন অপ্রয়োজনীয়, প্রক্ষিপ্ত। উপন্যাসের একটি বিশেষ গণ্ডিকে গণ্ডির বাইরের সঙ্গে অন্বিত করা, পাশাপাশি, বাইরের পৃথিবীতে উপস্থাপিত কাহিনীর খণ্ডিত সংসারের সঙ্গে সুষমার, অথবা তার বৈপরীত্যে, দাঁড় করানো। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যে কারো উপন্যাসপ্রয়াসে আমরা এই অন্বয়কে হাৎড়ে বেড়াই, সবসময় সফল হই না। যেন, উপন্যাসের চরিত্রগুলি লোকালয় থেকে নির্বাসিত, পরস্পরের সঙ্গে তাদের বিনিময়-সংঘাত-আস্ফালন যেন পৃথিবীবিচ্যুত সংঘটনা। 'জঙ্গম' অন্য এক পরীক্ষাপ্রয়াসের পরিণাম। সত্যি-সত্যিই যেন চরিত্রগুলি শোভাযাত্রার মতো নিরন্তর প্রবাহিত, অনেক ধরনের চরিত্র, তাদের যে একই সংস্থানে দাঁড় করানো যায়, তা ভাবতে একটু অবাকই লাগে। কিন্তু বনফুলের অপরিমেয় সাহস, তিনি কতিপয় নারীপুরুষের জীবনযাত্রার মিছিল লক্ষ্য করেছেন, কিংবা এই চরিত্রাবলীর কাছাকাছি স্বভাব বা আচরণ তাঁর দৃষ্টিগোচর হয়েছে। কাহিনীর বাঁধুনি বজায় রেখে চরিত্রগুলিকে প্রাণোচ্ছল করতে প্রতিজ্ঞ হয়েছেন বনফুল। উপন্যাসটির নায়ক শঙ্করকে আমার তেমন জুৎসই মনে হয় না, হয়তো বনফুল সে রকম ইচ্ছা করেছিলেন বলেই শঙ্করের চরিত্রে যেন ধৃতির অভাব। কিন্তু ক্ষতি নেই তাতে। শঙ্করের পরিবৃত্ত অনুসরণ করে আমরা ভণ্টুর দেখা পাই, পরে আমরা জেনেছি যা আপাত অলীক তা আসলে অলীক নয়, ভণ্টুর কিম্ভুত ব্যবহৃত বাক্যাবলীর প্রণেতা বনফুলের ভাগলপুরস্থ এক বাল্যবন্ধু, চ্যাম গ্যানচঅ দক্‌চাদক্‌চি ইত্যাদি শব্দ তিনি সদাসর্বদা প্রয়োগ করতেন। 'জঙ্গমে' প্রবেশ করে সে-শব্দগুলি অমরত্ব পেল, কিন্তু ভণ্টুর পরিভাষা ছাপিয়ে ভণ্টুর চরিত্র-

বৈশিষ্ট্য, বাঙালি নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষ কী করে নিছক নির্জীব হয়ে বেঁচে না থেকে, দূরবর্তী অথবা ঘনিষ্ঠ নক্ষত্রের মতো সংসারের নিগূঢ় অন্ধিসন্ধি দিয়ে প্রবেশ-প্রস্থান করে, যেন তেন প্রকারে কৌশলে-পরিশ্রমে-অধ্যবসায়ে চরিত্রগুলি বেঁচে থাকার কলকাঠি কৃতকার্যতার সঙ্গে নাড়া-চাড়া করতে শেখে, আমরা মোহিত হয়ে সেই বিবরণ পড়ি। ভন্টুর বৌদিকেই বা ভুলি কেমন করে, যিনি বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজভুক্ত নারীকুলের বিমর্ষ তমসাচ্ছন্ন পরিমণ্ডলে থেকেও মহত্তর পর্যায়ে পৌঁছতে পারেন, তাঁর সহ্য করবার ক্ষমতা প্রয়োগ করে এবং সেই সঙ্গে অপরের মঙ্গলসাধনার যত্নে নিজেকে সমর্পণ করার মধ্য দিয়ে। এই ছোটো পরিবারটি তার সমস্ত সমস্যা নিয়ে যেন যে-কোনো বাঙালি নিম্ন মধ্যবিত্ত সংসারের প্রতিভাস, ভন্টুর খামখেয়ালী বাবা এবং সংসারে না থেকেও পরম সম্ভোগপ্রিয় মেজকাকাও অবাক করার তালিকায় জায়গা প্রস্তুত করে নেন।

করালীচরণ বক্সীকে নিয়ে অতি প্রয়োজনীয় এক বিশ্লেষণে মগ্ন হোন। বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না বনফুল পুরোপুরি কল্পনার উপর নির্ভর করে এই বিশেষ চরিত্রটির অবতারণা করেছেন। করালীচরণ বক্সীর চরিত্রচিত্রণ এতটাই পরাবাস্তব যে তাঁকে স্বাভাবিকতার বৃত্তে উত্তীর্ণ না করে আমাদের আবেগ স্থিত হতে পারে না। একদা পরম প্রতিভাবান গণিতের ছাত্র ছিলেন, জাগতিক সাফল্যের প্রকৃষ্ট সুযোগগুলি তাঁর ক্ষেত্রে অবারিত-উন্মুক্ত ছিল। কিন্তু তাঁর কুৎসিত চেহারাহেতু কোথায় যেন একটা মস্ত ধাক্কা খেয়েছিলেন, যে অভিজ্ঞতার অবসন্ন পরিণামে তিনি প্রান্তিক মানুষ হয়ে গেলেন। তিনি সমাজে অবস্থান করছেন, অথচ সমাজের প্রতিটি অধমর্ণ মানুষের যুগ-যুগ সঞ্চিত ঘৃণা ও অবজ্ঞা দিয়ে তাঁর হৃদয়ের বিপণী সাজিয়েছেন। তাঁর হৃদয় জুড়ে একদা যে কোমলতা ছিল, তা তিনি কিছুতেই স্বীকার করবেন না। তাঁর একমাত্র আত্মসমর্পণ ভন্টুর স্নেহশীল কলাকুশলতার কাছে। বাকি সমস্ত অনুরাগ সারমেয়-পতঙ্গ-মনুষ্যোত্তর প্রাণীদলে উৎসর্গীকৃত।

অথবা ভাবুন মিষ্টিদিদির কথা। সাহসী বনফুল, সংযমী বনফুল যে-সময়ের পটভূমিকায় তাঁর কাহিনী বর্ণিত, বাঙালি উচ্চবিত্ত মহলেও মিষ্টিদিদির মতো চরিত্র সম্পর্কে সামান্যতম ইঙ্গিতও বাইরে ছড়িয়ে পড়লে টিটিক্কার পড়ে যেত। বনফুলের 'জঙ্গম'-এ তিনি অবহেলিত নন, তবে তাঁকে লেখক অল্পে রেহাই দিয়েছেন অত্যাশ্চর্য নৈপুণ্যের সঙ্গে। দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিক্ষেপ করেছেন মৃন্ময় চরিত্রে, যাকে বাইরে থেকে বোঝবার উপায় নেই, অথচ এই আপাতস্বল্পবাক্, সলজ্জ, সদা-অপ্রতিভ মানুষটির মধ্যে বিচিত্র রহস্যের উপাদান। তার প্রথম পত্নীকে অপহরণ করে যে দুরাত্মা তাকে হত্যা করেছিল সেই ব্যক্তিটি আপাতত কারাগারে। দপ্তরে ইচ্ছাকৃত তহবিল তছরূপ করে মৃন্ময় সেই কারাগারে পৌঁছে খুনীকে জবাই করে নিজের প্রথমা স্ত্রীর প্রতি আনুগত্যের দায় মেটালো। কিন্তু কী হবে তার দ্বিতীয়া

স্ত্রীর? যে-মুখুজ্যে মশাই বিশ্বময় পরোপকার করে বেড়ান, যে-অনাথা মেয়েটির সঙ্গে মৃন্ময়ের বিবাহ ঘটিয়ে দিয়েছিলেন তিনি, নতুন কী সমাধানে পৌঁছে দেবেন কাহিনীকে, আমরা তা নিয়ে চিন্তায় অব্যাহত থাকি।

পৃথিবীর মহত্তর উপন্যাসের সারিতে 'জঙ্গম'-কে ফেলা চলে না তার দুর্বল উপসংহারের জন্য। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে চরিত্রচিত্রণের সার্থক উদাহরণ হাতের আঙুলে গোণা যায়। নবকুমার-কপালকুণ্ডলা থেকে যদি গণনা শুরু করি, তা হলেও খুব বেশিদূর এগোনো সম্ভবপর বলে মনে হয় না। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে শুধু ‍বলা সম্ভব 'জঙ্গম' বাংলা সাহিত্যে মস্ত এক অভাব খানিকটা পূরণ করেছে।

আমার মনে কোনো স্বপ্নবিলাসিতার ঠাঁই নেই। এটা ধ্রুব জানি, জন্মশতবার্ষিকী ঋতুর অবসানে বনফুল আবার বিস্মৃতিতে মিলিয়ে যাবেন। তবু ইতিহাসের বিচারে যাঁর যা প্রাপ্য, তাঁকে তা না পৌঁছনো তো মহাপাপ।

করালীচরণ বক্সী কবেদিন বিস্মৃতির তেপান্তরে অদৃশ্য হয়ে গেছেন, তাঁকে তবু কুর্নিশ করি, এতাদৃশ চরিত্র বাংলা সাহিত্যে নেই, এই চরিত্রের স্রষ্টাকেও শত-সহস্র কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন।

বনফুল অতঃপর শিকেয় তোলা থাকবেন, তা হলেও।

আচার্য শৈলজারঞ্জন ঃ 'স্মরণবেদনার বরণে আঁকা'

অনন্তকুমার চক্রবর্তী

আচার্য শৈলজারঞ্জন মজুমদারের সঙ্গে আমার আলাপ যখন কিছুটা ঘনিষ্ঠ হয়ে এসেছে, একদিন তাঁকে জিগ্যেস করেছিলুম, আপনার বয়স কত? উনি হেসে জবাব দিয়েছিলেন, "I am as old as the century." তার মানে ১৯০১ সালে তাঁর বয়স ছিল এক বছর, দু সালে দু বছর, এমনি করে বিরানব্বই সালে বিরানব্বই বছর। কিন্তু তার পরেই তাঁর শতাব্দী-পরিক্রমা ফুরিয়ে গেল। শুধু রয়ে গেল তাঁর বহু-যত্নে-গড়ে-তোলা রবীন্দ্রসংগীত-সংরক্ষণের এক বিশিষ্ট ধারা, সঙ্গে কিছু স্মৃতি, কিছু নিকট-মুহূর্তের সৌরভ।

এক সময়ে আমি শান্তিনিকেতনে বছরখানেক চাকরি করেছিলুম। অবশ্যই অর্থনীতি বিভাগে— ১৯৫৫-৫৬ সালে। তখন বিভাগীয় প্রধান ছিলেন ড. করুণাময় মুখোপাধ্যায়, উপাচার্য ড. প্রবোধচন্দ্র বাগচী। ড. মুখোপাধ্যায় ও ড. বাগচীর মধ্যে কী কথাবার্তা হয়েছিল আমাকে নিয়ে ঠিক জানি না। তবে ঐ কথাবার্তার সূত্র ধরেই আমার ওখানে কর্মলাভ— প্রথমে অস্থায়ীভাবে, পরে স্থায়ী করার মৌখিক আশ্বাস। অর্থনীতি বিভাগের প্রশস্ত ঘরটার মাঝখানে বসতেন বিভাগীয় প্রধান, একপাশে দুই গবেষক-কর্মী, অন্যপাশে প্রয়োজনীয় বইপত্র আর কাগজের স্তূপের মধ্যে আমি। মাঝে মাঝে বাইরে গিয়ে স্নাতকোত্তর ছাত্রছাত্রীদের কয়েকটি ক্লাসও নিতে হতো। এইভাবেই দিন কাটাচ্ছিল। হঠাৎ একদিন সকালবেলায় এসে শুনলুম, ড. বাগচী বিনা নোটিশে চিরদিনের মতো চলে গেলেন। বিভাগের দরজায় তালা লাগিয়ে ছুটলুম তাঁর গৃহের উদ্দেশ্যে। গিয়ে দেখি, তখনই বেশ ভিড় জমে গেছে। প্রভাতদা (রবীন্দ্রজীবনীকার)-এর মুখের দিকে তাকাতেই তিনি বলে উঠলেন, 'সর্বনাশ হয়ে গেল।'

মাঝখানে কিছুদিন একটা অরাজক অবস্থাই চলেছিল। ইন্দিরাদেবী কিছুদিনের জন্যে ছিলেন অস্থায়ী উপাচার্য। কিন্তু কাজ দেখাশোনার তাঁর কোনো ক্ষমতাই ছিল না। কয়েক মাস পরে এলেন অধ্যাপক সত্যেন বোস। তাঁকে স্বাগতজ্ঞাপনের অনুষ্ঠানে আমি হাজির ছিলুম; বিদায়দানের সময় আমি শান্তিনিকেতনের বাইরে।

এই সময়েই আচার্য শৈলজারঞ্জন মজুমদারকে আমি দেখেছি, দেখেছি তাঁর যাওয়া-আসার পথে। আলাপের কথা চিন্তায়ও আসে নি। বিশেষ কোনো অনুষ্ঠানেও তাঁকে পরিচালকের আসনে দেখি নি। এ-সব কাজে বরং শান্তিদেব ঘোষকেই এগিয়ে আসতে দেখতুম। কারণ জানি না। শৈলজারঞ্জনকে তখন দেখেছি

শুধু গম্ভীরমুখে পথ হেঁটে চলেছেন। খালি পা, গায়ে সাধারণ ধুতি-পাঞ্জাবি, কাঁধের দু-পাশ থেকে বুকের ওপর ঝোলানো একটা সাদা বা ফিকে রঙের চাদর। মুখে বা গতিভঙ্গিতে কোনো চাঞ্চল্য নেই, বরং থাকত একটা স্বভাবসিদ্ধ গাম্ভীর্য। সংগীতভবনের একজনের সঙ্গেই আমার কিছুটা আলাপ ছিল— বীরেনদা। না, বীরেন বন্দ্যোপাধ্যায় নয়, বীরেন পালিত। মাঝে মাঝে তাঁর কিছু গানও শুনেছি— অনুষ্ঠানে ও অন্যত্র। ভালোবাসতেন রবীন্দ্রনাথের ধ্রুপদাঙ্গ গান গাইতে। অনেক কাল পরে শৈলজারঞ্জনকে তাঁর কথা বলতেই দেখলুম মুখে একটা স্নিগ্ধ হাসি খেলে গেল। বললেন, "তুমি বীরেনকে চিনতে? বড়ো ভালো ছেলে ছিল ও।" তারপর একটু দুঃখ করে বললেন, "কিন্তু চলে গেল কত তাড়াতাড়ি।"

নৈহাটিতে আমার জানাশোনার মধ্যে বাস করতেন এক দম্পতি— অবনী ও সর্বাণী মজুমদার। অবনী শৈলজারঞ্জন মজুমদারের আপন ভাগিনেয়। সেই অবনী একদিন আমাকে বললেন, "বড়মামার সঙ্গে আপনি দেখা করবেন? উনি এখন ইছাপুরে আছেন কিছুদিনের জন্যে। আমি আপনাকে তাঁর কাছে নিয়ে যেতে পারি।" আসলে শৈলজারঞ্জনের এক ভাই ছিলেন ইছাপুর রাইফেল ফ্যাক্টরির একজন উচ্চপদস্থ অফিসার, থাকতেন ওখানকার স্টাফ্ কোয়ার্টার্সে। সেখানেই গেলুম অবনীকে সঙ্গী করে। বাইরের ঘরে বসে আছি, কিছুক্ষণের মধ্যেই গম্ভীর মুখে ঢুকলেন আচার্য শৈলজারঞ্জন। প্রণাম করতে বসতে বললেন। কিছু কিছু কথাবার্তা শুরু হলো। প্রথমটায় একটু আড়ষ্ট লাগছিল। কেন-না আমার জ্ঞানগম্যি অতি সামান্য, আর উনি বিশ্বভারতী সংগীতভবনের প্রাক্তন অধ্যক্ষ, রবীন্দ্রসংগীতের একজন বিশেষজ্ঞ, অন্যতম প্রধান স্বরলিপিকার এবং বহু খ্যাতনামা রবীন্দ্রসংগীতশিল্পীর পরমশ্রদ্ধেয় শিক্ষাগুরু। কিন্তু কিছুক্ষণ কথাবার্তা চালাবার পর আড়ষ্টতা কোথায় উবে গেল। আমার তরফ থেকে দু-একটা সাধারণ প্রশ্নই ছিল যথেষ্ট। উনিই সারাক্ষণ কথা বলে গেলেন। নানা কাহিনী, নানা স্মৃতি, নানা অভিজ্ঞতা। কেন্দ্র অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ, মাঝেসাঝে দিনেন্দ্রনাথ ও আরও কেউ কেউ। ঘন্টাখানেকের পর আমি বললুম, "আপনার হয়তো এতক্ষণ ধরে কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে।" উনি বললেন, "গুরুদেবের প্রসঙ্গ বলতে আমার ক্লান্তি নেই।" এমন নিবেদিতপ্রাণ মানুষ আমি কদাচিৎ দেখেছি।

এই হলো আলাপের শুরু। তারপর বহুবার তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে, কথাবার্তা হয়েছে। কখনও সল্ট লেকে তাঁর প্রয়াত আর-এক ভাই-এর বাড়িতে, কখনও নৈহাটিতে, এবং গরিফায় তাঁর ভাগনের বাড়িতে, কখনও এমন-কি বাগবাজারে কে.সি. দাসের বাড়িতে। হ্যাঁ, 'স্পঞ্জ-এর রসগোল্লা'-খ্যাত কে.সি. দাসের বাড়িতেই। সেখানে কেন?— না সেখানে তিনি সপ্তায় একদিন কার ক্লাশ নিতেন। বোধহয় ঐ বাড়ির কোনো অন্তঃপুরিকা ছিলেন তাঁর ছাত্রী। প্রশস্ত ঘর, আসবাবহীন। যৎসামান্য বাদ্যযন্ত্র ও পরিচিত তাঁর এস্রাজটি ছাড়া ঘরের মধ্যে হাজির থাকতেন প্রবীন

শিক্ষক নিজে এবং তাঁর পঁচিশ-তিরিশজন ছাত্রছাত্রী। আমি বলেছিলুম, "আমিও মাঝে মাঝে আপনার ক্লাশে এসে বসব।" উনি বললেন, "দেখো, এখানে জায়গার বড়ো অভাব, যারা শিখতে আসছে তারাই ভালো করে বসতে পারে না। তবে তুমি একা যদি আস আপত্তি নেই।" সন্ট লেকের বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার পথে ওঁকে আমি বললুম, "আপনার তো বেশি কথা বলা-ই বারণ। তাহলে বোলপুর গিয়েছিলেন কী করে?" উনি বললেন, "বোলপুর গিয়ে তো আমি কোনো কথা বলি নি। কিন্তু ওঁরা গুরুদেবের শান্তিনিকেতন থেকে শেষযাত্রার রেলওয়ে 'সেলুন কার'-টি নতুন করে উদ্বোধন করলেন, না গিয়ে থাকতে পারি নি।" আমি সঙ্গে সঙ্গেই বললুম, "তা বলে গান শেখাচ্ছেন কী করে?" উনি চট্ করে উত্তর দিলেন, "আমি তো কথা বলছি না, গান শেখাচ্ছি।" ব্যস্, এর ওপর আর কথা নেই। উনি অবশ্য এস্রাজটা দেখিয়ে বললেন, "এটা তো রয়েছে। বেশি কথা বলব কেন?" অথচ আমি দেখলুম, কী গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে সেই পঁচাশি বছরের বৃদ্ধ শেখাচ্ছেন: 'জীবন যখন শুকায়ে যায় করুণাধারায় এসো।' যেখানটায় আছে 'দুয়ার খুলিয়া, হে উদার নাথ, রাজসমারোহে এসো', সেখানে উনি 'রাজসমারোহে' কথাটার তাৎপর্য বোঝাচ্ছেন, কিভাবে তা উচ্চারণ করতে হবে তা-ও দেখাচ্ছেন। এই ক্লাশের গুরুত্বই আলাদা। কোনো বিশ্ববিদ্যালয় আজ তা দিতে পারবে মনে হয় না।

কত কথাই হয়েছে তাঁর সঙ্গে। কত জিজ্ঞাসা, কত সংশয় নিয়ে গিয়েছি তাঁর কাছে, তিনি ধৈর্যের সঙ্গে একে একে সব কিছুর নিরসন করে দিয়েছেন। নানা নতুন তথ্য জেনেছি তাঁর কাছে যা আগে জানা ছিল না। সব কথা এখানে বলা যাবে না। তার প্রথম কারণ, সবই যে মনে আছে তা নয়। দ্বিতীয়ত, কিছু কথা তাঁর 'যাত্রাপথের আনন্দগান' বইটিতে (১৯৮৫) পরে প্রকাশিত হয়েছে। তৃতীয়ত, কিছু কথা আছে যাতে কিছুটা বিতর্ক সৃষ্টিও হতে পারে, কিন্তু আমার হাতে কোনো তথ্যপ্রমাণ নেই। কাজেই সেগুলো বাদ দিতে হচ্ছে, ব্যক্তিগত আলাপে ছাড়া তা বলা যায় না। একবার অবনীর সঙ্গে পরামর্শ করে একটা 'টেপ-রেকর্ডার'-ও লুকিয়ে রাখা হয়েছিল প্রশ্নোত্তরের সময়। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য, কোনো অজ্ঞাত ত্রুটির কারণে যন্ত্রটা একেবারেই কাজ করে নি। যাই হোক, যা বলা যায় তার দু-একটা কথা এখানে বলছি। একদিন উনি বললেন, "তোমার কাছে কী কী পুরনো রেকর্ড আছে আমাকে একটু শোনাতে পার?" আমি বললুম, "নিশ্চয়ই।" একদিন বাছাই-করা কিছু রেকর্ড বয়ে নিয়ে গেলুম অবনীর বাড়িতে। ওর মধ্যে রমা কর (মজুমদার)-এর গান শুনে খুব আনন্দ প্রকাশ করলেন, বললেন, "নুটুদির গলা কতদিন পরে শুনলাম।" দিনেন্দ্রনাথের রেকর্ড আমার কাছে যা আছে সে সব ওঁকে শোনানো বাহুল্যমাত্র, তাই নিয়ে যাই নি। রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর রেকর্ডটিও ওঁকে শোনাই নি, কেন-না ওটিও ওঁর ভালোভাবেই জানা। আমি শুধু জিগ্যেস করেছিলুম, "গোঁসাইজী যেভাবে প্রচুর তান সহযোগে গান-দুটি ('স্বপন যদি ভাঙিলে' ও 'বিমল আনন্দে জাগো রে')

গেয়েছেন এইভাবে গাওয়া কি উচিত?" উনি বললেন, "না, ওই তানগুলো অবশ্যই বাদ দিতে হবে। তা ছাড়া, ক'জনেরই বা ক্ষমতা আছে ওই সব জটিল তান গলায় তোলার। তবে, ওই গানের 'গান' অংশটুকু যেভাবে গোঁসাইজী গেয়েছেন সেটাই হলো 'মডেল'। আমি মোহরকে ও অন্যান্যদের ওই 'মডেল' ধরেই শিখিয়েছি।" বিশেষ করে 'স্বপন যদি ভাঙিলে' গানটি সম্পর্কে বললেন, "আমার যতদূর জানা আছে, এ-গানের কোনো স্বরলিপি নেই।" আমি এখানে ১৯৮৪-৮৫ সালের কথা বলছি। তখনও এ-গানের কোনো স্বরলিপি প্রকাশিত হয় নি। স্বরবিতান ৬৩ খণ্ডে যেটি পাওয়া যায় তার প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ ১৩৯৮ বঙ্গাব্দে, অর্থাৎ ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে। ওই ৬৩ নম্বর খণ্ডে লেখা আছে, উক্ত "স্বরলিপি রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী-কর্তৃক গীত গ্রামোফোন রেকর্ড অবলম্বনে শ্রীবিদ্যাধর ব্যঙ্কটেশ ওয়রলওয়ার (সম্প্রতি প্রয়াত)-কৃত; আনুষ্ঠানিক দ্বিতীয় খণ্ড (স্বরলিপি গ্রন্থ) হইতে সংকলিত। গানটির প্রথম অন্তরার অনুরূপ সুরের দ্বিতীয় অন্তরা : 'খুলি মোর দ্বার ... ভবনে' উক্ত রেকর্ডে গীত হয় নাই; উহার স্বরলিপি প্রথম অন্তরা অনুসারে সন্নিবিষ্ট।"...রবীন্দ্রসংগীত ছাড়া অন্য কিছু গানের রেকর্ডও ওঁকে আমি শুনিয়েছিলুম, যেমন একটা গান হলো এককালের বিখ্যাত ধ্রুপদ-গায়ক অঘোরনাথ চক্রবর্তী মশায়ের ব্ল্যাক-লেবেল রেকর্ড : 'বিফল জীবন বিফল জনম জীবের জীবন না হেরে'— গানটি ভৈরবী-রাগাশ্রিত টপ্পা-অঙ্গের গান। বৃদ্ধ শুনে প্রায় লাফিয়ে উঠলেন, বললেন, "শিগ্গির এটা আমায় 'টেপ' করে দাও। গুরুদেব ঠিক এই স্টাইলে টপ্পা গাইতেন। আমি যেন তাঁর নিজের কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি।" তারপর আরও বলেন, "এক-এক সময় গানের এক-একটা স্টাইল তৈরি হয়ে যায়, যেমন আজকাল হয়েছে হেমন্ত-র স্টাইল। এ-ও অনেকটা সেই রকম।" অঘোরনাথ চক্রবর্তী (১৮৫২-১৯১৫) ছিলেন রবীন্দ্রনাথেরই সমসাময়িক, বরং বয়সে কিছুটা বড়ো। আমি আচার্যের আদেশ যথারীতি পালন করে গানটি ওঁর 'টেপ'-এ তুলে দিই।

এখানে কিছু ছেঁড়া ছেঁড়া স্মৃতির কথাই বলতে হচ্ছে, কেন-না ওঁর সঙ্গে একটানা দীর্ঘদিন আলাপের সুযোগ আমার কোনদিনই হয় নি। একটা বিশেষ দিনের কথা বলি। তখন তিনি ক'দিনের জন্যে নৈহাটিতে (গরিফায়) ভাগনে অবনীর বাড়িতে অবস্থান করছেন। দিনটা ছিল সরস্বতী পুজোর দিন। সরস্বতীর বরপুত্রেরা চারিদিকে অসংখ্য মাইক বাজাচ্ছেন। কান ঝালাপালা। এরই মধ্যে বৃদ্ধ সংগীতাচার্য চুপ করে বসে আছেন, মুখে বিকারের চিহ্নমাত্র নেই। এটা-ওটা নানা প্রসঙ্গে কথা চলছিল। হঠাৎ উনি অবনী ও আমাকে বললেন, "দরজা জানলাগুলো তাড়াতাড়ি বন্ধ করে দাও তো।" তাই দেওয়া হলো। তারপর চলল বৃদ্ধের কণ্ঠে একটার পর একটা গান। প্রথমে গাইলেন, 'সবার সাথে চলতেছিল অজানা এই পথের অন্ধকারে'। একটু থেমে বললেন, 'এটা প্রথম গাইলাম কেন জানো? এটাই দিন-দার (দিনেন্দ্রনাথের) কাছে শেখা আমার প্রথম গান।' এই হলো ওঁর

গুরুপ্রণাম। প্রধান গুরু অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ— প্রায়ই বলতেন, "আমার নিজের কিছুই নেই, সবই তাঁর ধার-করা আলো।" কিন্তু দ্বিতীয় গুরু ছিলেন 'দিন্‌-দা'। কী প্রগাঢ় শ্রদ্ধা এই দিন্‌-দা সম্পর্কেও।... যাই হোক, গান চলতে লাগল। পরপর আরও আট-দশটি গান। আমার অনুরোধে শোনালেন, 'চিত্ত আমার হারালো আজ মেঘের মাঝখানে।' কণ্ঠ অবশ্যই বার্ধক্য-পীড়িত, সঙ্গে কোনো যন্ত্রের সাহায্যও নেই, এমন-কি তাঁর এস্রাজ-টি পাশে থাকলেও ওটি বাজিয়ে তো আর গাওয়া যায় না। তবু কী ভরাট আর সূক্ষ্ম সেই কথা ও সুরের নিশ্চিন্ত বিচরণ, গীতবিতান বা স্বরবিতানের কোনো প্রয়োজনই নেই, সবই তাঁর আয়ত্ত, যেন সবই তাঁর স্মরণমাত্র হাজির। এ-রকম অত্যাশ্চর্য স্মৃতিশক্তি আমি কোথাও দেখি নি। হয়তো আরও কেউ কেউ আছেন এ-রকম, কিন্তু আমার তাঁরা অজানা। দিনটি কিন্তু আমার কাছে স্মরণীয় হয়ে আছে আরও এক বিশেষ কারণে। গানের পর গল্প চলতে চলতে আসি এক সময় বললুম, "শুনেছি ঢাকা থেকে আপনার একটা বই বেরিয়েছে। সে বই চোখে দেখি নি, কোথায় পাওয়া যাবে তা-ও জানি না।" উনি বই-প্রকাশের কথা স্বীকার করলেন, বললেন, "আমার কাছে তো বেশি কপি নেই। বোধহয় একটা কপি-ই আছে।" অবনীকে বললেন, "দেখ্ তো আমার ঝুলির মধ্যে হাত ঢুকিয়ে।" একটা কপি বেরোল। বললেন, "এটা তুমি নিয়ে নাও।" আমি তো হতবাক্। বললুম, "আপনার কাছে একটাও কপি থাকবে না?" উনি বললেন, "দেখা যাক্।" আমি তখন বললুম, "দিচ্ছেনই যখন, এতে একটা সই করে দিন।" উনি বললেন, "সই করব যে, আমি তো চোখে দেখতে পাই না।" আমি তৎসত্ত্বেও জোর করায় উনি বড়ো বড়ো অক্ষরে নামটি সই করে দিলেন, আন্দাজমতো জায়গায় তারিখও বসালেন— ২৬।১।৮৪। কিন্তু মুস্কিল হলো 'শৈলজারঞ্জন'-এর 'ঐ'-কারের টিকি-টি নিয়ে; টিকি-টি কোথায় লাগাতে হবে খুঁজে পান না। আমি তখন বললুম, "আমিই ওটা লাগিয়ে দিচ্ছি।" এইভাবেই সই-দানের পালা সাঙ্গ হলো। আমি ধন্য হয়ে গেলুম। আজও সে বই আমার কাছে যত্নের সঙ্গে রক্ষিত আছে। সুখের বিষয়, ঐ বই*-এর প্রায় সব প্রবন্ধই (একটি ছাড়া) পরবর্তী কালের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগীত আকাদেমি প্রকাশিত (১৯৮৯) 'রবীন্দ্রসংগীত চিন্তা' সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, বাড়তি কিছু সংযোজনও আছে ঐ বইয়ে।

শৈলজারঞ্জন সম্পর্কে অনেকের ধারনা তিনি ছিলেন অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির লোক, কড়া শিক্ষক, কড়া পরীক্ষক ইত্যাদি ইত্যাদি। এ সবই হয়তো ঠিক। কিন্তু কিছুটা কাছে যেতে পারলে বোঝা যেত ওঁর মধ্যে একজন স্নেহপ্রবণ ও কৌতুকময় মানুষও লুকিয়ে আছেন। 'যাত্রাপথের আনন্দগান' বইয়ে (আনন্দ পাবলিশার্স,

* 'রবীন্দ্রনাথসংগীত প্রসঙ্গ'। প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ১৯৭৬।। প্রকাশক : ছায়ানট।। ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল, ঢাকা-৫।।

১৯৮৫) এর কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। আমার জানা দু-একটা বাড়তি কাহিনীর কথা বলি। একবার উনি বলছিলেন, "আমি নেত্রকোনার 'বাঙাল' হলে কী হবে, দীর্ঘকাল রাঢ় অঞ্চলে থাকতে থাকতে ওদিককার কথাবার্তার টানটোন বেশ রপ্ত করে নিয়েছিলাম। মাঝে মাঝে স্থানীয় যাত্রার আসরে চলে যেতাম, ওখানে যে-সব সংলাপ শুনতাম পরদিন গুরুদেবকে এসে তারই অনুকরণ করে শোনাতাম। উনি খুব উৎসাহ দিতেন, মাঝে মাঝে নিজেই খোঁচাতেন : এবার কী সব জোগাড়-টোগাড় হলো বলো না। আমি মজা করে শোনাতাম। একদিন রথীনবাবু আমাকে ডেকে বললেন, বাবামশায়কে কী সব শুনিয়েছেন, আমাকেও একটু শোনান না। আমি কিন্তু চুপ করে গেলাম। গুরুদেবকে যা শোনানো যায় আর কাউকে কি তা শোনাতে পারি।' আর একদিন শৈলজারঞ্জন বললেন, "গুরুদেব প্রায়ই আমাকে 'বাঙাল' বলে খ্যাপাতে চাইতেন। মাঝে মাঝে আবার বলতেন, আমার দুইপাশে দুই বাঙাল জুটেছে। দুই বাঙাল মানে আমি আর সুধীর কর (ঠিক বলছি তো। স্মৃতি থেকে বলছি, ত্রুটি ঘটলে মার্জনীয়)। বলতেন, "একজনের চাই ডজন-খানেক গান, আর-একজনের খাঁই আরও বেশি, চাই পঁচিশ-তিরিশটা কবিতা।" আমি শৈলজারঞ্জনকে জিগ্যেস করলুম, "সুধীরবাবু কি সম্পাদন-বিভাগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন?" উনি বললেন, "হ্যাঁ, পঁচিশ-তিরিশটা কবিতা না হলে পুরো বই হবে কী করে?" আমি তখন শৈলজাবাবুকেই উল্টে জানিয়ে দিলুম : কোথায় দেখেছি ঠিক মনে পড়ছে না, কিন্তু সুধীরচন্দ্র করের নামে রবীন্দ্রনাথের একটা ছড়া আমার মনে আছে। শুনিয়ে দিলুম তাঁকে।

ছড়াটা ছিল এই রকম :
'নাকের ডগা ঘষিয়া হাসে
　　দেয় না স্পষ্ট জবাব বাঙাল।
কাজ করে সে ষোল-আনার,
খাতা এবং ছাপাখানার
　　মাঝখানে সে বাঁধে জাঙাল।'

একেবারে রাজকীয় মিল। শুনে বৃদ্ধ আচার্য হো হো করে হেসে উঠলেন। বললেন, "বাঃ বাঃ, তুমি তো বেশ মনে রেখেছ। আমি তো কোথাও দেখেছি বলে মনে পড়ছে না। তবে কথাটা তুমি ঠিকই বলেছ। সুধীর করের সত্যিই একটা মুদ্রাদোষ ছিল মাঝে মাঝে নাকের ডগায় হাত বুলোনো। গুরুদেব এটুকু জিনিসও লক্ষ্য করেছিলেন।"

'সীরিয়াস্' আলোচনা তাঁর সঙ্গে অনেক হয়েছে এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই। মাঝে মাঝে তর্ক করতেও ইচ্ছে হয়েছে। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সংবরণ করেছি এই ভেবে যে এই বৃদ্ধ তাপসের সঙ্গে তর্ক করা কোনো কাজের কথা নয়, যা বলছেন শুনে যাও, তাতেই তোমার লাভ। আমার প্রথম বইটি যখন প্রকাশিত হলো, তাঁর

হাতে একটা কপি নিয়ে প্রণাম জানালুম। উনি বললেন, "বই দিচ্ছ, কিন্তু আমি তো পড়তে পারব না, চোখ নেই। কেউ পড়ে দিলে শুনতে পারি। কী লিখেছ অল্প কথায় বল।" আমি প্রারম্ভিক 'নিবেদন'-টি পড়ে শোনালুম যাতে তাঁর কাছে ঋণ স্বীকারের কথা আছে। এর এক জায়গায় লেখা ছিল, "রবীন্দ্র-প্রতিভার সাংগীতিক বিচার এ-দেশে কোনদিন তেমন সার্থক হয় নি। এককালে তাঁর ভাগ্যে জুটেছিল প্রচুর নিন্দা, তারপর নিছক ভক্তির স্তুতি। আজ যখন তিনি নিন্দা ও স্তুতির অতীত, তখন তাঁকে প্রায় 'ক্লাসিক্'-এর পর্যায়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে। 'ক্ল্যাসিক'-কে আমরা শ্রদ্ধা জানাই, শ্রদ্ধা জানিয়ে মাথায় ঠেকাই, কিন্তু নিত্য ব্যবহারে যাকে সঙ্গী করি সে সম্পূর্ণ অন্য জিনিস। ফলে রবীন্দ্রনাথ শুধু খ্যাতির উচ্চ শিখরেই রয়ে গেলেন, তাঁর মহত্ত্ব কোনদিনই প্রমাণিত সত্য হয়ে উঠল না। অবশ্য অপ্রমাণিত হলো এমনও নয়।" শুনে উনি বার বার বলতে লাগলেন, "ঠিক বলেছ, ঠিক বলেছ।"

মনের কোণে ওঁর হয়তো একটু ক্ষোভও জমা ছিল। একদিন আমায় বলেছিলেন, "তুমি কি জান, শান্তিনিকেতন থেকে আমি 'রিটায়ার' করি নি, আমি পদত্যাগ করে চলে এসেছিলাম। ওখানে থাকা সম্ভব হচ্ছিল না।" শুনে সত্যিই চমকে উঠেছিলুম। কিন্তু কথাটা সত্য সন্দেহ নেই। পরে অবশ্য তাঁকে 'দেশিকোত্তম'-ভূষণে সম্মানিত করা হয়। কিন্তু রবীন্দ্রসংগীতের বিশুদ্ধ শিক্ষাদান থেকে প্রায় কোনদিনই তিনি বিরত থাকেন নি— যতদিন সামান্যতম সামর্থ্য ছিল। অনেক দিনই দেখেছি, তিনি কাউকে না কাউকে গান শেখাচ্ছেন। এবং যাঁকে শেখাচ্ছেন তিনি নিজেই রীতিমতো ভালো গায়ক বা গায়িকা। জিগ্যেস করলে বলতেন, "ভালো আধার না পেলে এই বয়সে হাতে নিতে যাব কেন?" একদিন কথাপ্রসঙ্গে বললেন, "আচ্ছা, গুরুদেবের নামে তো দু-দুটো বিশ্ববিদ্যালয় চলছে। একটা কেন্দ্রীয় সরকারের— 'বিশ্বভারতী', আর একটা রাজ্য সরকারের— 'রবীন্দ্রভারতী'। কিন্তু কে কী করছে আমায় বলতে পার?" সেদিন উত্তর দিতে পারি নি, কিন্তু মনে মনে খুবই আহত হয়েছিলুম— প্রতিকারের যৎসামান্য চেষ্টাও করেছিলুম। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নি। পরে জেনে খানিকটা আশ্বস্ত হয়েছিলুম যে ড. দেবীপদ ভট্টাচার্য যে-সময় রবীন্দ্রভারতীর উপাচার্য সে-সময় তাঁর উদ্যোগে শৈলজারঞ্জন মজুমদারের কণ্ঠে গীত বেশ কিছু গান বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহশালায় রক্ষিত হয়। কিন্তু এগুলি সাধারণের কাছে উন্মুক্ত প্রচারের উপায় কী? 'আর্কাইভস্' খুবই মূল্যবান জিনিস। কিন্তু আসল উদ্দেশ্য তো প্রচার— অথবা প্রসার। শান্তিনিকেতনেও সংরক্ষণের ভালো ব্যবস্থা আছে শুনেছি। আর রবীন্দ্রভারতীতেও মাত্র ক'দিন আগে কিন্না কী সব ভাঙচুর হয়ে গেল। ওখানকার 'আলো ও ধ্বনি'-র পরীক্ষা দেখার সৌভাগ্য আজও আমার হয় নি। পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশনের প্রযোজনায় বিশ্বভারতী-অনুমোদিত একমাত্র বিক্রয়যোগ্য ক্যাসেট 'বিবেকানন্দের গাওয়া রবীন্দ্রসংগীত'-এ শৈলজারঞ্জন মজুমদারের একটিমাত্র গান 'মরি লো মরি আমায় বাঁশিতে ডেকেছে

কে'। অন্য নমুনা যা কিছু আছে সবই হয় ব্যক্তিগত সংগ্রহে (আমার সংগ্রহেও আছে), নয়তো 'সুরঙ্গমা' প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি। অন্য কিছু থাকলে তা আমার জানার বাইরে। প্রায়ই তিনি বলতেন, আমি শিল্পী নই, আমি শিক্ষক।

শৈলজারঞ্জন-শান্তিদেবের মতপার্থক্য নিয়ে অনেকের মুখে অনেক কথাই শুনেছি, এমন কি ছাপার অক্ষরেও কিছু কিছু মন্তব্য দেখেছি। কিন্তু ওঁর মুখে এ নিয়ে কোনদিন একটি কথাও শুনি নি; নিজে থেকে উস্‌কে দিতেও চাই নি। কেন-না দিনে দিনে এ-বিশ্বাস আমার দৃঢ় হয়ে উঠেছিল যে উনি সব রকম ব্যক্তিগত অসূয়াবিদ্বেষের উর্ধ্বে। এ-দিক থেকেও তিনি যথার্থ রবীন্দ্র-ভাবশিষ্য। রবীন্দ্রস্মৃতি, রবীন্দ্র-চিন্তা ও রবীন্দ্রসংগীতের বিশুদ্ধ চর্চা ছাড়া তাঁর জীবনে শেষ পর্যন্ত আর কিছুই ছিল না। কিন্তু যেখানেই দেখতেন রবীন্দ্রসংগীতের পরিবেশনে বিকৃতি ঘটছে সেখানেই তাঁর ক্ষোভ/ঘৃণা জ্বলে উঠত। এই একটি ব্যাপারে তাঁর কাছে কোনো ক্ষমা ছিল না, আপস ছিল না।

তাঁর স্নেহ পেয়েছি অঢেল— বাক্যে নয়, আচরণে। আমাদের এই বয়সেও ভেতরে-ভেতরে কোথায় একটা স্নেহের কাঙালপনা আছে, সেটা তাঁর কাছে গেলে বুঝতে পারতুম। তিনি শুধু অবনী-সর্বাণীর ডাকে নয়, আমার ডাকেও কয়েকবার নৈহাটিতে এসেছেন, আমাদের যুগ্ম অনুষ্ঠানে সারাক্ষণ উপস্থিত থেকেছেন, ভাষণও দিয়েছেন— টাকা পয়সার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই, সে-কথা তোলবার আমাদের সাহসই হয় নি। একদিন সল্ট লেকে ওঁর বাসস্থানে গিয়ে দেখি, একাকী বৃদ্ধ তাঁর বরাদ্দ চৌকিটিতে শুয়ে আছেন। একটু সাড়া দিতেই বলে উঠলেন, "কে?" আমি নিজের নাম বললুম। উনি বললেন, "ও, অনন্ত। কী ব্যাপার। মেঘ না চাইতেই জল।" এমনভাবে বললেন যে আমি কথা বলব কি, আমার গলার মধ্যে কী-একটা যেন দলা পাকিয়ে উঠল। আমি কোনমতে আত্মসংবরণ করে কথাবার্তা শুরু করলুম। তখনই বৃদ্ধ আচার্যের কাছে শুনলুম তাঁর নতুন পরিকল্পনার কথা। বললেন, "দেখো, আজকাল তো সবাই 'আর্টিস্ট্' হতে চায়। সব 'সোলো আর্টিস্ট্'। কিন্তু গুরুদেব তো এমন অনেক গান রেখে গেছেন যা বিশেষ করে সম্মিলিত কণ্ঠে গাওয়ার জন্যেই। এর চর্চা একটা আলাদা ডিসিপ্লিন। তাই চেষ্টা চলছে একটা নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ার— প্রফুল্ল দাসকে সম্পাদক আর আমাকে সভাপতি ক'রে। এ হবে শুধু সম্মেলক গান শিক্ষার প্রতিষ্ঠান। তোমাকে যদি এই সংগঠনে ডাকি আসবে কিনা জানবার জন্যে অবনীকে খবর দিতে বলেছিলাম। সে কিছু বলে নি তোমায়? অবশ্য বললেই বা কী হতো। শেষপর্যন্ত তো কিছুই হলো না।" আমি তাঁকে বলেছিলুম, "আমার শিক্ষাদীক্ষা নেই। তবে আপনি যদি আমাকে কোথাও ডাকেন সে হবে আমার কাছে আদেশ। আমি অবশ্যই তা পালন করব।" কথাগুলো লিখছি বিশেষ করে এই কারণে যে আচার্যের এই ইচ্ছাও অপূর্ণ থেকে গেছে। কিন্তু উদ্দেশ্যটা খুবই মহৎ। শান্তিনিকেতনে এককালে পথে-প্রান্তরে একত্র গান গেয়ে

চলার একটা রেওয়াজই ছিল। এখন অবশ্য কালপ্রভাবে যত্রতত্র বেড়া দেওয়া হয়েছে। তা হোক। কিন্তু বিভিন্ন সভা-সমাবেশ তো আছেই। এবং সেখানে সমবেত কণ্ঠে রবীন্দ্রসংগীত গাওয়ারও রীতি আছে। কিন্তু প্রায়ই যেটার অভাব দেখা যায় তা হলো উপযুক্ত শিক্ষার। এ কি শুধু একটা 'রিচুয়াল্' মাত্র।

কত কথাই ভিড় করে আসছে মনে। একটা দিনের স্মৃতির কথা দিয়ে এই প্রসঙ্গ শেষ করি। একবার নৈহাটিতে (গরিফায়) অবনী-সর্বাণীর বাড়িতে গেছি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। কথায় কথায় বেশ রাত হয়ে গেল। শীতকাল। উনি বললেন, "তাই তো, বাইরে বেশ ঠাণ্ডা। তোমার তো আবার হাঁপানির কষ্ট।" এই বলে তিনি নিজের গলার মাফ্লার-টা খুলে আমার গলায় জড়িয়ে দিলেন। একে শুধু উৎকণ্ঠা বলে না, একে বলে আশীর্বাদ। এই আশীর্বাদ আমাদেরও বড়ো দরকার। বৃদ্ধ মা-বাবা-দাদা-দিদি বেঁচে থাকলে তাঁদের কাছে বারবার ছুটে যেতে চাই কেন? তাঁরা তো আমাদের কোনো কাজেই লাগেন না। তবে।

আমার ইচ্ছে ছিল, আচার্যের জীবদ্দশায় সরকার পক্ষ থেকে তাঁর জন্মদিনে একটা সম্বর্ধনা দেওয়া হোক। চেষ্টাও করেছিলুম কিছুটা। কিন্তু প্রচুর সৌজন্যপ্রদর্শন সত্ত্বেও যে উত্তরটি শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল তাতে হতাশই হতে হয়েছিল। হঠাৎ আচার্যের জীবিতাবস্থার শেষ জন্মদিনে (৪ শ্রাবণ ১৩৯৮) দূরদর্শনের পর্দায় দেখা গেল স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু সংস্কৃতি-মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে সঙ্গে নিয়ে আচার্যকে তাঁর সল্ট লেক-স্থিত বাসভবনে কিছু মিষ্টি আর ফুল দিয়ে অভিনন্দন জানিয়ে গেলেন। সেদিন মনে মনে বড়ো স্বস্তি পেয়েছিলুম।

জনকণ্ঠে রবীন্দ্রনাথ

শৈলজারঞ্জন মজুমদার

[আচার্য শৈলজারঞ্জন মজুমদার। জন্ম ১৩০৭ বঙ্গাব্দের ৪ শ্রাবণ (১৯০০ খ্রি.), অখণ্ড বাংলার ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোনা মহকুমার বাহাম গ্রামে। পিতা রমণীকিশোর দত্তমজুমদার, মাতা সরলাসুন্দরী। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রসায়নশাস্ত্রে এম.এস.সি. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে শীতল মুখোপাধ্যায়ের কাছে এস্রাজ বাদন শিক্ষা। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপকরূপে শান্তিনিকেতনে যোগদান, সঙ্গে সঙ্গে দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে নিয়মিত সংগীত-শিক্ষা— পরবর্তীকালে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কাছে। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে গানকে স্বরলিপিবদ্ধ করা শুরু। রবীন্দ্রসংগীতের অন্যতম প্রধান স্বরলিপিকার তিনি। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে শান্তিনিকেতনে ছোটদের গানের ক্লাস নেওয়া শুরু করেন। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে শান্তিনিকেতনের সংগীতভবনের অধ্যক্ষ পদে যোগদান। বহুসংখ্যক সেরা রবীন্দ্রসংগীত-গায়কগায়িকার তিনি পরমশ্রদ্ধেয় শিক্ষাগুরু। ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বভারতী সংগীতভবনের অধ্যক্ষপদ ত্যাগ ও কলকাতায় বসবাস আরম্ভ। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্মানিক ডি.লিট., বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের 'দেশিকোত্তম'। কলকাতায় 'সুরঙ্গমা' সংগীত-বিদ্যায়তনের প্রতিষ্ঠাতা। ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ গমন; বিপুল সম্বর্ধনা; ঢাকা, চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহে সংগীত শিক্ষাদান ও বহু অনুষ্ঠান পরিচালনা।

পরিণত বয়সে ১৩৯৯ বঙ্গাব্দের ১০ জ্যৈষ্ঠ (২৪ মে, ১৯৯২) তাঁর জীবনাবসান হয়।

নিচের প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকীর এক বছর পরে দৈনিক 'যুগান্তর' পত্রিকার রবিবারের সাময়িকীতে। তারিখ ৬ মে ১৯৬২ (২৩ বৈশাখ, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ)। এই পত্রিকার কপিটি এতদিন সযত্নে রক্ষা করে এসেছেন ভাটপাড়া (উত্তর ২৪ পরগণা)-র বিশিষ্ট সংগীতানুরাগী বন্ধু শ্রীবৈদ্যনাথ ঘোষ। তাঁর কাছে এবং 'যুগান্তর' পত্রিকার বর্তমান স্বত্বাধিকারীর কাছে গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই। যতদূর জানি এই প্রবন্ধটি ইতিপূর্বে আচার্য শৈলজারঞ্জনের কোনো প্রবন্ধ-সংকলন-গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয় নি। তাঁর তিনটি গ্রন্থের কথা আমি জানি : (১) রবীন্দ্রসংগীত প্রসঙ্গ। ছায়ানট, ঢাকা। প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ১৯৭৬; (২) যাত্রাপথের আনন্দগান। আনন্দ পাবলিশার্স। ডিসেম্বর ১৯৮৫; (৩) রবীন্দ্রসংগীত চিন্তা। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগীত আকাডেমি। অক্টোবর ১৯৮৯।

তাঁর জন্মশতবার্ষিকী আসন্ন। শ্রদ্ধাবনত—অনন্তকুমার চক্রবর্তী, ২৪.৮.১৯৯৯]

রবীন্দ্রনাথের গানের বহুল প্রচার হোক, কবির আন্তরিক অভিলাষ ছিল তাই। তাঁর গান সাহিত্য-সংগীতের বিদগ্ধ রসিকমণ্ডলী আর বিচক্ষণ সমঝদারদের সংকীর্ণ সীমানা পেরিয়ে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ুক বাংলার সাধারণ মানুষের মাঝখানে, অসংখ্য জনহৃদয়ে তা স্থান করে নিক, দূরদূরান্তবর্তী গ্রামের কৃষাণ-মাঝি হাটের মাঠের মানুষদের কণ্ঠে তা গুনগুনিয়ে উঠুক, বাংলার আকাশে বাতাসে তাঁর গানের রেশ ভেসে বেড়াক— আপন অনন্য সৃষ্টির সার্থকতা তিনি সেই পরিণতির মধ্যেই কল্পনা করেছিলেন। বাংলার মাটিতে সেই মহাপুরুষের আবির্ভাবের একশত বৎসর উত্তীর্ণ হওয়ার এই স্মরণীয় কালে আমরা ভেবে দেখতে চাই রবীন্দ্রনাথের মহান সৃষ্টির উত্তরাধিকার লাভ করে আমরা জাতি হিসাবে সমগ্রভাবে অথবা ব্যষ্টিগতভাবে কতখানি সেই উত্তরাধিকারের মান বৃদ্ধি করতে, অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছি। রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষের এই বিশেষ বৎসরে যে বিরাট ও বহুমুখী প্রতিভার সম্পদ তিনি দেশবাসীর চিত্তভূমিতে ঢেলে দিয়ে গেছেন, সেই অতুল সম্পদের অধিকার লাভ করে বাঙালির চিত্ত কতখানি উৎকর্ষ লাভ করেছে, কতখানি তা রুচিশীল, উদার, সৌন্দর্যপ্রবণ, সত্যানুসন্ধানী, নির্ভীক এবং সর্বোপরি এক উচ্চতর মানবধর্মে দীক্ষিত হতে পেরেছে তার আনুপাতিক হিসাব হয়তো স্থির করা সম্ভব না হলেও, যে নির্ভুল লক্ষণটি সকলের চোখে ধরা পড়ে তা হলো— বাংলার অপামর জনসাধারণ গত এক বা দেড় যুগের মধ্যে রবীন্দ্রসংগীতের বিশেষ অনুরাগী হয়ে উঠেছে। প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানগুলির ভবিষ্যৎ আশ্রয় সম্পর্কে যে আশা ব্যক্ত করেছিলেন সেদিক দিয়ে বিচার করলে হয়তো মনে হতে পারে যে তাঁর অভিলাষ আজ প্রায় সফল হতে চলেছে। বাংলার দূর দূর সহর গ্রামাঞ্চলে রবীন্দ্রসংগীত ছড়িয়ে পড়েছে, অগণিত আসরে, সভায়, জলসায়, অভিনন্দনে, পারিতোষিক বিতরণে, বিদয়ানুষ্ঠানে, শোকসভায়, বিবাহবাসরে, সিনেমায়, থিয়েটারে ঠিক সুরে ভুল সুরে আর শত সহস্র সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মণ্ডপে রবীন্দ্রনাথের গান সুরে বেসুরে নিত্য শোনা যাচ্ছে। কলকাতার অলিতে-গলিতে ও মফঃস্বল সহরে হাটে-বাজারে সাইনবোর্ড টাঙিয়ে রবীন্দ্রসংগীতের ইস্কুলের প্রাদুর্ভাবে সারা দেশ গেছে। সংগীত প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান থেকে সিনেমা, বেতার এবং সাংস্কৃতিক মহড়াগুলিতে নিত্যনূতন সুর ও পদ্ধতিতে রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশনের প্রবণতাও ব্যাপক ও প্রবল আকার ধারণ করেছে।

বাহ্যিক লক্ষণগুলি বিচার করলে রবীন্দ্রসংগীতের বিপুল জনপ্রিয়তা ও সমাদর যে প্রমাণিত হয় তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কিন্তু এ প্রশ্নও হয়তো মনে স্বাভাবিকভাবে জাগতে পারে— এই ব্যাপক রবীন্দ্রসংগীতের প্রচার, অনুষ্ঠান এবং পরিবেশন কি জাতির উত্তরাধিকার এই অমূল্য সংগীত-সম্পদের যথার্থ এবং

সুসংগত ব্যবহার— নাকি তা এক সস্তায় পাওয়া দুর্লভ সামগ্রীর পরিপূর্ণ মূল্য ও মর্যাদার স্বরূপ না উপলব্ধি করতে পেরে, তার মর্ম না জেনে বুঝে কেবল সহজলভ্যতার গুণেই এতো ব্যাপক প্রসার লাভ করতে পেরেছে? অর্থাৎ রবীন্দ্রসংগীত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে সেই কারণে, যে কারণে ফিল্মের গানও অফুরন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করে। যদি এই আশঙ্কা সত্য হয় তাহলে রবীন্দ্রসৃষ্টির প্রতি শ্রদ্ধাবান প্রত্যেক দেশবাসী— যাঁরা তাঁদের চিন্তায় ভঙ্গিতে রুচিতে আচারে ব্যবহারে এবং চিত্তজগতের বিকাশে রবীন্দ্রনাথের নিকট অপরিশোধিত ঋণ সব সময়ে অনুভব করেন— তাঁরা গভীরভাবে বিচলিত না হয়ে পারেন না। এ আশঙ্কা করারও যে প্রভূত কারণ আছে সে কথা রবীন্দ্রানুরাগী প্রত্যেকে একবাক্যে স্বীকার করবেন।

যে বিষয়টি আজকাল দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন সকল লোকের মনকে বিশেষভাবে আন্দোলিত করছে তা হলো বাংলার সাংস্কৃতিক পটভূমিতে শতাব্দীর বর্তমান এই অংশে যেভাবে একটা সর্বাঙ্গীন নিম্নরুচি, নিম্নগামিতা ও সাধারণভাবে বলা যায় কোনো মহৎ যুগোত্থানের পরবর্তী সর্বগ্রাসী ক্ষয়িষ্ণুতার করাল মূর্তি প্রকট হয়ে উঠেছে— সেই একই পটভূমির অশুভ কীর্তিনাশা শক্তি আজ রবীন্দ্রনাথের অপরিমেয় মূল্যের সৃষ্টিকেও খর্ব করতে উদ্যত। এই কথাই রবীন্দ্রনাথের লেখায় পাই, "নদীতে যখন ভাঁটা পড়ে তখন কেবল পাঁক বাহির হইয়া পড়িতে থাকে, আমাদের সংগীতের স্রোতস্বিনীতে জোয়ার উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে বলিয়া আমরা আজকাল তার তলদেশের পঙ্কিলতার মধ্যে লুটাইতেছি। তাহাতে স্নানের উল্টা কাজ হয়। আমাদের ঘরে ঘরে গ্রামোফোনে যে সকল সুর বাজিতেছে, থিয়েটার হইতে যে সকল গান শিখিতেছি, তাহা শুনিলেই বুঝিতে পারিব, আমাদের চিত্তের দারিদ্র্যে কদর্যতা যে কেবল প্রকাশমান হইয়া পড়িয়াছে তাহা নহে, সেই কদর্যতাকেই আমরা অঙ্গের ভূষণ বলিয়া ধারণ করিতেছি। সস্তা খেলো জিনিসকে কেহ একেবারে পৃথিবী হইতে বিদায় করিতে পারে না, একদল লোক সকল সমাজেই আছে, তাহাদের সংগতি তাহার ঊর্ধ্বে উঠিতে পারে না— কিন্তু যখন সেই সকল লোকেই দেশ ছাইয়া ফেলে তখনই সরস্বতী সস্তা দামের কলের পুতুল হইয়া পড়েন।" এই অশুভ শক্তির প্রভাব ফুটে উঠছে বাঙালির জীবনে, তার মনের প্রকাশের প্রতি অভিব্যক্তিতে। সাধারণভাবে বাঙালির সংস্কৃতিমূলক ছবিটির দিকে চাইলে যেমন সেখানে পরিলক্ষিত হয় মহৎ সৃষ্টির বীর্যবত্তার বদলে কতকগুলি দুর্বল বিকৃতরুচি, পঙ্গু, নিষ্ঠাবিহীন সৃষ্টির বিপুল উদ্গীরণ— তেমনি দেখা যায় অতীতের সৃষ্টির অমূল্যরাশিকে মর্যদা না দিয়ে তা বিকৃত ও বিনষ্ট করার এক অন্ধ সর্বনাশা প্রচেষ্টা।

বিশেষ করে রবীন্দ্রসংগীতের ব্যাপক প্রচার ও জনপ্রিয় হয়ে ওঠা তার বিকৃতি যেভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে তাতে প্রত্যেক নিষ্ঠাবান ও বাংলার ঐতিহ্যপ্রেমিক গভীর মর্মপীড়া অনুভব করবেন। রবীন্দ্রনাথের গানগুলির প্রসার ও ব্যাপকতা যদি

এই গানগুলির রস ও মাধুর্য, ভাবমাহাত্ম্য ও সাহিত্য-গুণের প্রভাব পরিপূর্ণ মহিমায় বাংলার সর্বসাধারণের মানসলোকে পৌঁছে দিতে পারতো তা হলে রবীন্দ্রনাথের সমস্ত জীবনের দান শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি পরম সার্থকতা অর্জন করতো, রবীন্দ্রনাথের মর্যাদা মানুষের হৃদয়ে আরও সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারতো। কিন্তু এই উত্তরকালীন অধ্যায়ে রবীন্দ্রসংগীতের অনুশীলন, পরিবেশন ও রসগ্রহণের পদ্ধতির মধ্যে যে মনোভাব অভিব্যক্ত হয় তা কোনভাবেই রুচিশীল অথবা সংস্কৃতিধর্মী বলা চলে না। যে চিত্রটি সহজেই ফুটে উঠেছে তা হলো রবীন্দ্রনাথের এক সুন্দর ও সূক্ষ্ম সৃষ্টি মানুষের গভীরতর মর্মে যার একান্ত আসন ও বিকাশ সেই অমিতলাবণ্যমণ্ডিত গানগুলির রসে ডুব দেওয়ার বদলে সেগুলিকে তাদের আপন মরমী একাকিত্বের আসন থেকে নামিয়ে এনে স্থূল জৈব রসে ভরিয়ে তোলা, বাজারে পণ্যশালার চাহিদার উপযোগী করে বিভূষিত করা, নটনটীদের নিম্নরুচি ও ভঙ্গির সমোপযোগী আঙ্গিক প্রদান করা— এক কথায় গানগুলিকে সাধ্যমতো আধুনিক করে তোলা। এই মারণ প্রচেষ্টায় সোৎসাহে ও পূর্ণ প্রতিযোগিতায় নেমে এসেছেন প্রখ্যাত ও অখ্যাত গায়কগায়িকারা, বেতার, ফিল্ম, গ্রামোফোন রেকর্ড প্রভৃতি সংগীতের গণপ্রচারের প্রমোদ পরিবেশনকারী সর্ববিধ অর্থোপার্জনমূলক ক্ষেত্রে তাঁরা রবীন্দ্রনাথের গানগুলিকে গড়ে-পিটে, বদলে বিকৃত করে কখনও মেলোড্রামায় ভরিয়ে কখনও পীড়াদায়ক ভাবালুতা ফুটিয়ে প্রচার করতে শুরু করেছেন। আপন আপন ভাবমানসের সর্ববিধ অপরিণতি, রুচিবিকৃতি এবং স্থূল আবেগসমূহের বাহন হিসাবে গানগুলিকে সমস্ত উদারতা, নৈর্ব্যক্তিক ভাবগভীরতা, অতীন্দ্রিয় মানসলোকের প্রশান্তি থেকে বিচ্যুত করেছেন। আর এই সংখ্যাগরিষ্ঠ ঐতিহ্যবিনষ্টকারী সম্প্রদায়ের উৎসাহ ও রসদ জোগান ফিল্ম পরিচালকবৃন্দ, বেতার অনুষ্ঠানের সমঝদার ব্যক্তিরা, জনপ্রিয় রঙ্গবিষয়ক সাপ্তাহিকগুলির হাল্কা মেজাজী সমালোচক সম্প্রদায়। রবীন্দ্রনাথের গান যতোই লঘুত্ব অর্জন করে, যতোই তা তার আপন দূর নক্ষত্রলোকের মগ্ন সৌন্দর্য ও ভাবসমারূঢ় লাবণ্যভূমি থেকে খসে পড়ে নেমে আসে, ততোই যেন তা জনপ্রিয়তা অর্জন করে, ততোই বাজারে গানের কাটতি বাড়ে, রবীন্দ্রসংগীতের শিল্পীদের ডাক পড়ে ততো বেশি, অর্থোপার্জন, সম্মান ও খ্যাতির হুড়োহুড়ির হাঁকডাকে কর্ণ বধির হয়ে যায়।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবদ্দশাতেই তাঁর অতিপ্রিয় গানগুলির এই বীভৎস পরিণামের পূর্বপ্রস্তুতি অবলোকন করে শিউরে উঠে দেশবাসীর প্রতি অনুনয় করে বলেছিলেন, "আমার গান যাতে আমার গান বলে মনে হয় এইটি তোমরা কোরো। আরও হাজারো গান হয়তো আছে, তাদের মাটি করে দাও না, আমার দুঃখ নেই কিন্তু তোমাদের কাছে আমার মিনতি, তোমাদের গান যেন আমার গানের কাছাকাছি হয়, যেন শুনে আমিও আমার গান বলে চিনতে পারি। এখন এমন হয়

যে, আমার গান শুনে নিজের গান কিনা বুঝতে পারি না, মনে হয় কথাটা যেন আমার, সুরটা নয়। নিজে রচনা করলুম— পরের মুখে নষ্ট হচ্ছে এ যেন অসহ্য। মেয়েকে অপাত্রে দিলে যেমন সব কিছু সইতে হয়, এও যেন আমার সেই রকম।" শুধু অপাত্রে গানগুলি পড়েছে এই মাত্র খেদোক্তি করবার মতো প্রথম কারণ দেখা দিয়েছিল কবির জীবিতকালেই, কিন্তু তাঁর সুললিত গানগুলির আধুনিক পাত্রদের অবলোকন করলে কবির হৃদয় হয়তো ভেঙে যেতো, হয়তো বুঝতে পারতেন অপাত্র নয়, একেবারে নির্বিচারে পাষণ্ডের হাতে তাঁর গানগুলি পড়েছে। কিন্তু সে মিনতি সে মর্মস্পর্শী আবেদন যে তাঁর স্বদেশবাসীর গভীর কর্ণে পৌঁছেছিল তা তাঁর মৃত্যুর পরবর্তী কাল থেকে বিগত কুড়ি বছরে রবীন্দ্রসংগীতের ক্রমবর্ধমান প্রসার ও জনপ্রীতি অর্জনের গতি-প্রকৃতি অনুধাবন করলেই তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এই প্রকৃতি বা চরিত্র তাঁর পূর্বোক্ত কথাতেই স্পষ্ট— তাঁর গান তাঁর গান বলেই বুঝতে পারা যায় না সাধারণের গলায়। কবির জীবিতকালে যে গানগুলি মনে হতো কথাগুলিকে ধরে রেখেছে মাত্র কিন্তু সুর পাল্টে গেছে, মাত্র কুড়ি বছর পরে সেই গানের বিবর্তন আরও ভয়াবহ সীমানার দিকে ঝুঁকেছে— কেবল সুরই বিকৃত হয় নি, বর্তমানে কতো ওস্তাদি কারুকলা— তানকর্তব, আলাপ বিস্তার ঢুকছে ও শিল্পীরা ভাষাকেও তাঁদের শিক্ষাদীক্ষার মতো করে পাল্টে (Improve) ফেলবার স্বৈরাচার অর্জন করতে পেরেছেন এবং সুরে আনবার চেষ্টা করে থাকেন সাহেবী কিংবা হিন্দি ঢংয়ের অভিব্যক্তি, ফিল্মী ঢংয়ের চপলতা এবং স্বীয় স্বীয় বিভিন্ন ঢংয়ের রসবর্জিত ভাব-অক্ষমতা। কোনো গানের যে উচ্ছ্বাসটি হতে পারতো কোনো স্বর্গীয় অনিন্দ্যলোকের ভাব-পরিবাহী তা রবীন্দ্রসংগীতে অশিক্ষিত শিল্পীর সীমাবদ্ধ শিক্ষা ও রুচির প্রকোপে পরিণত হয় নিম্নস্তরের ভাবাবেগের প্রকাশ মাত্র। ভাষার যে ভাবার্থ কোনো মানসলোকের সূক্ষ্ম যোগান ধরে নেমে আসতে চায় তা বঙ্গসাহিত্যের সৃষ্টিতে সম্পর্করহিত শিল্পীর মানসললাটে কোনও ভাবারুনিম বনচ্ছটা ফুটিয়ে তোলে না, তার সূক্ষ্মভাব ও কবিত্বের নিগূঢ় অনুভূতির দিকে পা না বাড়িয়ে শিল্পী অসার সম ফাঁক ও তবলার ঠেকার সহযোগে কোন মতে সেই সব জায়গাগুলি আবৃত্তি করে পেরিয়ে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন। যেখানে সংগীতে প্রকৃতির চিত্র বাইরের উন্মুক্ত বিশ্বের রং রেখা ছেঁচে নিয়ে প্রবেশ করতে চায় মানবহৃদয়ের মুগ্ধ কোণগুলিতে যেখানে তা ভাষা ও ছন্দের সংবেদনায় পরিপ্লুত হয়ে ঝরে পড়ে সার্থক সুরের প্রতিধ্বনিতে— প্রকৃতির এই চিত্রকল্পের মধুর গানগুলি আধুনিক রবীন্দ্রসংগীত-গায়কের মনে হয়তো বর্ষার দিনে বসন্তের গান জাগিয়ে তোলে বা শীতের হাড়কাঁপানো ঠাণ্ডায় প্রখর তপনতাপে উদাত্ত কণ্ঠে এমন কি বেতারেও গাইতে প্ররোচিত করে। এই ত্রুটির দায়িত্ব বিশেষভাবে নির্ভর করে বেতার কর্তৃপক্ষের উপর।

এক অমিত মূল্যবান সম্পদ আমরা না চেয়েও পেয়েছি, আর পেয়েছি তা অগাধ পরিমাণে— ইতিহাসের এই যুগের সর্বমহৎ মহাপুরুষের সৃষ্টি থেকে। কারণ রবীন্দ্র-সৃষ্টি বাংলার হলেও তা শুধু বাঙালির নয়, তা বিশ্বের মানবজাতির, কোনও বিশেষ দেশকালের সম্পদ বলে তাকে প্রকৃতপক্ষে বিচার করা যায় না। বাঙালি জাতির সংস্কৃতি ও চিত্তের ভূমিতে অশেষ আশীর্বাদের মতো তবু ঝরে পড়ছে, সে আশীর্বাদ এই জাতিকে বিশ্বের সভায় পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত করেছে, তার মানসলোক ভরিয়ে তুলতে চেয়েছে অমেয় ভাবসম্পদে, হৃদয়লোকে ঢেলে দিতে চেয়েছে সুধানির্ঝর। যথার্থ মর্ম না বুঝতে পেরে আমরা এই অতুল সম্পদরাশিকে যথেচ্ছ অপচয় হবার সুযোগ দিয়েছি।

"আমার গান আপন মনে গান। তাতে আনন্দ পাই, শুনলে আনন্দ হয়। গান হবে যাতে যারা আশেপাশে থাকে তারা খুশি হয়। আত্মীয়স্বজন যারা আপিস থেকে আসছে— দূর থেকে শুনতে পেলেও এটা তাদের জন্যেও ভালো।"... গান ঘরের মধ্যে মাধুরী পাওয়ার জন্যে— বাইরের মধ্যে হাততালি পাওয়ার জন্যে নয়। তাঁর গান রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছিলেন, ঘরের মধ্যে মাধুরী পাওয়ার জন্যে— এক সাক্ষাৎকারে কথিত এই উক্তিটি সংবাদপত্রে বেরিয়েছিল। তিনি চেয়েছিলেন দৈনন্দিন জীবন নির্বাহের ফাঁকে ফাঁকে মাধুরী ঢেলে দিয়ে তাঁর গান ছড়িয়ে পড়বে, অসংখ্য মানুষের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে থাকুক তাঁর গানের কথাগুলি, তাঁর গানগুলিকে তাই সহজ করতে, সহজ ভাষায় বলতে, দুর্লভ ভাবকে আটপৌরে গহনায় সাজিয়ে কল্যাণরূপিণী গৃহবধূর মতো ঘরে ঘরে পাঠাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বাহুল্যহীন হলেও এই শত শত গানগুলির সহজ আর আটপৌরে গড়নে যে নিখুঁত সুষমা তিনি এঁকেছেন তা যেন কোন অতিমানবিক স্রষ্টার সৃষ্টি, প্রকৃতির অনায়াস কারিগরির মতোই এক চমকপ্রদ চিত্র। তেমনি অনায়াসেই শত শত সুরবৈচিত্র্যের মাঝখানে মানব-হৃদয়ের গভীরতর তন্ত্রীগুলি ছুঁয়ে ছুঁয়ে তিনি তাঁর অজানা অভূতপূর্ব ভাবগুলিকে অতি সহজে সুরের ও কথার অনুলিপিতে ব্যক্ত করেছেন— যার পলাতকা রেশ কখনও একবার শ্রবণে ছুঁয়ে গেলেও ঘুরতে থাকে দীর্ঘক্ষণ মর্মে, এক নিবিড় অনুভূত সত্যের প্রকাশ কোন বিমূর্ত চেতনায় বাঁধা পড়ে থাকে। গানগুলি যেন চেতনার সেই সকল অন্যমনস্ক ক্ষণের গান।

কবিতা আর সুর— ভাব আর তার সুর সংবেদন, তার মধ্যে কলাবতী সংগীত পদ্ধতির কারিগরির আধিক্য নেই, কিন্তু আছে প্রাণের অবাধ স্বাচ্ছন্দ্যের স্বাধীনতা, যা মার্গসংগীতের অন্তর্ভুক্ত রাগরাগিনীর ও সুরতালের সূক্ষ্ম এবং সুদৃঢ় রীতিগুলো হেলায় আয়ত্ত করে পেরিয়ে যায় নতুন এক সৃষ্টির জগতে, যেখানে ভাবা হয়ে ওঠে গীতিমুখর ভাবের দ্যোতক, সুর হয় ছন্দের বাহক। সেখানে রূপ রস বর্ণ গন্ধ ফোটে গানগুলির সূক্ষ্ম রূপকল্পের যাদুস্পর্শে, মনকে নিয়ে যেতে চায় ভাবনার

অতীত সুদূর কাব্যকল্পার নিসর্গলোকে। কারিগরি এবং প্রথার অলঙ্ঘনীয় নিয়ম তাই তার অন্তর্নিহিত সত্যকে, এই মুক্তির অপার সৌন্দর্যকে, কোনভাবেই অবরুদ্ধ করতে পারে না। বিশেষ করে অত্যধুনা রবীন্দ্রসংগীত চর্চায় যে অন্য একটি উপসর্গ দেখা দিয়েছে তার পরিণামও বিশেষ চিন্তার কারণ হতে পারে। সেটি হলো মূল রবীন্দ্রসংগীতের কাঠামোর মধ্যে যথেচ্ছভাবে তান বিস্তার করা ও তালের জটিলতা কুটিলতা সৃষ্টি করে গানটিকে অযথা তথাকথিত ক্লাসিকাল করে তোলার চেষ্টা। সেই চেষ্টা স্পষ্টতই নিরর্থক— কারণ রবীন্দ্রসংগীতের রসের আবেদন বা সৌন্দর্য বিকাশের জন্য তা মোটেই বৃথা অলঙ্করণের উপর নির্ভরশীল নয়। যাঁরা এই সত্যটি উপলব্ধি না করে খামোখা যথা তথা তান লাগাবার চেষ্টা করেন তাঁরা স্বভাবতই সেই বিশেষ গানটির যে একটি স্বকীয় পরিপূর্ণ বৈশিষ্ট্য আছে, যা বিনা তানেই কেবল যথার্থভাবে গাইতে পারলেই প্রকাশ করা যায় সেটি উপলব্ধি করতে পারেন না। আর পারেন না বলেই কেবল তান আর তাল-বৈচিত্র্যের খেলা সৃষ্টি করে গানটিকে একেবারে সমূলে নষ্ট করে দেন।

রবীন্দ্রনাথের গান একান্তভাবেই কাব্যময়, একান্তভাবেই তা নিভৃত মানসলোকের সম্পদ। সেখানকার আসন না দিলে রবীন্দ্রসংগীতের অনুশীলন ও সাধন উভয়তই ব্যর্থ হয়।

আবার সুরের দিকটিও সেই একই মানসলোকের যাত্রী। কিন্তু তার পথ হৃদয়ের সূত্র ধরে। রবীন্দ্রনাথের গানের সুর বুঝতে হয় হৃদয় দিয়ে, মেলাতে হয় গানের কথাগুলির মর্মোপলব্ধির ভিত্তিতে। এর কোন একটির পরিপূর্ণ উপলব্ধিতে যদি ত্রুটি থাকে তাহলে গানের প্রাণস্বরূপতার উন্মেষ ঘটে না, গান হয়ে পড়ে নিষ্প্রাণ। রবীন্দ্রনাথের কথায়— "তোমাদের কাছে (বুলাবাবু) সানুনয় অনুরোধ, এদের একটু দরদ দিয়ে, একটু রস দিয়ে গান শিখিও— এইটেই আমার গানের বিশেষত্ব।" গায়ক এবং শিল্পী যখন রবীন্দ্রনাথের কোনো একটি গান গাইছেন তাঁর মন সম্পূর্ণভাবে গানের কাব্যরসে মজে থাকবে, অনুভূতি প্রত্যেক সুরবৈচিত্র্যের সূক্ষ্ম অন্তরঙ্গতায় ভাবরসের বিকাশের রসাস্বাদন করবার চেষ্টা করবে তখনই তাঁর কণ্ঠে রবীন্দ্রসংগীত সার্থক হবে। লিখিত ভাষার অন্তরালে লীলাসম্ভূত আলোছায়ায় দাগ কাটা বর্ণগন্ধের ভুবনটি উঁকি দেয়— শিল্পী যদি গান গাইবার সেই পরিপূর্ণ ভুবনকে আপনার অন্তর্লোকে না প্রতিফলিত হতে দেখেন তাহলে রবীন্দ্রনাথের গানের যথার্থ সংবেদনা তিনি সৃষ্টি করতে পারবেন না। রবীন্দ্রসংগীতের যোগ্য শিল্পী হতে হলে, আঙ্গিক পূর্ণ মাত্রায় আয়ত্ত করা ছাড়াও তাঁকে হতে হবে, অন্তত গাইবার কালে, একটি বিশেষ কবিচিত্তের অধিকারী। যা গানগুলির স্বরলিপির নির্ভুল আয়ত্ত করা সুর তাল নিখুঁত রাখার অতিরিক্ত, কেবল গানগুলির সুরের যান্ত্রিক আবৃত্তি বা আবেগসর্বস্বতা নয়— গীত-কবিতার ভাব এবং অর্থকে সেই

সুরের মধ্যে যথার্থ ও সম্পূর্ণভাবে আরোপ কবা, প্রকাশ করা এবং সেই প্রকাশের ভিতবে এক অনিন্দ্যসুন্দর আনন্দলোকের আভাস বহন করে আনা। সেই আভাস শ্রোতার অন্তরে বিমল আনন্দের প্রদীপ তুলে ধরে, তার অন্তর পরিব্যাপ্ত হয় এক অকল্পনীয় সৌন্দর্যের ছটায় যা রবীন্দ্রনাথের গানগুলির অদৃশ্য অন্তরালে নিহিত।

রবীন্দ্রসংগীতের বিরাট আকাশ যদিও সামান্য দৃষ্টি খুলে ধরলেও দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু সেই আকাশে উড়তে হলে অনুশীলনের নিরিখ কী হওয়া উচিত? সে কথা কবি নিজেই বহু আলোচনায় ও প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন, যাঁর পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। আমাদের আলোচনা অন্য বিষয়ে। তা হলো রবীন্দ্রসংগীত অনুশীলন ও গাইবার রীতি সম্পর্কে কবির বহু মতামত এবং উপদেশ থাকা সত্ত্বেও বর্তমানে যে বিশৃঙ্খলা ও স্বৈরাচার দেখা দিয়েছে তা কী করে রোধ করা যায় এবং রবীন্দ্রসংগীতের একটি প্রামাণ্য রীতিকে স্বীকার করে নেওয়ার যুক্তি প্রদর্শন করা যায়। যথার্থ শিক্ষার অভাবেই হোক কিম্বা পরিণত রুচিবোধের অভাবেই হোক রবীন্দ্রসংগীতকে এমনভাবে বর্তমানে ব্যবহার করা হচ্ছে যে, অদূরভবিষ্যতে যথার্থভাবে রবীন্দ্রনাথের গানগুলি কী রকমের ছিল তা আর মনে করা দুষ্কর হবে। এ আশঙ্কার একটি কারণ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আরেকটি আশঙ্কার কথা হলো— যাঁরা বিগত যুগগুলিতে কবির স্বকণ্ঠ থেকে বহু গান নিয়েছিলেন তাঁদের অনেকেই আজ ইহলোকে নাই। কোনোদিন হয়তো এই বিপুল সংখ্যক গানের ঠিক সুর জ্ঞাতার অভাবে চিরকালের জন্য হারিয়ে যাবে এই আশঙ্কায় কবির জীবদ্দশা থেকেই গানগুলির স্বরলিপি বিভিন্ন ব্যক্তিবিশেষ প্রস্তুত করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। কিন্তু এই কথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে শুধু স্বরলিপি থেকে বিশেষ গীতরীতির গানের আসল প্রাণপ্রতিষ্ঠা আদৌ হয় নি। বর্তমানে অধিক সংখ্যক গানের স্বরলিপি প্রকাশিত হয়েছে। সেদিক থেকে রবীন্দ্রসংগীতের কথা ও স্বরলিপির সুর যে উত্তরকালীন অর্ধেক শতাব্দী টিকে থাকবে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যে জিনিসটি বিলুপ্ত হওয়ার আশঙ্কা তা হলো— রবীন্দ্রসংগীতের আলোকচিত্রটিকে অবিকল সংরক্ষণ করা গেলেও তার পূর্ণাঙ্গ সজীব প্রতিকৃতির হদিস খুঁজে পাওয়া যাবে না কোথাও। যে গানগুলি হয়তো অর্ধশতাব্দী পরে লোকের মুখে রবীন্দ্রসংগীত বলে পরিচিত থাকবে তা বর্তমানের রবীন্দ্রসংগীত থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। বর্তমানে রচিত প্রামাণ্য রেকর্ডগুলি সেই আগামীকালীন গানগুলির আলোড়নে অতলে তলিয়ে যাবে কিম্বা ত্রুটিপূর্ণ বলে বাতিল করা হবে। কারণ সেই সময় রবীন্দ্রনাথের নিজ কণ্ঠের গান আয়ত্ত করেছেন এমন একজনও জীবিত থাকবেন না। সেই পরিণাম এড়ানোর অর্থাৎ রবীন্দ্রসংগীতকে মানুষের চিন্তা-ভাণ্ডারের এক অমূল্য সম্পদ হিসাবে কী করে সংরক্ষণ করা যেতে পারে, তা আমাদের বিবেচনা করা একান্ত কর্তব্য।

প্রত্যেক শুভবুদ্ধিপরায়ণ এবং রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির প্রতি শ্রদ্ধাবান মানুষ যাঁরা তাঁর সৃষ্টি থেকে অনেক নিয়েছেন বা অনেক পেয়েছেন— তাঁদের কর্তব্য তাঁর ঐতিহ্য রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করা। এই দায়িত্ব প্রথমত সেই সকল শিল্পী ও সংগীত-শিক্ষার্থী ও শিক্ষার্থিনীদের উপরে যাঁরা রবীন্দ্রসংগীত চর্চা করেন, বেতারে ও সভায় আসরে গেয়ে থাকেন, যাঁরা সংগীত শিক্ষালয় পরিচালনা করেন, যাঁরা রেকর্ড করেন এবং যাঁরা সেই রেকর্ড অনুমোদন করেন এবং সর্বোপরি রবীন্দ্রসংগীতের অনুরাগী 'যে অগণিত শ্রোতৃবৃন্দ, সমালোচকবৃন্দ তাঁদের প্রত্যেকের উপর এই দায়িত্ব একক ও যৌথভাবে ন্যস্ত রয়েছে।

রবীন্দ্রসংগীতের বিশুদ্ধতা রক্ষার প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করলেই সঙ্গে সঙ্গে স্থির করতে হয় বিশুদ্ধ রবীন্দ্রসংগীত বলতে কোন শ্রেণীর গান বা কোন রীতির আঙ্গিক বুঝায়। এখানে বর্তমান অবস্থায় কেবল দ্বিমত নয়, বহুমতের সংঘর্ষ দেখা দিবার আশঙ্কা রয়েছে। কারণ জনপ্রিয় শিল্পী ও গায়কগায়িকারা অবিসম্পাদিরূপে কোনো একটি প্রামাণ্য রীতি স্বীকার করতে প্রস্তুত নন। তাঁরা প্রামাণ্য হিসাবে একমাত্র ছাপানো স্বরলিপিগুলিকেই স্বীকার করেন এবং গীতিরীতি বা গায়কীর কোনো বিশেষ ঐতিহ্যই মেনে নিতে নারাজ। কিন্তু এই মনোভাব এবং দৃষ্টিভঙ্গিই রবীন্দ্রনাথের গানগুলিকে 'মাটি করে' দেওয়ার পথ। রবীন্দ্রনাথের গানের স্বরলিপি থেকে সংগীত শিক্ষার্থী কতোটুকুই বা জানতে পারেন যদি না তাঁর সেই সংগীতের পূর্বপ্রকৃতি থাকে।

রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে আজও তাঁর গানগুলির বিশুদ্ধ গীতরীতি বজায় রাখা হয়েছে। এখনও সেখানকার ছাত্রছাত্রীরা কবির গানগুলি সেখানকার স্বাভাবিক পরিবেশে আলো হাওয়ার উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে থেকে শুদ্ধভাবে শেখে ও শুদ্ধভাবে গায়। রবীন্দ্রসংগীতের শুদ্ধতমভাবরূপ সেখানকার যে কোন উৎসব ও মন্দিরের অনুষ্ঠানে যাঁরাই যোগ দিয়েছেন তাঁরাই গানগুলিতে ফুটে উঠতে অনুভব করেছেন। রবীন্দ্রসংগীতের 'নিগূঢ় সৌন্দর্য যদি কোথাও একান্ত স্বাভাবিক হয়ে সেখানকার প্রকৃতিতে মিশে থাকে— তা হলে সে স্থান রবীন্দ্রনাথের হাতে গড়া শান্তিনিকেতন আশ্রম— যেখানে অপরিণত শিশুকণ্ঠেও শ্রুত রবীন্দ্রনাথের গানের ছেঁড়া কলি হঠাৎ শুনলে মন রুদ্ধশ্বাসে উন্মুখ হয়ে থাকে, আকস্মিক গানের যাদু হরণ করে নিয়ে যায় মন থেকে সকল পার্থিব ভাবনা। যে কথাটি বিশেষভাবে উপলব্ধি করা দরকার তা হলো রবীন্দ্রনাথের গানের সার্থক ভাবপ্রকাশের জন্য শিল্পীর কণ্ঠে আর অনুশীলনে একটি বিশেষ গুণের অস্তিত্ব থাকা দরকার। সে গুণ রবীন্দ্রনাথের গানের স্বরলিপি পুঙ্খানুপুঙ্খ নকল, তালের বিচ্যুতিলেশহীন পরিমাপ-রক্ষণ বা ভাষার নির্ভুল সুষ্ঠু উচ্চারণ করার মধ্যে ব্যক্ত করা যায় না। এগুলি মূল অঙ্গের সৌষ্ঠব মাত্র, কিন্তু অঙ্গটির লাবণ্য অন্য এক অনির্বচনীয় সত্যে যা সেই সংগীতকে

অবলম্বন করে অন্তরে ফুটে ওঠে। রবীন্দ্রসংগীতের সরসতা, কোমলতা, মাধুর্য অথবা প্রদীপ্ত তেজ ধারা পড়ে যে রসের নিবিড় স্পর্শে— গায়কের কণ্ঠে যে সূক্ষ্ম সাহজিকতা সেই রসকে ফোটাতে পারে— তা এক সমন্বয়ের সত্য। শিল্পীকে অনুভব করতে হয় রবীন্দ্রনাথের গানের ভাষা, ভাব, সুর, ছন্দ, শব্দ, অক্ষর এ-সবের মিলিত সংযোগে কীভাবে একটি নিখুঁত সমন্বয়কে ব্যক্ত করে। শিল্পী যখনই এই সমন্বয়ের স্বাচ্ছন্দ্যের সহজ সত্যটি উপলব্ধি করতে পারেন তখনই গান হয়ে ওঠে সার্থক। বিশেষ করে সে সত্য রবীন্দ্রনাথের গানে। শান্তিনিকেতনে শিক্ষাপ্রাপ্ত শিল্পীদের সংগীত-পদ্ধতিতে এই সুঠাম বিন্যাসের রীতিটি অতি সুন্দরভাবে উদ্‌ঘাটিত হতে দেখা যায়। বিচক্ষণতার সঙ্গে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে তাঁদের গানে ধ্বনি-সুর-উচ্চারণ-রেশ-মীড়ের কাজ ভাবব্যঞ্জনার এবং পরিবেশ সৃষ্টির অনুকূলে কতোখানি সার্থক হয়ে ওঠে। এই সার্থক রীতিকেই আমরা বলে থাকি— শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রসংগীতের গায়কী— যা অন্তরকে স্পর্শ করতে পারে, এনে দিতে পারে শ্রোতার মনের মাঝখানে অনির্বচনীয়ের স্বাদকে। সেখানে প্রত্যেকটি গান এক একটি পৃথক ব্যক্তিত্বে প্রতিষ্ঠিত, আপন আপন রূপ ও সুষমার মাধুর্যে অনন্য। এই ভঙ্গি বা রীতিটি প্রবর্তিত করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ নিজে— নিজে তাঁর গাইবার রীতি বা পদ্ধতি সম্পর্কে পুংখানুপুংখ শিক্ষা দিয়ে তাঁর আশ্রমের সংগীত শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে রবীন্দ্রসংগীতের সত্যকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর লোকান্তরিত হওয়ার পর অদ্যাবধি শান্তিনিকেতনের সংগীত-পদ্ধতি সেই একক শিক্ষাকে প্রামাণ্য মেনে নিয়ে শিখে এবং শিখিয়ে এসেছে, বিকৃতির সকল হানিকর প্রভাব থেকে আপনাকে মুক্ত রেখেছে।

কোনো সভ্য দেশেই একজন যুগশ্রেষ্ঠ কবির সৃষ্টিকে অবহেলা বা অবমাননা করতে দেওয়ার রীতি নেই। তবু আমাদের বিশ্বাস, সকল বাঙালিই আজ আত্মবিস্মৃত হতে পারেন না, রবীন্দ্রনাথের প্রাণের সম্পদ এই গানগুলিকেই নষ্ট হতে দেখলে অনেকের বুকেই মর্মাঘাত করবে।

এই শতাব্দীর বাংলাকে বলা যেতে পারে রবীন্দ্র-যুগের বাংলা। কারণ এই দেশের প্রত্যেক অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ তার শিক্ষায় সংস্কৃতিতে ভাবনায় আচার-ব্যবহারে সর্বত্র দেখেছে রবীন্দ্রনাথের সর্বব্যাপ্ত প্রতিভার অবদানকে। তা তাকে জীবনযাপনের সুন্দরতম আদর্শ এনে দিয়েছে, সুন্দর রুচি ও সৌন্দর্যের প্রতি গভীর অনুরাগ মুকুলিত করেছে তার মনে, এক মানবধর্ম শিখিয়েছে যা সেই একই সৌন্দর্যবোধ থেকে উপজাত। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সৌন্দর্যের পূজারী, তাঁর সৃষ্টির মধ্যে তিনি রেখে গেছেন সেই সৌন্দর্যের স্বরূপতাকে। তিনি দারিদ্র্যকে ঘৃণা করতেন তা অসুন্দর বলে, কিন্তু তাঁর কাছে আরও পীড়াদায়ক ছিল চিত্তের দারিদ্র্য। বাঙালির প্রাণের যা কিছু সুন্দর যা কিছু মধুর এবং মহান তার সকল রস নিংড়ে

তিনি রচনা করেছিলেন তাঁর শত শত গানগুলি; সে গান বাঙালির অন্তরের সব থেকে গভীর সত্য। তার ভিতর দিয়ে সে চিনতে পারে তার আত্মাকে, তার মহৎ পুরুষকে। রবীন্দ্রনাথের রচিত গান তাঁর একান্ত অন্তরের বস্তু, তাঁর মর্মের পরিচয়। সহজেই তা কেড়ে নিতে পারে তাঁর হৃদয়। কিন্তু প্রতি যুগ-পরিবর্তনের অবশ্যম্ভাবী নিয়মেই অনর্থকারী প্রভাব সাময়িকভাবে রুচি-বিকৃতি ঘটাতে পারলেও তা কখনই জয় করতে পারে না মহৎকে, চিরন্তনকে, সুন্দরকে। বাঙালির অন্তরের সেই চিরসুন্দর নিশ্চয়ই এই তামস অধ্যায়ের অবসানে আপনার কল্যাণ-দৃষ্টিকে প্রসারিত করবে। সেদিন বাঙালির প্রাণের চিরসত্য আর অবরুদ্ধ থাকবে না। রবীন্দ্রনাথ নিজে বলে গেছেন যে কথা, তা একমাত্র আমরা স্মরণ করি—

"যুগ বদলায়, কাল বদলায়, তার সঙ্গে সব কিছু বদলায়। তবে সবচেয়ে স্থায়ী হবে আমার গান, এটা জোর করে বলতে পারি। বিশেষ করে বাঙালির শোকে দুঃখে, সুখে আনন্দে আমার গান না গেয়ে তাদের উপায় নেই। যুগে যুগে এই গান তাদের গাইতে হবে।"

[যুগান্তর সাময়িকী। রবিবার, ৬ মে ১৯৬২। ২৩ বৈশাখ ১৩৬৯]

কাজী নজরুল ইসলাম

'নিজেকে চিনলে, নিজের সত্যকেই নিজের কর্ণধার
মনে জানলে নিজের উপর অটুট বিশ্বাস আসে'

কাজী নজরুল ইসলাম

রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত

১৯৩২ সালে আমি নজরুল ইসলামকে প্রথম দেখি এবং তাঁহার গান তাঁহার মুখে প্রথম শুনি। ইহার পর এই শহরের নানা অনুষ্ঠানে তাঁহাকে দেখিয়াছি, তাঁহার গান শুনিয়াছি। কিন্তু প্রথম সাক্ষাতে তাঁহার খুব নিকটে বসিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। আমার মনে হইয়াছে তাঁহার সমস্ত ব্যক্তিত্বই সঙ্গীতময়। তখন আইন অমান্য আন্দোলন চলিতেছে। কবি বোধহয় সেই কারণেই স্বদেশী গান গাহিলেন। যতদূর মনে পড়ে এপ্রিল মাসের কোন সময় এই গানের আসরের ব্যবস্থা হইয়াছিল। নজরুলের শ্রোতারাও এই সময় স্বদেশী গান শুনিতে চাহিয়া ছিলেন। দেশের অধিকাংশ রাজনৈতিক নেতা তখন কারাগারে। সুভাষচন্দ্র ২রা জানুয়ারী গ্রেপ্তার হন। ইহার পর ঐ মাসেই মহাত্মা গান্ধী, বল্লভভাই প্যাটেল, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, রাজাগোপালাচারী, সত্যমূর্তি প্রভৃতি কারারুদ্ধ হন। শান্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ডও এই মাসের শেষেই। ইহার পরের মাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে বীণা দাস গর্ভনর ষ্ট্যান্লি জ্যাক্শনকে গুলি করিয়া হত্যা করার চেষ্টা করেন। কলেজের ছাত্ররা তখন ইংরেজ শাসনের প্রতি বিদ্বিষ্ট। আমাদের এই মুড বুঝিয়া কাজীসাহেব প্রথম গাহিলেন, 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার'। কান দিয়া যেমন গান শুনিতেছিলাম তেমন চক্ষু দিয়া কবিকে দেখিতেছিলাম। মনে হইতেছিল কবি তাঁর সমস্ত তনু-মন-প্রাণ দিয়া গানটি গাহিতেছেন। দারুণ গ্রীষ্মে কবির মুখখানিও ঈষৎ ঘর্মাক্ত। মনে হইল স্বেদ মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুরত বিকশিত ভাব কদম্ব। সমস্ত সভাগৃহ যেন সেইভাবে টলমল করিতে লাগিল। ইহার পর তিনি গাহিলেন 'চল্ চল্ চল্ ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল'। কবির সহজ সরল ভাব লক্ষ্য করিয়া একজন শ্রোতা বলিলেন, 'কারার ঐ লৌহ কপাট' গানটি শুনিতে চাই। তিনি একটু হাসিয়া গানটি করিলেন। ইহার পর শুনিলাম জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত-জালিয়াৎ খেলছে জুয়া। শেষ গানটি ছিল চল্ চল্ চল্। কবি একটি পান মুখে দিয়া হাসিতে হাসিতে সভাকক্ষ ত্যাগ করিলেন। আমার মনে হইল এমন উজ্জ্বল সরস ব্যক্তিত্ব পূর্বে দেখি নাই। কবির জীবন ও কাব্য সম্বন্ধে আমার তখন কোন জ্ঞান ছিল না এবং এই কয়টি ছাড়া তাঁহার অন্য কোন

রচনার সঙ্গে পরিচয় ছিল না। তাঁহার দারিদ্র্য কবিতাটির প্রথম দুই স্তবক আমাদের আই. এ. পরীক্ষার পাঠ্য ছিল। ক্লাশে আমাদের বাংলার অধ্যাপক কবিতাটি ব্যাখ্যা করিয়া পড়াইয়া ছিলেন। কিন্তু এখনও মনে আছে কবিতাটি আমার হৃদয় স্পর্শ করে নাই। আমি স্বীকার করি সাহিত্যের ছাত্র হিসাবে কলেজে এবং ইউনিভারসিটিতে ছয় বছরে আমি কোন নজরুল চর্চা করি নাই। ঐ সময়ের মধ্যে আমি একাধিকবার কবির 'বিদ্রোহী' কবিতাটির আবৃত্তি শুনিয়াছি। শুনিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলাম বলিয়া মনে পড়ে না।

চতুর্থ দশকে কিভাবে আমি নজরুল-ভক্ত হইয়া উঠিলাম, সেই কথা বলি, একদিন আমার এক বন্ধু আমাকে নজরুল ইসলামের 'ফণি-মনষা' কাব্যগ্রন্থখানি পড়িতে দিলেন। বিশেষ করিয়া 'সত্যকবি' নামক কবিতাটি আমাকে পড়িতে বলিলেন। আমি ভাবিলাম কবিতাটি সার্থক কবি-কে এই বিষয়ে লিখিত হইয়াছে। কিন্তু কবিতাটি ১৯২২ সালে প্রয়াত সত্যেন দত্ত সম্বন্ধে লিখিত। ইতিপূর্বে সত্যেন দত্ত সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কবিতাটি পড়িয়াছিলাম এবং সেটিকে বাংলা সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ এলিজি রূপে গ্রহণ করিয়াছিলাম। সেই কবিতার সঙ্গে নজরুলের এই কবিতাটির তুলনা করিতেছি না। যাহা আমার মর্ম স্পর্শ করিয়াছিল তাহা হইল এই যে এক বাঙ্গালী কবি তাঁহার সমকালীন আর এক কবি সম্বন্ধে এমন একটি দীর্ঘ কবিতা লিখিলেন। এই কবিতার একটি লাইন আমাকে আকৃষ্ট করিল : 'সত্য-কবির সত্য জননী ছন্দ সরস্বতী'। এই কবিতাটি পড়িয়া নজরুল সম্বন্ধে আমার মনে একটি সম্ভ্রমের সৃষ্টি হইল। সত্যেন দত্ত সম্বন্ধে নজরুল আরও একটি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। এই দ্বিতীয় কবিতাটিতে নজরুল সত্যেন দত্তকে 'চল-চঞ্চল বাণীর দুলাল' আখ্যা দিয়াছেন। ইহার পর আমি নজরুলের প্রায় সমস্ত কাব্যগ্রন্থই মন দিয়া পড়িলাম। তাঁহার কাব্যের অনেক স্থানে একটু রেটরিকের rhetoric আধিক্য লক্ষ্য করিয়াছি। মনে হইয়াছে ইহা যেন সংস্কৃত অলঙ্কারে কথিত গৌড়ী রীতির নিদর্শন। সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা এই রীতির মধ্যে অক্ষর লক্ষ্য করিয়াছেন। কোন রচনায় বাক-বাহুল্য থাকিলে আমরা তাহাকে rhetorical বলিয়া নিন্দা করি। Swinburne-এর কবিতায় এই rhetoric দেখিয়াছি অনেক বড় কবিও অনেক সময় rhetorical হইয়া পড়েন। Shakespeare ও Milton-এর কাব্যে ইহার দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। কিন্তু এবিষয়ে আমাদের একটু চিন্তা করিতে হইবে। আমাদের জিজ্ঞাসা করিতে হইবে বাগৈশ্বর্য্য মাত্রেই নিন্দার্হ বাক-বাহুল্য কিনা। যেখানে ভাবে জোয়ার সেখানে শব্দের জোয়ার আসিবেই। আর যেখানে শব্দের জোয়ার আছে কিন্তু ভাবের জোয়ার নাই সেখানেই রচনা বাক্-বাহুল্য দোষে দুষ্ট। ভাবের ছটা নাই, শব্দের ছটা আছে এমন কবিতা আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে না। ভাষা ভাবের সাজ। বস্তুতঃ কাব্যে ভাব সজ্জিত হইয়াই আবির্ভূত হয়। শ্রেষ্ঠ কাব্যে ভাব ও ভাষার,—

অনুভূতি ও উচ্চারণের অন্বয় দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হই। এখানে Shakespeare-এর কয়েকটি বহুশ্রুত চরণ উল্লেখ করিতে পারি : 'Life is but a walking shadow

A poor player that struts and frets upon the stage
and then is heard no more.
It is a tale told by an idiot
Full of sound and fury signifying nothing.

গ্রীক Tragedy পড়া পাঠক বলিবেন, ইহা বড় বেশী কথা হইল। Rhetoric-এর আধিক্য হইল। যাহা সকলেই জানেন, তাহা কতগুলি উপমা দিয়া প্রকাশ করা হইল। কিন্তু নাটকটি পড়িলে মনে হইবে কথাগুলি Macbeth-এর হৃদয়ের কথা। এখানে অলঙ্কার ভাবকে ছাড়াইয়া যায় নাই। ভাবের তীব্রতা সার্থকভাবে প্রকাশ করিয়াছে। নজরুলকে যে আমরা একটু বেশী rhetorical বলিয়া তুচ্ছ করি তাহার কারণ এই যে আমরা নজরুলের ভাবলোকের সংবাদ লইতে চাহিনা। সেই ভাবলোকের কথা যদি আমরা শুনিতে না চাহি তাহা হইলে আমরা তাঁহার কবিতা পড়িব না। কিন্তু নজরুলের কাব্যে ভাবের অভাব, শব্দালঙ্কারের প্রাচুর্য এমন কথা বলা বোধহয় ঠিক হইবে না।

এই প্রসঙ্গটি তুলিবার একটি কারণ আছে। বুদ্ধদেববাবু নজরুল সম্বন্ধে ১৯৪৪-এ তাঁহার কবিতাপত্রে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছেন : 'নজরুল চড়া গলার কবি, তাঁর কাব্যে হৈ-চৈ অত্যন্ত বেশি, এবং এই কারণেই তিনি লোকপ্রিয়। যেখানে তিনি ভালো লিখেছেন, সেখানে তিনি হৈ-চৈটাকেই কবিত্বমণ্ডিত করেছেন; তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনায় দেখা যায়, কিপলিঙের মতো, তিনি কোলাহলকে গানে বেঁধেছেন। প্রবন্ধটি ১৯৪৬ সালে প্রকাশিত বুদ্ধদেব বসুর 'কালের পুতুল' গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট। বুদ্ধদেব বসু তাঁহার 'An Acre of Green Grass' (1948) গ্রন্থে এই কথাই পুনরায় বলিয়াছেন : 'Nazrul, I repeat, is a loud poet, his poetry is boisterous. That kiplingesque clamour which made him widely read also subjected him to pitiful faults. He has written much that is heart-warming along with a lot of rant, himself unable to discern the difference. His effusiveness, painful in descriptive nature-poems, becomes intolerable in prose, which, indeed, he should never have written.'

বুদ্ধদেব বসু সুপণ্ডিত সাহিত্যিরসিক মানুষ। তাঁহার কোন অভিমত সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করিতে আমার সঙ্কোচ হয়। এতে এতটুকু বলিতে পারি যে নজরুলের কবিতা আমার কাছে সুরেবাঁধা কোলাহল বলিয়া কখনও মনে হয় নাই। আবার ইহাও ভাবিয়াছি যে হৃদয়ে কোলাহল থাকিলে কবিতায়ও কোলাহলের সুর আসিয়া পড়িবে। কাব্য সংসারে বিচিত্র ভাব, বিচিত্র ভাষা, বিচিত্র রূপের কবিতা।

নজরুলের গদ্য দুর্বল, ইহা গদ্যই নহে একথা অবশ্যই মানিনা। সম্প্রতি নজরুলের কয়েকটি প্রবন্ধ পড়িবার সুযোগ পাইয়াছি। 'নবযুগ' প্রবন্ধের একটি অংশ তুলিয়া দিতেছি : 'দাঁড়াও জন্মভূমি জননী আমার। একবার দাঁড়াও।। যেদিন তুমি সমস্ত বাধা-বন্ধন-মুক্ত, মহা-মহিমময়ী বেশে স্বাধীন বিশ্বের পানে অসঙ্কোচ দৃষ্টি তুলিয়া তাকাইবে, সেদিন যেন নিজের এই ক্ষত-বিক্ষত অঙ্গ, ঝাঁজরাপাড়া বক্ষ, শোণিতলিপ্ত ক্রোড় দেখিয়া কাঁদিয়ো না। তোমার পুত্র শোকাতুর বুকের নিবিড় বেদনা সেদিন যেন উছলিয়া উঠে না, মা। সেদিন তুমি তোমার মুক্ত শিশুদের হাত ধরিয়া বিশ্বমঞ্চে বীরপ্রসূ জননীর মত উঁচু হইয়া দাঁড়াইয়ো। ঐ দূর সাগরপার হইতে তোমার মুখে সেদিন যেন নব প্রভাতের তরুণ হাসি দেখি।'

নজরুলের বাইশটি প্রবন্ধ পাঁচটি অভিভাষণ এবং ছয়খানি চিঠি আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত 'শ্রেষ্ঠ নজরুল' গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছে। ইহার কোন অংশই আমি ইতিপূর্বে পড়ি নাই। এই রচনাবলীতে আমি এক চিন্তাশীল লেখকের পরিচয় পাইয়াছি। বুদ্ধদেব বসু লিখিয়াছেন, 'For twenty-five years he has written like a boy of genious, without ever growing up or maturing. The sequence of his works does not give a history of development.' নজরুল সম্বন্ধে তাঁহার বাংলা প্রবন্ধে বুদ্ধদেব বসু ঐ একই কথা বলিয়াছেন, 'পঁচিশ বছর ধরে প্রতিভাবান বালকের মতো লিখেছেন তিনি, কখনও বাড়েননি, বয়স্ক হননি, পর-পর তাঁর বইগুলিতে কোনো পরিণতির ইতিহাস পাওয়া যায় না, কুড়ি বছরের লেখা আর চল্লিশ বছরের লেখা একই রকম। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর প্রতিভার প্রদীপে ধীশক্তির শিখা জ্বলেনি, যৌবনের তরলতা ঘন হলো না কখনো, জীবনদর্শনের গভীরতা তাঁর কাব্যকে রূপান্তরিত করলো না।' আমার মনে হয় নাই। ১৯২২ সালে কবি হিসাবে নজরুল যখন বাঙ্গালীর হৃদয়ে আসন পাতিলেন রবীন্দ্রনাথ তখন তাঁহার 'বসন্ত' গীতিনাট্যখানি নজরুলকে উৎসর্গ করিলেন। নজরুল তখন কারাগারে। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়কে গ্রন্থখানি নজরুলের হাতে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিয়া বলিলেন, 'জাতীয় জীবনে বসন্ত এনেছে নজরুল। তাই আমার সদ্য প্রকাশিত 'বসন্ত' গীতি নাট্যখানি ওকেই উৎসর্গ করেছি।' এই সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ এক সভায় বলিলেন 'কাব্যে অসির ঝনঝনা থাকতে পারে না, এও তেমাদের আবদার বটে। সমগ্র জাতির অন্তর যখন সে সুরে বাঁধা, অসির ঝনঝনায় যখন সেখানে ঝংকার তোলে, ঐকতান সৃষ্টি হয়, তখন কাব্যে তাকে প্রকাশ করবে বৈকি। আমি যদি— আজ তরুণ হতাম, তাহলে আমার কলমেও ওই সুর বাজত।' নজরুলের কবিতায় এই বসন্ত ভাবটি সাধারণ পাঠক হিসাবে আমিও অনুভব করিয়াছি। কিন্তু বুদ্ধদেববাবু যে development-এর কথা বলিয়াছেন তাহা আমি দেখাইতে পারিব না। 'বসন্ত' কাব্য আবার কবে অন্য ঋতুর

কাব্য হইয়া উঠিল তাহা দেখাইতে পারিব না। ১৯২৯ সালে ৫ই ডিসেম্বর 'কলিকাতার এলবার্ট হলে জাতির পক্ষ হইতে এক সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। এই সভায় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বলিলেন 'কারাগারের শৃঙ্খল পড়িয়া বুকের রক্ত দিয়া তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালীর প্রাণে এক নূতন স্পন্দন জাগাইয়া তুলিয়াছে।' এই সভাতেই সুভাষচন্দ্র বসু বলিলেন, 'নজরুল একটা জীবন্ত মানুষ। আমাদের প্রাণ নেই তাই এখন প্রাণময় কবিতা লিখতে পারি না।' আমার মনে হয় এই প্রাণ-ই নজরুলের কাব্যকে আধুনিক মন হইতে দূরে সরাইয়া দিয়াছে। বুদ্ধদেববাবুর কথা যেন এই যে তোমার কাব্যে প্রাণ আছে, মননশীলতা কৈ। মনের দিক দিয়া তুমি বয়সের সঙ্গে বাড়িয়া উঠিতে পার নাই। তুমি একটি প্রাণোচ্ছল শিশুই রহিয়া গেলে। নজরুলের কালে আমাদের সাহিত্য-সমাজে-বাদবিসংবাদের অন্ত ছিল না। শনিবারের চিঠির সজনীকান্ত ইহার ইন্ধন জুটাইয়াছেন। আজ আর সে কলহের কাহিনীর মধ্যে যাইতে চাহিতেছি না। নজরুলের শতবার্ষিকী উৎসবে আমরা সমগ্র নজরুলকে চিনিয়া লইতে চাই। এইজন্য আমাদের নজরুলের সমগ্র রচনা যত্ন করিয়া পড়িতে হইবে। নজরুলের সাহিত্যিক জীবনকাল মাত্র তেইশ বছরের ১৯১৯ হইতে ১৯৪২ পর্য্যন্ত। তাঁহার সমস্ত রচনার মধ্যে এক উজ্জ্বল সরস ব্যক্তিত্বের পরিচয়। সেই ব্যক্তিত্বে বিচিত্র-ভাব, বিচিত্র চিন্তার সমাবেশ। এবং এই ধারনা ও চিন্তার যেমন বিস্তার তেমন গভীরতা। তাঁহার কাব্যে আমরা যে একটা সাংস্কৃতিক ঐক্য দেখিতে পাই তাহার মূলে এই চিন্তা ও ভাবের বিস্তার ও গভীরতা। তাঁহার শ্যামা-সঙ্গীত পড়িয়া কোন মুসলমান বলিতে পারেন যে তিনি এইখানে কাফের। আবার তাঁহার ইসলাম বিষয়ক রচনা পড়িয়া হিন্দু পাঠক বলিবেন তিনি মুসলমানকে খুশি করিবার জন্য এইরকম লিখিয়াছেন। নজরুল হিন্দু-মুসলমানের ভাবের ঐক্যে বিশ্বাস করিতেন। তিনি বুঝিতেন যে বাঙ্গালীকে আগে বাঁচিতে হইবে। এই বাঁচিবার যুদ্ধে ধর্ম-প্রসঙ্গ অবান্তর। 'আমার ধর্ম' প্রবন্ধে তিনি লিখিলেন 'ওগো তরুণ, আজ কি ধর্ম নিয়ে পড়ে থাকবে— তুমি কি বাঁচবার কথা ভাববে না? ওরে অধীন, ওরে ভণ্ড, তোর আবার ধর্ম কি? যারা তোকে ধর্ম শিখিয়েছে, তারা শত্রু এলে বেদ নিয়ে পড়ে থাকতো? তারা কি দুশমন এলে কোরআন পড়তে ব্যস্ত থাকতো? তাদের রণ কোলাহলে বেদমন্ত্র ডুবে যেত, দুশমনের খুনে তাদের মসজিদের ধাপ লাল হয়ে যেত। তারা আগে বাঁচতো।' এই কথাই তিনি আর একটি জনপ্রিয় কবিতায় বলিয়াছেন :

"হিন্দু না ওরা মুশলিম?" ওই জিজ্ঞাসে কোন জন?
কাণ্ডারী। বল ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা'র।

তবে একথা ঠিক যে তিন হাজার বৎসরের হিন্দু সংস্কৃতির অনেক ভাব নজরুলকে প্রভাবিত করিয়াছে। সেই ভাবকে তিনি এক হিন্দু-সাম্প্রদায়িক ভাব

বলিয়া মনে করিতেন না। 'নবযুগ' প্রবন্ধে তিনি লিখিলেন, ঐ শোনো মহামাতা জগদ্ধাত্রীর শুভ-শঙ্খ'। আবার ইহার ঠিক পরেই লিখিলেন 'ঐ শোন ইসরাফিল-এর শিঙ্গায় নবসৃষ্টির উল্লাস ঘন রোল' ইহার পর লিখিলেন 'আজ নারায়ণ মানব'। এই নারায়ণ নজরুলের ঈশ্বর। হিন্দু পুরাণের সঙ্গে তাহার যোগ না দেখিলেও চলে। যে কোন জাতির ভাবার মধ্যে সেই জাতির পৌরাণিক কাহিনী আসিয়া পড়ে। ইওরোপীয় সাহিত্যে প্রাচীন গ্রীক ও রোমের পুরাণ কথা মিশিয়া গিয়াছে। ইহাতে ইওরোপের খৃষ্টীয় বিবেক বিব্রত হয় নাই। ইহার কারণ এই যে ইওরোপের কোথাও কোন পেগান রাষ্ট্রশক্তি ছিল না। ইংরাজ কবি বলিতে পারে I would rather be a pagan suckled in a creed outworn. কারণ তখন কোন Pagan রাজ্য ইওরোপে ছিল না। আমাদের সাম্প্রদায়িক ঐক্যের পথে বড় বাধা Politics. এই দেশ হিন্দুর না মুসলমানের। নজরুল ইহা বুঝিতেন কিন্তু তবু বলিতেন : 'আজ আর কলহ নয়, আজ আমাদের ভাই-এ ভাই-এ মনে মনে মায়ের কাছে অনুযোগের আর অভিযোগের এই মধুর কলহ হইবে যে, কে, মায়ের কোলে চড়িবে, আর কে মায়ের কাঁধে উঠিবে'। এই ভাব শিশুসুলভ হইতে পারে। কিন্তু, নজরুল ইহাকে সত্য বলিয়াই জানিয়াছেন। 'ভাব ও কাব্য' নামক একটি প্রবন্ধে নজরুল লিখিয়াছেন আমাদের দেশ এক 'ভাব পাগলা দেশ' এবং তিনি আবার লিখিয়াছেন, 'যিনি ভাবের বাঁশি বাজাইয়া জনসাধারণকে নাচাইবেন, তাঁহাকে নিঃস্বার্থ ত্যাগী হইতে হইবে।' আমি নজরুলকে এক নিঃস্বার্থ ত্যাগী পুরুষ বলিয়াই জানিয়াছি। নজরুল নিজেকে জানিতেন, নিজেকে চিনিতেন। এবং এই বিশ্বাসেই তিনি লিখিয়াছেন 'নিজেকে চিনলে নিজের সত্যকেই নিজের কর্ণধার মনে জানলে নিজের শক্তির উপর অটুট বিশ্বাস আসে।' এই বিশ্বাস নজরুলের ছিল। 'আমার সুন্দর' প্রবন্ধে তিনি লিখিলেন : 'জাতি-ধর্ম-ভেদ আমার কোনদিনই ছিল না। আজও নেই। আমাকে কোনদিন তাই কোন হিন্দু ঘৃণা করেনি।' আসলে তিনি ধর্ম লইয়া কোনদিন ব্যস্ত হন নি। তাঁহার কথা হইল : 'আমি ব্রহ্ম চাই না, ভগবান চাই না। এইসব নামের কেউ যদি থাকেন, তিনি নিজে এসে দেখা দিবেন। আমার বিপুল কর্ম আছে, আমার অপার, অসীম এই ধরিত্রী মাতার ঋণ আছে।'

নজরুল নিজেকে বাঙ্গালী বলিয়া মনে করিতেন। তিনি হিন্দু কি মুসলমান এই প্রশ্ন তাঁহার কাছে অবান্তর এবং বাঙ্গালী সম্বন্ধে তাঁর একটা গর্ববোধ ছিল। 'বাঙ্গালীর বাংলা' প্রবন্ধে তিনি লিখিলেন : বাঙ্গালী যেদিন ঐক্যবদ্ধ হয়ে বলতে পারবে—"বাঙ্গালীর বাংলা" সেদিন তারা অসাধ্য সাধন করবে, সেদিন একা বাঙ্গালী-ই ভারতকে স্বাধীন করতে পারবে। বাঙ্গালীর মত জ্ঞানশক্তি ও প্রেমশক্তি (ব্রেণ সেণ্টার ও হার্ট সেণ্টার) এশিয়ায় কেন, বুঝি পৃথিবীতে কোন জাতির নাই।' অনেক মুসলমান নজরুলকে মুসলিম লীগ বিদ্বেষী বলিতেন, ইহার উত্তরে নজরুল লিখিলেন : 'কোন

শতকিয়া

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

[স্থান— অনন্তলোক।

কাল— সেখানে কোনো কাল নেই।

পাত্র পাত্রী—জীবনানন্দ, বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, নজরুল, শরদিন্দু এবং আরো কেউ কেউ। আছেন একটু দূরে মানিক, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু। আরো পিছনে সতীনাথ, সমরেশ]

তারাশঙ্কর— তাইতো হে বিভূতি, তোমার 'দেবযান'-এ তো তুমি ঠিকই লিখেছিলে, এই অশেষ জ্যোতির্মণ্ডলের একটা নির্দিষ্ট স্তরে আমরা সবাই সমবেত। তা আমাদের যাঁরা পূর্বগ তাঁরা কোথায়? বঙ্কিম, মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এঁরা?

বিভূতিভূষণ— আছেন, আছেন, তাঁরা আছেন আরো একটু ওপরে। তাঁদের অমরত্ব যাচাই হয়ে গেছে।

বনফুল— ও, আমাদের বোধ হয় যাচাই হচ্ছে। তাই বুঝি আমাদের ফেলে আসা মর্ত্যখণ্ডে এখন চলেছে শতবার্ষিকীর ঘটা।

শরদিন্দু— খুব ঘটা। জাতটা সেই রকমই থেকে গেল। যখন যাকে নিয়ে মাতবে তখন সে ছাড়া যে আর কেউ পাশে ছিল তা বুঝতে দেবে না। সেদিন অদৃশ্য হয়ে জীবনানন্দের শতবার্ষিকীর একটা সভায় গিয়েছিলাম। মাস্টারমশাই আর চ্যাংড়া এবং চিংড়ি কবিদের বক্তৃতা শুনে আমার মনে হল জীবনানন্দ বোধ হয় একাই একমাত্র ছিল। আশেপাশে কেউ ছিল না।

জীবনানন্দ— বলে এসেছিলাম 'সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি'। ব্যাপার স্যাপার দেখে এখন যেন বলতে ইচ্ছে করছে 'সকলেই প্রাবন্ধিক, কেউ কেউ রসিক'।

বনফুল— আমিও তো কিছু কবিতা লিখেছি। জীবনানন্দকে জিজ্ঞাসা করতে সাধ হয়, সমালোচকদের উদ্দেশ্যে আপনার বক্তব্য।

জীবনানন্দ— 'বরং নিজেই তুমি লেখো নাক' একটা কবিতা। বিষ্ণু আপনি কী বলবেন।

বিষ্ণু দে— 'নিরুদ্দেশ অন্বেষা উৎসবে সতীকে মেলেনা মেলে পার্বতীকে কুমার সম্ভবে।' বুদ্ধদেব আপনি?

বুদ্ধদেব বসু— আমার যা বলার কথা তা নিজেকেই—'বল দেখি আর

কতকাল একই সঙ্গে হতে হবে দ্রাক্ষাপুঞ্জ বকযন্ত্র শুঁড়ি ও মাতাল'। নজরুল আপনি?

নজরুল— আমার গুরু আমাকে সস্নেহ তিরস্কার করেছিলেন, তুই তরোয়াল দিয়ে দাড়ি চাঁছা শুরু করেছিস। আমার উত্তর একটাই ছিল অমরকাব্য তোমরা লিখিও বন্ধু যাহারা আছ সুখে।

বনফুল— দিনগুলোর কথা খুব মনে পড়ে। বিষ্ণু একা কলকাতার ছেলে। বাকি আমরা সবাই বাইরে থেকে কলকাতায় এসেছিলাম। তারাশঙ্কর লাভপুর থেকে, বিভূতির জন্ম চব্বিশ পরগণায় বনগ্রামের গ্রাম পরিবেশ থেকে সে রিপণ কলেজে পড়তে আসে, নজরুল চুরুলিয়া থেকে, বুদ্ধদেব ঢাকা থেকে, মানিক জন্মেছে বটে দুমকায়, তবে পূর্ববঙ্গে নদী মাটির দেশে সেও লালিত, এবং ছাত্র সে প্রেসিডেন্সির। সতীনাথ তো পূর্ণিয়া ছেড়ে কোথাও গেল না।

তারাশঙ্কর— জীবনানন্দ বরিশাল থেকে এলেন। আর বলাই তুমি পূর্ণিয়ায় জন্মে ভাগলপুর হয়ে এলে কলকাতায়।

বুদ্ধদেব— কলকাতা প্রেমিকার মতো আকর্ষণময়ী, কলকাতা প্রেমিকার মতোই নিষ্ঠুর— 'তুমি কাউকে মনে রাখো না তুমি শুধু পায়ের শব্দ। মমতা করো না অতীতেরে, তুমি শুধু গতির বেগ।' বলেছিলাম— 'কোনো কথা তুমি দাওনি আমাকে, শুধু ডাক দিয়েছিলে,/আমারো কোনো যৌতুক ছিল না, উৎসুক অনিশ্চয়তা ছাড়া/তবু তাই— তাই তোমার। রাস্তার বাঁকে বাঁকে আমার চোখের সামনে খুলে গেল ভবিতব্যের দুয়ার।'

তারাশঙ্কর— কলকাতা সহজে দরজা খোলেনি। অনেকবার দরজায় ঘা দিলে তবে দরজা একটু খোলে। আজ মনে পড়ে সেই সব দিনগুলো। পাইস হোটেলে ভাত খেয়েছি, খোলার চালের ঘরে থেকেছি, রাস্তার জলে পিপাসা মিটিয়েছি। পাঁচটাকা দক্ষিণার জন্য সম্পাদকের দরজায় দরজায় ঘুরেছি। তবু কলকাতাকেই করেছি সাধনপীঠ।

নজরুল— রেকর্ডের জন্য গান লিখতে হয়েছে অনর্গল। উপায় তো কিছু ছিল না। তারাশঙ্কর তুমিও জেল ফেরৎ আমিও জেল ফেরৎ— সংস্থানের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু দেশ সৃষ্টিসুখের উল্লাসের কিছু কমতি ছিল না।

তারাশঙ্কর— প্রেস খুলতে গেলাম। ইংরেজ সরকার আমি রাজবিদ্রোহী এবং জেলখাটা মানুষ বলে মোটা টাকা জামানত দাবি করল।

সুভাষচন্দ্র নির্দেশ দিলেন, কিছুতেই জামানত দেবেন না— তাতে যা হয় হোক। মনে হল যেন দেববাণী। প্রথম উপন্যাস 'চৈতালী ঘূর্ণি' সুভাষচন্দ্রকেই উৎসর্গ করেছিলাম।

জীবনানন্দ— আপনারা যেন ভাববেন না, আমাদের মানে কবিদের অবস্থা কিছু ভাল ছিল। বুদ্ধ আর বিষ্ণু রিপন কলেজে কণ্ঠবাদন করেছে। আমি প্রথমটা ছিলাম সিটি কলেজে টিউটর। একবছরে চারবার বাসা বদল। মফস্বল কলেজে দরখাস্ত করেছি, গভর্নিং বডির সম্পাদক অন্য সদস্যকে জিজ্ঞাসা করেছেন— লিখেছে' কবিতার বই আছে— তোমরা কেউ জান নাকি হে এঁকে? তারপর যদি বা একটা কলেজে চাকরি হল উপভাড়াটিয়া নিয়ে অন্তবিহীন ঝামেলা আর থামে না।

বিষ্ণু দে— তবু আমরা তার মধ্যেও অলাতচক্রে চংক্রমণ করিনি। পথ খুঁজেছি, অনলস ভাবে। কবিতা ভবনের আড্ডা, রিপন কলেজে তিনটের পরে প্রিন্সিপ্যাল রবীন্দ্রনারায়ণের ঘরে বিদগ্ধ আলোচনা— না— আক্ষেপ নেই— এরই মধ্যে একদিন টের পেলাম জনসমুদ্রে জেগেছে জোয়ার।

শরদিন্দু— আমি তো কিছু দিনের জন্য চলে গেলাম কলকাতার বাইরে। মন পড়ে থাকত কলকাতায়। ততদিনে আমার ব্যোমকেশ অজিত দাঁড়িয়ে গেছে। ভারত ইতিহাসের নানা যুগ আমাকে টানছে। বাংলাগদ্য আর সাহিত্যই হল আমার যথার্থ অভিজ্ঞান। বোম্বাই— একালে বুঝি আবার নতুন নাম হয়েছে, আমাকে স্বাচ্ছল্য দিয়েছে— স্বাচ্ছন্দ্য দেয়নি। আমি—

বিভূতি— তুমি, একালে একজন বলেছে দেখলাম, এক খাঁটি বাঙালি।

শরদিন্দু— সেটা আমরা সবাই। দীনেশবাবু তারাশঙ্করকে 'বাবা' বলে বৎসলভাবে সম্বোধন করতে তারাশঙ্কর কেমন অভিভূত হয়ে গিয়েছিল মনে নেই?

বনফুল— একটা কথা, সে অভিধা বোধ হয় আমাদের সকলের সম্বন্ধেই খাটে। যদিও আমাদের প্রত্যেকের বাঙালিত্বের অভিজ্ঞান এক একজনের কাছে এক এক রকম। আমি বুঝি বাঙালীর অনুপুঙ্খ সচেতনতা। বিভূতি কী ভাবেন?

বিভূতিভূষণ— হৃদয়। তারাশঙ্কর?

তারাশঙ্কর— কাল থেকে কালান্তরের দিকে চলে যেতে থাকা। নজরুল?

নজরুল— জীবনের উদ্দামতা।

জীবননান্দ— অনন্ত শ্যামলতায় রূপসী বাংলা।

বিষ্ণু দে— উদগ্রীব প্রতীক্ষার মিশ্র সুর।

মানিক— পর্যবেক্ষণ।

শরদিন্দু— পারিপাট্য।

বুদ্ধদেব— অমাবস্যা পূর্ণিমার পরিণয় প্রয়াসী।

বিভূতিভূষণ— একটা কথা ভেবেছ সবাই? আমরা জন্মেছি কয়েকবছর আগু পিছু। মানিক কেবল একটু ছোট বয়সের দিক থেকে। আমরা প্রায় একই সময়ে কৈশোর পেরিয়েছি— যুবক হয়েছি। দুটো দুটো মহাযুদ্ধ আমাদের প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছানোর আগেই ঘটে গেল।

মানিক— মানুষ তার সামাজিক নিয়তিকে আর অকাট্য বলে মানতে চাইল না।

তারাশঙ্কর— ভারতীয় জীবনে ধাক্কা দিল একুশের গণ আন্দোলন, বত্রিশের গণ আন্দোলন।

মানিক— মিরাট ষড়যন্ত্র মামলায় জানা গেল এক নূতন শক্তির প্রবেশ আসন্ন। আমি তখনই টের পাইনি। তারাশঙ্কর পেয়েছিল।

তারাশঙ্কর— আমার অধীন তো মীরাট ষড়যন্ত্রের পরের ধরপাকড়ে গ্রেপ্তার হল।

মানিক— তোমার অধীন কিন্তু একটু টেরোকম্যুনিজমের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। তবে কম্যুনিস্টদের নিয়ে প্রথম উপন্যাস তুমিই লিখেছিলে। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় আমাদের ইংরাজী সাপ্তাহিকে তোমাকে নিয়ে লিখেছিলেন Foremost Novelist of Bengal.

বনফুল— ভাবো বিয়াল্লিশের ভারত ছাড়ো আন্দোলনের কথা। একটু আগে তোমরা বলছিলে নজরুল আর তারাশঙ্করের কারাবাসের কথা। ওই দেখ একটু পিছনে বসে আছে সতীনাথ। স্বাধীনতা আন্দোলনে ও দুবার জেলে গিয়েছিল।

মানিক— আরেকটু পিছনে রয়েছে সমরেশ সে স্বাধীনতা উত্তর ভারতবর্ষে কম্যুনিস্ট আন্দোলনে যুক্ত থাকার জন্য বছরখানেক কংগ্রেসী জেলে ছিল।

বনফুল— আমি ভুলতে পারি না আমার অংশুমান আর অন্তরাকে। তবে যতদূর জানি— সতীনাথ কংগ্রেস ছেড়ে দিল। সমরেশ কম্যুনিস্ট পার্টির মেম্বরশিপ রিনিউ করল না।

সমরেশ ও সতীনাথ (দূর থেকে প্রায় একসঙ্গে)— হ্যাঁ, তবে ছাড়িনি মানুষকে।

বনফুল— সে কথা আমাদের সকলের পক্ষেই প্রযোজ্য। সমালোচকেরা যাকে যা ভাবেন তা বলুন না কেন।

জীবনানন্দ— সমালোচকদের কথা যত কম বলা যায় তত ভাল। মর্ত্যভূমির হিসাবে তিপ্পান্ন সালে এক অকাল পক্ক যুবক একটি ত্রৈমাসিকে আমাকে নানা ধরণের অমূলক অভিযোগে— এখন শুনতে পাই মাথা ঠাণ্ডা হয়েছে। তবে সুখের কথা সেটা শতবার্ষিকী সমারোহের আগেই হয়েছে।

বুদ্ধদেব— ওটা রবীন্দ্রনাথের অল্পবয়সে মেঘনাদ বধ আলোচনা অনুকরণ করতে চাওয়ার মতো ব্যাপার। ধর্তব্য নয়।

বনফুল— শুনেছি আমার ভাইঝির কাছে ছেলেটি সাহিত্যের অধ্যাপক। সেই বাবদে আমার স্বাক্ষরিত একটা বই ছোকরা মেরে দিয়েছে।

বিভূতিভূষণ— যমুনাও ওর কাছে পড়েছে। ঠাণ্ডা মানুষ।

বিষ্ণু দে— আমি জানতাম ছেলেটিকে, খুব মজার ছেলে।

তারাশঙ্কর— আমাকে সে একবার খুব মজার কথা বলেছিল। তখন কিছুদিন হল আমার 'অরণ্য বহ্নি' বেরিয়েছে। চুঁচুড়ায় মহসীন কলেজে আমি তাকে বলেছিলাম, দেখ হে, 'অরণ্য বহ্নি' লিখেছি বলে অনেকে আমায় বলছে আমি নাকি নকশাল হয়ে গেছি। সে আমায় বলেছিল, দাদা আপনি কংগ্রেস, কম্যুনিস্ট, নকশাল কিছুই নন— আপনি আদি মধ্য অন্তে একান্ত অকৃত্রিম তারাশঙ্কর।

সকলে একসঙ্গে (বুদ্ধদেব বাদে)— প্রায় ঠিক বলেছে।

বিভূতিভূষণ— সমালোচকদের কথা—

মানিক— থুইয়া ফ্যালাও।

বিভূতিভূষণ— একজন আমার সিঁদুরচরণের গল্প পড়ে বলেছিল, ওটা কিছু হয়নি। আমি বলেছিলাম চ্যান করুক গে।

তারাশঙ্কর— দেখ আমরাও তো একে অন্যের লেখার সমালোচনা করিনি তা নয়— কিন্তু অন্তরের সম্বন্ধ ঠিক ছিল।

বনফুল— নিশ্চয়। আমরা পরস্পরকে স্বাধীনভাবে যা বলবার তা বলতে পারতাম। তোমার 'কবি' আমার কাছে অশ্লীল বলে মনে হয়েছিলো। মন খুলে সে কথা সেদিন বলেছিলাম। আবার যেদিন গণদেবতা পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম সেদিন তোমায় দীর্ঘ চিঠি লিখেছিলাম।

তারাশঙ্কর— জ্ঞানপীঠ সত্ত্বেও তোমার চিঠিখানির দাম আমার কাছে অমূল্য।

শরদিন্দু— তোমরা হাওয়া ভারি করে ফেলছ। তার চেয়ে এস একটা খেলা খেলি। আমরা প্রত্যেকে আমাদের অন্তরের গভীর কথা— যার

কাছে যেটা গভীরতম বলে মনে হয়েছে— সেটা বলি। আর গভীরতম কথা যখন সেটা অবশ্যই কবিতায় হোক।

বনফুল— সাধু প্রস্তাব। প্রথমে জীবনানন্দ।

জীবনানন্দ (একটু ভেবে)— তবুও নদীর মানে স্নিগ্ধ শুশ্রূষার জল, সূর্য মানে আলো, এখনো নারীর মানে তুমি, কত রাধিকা ফুরালো।

এবার বিভূতিভূষণ—

বিভূতিভূষণ— বলব? আচ্ছা বলছি :

ও আমার হৃদকমলের পরম গুরু সাঁই,
রেতে আলো দিনে তারা রাত নাই দিন নাই।
তোমার সেথা বাঁশের ঝাড়ে
অরূপ রূপের পাথার পাড়ে
বাঁশের ফুলে ভুবন আলো দেখতে এলাম তাঁই।
এবার নজরুল—

নজরুল— কী যে বলি। শোনো তাহলে।

(সুরে) মহাকালের কোলে এসে গৌরী হল মহাকালী।
শ্মশান চিতার ভস্ম মেখে ম্লান হল মা-র রূপের ডালি
তবু মায়ের রূপ কি হারায়
সে যে ছড়িয়ে আছে চন্দ্র তারায়।
সকলে একসঙ্গে— বাঃ বহুৎ খুব।

তারাশঙ্কর— বলিহারি।

নজরুল— বলিহারি দিলেই হবে না। এবার তুমি বল।

তারাশঙ্কর— বলব বৈ কি, সেই কথাটা বলব, যে কথা এখানে এসেও ভুলতে পারছি না— (সুরে)

হায় জীবন এত ছোট কেনে
ভালবেসে মিটিল না সাধ এ জীবনে।

(সকলে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে। তারপর সহসা বিষ্ণু দে নিজে থেকেই)

বিষ্ণু দে— বিভাবরী তাকে দিয়ে দাও যাকে দিয়েছ দিবা।

বুদ্ধদেব আপনি বলুন—

বুদ্ধদেব— কী যে বলি। আচ্ছা বলা যাক—

হয়তো বা আমাকেও তবে
অন্তরের ক্ষমাহীন তিলোত্তমা, রূপের বাস্তবে
ধরা দেবে একদিন— শুধু যদি অপেক্ষার ধৈর্য না ফুরায়।

বনফুল— এবার আমি একটু বলি :

কল্পনা জাল অল্প না জেনো
নাহিক গণ্ডি পরিধি তার
অবাংমানসগোচরও তাহাতে
ধরা পড়ে যায় বারংবার।

তারাশঙ্কর— এবার শরদিন্দু তুমি বল।

শরদিন্দু— আমি তো কবি নই, তবু বলছি, যে রাইকিশোরী চোখে ভাসছে—

দুকূলবাস উজল ভাস দলিত হরিতাল
জবার ফুল চরণ মূল নীল তনু তমাল
বদনে হাস মৃদুপ্রকাশ রভস নিমগন।
আমার বুক আলো করুক এমন কোন জন।

তারাশঙ্কর— বলিহারি, বুকটা জুড়িয়ে গেল হে। বাঃ বাঃ। মানিকের কাছ থেকে কিছু?

মানিক— তাইতো কবিতায় বলতে হবে, তাও আবার বুকের কথা, দেখা যাক :

স্নিগ্ধ ছায়া ফেলে সে দাঁড়ায়
আমারে পোড়ায় তবু উত্তপ্ত নিশ্বাসে
গৃহাঙ্গনে মরীচিকা আনে।
বক্ষরিক্ত তার মমতায়,
এ জীবনে জীবনের এল না আভাস
বিবর্ণ বিশীর্ণ মরুতৃণে।

[সকলে খানিকক্ষণ চুপ করে থাকলেন]

তারাশঙ্কর— আচ্ছা, এবার একটা নতুন খেলা। আমাদের ফেলে রেখে আসা কোন চরিত্রটির জন্য আমাদের মন আজও আকুলি করে। মানিক শুরু করুন। মনে রাখবেন এ আমাদের সাহিত্য আলোচনা নয়। জীবনকথা আলোচনা।

মানিক— কুসুম। সে কেন আরেকটু অপেক্ষা করল না।

তারাশঙ্কর— বসন। পেয়ে গিয়েছিল প্রায়— পেল না।

বনফুল— ডানা। গৈরিকবাসা মেয়েটিকে আজও খুঁজি।

বিভূতিভূষণ— দুর্গা— তার রেলগাড়ি দেখার সাধ মিটল না।

শরদিন্দু— 'একূল ওকূল' গল্পের সাধুচরণ। তার শেষ গৃহত্যাগে তার বউও বাধা দিলনা বলে।

সতীনাথ— ঢোঁড়াই, জেল থেকে ছাড়া পেয়ে সে কোথায় যাবে?

সমরেশ— রামকিঙ্কর, আমি যে শেষ করে আসতে পারলাম না।

বনফুল— আমরা আমাদের ভূমিকা যথাসাধ্য পালন করে চলে এসেছি। এখন যারা লিখছেন তাঁদের জন্য থাকল আমাদের শুভেচ্ছা। তাঁদের পটভূমিকা অন্য, কিন্তু ভূমিকায় কোনো অমিল নেই। যখন আমরা লেখা শুরু করেছি তখনও রবীন্দ্রনাথ সম্মুখে দীপ্যমান, আমরা এখানে সমবেত সকলে পৃথক পৃথকভাবে তাঁর স্নেহধন্য। তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা পেয়েছি বলেই আমরা কেউ গ্রন্থবণিক হতে চাইনি, সরস্বতীকে ক্যাবারেতে নিয়ে গিয়ে নাচাতে চাইনি।

বিভূতিভূষণ— কথাগুলি যেন চেনা চেনা লাগছে।

তারাশঙ্কর— কেউ বলেছিল তোমাকে প্রশংসা করতে করতে। না বললেও বলা উচিত ছিল।

[এমন সময় এক ধুতি পাঞ্জাবী পরা অতীব বর্ষীয়ান ব্যক্তি প্রবেশ করলেন।]

বিভূতিভূষণ— মনে হচ্ছে রিপন কলেজে পড়বার সময় সিঁড়ি দিয়ে নামছি... নামছি... নীরদ না?

নবাগত ভদ্রলোক— হ্যাঁ, আমি নীরদ সি চৌধুরী। যদিও পয়তাল্লিশ সালের পরের কোনো বাংলা বই পড়িনি। তবু মনে হল এটাই আমার জায়গা। আর কোথা যাব?

বিভূতিভূষণ— দেখ হে নীরদ, ইনি জীবনানন্দ ইনিও আমার মতো 'ওম' শব্দটি বর্জনীয় ভাবেন নি। [নীরদ সি চৌধুরী ত্যাগ করলেন]

বনফুল— এঁর জন্মশতবার্ষিকী হচ্ছে না?

তারাশঙ্কর— ওঁর আর শতবার্ষিকী কী? উনি তো নিজেই শতবর্ষ পার করে দিয়ে এলেন।

সমবেত হাস্যে সকলে— স্বাগতম-সুস্বাগতম।

মোড়ল পঞ্চায়েৎ

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের কথা।

ঝগড়াটা শেষ পর্যন্ত তুমুল হইয়া সমস্ত গ্রামের মধ্যে একটা বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দিল। কারণ সামান্যই এবং আশ্চর্যের কথা এই যে, যাহাকে লইয়া ঝগড়ার সূত্রপাত, সে এই বিবদমান দুই দলের কোন দলেরই অন্তর্ভুক্ত হইল না। সে আপনার ঘরে পরম পরিতৃপ্তির সহিত কাপড় জামা সিদ্ধ করিয়া পরিষ্কার করিতেছিল, — কাল রথের মেলা, সে মেলা দেখিতে যাইবে। রথের দিন চাষীদের হলকর্ষণ নিষিদ্ধ। এই দিনটিতে বহুকাল হইতেই চাষীরা সকলে মিলিত হইয়া আপন আপন বাড়ীর পাশের জল-নিকাশী নালা পরিষ্কার করিয়া কাটিয়া মাঠের মূল নালার সহিত যোগ করিয়া দেয়, মাঠের নালা গভীর করিয়া কাটে, সিচের পুষ্করিণীর মুখের ভাঙন মেরামত করে, নদীর বন্যা প্রবেশের পথরোধ করিয়া বাঁধের গায়ে মাটি ধরাইয়া বাঁধটাকে শক্ত করিয়া তুলিয়া থাকে। পুরুষানুক্রমে চাষীরা এই নিয়ম পালন করিয়া আসিতেছে। আজ তিন বৎসর সেই নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া আসিতেছিল একা কৃষ্ণমোহন। সে এ সবের মধ্যে যোগ দেয় নাই। রথের দিন সকাল হইতেই তাহাকে পাওয়া যাইত না। ভোর না হইতেই সে চার ক্রোশ দূরবর্তী রামনগরের রথের মেলায় রওনা হইয়া যাইত। এবার তাহাকে গ্রামের লোকে আগে হইতেই চাপিয়া ধরিয়াছিল, কিন্তু সে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিয়াছে, হ'ল আর না হ'ল আমার কচু; সম্বচ্ছর পরে রথের মেলা একদিন, মেলায় না গেলে আমার হবে না। সমস্ত গ্রামের লোকের মুখের উপর আঠারো বছরের একটা ছোঁড়ার এই উত্তর শুনিয়া সকলে অবাক হইয়া গেল। তবে কৃষ্ণমোহনের ভাগ্য যে, ইহার মধ্যে প্রধান মণ্ডল-মহেশ্বর ছিল না। কেনারাম পাঠশালার পণ্ডিত, সে বলিল, এও তো বছরে একদিন।

উত্তর হইল, বেশ তো, তোমরা কর গে।

— আর তুমি?

আমি মেলা দেখতে যাব। গান বাজনার আসর হবে, ওস্তাদ আসবে।

— বাধা দিয়া কেনারাম বলিল, আর গাঁয়ে যখন বান আসবে?

তখন গাছে চ'ড়ে ব'সে থাকব— না হয় সাঁতার দিয়ে ডাঙ্গায় গিয়ে উঠব।

এমন উত্তরের প্রত্যুত্তরে জোর ছাড়া যুক্তি চলে না। কাজেই সকলে সমস্বরে বলিল, চালাকী রাখ তুমি কেষ্ট। একঘরে করব তোমাকে।

কেষ্ট বলিল, বেশী চেঁচামেচি করবি তো পুলিসে খবর দোব আমি, আমার ঘর চড়াও হয়ে মারতে এসেছ সব। দোব একনম্বর ফৌজদারী ঠুকে।

যুক্তি শক্তি দুইয়েরই ফুরাইয়া সকলে ফিরিয়া আসিয়া নিজেদের মধ্যে কলহ বাধাইয়া তুলিল। প্রধান মণ্ডল মহেশ্বরের অনুপস্থিতিতে তাহারাই আসর জমাইয়া বসেন। একদল বলিল, একজন না করলে কি করা যাবে— সবাই মিলে ওর কাজটা না হয়—

— বাধা দিয়া কেনারাম বলিল, বেশ, তবে আমিও করব না, আমারটাও তোমরা ক'রে দিও।

আঃ সবাই ওই বললে কি চলে? মনে কর কেষ্টা কানা খোঁড়া— মরে গিয়েছে।

— বেশ আমিও কানা খোঁড়া, আমিও ম'রে গিয়েছি।

ক্রমশঃ বিবাদ তুমুল হইতে তুমুলতম হইয়া উঠিয়া শেষ হইল। সিদ্ধান্ত হইল— মরুক সকলে পচিয়া, তাহাতে কাহারও কিছু আসিয়া যায় না।

প্রধান মণ্ডল মহেশ্বর রথের দিন প্রাতঃকালেই ফিরিয়া সমস্ত শুনিয়া অত্যন্ত অপ্রসন্ন মুখে আপন বহির্বাটীর দাওয়ায় বসিয়া তামাক খাইতেছিল। কিছুক্ষণ পরেই কেনারাম আসিয়া দাবী করিল, ধর্ম্মগোলা টোলা আমি বুঝি না মোড়ল, আমার ভাগের ধান আমাকে ফেলে দাও। আমি তোমাদের ধান নোবও না, দোবও না।

পঞ্চায়েতের প্রধান মহেশ্বর মণ্ডল অবাক হইয়া গেল। কতকাল হইতে এই গোলা চলিয়া আসিতেছে— কেহ কোন কালে এমন দাবী করে নাই, আজ সেই জিনিস উঠিয়া যাইবে। সে একেবারেই অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া বলিল, বেরো বলছি, নইলে ঠেঙিয়ে তোর মাথা ভাঙব আমি।

বহুকাল হইতে গ্রামের সরকারী গোলায় সাধারণের ধান সঞ্চিত হইয়া আসিতেছে। প্রত্যেক গৃহস্থ বৎসরে হাল-পিছু এক আড়ি-দশ সের-ধান চাঁদা দিয়া থাকে। এবং বর্ষায় অনটনের সময় যাহাদের অভাব ঘটে তাহারা এই গোলা হইতে প্রয়োজন মত ধান ধার লয়। ফসল উঠিলে নামমাত্র সুদসহ ধানটা শোধ করিতে হয়। সেই অল্প সুদ জমিয়া আজ গোলাটা একটি সুবৃহৎ ধানের গোলায় পরিণত হইয়াছে। সেই গোলা ভাঙিয়া যাইবে কল্পনায় মহেশ মণ্ডল একেবারে পাগল হইয়া উঠিল। কেনারাম বৃদ্ধ মণ্ডলের সে মূর্ত্তি দেখিয়া ভয়ে পলাইয়া গেল।

মণ্ডল মাথায় হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতেছিল ওই কেষ্টার কথা। হতভাগা ছেলেটাকে কিছুতেই বশে আনিবার উপায় নেই। ভাল ঘর— ভাল লোকের ছেলে— কেষ্টর বাপ নগেন্দ্র তাহার বন্ধু ছিল— নগেন্দ্রর জোত-জমা গ্রামের শ্রেষ্ঠ জোত-জমার একাংশ। নগেন্দ্র যখন মারা যায় তখন সে-ই নিজে বিষয় সম্পত্তির তালিকা করিয়াছে; দুইটা প্রকাণ্ড হামারে চাল পর্য্যন্ত ধান বোঝাই হইয়াছিল। নগদ পাঁচশত টাকা মজুত ছিল। আর আজ এই তিন বৎসরের মধ্যেই কেষ্ট সমস্ত মজুত

নষ্ট করিয়া শতখানেক টাকা দেনাও নাকি করিয়া ফেলিয়াছে। গত বৎসরের মত বর্ষাতেও তাহার সকল জমি আবাদ হয় নাই। নিজে হাতে চাষ পর্য্যন্ত সে করে না— জমিগুলি ভাগে দিয়া যাত্রার দল, গানের আসর— এই করিয়া ফেরে। কেষ্টর গলাটি কিন্তু ভাল-গানেও বেশ দখল আছে ছোকরার, বাঁশের বাঁশী যা বাজায় হতভাগা, — শুনিতে শুনিতে হাতের কাজ থামিয়া যায়। আর ছেলেটার ফুটফুটে চেহারাখানিও কি মিষ্টি, কেষ্টাই যত অনিষ্টের মূল। প্রয়োজন হইলে পতিতই করিতে হইবে তাহাকে। একা তাহার জন্য তো সমস্ত গ্রামটাকে নষ্ট করা যায় না। ছেলেটা নাকি মদ পর্য্যন্ত ধরিয়াছে। বাড়ীতে গোপনে মদও চোলাই করে।

ঠিক এই সময়েই কেনারাম আবার আসিয়া উপস্থিত হইল। এবার আর সে একা নয়, তাহার পশ্চাতে তাহার দলবল সমস্ত।

— আমরা সবাই ধান ফেরত নোব। না দাও, আমরা জোর করে গোলা ভেঙে আপন আপন ধান যে যার নিয়ে চ'লে যাব।

একটা ছোকরা ভিড়ের মধ্যে আত্মগোপন করিয়া হিন্দীতে বলিয়া উঠিল— আবি ফেকো হামলোগকা ধান। গোলা ফোলা ফোলা— নেহি মাংতা হ্যায় হামি লোক।

*　　　*　　　*

হিন্দী বাত শুনিয়া মহেশ্বরের যেটুকু ধৈর্য্য ছিল, সেও আর রহিল না, মাথায় যেন আগুন জ্বলিয়া উঠিল। সে লাফ দিয়া উঠিয়া আপনার তৈলপক্ব বাঁশের লাঠিগাছটা লইয়া বন বন শব্দে ঘুরাইতে ঘুরাইতে হাঁক দিল, আও আও বেটারা, ধান কোন্ লেগা আও।

জনতা প্রথমটা স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু কয়েকমুহূর্তের পরেই তাহারাও চীৎকার করিয়া উঠিল, নিয়ে আয় লাঠি।

মহেশ্বর হাঁকিল, পেল্লাদে, ওরে হারামজাদা পেল্লাদে।

প্রহ্লাদ বাগ্দী মহেশ্বরের কৃষাণ— নাম করা প্রসিদ্ধ লাঠিয়াল— লোকে বলে প্রহ্লাদ ডাকাতের দলের সর্দ্দার।

— ওরে বেটা হারামজাদা বাগ্দী।

কৃষ্ণকায় হিংস্র শিকারী পশুর মত স্থূলতাবর্জ্জিত অথচ সবলপেশী দীর্ঘাকৃতি প্রহ্লাদ আসিয়া বলিল, বাড়ীকে যাও বাপু তুমি, মা বেটীতে যে ঝগড়া লেগেছে।

মহেশ্বর ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তাহার হাতে লাঠিগাছটা দিয়া বলিল, ধর, যে বেটা ফ্যাট্ ফ্যাট করবে, এক বাড়িতে তার মাথাটা ফাটিয়ে দিবি। আর পাঁচনগাছটা কোথা?

লাঠিগাছটা ধরিয়া বেশ আরাম করিয়া দরজার ঠেস দিয়া বসিয়া প্রহ্লাদ বলিল, ওই গরুর চালায় গোঁজা রইছে দেখ।

মহেশ্বর পাঁচন অর্থাৎ গরু ঠেঙানো হাতখানেক লম্বা লাঠিগাছটা টানিয়া

বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। বাড়ীর মধ্যে মহেশ্বরের স্ত্রী ও কন্যার মধ্যে তুমুল কলহ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। মহেশ্বর কারণ অনুসন্ধান করিল না, দোষগুণের বিচার করিল না, একেবারে উভয়ের মধ্যে পড়িয়া ইহাকে একদিকে— উহাকে অপর দিকে ঠেলিয়া দিয়া মাটির উপর পাঁচনের একটা আঘাত করিয়া বলিল, যে চেঁচাবে বাড়িয়ে তার দাঁত ভেঙে দোব আমি।

মেয়ে কিন্তু মানিল না, সে বাপকেই বলিয়া উঠিল, এঃ দাঁত ভেঙে দেবে। দোষ নাই, ঘাট নাই— দাঁত ভেঙে দেবে। আপন পরিবারকে শাসন কর গিয়ে।

মহেশ হুঙ্কার দিল, এই দেখ জগা।

ওদিক হইতে মা এবার বলিল, ওই দেখ কেনে— মেয়ের কথার ছিরি দেখ কেনে। বাপের সঙ্গে চোপা দেখ।

মহেশ হুঙ্কার দিল, এ্যাও।

মেয়ের মা কিন্তু ভয় পাইল না; সে বলিল, তোমার আদরেই তো মেয়ের এমন স্বভাব হ'ল। বেধব্য হবে— বেধবা হবার ভয়ে মেয়েকে চোদ্দ বছরের ধাড়ী ক'রে রেখেছ; দাও এখন— মেয়ের ঠেলা দাও। তুমিই যত নষ্টের মূল।

মহেশ চটিয়া লাল হইয়া উঠিল, আমি? মুখ তোর ছেঁচে দোব আমি। তোর মত কুঁদুলীর পেটের জাত আবার হবে কেমন শুনি? নিমগাছে কি আম ধরে নাকি? শোন গা গাঁয়ের লোক কি বলে। আমি তাই তোকে ভাত দিয়েছি।

মাতা পিতার মধ্যে কলহ বাধিবার উপক্রম হইতেই মেয়ে জগা বা জগদ্ধাত্রী সরিয়া পড়িয়াছিল। জগার মা মহেশের কথায় তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিল— মহেশের মুখের কাছে দুইটা হাত নাড়িয়া বলিল, কি বল্‌লি— কি বল্‌লি বুড়ো— নেমখারাম? মুখে পোকা পড়বে তোর। বলি ঘর তোর ছিল না কিনা, ভাতই ছিল তোর? মদ খেয়ে—

মহেশ হাসিয়া ফেলিয়া বাধা দিয়া বলিল, আর থাম বাপু, মেয়ে রয়েছে ঘরে।— বলিয়া কিন্তু নিজেই আবার সমজদারের মত ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বরে বলিল, হ্যাঁ বটে— তা বাঘ বশ করা মেয়ে বটে তুমি।

জগার মাও হাসিয়া বলিল, বাঘ। বাঘ না ভেড়া?

মহেশ বলিল, ভেড়া হলেও লড়ুয়ে মেড়া।

জগার মা বলিল, ও সব হাসি-তামাসা নয়। মেয়েকে শাসন কর। এইবার বিয়ে দাও। চোদ্দ বছরের মেয়ে, ভাবনাও তো নাই তোমার?

মহেশ ডাকিল, জগা, তামাক সাজ একবার।

জগার মা বিরক্ত হইয়া বলিল, বলি কানে শুনতে পাও না নাকি? গাঁয়ের লোকে যে নিন্দে করছে।

মহেশ বিরক্ত হইয়া বলিল, করুক। আমার ওই একটা মেয়ে পুঁজি— নিন্দের ভয়ে আমি বেধবা করব নাকি?

বলি ওরে হাঁদা মিন্‌সে, সে ফাঁড়া তো তিন মা— স হ'ল কেটে গিয়েছে।

— যাক। আমি কি যার তার হাতে মেয়ে দোব নাকি? আর বিয়ে দিলেই তো বেটারা গলায় গামছা দিয়ে নিয়ে যাবে।

তবে থাক তুই, পচে মর, আমি কালই জগাকে নিয়ে বাপের বাড়ি চ'লে যাব, সেখান থেকে জগার বিয়ে দোব।

মহেশ বিরক্ত হইয়া বাহির হইয়া গেল। সেখানে তখনও কয়জন মাতব্বর বসিয়া তাহার অপেক্ষা করিতেছিল। দেখিয়া মহেশ্বরের সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল। বাড়ীতে জ্বালা-বাহিরে জ্বালা— এ যেন তাহাকে পুড়াইয়া মারিবার বন্দোবস্ত করিয়াছে। সে প্রতীক্ষমান ব্যক্তিদের সহিত বাক্যালাপ পর্য্যন্ত না করিয়া একেবারে রাস্তায় নামিয়া পড়িল— সে মাঠে অথবা শ্মশানে গিয়া বসিয়া থাকিবে।

একজন বলিল, আমরা যে ব'সে আছি মোড়ল।

মহেশ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, কানা তো নই— চোখে তো দেখতে পাই আমি।

কোথা চললে এখন?

তোমাদের জ্বালায় আমি গাঁ ছেড়ে পালাচ্ছি।

তা আমরা কি করব বাপু? আমাদের দোষ কি বল? তুমি কেষ্টাকে শাসন্ করতে পারছ না, আমাদের উপর রাগছ। তাকে শাসন কর দেখি।

মোড়ল এবার ফিরিয়া আসিয়া বলিল, কাল সব সনজে বেলাতে এস। সে আসুক, কথা না শুনলে তাকে পতিত করব।

এ কথায় সকলে পরিতুষ্ট হইয়া উঠিল। মোড়ল বলিল, পেল্লাদে, বাড়ীতে বল গিয়ে গুড়ের সরবত করতে— আর গোটা তিনেক কল্‌কেতে তামুক সাজ।

* * *

পরদিন প্রাতঃকালেই মহেশ্বর প্রহ্লাদকে বলিল, ডেকে নিয়ে আয় তো নগেন্দের বেটা কেষ্টাকে। বলবি, মোড়ল ডাকছে। এখুনি আসতে হবে।

প্রহ্লাদ চলিয়া গেলে মহেশ হুঁকা টানিতে টানিতে আকাশের দিকে চাহিয়া চিন্তিত হইয়া উঠিল। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছে। বাতাসও বহিতেছে নৈঋত কোণ হইতে, জল নামিল বলিয়া। হয়তো বা আজই জল নামিয়া যাইবে। অথচ এখনও গ্রামের নালা কাটা হইল না, মাঠের নালাও মজিয়া আছে। জল হইলে গ্রাম ভাসানো জল এক বিন্দু মাঠে যাইবে না। ও পাশ দিয়া নদীতে গিয়া পড়িবে। অথচ এ জলটার মত উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিতে নদীর পলিতেও পারে না। সমস্ত গ্রামধোয়া আবর্জ্জনা-গোলাজল। মহেশ্বরের আক্ষেপ রাখিবার আর ঠাঁই ছিল না।

প্রহ্লাদ একা ফিরিয়া আসিয়া বলিল, সে এলো না।

এলো না? মহেশ্বর চোখ রাঙা করিয়া বলিল, বেটার টুঁটীতে ধ'রে নিয়ে আসতে পারলি না?

কোটার উপর খিল দিয়ে ঘুমুচ্ছে তা টুঁটীতে ধরব কি ক'রে আমি? বললাম তো বললে— আমি যাব না যা। তোর মোড়লকে আসতে বল গে।

আচ্ছা চল। মহেশ্বর নিজেই উঠিয়া দাঁড়াইল।

কেষ্টমোহনের বাড়ীতে আসিয়া মহেশ্বরের চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। সেই বাড়ী এই হইয়াছে। সে ডাকিল, কেষ্ট।

কেষ্ট সচকিত হইয়া তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিল; সে মুখে বলিলেও মহেশ মণ্ডল সত্য সত্যই নিজে আসিবে এ কল্পনা করে নাই। মহেশ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, এসব হচ্ছে কি তোর দিন দিন?

কেষ্ট প্রশ্ন করিল, কি?

এই বাড়ীঘরের অবস্থা। তুই না কি দেনা করেছিস?

কেষ্ট চুপ করিয়া রহিল। মহেশ্বর বলিল, হাল ঘুচিয়েছিস কেন?

কেষ্ট নীরব। মহেশ্বরের ক্রোধ হইয়া গেল— সে বলিল, বেটা চাষার ঘরের মুখ্যু-গোঁয়ার উচ্ছন্নে যেতে বসেছ তুমি?

কেষ্ট এবার বলিল, সে আমি যাই করি তোমাদের কি?

তোমাদের কি? মহেশ গর্জ্জন করিয়া উঠিল; কি বল্লি?

কেষ্ট বলিল, কেনে মারবে নাকি তুমি? আর সে আইন নাই কোম্পানীর রাজত্বে।

আইন? মহেশ হতভম্ব হইয়া গেল, কিছুক্ষণ পরে বলিল, নালা কাটতে এস নাই কেন তুমি?

উ আমি পারব না। কোদাল পাড়তে আমি পারব না।

চাষার ছেলে কোদাল পাড়তে পারবি না? তা হ'লে এ গাঁয়ে থাকা চলবে না তোমার।

আমি তোমাদের গায়ে থাকব না বাপু। আজই আমি চ'লে যাব। যাত্রার দলে আমাকে মাইনে দেবে— খেতে দেবে।

তোমার জমি— বলি জমি তো থাকবে হে বাপু; জমিতে জল যাবার নালা চাই না?

এবার হুকুম করিয়া মহেশ বলিল, এই দেখ কেষ্টা, ও সব বদ মতলব ছাড়। ও সব হবে না।

কেষ্ট উদ্ধত-স্বরে উত্তর দিল, তোমার হুকুমে না কি?

আলবৎ আমার হুকুমে।

অঃ রাজা মহারাজা এলেন আমার। যাও তোমার হুকুম মানি না আমি। কেষ্ট ঘরের ভিতর প্রবেশের উদ্যোগ করিতেছিল, মহেশ দুর্দ্দান্ত ক্রোধে বলিল, ধর তো পেহ্লাদে— হারামজাদাকে।

প্রহ্লাদ খপ করিয়া কেষ্টর হাতখানা ধরিয়া ফেলিল। মহেশ বলিল, নে বেটাকে

চ্যাংদোলা ক'রে তুলে নিয়ে আয়। ওর কালদমনের সং সাজা আজ বার করবো।

অবলীলাক্রমে শিশুর মতোই চ্যাংদোলা করিয়া প্রহ্লাদ কেষ্টাকে তুলিয়া লইল। কেষ্ট কোন আপত্তি করিল না; বলিল, দেখি, তোমাদের ক্ষমতাই দেখি। চল নিয়ে চল।

আপন বহির্বাটীতে আসিয়া মহেশ বলিল, বাঁধ বেটাকে খুঁটির সঙ্গে বাঁধ।

কেষ্ট হাত দুইটা বাড়াইয়া দিয়া বলিল, নাও বাঁধ, বেঁধেই কতক্ষণ রাখ দেখি। ছাড়তে তো হবেই— চিরকাল তো বেঁধে রাখতে পারবে না। আজই আমি গাঁ থেকে পালাব।

একটা দুগ্ধপোষ্য শিশুর কাছে এমনভাবে পরাভূত হইয়া মহেশের ক্রোধের আর অন্ত রহিল না; সে বলিল, আন তো পেহ্লাদ, একগাছা কঞ্চি ভেঙে।

কঞ্চিগাছটা হাতে করিয়া মহেশের আর প্রহার করা হইল না, কঞ্চি হাতেই সে দ্রুতপদে বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেল। বাড়ীর মধ্যে ঝগড়া বাঁধিয়াছে। যাইবার সময় বলিল, পুরে রাখ বেটাকে ওই ঘরের ভেতর।

প্রহ্লাদ আজ্ঞাবাহী ভৃত্য, কেষ্টকে এক ঠেলায় ঘরের মধ্যে ঠেলিয়া দিয়া দরজায় শিকল তুলিয়া দিল।

*　　　　*　　　　*

ঘণ্টা দুয়েক পরেই নিত্যানন্দ পাল আসিয়া বলিল, কি গো দাদা, বলি এত জোর তলব কিসের?

মহেশ বলিল, জগাতে আর জগার মায়ে ঝগড়া করে লক্ষ্মী ছাড়াবে আমার, মাথা খারাপ ক'রে দেবে। তাই আকাট দিব্যি করেছি জগার আজই বিয়ে দোব আমি। জামাই থাকলে তবু হারামজাদী শাসনে থাকবে।

নিত্যানন্দ হাসিয়া বলিল, আজই কি বিয়ে হয় নাকি?

মহেশ বলিল, দিব্যি করেছি তা নইলে যোগী মণ্ডলের ছেলেই নই আমি।

পাত্র?

নগেন্দ্রের বেটা কেষ্টমোহন। কেষ্টা— কেষ্টা হে। পুরে রেখেছি বেটাকে ঘরের ভেতর। বেটা বলে কি— বেঁধেই বা কতক্ষণ রাখ দেখি? ছেড়ে তো দিতে হবে। মতলব করেছে কি জান? জমিজমা বেচে যাত্রার দলে যাবে— গাঁ ছেড়ে যাবে। যা— এইবার।

নিত্যানন্দ স্বীকার করিল, দেখতে শুনতে কেষ্ট পাত্র ভালই— বংশও ভাল, সম্পত্তিও ভাল, কিন্তু, —

মহেশ চোখ টিপিয়া বলিল, ও কিন্তু টিন্তু নাই ভাই, জগার মায়ের বেটী জগা— জগার মা আমাদের বাঘ-বশ-করা মেয়ে। বুঝেছ কেষ্টা বেটাও জব্দ হ'ল— মেয়ে-জামাইও আমার কাছে থাকবে।

বাহিরে ইতিমধ্যে ঢোলের সঙ্গে সানাই বাজিয়া উঠিয়াছে। মহেশ বলিল, লেগে

যাও ভাই, কোমর বেঁধে। আর গাঁয়ের সব মজুরদের নালা কাটতে লাগিয়ে দাও। এবারকার খরচ কেষ্টার, ওই বেটাকেই জরিমানা দিতে হবে।

['মোড়ল-পঞ্চায়েত' গল্পপ্রসঙ্গে : তারকচন্দ্র রায়ের সম্পাদনায় ১৩২৫ সালের (১৯২৮) শ্রাবণমাসে 'ভাণ্ডার' পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে। এ পত্রিকার মর্মবাণী হল 'সমবায় দর্শন'; বেশীর ভাগ লেখাই ছিল সে সম্পর্কিত; প্রবন্ধ-ছোটগল্প-কবিতা-গান প্রায় সবই একই উদ্বেজনায় অনুস্যূত।

স্বদেশপ্রেমেরই এক উপজাত ও পরিশ্রুত ভাবনা হল 'সমবায় দর্শন'। অসহায়, বিচ্ছিন্ন ও দারিদ্র্যক্লিষ্ট মানুষজনকে সমবাবের মন্ত্র নূতন আশার পথ দেখায়। স্বভাবতই মনে আসে বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটকের গাঁতায় খাটাব প্রসঙ্গ বা সমবায-সংক্রান্ত রবীন্দ্রনাথের নানাবিধ রচনার কথা; স্মর্তব্য এই 'ভাণ্ডারে'র প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যার প্রথম রচনাটিই রবীন্দ্রনাথের— 'সমবায়'।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যজীবনের সূচনার গুরুত্বপূর্ণ পটভূমিকাই হল স্বদেশভাবনা। তারপর বিভিন্ন ঘটনার সঙ্গে দেশের আর্থিক উন্নয়ন প্রচেষ্টা, সমবায়-দর্শনও তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির পটভূমি রচনা করেছে। পল্লীর কাজে তিনি একদা নিজেকে সমর্পণও করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় নিজেব 'আত্মার বাণী' শুনেই তাঁর গোত্রান্তর— "এইসব মূঢ় ম্লান মূক মুখে/দিতে হবে ভাবা, এই-সব শ্রান্ত ভগ্ন বুকে/ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা।" শ্রীনিকেতনে এক 'পল্লী-কর্মী-সম্মেলনে' আমন্ত্রিত তারাশঙ্করকে প্রথম সাক্ষাতেই রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন "গ্রামকে গড়ে তোল নইলে ভারতবর্ষ বাঁচবে না"। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য তারাশঙ্করের 'রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার পল্লী' গ্রন্থটি।

এই সমস্ত ভাবনা এবং আলোচ্য 'ভাণ্ডার' পত্রিকার মূলভাবকে অন্তরঙ্গ সূত্রে গ্রথিত করে সাময়িক প্রয়োজনেই তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন 'মোড়ল-পঞ্চায়েৎ' নামক ছোটগল্পটি। 'ভাণ্ডার' পত্রিকার (সম্পাদক নাট্যকার মন্মথ রায়) বিংশ বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যায় তা (জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫, পৃ. ২৭-৩২) প্রকাশিত হয়। গল্পটি তারাশঙ্করের কোনো গ্রন্থে বা বচনাবলীতে এখনও পর্যন্ত সংকলিত হয় নি। পত্রিকায প্রকাশের সময় লেখার সঙ্গে অনেকগুলি চিত্র ছিল, ছবিগুলি এঁকেছিলেন জনৈক এস দত্ত। মূল গল্পের বানানই এখানে বজায় রাখা হল।

সংকলক : প্রত্যুষকুমার রীত]

জীবিত ও মৃত

জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়

মহারাণী,

চিরকাল তোমাকে একান্তে যে-নামে সম্বোধন করেছি, সেই নামেই আজও করলাম, অপরাধ নিও না। জানি, এ চিঠি পেয়ে, তুমি রাগ করবে, আগেও করেছ অনেকবার, এখন ত করবেই। যে-স্বামীর সহধর্মিণী তুমি, পুত্র-কন্যা-পুত্রবধু নিয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত, সব অর্থেই সুসমৃদ্ধ যে-পরিবারের কর্ত্রী তুমি, আমার মতো মানুষের কাছ থেকে চিঠি পেলে তোমার অসুবিধা হয়, হতেই পারে। রাগও করতেই পারো। কিন্তু আমার যে উপায় নেই। তুমি ছাড়া এ জীবনে আমার আর কেউ নেই, যাকে আমি আমার সব কথা বলতে পারি।... কেহ নাই, কিছু নাই— গো! মনে আছে গানটা? নাকি সবই গেছ ভুলে?

ভুলে গিয়ে থাকলে তোমাকে দোষ দেব না। সেসব কবেকার কথা, কত যুগ পার হয়ে গেছে তারপর। তারপর কত কিছু ঘটে গেছে আমাদের সকলের জীবনে, এ দেশে, বিদেশে, সারা পৃথিবীতে। তোমার জীবনে তো বটেই। শ্যামপুকুরের নোনাধরা দেওয়ালের সেই বাড়ি থেকে দিল্লীর কুতুব কনক্লেভ। এ দুই জগৎ কি একই গ্রহের? ভুলে ত যেতেই পারো।

কিন্তু আমার মুশকিল ত জানো তুমি। কিছুই ভুলি না আমি। ভুলতে পারি না। মনে হয় সবই যেন কাল কি পরশুর কথা। সবাই মিলে চেষ্টা করলে হাত বাড়িয়ে আবার ছুঁয়ে দেওয়া যাবে সব।

বিজয়া বলে, আমি নাকি বর্তমানে বাস করি না, অতীতেই থাকি। হয়ত ঠিকই বলে। হয়ত আমি সত্যিই বেঁচে আছি সেইসব দিনের মধ্যে যে সব দিন আমার ভালো লাগত। হয়ত আমি সেই যুগেই থাকি। যে-যুগে আমি মুক্তি পেয়েছিলাম, এমন কি জেলখানায় বসেও তীব্রভাবে অনুভব করতাম মুক্তির বাতাস, সে-বাতাসে গমগম করে ভেসে আসত বটুকদার গান, এসো মুক্ত করো, মুক্ত করো অন্ধকারের এই দ্বার। বুক ফাটিয়ে গাইতাম আমরা। মনে হতো, শুধু মনে হতো না, গভীরভাবেই বিশ্বাস হতো, সত্যিই মুক্তি আসবে, আমরা মুক্ত হবো, অন্ধকার কেটে যাবে নিঃশেষে।

কিন্তু সত্যিই কি আমি সেইসব দিনে বাস করি? অতীতে? কল্পনায়? আমার বানানো জগতে? আমার ভালোলাগার ভালোবাসার, আমার জীবনের কৃতার্থতার জগতে? যে জগত আর সত্য নয়, বাস্তব নয়? তবে তো বিজয়া ঠিকই বলে, তোমার বাবা ছিল পাঁড় মাতাল, আর তুমি বদ্ধ পাগল।

মনে আছে মহারাণী, একসময় তুমিও আমাকে পাগল বলতে? শুধু পাগল নয়,

বিশুপাগল। শম্ভুবাবুরা আই-পি-টি-এ ছেড়ে চলে যাওয়ায় তাঁর ওপর আমাদের খুব রাগ ছিল। প্রতিজ্ঞাও যেন ছিল, ওঁর মুখ আর দেখব না। তবু শেষ পর্যন্ত যেতেই হয়েছিল রক্তকরবী দেখতে। নিউ এম্পায়ারের অন্ধকারে বারকয়েক তোমার হাত তুমি আমাকে ধরতে দিয়েছিলে। গানগুলোও গাইতে দিয়েছিলে তোমার কানের কাছে গুণগুণ করে। বেরিয়ে এসে আমরা গিয়েছিলাম গঙ্গার ধারে। সেখানে বসেই তুমি আমাকে প্রথম বলেছিলে, বিশুপাগল।

আমি পাগলই, সত্যিই পাগল! নইলে আজ এখন, এই অবস্থায় গঙ্গা থেকে ফিরে এসে সেদিনের সেই গঙ্গার কথা, সেই সন্ধ্যার কথা কেমন করে লিখছি তোমাকে? একটু আগে আমার পুত্রবধূ চন্দ্রিমাকে পুড়িয়ে, তার শরীরের ছাই গঙ্গায় দিয়ে এলাম। চন্দ্রিমা আত্মহত্যা করেছিল।

বিজয়া ওঘরে উপুড় হয়ে পড়ে আছে বিছানায়, ঘর অন্ধকার করে। আমার মেয়েরা, ছোট বউ, অন্য আত্মীয়েরা পাশের ঘরে। বাইরের ঘরে বসে আছে ছেলেরা, জামাইরা। যাঁরা আসছেন, সহানুভূতি জানাতে, শোক ভাগ করে নিতে, মজা দেখতে, আসল ব্যাপারটা কী আন্দাজ করতে, তাঁদের সামলাচ্ছে। আমি আমার খাঁচায়, খাটের ওপর টেবল ল্যাম্পটা টেনে নিয়ে চিঠি লিখছি। আমি রিটায়ার করার কিছুদিন পরে সাত ফুট বাই সাড়ে তিন ফুট এই বারান্দাটা ঘিরে ওরা একটা খাঁচা বানিয়ে দিয়েছিল। এ বাড়িতে এলে এইটেই আমার গুহা। গোটা বারান্দা জুড়েই খাট। হামাগুড়ি দিয়েই ঢুকতে হয়। তখন আমার নানা কথা মনে হয়। কখনও মনে হয় আমি পাঁঠা, আমাকে জমিয়ে রাখা হয়েছে সন্ধিপুজোর রাত্রে বলি দেওয়ার জন্যে। কখনও মনে হয় আমি সিংহ, এক হুংকারেই কাত করে দিতে পারি সবাইকে। কখনও মনে হয়, আমি সাপ। বুকেপেটে ভর দিয়ে হিলিহিলিয়ে ঢুকে পড়ছি আমার গর্তে।

মহারাণী, আজ মনে হচ্ছে, এরা আমার সম্বন্ধে যা-ই ভাবুক, আমি পাঁঠা নই। অত লাঠি-গুলি-পুলিশের মার-জেল-বকসা ক্যাম্প পার হয়ে বুক ফুলিয়ে গান গাইতে গাইতে একদিন যে ফিরে আসতে পেরেছিল সে কখনও পাঁঠা হতে পারে? কিন্তু সিংহও নই। এত কাণ্ড ঘটে গেল, তোমার চলে যাওয়া, আমার বিয়ে, বড় ছেলেটার আত্মহত্যা থেকে একেবারে এই শেষ মরণ— চন্দ্রিমার আত্মহত্যা— একবারও তো হুংকার দিয়ে উঠতে পারলাম না। তেমন করে একবারও যদি সেদিন হুংকার দিতে পারতাম, তুমিই কি পারতে চলে যেতে? আর তুমি চলে না গেলে তুমি-আমি দু'জনেই হয়ত অন্যরকম, অন্য কিছু হয়ে উঠতাম, হয়ে যেতাম। এখনও ত আমার চোখে ভাসে দুটি মুখ, শ্রদ্ধানন্দ পার্কের বিশাল জনসভায় শম্ভু মিত্রের আগে তোমরা দুই বোন আবৃত্তি করছ সুকান্ত'র কবিতা। আজও, বিশ্বাস করো মহারাণী, আমার বুকের ভেতর গুমগুম করে বাজে তোমার উদ্ধত ঘোষণা, তা যদি না হয় বুঝব তুমি তো মানুষ নও, গোপনে গোপনে দেশদ্রোহীর পতাকা

বও! আর শম্ভুবাবুর পরেই আমাদের গান। কবিতা আর গান মিলে একটা কিছু হয়ত হতো। হলেও হতে পারত। কিন্তু হয় নি। কিংবা কে জানে হয়ত ভালই হয়েছে। যা মনে হচ্ছে তার উলটোটাও ত হতে পারত। আমরা দুজনই হয়ত দুজনের জীবন মরুভূমি করে দিতাম। তোমার এই সফল জীবনের বদলে তুমি হয়ত পেতে দারিদ্রলাঞ্ছিত এক পীড়িত জীবন। আর আমি বিজয়ার অতিবিষয়ী স্বভাব এবং চতুরতা সত্ত্বেও যেটুকু পাগল থাকতে পেরেছি— সারাজীবনই তো সুযোগ পেলেই, ডাক পেলেই হারমোনিয়াম গলায় ঝুলিয়ে ছুটে গেছি গান গাইতে। ছেলে-মেয়েগুলোর মধ্যে আমার গান ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। বিজয়ার জায়গায় তুমি হলে হয়ত এটুকুও পারতাম না। তোমার তেজ আমাকে ভস্মই করত। অন্তত খর্ব তো করতই। কাজেই, কে জানে, হয়ত যা হয়েছে ভালই হয়েছে।

যাই হোক, দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় বুঝেছি, আমি সিংহ নই। এমনকি সাপও নই। নইলে চন্দ্রিমা মরে গেল, শেষ পর্যন্ত তাকে সত্যিই মরতে হলো, অথচ আমি একবার ফোঁসও করতে পারলাম না। সেই আমি যার গানের গর্জনে দুলে উঠত প্রেসিডেন্সি জেলের দেওয়াল, বকসা ক্যাম্পের পাহাড় কেঁপে কেঁপে উঠত। মহারাণী, চন্দ্রিমা মরে আমাকে বুঝিয়ে দিয়ে গেল, খাঁচায় বন্দী এই জীবটা পাঁঠা নয়, সিংহ নয়, সাপও নয়। সামান্য এক কাপুরুষ বাঙালি। তোমার সেই ঘোষণাই আসলে ঠিক, বুঝব তুমিত মানুষ নও... মানুষ হলে চন্দ্রিমার শেষ কথাগুলো আমাকে আজ সন্ধ্যাতেই গঙ্গার পাড়ে ছাই করে মিশিয়ে দিত তারই সঙ্গে, গঙ্গার জলে। এই খাঁচায়, এই বিছানায়, সেদিনও বোধহয় এই বেডকভারটাই ছিল, আমার দু পায়ের পাতায় মাথা রেখে কেঁদেছিল চন্দ্রিমা। কান্না ফুরোলে সোজা হয়ে বসে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, এ বাড়িতে একমাত্র আপনিই পারেন আমাকে বাঁচাতে। আমাকে বাঁচান বাবা। তখন তার চোখে জল ছিল না। শুকনো, কঠিন, চোখের দুটি গোলক। শুধু দুগালে আঠার মতো এঁটে ছিল অশ্রুর দাগ।

কাল রাত্রে ওরা যখন দড়ি কেটে চন্দ্রিমাকে নামাল, আমি দেখতে যেতে চাই নি, জোর করেই নিয়ে গেল ওরা, অনেকে মিলে ধরাধরি করে, আমি যেন এক মৃতদেহ। গিয়ে দেখি দুই গালে মেয়েটার সেই অশ্রুর দাগ, সেই সন্ধ্যার। অথচ তা দেখেও আমার কিছুই হলো না। আমি আর্তনাদ করে উঠলাম না। আমার চোখে জল এল না। মুখে একটি শব্দও উচ্চারিত হলো না। নির্বিকার কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে এলাম আমার খাঁচায়। এবং মহারাণী, তখনই বুঝলাম, এতকাল যাহোক করে কাটিয়ে দিলেও এখন আমি আর বেঁচে নেই। সেই সন্ধ্যায়, এই খাটে, দুপায়ে চন্দ্রিমার অশ্রু নিয়ে আমার মৃত্যু ঘটে গেছে। তারপর থেকে যে চলে ফিরে বেড়ায় সে আমার মৃতদেহ।

সারা জীবনে আর একবার মাত্র মনে হয়েছিল, আমি মরে যাচ্ছি। লর্ড সিনহা রোডের টর্চার চেম্বারের মৃত্যুর কথা মনে হয় নি। দাঁতে দাঁত চেপে শুধু মনে

হয়েছিল বাঁচতে হবে, বেঁচে থাকতেই হবে যেমন করে হোক। রিভলবারটা লুকিয়ে রেখে এসেছি। বেরিয়ে গিয়ে সেটা উদ্ধার করতে হবে। আত্মগোপন করে থাকা কমরেডদের কাছে ফিরে যেতে হবে। আবার যোগ দিতে হবে মুক্তির লড়াইয়ে। প্রেসিডেন্সী জেল বা বকসা ক্যাম্পে দিনের পর দিন পচতে পচতে মৃত্যুভাবনা কষ্ট দিতে পারে নি। চারপাশে কতজন ছিল। সবাই মিলে একসঙ্গে ছিলাম। রাজনীতির ঝগড়া ছিল, দলাদলি ছিল। তবু একসঙ্গে ছিলাম। একা ছিলাম না। জানতাম বাঁচব। বিশ্বাস ছিল মুক্ত হবো। একদিন মুক্তি পাবো। মুক্তি পেয়েও ছিলাম।

কিন্তু আর-জি-করের টেবিলে অরুণের মৃতদেহের সামনে দাঁড়িয়ে মনে হয়েছিল, আমি মরে যাচ্ছি। মনে হয়েছিল, অরুণ নয়, আমি শুয়ে আছি টেবিলে। ও মৃতদেহ আমার।

আমার বড় ছেলে বলে নয়। অরুণ ছিল আমারই মতো। যেন আমিই। বিজয়া বলত, মাতাল-পাগলের বংশে একটা পাগল ত অন্তত জন্মাবেই। তাই হয়ত জন্মেছিল। অরুণ একটু পাগলই ছিল। পরীক্ষা দিতে দিতে ধুত্তোর বলে উঠে আসত। স্কুল জীবন থেকেই। বেরিয়ে এসে ক্রিকেট খেলতে আরম্ভ করত। কিংবা গান গাইতে গাইতে হাঁটতে হাঁটতেই বাড়ি চলে আসত। কটা বাজল, কত রাত হলো খেয়ালই থাকত না। কলেজে, ভুল পরীক্ষার দিন গিয়ে হাজির হতো হলে। পরীক্ষার হলে যে অধ্যাপকরা পাহারায় থাকতেন তাঁরা একঘণ্টার আগে বেরোতে দেবেন না, এক ঘণ্টা আটক থাকতে হবে, শুনেই মুখ শুকিয়ে যেত। তাঁরা ভাবতেন এই বুঝি কেঁদে ফেলবে। যেন শিশু। বিব্রত অধ্যাপকরা তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে রাখতেন স্টাফ রুমে। সেখানে গান গেয়ে মজিয়ে দিত তাঁদের। এমন যে করে সে কোনও দিন বি.এ. পাশ করতে পারে? পাশটাশের কোনও দামই বোধহয় ছিল না তার কাছে। সে চাইত বাধাবন্ধহীন একটা জীবন। আপন খেয়ালে আর আনন্দে দিন কাটিয়ে দিতে চাইত। আর চাইত গান গাইতে। ঠিক আমার মতো। যেন আমিই। আমিই আর একবার। গাইতও খুব ভালো। খুব ইচ্ছে করত তোমাকে শোনাতে। একবার শুনলে তুমি আর ভুলতে পারতে না, আমি জানি। পাশটাশ করা হয় নি অরুণের। ওর ভাইবোনেরা পটপট পার হয়ে গেল। শুধু ও-ই পড়ে রইল। কিন্তু অরুণ হতাশায় আত্মহত্যা করে নি। গঙ্গার ধারে তাকে যেখানে পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছিল সেখানে তার ঝোলাটাও পাওয়া গিয়েছিল। ঝোলাতে জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, আবোলতাবোল কিছু কাগজপত্র, ওর নিজের লেখা কবিতার খাতা, আরও কিছু টুকিটাকি জিনিসপত্র ছিল। আমি যখন ভেবে কোনও কূলকিনারা পাচ্ছি না, কেন ওর মরতে ইচ্ছে হলো, কেন ও আত্মহত্যা করল। হঠাৎ চোখে পড়ল ওর লেখা একটা নোট। কবিতার খাতার এক পাতায়।

মহারাণী, আমরা চিরকাল জেনে এসেছি, মেনে এসেছি, বলে এসেছি, ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে না। অথচ আমার বেলাতেই ঘটল। আমি তোমার জন্যে

একদিন মরতে গিয়েছিলাম। মরা হয় নি। আমি পারি নি। আমার ছেলে মরতে গিয়েছিল প্রেমের জন্যে। সে পেরে গিয়েছিল। এইটুকুই তফাৎ। আজ, এতদিন পরে এত কথা মনে হচ্ছে, কিন্তু সেদিন, ওর সামনে দাঁড়িয়ে শুধু মনে হয়েছিল, আমি মরে যাচ্ছি। আমি মরে যাবো। আমি মরে গেছি। ওই মৃতদেহ আমার পুত্রের নয়, আমার।

তখনও তোমার কথাই মনে হয়েছিল। পরে, সময়ের কিছু প্রলেপ পড়ার পর, তোমাকে এমনিই একটা চিঠি লিখেছিলাম। সেদিন কারণ ছিল আমার জ্যেষ্ঠপুত্র। না, পুত্র নয়, আসলে আমিই ছিলাম কারণ। কারণ মৃত্যু তো আমারই ঘটেছিল। আর আজ কারণ আমার মধ্যম পুত্রবধূ। না, ভুল হলো, তোমার কাছে তো ভুল বলা যাবে না। আজও কারণ চন্দ্রিমা নয়, আমি। কারণ চন্দ্রিমার মৃত্যুর জন্যে তো আমি দায়ি। সে তো আমার পায়ে মাথা রেখে অশ্রু বিসর্জন করেছিল। বাঁচতে চেয়েছিল। বলেছিল, বাবা, আমাকে বাঁচান। ... আমিই দায়ি। তাই এ মরণ আমারই।

কৈফিয়ৎ দিচ্ছি না, শুধু তোমাকে জানাচ্ছি, আমার কিন্তু মত ছিল না ওদের বিয়েতে। না, প্রেম করে বিয়ে করে নি ওরা। দেখেশুনে, ঝাড়াইবাছাই করে, পছন্দসই মেয়ে বেছে এনেই বিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমি বরুণের বিবাহেরই বিরুদ্ধে ছিলাম।

বরুণ তখন সবে একটা প্রাইভেট স্কুলে ঢুকেছে, দুর্গাপুরে। মেসে থাকে। সামান্য মাইনে, কিন্তু খাটনি খুব, প্রাইভেট স্কুলে যেমন হয়। বিজয়া আমার মত চায় নি। কোনওদিনই, কোনও ব্যাপারেই চায় না। আধপাগলা এক ব্যর্থ মানুষের মতামতের কী-ই বা দাম। প্রেমে ব্যর্থ, রোজগারে ব্যর্থ, সংসারে ব্যর্থ, রাজনীতিতে ব্যর্থ, এমনকি গানেও ব্যর্থ। হয়ত সেইজন্যেই কেউ আমার মত চায় নি। কিন্তু আমি ডেকে ডেকে সবাইকে আমার মত জানিয়েছিলাম। বলেছিলাম, কিছুদিন যাক। বরুণের চাকরিটা পাকা হোক। ততদিনে চন্দ্রিমার জন্যেও দুর্গাপুরে বা ওর কাছাকাছি একটা কাজ খোঁজা যাক। তারপর...

আমার বড় মেয়ে অরুণা শুধু বলেছিল, বাবা ঠিক বলেছে। তাতে ওরই মুখটা গেল। ধুমধাম করেই বিয়ে হলো। বিয়ের আগেই চন্দ্রিমা তার এখানকার চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে দিল। এরাই বলল দিতে। এখানে তো থাকবে না, দুর্গাপুরেই চলে যাবে। কী হবে ও চাকরি দিয়ে? বরং ঘাড়ের ওপর বউ পড়লে বরুণ তাড়াতাড়ি বাসা করবে, চন্দ্রিমাও একটা কিছু পেয়ে যাবে। শিল্পের শহরে পয়সা তো বাতাসে উড়ে উড়ে বেড়ায়, হাত বাড়ালে হাতেও এসে বসে।

বিয়ের পর হানিমুনে গেল ওরা। ফিরল মুখ হাঁড়ি করে। সেই মুখ নিয়েই দুজনে গেল দুর্গাপুরে। সেখান থেকে দিনকয়েকের মধ্যেই চন্দ্রিমা ফিরে এল, একা। বরুণের কোনও খবর নেই।

আমরা তখন, আমি আর বিজয়া, সোনারপুরের বাড়িতে থাকি। পৈতৃক বাড়ির একটা অংশ বিজয়া পেয়েছিল, সেখানে। ঢাকুরিয়ার পুরোনো বাড়িতে থাকে কিরণ আর তার বউ জলি। কিরণ ওর মামাদের ধাত পেয়েছে। চালাকচতুর, খুব স্মার্ট, চোখেমুখে ইংরেজি বলে, বইটই-এর ধার ধারে না। একটা বিদেশী ব্যাংকের অফিসার। তার বউ জলি সরকারি অফিসে কাজ করে। কেরাণী।

সোনারপুরের বাড়িতে আমাদের পাশের ঘরে সারারাত ধরে কথা হলো বিজয়ার সঙ্গেচন্দ্রিমার। আমাকে কেউ কিছু বলল না, জিজ্ঞেসও করল না কিছু শেষ রাত্রে, তখন আলো ফুটতে আরম্ভ করেছে, দরজা খুলে ছিটকে বেরিয়ে এল বিজয়া। ধুড়মুড় করে উঠে বসে দেখি, ওঘরের খাটের ওপর বসে দু'হাতে মুখ ঢেকে কাঁদছে চন্দ্রিমা। সেই তার কান্নার শুরু। বিজয়া আমার সামনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে উঠল, এ মেয়ের সঙ্গে ঘর করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তুমি কিছু করো।

আমার বলতে ইচ্ছে করল, জীবনটা তো প্রায় কেটেই গেল। আর কী হবে ঘর করে? তা ছাড়া কার সঙ্গেই বা ঘর করতে পেরেছ তুমি? মা-মরা ছোট ভাই আমার। ছেলের মত করে বড় করেছিলাম। তার বিয়ে তুমিই দিয়েছিলে। মেয়েও পছন্দ করেছিলে তুমি। সেই মেয়ের সঙ্গেও ঘর করতে পারো নি। তাদের আলাদা হয়ে যেতে হয়েছিল। কিরণের বউ নিজেই এসেছিল। প্রেমের বিয়ে ওদের। তার সঙ্গেও ঘর করতে পারো নি। ভাড়াটেদের হাতেপায়ে ধরে, নগদ টাকা পকেটে গুঁজে দিয়ে এই ঘরদুটো খালি করে উঠে আসতে হয়েছিল আমাদের। এবার চন্দ্রিমা। কিন্তু ওর সঙ্গে তো তোমার ঘর করার কথা নয়, প্রয়োজনও নেই। ও ঘর করবে ওর বরের সঙ্গে, বরুণের সঙ্গে। ওরা দুজন নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া করে নিক। সেই বোঝাপড়াটা গড়ে উঠতে দাও। দু'জনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমরা ওদের কোনও ভালো করতে পারব না। মিছিমিছি ব্যাপারটা আরও জটিল, আরও খারাপ করে ফেলব। ওদের তুমি ছেড়ে দাও বিজয়া।

বলতে চাই কিন্তু বলতে পারি না। আমি নীরবে বসে থাকি। বিজয়া চিৎকার করেই যায়। তুমি এর একটা প্রতিকার করবে কিনা জানতে চাই আমি। বলে কিনা, আমার ছেলের ক্ষমতা নেই। তাকে এখুনি ডাক্তার দেখাতে হবে। হানিমুনে গিয়ে ওর সন্দেহ হয়েছিল। দুর্গাপুরে গিয়ে একেবারে নিশ্চিন্ত হয়েছে। কত বড় স্পর্ধা, আমি মা, আমাকে বলে কিনা, সামান্য ব্যাপার, অল্প চিকিৎসাতেই ঠিক হয়ে যাবে, আমি ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলেছি, আপনি শুধু আপনার ছেলেকে বলে রাজি করিয়ে দিন। ডাক্তারের কাছে গেছে! আরও কার কার কাছে গেছে, কী কী বলেছে কে জানে! ও আমাদের পরিবারের বদনাম করতে এসেছে। ও বরুণের সর্বনাশ করবে। ও পাগল। ও উন্মাদ। বসে আছ কি? ওঠো। ওকে বের করে দাও বাড়ি থেকে।

বিজয়ার দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে দেখি, ওর চোখদুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসছে, গলগল করে ঘাম গড়াচ্ছে, মাথার চুল এলোমেলো, শাড়ির আঁচল মাটিতে লুটোচ্ছে। বুঝলাম, ও পাগল হয়ে গেছে। ও জানে না ও কী বলছে। ওর কোনও কথা, কোনও কাজই কোনওরকম যুক্তিবুদ্ধির, এমনকি ওর নিজস্ব চতুরতার নিয়মও মানছে না। আমার উচিত ওর সামনে গিয়ে দাঁড়ানো। ওর গালে ঠাস ঠাস করে চড় মারা। তাতে হয়ত ওর সম্বিৎ ফিরে আসবে। কিন্তু হাই ব্লাড প্রেসার, হাইপার টেনশনের রোগী। কিছুদিন আগেই ছোট একটা সেরিব্রাল অ্যাটাক হয়ে গেছে। যদি আবার কিছু হয়ে যায়।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে, ওকে ধরে আমার খাটে বসিয়ে দিলাম, প্রায় জোর করেই। বললাম, বসো, আমি দেখছি। খাটে বসে বিজয়া ফুঁসতে লাগল। আমি পাশের ঘরে গিয়ে ডাকলাম, চন্দ্রিমা। চন্দ্রিমা অনেকক্ষণ বসে রইল নীরবে, দু হাতে মুখ ঢেকে। তারপর আঁচল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে উঠে দাঁড়াল। আমি বললাম, মা, তুমি এখান থেকে চলেই যাও। বলতে গেলাম, এখানে থাকলে তুমি বাঁচবে না। আসলে বলতে চাইছিলাম, আমি বাঁচব না। বলতে পারলাম না। চন্দ্রিমা কিছু না বলে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। অনেকক্ষণ। চন্দ্রিমা বেশ লম্বা। তার গায়ের রঙ শ্যামলা, কিন্তু চোখদুটো শার্প, নাক-মুখ-ঠোঁট খুব সুন্দর, গলাটা লম্বা, চেহারাটা স্লিম। সোজা হয়ে দাঁড়ালে, মহারাণী, পঞ্চাশের দশকের গোড়ায় তোমাকে যেমন দেখাত মিছিলে, মঞ্চে, কিংবা তোমাদের বাড়ির দরজায়। ঠিক তেমনি দেখাত চন্দ্রিমাকে, খাপ-খোলা তলোয়ারের মতো। চন্দ্রিমা মুখ তুলে আমার চোখে চোখ রাখল। তারপর জিজ্ঞেস করল, কিন্তু কোথায় যাব, বাবা?

এইটেই হয়ে গেল চন্দ্রিমার আশু সমস্যা। সবচেয়ে বড় সমস্যা। কোথায় যাবে সে? কার কাছে যাবে? তার বিয়ে হয়ে গেছে কিন্তু বর নেই। তার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই। কোনওভাবে যোগাযোগ করে তাকে যদি চেপে ধরে, সে একটাই কথা বলে, মা-র সঙ্গে মিটিয়ে নাও। মা যা বলবে তাই হবে। আমার ছেলেরা সকলেই মাতৃভক্ত।

চন্দ্রিমার বিয়ে হয়ে গেছে কিন্তু তার শ্বশুরবাড়ি নেই। অনেক কষ্ট করে বরকে কোনওমতে পাঁচ মিনিটের জন্যে যদি পায়, যদি জানতে চায়, আমি কোথায় থাকব বলে দাও, সে বলে দেয়, কেন, ঢাকুরিয়ায়, সোনারপুরে, বাপের বাড়িতে, যেখানে ইচ্ছে থাকো। ঢাকুরিয়ায় কিরণদের কাছে গেলে প্রথম প্রথম তারা দরজা খুলে দিত, কিন্তু ভেতরে ডাকত না। ও নিজেই ভেতরে গেলে কথা বলত না। তারপর ওদের বেরোবার সময় হলে বলত, এবার আমরা বেরোব, তুমি ওঠো। দেওরকে সে জিজ্ঞেস করত, কিন্তু আমি কোথায় যাব? দেওর উত্তর দিত না। জা বলত, বাপের বাড়ি চলে যাও না। কাল সকালে বরং সোনারপুরে... তোমার তো মা-র কাছেই থাকা উচিত। পরের দিকে আর ভেতরেও ঢুকতে দিত না। দরজা থেকেই বিদায় করে দিত।

বাপের বাড়ি বলে চন্দ্রিমার প্রায় কিছুই ছিল না। বাবা রিটায়ার করেছেন কয়দিন। মা শয্যাগত। ছোট ভাই কনফার্মড বেকার। ছোটবোন বসে আছে বিবাহের অপেক্ষায়। চন্দ্রিমার কাহিনী সে সম্ভাবনা ক্ষীণতর করে দিতে পারে। সেই ভয়ে তটস্থ তার বাবা-মা-ভাই। ফলে, তার পেছনে দাঁড়াবে এমন কেউ নেই। ও বাড়িতে গেলেই ওঁরা ভয় পেতেন, আবার বুঝি তাঁদের ঘাড়েই ফিরে এল মেয়েটা। তার ওপর তাঁদের জানা ছিল, এখন আর ওর কোনও রোজগার নেই।

সোনারপুরে গলাধাক্কা। ঢাকুরিয়ায় 'ওঠো এবার আমরা বেরোব'। বাপের বাড়িতে, 'বিয়ের পর শ্বশুরবাড়িই মেয়েদের নিজের বাড়ি'। এই তিন দেওয়ালে ধাক্কা খেতে খেতে মেয়েটা কেমন পাগল পাগল হয়ে গেল। মলিন শাড়ি, ছেঁড়া ব্লাউজ, জট বেঁধে যাওয়া চুল, পায়ে হাওয়াই চপ্পল। সারা মুখে কালি, চোখদুটো কোটরে, হাঁটতে গেলে পা-দুটো কেমন টলে টলে যায়। শেষবারের মতো একবার দুর্গাপুরে গিয়েছিল সে। বরুণ আবার মায়ের কাছেই যেতে বলেছিল। বলেছিল, তিনিই করবেন যা করার। সেই প্রথম চন্দ্রিমা বিদ্রোহ করেছিল। বলেছিল, আমি তো তোমাকে বিয়ে করেছিলাম, তোমার মাকে নয়। তোমাকেই করতে হবে যা করার। ঝগড়া হয়েছিল দু'জনে। সেই প্রথম এবং সেই শেষ। সারারাত ঝগড়ার পর সকালের ট্রেন ধরে ফিরে এসেছিল চন্দ্রিমা। বরুণ সবাইকে বলেছিল তার বৌ-এর মাথায় গোলমাল আছে, তাই এত চেঁচামেচি। তার দুর্ভাগ্যে দুঃখিত হয়েছিল সবাই।

কার পরামর্শে কে জানে, চন্দ্রিমা এক ফ্যামিলি কাউন্সেলরের কাছে গিয়েছিল। সেখান থেকে মহিলা কমিশনে। তারপর হিউম্যান রাইটস কমিশনে। তখন ওর চোখমুখ দেখে, পোশাক আশাক-চেহারা দেখে বিশ্বাস করা কঠিন, ও পাগল নয়। এরাও তাই বলেছিল। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, পাড়াপ্রতিবেশী, ফ্যামিলি কাউন্সেলর, মহিলা কমিশন সর্বত্র এরা সবাই এক বাক্যে বলেছিল, ও পাগল। পাগলামিটা মাঝেমাঝেই মাত্রাছাড়া হয়ে যায়। হিংস্র হয়ে ওঠে। এমন পাগলের সঙ্গে ঘর করা অসম্ভব। ডিভোর্সই একমাত্র পথ। ওরা ওর অসুস্থতার কথা গোপন করে বিয়ে দিয়েছিল।

তখন মাঝে মাঝে চন্দ্রিমা এসে সোনারপুর স্টেশনে বসে থাকত। কেন থাকত কে জানে। এক একদিন ভোরবেলা হাঁটতে বেরিয়ে দেখতাম, বসে আছে। মনে হতো সারারাত বোধহয় স্টেশনেই কাটিয়েছে। আমার মাথার মধ্যে তখন প্রবল জোরে হাতুড়ি পিটিত সেই রাত্রে তার প্রশ্নটা, কিন্তু কোথায় যাব, বাবা?

যখন পৃথিবীর প্রায় সবাই বিশ্বাস করে ফেলেছে মেয়েটা পাগল, সেই কারণেই যখন একটার পর একটা চাকরির ইন্টারভিউয়ে ও বাতিল হয়ে যাচ্ছে— প্রশ্নের ধারাটা এইরকম : আগের চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছিলেন কেন? বিয়ের জন্যে। বিয়ের জন্যে কেউ চাকরি ছাড়ে আজকালকার দিনে? ওরা বলেছিল আমাকে দুর্গাপুরে

নিয়ে যাবে, সেখানে চাকরি হবে। তবে কেন গেলেন না দুর্গাপুরে? আমাকে নিল না। কে? আমার স্বামী। কেন নিল না। চুপ। উত্তর দিন। কী হলো, কিছু বলুন। ওরা রটিয়ে দিয়েছে আমি নাকি পাগল।

আমার এক এক সময় মনে হয়, চন্দ্রিমা নিজেও হয়ত বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছিল, ও পাগল। যে চেহারায়, যেমন পোশাক পরে ও বিভিন্ন অফিসে, কমিশনে, স্কুলে ইন্টারভিউতে যেত, তেমন অবস্থায় কেউ বাড়ির পাশের দোকানে পাঁউরুটি আনতেও যায় না।

একদিন ভোরে ও আমার মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। দেখি, ওর চোখদুটো লাল, মুখ-গলার ভাজে ভাজে ময়লা, মাথাভর্তি জট, ছেঁড়া আঁচল টেনে বুকটা ঢাকা। ও ডাকল, বাবা। আমি বললাম, বলো। আপনি কি বিশ্বাস করেন, আপনার বড় ছেলে পাগল ছিল? বললাম, না। আপনার কি মনে হয় আপনি নিজে পাগল? বললাম, জানি না, হয়ত, একটু হয়ত...। আমি? আমি কি পাগল? কী মনে হয় আপনার? বললাম, না, মা। তুমি একটুও পাগল নয়। তুমি সম্পূর্ণ সুস্থ।

হঠাৎ চন্দ্রিমা আকাশের দিকে মুখ তুলে, চোখ পাকিয়ে চিৎকার করে উঠল, চিৎকারের চাপে তার গলার, কপালের পাশের শিরাগুলো ফুলে ফুলে উঠল, তবে কেন আপনি বলেন না সে কথা? কেন আমার পাশে দাঁড়ান না?

মহারাণী, আমার মনে হলো, চন্দ্রিমা নয়, আমার সামনে দাঁড়িয়ে আর্তনাদ করছ তুমি। আকাশ ফাটিয়ে চিৎকার করে আমার কৈফিয়ৎ চাইছে আমার সারা জীবনের সমস্ত মিছিলের সাথীরা, সমস্ত মঞ্চের সহগায়করা, প্রেসিডেন্সী জেলের সহবন্দীরা, বকসা ক্যাম্পের বন্দীরা। তারা জানতে চাইছে, এ যদি নারী নির্যাতন না হয় তবে কাকে বলে নারী নির্যাতন? এ নির্যাতনে কেমন করে লেগে গেল তোমার হাতের ছাপ? পঞ্চাশ বছরের এক কমিউনিস্টের হাতের ছাপ? বিনয় রায়-বটুকদা-জর্জ বিশ্বাসের শিষ্যের হাতের ছাপ? মহারাণীর বিশুপাগলের হাতের ছাপ? বলো জবাব দাও, কেমন করে লাগল? আমার মাথায় যেন সমস্ত আকাশের সবকটি বাজ ভেঙে পড়তে থাকল পরপর।

সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা কী জানো মহারাণী, তারপরেও আমি মরি নি, অর্থাৎ আমার মৃতদেহের চলাফেরা থেমে যায় নি। সে ভাত খেয়েছে। কাঁটা বেছে বেছে মাছ খেয়েছে। গান শুনেছে। গল্প করেছে। গল্পের ফাঁকে ফাঁকে প্রয়োজনে হেসেছে।

মহারাণী, চলে ফিরে বেড়ানো এক মৃতের সঙ্গে মরণোন্মুখ এক জীবিতের সেই ছিল শেষ সাক্ষাৎকার।

ডাক্তার, পুলিশ, পাড়াপ্রতিবেশী, পাড়ার ক্লাব সব ম্যানেজ করে, ভালো কাপড় পরিয়ে, চন্দনে সাজিয়ে, খাটে শুইয়ে, শাদা ফুলে ঢেকে দেওয়ার পর ওরা আমাকে নিয়ে গেল চন্দ্রিমার কাছে। যখন ফিরে এলাম, ওরা ফিরিয়ে আনল, দুপাশে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আমার পুত্র, কন্যা, জামাতা, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবর্গ। মনে হলো যেন

আমাকে লর্ড সিনহা রোডের নির্জন সেলে নিয়ে যাচ্ছে এরা, দুপাশে কড়া পাহারা। কোনওমতেই পালাতে না পারে বন্দী, নির্জন সেল একটু পরেই হয়ে উঠবে টর্চার চেম্বার।

সেইথেকে সেই টর্চারই চলছে, মহারাণী। এবার সব টর্চারের অন্ত ঘটাতে হবে। আর কেউ না জানুক, তুমি জানলে, অরুণ মরে নি, মরেছি আমি। চন্দ্রিমা আত্মহত্যা করে নি, ওকে হত্যা করেছি আমরা। আর আমার মৃত্যুর জন্যে কেউ দায়ি নয়, আমি ছাড়া। আসলে তো কবেই মরে গেছি আমি। তবু, এই মৃতদেহের এই মৃত হাতেই শুধু তোমাকে জানিয়ে গেলাম, আমি ভালবেসেছিলাম, আজও ভালবাসি, এত ভালো কেউ কোনওদিন বাসে নি। সবাইকেই জানিয়ে দিও, কথাটা রটিয়ে দিও। ইতি। তোমার বিশুপাগল।

এই পর্যন্ত লিখে তিনি চিঠিটা যত্ন করে খামে ভরলেন। জিভ ঘসে আঠা কাঁচা করে খামের মুখটা বন্ধ করলেন। খামের ওপর স্পষ্ট করে মহারাণীর আসল নামটা এবং ঠিকানা লিখলেন। বালিশের তলায় খামটা রেখে খাটের পাশে টুলের ওপর থেকে বইপত্র মেঝেয় নামিয়ে দিয়ে টুলটা খাটের ওপর পাতলেন। সাবধানে টুলের ওপর সিলিং ফ্যান থেকে ঝুলিয়ে রাখা দড়ির ফাঁসটা গলায় পরে, ফাঁসটা ভালো করে টাইট করে নিলেন। তারপর পা দিয়ে টুলটা ঠেলে দিলেন।

তাঁর পুত্রকন্যারা মেডিক্যাল শিক্ষার উন্নতির জন্যে তাঁর দেহ দান করে দেওয়ার ফলে তাঁর শরীর ছাই হয়েও সেই গঙ্গায় গেল না যে-গঙ্গায় গিয়েছিল চন্দ্রিমার শরীরের ছাই। তবে প্রায় প্রতিটি সংবাদপত্রে তাঁর ও তাঁর পুত্রকন্যার প্রগতিশীল ও মানবহিতৈষী মনোভাবের প্রশংসা করে দেহদানের সংবাদটি ছাপা হলো।

তাই বা কম কী।

জোয়ার

নিখিলচন্দ্র সরকার

সকাল থেকেই বৃষ্টি হয়ে চলেছে। কখনও জোরে, কখনও ঝির ঝির করে। থামছেই না। এ যেন সেই নাছোড়বান্দা বেয়াড়া ছোকরাটার মত। ঘ্যানর ঘ্যানর করেই যাচ্ছে। মাঝে মাঝে এক একটা চটকা বাতাস এসে কষে থাবড়া মারছে। এতেও হুঁশ নেই। রাস্তার জায়গায় জায়গায় জল জমেছে। খড়কুটো, গাছের ভাঙা ডাল, পাতা, পাখির বাসা, কাগজের টুকরো, আরও কত কী উড়ে এসে রাস্তাটাকে অপরিচ্ছন্ন করে দিয়েছে। মাথার ওপর চাপ চাপ কালো মেঘ। দিনের আলো একটা কালচে রং ধরেছে। বাতাসে গাছগাছালি দুলছে। আরও পাতা ঝরছে। বাতাসে উড়ছে। উড়তে উড়তে গিয়ে মাটিতে পড়ছে। দূরে কাছে। মটমট শব্দে আরও দু একটা ডালও ভাঙছে। কাক ভিজছে, শালিখ ভিজছে। ভিজছে নর্দমার কাছে ঝুপড়ির ওই কালোকুলো আদুল গা ছেলেমেয়ে, বউ মরদ অনেকেই। বৃষ্টিটা এসে সব কিছুই কেমন ওলটপালট করে দিয়েছে। দিনের তিরিক্ষে মেজাজ মর্জিটা যেমন খানিকটা শান্ত হয়েছে। ঝুপড়ির লোকগুলোর মনেও কিছুটা স্বস্তি এসেছে।

সুন্দরী ঘরের বাইরে বেরিয়ে এল। বৃষ্টির ছোঁয়া পেয়ে আরও ডগমগিয়ে ওঠে ও। কী খুশি, কী খুশি। 'আঃ, বিষ্টি আইসা য্যান শরীলডারে জুড়াইয়া দ্যাল।' বিড় বিড় করে শব্দগুলো উচ্চারণ করল সুন্দরী। ক দিন ধরেই শরীরে কী চিড়বিড়ানি জ্বালা। চুলকে চুলকে রক্ত বের করে দিয়েছে। আর পারছিল না। গোসাপের মত চামড়াটা কেমন খসখসে আর কুৎসিত দেখায়। বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে তার মনে হচ্ছিল, শরীরটা যেন আবার শীতল হচ্ছে। মাথা থেকে জল গড়িয়ে শরীর ছুঁয়ে নিচে নামছে। সারা অঙ্গে কী এক সিরসিরানি। ফোঁটা ফোঁটা আকারে জলের দানা সূঁচের মত এসে শরীরে বিঁধছে। কেমন এক অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ছে দেহের আনাচে কানাচে। গায়ের সঙ্গে পরনের শাড়ি সাপটে রয়েছে। কে তাকাল, না তাকাল কোনদিকেই তার খেয়াল নেই। আবার মুষলধারে বৃষ্টি নামল। যেন আকাশ ভেঙে পড়েছে আজ। বাতাসে বৃষ্টির দানা উড়ছে। একটা সাদা চাদর কে যেন আকাশ থেকে মাটি পর্যন্ত বিছিয়ে দিয়েছে। সুন্দরীর মনে একটা খুশি ফড়িং হয়ে ফর ফর করে উড়ছে। তার ভাল লাগছে। ভীষণ ভাল লাগছে। এই মুহূর্তে তার কোন দুঃখ নেই, কষ্ট নেই। জোয়ারের জলের মত তার বুকের ভেতরটা কেবলই ফুলছে আর ফুলছে। সে এখন জোয়ার হয়ে ভেসে যেতে চায়। কোথায় ভাসবে জানে না। তাদের সেই গাঁয়ের লাগোয়া নদীতেও কি এখন জোয়ার? বিদ্যুৎ চমকের মতই কথাটা একবার মনের মধ্যে খেলে গেল। মুহূর্তের মধ্যে আরও একটা ফুল ভেসে উঠেই মিলিয়ে গেল। তক্ষুনি একটা গাছের ডাল শব্দ করে ভেঙে পড়ল। আচমকা শব্দে কাক,

পাখিরা ভয় পেল। কা কা, কিচির মিচির শব্দে কয়েকবার পাক খেল গাছটার চারদিকে। তারপর আবার অন্য জায়গায় গিয়ে বসল ওরা। সুন্দরীও চমকে উঠেছিল সেই শব্দে। আর নয়, অনেক ভিজেছে। হাতের আঙুলগুলোও কেমন ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। সে ঘরে ঢুকে পড়ল। শাড়ি ছাড়ল। গা মাথা মুছল।

সুন্দরী সুবলের বউ। সুন্দরবনের সামনের নগরের শেষপ্রান্তে ওদের বাড়ি। পাশেই জঙ্গল। শকুনখালির জঙ্গল। ও শুনেছে, নদীর ওপারে বাংলাদেশে নাকি একসময় ওদের আসল বাড়িঘর ছিল। ওর বাবা, খুড়া চাষ আবাদ করত। ডিঙি নিয়েও নদীতে-জঙ্গলে মাছ ধরতে যেত। কাঠ আসত, মধু আসত। দেশভাগের পরও ওর বাবা অনেক বছর বাংলাদেশে ছিল। ওরা এদেশে এসেছে বছর পঁচিশ। সেসব সুন্দরীর জন্মের আগে। ওর জন্ম এখানেই। এদেশে এসেও তার বাবা কাকারা চাষবাস করে। মাঝে মাঝে জঙ্গল করতেও যায়।

সুন্দরীর বয়স এখন কুড়ি। এই গাঁয়েই তার শ্বশুরবাড়ি। তার শ্বশুর ঘর চেনা ঘর। শ্বশুরমশায়ই তার বাবা খুড়াকে এদেশে নিয়ে এসেছিল। এক গাঁয়েই এদের বাড়ি ছিল। দেশ ভাগের পরপরই তাঁর শ্বশুরমশায়রা যে সামান্য ভিটেমাটিটুকু ছিল, তা বিক্রিবাটা করে চলে আসে। আগে এসেও বেশি সুবিধে করতে পারেনি। এক খুড়া শ্বশুর তো একবার জঙ্গল করতে গিয়ে আর ফিরেই এল না। বাঘেই খেয়ে নিয়েছে। বাঘ তো হামেশাই গাঁয়ে হানা দেয়। বুনো শুয়োরও চলে আসে। বনে যাওয়া এখন আইন করে বন্ধ করে দিয়েছে। তবু এরা লুকিয়ে লুকিয়ে যায়। হরিণ মেরে আনে। ধরা পড়ে জেল খাটে।

সুন্দরীর মনে আজ অনেক কিছুই এসে ভিড় করছে। এরকম দিনে তার কত কথা মনে পড়ে। বাইরে ঝমঝম করে সমানে বৃষ্টি পড়েই যাচ্ছে। দিনের আলো মরা মাছের চোখের মতন ফ্যাকাসে, বিবর্ণ। অসময়েই সন্ধের আঁধার নেমেছে চরাচরে। থেকে থেকে মেঘ ডাকছে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। এরকম দিনেই বাবা গিয়েছিল মাছ ধরতে নদীতে। নদী ছিল ফুলন্ত। বাতাস ছিল এলোমেলো। আকাশ জলের ভারে নদীর বুক ছুঁয়েছে প্রায়। বাপ আর ফিরল না। মা গিয়েছিল নদীর ঘাটে ডিঙি নৌকার খোঁজে। পা পিছলে নদীতে পড়ে গেল। সেবারও ছিল বর্ষার দুরন্তপানার দিন। নদী তখন ফুঁসছে। কোথায় তলিয়ে গেল মা। বাপ গেল বিয়ের আগে। মাকে হারাল বিয়ের পর। এ তার কপালের লিখন। তা ছাড়া কি। সুন্দরী যখন ছোট, চাষের সময় বাপের পেছন পেছন সেও যেত। ধান কাটার সময় হলে তার কী আনন্দই না হতো। বর্ষায় যখন জল বাড়ত, খাল ডোবা ক্ষেতে বাবা খুড়ার সঙ্গে মাছ ধরতেও যেত। খালুই ভরে মাছ আনত। মাছগুলো তখনও ছড়বড় ছড়বড় করত। কী মজাই না লাগত তখন। পুঁটি কই সিঙি মাগুর ট্যাংরা পাঁচমিশেলি মাছ। বাপ সোহাগী মেয়ে। বাপের জন্যে কেউ কিছু বলতে পারত না মেয়েকে। সেই বাপই একদিন চলে গেল। আকাশের যত কান্না, সব তখন তার

বুকের মধ্যে এসে জমল। অনেক কাঁদল। চোখের জলে বুক ভাসাল। তবু বুকের ভার হালকা হলো না। এখনও মনে হলে বুকটা তার টনটন করে ওঠে। মা-র কথাও তার মনে পড়ে। সেই ছেলেবেলা থেকেই নদী তার নেশা। যখন তখন এসে ওই বাঁধের ওপর এসে দাঁড়াত। বাঁশ দিয়ে ওর বাবা একটা বসার জায়গা করে দিয়েছিল ওখানে। পাশেই একটা তেঁতুল গাছ ছিল। ওপারে বাংলাদেশ। ওই জলজঙ্গল পেরিয়েই তার বাপ ঠাকুর্দার জন্মভিটে। কতদিন তার বাপের মুখে পেছনে ফেলে আসা দিনের গল্প শুনেছে। শুনতে শুনতে তারও যেন চেনা হয়ে গেছে সেই গ্রাম গঞ্জের পাঁচালী। কতদিন সে দাঁড়িয়ে একমনে দেখত ভরন্ত নদীর চেহারা। ওই নদীই তার বাপকে নিয়েছে, মাকে ডুবিয়ে মেরেছে। রাগ হতো। তবু সেদিকে চেয়ে থাকতে থাকতে একসময় মনের মধ্যে নানা রকমের খেলা চলত। তখন সব কেমন তালগোল পাকিয়ে যেত। জোয়ার এলে নদীর চেহারাটাই অন্যরকম হয়ে যায়। ফুলছে তো ফুলছেই। সব কিছুই যেন ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। কিছুই রেখে যাবে না। স্বামী সংসার দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা পাপপুণ্য সব কেমন একাকার হয়ে যায়। সুন্দরীও ঠিক এমনি করেই একদিন ভেসে যাবে। মাঝে মাঝে কর্তব্য অকর্তব্যের বোধ বুদ্ধি সে হারিয়ে ফেলে। কেন যে এমন হয়। মনের যেদিন এরকম তোলপাড় অবস্থা, সেদিন স্বামী সংসারের কোন টান থাকে না তার।

শেষ পর্যন্ত সুবলের সঙ্গেই তার বিয়ে হলো। এ বিয়েতে ঘোর আপত্তি ছিল সুন্দরীর। প্রথমে সে বেঁকে বসেছিল। কিন্তু বাপ কথা দিয়ে গেছে। মা অনেক বোঝাল। কাজ হলো না। শেষে জোরাজুরি করল। পরে খুড়ার কাছে শুনল, বাপ নাকি তার জন্মের পরেই শ্বশুরমশাইকে কথা দিয়েছিল। তার ইচ্ছে অনিচ্ছের কোন দামই রইল না আর।

সুন্দরীর দেহের আনাচে কানাচে তখন জোয়ারের জল ঢুকছে। ঢল ঢল লাবণি। চোখের তারায় ভাষা ফুটেছে। লাউডগার মতন শরীরেরও বাড়ন্ত, তার সঙ্গে লমলমে স্ত্রী। এখন ও অনেকেরই নজরে পড়ে। চোখে পাড়ার মতই দিনে দিনে লাবণ্য ছড়িয়ে পড়ছে সর্বাঙ্গে। টানা টানা চোখ। চোখের সাদা জমিতে অনেক না-বলা কথা এসে ভিড় করে। ঠোঁটের ডগায় সবসময়েই পাতলা একটা হাসির ছোঁয়া। জোড়া ভুরু। খোঁপা খুলে দিলে পিঠ ছাড়িয়ে ঘন, কুচকুচে কালো চুল হাঁটুর তলায় এসে ঠেকে। যেন কেশবতী কন্যা। পুরুষের চোখের ভাষা বুঝতে আর অসুবিধে হয় না তার। হবে কেন। ফুল ফুটেছে। ফুলের বুকে মউ জমেছে। ভোমরা আসে গুনগুনিয়ে। তার মনেও যে তখন একজন চুপি চুপি গুনগুনানি শুনিয়ে যায়। তার চোখে সে নেশা ধরিয়েছে। মনে স্বপ্নের জাল ছড়িয়েছে। নদীর বুকে একদিন ডিঙি ভাসাবে তারা। তারপর অনেক, অনেক দূর চলে যাবে। সংসারের এত খুঁটিনাটি, বেড়াজালের ধার ধারে না।

হ্যাঁ বলাই, বলাই-ই তার সেই ভোমরা, মনচোর। ও-তার চেয়ে মাত্র বছর

পাঁচেকের বড়। এ গাঁয়েরই ছেলে। পড়াশুনোর জন্যে শহরে গেছে। মাঝে মধ্যে আসে।

বলাইদের অবস্থা ভাল। ওদের ক্ষেতি জমি আছে বেশ কিছু। পুকুর, প্রায় বিঘে খানেক জমি নিয়ে ফলের বাগান। বন্দুকও আছে। কিন্তু থাকলে কী হবে। এ একেবারে অজ পাড়া গাঁ। ধারে কাছে কোন হাইস্কুল নেই। থাকার মধ্যে একটা প্রাইমারি স্কুল। তাও মাইল তিনেক দূরে। রাস্তা ভাল নয়। এবড়ো খেবড়ো। ছেলেবেলায় তারা হেঁটে হেঁটে এতদূর পড়তে যেত দলবেঁধে। বলাইদের সঙ্গেই ছিল তার ঘনিষ্ঠতা। দারুণ মজা লাগত। অসুবিধে কি আর একটা। আরও অনেকরকমের। তাদের গ্রামটা ছোট নয়। কিন্তু একটা ডাক্তার নেই, ওষুধ নেই। কঠিন কোন রোগ হলে সেই ছুটতে হয় বসিরহাট সদর হাসপাতালে। যাতায়াতেরও ভীষণ কষ্ট। নৌকোই একমাত্র ভরসা। নৌকো করে মাইল দেড় দুই উজানে গিয়ে তবে লঞ্চে উঠতে হয়।

সেই বলাই একদিন শহরে চলে গেল পড়তে। যাবেই তো, এখানে কেন পড়ে থাকবে ও। কিন্তু তার মন যে বুঝ মানে না। মনে হয়েছিল, তার সব আনন্দ, খুশি ও চুরি করে নিয়ে চলে গেছে। সব কেমন অন্ধকারে ভরে গিয়েছিল। কোন কিছুই ভাল লাগে না তখন। এক জায়গায় চুপটি করে বসে থাকতে পারে না। একা একা বাঁধের ওপর এসে দাঁড়ায়। নদীর দিকে তাকিয়ে থাকে। তাকিয়ে তাকিয়ে চোখের জলে তার বুক ভাসে।

বলাইদের বাড়িতে তখন তার যাতায়াত আরও বেড়ে গেল। ওর মা-র সঙ্গে কত গল্প। হাতে হাতে তখন কত কাজ করে দিত। বলাইয়ের মাকে ও জেঠিমা বলে ডাকে। ও বুঝত, জেঠিমাও ওকে খুব ভালবাসে। দিনের বেশির ভাগটাই তার ওখানে কাটত। জেঠিমা মাথায় তেল দিয়ে দিত, চুল বেঁধে দিত। এ নিয়ে তার মা খুব রাগারাগি করত, অশান্তি করত। সুন্দরী গায়ে মাখত না। হেসে উড়িয়ে দিত সব। এরই পরে ছুটি ছাটায় বলাই বাড়ি আসে। উঃ, তার যে তখন কী আনন্দ হতো। বলাইকে তখন অন্যরকম লাগত। ওর পোশাক আশাক বদলে গেছে। কথাবার্তার ধরণও পাল্টেছে। দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষার এক উপচানো আবেগ যেন তার বুকটাকে চেপে ধরেছে। কথা বলতে গিয়েও গলার স্বর বেসুরো হয়ে পড়ে। চোখের পাতা লজ্জায় ভারী। ওইটুকুই যা দ্বিধা। তারপরই সেই আগের মতন। হাসি গল্প। নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে কত কথা। কথা যেন আর ফুরোয়ই না। বলাই কত গল্প শোনাতো তাকে। শহরের গল্প। কলকতা এক বিরাট শহর। বিশাল বিশাল বাড়ি। কত আলো। বাস ট্রাম গাড়ি ঘোড়ার গল্প। কত মেলা, সার্কাস, সিনেমা। আরও কত কী। শুনতে শুনতে ও তখন নিজের মধ্যে থাকত না। কোথায় যেন ভাসতে ভাসতে চলে যেত। বলাই যেন তাকে এক স্বপ্নের জগতে নিয়ে যেত। সময় তো এক জাযগায় থেমে থাকে না। আবার একদিন ও শহরে চলে যায়।

দেখতে দেখতে সুন্দরীও তখন যুবতী। বলাই একদিন তাকে লুকিয়ে আদর করতে করতে বলেছিল, 'হ্যাঁরে সুন্দরী, আমি তোকে কলকাতায় নিয়ে যাব, যাবি?'

খুশিতে নেচে ওঠে ও। ও জবাব দিয়েছিল, 'হঁ ত, কবে নিবা আগে কও।' ওর আর তর সইছিল না। 'একদিন ঠিক নিয়ে যাব।'

বলাই তখন শহরে। সুন্দরীও সময় ভাল যাচ্ছে না। তাকে নিয়ে গাঁয়ের লোক নানা কথা বলছে। তার পেছনে আরও ছেলে লেগেছে। যেতে আসতে অনেকে ঠারে ঠুরে অন্যকথা বলে। এতে তার মা-র দুশ্চিন্তা বেড়েছে। মেয়েকে আর ঘরে রাখা ঠিক হবে না। সুন্দরীও জেদ ধরেছে, বলাইকে ছাড়া সে অন্য কাউকে আর বিয়ে করবে না। খুড়া তাকে বোঝায়। বাবা যে আগেই তার বিয়ে ঠিক করে রেখে গেছে। ওরাও আর দেরি করতে চায় না। ছেলের বাড়ি থেকে চাপ দিচ্ছে খুব। তবু সুন্দরী আরও কিছুদিন ঠেকিয়ে রাখল তার বিয়ে। বলাই সেবার এলো না। একদিন সুবলের সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে গেল।

প্রথম থেকেই সুবলের ওপর তার রাগ। শুধু রাগই নয়, একধরণের চাপা একটা ঘৃণাও। স্বামীর প্রতি বাড়তি কোন শ্রদ্ধা বা ভালবাসা কোনটাই তার ছিল না। সুবলের সঙ্গে তার প্রায় সময়েই খটাখটি লেগে থাকে। ঘন ঘন বাপের বাড়ি আসা তার বন্ধ। কারও সঙ্গে কথা বলা তার বারণ। পান থেকে চুন খসলেই মারধর। গালিগালাজ। সুন্দরীও রাগে, জ্বালায় ফোঁস ফোঁস করে। কিছুতেই সে সুবলের কথা শুনবে না। তার শরীরে কে যেন জলবিছুটি লাগিয়ে দিয়েছে। কেবলই সে জ্বলছে আর জ্বলছে। স্বামীকে সে সহ্য করতে পারে না। খালি সন্দেহ। সে কোথাও যেতে পারবে না, কারও সঙ্গে মিশতে পারবে না, সব সময়ই নজরদারি। কেন, সে কী করেছে। এমন পুরুষের ঘর করার চেয়ে তার মরে যাওয়া ভাল। স্বামীও গোঁয়ার গোবিন্দ। তার কথার টের বেটের হলেই চুলের মুঠি ধরে টেনে হিঁচড়ে মাটিতে ফেলে কিল চড় লাথি। সুন্দরীও তখন মাথায় আগুন ধরে গেছে। একেবারে রণরঙ্গিনী মূর্তি। কামড়ে আঁচড়ে সেও একাকার করে দেয়।

বিয়ের আগে সুবলের সম্পর্কে সে কিছুই জানত না। জানার কোন আগ্রহও ছিল না। তার মন যে তখন বলাইয়ের মধ্যেই মগ্ন হয়ে আছে। কিন্তু খুড়াই বা কেমন মানুষ। সে তো আপনার জন। সে কেন খোঁজখবর নিল না? খুড়া কি জানত না সুবলের তেমন একটা রোজগারপাতি নেই, চরিত্রও সুবিধের নয়। নেশাভাঙ করে। সাঁওতাল পাড়ায় হাঁড়িয়া খেতে যায় প্রায় রোজই? এমন তো নয় সে খুব দূরের। তারপরও সেই ছেলের হাতে তুলে দিল? বাপ কথা দিয়েছিল, সেটাই কি বড় হলো? আর কথা দিলেই কি এমন একটা পাষণ্ডের হাতে তুলে দিতে হবে? তার বাপ কি জানত যে ছেলেটা এমন হবে। আজ বাপ বেঁচে থাকলে এমনটা কখনই হতো না। কথা দিলেও না। সে গুমরে গুমরে কাঁদে। এ জীবন সে চায় নি। জীবনটা এরই মধ্যে কেমন এক বিস্বাদ, তেতোয় ভরে উঠেছে। তার কিছু

ভাল লাগে না। মনে কোন সুখ নেই। নদীর পাড়ে গিয়েও আর দাঁড়াতে পারে না। জোয়ারের চেহারাটাই যেন ভুলে গেছে।

এরই মধ্যে একদিন বলাই গাঁয়ে ফিরল। তার কানেও গেল কথাটা। মন উতলা হলো। নিজেকে অনেক করে বোঝাল, বলাইয়ের কাছে গিয়ে দাঁড়ানোর আর মুখ নেই তার। দেখা হলে কী বলবে? সে তো এখন অন্যের বউ। তবু মন মানে না। একবার শুধু চোখের দেখা। তার ছটফটানি বাড়ে। শ্বশুরবাড়ির চোখকে ফাঁকি দিয়ে বেরোবার উপায় নেই। সুবলকেও কিছু বলা যাবে না। নানা ফন্দিফিকির খোঁজে। একদিন যায়, দুদিন যায়। ক্রমেই অস্থিরতা বাড়ছে। অন্ধকারে তাকিয়ে তাকিয়ে তার রাত কাটে। ঘুম হয় না। চোখের তলায় কালি জমেছে। মুখ চোখ শুকনো, ফেকাসে, দেখতে দেখতে পাঁচদিন হয়ে গেল। শেষে একদিন মরীয়া হয়েই মাকে দেখার ছল করে বাপের বাড়ি চলে এল। মা-কে দেখেই সে চলে যাবে। বাড়িতে দুদণ্ড পা রেখেই বলাইদের বাড়ি। তার ভেতরটা তখন কী ধড়াস ধড়াস করছিল। বলাইকে দেখেই তার কান্না ঠেলে উঠেছে। কিছুক্ষণ কোন কথাই বলতে পারে নি। জেঠিমাও ওকে দেখে অবাক।

পেছন পেছন সুবলও এসেছে তার খোঁজে। বাড়ি না পেয়ে সরাসরি বলাইদের বাড়ি চলে এসেছে। রাগে তখন ও কাঁপছে। সুন্দরীর নাম ধরে হাঁক মারল। বাজখাঁই গলা। মুখে উল্টোপাল্টা অসভ্য ইতর, নোংরা কথাবার্তা। সে এক কেলেঙ্কারি কাণ্ড। ছিঃ ছিঃ এমন কাজও কেউ করে। বউয়ের পেছন পেছন এসে হাজির। বলাইকে ও সহ্য করতে পারে না। ওর নাম শুনলেই সুবলের চোখে মুখে আগুন ঝরে। আর একটু হলেই একটা খুনখারাবি হয়ে যেত সেদিন। আর একমুহূর্ত অপেক্ষা না করে সেখান থেকে সুবলকে টানতে টানতে নিয়ে চলে এলো সুন্দরী। ঘরে ফিরে সুন্দরীকে সেদিন অনেক মারধর করেছিল সুবল। মেরে হাত মুখ ফুলিয়ে দিয়েছিল। যেন উন্মাদ হয়ে গেছে। পরে শাসিয়ে শাসিয়ে বলেছে, 'এই মাগী, আর যদি ওদিকে কোনদিন পা বাড়াইস, তবে তর একদিন কি আমার একদিন, কাইট্যা দুই টুকরা কইর‍্যা জলে ভাসাইয়া দেব, এই তরে শেষ কথা কইয়া দিলাম।' রাগে গজ গজ করতে করতে ও নেশা করতে চলে গেল।

কি আশ্চর্য, সুন্দরী কিন্তু সেদিন আর একটাও কথা বলে নি। চুপ করে সে মার খেয়েছে, গালি শুনেছে। কোন প্রতিবাদই করেনি। ও চলে গেলে সুন্দরী একা একা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে অনেক কাঁদল। বলাইয়ের সঙ্গে সেই তার শেষ দেখা। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছে, সুযোগ এলে এর শোধ একদিন সে তুলবে।

তারপর আরও কয়েকবছর এমনি করেই কাটল। এরমধ্যে কয়েকটা ঘটনা ঘটল মাত্র। তার মা মারা গেল। খুড়াও একদিন লুকিয়ে জঙ্গল করতে গিয়ে আর ফিরে এলো না। তার শ্বশুর শাশুড়ীও চলে গেল। সুবলের মাথার ওপর বলার মত

আর কেউই থাকল না। কিছু জমি বিক্রি করে দিল। সুন্দরী আপত্তি করেছিল। তার কথা শোনে নি। গেলবার বাঁধ ভেঙে নদীর নোনাজল ঢুকেছে ক্ষেতে। ভেটকি মাছের চাষ করেছে। তাতেও তেমন একটা সুবিধে করতে পারেনি। সংসারে অভাব যেন আরও চেপে বসেছে। চাষবাসের সময় গেরস্থের বাড়িতে অনেক রকমের কাজটাজ থাকে। একটু বললেই হয়। কিন্তু তার সে উপায় নেই। সুবল চায় না, তার বউ অন্যের বাড়িতে গতর খাটে। গতানুগতিক জীবন। কখনও কখনও বলাইয়ের কথাও মনে পড়ে। ও শহরে চলে গেছে। মনে মনে একটা দুঃখ তার থেকেই গেল। বলাইকে সে কিছুই বলতে পারল না। তাকে ভুলই বুঝে গেল ও। তার আগেই তো এত কাণ্ড। আজ সেসব কথা অতীত। এ নিয়ে আর উত্তেজনা নেই কারও মধ্যে। সুবল এখন আর তাকে আগের মত মারধর করে না। বরং, একটু তোয়াজই করে। বাড়াবাড়ি করলে সুন্দরী ওকে ছেড়েছুড়ে চলে যাওয়ার ভয় দেখায়। সুবলকে তখন কেমন অসহায় দেখায়। ওর ওই করুণ, ভীতু মুখ দেখে সুন্দরী খিল খিল করে হেসে ওঠে। হাসতে হাসতে যেন মাটিতে লুটিয়ে পড়বে। ওর নেশার বন্ধুরাও মাঝে মধ্যে বাড়িতে আসে। ওদের সঙ্গে মজা করে হেসে কথা বলে সুন্দরী। ইচ্ছে করেই করে। সুবলের রাগ হয় এতে। সে তা ভাল করেই টের পায়। একটা অক্ষম আক্রোশ। কিন্তু ও তাকে কিছু বলার সাহস পায় না। নিজের মধ্যেই গজরাতে থাকে। সুবলকে ওরা নেশা করায়। তার স্বামীই ওদের বাড়ি নিয়ে আসে। সুন্দরীও সেই সুযোগে স্বামীর মনে আরও জ্বালা ছড়ায়। সে চায়, তিলে তিলে ও জ্বলুক। জ্বলতে জ্বলতে খাক হোক। মনে মনে ও হাসে। হাসিটা একসময় কুটিল হয়ে ঠোঁটের ডগায় মিলিয়ে যায়।

সুবলের গাঁয়ে থাকতে আর মন নেই। ঘরে থাকতেও ভাল লাগে না। বাইরে থাকলে ঘরের জন্যে নানারকম এলোমেলো আজেবাজে চিন্তা এসে ঘিরে ধরে। তার নেশার বন্ধুরা যখন তখন বাড়ি চলে আসে তার খোঁজে। সুবলের ধারণা, তারা আসে সুন্দরীর টানে। কিন্তু ওদের ও তাড়িয়ে দিতে পারে না। কেমন একটা অস্বস্তি হয়। এরই মধ্যে তার কানে কানে কারা যেন মন্ত্রণা দেয় শহরে যাওয়ার। আশপাশের গাঁয়ের অনেকেই দলবেঁধে শহরে চলে গেছে। গাঁয়ে বড় অভাব। নোনা জলে প্রচুর ফসল নষ্ট হয়ে গেছে। সেবারের ঝড় জলে অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ওরা শুনেছে, শহরে কাজের অভাব নেই। ওরা রিক্সা চালায়। ঝুপড়ির ঘর করে থাকে।

সুবলও একদিন সুন্দরীকে নিয়ে শহরে চলে এলো।

রাস্তার ওপাড়ে ফুটপাত। তারপর ড্রেন। ড্রেনের পরে পার্ক। একটা পুকুরও আছে পার্কের মধ্যে। ড্রেনের লাগোয়া অনেকগুলি ঝুপড়ি। ছোট ছোট ঘর। দরমার বেড়া দেওয়া। হোগলা পাতার ছাউনি। সুবলদের পাশেই ইসমাইলদের ঘর। এখানে জাতপাতের কোন বেড়া নেই। ওরা সবাই প্রায় রিক্সা চালায়। ওদের

আশপাশের গাঁয়ের অনেকেই এখানে রয়েছে। ঘরের সামনে এক ফালি ফাঁকা জায়গা। এটাকেই দু বেলা ঝাড়পোছ করে। যতটা পরিচ্ছন্ন রাখা যায়। সুন্দরী ঘরের সামনে একটা তুলসী গাছও রেখেছে। রোজ সন্ধেয় ধূপবাতি দেয়। ইসমাইলরা নামাজ পড়ে। রাস্তার লাগোয়া ফুটপাতের ওপর বড় বড় পাইপও পড়ে আছে। রাস্তা খোঁড়াখুড়ি চলছে। কেউ কেউ পাইপের মধ্যেই ঘরগেরস্থালি সাজিয়েছে।

বছর খানেক হয়ে গেল সুবলরা এখানে এসেছে। ইসমাইলই রিক্সা চালাবার কাজ জোগাড় করে দিয়েছে ওকে। কিন্তু সুন্দরীর মন উঠল না। এ তারা কোথায় এলো? লোকজন গাড়িঘোড়া সবই ঠিক আছে। কত সুন্দর সুন্দর বাড়ি ঘর। কিন্তু এই ঝুপড়ির ঘরে তার দম আটকে যায়। এখানে আকাশ দেখা যায় না। এ অন্য এক জীবন। একেবারে অচেনা, নতুন।

এ জীবন কি সুন্দরী কল্পনাও করতে পেরেছিল? কী যে অস্বস্তি আর লজ্জার তা কাউকেই বলার নয়। মনে মনে সুবলের ওপর খুব রাগ হতো। শহরের এ কোন চেহারা? এতো তার সেই স্বপ্নের শহর নয়। সন্ধের পরেই জায়গাটা যেন নরকের চেহারা নিত। ঝুপড়ির পেছনে আবছা অন্ধকারে বাংলা মদের ঠেক বসত। পাশেই মিনি বাসের স্ট্যাণ্ড। বাসের ড্রাইভার কণ্ডাক্টর অনেকেই লুকিয়ে লুকিয়ে আসত। কয়েক ঢোক গিলেই চলে যেত। আবার আসত। অন্য কুলিকামিনরা এসে ভিড় করত। রিক্সাওয়ালারা আসত। সারাদিন খাটাখাটুনির পর শরীরটাকে একটু চনমনে করে নেওয়া। ভদ্দর লোকের ছেলে ছোকরাও এসে এখানে ভিড় জমাত। শুধু একটা নেশাই নয়, অন্য নেশাও ওদের এখানে টেনে আনত। ঝুপড়ির অল্প বয়েসী বউ, ডবকা মেয়েদের নিয়ে ফস্টিনস্টি করত। চাপা হাসি, ফিসফিসানি চলত। পার্কের গাছের ছায়ার ঘন অন্ধকারে মিশে গিয়ে নানারকমের শব্দ তুলত। মা গো। এ আবার একটা জীবন নাকি। সুন্দরীর গা ঘিন ঘিন করত। এর সঙ্গে ছিনতাই টিনতাইটিও মিশে থাকত। একটু বেশি রাতে পুলিসের গাড়ি এসে থামত। কারা যেন অন্ধকারে ফিসফিস করে কথা বলত। সুন্দরীর ঘুম ভেঙে যেত। কান খাড়া করে রাখত। বেড়ার ফাঁকে চোখ রাখত। অন্ধকারে ঠিক বুঝতে পারত না। মনে হতো, কাদের যেন অতি সাবধানে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। তার ভয়-ভয় করত। কোনদিন যদি তাকেও তুলে নিয়ে যায়। ভাবতেই গায়ে কাঁটা দেয়। দম বন্ধ হয়ে আসে। সুবল তখন বেঘোরে ঘুমুচ্ছে। পাড়ার গুণ্ডা, বদমাশরাও এখানে আসে। প্রায়ই হুজ্জুতি করে। একদিন ইসমাইল খুড়ার মেয়ে মর্জিনাকে পাওয়া গেল না। কোথায় গেল মেয়েটা, কার সঙ্গে পালাল, কিছুই জানে না কেউ। নানা কু-কথা মনে আসে। না কি, মেয়েটাকে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ টর্ষণ করে মেরে ফেলেছে! কত কী-ই তো চলছে এখন। মেয়েটা দেখতে দেখতে কেমন বাড়ন্ত, রূপসী হয়ে উঠছিল। ওর বুক, নিতম্ব বর্ষার ভরা নদীর মত। সুন্দরীর সঙ্গে ওর খুব ভাবসাব।

যখন তখন ঘরে আসত, গল্প করত। কত হাসাহাসি, মজা। কে তার কানে কী ফুসমন্তর দিয়েছে, তাও বলত। কিছুই গোপন করত না ও। একদিন একটা ছেলের সঙ্গে সিনেমা গিয়েছিল, তাও বলেছে। ওর বন্ধুদের চেহারা চাউনি ওর ভাল লাগেনি। সুন্দরী ওকে সাবধান করে দিয়েছিল, 'ভাইব্যা চিন্তা কাম করিস রে মর্জিনা, কার কথায় ভুলিস না। পুরুষ মাইনসেরে বিশ্বাস নাই। আইজ তরে চায়, কাইল আবার অন্য মাইয়া মাইনদেরে দেইখ্যা জিভ লকলকাইয়া উঠে। তর শরীলে অ্যাখন জোয়ার আইছে ত, অনেক কিছুই দেইখ্বি। খুব সাবধানে পা বাড়াইবি। এই তরে কইয়া দিলাম।' কে কার কথা শোনে। মর্জিনা তখন ভাসছে। ভাসতে ভাসতেই একদিন চলে গেল ও। কেউ জানল না। ওর বাবা ইসমাইল এখন বুক চাপড়ায়, হাউ হাউ করে কাঁদে। বিড় বিড় করে, 'তখনই বুঝছিলাম, মাইয়াটা কোন্দিন না একটা সর্বনাশ ঘটাইয়া বয়ে, তাই ঘটাইল।' ইসমাইল খুড়া এখন পথে পথে মেয়েকে খুঁজে বেড়ায়।

হারান মণ্ডলের কচি বউটা পদ্ম। এই ঝুপড়িরই মেয়ে। তার আবার একটা বাচ্চাও আছে। জনার্দন তাদের গাঁয়েরই ছেলে। চেনাজানা ও মিনিবাসের হেল্পার। হারানকে পয়সাকড়িও দেয়। ও নেশা করে করেই শেষ হয়ে গেল। বউ বাচ্চার ওপর কোন দরদই নেই যেন। জনার্দন সেই সুযোগটাই নিল। পদ্মর রসালো চেহারার নেশা ও কাটিয়ে উঠতে পারল না। পদ্মও ভাবল, যে স্বামী তার দিকে তাকায় না, তার ভালমন্দর খোঁজ রাখে না, তার ঘর করা না-করা সমান। এমন স্বামীর জন্যে তার কোন তাপ উত্তাপ নেই। বাচ্চাটাকে ফেলে রেখেই পদ্ম একদিন জনার্দনের সঙ্গে পালিয়ে গেল। লক্ষ্মীর মা বিকেল-বিকেল সেজেগুজে বেরিয়ে যায়। ফেরে রাত করে। কোথায় যায়, কি করে কেউ জানে না। এ নিয়েই স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মারামারি লেগে যায়।

এভাবেই চলছিল তাদের জীবন। প্রথম প্রথম খুব ভয় পেত সুন্দরী। এখন আর পায় না। গা-সওয়া হয়ে গেছে। তাদের ঝুপড়ির জীবনে এমন অনেক কেচ্ছাই রোজ রোজ তৈরি হয়। মারপিট, খিস্তি, খেউড় লেগেই আছে। খুনটুনও হয়েছে। পুলিস এসেছে। ধরে নিয়ে গেছে। আবার ছেড়েও দিয়েছে। এখানে চুরি ডাকাতির সঙ্গেও কেউ কেউ জড়িয়ে আছে। দু একজন বেআইনী নেশার জিনিসও বিক্রী করে। মাঝে মধ্যে পুলিস এসে হামলা করে। গুণ্ডারা গুণ্ডামি করে। রাজনীতি-করা লোকেরা এসে তুলে দেওয়ার ভয় দেখায়। নানাভাবে শাসায় তাদের। কোন কিছুতেই কিছু হয় না। নেশাও বন্ধ হয় না। রাস্তার এদিকে সন্ধের পর আলো জ্বলে না। পার্কের গাছের তলায় অন্ধকার আরও ভারী হয়। রাত বাড়ে, অন্ধকারে ছায়া ছায়া কী যেন ঘুরে বেড়ায়।

সুন্দরীর ওপরও অনেকের নজর। লোকের চাউনি দেখলেই সে তার মনের কথা টের পায়। ওদের মুখ চোখের চেহারাই তখন অন্যরকম হয়ে ওঠে। ও এড়িয়ে

যায়। ফুঁসলানোর কথা কানে আসে। কোন আমলই দেয় না। এরই মধ্যে সুকুমারবাবু এসেছে কয়েকবার। মাঝে মধ্যে ও আসে। সুবলের সঙ্গেই আসে। সুকুমারবাবুকে দেখলে মনে হয় কত নিরীহ, গোবেচারা। আসলে তা নয়। এটা ওর বাইরের চেহারা। এখানকার লোকজন ওকে ভয় পায়। ও শুনেছে, ওই লোকটা নাকি হাসতে হাসতে অনেককে খুন করেছে। বিশ্বাসই হয় না। কথা বলে খুব সুন্দর করে আস্তে আস্তে। পুলিশের সঙ্গে হাত আছে। নেতাদের সঙ্গেও ওঠা বসা।

এখানে তাদের আসার কিছুদিন পরেই ঝুপড়ির লোকদের সঙ্গে এলাকার কিছু মানুষজনের সঙ্গে প্রথমে ঝগড়া, পরে মারপিট হয়। ওদের কথা, ওরা এখানে কোন ঝুপড়িই রাখবে না। সব ভেঙে দেবে। ঝুপড়ি থেকেই নোংরা ছড়াচ্ছে। পরিবেশ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সন্ধে নামলে ওদিকটায় আর যাওয়া যায় না। একটা আতঙ্ক। সুন্দরীরা তখন এর কিছুই জানে না। নতুন এসেছে। তখন ওই সুকুমারবাবুই এদের হয়ে বোমাবাজি করেছে। ওদের কাছে ঘেঁষতে দেয় নি। তারপর থেকেই ঝুপড়ির বাসিন্দারা খুব খাতির করে ওকে, নানা সমস্যার কথা জানায় ওর কাছে। সুকুমারবাবু প্রায় রোজই এই ঝুপড়ির ঠেকে আসে। নেশা করে। নেশা করলেই আবার অন্যমানুষ। পরে আরও জেনেছে, ওই লোকটা এখানে কয়েকটা নিষিদ্ধ ব্যবসা চালায়। তার স্বামীর সঙ্গেই যেন ওর মাখামাখিটা আরও বেশি। তার মনে হয়েছে, সুবল ওর কাছ থেকে লুকিয়ে টাকাকড়ি নেয়। এটা তার ভাল লাগে না। ভয় হয়। অন্য কোন মতলব নেই তো। তবে কু-নজরে তার দিকে তাকায় না। মুখ ফুটে যখনও কিছু বলেও নি। শুধু একদিন ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়েছিল কিছুক্ষণ। সেদিনই সুন্দরী তার সহজ নারী মন নিয়ে এক লহমায় বুঝতে পেরেছিল, ও তাকে পছন্দ করে, তার কাছে কিছু একটা চায়। মনে মনে হেসেছে সুন্দরী। এরপর তার নিজেরও কৌতূহল বেড়েছে। ও এলে তার ছলবলানিও যেন বাড়ে একটু। এক একবার তারও তখন, মাথায় পোকা নড়ে ওঠে। হঠাৎ করে বলাইয়ের কথা মনে পড়ে। মাথায় রক্ত উঠে যায়। চোখে আগুন ঝরে। শরীর টালমাটাল করে। ওর সঙ্গেই তো একদিন ঘর বাঁধতে চেয়েছিল সুন্দরী। ওই তো তার মধ্যে প্রেমের জোয়ার এনেছিল। সেই জোয়ারে ভেসে যেতে চেয়েছিল ও। তা আর এ জন্মে হল না। তখনই সুবলের ওপর তার প্রচণ্ড রাগ হয়। ভেতরটা জ্বলে যায়। স্বামীর ওপর তার প্রতিশোধ নেওয়ার ইচ্ছে হয়। সেদিন কত অত্যাচারই না করেছে তার ওপর। মনে হলে, সব কেমন বিবিয়ে ওঠে। ইচ্ছে করলে সুকুমারবাবুকে নিযেও এখন পদ্মর মত কোথাও পালিয়ে যেতে পারে সে। একবার শুধু মুখ ফুটে বলা। একদিন হয়তো তা-ই করে বসবে ও। তবে সুবল আগের মত আর বাড়াবাড়ি করে না। এর মধ্যে কাছাকাছি সার্কাস এসেছিল। সুবল তাকে সার্কাসে নিয়ে গেছে। মেলা বসেছিল। সেই মেলায় নিয়ে গিয়ে ঘরের টুকিটাকি জিনিস কিনে দিয়েছে। কাচের চুড়ি, স্নো-পাউডার, ছাপার শাড়ি দিয়েছে

তাকে। নাগরদোলা চড়িয়েছে। গরম গরম জিলিপি খেয়েছে তারা। হাত ধরে মেলায় ঘুরে বেড়িয়েছে। ফুচকা খেয়েছে। একদিন সুকুমারবাবুর সঙ্গেও গিয়েছিল। প্রথমে যেতে চায়নি ও। সুবলই তাকে জোর করেছে যেতে, বাধা দেওযা তো দূরের কথা। মুহূর্তের জন্যে অবাক হয়ে গিয়েছিল ও। পরক্ষণই কী একটা ভেবে খিলখিল করে হেসে উঠেছে। আব দাঁড়ায় নি। প্রথম প্রথম একটু আড়ষ্ট লাগছিল। তারপবই খুশিতে ভেসে গেছে। সুকুমারবাবু সেদিন তাকে ভালভাল জিনিস খাইয়েছে। তার পছন্দসই কয়েকটা জিনিসও কিনে দিয়েছে। ঘরে এসেও খুশিতে উচ্ছল। সুন্দরী বুঝতে পারছিল, সুবলের মনে একটু একটু করে একটা জ্বালা ছড়িয়ে পড়ছে। দারুণ মজা লাগছে তার। জ্বলুক, আরও জ্বলুক।

হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকাল। বাজ পড়ল। বিকট একটা শব্দ। চমকে উঠেছে সুন্দরী। বাইরেটা আরও অন্ধকার হয়ে উঠেছে। ড্রেনের জলে সোঁ সোঁ শব্দ। পার্কের পুকুরের জল উপচে পড়ছে। সব মাছ বেরিয়ে যাচ্ছে। নর্দমায় গামছা পেতে ছোটছোট ছেলেমেয়েরা মাছ ধরছে। একটা উত্তেজনা, হইচই। বড়রাও নেমে পড়েছে। সুন্দরীরও ইচ্ছে করছে মাছ ধরতে। বৃষ্টিতে ভিজে মাছ ধরার একটা নেশা আছে। আচমকা বাবার কথা মনে পড়ে যায় তার। মনটা ভারী হয়ে ওঠে। সেসবদিন পেছনেই পড়ে থাকল। আর ফিরে আসবে না কোনদিনও।

এতক্ষণ যেন একটা ঘোরের মধ্যে ছিল সুন্দরী। এখন মনে হলো, তার খুব খিদে পেয়েছে। পেটের ভেতরটা মোচড় দিচ্ছে। একটা বমি-বমি ভাব। উনুন ধরায় নি আজ। কোন উপায়ও ছিল না। ঘরে মুড়ি ছাতু ছিল। তাই খেল। ঢকঢক করে জল খেল। এতক্ষণে স্বস্তিবোধ করল। 'আঃ, শরীলড্যা য্যান্ জুড়াইয়া গ্যাল'।

বাইরের দিকে তাকাল একবার। না, দিনের দিকে তাকিয়ে বেলা বোঝায় উপায় নেই। ঝড় জল মাথায় করে সেই কোন সকালে সুবল বেরিয়েছে। এখনও ফেরেনি। দুপুরে খেতেও এলো না। রাস্তাঘাটে জল জমে গেছে। রাস্তায় রিক্সার খুব ছোটাছুটি চলছে। রিক্সার বাজার আজ খুব ভাল। তাহলেও অনেকক্ষণ তো হয়ে গেছে। মানুষটার আক্কেলটা কীরকম। ওইরকমই বুদ্ধিসুদ্ধি। মনে মনে রাগ হয় তার।

সুবলের আজ সওয়ারীর অভাব নেই। দম ফেলতে পারছে না ও। বৃষ্টিতে ভিজছে। ভিজতে ভিজতেই রিক্সা চালাচ্ছে। পাঁই পাঁই করে ছুটছে রিক্সার চাকা। সুন্দরী ভাবছে, এই বৃষ্টিতে ভেজার কী মানে হয ওর। শরীরের দিকেও তাকাচ্ছে না। চলে এলেই তো পারে। শেষে জ্বরজারি এলে, তাকেই তো ভুগতে হবে। টাকা রোজগারের নেশায় পেল নাকি। আগে তো এমন উদ্যম ছিল না। আবার পরমুহূর্তেই একটা খটকা লাগে। কেন যেন তার মনে হয়, রোজগারের নেশাতেই কি ও এমন করে ভিজছে? নাকি লুকনো কোনো অভিমান, না-বলা যন্ত্রণা এমন উদ্‌ভ্রান্তের মত তাকে ঘুরিয়ে চলেছে।

সুবল ভাবে অন্য কথা। আজ আর যাত্রীর জন্যে বসে থাকতে হচ্ছে না। ভাড়াটাও বেশি। একটু যে বিশ্রাম নেবে, তারও উপায় নেই। এরই মধ্যে একফাঁকে রমেশের দোকানের সামনে রিক্সা দাঁড় করিয়ে মুড়ি, তেলেভাজা ও চা খেল। বিড়ি ফুঁকল। মনের মধ্যে কী যেন একটা অলক্ষে কাজ করে চলেছে। ক দিন কী গুমোটই না গেছে। চড়চড় করে রোদ্দুর উঠত। কী তার কাজ। গায়ে জ্বালা ধরত। এর মধ্যে রিক্সা চালানোয় যে কী কষ্ট হেতো। কলকল করে ঘামত, হাঁপাত। পেটের ধান্দায় বেরোতেই হতো। এছাড়া তো আর উপায় নেই। রোদের চেহারা দেখেই মাথা ঘুরত। তাড়াতাড়ি করে চলে আসত। ঘরের সামনে রিক্সাটা চাবি মেরে চান খাওয়া করত, ঘুমোত। বিকেলে রোদের তেজ কমলে বেরোতো। দশটা, সাড়ে দশটা পর্যন্ত রিক্সা চালাত। কোন কোন দিন আগেও চলে আসত।

আজ দুপুরে সুবল খেতে আসে নি। খেতে যাওয়া মানেই ক্ষতি। হাতে কটা পয়সা এলে কার না ভাল লাগে। মনটা কার না ফুরফুরে হয়ে ওঠে। সুকুমারবাবু তার কাছে অনেকগুলো টাকা পাবে। টাকা দিয়ে যেন তাকে বেঁধে ফেলেছে। তার ঘরে আসে। সুন্দরীর সঙ্গেও আলাপ হয়ে গেছে ওর। নেশা করে। সুবলকে সঙ্গে নিয়েই করে। সুন্দরীও ওর কাছে অনেক সহজ এখন। তার বউটা বড় বোকা। সুবল সঙ্গে যায় নি। সে যেতে বলেছে বলেই কি ওর সঙ্গে চলে যেতে হবে। ফিরে এসে আবার কত গল্প। খুশি যেন আর ধরে না। মুখে হাসি থাকলেও ভেতরে ভেতরে সে খুব কষ্ট পেয়েছে। তার বউ তাকে বুঝবে না। ভেতরের কষ্ট, ভেতরেই সে চেপে রেখেছে। বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে সে এসব কথাও ভাবছিল।

দুপুরের দিকে আকাশটা একটু সেঁক দিয়েছিল। খানিকক্ষণ পর আকাশ আবার কালো হয়ে এলো। ফের খুব জোরে বৃষ্টি নামল। সঙ্গে ঘুরানো হাওয়া ছিল। সুবল আরও কিছুক্ষণ রিক্সা চালাল। আর যেন সে পারছিল না। খুব কাহিল লাগছিল শরীর। বৃষ্টির জলে হাত পায়ের আঙুলগুলো কেমন শিটে হয়ে গেছে। বিবর্ণ। কোন সাড় নেই যেন। তাছাড়া খিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছিল। উদোম গায়ে বাতাসের সূঁচ-ফুটানো বাড়ে। শীতে কাঁপছিল সে। দাঁতে দাঁত লেগে যাচ্ছিল। রিক্সাটা ঝুপড়ির সামনে দাঁড় করিয়ে সুবল ডাকল, 'তাড়াতাড়ি কইরা শুকনা কিছু একটা দে, আর দাঁড়াইয়া থাইকতে পারতাছি না।' এই জলকে ভিইজতে তুমারে কে কইছিল?' সুন্দরী একটা লুঙ্গি আর গামছা বাড়িয়ে দিল।

সুবল মাথাটা আগে মুছল। পরে হাত চুল মুখ পা সব। লুঙ্গিটা পরতে পরতে মাথা নিচু করে ঘরে ঢুকল, 'আগে কিছু খাইতে দে।'

সুন্দরী এনামেলের থালায় ছাতুমুড়ি গুড় দিল। মাখতে যেটুকু সময়। কিছুক্ষণের মধ্যেই তা শেষ। এতক্ষণে আরাম বোধ করল।

'খুব খিদা পাইছিল।'

'খিদার আব দোষ কি, সেই কখন বাইরইছ।'

'শরীরটা খুব ম্যাজম্যাজ করতাছে, মাথাডাও ধরছে।'

'অত ভিইজলে আর হইব না?'

'হুঁ, খুব ভিজান্ডা ভিইজ্‌ছি আইজ, তবে এর লাইগ্যা দুইড্যা পয়সাও বেশি পাইছি।' বলতে বলতে সুবল একটা বিড়ি বের করল কৌটা থেকে। বিড়িটা টিপে টুপে বার দুই ফুঁ দিল। পরে দাঁতে চেপে ধরে বিড়ি ধরাল। এক মুখ ধোঁয়া নাক-মুখ দিয়ে বের করে দিতে ও বলল, 'আইজ একজন একটা খুব খারাপ খবর শুনাইল রে।' বলতে বলতে ওর মুখের ওপর দুশ্চিন্তার কয়েকটা রেখা ফুটল।

সুন্দরী তাকাল। তার কপালেও ভাঁজ পড়েছে।

'হুঁ, আমাগোর পক্ষে খারাপই।'

'কইবা ত খবরডা।'

'দুই একদিনের মধ্যেই নাকি ঝুপড়িগুলান ভাইঙ্গা দিব অরা।'

'অরা কারা?'

'পার্টির লোক, ইয়ার সঙ্গে পুলিসও রইছে।'

সুন্দরী চুপ করে থাকে। তারও মুখের ওপর চিন্তার কাটাকুটি।

একটু করেই সুকুমারের গলা পাওয়া গেল। 'সুবল আছ নাকি?'

'আছি গো বাবু, আসেন, ভিতরে আসেন।'

সুকুমার ঘরে ঢুকল। তার কাঁধে একটা ব্যাগ।

সুন্দরী হাসি হাসি মুখে একটা বসার আসন এগিয়ে দিল। ও বসল। ব্যাগ থেকে দুটো বোতল বের করে মেঝেয় রাখল। কিছু চপ কাটলেট, ভাজাভুজিও এনেছে। তার একটা সুবাস বেরোচ্ছে।

সুন্দরী তাড়াতাড়ি করে হ্যারিকেন ধরিয়েছে। আলো কমিয়ে লণ্ঠনটা এক কোণায় রেখেছে। বাইরে অন্ধকার। তখনও বৃষ্টি পড়ছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে।

'নেশা করার একটা আদর্শ দিন বটে, কি বল সুবল।' সুকুমার বলল। শরীর ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে হাসল।

'তা ঠিক।' সুবল মাথা নাড়ে। তারও মন এখন ফুরফুর করছে।

সুন্দরী দুটো গ্লাস বার করে দিল। জলের হাঁড়িটা এগিয়ে [illegible]ল। খাবারগুলো মাঝখানে রাখল। সুকুমার দুটো গ্লাসে মদ ঢালল। জল মেশা[illegible] [illegible]াসে চুমুক দিয়ে সুন্দরীর দিকে চেয়ে সুকুমার বলল, 'কি, একটু হবে নাকি?'

সুন্দরীর মুখে একটা মিষ্টি হাসি ফুটল, বলল, 'নাগো বাবু, উয়া আমায় সয় না।'

'আজ একটু চলতে পারে, যা বাদলার দিন।'

'আমারে খেমা দ্যান বাবু, অই ত, ভাজাভুজি কত আছে।'

এমনি করেই রাত বাড়ে। নেশাও জমে ওঠে। সুবলের কথা জড়িয়ে যাচ্ছে।

সুকুমারও নেশায় টং হয়ে আছে। তার চোখ করমচার মত টকটকে লাল। একটা বোতল শেষ হয়ে গেছে। অন্যটাও প্রায় শেষ।

সুন্দরীর চোখও ঘুমে টানছে। কিন্তু জেগে থাকতে বাধ্য হচ্ছে। সুকুমারবাবু না গেলে তো আর ঘুমোতে পাববে না। হঠাৎ খেয়াল হলো, সুকুমারবাবু তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। এর চোখে তখন অন্য কথা। শরীরটা যেন কামনার আগুনে পুড়ছে। সেই আগুনের আঁচ সুন্দরীর শরীরকেও ছুঁয়েছে। হ্যারিকেনের আলো ঝিমঝিম। বৃষ্টির একটানা শব্দ। সব মিলিয়ে যেমন একটা মাতাল চেহারা। সুকুমারের হঠাৎ কি খেয়াল হলো। সুন্দরীর হাত ধরে টানল। ও কিছু বলল না। হাত ছাড়াল না। মুচকি হাসল। সুকুমার তখন টলছে। ওকে কাছে টেনে নিল, বলল, 'তোকে আমি খুব ভালবাসিরে সুন্দরী, এই ঘরে তোকে মোটেই মানায় না। তোর এই সোমত্ত যৌবন এভাবে শেষ করবি কেন রে, কি লাভ।' বলতে বলতে ওকে আরও কাছে টানতে চেষ্টা করছে। কথাগুলো জড়ানো, অস্পষ্ট।

সুবল আর পারল না। নেশায় ভাল করে সে তাকাতেও পারছে না। চোখ বুঁজে আসছে বারবার। হঠাৎ মনে হলো, সুন্দরীকে ভুলিয়ে ভালিয়ে তার কাছ থেকে নিয়ে যেতে চাইছে সুকুমারবাবু। সেদিন তার বউকে ওর সঙ্গে যেতে দেওয়া ঠিক হয় নি। তারপর থেকেই যেন ওর লোভ, সাহস বেড়ে গেছে। আজ আরও বাড়াবাড়ি করছে। তার অসহ্য লাগছে। চোখ জ্বালা জ্বালা করছে। কান দিয়ে ভাপ বেরোচ্ছে। পা টলছে। টেনে টেনে জড়ানো গলায় বলল, 'এইস্ শালা সুকুমারবাবু, বইল্‌ছি আমার বউয়ের গায়ে হাত দিবা না, ভাল হইব না।'

'দেব, আলবাৎ হাত দেব, তোর বউ আমাকে ভালবাসে। আমি ওকে বিয়ে করব রে শালা। ওকে রানির মত রাখব। তুই একটা আস্ত ছুঁচো।'

'খবরদার, অ্যাখনও কইতাছি, অর হাতটা ছাইড়া দাও বাবু।'

'আমাকে ভয় দেখাচ্ছিস শালা, তোকে যে এত টাকা দিয়েছি সে কি মাগনা,দে আমার সব টাকা ফেরত দে।'

তখনও সুন্দরীর হাত ধরে রেখেছে। ওর ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করছে।

'অখনও কইতাছি বাবু, কাজটা ভাল করতাছেন না, মানে মানে বিদায় নেন।'

'আমাকে ভয় দেখায় নাকি?'

'আপানারে কে ভয় দেখাইব, আপনার ভয়েই ত সব ঠকঠক কইরা কাঁপে।'

'তাহলে চুপ করে থাক।'

'অরে ছাইড়া দ্যান্ কইতাছি।'

'না, ছাড়ব না।'

'কি কইলেন?' মাথায় আগুন ধরে গেছে সুবলের। তার চোখের সামনে বউকে নিয়ে টানাটানি করছে। আর সহ্য করতে পারল না। আরও কাছে চলে

এলো ও। 'তবে রে', বলেই শরীরের সব শক্তি ঠেলা দিয়ে ওকে ফেলে দিল। কয়েকবার হাত চালাল।

'কি, আমার গায়ে হাত।' সুকুমার টলতে টলতে উঠে দাঁড়ায়। নেশাটা যেন চট করে জল হয়ে গেল। তার চোখ-মুখ হিংস্র, আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। সুন্দরীও ভয় পেয়ে গেল। ওর এরকম চেহারা এই প্রথম দেখল। বুক কেঁপে গেল।

সুবলকে টানতে টানতে ও বাইরে নিয়ে গেল। কোমরের বেল্ট খুলে ফেলেছে ততক্ষণে। ও তখন কাণ্ডজ্ঞানহীন। রাগে রীতিমত জ্বলছে। বেল্ট দিয়ে এলোপাথাড়ি মারতে লাগল ওকে। সুবলের মুখ দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে। শরীরের জায়গায় জায়গায় কেটে গেছে। সেখান থেকেও রক্ত ঝরছে। কোন কথা বলতে পারছে না সে।

সুন্দরী সুবলের সামনে এসে আগলে দাঁড়াল। ও-ও চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'অরে, এই ভাবে গরপেটার মতন মারতাছ ক্যান্ গো বাবু, অ কী করছে!'

সুন্দরীর কথা কানেই নিল না সুকুমার। তখনও পিটিয়ে চলেছে। সুন্দরী এবার কাকুতি মিনতি করে বলল, 'আর মাইরো না গো বাবু, আর মাইরো না, তোমায় দুইডা পায়ে পড়ি।'

ঝুপড়ির অনেকেই বেরিয়ে এসেছে। সুকুমারকে দেখে কারও মুখে আর কথা নেই। কারও সাহসেই কুলোলো না, ঘটনাটা কি ঘটেছে একবার জিজ্ঞেস করে। হাতকাটা দাশুও এসে পড়েছে ততক্ষণে। সুকুমারের চেলা। ও আরও ভয়ঙ্কর। কিছু না বাঁ হাতে ভোজালিটা বের করে ফেলল।

'শালার হাতটা আগে কেটে দে।' সুকুমার ওকে লেলিয়ে দিল।

দাশু ভোজালিটা সবে তুলেছে। ঠিক তক্ষুণি পুলিসের গাড়িটা চলে এলো। দাশু ধরা পড়ে গেল। সুকুমার মুহূর্তে গলির অন্ধকারে পালিয়ে গেল। যাওয়ার আগেও ও শাসাল, 'দেখি তোকে কোন শালা এসে বাঁচায়।'

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল পুলিসের গাড়ি। সে রাত্রে আর কোন হাঙ্গামা হয়নি।

ভয়ে ভয়েই রাত কাটল সুন্দরীদের। একটা লোকও এগিয়ে এলো না। পরিষ্কার ন্যাকড়া দিয়ে সুবলের যেখানে যেখানে রক্ত বেরিয়েছে, তা মুছে দিল। তার আর ঘুম এলো না। ভয়ে শরীরে কাঁটা দিল। সুবল আজ খুনই হয়ে যেত। চোখ বুঁজলেই চমকে চমকে উঠেছে। বাকি রাতটা প্রায় জেগেই কাটাল সুন্দরী। সকাল হলো। আকাশ মেঘহীন।

দিনটাও ভালয় ভালয় কাটল। আজ আর কাজে গেল না সুবল। যাওয়ার ক্ষমতাও নেই তার। সারা শরীরে ব্যথা। জ্বর এসে গেছে।

একটু বেশি রাতেই ওরা এলো। পার্টির লোক, পুলিসের গাড়ি। ওরা ঝুপড়ি ভাঙতে এসেছে। ওদের কাছে খবর আছে, অনেকদিন ধরেই এখানে অনেক রকমের ব্যবসা চলে। গুণ্ডা সুকুমার এখানে কলকাঠি নাড়ে। গোপন ব্যবসা চালায়।

ও গা ঢাকা দিয়েছে। যে যা পারল, ঘরের আসবাবপত্র নিয়ে ওরা অন্য ফুটপাতে, গাড়ি বারান্দার নিচে আশ্রয় নিল।

পরের দিন সবাই দেখল, ঝুপড়ি আর নেই। ভেঙে সব সমান করে দিয়ে গেছে।

থেকে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো সুন্দরীর। ও সুবলের মুখের দিকে তাকাল। আজ যেন অন্যরকম লাগছে ওকে। মুখটা শুকিয়ে গেছে। শরীর খুব দুর্বল। সুন্দরী বলল, 'আর ক্যান্, চল আমরা গাঁয়েই ফিরা যাই আবার। ওখানে ত ভিটডা আইজও আছে। তাছাড়া ওইখানে মাথার ওপর বিশাল আকাশ আছে, নদী আছে।' বলতে বলতে ও অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। সুবলের মধ্যে আজ যেন সে অন্য এক মানুষকে খুঁজে পেল। ও তাকে বাঁচিয়ে দিল, আরও বড় এক লজ্জার হাত থেকে। গুণ্ডা বদমাশকে বিশ্বাস করতে আছে? ওরা পারে না এমন কোন কাজ নেই। আজ কেন যেন তার বারবার মনে হচ্ছে, একদিন সে জোয়ারে ভাসতে চেয়েছিল, সুবলের ওপর তার ঘৃণা ছিল। এখন আর ওসব কিছু নেই। হঠাৎ মনে হলো, এতদিন পর আবার যেন তার মনের মধ্যে কি-আশ্চর্য জোয়ারের জল কলকল শব্দে ঢুকছে। সুন্দরী এই প্রথম বুঝতে পারছে, এ যেন এক অন্যরকমের জোয়ার। একেবারে নতুন স্বাদের।

পাতাল খুলেছো যদি

লীনা গঙ্গোপাধ্যায়

বিকেল এখন সন্ধের বাঁকে। রাস্তায় পেঁজা তুলোর মতো বরফ পড়ছে। আস্তে আস্তে সাদা হয়ে আসছে দু-ধারের ম্যাপেল আর ফার গাছের মাথা, ঝুরো বরফ আটকে রয়েছে পাতার গায়ে গায়ে। ঠিক যেন বরফের ফুল। মস্কো শহরের রাস্তায় রাস্তায় আলো জ্বলে উঠেছে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত গরম পোষাকে ঢেকে কিছু নারী-পুরুষ অত্যন্ত নিঃশব্দে হেঁটে যাচ্ছে ওই পথে। এখন এই বরফপড়া সন্ধ্যে সমস্ত কিছু আলগা কুয়াশায় ঢেকে যাওয়ায় গোটা শহরটাকেই মায়াময় দেখাচ্ছে। যেন এই শহরের সমস্ত উষ্ণতা, সতেজতা, কর্মমুখর কোলাহল সব আড়াল করে বরফ আর কুয়াশায় নতুন এক আস্তরণ তৈরি করেছে যাতে পুরো শহরটাকেই মনে হচ্ছে নিঃশব্দ, নিথর এক শোকনগরী। তুরা পায়ে চলার রাস্তা দিয়ে মস্কো আর্ট থিয়েটারের বিশাল গম্বুজাকৃতি এক তলা বাড়িটার দিকে হেঁটে যাচ্ছে। আর কয়েক-পা এগোলেই মস্কো আর্ট থিয়েটার। সে উল্টোদিকে একটা বড় ঘড়িওলা বাড়ির দিকে তাকাল। ছটা বেজে পাঁচ মিনিট তেরো সেকেণ্ড। মুখের যে অংশটুকু খোলা রয়েছে তাতে ছুঁচলো হিমেল বাতাস এসে ঝাপটা মারছে বারবার।

তুরা তার শরীর গরম রাখতে হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল। আর ঠিক সোয়া ছটায় মস্কো আর্ট থিয়েটারের দরজায় পা দিল। এতক্ষণে একটু একটু উত্তেজনা হচ্ছে তুরার। বুকটা সামান্য ধড়ফড় করছে। সেসব নিতান্ত উপেক্ষা এবং অগ্রাহ্য করেই তুরা ভেতরে ঢুকে পড়ল। বিশাল স্টেজ। যা এ পর্যন্ত তার কল্পনারও বাইরে ছিল। কলকাতার তিন-চারটে রবীন্দ্রসদনের মঞ্চ একসঙ্গে করলে যতখানি বড় হয় তার চাইতেও সামান্য বেশি-ই হবে।

স্টেজে কোনও নাটকের মহড়া চলছে। দু-হাতের পাতায় চোখ ঢেকে তুরা হলের ভেতরের অন্ধকার সইয়ে নিল। ঢোকার মুখে একজন কর্মচারী ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিয়েছিলেন, স্তানিস্লাভস্‌কি কোথায় রয়েছেন। তাঁর নির্দেশ মতো এগিয়ে উইংসের একেবারে সামনের দিকে দেখতে পেল, একটু কোণ ঘেঁষে একটি আরামকেদারায় বসে রয়েছেন সন্তপ্রতিম, একমুখ সাদা দাড়ি সমেত মানুষটি। স্তানিস্লাভসকি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নাট্য প্রয়োগবিদ ও তাত্ত্বিক। ওঁর পাশের ফাঁকা চেয়ারটায় বসে পড়ল তুরা। ভদ্রলোক ফিরে-ও তাকালেন না। তখন স্টেজে টেবিলের ওপর একটি অর্ধনগ্ন কিশোরীকে শুইয়ে তার গভীর নাভির গর্তে মদ ঢেলে দেওয়া হচ্ছে, একজন ব্যারন সেই মদ তাঁর ছুঁচলো জিভ দিয়ে চেটে নিচ্ছেন। চারপাশে উৎসবের আমেজ। হাততালি। হুল্লোড়। চাপা গুঞ্জন। ক্রীতদাসী কিশোরীটির মুখের ওপর আলট্রা মেরুন স্পট। হঠাৎ স্তানিস্লাভসকি চিৎকার করে উঠলেন। 'আলো ফেইড করো। আলো

ফেইড করো'। তুরা বুঝতে পারল দস্তয়েভ্স্কির 'কারমাজোভ ব্রাদার্স' হচ্ছে। মধ্যযুগের ক্রীতদাসীদেব পরিবারের কিশোরী মেয়েদের নিয়ে এই ধরনের আমোদে মেতে ওঠা ব্যারনদের এক বীভৎস মজা ছিল।

স্টেজে এবং হলে আলো জ্বলে উঠল। এখন বিরতি। হঠাৎ স্তানিস্লাভ্স্কির চোখ পড়ল ছোটখাটো চেহারার বিচিত্র পোশাক পরা তুরার দিকে। একটু অবাক হয়েই তাকালেন। তুরা মাথা থেকে টুপি খুলে উঠে দাঁড়াল— আমি তুরা। তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশ থেকে এসেছি। স্তানিস্লাভ্স্কির চোখে-মুখে উৎসাহ— বলো কি করতে পারি?

আপনি বিশ্বের সেরা প্রয়োগবিদদের একজন। আমি নাটকের একটি চরিত্র নিয়ে খুব সমস্যায় পড়েছি। এই বিষয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই। স্তানিস্লাভস্কি তাঁর প্রিয় করোনা চুরুট ধরালেন। মুখে মৃদু হাসি। চুরুটে দীর্ঘ টান দিয়ে বললেন— তোমার সঙ্গে নাটক নিয়ে কথা বলার আগে সে বিষয়ে তুমি কতখানি যোগ্য, তা দেখতে চাইতে পারি?

— অবশ্যই।

— এখন স্টেজ খালি। স্টেজের পেছনে ওই সে সিল্কের ড্রপ-সিন আছে। ওইখানে আমি একটি পিন পুঁতে রেখেছি। ওটি আমার হাতে এনে দিতে পারলে তবেই আমি তোমার সঙ্গে নাটক নিয়ে কথা বলব।

— ওখানে কোনও পিন নেই।

— না খুঁজে-ই কি করে জানলে?

— এই একই কাজ আশি বছর আগে ওল্গাকে করতে বলেছিলেন। আঙ্কল ভেনিয়া নাটকের মেইন রোলে নেওয়ার আগে।

— তুমি কে?

এর মধ্যে আশিটা বছর কেটে গেল।

— সময় এগিয়ে গেলেও মানুষ তার মূল সমস্যা থেকে মুক্ত হতে পারেনি স্তানিস্লাভস্কি। কারমাজোভ ব্রাদার্সের মতো ঘটনা সারা বিশ্বে এখনও অন্য ফর্মে ঘটে চলেছে।

— সেকি। আমি আজকাল অবশ্য অন্য দেশের খবরাখবর তেমন রাখতে পারি না। এখন এই মস্কো শহর আর এই মস্কো আর্ট থিয়েটারের মধ্যেই আমার যা-কিছু ঘোরাফেরা। অবশ্য মাঝে-মাঝে কমরেড লেনিন ডিনারে ডাকেন। কথাবার্তা হয়। বড় দুঃখ করেন।

— কেন?

— লেনিনবাদীরা সারা বিশ্বে নাটক শিল্প সাহিত্য নিয়ে যা করে বেড়াচ্ছে, তাতে লেনিন বলেন, 'দে আর মোর লেনিনিস্ট্স্ দ্যান লেনিন'।

— আপনি দয়া করে আমার সমস্যা শুনুন স্তানিস্লাভস্কি।

— নিশ্চয়ই শুনব। তার আগে চলো আমাদের এখানকার একটা পাবে তোমাকে একটু ভদ্‌কা খাওয়াই। খেতে খেতে তোমার সমস্যা শোনা যাবে।

এখন প্রায় সন্ধে। স্তানিস্লাভ্‌স্কির পাশে পাশে হেঁটে যাচ্ছে তুরা। দীর্ঘদেহী মানুষটি হেঁটে চলেছেন সামান্য সামনের দিকে ঝুঁকে। পরণে গ্রেট কোর্ট, হাঁটু পর্যন্ত ব্রালোস ধাঁচের জুতো, মাথায় ফারের টুপি, হাতে দস্তানা। তাঁর লম্বা লম্বা পা ফেলে হেঁটে যাওয়ার অভ্যেস। তুরার মনে হচ্চে তিনি যেন সম্পূর্ণ শরীর দিয়ে কুয়াশার জাল ছিঁড়তে ছিঁড়তে এগিয়ে যাচ্ছেন।

একটু কোণের দিকে দুটো মুখোমুখি চেয়ারে তুরাকে নিয়ে বসলেন স্তানিস্লাভ্‌স্কি। ভদ্‌কার অর্ডার দেওয়া হল। দাড়িতে ঘন ঘন হাত বুলোনো বোধহয় ওঁর একটি প্রিয় অভ্যেস। সেই সঙ্গে চোখ বুজে মৃদু হাসি। সেই ভঙ্গি তেই বললেন— এইবার, শোনা যাক তোমার সমস্যা।

তুরা স্তানিস্লাভ্‌স্কির চোখের দিকে তাকাল। খুব স্পষ্ট গলায় বলল, মধ্যপ্রাচ্যের ইসলামিক কান্ট্রিগুলোতে এক সাংঘাতিক প্রথার প্রচলন আছে। নারী খৎনা। সেখানে মেয়েরা বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের সেক্‌স্ অরগ্যানগুলো কেটে বাদ দেওয়া হয়।

চোখ খুলে সোজা হয়ে বসলেন স্তানিস্লাভ্‌স্কি— আশ্চর্য। এই প্রথা এখনও আছে?

— হ্যাঁ, তাদের চোখে বিপর্যয় ঘটানোই তার নারীদের একমাত্র কাজ। তা থেকে সমাজকে বাঁচানোর জন্যই তাদের সেক্‌স্ অরগ্যান কেটে ফেলা হয়। তার ফলে নারীর শরীর কখনোও জাগে না। এইভাবে তারা সমাজ আর সতীত্ব রক্ষা করে।

—এই ঘটনা এখনও ঘটছে?

— ন্‌ও এল এল সাদাওয়ি আরবদেশের একজন চিকিৎসক। তাঁর নিজের জীবনে খৎনার এই অভিজ্ঞতা নিয়ে এই তো সেদিন মাইল্‌স্ নামে তিনি একটি বই লিখেছেন।

— এই আশি একশ বছরে সমাজ এতটুকু বদলাল না?

— কোথায় আর বদলাল? আপনি যদি সাহস দেন তবে আরো বলতে পারি।

— তোমাকে খুব সাহসী বলেই তো মনে হচ্ছে। সাহস দেওয়ার কি দরকার আছে আরও? হাসছেন স্তানিস্লাভ্‌স্কি। তুরার চোখে রক্তচুনি। শরীরে রক্তকণাদের দ্রুত লাফালাফি।

— বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়কার লেখালেখিতেও এই ধরনের নানা ছবি। শুনলে আপনি অস্থির হয়ে পড়বেন।

— বলো, শোনা যাক।

— একজন পাকিস্তানি মেজর বিলকিস নামের একটি কিশোরীকে শারীরিক ধর্ষণ করার আগে কিভাবে মানসিক ধর্ষণ করছে শুনুন।

আমাকে একটা কথা বলো, হিন্দুরা কি প্রতিদিন গোসল করে?

মেয়েটি চুপ করে থাকে।

— হিন্দু মেয়েদের গায়ে নাকি কটু গন্ধ?

মেয়েটি চুপ করে থাকে।

— তাদের জায়গাটা পরিস্কার?

মেয়েটি চুপ করে থাকে।

— শুনেছি, হয়ে যাওয়ার পর সহজে বের করে নেওয়া যায় না?

মেয়েটি এখনও চুপ করে থাকে।

— আমাকে কতক্ষণ এভাবে ধরে রাখতে পারবে?

এইবার দুহাত তুরার মুখের সামনে প্রসারিত করে তাকে থেমে যাওয়ার ইশারা দেন স্তানিস্লাভ্‌স্কি। ক্রমশ টেবিলের ওপর তাঁর মাথা নেমে যেতে থাকে।

তুরা স্তানিস্লাভ্‌স্কিকে দেখছে। অপলক। তার গলায় হাহাকার— আমার যে কথা এখনও শেষ হয়নি স্তানিস্লাভ্‌স্কি। তিনি বিষণ্ণ গলায় বলেন— আরও আছে?

— আমার আসল কথাই এখনও বলা হয়নি। স্তানিস্লাভ্‌স্কির বুক থেকে একটি দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে।

— বলো।

— আমি ভারতবর্ষের কলকাতা নামের শহরে একটি স্লাম এরিয়ায় কাজ করি। সেখানকার মেয়েদের অবসর সময়ে লেখাপড়া শেখানো, একটু-আধটু নাটক ছবি আঁকা এসবের মধ্যে দিয়ে আনন্দ দেওয়ার চেষ্টা করি।

— বাঃ, এতক্ষণে একটু আশার কথা শোনালে।

— না, স্তানিস্লাভ্‌স্কি না। এখানেও আশা নেই। ভারতের মতো সেকুলার কান্ট্রিতেও মুসলিমদের মধ্যে খুব গোপনে এই খৎনার কাজ হয়ে চলেছে।

— সেকি।

— হ্যাঁ, আমার বস্তির একটি মুসলিম মেয়েকে খৎনা করা হয়েছে।

— তারপর?

— মেয়েটা এখন ভাল করে হাঁটতে পারে না। মানুষজনকে ভয় পায়। এমনকি জোরে বাতাস বইলেও অজ্ঞান হয়ে যায়। অথচ ওইভাবে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে মায়ের সঙ্গে সে একটি চিংড়ি ছাড়ানোর কারখানায় কাজ করতে যায়।

— যারা দুবেলা পেট ভরে খেতে পায় না, তারা সবার আগে খাবারের চিন্তা করবে। তাদের পক্ষে....

স্তানিস্লাভ্‌স্কিকে কথা শেষ করতে দেয় না তুরা— সবার ওপরে ইসলাম।

তিনি দীর্ঘ সময় নিয়ে তাকান তুরার দিকে— আমি কিভাবে তোমাকে সাহায্য করতে পারি?

— এই ঘটনা আমার জীবনের সবকিছু ওলোট-পালোট করে দিয়েছে। আমি এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে একটা নাটক লিখেছি। ওই মেয়েটির চরিত্রে আমি নিজে অভিনয় করব আপনি আমাকে সবরকম সাহায্য করুন।

— ঠিক আছে। তুমি নাটকের স্ক্রিপ্ট নিয়ে মাঝে মাঝে চলে এসো।

— আপনি আমাদের নাটক দেখতে যাবেন স্তানিস্লাভ্স্কি। তিনি খুব প্রত্যয়ের সঙ্গে উত্তর দেন যাব।

তুরার চোখে এতক্ষণে গোটা মস্কো শহর সমস্ত কুয়াশা ছিঁড়ে বেরিয়ে এল।

দুই

শুভম চোখ বুজেই টের পেয়েছিল যে, তুরা ঘরে এসেছে। এর ভেতর কোন-ও যাদু নেই। সে ঘরে এলে বাতাসে একরকম গন্ধ মিশে যায়। এই গন্ধ শুভমের ভীষণ চেনা। সে পাশ ফিরে শুল। কাল শুতে অনেক রাত হয়েছে। তাই চোখের পাতাগুলো গদের আঠার মতো আটকে আছে। তুরা এসে শুভমের চুলের মুঠি ধরল— দশটায় রিহার্সাল ফেলেছিস। এখন সাড়ে নয়। শুভমের আরাম লাগছিল। মাথার কোণে কোণে ক্লান্তি অবসাদ এই ঝাঁকুনিতে কেটে যাচ্ছে। তাই, তুরার এই চুল টানাকে সে খুব একটা গা করল না। ওঁর দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল — কাল ভোর রাতে ঘুমিয়েছি।

— কেন? তুরার গলায় ঝংকার।

— মুড লাইটিংয়ের ওপর একটা ভাল বই পেয়ে গেলাম। পড়তে পড়তে খেয়াল ছিল না।

শুভম বিছানা ছেড়ে উঠল। বাথরুমের দিকে যেতে যেতে বলল— কফি খাওয়া। কড়া করে করিস। কালো কফি। তুরা দ্রুত হাতে বিছানার চাদর টান টান করে ঘরটাকে মোটামুটি ভদ্রস্থ করার কাজে লেগে গেল।

শুভম বাথরুম থেকে বেরিয়ে বলল— কাল রাজাবাজার গিয়েছিলি? তুরা ঘর পরিস্কার করতে করতেই মুখ তুলে তাকাল। এবার তার গলার স্বর সামান্য— গম্ভীর গিয়েছিলাম।

ঘটনাটা যে ঘটিয়েছে তাকে ধরা গেল?

— হ্যাঁ, তার সঙ্গে কথা-ও বলেছি।

শুভম নড়েচড়ে বসল। তুরা বলল - দাঁড়া, আগে কফি নিয়ে আসি। 'না', শুভম ব্যগ্র হয়ে রয়েছে শোনার জন্য আগে বল। ওরা এলে একসঙ্গে কফি খাব।

— মেয়েটার এক চাচা আর নানি হজ্ব করতে গিয়েছিল। ওখানেই কার কাছ থেকে শুনে এসে ওর বাবা-মাকে বুঝিয়েছে। তখন ওই নানি আর মা দুজনে মিলে এক বাস্তিরে ঘুমের মধ্যে ওকে অপারেট করেছে।

— কিভাবে করল?

— ধারালো কাচের ফালি দিয়ে ভেতরের মাংসপিন্ড বার করে এনেছে।

শুভম এবার নিজেই নিজের মাথার চুল টেনে ধরেছে 'কোথায় বাস করছি বল তো'? তুবা নিভে যাওয়া গলায় বলল— 'মেয়েটার সেপটিক হয়ে যেতে পারত'। শুভম তীক্ষ্ন গলায় বলল 'মরে যেতে পারত'। তুরা শুভমের দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে রইল। একটু সময় নিয়ে বলল— 'মজা হল, মেয়েটা প্রথম দিন ভায়োলেন্স দেখিয়েছিল। এখন একেবারে সুর পালটে ফেলেছে।' শুভম উত্তেজিত 'তার মানে'?

— প্রথম দিন ওই তো আমার কাছে কান্নাকাটি করে সব কথা কবুল। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে শুধু এই কথাটা বলতে এসেছিল, 'আমাকে এখান থেকে নিয়ে যাও'

— এখন?

— কাল ওদের ঘরের সকলকে যখন পুলিশের ভয় দেখালাম, তখন ওই মেয়েটাই আগ বাড়িয়ে এসে বলল, তুমি আমাদের পড়া-লিখা শেখাও। এসব ব্যাপারে তোমার কি দরকার? আমাকে কেউ জোর করেনি। আমি ইচ্ছে করেই করেছি।" শুভম রাগে কথা বলতে পারছে না। তার সারা শরীর কাঁপছে। সে তুরার ওপর ফেটে পড়ল— 'এত বড় একটা ঘটনা, আর তুই ধীরে সুস্থে কফি বানাতে যাচ্ছিলি'? তুরা আর-ও শান্তভাবে বলল— 'এরকমই তো হওয়ার কথা। না? মেয়েটাকে তো আমরা ওখান তেকে বার করে আনতে পারিনি। ওর লোকজন, ওর সমাজ ওকে প্রেশার দিচ্ছে। ও কি করবে?'

— দেশে পুলিশ নেই, আইন নেই?

— আছে কি-না, তা তুই আমার থেকে ভাল জানিস। নাটকের ছেলেমেয়েরা একে একে আসছে। শুভম সিগারেট হাতে পায়চারি করছে। উত্তেজনায় তার ফর্সা মুখ এখনও লালচে। তুরা উঠে পড়েছে। কফি বানাতে যাওয়ার আগে খুব নির্লিপ্তভাবে বলল— 'রাগ কখনও শিল্পের জন্ম দেয় না। সব কিছু পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়। তখন পড়ে থাকে শুধু ছাই। খামোখা উত্তেজিত না করে আমাকে ঠিকঠিক নাটকটা করতে দে।'

তিন

স্তানিস্লাভস্কি তুরার সঙ্গে আলো নিয়ে কথা বলছিলেন। আজ মস্কো আর্ট

থিয়েটারে নয়, কোনও পাবেও নয়, একটা অ্যাভিনিউ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে রাস্তার গায়ে পার্কে ঢুকে পড়েছেন। সবুজ ঘাসে বসেছেন। আজ ঠাণ্ডা-কম। এই ঘোর বিকেলে পার্কটাও বেশ সরগরম নানা মানুষের আনাগোনায়। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছুটো-পুটি করছে এক ঝাঁক বাচ্চা।

তুরা বলল 'প্রথম দৃশ্যে আমার আত্মকথন থাকবে।' তিনি বললেন — 'আমি আলোটা বুঝিয়ে দিচ্ছি। তুমি সময়মত ডায়লগ ধরবে।'

তুরা অপেক্ষা করছে। স্ক্রিপ্টের পাতায় তার চোখ। স্তানিস্লাভস্কি বলছেন— 'প্রথমে স্টেজ ডার্ক থাকবে। তুমি পোজ নিয়ে দাঁড়াবে। আবহে ব্লু-দানিউবের সুর....', তুরা হঠাৎ বলে উঠল — 'না, আবহে বেহাগ।'

— বেশ, প্রথমে তোমার মুখে স্পট পড়বে। তারপর তুমি যতটুকু জায়গা নিয়ে দাঁড়িয়েছে। সেই জায়গাটুকু ঘিরে আলো ফেলে একটা বৃত্ত তৈরি হবে। তুমি তোমার কথা শুরু করবে। এই আলোয় তুমি নিজেকে ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না। আস্তে আস্তে বৃত্তটা বড় হবে। বড় হতে হতে গোটা স্টেজ জুড়ে ছড়িয়ে পড়বে। ওই সময়ের মধ্যে তোমার ডায়লগ শেষ করতে হবে।

তুরা বলল, এভাবে আপনি অভিনেতার পারস্যোনালিটি তৈরি করেন, না?

— হ্যাঁ, ঠিক তাই। এতে সে ধীরে ধীরে পরিবেশের সঙ্গে সহজ হয়ে যায়। তার আড়ষ্টতা কেটে যায়। আর তোমার এই নাটকের প্রথম দৃশ্যের সঙ্গে এই লাইটিংয়ের এফেক্টই প্রয়োজন। তুমি ডায়ালগটা পড়ো তো।

তুরা নিজেকে গুছিয়ে নিল — 'আমি রেজিনা। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের বছরে আমার জন্ম। ওই বছরেই আমরা চোরাপথে ওপার বাংলা থেকে চলে আসি। আমার একটা দিদি ছিল। তাকে খান সেনারা তুলে নিয়ে গেছে। এখানে এই রাজাবাজারে আমাদের মতো আরও অনেক মানুষ আছে। আমার আব্বা যোগাড়ের কাজে যায়। নানি আম্মা আর আমি চিংড়ি ছাড়ানোর কারখানায়। পরা দিন হলে এক একজনের বারো-তেরো টাকা হয়ে যায়। ছোট ভাই-বোনগুলো কাগজ কুড়োয়। কাজ থেকে ফিরে এসে আমরা ক্লাব ঘরে যাই। সেখানে এক পড়ালিখা জানা দিদিমণি আসে। আমাদের পড়ালিখা শিখায়। ভাল ভাল গল্প বলে। গানও শেখায়।

শুককুরবার মৌলবি আসেন। আমরা তাঁর কাছে কোর-আন আর হাদিসের বাণী শুনি। আম্মা আর নানি প্রায়ই বলে, বড় হয়েছিস। সহবৎ ঠিক রাখবি। বংশের ইমান কখনও ডোবাবি না। একা একা হুটহাট কোথাও চলে যাবি না।

আমার খুব ইচ্ছে করে একা একা এই শহরের অলিগলি ঘুরে দেখি। দু-চোখ ভরে সবকিছু দেখি। কিন্তু ঘরের বাইরে পা দিলেই আমাকে বোরখা পড়তে হয়। এক একসময় এমন রাগ হয়, মনে হয়, ওই কালো পর্দা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলি। কিন্তু আব্বা বলেছে, বেচাল দেখলে কোরবানি

দেবে। তাই আমি আমার সব রাগ ভেতরে জমা করছি, জমা করছি, জমা করছি....'।

ডায়ালগ পড়া শেষ করে তুরা স্তানিস্লাভস্কির দিকে তাকাল। তিনি তুরাকেই দেখছিলেন। বললেন, 'তোমার এক্সপ্রেশন দেখছিলাম। খুব মিশে গেছো ক্যারেকটারের সঙ্গে'। তুরা মৃদু হাসল, 'আপনি তাহলে ঠিক সময়ে চলে আসছেন স্তানিস্লাভস্কি'।

— তুমি নিশ্চিন্তে থাকো। দেখো, লাইট আর মিউজিক ঠিকঠাক লাগাতে পারলে নাটকটা দাঁড়িয়ে যাবে।

তুরা উঠে পড়ল, 'আমি চেষ্টা করব। আজ যাই'। স্তানিস্লাভস্কি মৃদু হেসে মাথা নাড়লেন। তুরা পার্ক পার হয়ে এগিয়ে গেল।

চার

হলে আর তিলধারণের জায়গা নেই। বিশ্বের নানা দেশ থেকে সেরা বুদ্ধিজীবীরা এসে জড়ো হয়েছেন। এসেছেন দুই আন্তর্জাতিক মাপের নাট্য পরিচালক গর্ডন ক্রেগ আর ফ্রান্সের সেরা শিল্পী পাওলো পিকাসো। এসেছেন আমেরিকার মাইগ্রান্ট সুরকার ইহুদি মেহুনিন। তিনি শ্যুবার্টের বিশাল ছায়ায় ঢাকা পড়ে গেছেন। এসেছেন স্পেনের তরুণ কবি ফেদেরিকো গারসিয়া লোরকার হাত ধরাধরি করে চিলির প্রবীন কবি পাওলো নেরুদা। মহাচিনের মহান কথা সাহিত্যিক লু-শুন। মাঝের সারি আলো করে বসে আছেন সেল্‌মা লাগারল্যাফ, মেরি ওলস্টোনক্র্যাফট্, মাদাম কুরি, রোকেয়া বেগম। এসেছেন তুর্কী বীর কামাল আর্তাতুকের পেছনে মিশরের সাম্রাজ্যবাদী বিরোধী নায়ক আবদুল গামাল নাসের। কি আশ্চর্য, তাঁদের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে-ই বিশাল জোববা পরিহিত ইরানের কট্টর মৌলবাদী খোমেইনিকেও দেখা যাচ্ছে। নাটকটিতে ইসলাম বিপন্ন এমন এক হাওয়ার গন্ধ পেয়ে এসে গেছেন মানুষটি। ওই তো এসে গেলেন শিষ্য শম্ভু মিত্র-কে নিয়ে নাট্যাচার্য শিশির কুমার ভাদুড়ি। যেন মেঝেয় পা পড়ছে না এমন হালকা নৃত্যরত পায়ে ইশাডোরা ডানকান। এ ছাড়া সপ্ত সিন্ধু দশ দিগন্ত পেরিয়ে কত জ্ঞানী-গুণী আবার একান্ত সাধারণ মানুষ।

আস্তে আস্তে পেক্ষাগৃহ এবং মঞ্চ সম্পূর্ণ অন্ধকার হয়ে গেল। পর্দার আড়াল থেকে ঘোষকের গলা শোনা গেল, 'আমরা পেশাদার ও শৌখিন নাট্যকর্মী নই। চারপাশের কানও কোনও ঘটনা যখন শিকড় ধরে টান দেয়, তখন নিতান্ত বেঁচে থাকার তাগিদে মঞ্চে আসি। সেই ঘটনা আমরা বিশ্বের সচেতন মানুষের কাছে তুলে ধরি। আমরা এইটুকুই পারি।

আমাদের আজকের নাটক — 'রেজিনার উপনয়ন'। রেজিনা একটি

মুসলিম মেয়ে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বছরে যার জন্ম। সে ওই বছরেই মা, বাবার সঙ্গে ভারতে আসে। এখানকার এক বস্তিতে আব্বার রক্তচোখ আর নানি-আম্মার কড়া শাসনের মধ্য দিয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হতে হতে বড়ো হয়। বড়ো হতে হতে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে।

রেজিনা একটি চিংড়ি ছাড়ানোর কারখানায় কাজ করে। একদিন হজ থেকে ফিরে তার চাচা এক অদ্ভুত প্রস্তাব দেয়। সে তার আম্মা আব্বাকে বলে রেজিনাকে খৎনা করার কথা। এই খৎনায় অংশ নেয় তার আম্মা আর নানি। খৎনার পর জন্ম নেয় নতুন এক রেজিনা। রেজিনার এই নবজন্মের লজ্জা আমাদের সকলকে কালো বোরখায় ঢেকে দেয়।

নাটক চলতে চলতে যদি মনে হয় ঘটনা, পরিবেশ, সময় এবং চরিত্রের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে আপনাদের অস্তিত্ব, অসম্ভব হয়ে উঠছে অসহায় হয়ে দর্শকের আসনে বসে থাকা, যদি আপনাদের প্রতিটি কোষে কোষে জমে থাকা বারুদে আমরা সত্যিই দেশলাইকাঠির ছোঁওয়া দিয়ে আগুন জ্বালাতে পেরে থাকি, তবে আপনারাও সরাসরি মঞ্চে আসবেন। ঘটনা, পরিবেশ, চরিত্র, অর্ন্তদ্বন্দ্বকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন।'

ঘোষণা শেষ হলে আস্তে আস্তে পর্দা সরে গেল। অন্ধকার মঞ্চের মাঝখানে এগিয়ে এল সম্পূর্ণ কালো পোষাক পরা একটা মেয়ে। মেয়েটির কেবল মাত্র মুখটুকুতে একটি হলুদ আলো উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠতে লাগল।

'আমি রেজিনা। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের বছরে আমার জন্ম। ওই বছরেই আমরা চোরাপথে ওপার বাংলা থেকে চলে আসি। আমার একটা বড় দিদি ছিল। খানসেনারা তাকে তুলে নিয়ে গেছে....'।

নাটক দেখতে দেখতে একেবারে সামনের সারিতে বসে থাকা কমরেড লেনিন, নাট্যকার গর্ডন ক্রেগ, জাক কোপো, ব্রেখট, শিল্পী পাওলো পিকাসো মাঝের সারি থেকে উঠে আসা একটি গুঞ্জনে চোখ ফিরিয়ে দেখলেন মেরি ওলস্টোনক্রাফট্ বেগম রোকেয়ার সঙ্গে নিচু সুরে খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনার ভঙ্গিতে কথা বলছেন। আর সামান্য পরেই দুজনে অডিটোরিয়াম চিরে গ্রীনরুমের দিকে ছুটে গেলেন। প্রেক্ষাগৃহের সমস্ত দর্শক খেয়াল করল মঞ্চে মাইক্রোফোনের সামনে কথা বলে উঠলেন বেগম রোকেয়া :

'ঘরের বাইরে পা দিলেই আমাকে বোরখা পড়তে হয়। এক একসময়ে এমন রাগ হয়, মনে হয় এই কালো পর্দা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলি। কিন্তু, আব্বা বলেছে বেচাল দেখলে কোরবানি দেবে। তাই, আমি আমার সব রাগ ভেতরে জমা করছি, জমা করছি, জমা করছি।'

ওই হলুদ আলো এখন গোটা মঞ্চে ছড়িয়ে পড়েছে। সেই উজ্জ্বল আলোর তলায় কালো পোশাক পরে দু-চোখে অগ্নিকণা নিয়ে স্থির দাঁড়িয়ে আছেন

বেগম রোকেয়া। প্রথম দৃশ্যের পর্দা পরে গেল। দেখা গেল হলের বিভিন্ন সারি থেকে হুড়োহুড়ি। এই পুরো হুড়োহুড়িটাই এগিয়ে যাচ্ছে গ্রীনরুমের দিকে। স্তানিস্লাভ্স্কি এতক্ষণ নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে দেখছিলেন। এই ত্রস্ততা এবার তাঁকেও নাড়া দিল। তিনি-ও ধীরে ধীরে এগোলেন গ্রীনরুমের দিকে।

পরের দৃশ্যে দর্শকরা দেখলেন গোটা মঞ্চ জুড়ে অদ্ভুত সব দৃশ্য। পিকাসো পেছনের পর্দার ওপর কেবলমাত্র তার দু-হাতের দশটা আঙুলকে কাজে লাগিয়ে তৈরি করছেন বস্তির কিছু ছবি। বস্তির মধ্যে একটি ক্লাব ঘর। সেখানে অন্য অনেকের সঙ্গে মধ্যমণি হয়ে বসে রয়েছেন বেগম রোকেয়া। আগের দৃশ্যে যিনি রেজিনার গলায় কথা বলে উঠেছিলেন। অন্যদের মধ্যে অসংখ্য সাধারণ মানুষের সঙ্গে রয়েছেন মেরি ওলস্টোনক্র্যাফট, সেলমা লাগারল্যাক, মাদাম কুরি প্রভৃতি।

ঘরের মাঝখানে একটি আসনে সম্পূর্ণ মৌলবির পোশাকে বসেছেন আবদুল খোমেইনি। তাব সামনে ছোট জলচৌকিতে খোলা একটি বই। ধর্মগ্রন্থ হাদিস। ঘর জুড়ে একরকমের নেভা-নেভা আলো। যেন কত বছরের জমাট অশ্রু লেগে রয়েছে ওই মলিন আলোর বুকে। লেনিন তার পাশে বসে থাকা লোরকার কানে কানে বললেন, 'এ আলো স্তানিস্লাভাস্কি ছাড়া আর কারো হতে পারে না। ওঁর দু-চোখের মণিজ্বলা এই আলো আমার খুব চেনা। মঞ্চে তখন আবদুল খোমেইনি গমগমে গলায় হাদিসের বাণী পাঠ করছেন।

পুরুষের পক্ষে নারী অপেক্ষা অধিক ক্ষতিকর বিপদের জিনিস আমি আমার পরে আর কিছু রাখিয়া যাইতেছি না। সর্তক হও নারীজাতি সম্পর্কে। কেননা ইস্রায়েলের প্রতি প্রথম যে বিপদ আসিয়াছিল তাহা নারীদের ভিতর দিয়াই আসিয়াছিল।

অকল্যাণ রহিয়াছে তিন জিনিসে। নারী, বাসস্থান ও পশুতে।

নারী শয়তানের রূপে আসে আর শয়তানের রূপে যায়।

নারী হইল আওরত বা আবরণীয় জিনিস। যখন সে বাহির হয়, শয়তান তাহাকে চোখ তুলিয়া দেখে।

যখন কোনও রমণীকে তার স্বামী শয্যায় আহ্বান করে এবং সে অস্বীকার করে এবং তার জন্য তার স্বামী ক্ষোভে রাত কাটায়, সেই রমণীকে প্রভাত পর্যন্ত ফেরেশতাগণ অভিশাপ দেয়।'

স্ত্রীগণকে সদুপদেশ দাও, কেননা পাঁজরের হাড় দ্বারা তারা সৃষ্ট। পাঁজরের হাড়ের মধ্যে ওপারের হাড় সবচেয়ে বাঁকা — যদি ওকে সোজা করতে যাও তবে ও ভেঙে যাবে, যদি ছেড়ে দাও তবে আরও বাঁকা হবে।

পুরুষ নারীর বাধ্য হলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

আবহে সেতারের ঝালা। মৌলবি সাহেব বই বন্ধ করে ওজু করলেন। অন্যরাও। তারপর সকলকে বিদায় জানিয়ে যাওয়ার জন্য পা বাড়ালেন।

মঞ্চে হাদিস শোনা-শ্রোতাদের মধ্যে তখন নানারকম ব্যস্ততা। মেরি ওলস্টোনক্র্যাফট তখন এক চোখে আগুন আর এক চোখে কান্না দিয়ে খসখস করে নিজের শরীরময় দ্রুত লিখে চলেছেন 'ভিন্ডি-কেশন অফ দি রাইটস অফ ওম্যান : উইথ স্ট্রিকচারস অন পলিটিক্যাল এণ্ড মরাল সাবজেক্টস'। লিখতে লিখতে মেরি হলভরা মানুষের দিকে তাকিয়ে তাঁর উৎসর্গের অংশটুকু পড়ে শোনালেন।

'স্বাধীনতাকে আমি দীর্ঘকাল ধরে আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ ধন, সব গুণের ভিত্তি বলে গণ্য করে আসছি। আমার সব চাওয়া সংকুচিত করে হলেও আমি নিশ্চিন্ত করবো আমার স্বাধীনতাকে, যদি আমাকে উষর প্রান্তরে বাস করতে হয় তবু-ও।'

মঞ্চের অন্যদিকে মাদাম কুরি তাঁর বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণার কথা আলোচনা করছেন সেকেণ্ড সেকসের লেখক সিমোন দ্য বোভার সঙ্গে। বেগম রোকেয়া, নাটকের রেজিনা তখন সারা শরীরে কমলা রঙের আগুন নিয়ে সবার মাঝখানে উঠে দাঁড়িয়েছেন। ঝালার কাজ দ্রুত থেকে দ্রুততর হচ্ছে। ঘরে এখন কমলা ফিরোজায় মেশা আলো। এই আলোয় মনে হচ্ছে পা মুড়ে বসে থাকা মানুষগুলো যেন একটু একটু করে উঠে দাঁড়াচ্ছে। পেছনের পর্দায় এখন পিকাসোর পিংক পিরিয়ডের নানা ছবি। তাতে নীল আলো পড়ায় জয়পতাকার মতো কাঁপছে দৃশ্যগুলো। আস্তে আস্তে আলো ফেইড হয়ে ডার্ক হয়ে গেল মঞ্চ।

পরের দৃশ্য :

মঞ্চের বাঁদিকে রেজিনা হাঁটু মুড়ে বসল। একজন বৃদ্ধ এবং একজন মধ্যবয়সিনী তার মুখোমুখি দাঁড়ানো। পালা করে দুজনেই তর্জন গর্জন করছেন।

বৃদ্ধা — আজ তুই বোরখা না পরে বাইরে গিয়েছিলি কেন?

রেজিনা — আমার বোরখা পড়তে ভাল লাগে না।

মধ্যবয়সী — কতদিন বলেছি মেয়েমানুষকে সহবৎ শিখতে হয়। চোখ নিচু করে নিজের শরীরকে ঢেকেঢুকে হাঁটতে হয়।

রেজিনার বিষণ্ন দৃষ্টি মধ্যবয়সীর ওপর— আমার গায়ে রোদ্দুর আর বাতাস লাগাতে ইচ্ছে করে। চোখ মেলে সব কিছু দেখতে ইচ্ছে করে।

বৃদ্ধা — তুই কি বংশের ইমান ডোবাবি? ফিৎনা ঘটাবি?

রেজিনা — আমার মানুষের মতো বাঁচতে ইচ্ছে করে।

মধ্যবয়সী — শহরে এসে টিভি দেখে দেখে এইসব কথা শিখেছিস।

বৃদ্ধা — কাল থেকে আমাদের সঙ্গে চিংড়ি কারখানায় যাওয়া-আসা ছাড়া অন্য কোথাও যাবি না।

মধ্যবয়সী — চৌকাঠের বাইরে পা দিবি না।

বৃদ্ধা — মেয়েমানুষের আলো-হাওয়া গায়ে লাগাতে নেই।

এইসময় একজন মধ্যবয়স্ক যাঁকে আমরা কিছুক্ষণ আগেও চিনের মহাসাহিত্যিক লু-শুনের পাশে বসে থাকতে দেখেছি সেই তুর্কী বীর কামাল আতার্তুক মঞ্চে এলেন। তাঁকে ঠেলে সরিয়ে জলপ্রপাতের মতো সাদা দাড়ি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন খোমেইনি। পরণে কালো কুর্তা, কি হয়েছে? এত কথা কিসের? বৃদ্ধা এবং মধ্যবয়সী একসঙ্গে বলে উঠলেন, — রেজিনা আজকাল কথা শোনে না। বোরখা পড়তে চায় না। হঠাৎ হঠাৎ আকাশের দিকে, গাছপালার দিকে, পথচলিত মানুষজনের দিকে চোখ তুলে চায়।

— কেন ? মধ্যবয়স্কের ভারি গলা।

— আমার ইচ্ছে করে। রেজিনার গলায় বাঁধ।

মধ্যবয়স্ক এবার দেওয়ালের হুকে ঝোলানো শঙ্কর মাছের চাবুক হাতে নিল। পরক্ষণেই শপাশপ আঘাত রেজিনার নরম শরীরে কেটে বসতে লাগল। তার শরীর কেটে ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে আসছে রক্ত। দর্শকবৃন্দ শিউরে শিউরে উঠছেন। নাট্যাচার্য শিশির ভাদুড়ি শম্ভু মিত্রকে কানে কানে বললেন — দেখছ, কিরকম আলোর কাজ। লেনিন মৃদু হেসে বললেন— আলো নয়, স্তানিস্লাভ্স্কির রক্ত।

পরবর্তী দৃশ্য :

আরো অন্ধকার ঘর। ঘুমন্ত রেজিনার পোশাক খুলে ফেলছে তার আম্মা। তার হাতে ধারালো কাঁচের ফালি। ভেতর থেকে হজ্জ সেরে ফেরা রেজিনার চাচার গলা।

মেয়েদের সতীত্ব রক্ষা করা আমাদের মহান কর্তব্য। মহম্মদ বলেছেন— নারী ফিৎনা। বিপদ ঘটনোই তার কাজ। খৎনা করলে নারীর শরীরের খিদে চিরদিনের মতো মরে যায়। বংশের ইমান যাওয়ার আর কোনও ভয় থাকে না।

নানি তার ধারালো কাচের টুকরো ঢুকিয়ে নিয়েছে রেজিনার যোনির ভিতর। তার দু-হাত শক্ত করে ধরে আছে আরও দুজন স্থূলকায় মহিলা। মায়ের হাতে দপদপ করছে মোমের আলো। রেজিনার সারা শরীরে হলদে আগুনের শিখা। যেন আগুন ধরে গেছে সারা গায়ে। সে হাঁ করে আছে, কিন্তু মুখ দিয়ে কোনও শব্দ আওয়াজ বের হচ্ছে না। দু-চোখে অশ্রু। আবহে প্রথমে জলতরঙ্গ। তারপর ভায়োলায় নাড়ি ছেঁড়া টংকার। ভেতর থেকে পাশবিক গোঙানি। রেজিনার নিম্নাঙ্গ ভেসে যাচ্ছে রক্তে। সেই রক্তস্রোত মঞ্চ ছাড়িয়ে চুঁইয়ে নামছে দর্শকের দিকে। রেজিনার নানির হাতে তার কেটে ফেলা যৌন গ্রন্থি তার ভগাঙ্কুর। নানি আর মায়ের মুখে সফলতার হাসি। নানি ট্রফির মতো সেই মাংস-পিণ্ড তুলে ধরল দর্শকদের দিকে।

শেষদৃশ্য :

রেজিনা অদ্ভুত বিকৃত ভঙ্গিতে হেঁটে এসে মঞ্চের ওপর পিকাসোর তৈরি করা জানলা বন্ধ করে দিচ্ছে। ঘরে ঢুকল তার নানি, আব্বা, আম্মা।

নানি — জানলা বন্ধ করছিল কেন রেজি?

রেজিনা — ওই খোলা জানলা দিয়ে বেশরম বাতাস আর বেয়াদপ রোদ্দুর ঢুকে পড়ছে।

আম্মা — পাড়াঘরে সকলে বলছে রেজি বড্ড লক্ষ্মী মেয়ে। নিজের দিকেও কখন ও চোখ তুলে তাকায় না। সতীনও এ মেয়েকে মাথায় তুলে রাখবে। রেজিনার হাঁটার দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে, আব্বা এ মেয়ের সাদি হবে কেমন করে? খুঁতো মেয়ে কেউ ঘরে নিতে চায় না।

নানি — সেলাইটা ভালভাবে জোড়া লাগেনি।

আম্মা — অ রেজি, তোর ব্যাথা লাগে? 'না'। রেজিনার ক্লান্ত কণ্ঠস্বর।

— হাঁটতে কষ্ট হয়?

— না।

— কাল চিংড়ি কারখানায় যাবি?

— যাব।

আব্বা — ঘরে বসে থাকলে খাওয়া জুটবে কি করে?

আম্মা — অ রেজি, তোর মুখখানা শুকনো দেখাচ্ছে কেন মা? খিদে পেয়েছে?

— আমার আর খিদে পায় না।

নানি — এই তো সাচ্চা আওরতের মতো কথা।

আম্মা — রেজি, আজ ক্লাবঘরে মৌলবি আসবেন। কলমা পড়বেন। চল, শুনে আসি।

রেজিনা — তোমরা যাও।

নানি — তুই যাবি-না?

রেজিনা — না।

নানি — কেন?

রেজিনা নতমুখে চুপ করে থাকে। খোঁড়াতে খোঁড়াতে ঘরের উল্টোদিকে রাখা সিন্দুকের দিকে এগিয়ে যায়। শব্দহীন নিঃস্তব্ধ অডিটোরিয়াম থেকে একটি গলা হাহাকার করে ওঠে :

আ কাঠুরিয়া

আমার ছায়াটা কেটে ফেল তুমি

নিস্ফলা নিজেকে দেখার নিয়ত অত্যাচার থেকে
বাঁচাও বাঁচাও আমাকে। (ফেদেরিকো গারথিয়া লোরকা)

কমরেড লেনিন দাঁড়িয়ে ওঠেন। তাঁর গলা বুজে আসছে কান্নায়। আমার বিপ্লব। আমার শোষণ মুক্ত সমাজের স্বপ্ন। অন্য দর্শকদের মাথা ক্রমশ মাটির দিকে নামছে। ভায়োলায় হৃদয়ের সবটুকু নিংড়ে মুছড়ে? টেনে চলেছেন মেণ্ডলসন্। এবার কি সঙ্গে ইহুদি মেনুনিন-ও হাত লাগিয়েছেন।

নানি-আম্মা আর আব্বা পরম সন্তোষে হাসতে হাসতে চলে যায় নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে। রেজিনা মাটিতে পা মুড়ে বসে সিন্দুকের ডালায় হাত দেয়। আস্তে আস্তে ডালা খোলে। হাতে তুলে নেয় একখানি কালো বোরখা। ধীরে ধীরে ঘরের মাঝখানে আসে। দাঁড়ায়। এখন মঞ্চে আলো কেইড হচ্ছে। রেজিনার মুখে স্পট। নীল। এবার সমস্ত দর্শক একসঙ্গে মঞ্চে রেজিনার দিকে একটি প্রশ্ন ছোঁড়ে— দরজা, জানলা বন্ধ করে বোরখা কি হবে?

রেজিনা খুব আস্তে বোরখা দিয়ে আপাদমস্তক ঢেকে নেয়। ক্লান্ত গলায় উচ্চারণ করে — আমার ভীষণ লজ্জা করে।

ভায়োলিন এখনও কঁকিয়ে উঠছে যন্ত্রণায়। মঞ্চ জুড়ে অন্ধকার নেমে এল।

আলো জ্বলে ওঠার পরে তুরা গ্রীণরুমে এল। শুভম মঞ্চে। নাটকের কলা-কুশলীদের ধন্যবাদ জানাতে হবে। প্রথমে মঞ্চের পেছনের গায়ে পিকাসোর কাছে গেল। ক্যানভাসের ওপর তাঁর রক্তমাখা শরীর ফ্রিজ। বেগম রোকেয়ার কাছে এল, কোথায় তিনি? এতো তাঁর ছবি। তুরা স্তানিস্লাভস্কিকে ধাক্কা দিল। তাঁর দুচোখ কেটে রক্ত ঝরছে। এই রক্তই আলোর কাজ করেছে এতক্ষণ। শ্যুবার্ট তাঁর পাঁজরের ওপর ছড় চালিয়ে বাজনা বাজাচ্ছিলেন। এখন তিনি মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছেন।

তুরা দ্রুতপায়ে অডিটোরিয়ামের দিকে গেল। তাঁদের গলায় আর্তনাদ। কমরেড লেনিন, মহাকবি লোরকা, শিশিরবাবু, ম্যাডাম কুরি ওঁরা পরম বিস্ময়ে দেখেন, দর্শকদের আসন জুড়ে নিচু তার থেকে ক্রমশ সপ্তকে উঠতে থাকা রেজিনার কান্না একটা অতিকায় কালো বোরখা হয়ে ভাসতে ভাসতে ধীরে ধীরে গোটা অডিটোরিয়াম ঢেকে দিল। দর্শকেরা এই অন্ধকার বুকে নিয়ে যে যার দেশে আবার নতুন দরবেশ হয়ে ফিরে যাবে।

—

নতুন কথার দরবার

সাধন চট্টোপাধ্যায়

এক রাজা মন্ত্রীকে বললেন— রাজ্যময় ট্যাড়া দেওয়ান।

— কেন মহারাজ?

রাজা হেসে জবাব দিলেন— কথা সব পুরনো হয়ে গেছে সংসারে। কানে খোল ধরে গেল। যে-পণ্ডিত দরবারে নতুন কথা শোনাতে পারবেন— আর্দ্ধেক রাজত্ব দান করব তাঁকে।

— হুজুর, নতুন কথা বলতে?

— যা পূর্বে কেউ শোনে নি।

মন্ত্রী বুঝেও গম্ভীর। নানা ব্যাসকূট দেখা দিল তার মনে। এদিকে রাজামশাইয়ের হুকুম, অমান্য চলে না। কিন্তু কথাটা নতুন কিনা বিচার করবে কারা? কী ভাবেই বা রাজ্যজুড়ে ট্যাড়া মারানো যায়? ভিন দেশের কোনো পণ্ডিত কি আসরে যোগ্য বিবেচিত হবে? কিংবা নতুন কথার দাবিদারীর পর যদি পুরনো বলে প্রমাণ হয়ে যায়, কোনো শাস্তি ঝুলবে কি তার?

মন্ত্রীর অন্যমনস্কতা আন্দাজ করেই রাজা বললেন— আপনি বিমর্ষ হলেন কেন?

— ভাবছিলাম মহারাজ, ট্যাড়া কীভাবে দেওয়া করাব? শুধু আমাদের রাজ্যে, নাকি ভিন্নদেশেও?

রাজামশাই প্রত্যয় নিয়ে জানালেন— সর্বত্র। পৃথিবীময়। যার কাছেই জমানো নতুন কথা আছে, আমার দরবারে হাজির হতে পারেন।

— আশ্বস্ত হলাম মহারাজ। একটি সংশয় নিরসন হল। কিন্তু এত এলাকা জুড়ে ট্যাড়া দেওয়া করাব কী হবে?

— ইন্টার নেট, ফ্যাক্স, টি. ভি, খবরের কাগজ...

রাজামশাই নাগার বলে যেতেই, মন্ত্রী এক আমলার কানে শলাপরামর্শ করলেন এবং খুশি হয়ে জিগ্যেস করলেন রাজাকে— মহারাজ, গ্লোবাল টেণ্ডার ডাকব?

রাজামশাই বিস্ময়ে বললেন— টেণ্ডার? আমরা নতুন রাস্তা-ঘাট-কলকারখানা বসাতে যাচ্ছি না তো।

দুচোখে বিদ্রুপের ছটায়, মন্ত্রীমশাই খানিকটা লজ্জা পেলেন। সত্যিই, আমলাদের গ্যাস খেয়ে মুর্খামি করে ফেলেছেন। সামলে নিয়ে জিগ্যেস করলেন এবার— মহারাজ, বিচারক কারা থাকবেন?... বলছিলাম, কথাগুলো যে নতুন— কীভাবে বিচার হবে? কোনো কমিটি?

রাজামশাই চোখ পাকিয়ে বললেন— মন্ত্রী, আপনার আহাম্মুকি আজও গেল না?

সাত লক্ষ কমিটি গড়েও আক্কেল হল না? ফের একটা কমিটির পরামর্শ দিচ্ছেন? জানেন, বেশিদিন বাঁচব না আমি? কমিটির রিপোর্ট ফেলেই চলে যেতে হবে?

— তালে বিচারের পদ্ধতি?

— আমজনতা বিচারক। লক্ষ লক্ষ মানুষ দরবারে থাকবে সেদিন।

শুনে সবাই যদি 'নতুন' বলে সায় দেয়, তবেই পরীক্ষায় পাশ নম্বর।

— আর ফেল করলে কি দণ্ড জুটবে?

— ঠিক করেছি, ঐসব পণ্ডিতদের চূণগোলায় পুরে দেব।

মন্ত্রী তখন ঈষৎ অস্থির হয়ে 'রাজামশাই, একটা কথা।' বলে কাচুমাচু করতেই, রাজামশাই চোখ পাকিয়ে অনুমতি দেন— বলে ফেলুন।

— দণ্ডের ব্যবস্থা রাখবেন না।

— কেন?

— তালে কেউ আর আদ্দেক রাজত্বের লোভেও যোগ দিতে আসবেন না।

— কেন মন্ত্রী?

— পণ্ডিতরা তো যশ, কামিনী-কাঞ্চন পেয়ে অভ্যস্ত। আজকাল ক্ষমতা-টমতারও রেওয়াজ উঠেছে। চূণগোলার ভয়ে কেউ এ-মুখো হবেন না।

রাজামশাই মৃদু মাথা নাড়িয়ে ভাবলেন, এবার মন্ত্রীর যুক্তিটি অকাট্য। পণ্ডিতদের ওঠা-বসা মন্ত্রীর সঙ্গেই, খুব ভালোভাবেই তিনি এঁদের খানাপিনা, জাবরকাটার অভ্যেস দেখেদেখে রপ্ত করে ফেলেছেন। শাস্তির ব্যবস্থা থাকলে, কেউ এ মুখো হবেন না। চূণগোলার বাতাস সওয়া কি যে-সে কাজ? গ্ল্যামার শুকিয়ে খড়খড়ে হয়ে যাবে না? একি ব্রুনো, গ্যালেলিও বা সক্রেটিসের আমল?

— তথাস্তু মন্ত্রী। দণ্ডের ব্যবস্থা রদ।

মন্ত্রীমশাই তখন প্রবল উৎসাহে ট্যাঁড়ার ব্যবস্থায় নামলেন। ইন্টারনেট থেকে ছোট ছোট হোর্ডিং টানিয়ে হপ্তাখানেকের মধ্যেই সর্বত্র জানানোর বন্দোবস্ত হল। মাত্র সাত দিন আগে মন্ত্রীমশাইয়ের খেয়াল হল, যারা বিচার করবেন— আমজনতা— যদি ঐদিন যথাসময়ে দরবারে হাজির না থাকে? ব্যাপারটাই মাটি। এরা তো ইন্টারনেট বা হোর্ডিং-এর খদ্দের নয়। রাজামশাই ব্যাপারটাকে ষড়যন্ত্র ভেবে হয়তো মন্ত্রীকেই পুরে দেবেন চূণের গোলায়। তড়িঘড়ি তাই, কয়েক হাজার ঢোল রাজ্যময় পাঠিয়ে হুকুম দিলেন— শোনো ঢুলেরা। রাজ্যের একটি প্রজাও যদি না শুনতে পায়, ডবল জরিমানা বসাব।

মন্ত্রী এইসব ঢোলবাদকদের খুব ভালভাবেই চেনেন। এরা সব ব্যাপারেই ঘাড় কাত করে কিন্তু কাজের বেলা অষ্টরম্ভা। চোখের আড়াল হলেই যে-যার চিট্‌কেনো ইঁদুরের মতো আপন খুদে ব্যস্ত হয়ে যায়। তাই ডবল জরিমানার জুজু দেখিয়ে

গ্রাম-গ্রামান্তরে পাঠিয়ে দিলেন। নজরদারীর জন্য কিছু আমলার সঙ্গে পরামর্শ করে তাদেরই নিকট আত্মীয়-স্বজনদের কাজে নিযুক্ত করে দিলেন।

দরবারের দিনটি যতই এগিয়ে আসে, রাজামশাই উদ্বিগ্ন হলেই মন্ত্রী প্রবোধ দেন— ভাববেন না মহারাজ, স-ব ব্যবস্থা পাকা।

— পণ্ডিতদের মধ্যে উৎসাহের সাড়া পাচ্ছেন?

— বি-স্ত-র।

— আমজনতাকে ব্যাপারটা খোলসা করে দিয়েছেন?

— তা আর বলতে? ... কিন্তু ছোট্ট সমস্যা রয়েই গেল।

— কী?

— বিচারের ভার ষোলআনা প্রজাদের হাতে না ছেড়ে, কম্প্যুটার বসালে হত না? ধম্মের কলের মতো বাতাসে ঠিকঠিক নড়ত।

রাজামশাই সায় দিলেন না। মুখ ব্যাজার রেখে বললেন— যন্ত্রেরই বা ভরসা কী ইদানীং? বাজারে পড়তে না পড়তেই ভেতরের ভেল্কি বদলে ফেলছে।

— মানে?

— কিনে বসাতে-না বসাতেই পুরনো করে দিচ্ছে!... নতুন কায়দা হাজির। তাচ্চে, আমার জনতাই ভালো।

মন্ত্রী পুরোপুরি রাজার যুক্তিটি মাথায় ঢোকাতে পারলেন না। মনে হল হেঁয়ালি করছেন। শেষে এক নিকট-আমলা আড়ালে বোঝাল— প্রহরে প্রহরে গোরুর খুঁটো নাড়াবার মতো, ভেতরে ভেল্কি না বদলালে যন্তরই মরে-পচে উঠবে!... তাই আজ যা সর্বশেষ, কালই তা পুরনো।

মন্ত্রীমশাই এরপর বিশেষ মাথা ঘামালেন না। ঢুলেদের ওপর নজরদারি কড়া করলেন।

এদিকে দেশের বাইরে ট্যাড়া পিটতে গিয়ে রাজ্যের কিছু পণ্ডিতশ্রী মন্ত্রীর কাছে মৃদু উষ্মা শোনালেন— ভিন রাজ্যে কেন হুজুর? আমরা যে কোণঠাসা হয়ে পড়লাম।

— কেন?

— বিদেশে পণ্ডিতরা নিত্য নতুন কথা বাঁধছে!... আমরা যুঝব কিভাবে?

— নিত্য নতুন কথা? বুদ্ধির সার কোথায় পায়?

— হুজুর, ও-দেশে নতুন কথা পড়বার সময় পায় না আসরে। অমনি পাল্টি নতুন চলে আসে। মেলাই ব্যাপার।

নিজের সীমানার মধ্যে ট্যাড়া পেটানো মন্ত্রীরও পছন্দ ছিল। রাজার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন তোলেন নি। কাঁহাতক, বড় গাছের সঙ্গে চুলকোচুলকি করা যায়।

মন্ত্রী এক দেশি পণ্ডিতকে জিগ্যেস করলেন— ওরা এত নতুন কথা বানায়, তোমরা কি কম্বল ছেঁড়ো?

এক পণ্ডিত মন্ত্রীর রুচিজ্ঞানে ঈষৎ আহত হয়ে বলেন— ও-সব দেশে সব্বাই স্বাধীন— ভাবতে কইতে ইলকিবিলকি করে না... নতুন কথা তো ওদের মাথাতেই জন্মাবে।

মন্ত্রীমশাই যখন দেখলেন দিশিরা বড্ড ঘ্যানঘ্যান করছেন, সোজা জবাব দিলেন— রাজারই হুকুমের কোনো নড়চড় হবে না।

আদ্দেক রাজ্যের লোভ এবং কাণাঘুষোয় যেহেতু শোনা যাচ্ছে রাজকন্যাকেও যৌতুক দেবেন নতুন কথাকারটির সঙ্গে, লোভও জন্মাচ্ছে প্রচুর। এমন সুযোগ বাতিল করেই বা কি করে।

গাঁয়ের মোড়েমোড়ে ট্যাঁড়া শুনে মানুষজনের ভীষণ আনন্দ। চাষী, জেলে, কুমোর-কামাররা আলোচনা করলে— একখান দাও দিলেন বটে রাজামশাই।

— কি মতলবে বুইলছ কথাগুলা?

— দোষ নিও না ভাই, সকলের জিভকাটি বাসিপান্তার মতো হেদিয়ে গেছে। একই বুলি শুইনে শুইনে গাল কাটতে থাকে এখন।... তা, নর-মনিষ্যিই বলো, বাবুই বলো, আমাদের লেডারদের কতাই বলো। অর্থাৎ চারপাশের মানুষ, রেডিও-টি ভি এবং নেতাদের মুখে ঘুরতে ফিরতে একই মাপের কথা। যেন সাদা ডিম।

লোকটা ভীষণ গম্ভীর চালে জবাব দেয়— নতুন কতা বাঁইধে তোলা মুখ্যুর কম্ম নয়। তালি তো সব্বাই মোরা পণ্ডিত সাজতাম।... তবে হক্ কতাখান শুনে রাখ, পুরনো কতা যেশাল মারলেই আমি ধইরে ফেলায় দেব।

— অত পাখাল মাইরো না, ভিন দ্যাশের পণ্ডিত আসছেন।... তাদের বিদ্যের জল, তুমি বাঁশ ফেলায়ে মাপবা? দু-জনের আঁতে ভীষণ তক্ক বেঁধে যায়।

ইতিমধ্যে, ইন্টারনেট থেকে সেটেলাইট চ্যানেলে ট্যাঁড়ার বৃত্তান্ত শুনে বিলিতী পণ্ডিতরা অবশ্যি মুচকি হাসলেন। রাজাকে খুবই মূর্খ মনে হল তাঁদের। কোনো খবর না রেখেই এমন একটি প্রতিজ্ঞায় জড়ালেন? আর্দ্ধেক রাজত্ব পণ? প্রতিদিন দেশে দেশে নতুন কথার ঢেউ। চারদিকে পুরণরা ভীষণ ফেল মারেছ বলেই তো নতুনের এত রমরমা। নতুন তত্ত্ব, নতুন নাম, নতুন পোষাক। এজন্যই বলে, বর্তমান পৃথিবীতে রাজা অচল, রাজা মূর্খ। এবং মূর্খের ধন যে এ-ভাবেই ক্ষয় পায়— শাস্ত্রে বলে গেছে।

যথারীতি নির্দিষ্ট সকালটি হাজির হতেই, পিল পিল করছে মানুষ। পথ-ঘাট, মাঠ, পাহাড়, নদীর খেয়া— কোথাও বাদ নাই। দরবার কাঁইকাতু করছে। হাজার হাজার মানুষ ধুলোয়, ঘাসে, ঘামে, হাঁটুতে হাঁটু ঠেকিযে বসে আছে। সঙ্গে মুড়ি-ছাতু-চিড়ে বাঁধা। চিৎকার চেঁচামেচি, নানা দুর্গন্ধ।

দূরে রাজা বসে আছেন উঁচু সিংহাসনে। মণি-মুক্তা এবং হীরে-পান্নার ঝলমলে

পোবাক আমজনতাকে মুগ্ধ করে দিয়েছে। রাজার সামনেই দেশ-বিদেশের সারি সারি পণ্ডিত। বিচিত্র টেরি-টিকি-গায়ের রং এবং বৈচিত্রময় কত পোবাক। একসাথে দেখবার সৌভাগ্য হয়নি আমজনতার।

রাজামশাইয়ের নির্দেশে মন্ত্রী একটা রোশন-চৌকিতে উঠে মোরগার মতো ঝুঁকে উঠলেন, পণ্ডিতরা একে একে এই চৌকিতে চড়ে নতুন কথা ফেলবেন এবং রাজামশাইয়ের অঙ্গুলি নির্দেশে জনতাকে বলতে হবে আগে শুনেছে কোথাও নাকি নতুন। পেছনে একটা ঘণ্টা বাঁধা রয়েছে, বোতাম টিপলেই ওটি মহাকোলাহলে সাইরেন বাজালে বুঝতে হবে কোনো পণ্ডিতের পালা এসেছে। শ্রোতাদের মধ্যে তখন কোনো হুড়োহুড়ি চলবে না। কানের পেছনে হাত লাগাবার পালা।

প্রথম পণ্ডিত উঠেই চেঁচালেন— মহারাজ, ধম্মই জীবন, ধম্মই মরণ, বাকি সব সওদা।

চটপট. কোলাহল— শুইনেছি, শুইনেছি। এ পুরনো কতা।

তাচ্ছিল্যে পণ্ডিত নেমে যেতেই, দ্বিতীয়বার কলের ঘণ্টা বেজে উঠল।

— মিঃ মহারাজ, মানুষ খাটো হতে হতে একদিন বেগুন ক্ষেতের তলা দিয়ে হাঁটবে। কম্প্যুটার হবে তখন দিক নির্দেশক।

ফের আমজনতার একাংশ— কতাখান জানা মোদের। শুইনেছি।

তৃতীয় পণ্ডিত তখন— মহারাজ, মানুষ ক্ষুধায় সমান কাতর হয় না। তাই পৃথিবী ছেড়ে ক্ষুধা নড়বে না।

আমজনতা সামান্য চুপ থাকতেই, রাজামশাই জিগ্যেস করলেন— কী বলছ তোমরা?

কিছু অংশ চেঁচায়— মহারাজ, কতা খান বাজারে চালু আছে।

তখন চতুর্থ পণ্ডিত— মনুষ্য জন্মের কোনো ইতিহাস নাই মহারাজ।

পঞ্চম পণ্ডিত— মহারাজ, এতদিন আদ্দেক দুনিয়ার মানুষ নাক ঘুরিয়ে ভাত খেয়েছে। এখন সোজা ভাত খাওয়া দরকার।

মহারাজ যখন আমজনতার মুখ হাত থেকে পণ্ডিতদের জন্য গাড্ডুচিহ্ন দেখছেন, তখনই বেরো-নানপুকুরিয়া গাঁয়ের মহম্মদ আবু বক্কর হাজির। আশির ওপর বয়স, গোঁফ নেই, সাদা ছুঁচলো দাড়ি, সামান্য কোলকুঁজো। সে হাটেহাটে ভেঁড়সো করে অর্থাৎ রঙ্গ-তামাশায় মজিয়ে দেয়।

গত পরশু সে হাটে গিয়ে ঢোলের কাঠিতে রাজার প্রস্তাব শুনে কেবলই ভাবছিল, আহাঃ। আদ্দেক রাজত্ব! রাজকন্যে। এ-বয়সে একবার তলপেট পুড়ে উঠেছিল বটে, ভাবল নিকের দরকার নাই। তিনবিবি তাকে অনে-ক সুখ দিয়েছে। এখন অদ্দেক রাজত্ব পেলে ঠ্যাংয়ের ওপর ঠ্যাং রেখে মনের আনন্দে এন্তেকাল

পর্যন্ত কাটিয়ে দেয়। কিন্তু নতুন বুলি তো বাঁধা-ছাঁদা তার কম্ম নয়। লেখাপড়া জানে না। কথা সাজিয়ে মানুষ হাসায় বটে, পণ্ডিতদের পাশে ম্যার ম্যার করবে তা। দিশি পণ্ডিত হলে না হয় কথা, এ যে বিদেশ-বিভুঁই থেকে হাজির।

ট্যাড়ার পর থেকেই আবুর প্রাণ নতুন বুলির জন্য হজিগজি করছিল। তো, গত বৈকালে, গাঁয়ের পথে হাঁটতে হাঁটতে মাঠের ধারে হঠাৎ নজরে পড়ে, কারা যেন মাঠের জোলকেটে মাটি তুলে বাগানের গড় দিয়েছে। বড় একটি আমবাগান। একটা মেটে ইঁদুর নির্জনে গর্ত বানিয়ে যত্নের মাটির কেটে-কেটে গড়টিকে ফোকড়া করে তুলছে। দেখেই আবু বক্করের মনে এল— কাটি-কুটি মাটি ফেলা।

সামান্য আওয়াজে, নর-মনিষ্যি টের পেয়ে ভয়ে ইঁদুরটা হিলবিল করে পালিয়ে যেতেই আবুর ঠোঁটে এল— হিলিকি-বিলিকি ধায়। পথ চলতে চলতে এবার বক্কর দেখে, মস্ত একটা বটগাছের গোড়ায় এক নাপিত আপনমনে একটা পাথরে ক্ষুর শানাচ্ছে এবং মাঝেমধ্যে বাটি থেকে দু-চার ফোঁটা জল ফেলছে পাথরটার মধ্যে। দেখতে-দেখতে আবু বক্করের মাথায় এল— ঘসন্ত, মসন্ত ক্ষুরে

মধ্যে টিপি টিপি পানি।

এবার বৃদ্ধ আবু হাঁটছে তো হাঁটছেই। বিশাল জলাক্ষেতের ধারে এসে দেখতে পায় মস্ত একটি কোলাব্যাঙ পাছার ঠ্যাংয়ে ভর দিয়ে সামনের পা দুটো জোরা করে বসে আছে। প্রাণীটা যেন আকাশে জলের প্রার্থনা করছে। ঠিক জপ-তপ করার ভঙ্গি।

আবুর মনে এল— বসে করে তপো হেলা।

এবার স্থান ত্যাগ কিছুটা এগোতেই আবু লক্ষ্য করে সামনে রাস্তা জুড়ে একটা এঁড়ে শিং উঁচিয়ে স্থির। ক্ষ্যাপা মুদ্রা। নাক দিয়ে ফোঁশ ফোঁশ নিশ্বাস। খেয়েছে। আবু মনে মনে বলল— তুই ব্যাটা মারবি তা আমি নিশ্চয় জানি।

তারপর কোনক্রমে প্রাণ বাঁচিয়ে আবু বক্কর হাঁফ ছাড়ে।

তো হঠাৎ আজকের আসরে আবু বক্কর ঢুকে সোজা রোশনচৌকির কাছে হাজির হতেই, মন্ত্রী বেয়াদপির জন্য চোখ পাকাতে থাকেন।

— তোর কী চাই ব্যাটা?

আবু বুঝল প্রাণটা বুঝি যায়। মরিয়া হয়ে বলে— হুজুর, নতুন বুলি কইতে আলাম।

সার সার পণ্ডিতরা চমকে আবুর দিকে তাকায়। রাজামশাইয়ের নজরেও ইতিমধ্যে এসে গেছে আবু। তাই মন্ত্রী আগ বারালেন না।

রাজা জিগ্যেস করলেন— নতুন কথা না হলে চুণগোলায় ভরব।

— এজ্ঞে হুজুর।

ভয়ে হৃৎপিণ্ড টিকটিক করছে। এই বুঝি চার-পাঁচ জনের ছুরির খোঁচা খেয়ে উল্টে পড়ে। গেল জানডা। কিন্তু আদ্দেক রাজত্বের স্বপ্নও ছাড়তে পারছে না।

ইতিমধ্যে কলের ঘন্টা বাজতেই, বাকি পণ্ডিতরা হাল ছেড়ে বসে আছেন দেখে, রাজামশাই হুকুম ছাড়লেন— বল্ কী বলবি তুই।

সমস্ত দরবার ছিরকুট মেরে থাকে। আবু বক্কর আকাশে খোদার স্মরণ করে বলে— হুজুর।

কাটি-কুটি মাটি ফেলা,
হিলিকি বিলিকি ধায়।
ঘসন্ত-মসন্ত ক্ষুরে
মধ্যে টিপিটিপি পানি।
বসে করে তপো হেলা,
তুই ব্যাটা মারবি তা আমি নিশ্চয় জানি।

আমজনতা থ। রাজামশাই জিগ্যেস করলেন— কিছু বলবে তোমরা?

সব্বাই বলে উঠল— শুনি নাই মহারাজ। নতুন কথাই বটে।

সঙ্গে সঙ্গে আবু বক্করকে প্রাসাদের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হল। চারদিকে বাজনা বেজে উঠল।

পণ্ডিতমহল নির্বাক। ক্ষুণ্ণও বটে। ভাবতে থাকলেন— আমজনতা বদলায় বড্ড কৃপণের মতো।

মণ্ডূককথা

কিন্নর রায়

হাতের তেলোর ভেতর বোর্ড পিন ফোটালে কেমন লাগে?

ভোঁতা, জং ধরা পিন হলে একরকম। স্টেশনারি দোকান থেকে সবে কিনে আনা নতুন পিনে আর এক রকম ব্যথা। দুটো কষ্টকে মন দিয়ে আলাদা করতে করতে শুধু হাতের পাতাতেই নয়, পায়ের পাতাতেও সেই বোর্ড পিনের খোঁচা টের পেল অরূপ।

বালি জোড়া অশ্বত্থতলা বিদ্যালয়ের ক্লাস ইলেভেনের বায়োলজি প্রাকটিক্যাল ক্লাস। মোম মাখান চৌকো, লম্বাটে ট্রের ওপর ব্যাঙ। তার আগে ক্লোরোফর্ম ছিটিয়ে অজ্ঞান করা হয়েছে ব্যাঙকে। তারপর চিৎ করে ফেলে তার জননতন্ত্র, রেচনতন্ত্র, পৌষ্টিক তন্ত্র— সব পর পর ডিসেক্ট করা। সেটা ১৯৬৯। একটা 'ভারত' বা 'পানামা' ব্লেডের দাম পাঁচ নয়া পয়সা। এখন যে কয়েনটাকে আর প্রায় দেখাই যায় না। এক, দুই, তিন পয়সা তো উঠে গেছে কবে দিন। ব্লু কোটিং দেয়া প্রিন্স ব্লেডের দাম দশ নয়া। সেভেন ও ক্লক আর একটু বেশি। সে যাক গে।

নতুন কেনা ব্লেডে কেঁচো, আরশোলা, ব্যাঙ, চিংড়িমাছ— এক বছরে এই চার রকম প্রাণী কাটা। কালো বা সবুজ ভেলেভেটে মোড়া বাহারি বায়োলজি বক্সে সরু মুখের কাঁচি, চিমটে, ক্ষুর, ছুরি— সব স্টিলের। আর আতশ কাঁচ। মোম-ফেলা ট্রের ওপর সামান্য জল। সেই জলে চার হাত পা ছড়ান ব্যাঙ। বাতাসে ক্লোরোফর্মের টিমেতালা গন্ধ। চোখে আতশ কাঁচ দিয়ে ব্যাঙের গভীরে জেগে থাকা সেই সব প্রত্যঙ্গ দেখা।

তারা তো সব কুনো ব্যাঙ। তখন বালির বাড়িতে বর্ষা পড়তে না পড়তেই গাদা গাদা ব্যাঙ। ঘুঁটের বস্তার পাশে। ভাঙা, না-ভাঙা কয়লার ঢিবির ধারে। ঘরের ভেতর, রান্নাঘরে উঠে আসে ব্যাঙের ছানারা। ধাড়ি কোলা ব্যাঙও। বর্ষার জমা জলে, ডোবায় কিলবিল করে ব্যাঙাচি। আস্তে আস্তে ল্যাজ খসে গেলে একসময় তারা ব্যাঙ।

বায়োলজি প্রাকটিক্যাল ক্লাসের জন্যে স্কুলে একটা আরশোলা চার আনায় বিক্রি করে যেত একজন। তার কাছে বড়সড় কুনো ব্যাঙ এক টাকা। তখন এক টাকার অনেক দাম। প্লাস্টিক প্যাকেটে হাত ঢুকিয়ে, নয়ত উনোন থেকে মায়ের পোড়া কয়লা তোলার লোহার চিমটে দিয়ে ব্যাঙ ধরেছি। বায়োলজি প্রাকটিক্যাল ক্লাসে কাটার ব্যাঙ। গায়ে হাত পড়লেই ব্যাঙ চিরিক করে..। সেই পেচ্ছাপ গায়ে লাগলেই নাকি ঘা। ব্যাঙের থুতুতেও নাকি গরল। বিষ।

তখন রাস্তাতেও অনেক সোনা ব্যাঙ। একটু জল পড়লেই গ্যাঙর গ্যাঙ

ব্যাঙের ডাক। 'ডাকিছে দাদুরী মিলন পিয়াসে/ঝিল্লি ডাকিছে...' পাঁচ টাকা দিলে কলেজ ল্যাবরেটরির বেয়ারারা কেমিস্ট্রি প্রাকটিক্যালের 'সল্ট' বলে দেয়। যাক গে সে সব কথা। সেটা ১৯৭০।

বালির বাড়ির স্যানিটারি পায়খানায় পরপর তিনটে চেম্বার। দেড় মানুষ সমান সেই চেম্বারের ওপর সিমেন্টের ঢালাই ছাউনি। পাশের সোকপিটে কোনো ঢাকনা নেই। সেখানে জল জমে। অনেক মশা। ঝাঁক বাঁধা মশারা গুন গুন গুন গুন করে। সেই সোকপিটের জমা জলে বড় বড় সোনা ব্যাঙ। আধ হাতের থেকেও বড় লম্বা। চার হাত পা ছড়িয়ে সেই সব ব্যাঙেরা সাঁতার দিত। তখনও ব্যাঙের ঠ্যাঙ বিদেশে বরফ চাপা দিয়ে চালান দেয়া শুরু হয় নি।

বড় ব্যাঙকে বাবা বলতেন, ভাইয়ো। ছোট ব্যাঙকে কুতকুতি। এই ভাইয়ো কথাটি কি বাবার আবিষ্কার। নাকি ঢাকা থেকে নিয়ে আসা অনেক স্মৃতির সঙ্গে সেই 'ভাউয়া' শব্দটিও এসে গেছিল— যা বড় ব্যাঙ বলতে বোঝায়।

ব্যাঙের মাথায় নাকি মণি থাকে। কে জানে কেন। ছোটবেলায় এই সব বিশ্বাস করতে বেশ লাগত।

রূপকথার গল্পে অভিশপ্ত রাজপুত্র ব্যাঙ হয়ে যায়। তার বিয়ে হয় রাজকুমারীর সঙ্গে। তারপর এক সময় সেই ব্যাঙের খোলস পুড়িয়ে দিয়ে রাজকুমারী পেয়ে যায় রাজপুত্রকে। আর রাজপুত্তুর? তার কি কোনো যন্ত্রণা থাকে? কষ্ট? খোলস হারানর বেদনা?

কি করে হয়? কি করে? অরূপের মাথার ভেতর নাগরদোলার-পাক।

পঁয়তাল্লিশ প্রাস অরূপ বাগচির এতসব কথা পর পর মনে পড়ল না। কিন্তু তার মাথার খাদে ক্লোরোফর্মের ভারী গন্ধ। মোমমাখা ট্রের ওপর শোয়া তার হাত পায়ে বোর্ড পিন। সকালে অফিস যাওয়ার জন্যে তৈরি হওয়ার আগে স্বর্ণা বলেছে, এমাসে একটা মশারি কিনতেই হবে। রোজ অ্যাত মশা ঢোকে। আসলে পাঁচশো টাকা দিয়ে বছর তিনেক আগে একটা মশারি কিনেছিল অরূপ। তাদের শোয়ার খাটের মাপ সাড়ে ছয় বাই সাত ফিট। বক্স খাট। ফরেন নেটের সেই মশারিতে খুব হাওয়া ঢুকত। কিন্তু হলে হবে কি। এক মাসের ভেতরই পোকায় তার দফারফা করল। ফুটো আর ফুটো। কত আর জোড়াতালি দেয়া যায় রোজ। সেই ফুটো দিয়ে মশা। মাঝরাতে উঠে সেই রক্ত খেয়ে ঢুবো হওয়া মশা মারা। দু হাতের পাতায় আঙুলে রক্তের ছোপ। পায়ে হাতে মশার কামড়।

খুব ম্যালেরিয়া হচ্ছে চারপাশে। সঙ্গে ফাইলেরিয়া, ডেঙ্গু। কি শুনতে পাচ্ছ। বাচ্চা-কাচ্চার ঘর। একবার ম্যালেরিয়া, ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া বা অন্য কিছু হলে আর উপায় নেই। এনকেফেলাইটিসও হচ্ছে চারপাশে, কাগজে দেখলাম। মশারি না কিনলে এবার...

লোকজনের যত না হচ্ছে ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু বা এনকেফেলাইটিস— তার

চেয়ে অনেক অনেক বেশি হচ্ছে খবরের কাগজের হেডিংয়ে। এমন লিখছে যেন মড়ক লেগে গেছে কলকাতায়। বলেই অরূপের মনে হলো, মোম মাখান ট্রেব ওপর জলের পাতলা মলাটের নিচে চার হাত পায়ে পিন লাগান অবস্থায় কাটা পেট নিয়ে সে শুয়ে আছে।

যাই বল তুমি, মড়ক না হোক, মারা তো যাচ্ছে লোকজন। হাসপাতালের ভেতর ম্যালেরিয়ার দাপট। আর গোটা কালিঘাট ভবানীপুর টালিগঞ্জ ত— ম্যালেরিয়াপ্রবণ অঞ্চল হয়ে গেল। নর্থে শ্যামবাজার বৌবাজার বাগবাজার কলেজস্ট্রিট— সব জায়গায় ম্যালেরিয়া। রাত নটার পর নাকি ম্যালেরিয়ার মশা কামড়াবার জন্যে উড়ে আসে। আর যে বাড়িতে ঢোকে তাদের বারোটা বেজে গেল। পালা করে করে জ্বরে পড়া। কাঁপুনি, খিঁচুনি, কখনও মৃত্যু। না বাবা, আর রিসক নেয়া যায় না। তুমি এ মাসেই একটা মশারি কেন।

নিজের পনের বছরের বিয়ে করা বৌয়ের দাঁত খুব সাজান, হাসলে ভারী সুন্দর দেখায় ঝর্ণাকে। তার দিকে তাকালে অরূপ টি ভি-র পর্দায় ধারাবাহিক চেতাবনী— পাত্রে জল জমাবেন না, পরিষ্কার জলে ম্যালেরিয়ার মশা ডিম পাড়ে— এমনটি শুনতে পায়। কিংবা তাদের ছেলেবেলায় শোনা সেইসব ছিকুলি-ধাঁধা— এক থালা সুপারি গুনিতে না পারি।'

'কি হবে এর উত্তর?

কেন, তারা বসান আকাশ।

'বন থেকে বেরুল টিয়ে

সোনার টোপর মাথায় দিয়ে।' মানে কি?

জানি তো, আনারস।

'বগা ঠুঁটি বগা ঠুঁটি বগও তো

উড়ে উড়ে পেখম ধরে ময়ূরও তো নয়

মানুষ খায় গোরু খায় বাঘও তো নয়

শহরে বন্দরে ফেরে চোরও তো নয়।' কি হবে এর উত্তর?

মশা।

আর এইটা— 'ঘরের মধ্যে ঘর/তার মধ্যে পড়ে মর'?

মশারি।

ঝর্ণার সঙ্গে এইসব কথা হয় না। কিন্তু অরূপ বাগচি তার বৌয়ের সাজান দাঁতে টি ভি-র পর্দা দেখতে দেখতে ভাবতে শুরু করে, এমাসে আমি এত কি করে পারব ঝর্ণা। নিয়ম মতো তিন মাসের বিল একসঙ্গে পাঠিয়েছে স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড। একটা তারিখের আগে তিন মাসের বিল একসঙ্গে দিলে খানিকটা বেশি রিবেট পাওয়া যায়। তাই বা কম কি? ধর— নশো টাকা ইলেকট্রিক বিল, ফোনের বিল সাতশো, হলো ষোলশো। তারপর তুতুল-মিতুল— আমাদের দুই কন্যার ক্লাস

সেভেন আর এইটের টিউশন ফি। তিনশো তিরিশ প্লাস তিনশো পঁচানব্বই। ক্লাস এইটের তুতুলের দুজন প্রাইভেট টিচার। ইংরেজি বাংলা— মানে ল্যাংগোয়েজ গ্রুপ— দুশো টাকা। ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথমেটিকস— সায়ান্স গ্রুপ— তিনশো টাকা। দুজনের আঁকার স্কুল— ষাট প্লাস ষাট— মোট একশো কুড়ি। দুজনের নাচ— দেড়শো দেড়শো তিনশো। স্কুলে যাওয়া আসার রিকশা ভাড়া আছে দুজনের— তিনশো সত্তর। পাম্পের বিল আছে। এল আই সি-র একজন হায়ার গ্রেড অ্যাসিসটেন্ট আর কত পারে বল তো। এবপর ফ্ল্যাটের লোন কাটা আছে। ইয়ারলি ইনকাম ট্যাক্স বাঁচাতে এন এস সি কেনার জন্যে মান্থলি হাজার টাকা রেকারিং। সেই জমা টাকা ভোগ করা তো দূরের কথা, আমি ছুঁতে পর্যন্ত পারব না।

বিদেশি বিমা কোম্পানিকে তো ছেড়ে দেয়া হচ্ছে। ফিস ফিস করে বলে ওঠে অফিসের পুরনো দেয়াল। প্রাচীন দরজা জানলা বলে ওঠে, সেই রকম বিল আসছে পার্লামেন্টে।

আসছে কি, এসে গেছে। নেহাৎ বার বার সরকার বদলাচ্ছে, তাই—

মালহোত্রা কমিটির রিপোর্ট—

সে তো কবেই বেরিয়ে গেছে।

খুব খারাপ দিন আসছে সামনে। নতুন কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেই। যাকে তাকে, যেখানে সেখানে বদলি করে দেবে— তোমার চাকরির শর্তেই এটা আছে, এমন বলে। জানলা-দরজা, দেয়াল, টেবিল, চেয়ার, পেপারওয়েট, জলের গ্লাস, ফাইল— সবাই ফিসফিস করে এইসব কথা বলে।

ফিরে আসবে সেই কোম্পানির আমল। ন্যাশনালাইজেশনের পর এল আই সি যে লাভ করে তার অনেকটাই এ দেশের উন্নয়নে খাটে। ব্রিজ তৈরি হয়, রাস্তাঘাট। কোটি কোটি টাকার লাইফ ফাণ্ড আমাদের— সেখানেও বিদেশি ইনসিওরেন্স কোম্পানি হামলা করবে। এসব শুনলে অরূপ হাতের তালু ও পায়ের পাতায় জং ধরা পিনের ব্যথা টের পায়। ক্লোরোফর্মের গন্ধ বসে যায় বুকের ভেতর।

ইউনিয়নও কিছু করতে পারবে না। করার কোনো ক্ষমতা নেই। সব জায়গায় মেশিন বসে যাচ্ছে। কমপিউটার, ফ্লপি। ম্যানুয়ালি আর কিছু হবে না। লোকই লাগবে না এত। ক্লাস থ্রি, ক্লাস ফোর থাকবেই না বলতে গেলে। যা থাকবে— তা হলো কয়েকজন অফিসার আর কিছু মেশিন।

ক্লাস থ্রি ক্লাস ফোর না থাকলে ইউনিয়নের চাপও নেই।

মনমোহন সিং, চিদাম্বরম, যশোবন্ত সিনহা— সবারই কথাবার্তা কাছাকাছি। বিমা বেসরকারিকরণ করতে হবে। বিদেশি কোম্পানিগুলোর সামনে খুলে দিতে হবে ব্যবসার দরজা।

এসব কথার ছ্যাঁকা অফিসে ঢুকলেই গায়ে লাগে। অরূপ বাগচি বুঝতে পারে

বেশ বড় কিছু একটা রদ-বদল হতে যাচ্ছে। বড় টেবিলের ওপর প্লাস্টিকের চৌকো নেমপ্লেট তার গায়ে ইংরেজিতে লেখা— অরূপ বাগচি— এইচ জি এ— হায়ার গ্রেড অ্যাসিস্টেন্ট। তার টেবিলের নেম প্লেটও কি কি যেন বলে। শুনতে পায় অরূপ।

পরীক্ষা দিয়ে অ্যাসিসটেন্ট হিসবে ঢুকেছিলাম। তারপর আবার পরীক্ষা দিয়ে এইচ জি এ। তাতে মাইনে হয়ত সামান্য বাড়ল। কিন্তু দায়িত্ব বাড়ল অনেক। এখন অন্যকে কাজ দিতে হয়। অফিসাররা আমাকে প্রায়ই ডেকে পাঠান।

ইউনিয়ন এই যে স্ট্রাইক ডাকে, নয়ত এক ঘন্টার কর্মবিরতি— তাতে আরও ক্ষতি আমাদের। মাইনে কাটা যায়। টানাটানি বাড়ে সংসারের।

কি হবে এই সব স্ট্রাইক-মাইক করে। যা হবার তা হবেই। বিদেশি কোম্পানি আসবেই। সরকার যা করার করবেই। কেউ কিছুই আটকাতে পারবে না।

এমন অনেক কথা মেঘ হয়ে অফিসে ঘোরে। পাশাপাশি চলে গেট মিটিং, স্লোগান, কর্মবিরতি। জলের গ্লাস, ফাইল। ইউনিয়নের চাঁদা। কেস কমিটি। ঘরের মেঘ বাইরের মেঘ কখনও কখনও এক হয়ে যায়।

তিনটে ডি এ কমে গেল পরপর।

তার মানে মাসে হাজার টাকা কম। আমরা চালাব কি করে?

এক হাজার টাকা। ভেবে দেখুন, এক হাজার। বলতে বলতে হাত-পায়ের তেলোয় ভোঁতা পিন ফোটাবার যন্ত্রণা টের পায় অরূপ। মাথার ভেতর ক্লোরোফর্মের নাচ। নাকের মধ্যে সেই ঝিমঝিমে গন্ধ। দু চোখ জড়িয়ে আসে। দেশে নাকি মুদ্রাস্ফীতি কমছে।

কোথায়। জিনিসের দাম তো কমে না।

এই তো, এই তো কাগজে লিখেছে— বলে আর একজন এইচ জি এ খবরের কাগজ এগিয়ে দেয়।

মুদ্রাস্ফীতি কমল

নয়াদিল্লি ৮ আগস্ট— মুদ্রাস্ফীতির বার্ষিক হার গত ২৪ জুলাই শেষ হওয়া সপ্তাহে আরও কমে হয়েছে ১.১৯ শতাংশ। আবার সপ্তাহে তা ছিল ১.৬২ শতাংশ। গত বছর এই একই সময়ে এই হার ছিল ৮.৭৮ শতাংশ। পাশাপাশি আলোচ্য সপ্তাহে সমস্ত পণ্যের জন্য পাইকারি মূল্য সূচক সামান্য বেড়ে হয়েছে ৩৫৭.৪। আগের সপ্তাহে তা ছিল ৩৫৭.৩।— পি.টি. আই।

এসব তো কাগজে কলমে কমে। খবরের কাগজে তিনের পাতায় পাঁচ ছ লাইনের এই খবর পড়ে গা-জ্বালা করে। বাজারে গেলে কোথাও টের পাওয়া যায় না মুদ্রাস্ফীতি কম। সব জিনিসের দাম বাড়ছে— ইনফ্লেশন— ইনফ্লেশন। কিন্তু খবরের কাগজ ডাটা দিয়ে দিয়েও দিব্যি কমিয়ে দিচ্ছে। আর ডি এ কমে যাচ্ছে আমাদের। এসব ভেবে অরূপ একটা সিগারেট ধরিয়ে ফেলে। এই এক বাড়তি

খরচ। প্রতিবার বাজেটের পর ভাবি ছেড়ে দেব। দিন পাঁচ-সাত সিগারেট ছাড়া থাকিও। তারপর একটা দুটো একটা দুটো করে, যে কে সেই। ঝর্ণা এক সময় খুব মুগ্ধ থাকত সিগারেটের গন্ধে। এখন বিরক্ত হয়।

কি খাও এইসব ছাইপাঁশ। অকারণ কাশি হয়। গলায় ইরিটেশন। তুতুল-মিতুলেরও তো প্যাসিভ স্মোকিংএর থেকে। অ্যাত দেখাচ্ছে টি ভি-তে। কিন্তু তোমাদের কানে গেলে তো, পয়সা দিয়ে কি এক গাদা ধোঁয়া গেলা। এসব বলতে গিয়ে ঝর্ণার সাজান দাঁত কাঁটাতারের বেড়া হয়ে দাঁড়ায়।

অফিসে এখনও নন স্মোকিং জোন হয় নি। বাইরে গিয়েও ফুঁকতে হয় না। কলকাতার অনেক অফিসেই স্মোকিং ফ্রি জোন হয়ে গেছে। হাওয়ায় ধোঁয়া মেশাতে মেশাতে অরূপ ভাবল ভি আর এস দিলে আমি কি নিয়ে নেব। পরে যদি ভি আর এসও না দেয়। ফরেন ব্যাঙ্কগুলোতে যেমন নোটিশ দিয়ে পর পর টারমিনেশান-এর চিঠি ধরিয়ে দিচ্ছে। কাল কিংবা পরের মাস থেকে তোমার আর চাকরি নেই। দৌড়-ঝাঁপ করে সকাল নটায় অ্যাটেনডেন্স। তারপর ফেরার সময়ের কোনো ঠিক নেই। কোম্পানি কার লোন দেবে। গাড়ি কিনে মাসে চল্লিশ লিটার কি আর একটু বেশি পেট্রল ফ্রি। সেই স্বপ্নের চাকরি চলে গেলে আলিবাবার গুহার দরজা রাতারাতি বন্ধ। সুপার অ্যানিউটেড ম্যান।

সামনে লম্বা টেবিলের ওপর জল রঙের কাঁচে নিজের মুখ ভেসে উঠলে একটা ব্যাঙকেই যেন দেখতে পায় অরূপ। মাথার চুল অনেকটা পিছিয়ে গিয়ে চওড়া কপাল। সেই কপালে ব্রণের দাগ। নতুন ফুসকুড়ি। কোষ্ঠকাঠিন্য, অ্যাসিড, আমাশা।

চোখে চশমার বড় বড় কাঁচ আরও বড় হয়ে ভেসে উঠল টেবিলের কাঁচে। ব্যাঙের চোখ। ব্যাঙের জিভ ওল্টান সেই ওল্টান জিভ দিয়ে ব্যাঙ পোকা-মাকড় শিকার করে। কবে পড়েছিলাম যেন প্রকৃতি বিজ্ঞান বইয়ে। অরূপের মনে পড়ল।

কলকাতায় আর ব্যাঙ দেখতে পান অরূপবাবু? নিজের ছায়াকে নিজেই জিগ্যেস করে অরূপ।

নাতো— নিজের প্রশ্নের জবাব দেয় নিজেই।

আগে রাস্তায় ঘাটে খুব দেখা যেত ব্যাঙ। সোনা, কোলা, গেছো, কটকটে, কুনো।

সত্তর সালে— হ্যাঁ, ঐ সময়েই হবে, ব্যাঙ ধরে ধরে চালান দেয়া শুরু হলো না?

আপনার অ্যাত মনে থাকে কি করে অরূপবাবু?

ঐ যে হাতে পাঁচ ব্যাটারি, নয়ত তিন সেলের বড় টর্চ। আর পিঠে বড় ঝোলা। ছবিটা চোখের সামনে ভাসে। একজন নয়। অনেক লোক।

ব্যাঙ ধরত কি দিয়ে?

ক্লেন চিমটে, নয়ত কোচ।

তারপর ধরে ধরে বিদেশে। লোকাল রেস্তরাঁয়ও কখনও। খুব দামী ডিশ। ফ্রগ লেগ একেবারে চিকেন লেগ পিসের মতো। অসাধারণ ডিলিশাস।

সিগারেটের ধোঁয়ায় অরূপের মুখ আবছা হয়ে গেলে টেবিলের কাঁচে জলছবি হয়ে ভেসে থাকা তার ছায়াও আড়াল হয়ে যায়।

সাউথ বেঙ্গলে খুব ব্যাঙ ধরত লোকজন। ধরে ধরে একেবারে ভুষ্টিনাশ। ব্যাঙের বংশ শেষ। বিশেষ করে সোনা ব্যাঙ। লোভ। মানুষের লোভ। টাকা। আরও টাকা। অনেক টাকা। ফরেন কারেন্সি। বৈদেশিক মুদ্রা। উন্নয়ন।

ব্যাঙের আরও সব কি কি নাম আছে যেন অরূপবাবু?

ও মিস্টার বাগচি— আপনি এও জানেন না। অথচ সকালে বাংলা দৈনিকটি এলেই তো তার পাঁচের পাতায় 'শব্দ ছক'-এর ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েন। তিমি মাছকে যে গিলে খায়, এতো তাকেও গিলে খায়— তিমিঙ্গিল গিল— হবে কি? আর এই সরস্বতী ছিলেন বাংলার সাধক কবি?

এতো পরমানন্দ সরস্বতী।

উপনিষদ বিশেষ, ছ অক্ষরে?

বৃহদারণ্যক।

সকালে সব কাজ ফেলে শব্দ ছক নিয়ে নাড়াঘাঁটা করলে ঝর্ণা বিরক্ত হয়।— কি রিটায়ার্ড পার্সনের মতো দিনরাত শব্দছক কর।

করি তো। যাতে আলঝাইমার না হয়।

ঐ ভুলো রোগ তোমার হবে না। আমার সঙ্গে ঝগড়ার পরেই যে ভাবে মনে রাখ তুমি।

বয়েস হলে কি হবে, কিছুই বলা যায় না ঝর্ণা। কিস্যু বলা যায় না। ব্রেন সেল যদি একটু একটু করে শুকিয়ে যায়—

রাখ তো তোমার বাজে কথা। বাজে কথা বাদ দাও।

ব্যাঙের আর প্রতিশব্দ বা সমার্থক শব্দ কি আছে? বেঙ, দাদুরী, ভেক, মণ্ডুক। মণ্ডুক শব্দটা যেন কোন একটা বাংলা সিনেমায় শুনেছিলাম। কোন সিনেমায়— কোন সিনেমায়— হ্যাঁ মনে পড়েছে। আগন্তুক। সত্যজিৎ রায়ের আগন্তুক। উৎপল দত্ত বলেছিলেন কথাটা। একটা ডায়ালগে। কূপমণ্ডুক— কুয়োর ব্যাঙ হয়ো না। বা এরকম কিছু। কি অসাধারণ অভিনয় উৎপল দত্তের। একেবারে সমস্ত রকম ম্যানারিজম বাদ দিয়ে অন্য ধরনের ক্যারেক্টার রোল। 'আগন্তুক' ছবিটা অবশ্য তেমন আহামরি কিছু লাগে নি অরূপের।

সিগারেট শেষ হয়ে গেলে গলা আর ঠোঁটের গায়ে খানিকটা খানিকটা তেতো জড়িয়ে যায়। ইচ্ছে হয় নতুন সিগারেটের।

আমার সি আর-এ কি কোনো কালো দাগ পড়ল? নিজেকেই নিজে জিগ্যেস

করে অরূপ। অফিসে প্রতি মাসের শেষ তিন দিন খুব কাজের চাপ থাকে। আর মাসের প্রথম তিনদিনও। তখনও মাথা তোলা যায় না। এছাড়া মার্চের ইয়ার এণ্ডিং তো আছে। কিন্তু অ্যাত করেও কি শেষ রক্ষা হবে। পারব কি রিটায়ারমেন্ট পর্যন্ত চাকরি করতে। আমার দুই মেয়ে, ঝর্ণা, বাকি জীবন, ফ্ল্যাটের লোন! বয়েস হলে শরীর ভাঙবে। শরীর খারাপ হবে। মেয়েদের এডুকেশন খরচ। বিয়ে— সবই তো আছে।

বালির বাড়িতে— একতলায় একটা ঘর, কমন বাথরুম-পায়খানা নিয়ে থেকে গেলে হাউজ বিল্ডিং লোনের টেনশান, আরও নানান খরচের ধাক্কা— এসব নিয়ে দুশ্চিন্তার পাহাড় ঘাড়ে চাপত না। কিভাবে ম্যানেজ হবে সব, যদি সত্যিই চাকরি না থাকে। কোথায় গিয়ে দাঁড়াব। কে দেখবে। এসব অনেকক্ষণ ধরে ভাবলে মাথার ভেতর উথাল পাথাল হতে থাকে। বুকের মধ্যে ছড়ায় ক্লোরোফর্মের ঝাঁঝ। কি রকম যেন একটা ঝিমঝিমে ব্যাপার।

ডি ও এজেন্টরা কাজের জন্যে অরূপের সামনের টেবিলে বসে। ডেথ ক্লেম।

স্যার, আমারটা একটু দেখবেন।

স্যার, আমার কেসটা—

আমারটা স্যার—

অরূপ শুনতে পায় তাকে ঘিরে অনেকগুলো ব্যাঙ ডাকছে-গ্যাঙোর গ্যাঙ। গ্যাঙোর গ্যাঙ। গ্যাঙোর—

এরা কি ব্রাঞ্চে নতুন। আগে দেখেছি বলে তো মনে পড়ছে না। না কি দেখেছি। নিজের ভেতর এসব গিলে নিয়ে অরূপ বলল, আচ্ছা, আপনারা কেউ ব্যাঙের আধুলির গল্পটা জানেন?

কি গল্প স্যার।

জানেন না।

একটু যদি ধরিয়ে দেন স্যার।

ঐ যে একটা ব্যাঙ রাস্তায় একটা আধুলি কুড়িয়ে পেয়েছিল। সেই চকচকে আট আনা হাতে পেয়ে কি তার গুমোর। রাস্তার পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়া হাতিকে দেখে পেট ফোলাতে ফোলাতে ফোলাতে তার মতো বড় হতে গিয়ে শেষ অব্দি ফটাস।

ফটাস মানে।

পেট ফেটে গেল। হাতি হতে গিয়ে পেট ফেটে গেল ব্যাঙের। ব্যাঙ ফিনিশ।

কি বলছেন স্যার। ব্যাঙটা মরে গেল। খুবই দুঃখের কথা স্যার। নিন, এটা রাখুন প্লিজ।

বলেছি না, এসব সিগারেটের প্যাকেট ফ্যাকেট কখনও আনবেন না আমার জন্যে। কাজ হলে এমনি হবে। না হলে হবে না।

না স্যার, কাজের জন্যে নয়। আপনি সিগারেট পছন্দ করেন, তাই—

আমি আরও অনেক কিছু পছন্দ করি। ভবিষ্যতে আর কখনও এমন করবেন না। তাতে আপনাদের অসুবিধে হবে। আপনারা কি এ ব্রাঞ্চে নতুন? আগের কথাগুলো বললেও শেষ বাক্যটি বলা হলো না অরূপের। তার মনে পড়ল যে ভাবেই হোক এ মাসে একটা মশারি কিনতেই হবে। রোজ রাতে ফাঁক ফুটো দিয়ে ঢুকে পড়ছে মশা। রক্ত খেয়ে ঢিব হয়ে বসে থাকছে। ভাবতে ভাবতে সামনের লোকগুলোকে অরূপ বলল, আজকে আপনারা আসুন। মুড স্পয়েল করবেন না। সাড়ে ছয় বাই সাত ফিট খাটে অর্ডিনারি নাইলন মশারি দুশো আশি টাকা। টু হাড্রেড এইটটি। ভালো— ফরেন কোয়ালিটির নেট নিলে ছশো— সিক্স হাড্রেড। মশারি এখনই দরকার। চেতলা হাটে সস্তা পাব কি মশারি? নাকি হাওড়ার মঙ্গলা হাটে? কিংবা বড়বাজারে?

হাতের তালুতে ফোটান পিনের যন্ত্রণা আবারও টের পেল অরূপ বাগচি। সঙ্গে পায়ের পাতায় বিঁধে থাকা পিনের কষ্ট। নাক-মুখ ভরে গেল ক্লোরোফর্মের গন্ধে। ঢেকুর তুললেও ক্লোরোফর্মের গন্ধ উঠে আসছে।

খরচ পর পর সেজে থাকে। আমি আর কত পারি। সামনের মাসে চার্টার্ড বাসটা ছেড়ে দেব ভাবছি। তাতে বেশ কয়েকটা টাকা বাঁচবে। কিন্তু অনিশ্চয়তা। সে তো বেড়ে যাবে নিয়ম মতো। ঐভাবে ঠেলেঠুলে বাসে ওঠা। ভাবলেই গা কেমন করে। গলা শুকিয়ে আসে। বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শরীর কিছু কিছু আরাম চায়। সেই আরাম অর্জন করতে গেলে টাকা লাগে। চাকরি করে সৎপথে থেকে টাকা হয়। এসব ভাবলেই মাথা ভারী হয়ে আসে ক্লোরোফর্মের গন্ধে। দুপুরের ভাত-তরকারি-ডাল-মাছের বদহজমি ঢেকুর জড়িয়ে যায় জিভের সঙ্গে। কেমন যেন টকসা একটা জল উঠে আসে ভেতর থেকে। বাইরে মেঘমাখা শ্রাবণের পৃথিবী কেমন যেন ভেপসে ওঠে।

বালি শান্তিরাম রাস্তার বাড়িতে আমরা তাঁতের মশারি টাঙিয়ে রাতে শুতাম। সেই মশারি ময়লা হয়ে গেলে মা গরম জলে সোডা দিয়ে সেদ্ধ করে কেচে নিতেন। পা দিয়ে মাড়িয়ে মাড়িয়ে। তারপর নেটের মশারি এল। সুতির নেট। ক্ষারে কাচা মশারির গায়ে একটা সাবান সাবান গন্ধ। সব পর পর মনে পড়ে যাচ্ছে অরূপ বাগচির।

মশারি কিনতেই হবে এমাসে। সঙ্গে কেনা দরকার দু দুটো ওয়াটার প্রুফ। তুতুল-মিতুল— দুজনের জন্যেই ডাকব্যাক কোম্পানিব ওয়াটার প্রুফ। অর্ডিনারি ওয়াটার প্রুফ কিনলে বগল থেকে বড় তাড়াতাড়ি ছিঁড়ে যায়। রিকশায় বসে মেয়েরা ভেজে। এভাবে ভিজলে জ্বর হবে। দুটো ওয়াটার প্রুফ মানে আরও প্রায় শ ছয়েকের ধাক্কা। কোত্থেকে পাব আমি অ্যাত টাকা। এসব ভাবলেই হাতের তালু, পায়ের পাতায় মরচে ধরা পিনের যন্ত্রণা বাড়তে থাকে।

ভাবতে ভাবতে আবারও ফাইলের গলিঘুঁজিতে ফিরে গেল অরূপ বাগচি।

মশারি না কিনলে সত্যি সত্যি এবার বিপদ হবে।

দেখছি। দেখছি। বলে ঝর্ণার কথাকে ঘাড় থেকে ঝেড়ে ফেলতে চাইল অরূপ। আজকাল একই কথা অনেকবার করে বলে ঝর্ণা। এ কি বয়েস বাড়ার সংকেত? আমিও কি একই বাক্য রিপিট করি। নিজে টের পাই না।

একবার ম্যালেরিয়া হলে কিন্তু—

আমাদের এই এলাকা ম্যালেরিয়া জোন নয়।

না হোক। মাঝরাতে উঠে রোজ ফটাস ফটাস করে মশা মারা যে কি বিরক্তিকর, যে মারে সে জানে। তুতুল-মিতুলদের মশা কামড়ে কামড়ে ফুলিয়ে দেয় একেবারে।

দেখছি— এমাসেই বলে সিগারেট দেশলাই নিয়ে ছাদে উঠে যায় অরূপ।

ফুটো মশারির ভেতর শুয়ে ঘুম আসতে দেরি হয় না। ঘুমে ভাসতে ভাসতে বালির বাড়ির ঢাকনা ছাড়া সেই সোকপিটের ভেতর উপুড় হয়ে ভাসা বড়সড় সোনা ব্যাঙটিকে দেখতে পায় অরূপ। কি তার বিশাল বিশাল ঠ্যাঙ। এক লাফে পেরিয়ে যেতে পারে কতটা রাস্তা।

ঘুন ঘুন ঘুন ঘুন করে মশার ঝাঁক উড়ছে সোকপিটের জলের ওপর। তা থেকে কখনও কখনও একটি দুটি একটি দুটি পেটে যাচ্ছে সোনা ব্যাঙের।

ব্যাঙ কমে গেল, সঙ্গে সঙ্গে মশা বাড়ল। ঘুমের মধ্যে বিড় বিড় করে উঠল অরূপ। তারপর পাশ ফিরতে ফিরতে তার মনে পড়ল কতদিন আগে ছেড়ে রাখা সেই ব্যাঙের চামড়াটির কথা। ব্যাঙের চামড়া গা থেকে সরিয়ে রেখে রাজপুত্তুর হলাম। সেই ছালটি এক রাতে তুমি কি পুড়িয়ে দিলে ঝর্ণা? না কি অন্য কেউ? আমার অভিশাপ কি মুছে গেল তাতে? আবার আমি ব্যাঙ হয়ে যেতে চাই। বালির বাড়ির সোকপিটে ভাসা সোনা ব্যাঙ।

ঘুমের ভেতর আস্ত এক মণ্ডুক হয়ে উঠতে চাইল অরূপ।

আলোয় অন্ধকারে

বীরেন্দ্র দত্ত

নদী ছিল উত্তাল। তার ওপর আকাশ ছিল মেঘে ঢাকা। নদীর ঢেউয়ের ওপর গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির স্পর্শ ছিল শিহরণ জাগানোর মত। নদী পার হয়ে ডাঙার বিশ্রী রাস্তায় ওরা দুজন ভ্যান রিক্‌শাটা ঠেলেছে বেশ কিছু সময়। এখন রিক্‌শা থামিয়ে ওরা বিশ্রাম নিচ্ছে। চারপাশে কঠিন অন্ধকার। এখন রাতের শেষ প্রহরের শুরু। চাঁপা বুক ভরে নিশ্বাস নিতে আকাশের দিকে হাঁ-করা মুখে তাকাল। আহ্। কী শান্তি। কিন্তু একি। কোটি কোটি তারা-ঝোলানো আকাশে বুঝি এত ফুল। আগের এতটুকু মেঘ নেই। এত আলো চারপাশের অন্ধকার পাথরটাকে গলিয়ে নরম করে দিয়েছে।

টানা এক মাসের এই নতুন সাজে এত গভীর রাতে চাঁপার বুঝি কি এক মুক্তি। চাঁপার মধ্যে এমন ভাবের কোন ভাষা নেই, কিন্তু মুক্তির অবুঝ স্বাদ মেলে।

দিদি প্রাসাদীর দিকে তাকায়। 'দেরী হয়ে যাচ্ছে দিদি।' চাঁপার গলায় নতুন উদ্যম।

প্রসাদী ভ্যান রিক্‌শার সীটে হাত রেখে দাঁড়িয়ে। 'তুই টর্চটা একবার জ্বালবি। সামনের রাস্তাটা একটু দেখে নিই।'

চাঁপা রিক্‌শায় বসে। রিক্‌শার এক প্রান্তে। হাতের চর্চটা জ্বেলে সামনের রাস্তায় বার কয়েক আলো বোলায়। বাকি তিনটি মড়া যেন একজায়গায় গাদাগাদি হয়ে গেছে। রাস্তা এতক্ষণ ছিল এবড়ো-খেবড়ো। তাই এমন। প্রসাদী আলো একভাবে দাঁড়িয়ে। চাঁপা মড়াগুলোর ওপর আলো বোলায়। দুচোখে এখনো লেগে আছে অন্ধকারে আলো দেখার মুখ, তারাদের আলোর অঞ্জন। টর্চের অস্থির আলো হঠাৎ একসময় স্থির হয়ে যায় একটি মড়ার মুখে। এ কে? কে? চমকে উঠে থর থর করে কাঁপে। বুকের মধ্যে ধক্ করে একটা শব্দের ধাক্কা লাগে। রুদ্ধশ্বাস। পরমুহূর্তে সারা শরীরে একটা ছোট বাসন মেঝের পড়ে যাওয়ার মত ঝন্‌ঝন্ ধ্বনির অনুভব।

'দিদি।'

এখন মেঘ সরে গিয়ে অন্ধকারের বুকে একসময় ঝিঁঝির ডাক। প্রাসাদী কাঁধে ঝোলানো ব্যাগটা সরিয়ে শালওয়ার কামিজের ওড়নাটা কোমরে বাঁধছিল। চাঁপার ফিস ফিস শব্দ নিশ্ছিদ্র অন্ধকার জড়িয়ে প্রসাদীর কানে কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে গেল।

'কি হল।' চাঁপাকে বিমূঢ় স্থির হতে দেখে থতমত খেল ও। অন্ধকার সরানো চোখে চাঁপার মুখের ওপর দৃষ্টি রাখে।

চাঁপার চোখ আর হাতের টর্চের আলো একভাবে মড়াগুলোর ওপর স্থির। বুক-চাপা গলায় চাঁপা বলে, 'দিদি, এদিকে আয়। দ্যাখ্ তো।' ওর গলায় অবিশ্বাস।

চাঁপার বয়স ষোল, প্রসাদীর বাইশ। দুই বোন ওরা। তবু ওদের সম্পর্ক তুই-তুকারির।

প্রসাদীর নির্বোধ বাক্যহীন বিস্ময় কাটেনি। চাঁপার পাশে এসে দাঁড়ায় নিমেষে। চাঁপার হাতে-ধরা টর্চের আলোর রেখা ধরে প্রসাদী একটা মড়ার মুখে দৃষ্টি রাখে। চমকে ওঠে ও। 'রাজুর মুখ না?' স্বর ভীত-সন্ত্রস্ত।

'রাজুদাই তো!' চাঁপা জোর দেয়। 'কি, তাই না?' উত্তেজনায় বুক ওঠে নামে।

দুজনে পরস্পরের দিকে দৃষ্টি ফেলে রাখে। কয়েক মুহূর্ত ওরা শ্বাসরুদ্ধ, স্পন্দনহীন, অনড়।

পাথরপ্রতিমা থানা থেকে মড়া তিনটি নেওয়ার সময় আষ্টেপৃষ্টে মোড়া অবস্থায় বাঁধা ছিল। পাথরপ্রতিমার ঘাট থেকে দেশি নৌকায় সুতার বাঁধ নদী পার হয়েছে। রামগঙ্গার শীতে ভ্যান রিক্শাকে অনেকটা রাস্তা ঠেলতে হয়েছে। রাস্তা একেবারে এব্ড়ো-খেব্ড়ো, গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিতে ভেজা এঁটেল মাটির। বৃষ্টির জলে ভেজা তৈলাক্তের মত। গাড়ির এত ধকলে দড়ির বাঁধন কখন গেছে খুলে। রাজুর থুতনির নীচে থেকে একটু পাশ-ফেরা মুখটা আবরণহীন, বীভৎস, ফ্যাকাশে। মড়াগুলো পৌঁছে দিতে হবে ডায়মণ্ডহারবার মর্গে। অন্য দিনের মত আজও দিনের আলো ফোটার আগেই পৌঁছে দিতে হবে। বেরিয়েছে সেই রাত একটায়।

প্রসাদী গভীর শ্বাস ফেলে। চাঁপার দিকে ফিরে তাকায়।

চাঁপার মুখ ভূমিকম্পে ভেঙে-পড়া একখণ্ড মাটির তাল। থমথমে। প্রসাদী ওর দিকে তাকাতেই শব্দ করে কেঁদে উঠল।

'এখন কাঁদিস না। এখনো যেতে হবে অনেকটা রাস্তা।' হাতঘড়ি দেখে প্রসাদী। গলার স্বর অভিজ্ঞ, আবেগহীন। 'বডিগুলো পৌঁছে দিয়ে ভাবব ব্যাপারটা।'

'এটা কি হল দিদি।' কথাগুলো চোখের জলে, শ্বাসে ফুলে ফুলে ওঠে।

প্রসাদী বড় করে শ্বাস ফেলে। চাঁপার হাত ধরে। 'উঠে বোস্। আলোটা দেখা। আমিই বরং রিক্শাটা চালাচ্ছি।' প্রসাদী দেরী করে না। এগিয়ে সিটে বসে, প্যাডেলে পা রাখে। 'এই উঠে পড়্।' পিছন ফিরে দেখে চাঁপাকে। তাড়া দেয়।

চাঁপা উঠে বসে। হাতের টর্চ জ্বেলে প্রসাদীর পাস দিয়ে আলো জ্বেলে রাখে রাস্তায়। ও রাজুদার মৃত মুখের দিকে তাকাতে পারছে না। আকাশ তারাদের ফুলে আলোময়। চারপাশের অন্ধকারে চাঁপা কিন্তু মাটি আকাশ লেপে ভারী এক শূন্যকে বুকের গভীরে ঢেকে রাখে মড়াগুলোর থেকে সামান্য দূরত্বে ভ্যানরিক্সার প্রান্তে বসে নিথর, নিশ্চুপ।

আজকের ক্রমশ ঝিরঝিরে বৃষ্টির রাতে দেশি নৌকোয় কোনরকমে লাশগুলো সুতার বেঁধে নদী পার করিয়ে এনেছে ওরা দুজনে। রামগঙ্গায় নেমে একটানা

ভ্যানরিক্সায় চালানো। প্রসাদী ওর এমন শক্ত সমর্থ চেহারায় আজ হাঁপিয়ে উঠেছে বার কয়েক। শরীরটা যেন বই ছিল না। তিনটে ভারী লাশ থাকায় রাত একটার কিছু আগেই বাড়ি থেকে বেরিয়েছে। দুই বোন বার কয়েক হাত বদল করতে করতে এতটা আসছে। বিশ্রাম নেই। দিনের আলোর আগেই মর্গে পৌছতে হবে। দিনের আলো থাকলে রাস্তার কাক-চিলগুলো উৎপাতের মত তাড়া করে, পিছু নেয়। এগুলো কিছু বেওয়ারিশ কিছু অস্বাভাবিক পচা-গলা মড়া। লোকজনের নানা প্রশ্নে তিতি হতে বিরক্ত হয়। তাই গভীর রাতেই এমন আসার ব্যবস্থা। রাতেও টহলদারি পুলিশের জেরার সামনে পড়তে হয়। গভীর রাতে ডাকাতের দল থাকে। তারা রাস্তা বন্ধ করে দেয়। প্রথম প্রথম ওদের সন্দেহ করত। এখন ব্যাপারটা বুঝে সকলেই ওদের সাহায্য করে।

তবু আজও মায়ের ভয় কাটেনি। মায়ের কথা মনে পড়ে যেতে প্রসাদীর চাপা কষ্ট ঠেলে ওঠে বুকের মধ্যে থেকে।

এমন রাতে বেরুবার আগে মা আবার বলে, 'আজ তোরা বেরুস না রে। রাস্তাঘাট ভাল নয়।'

'তা কি করে হয় মা?' প্রসাদীর গলায় নির্ভর ও সমবেদনার নরম অভয়।

'তোরা বেরিয়ে গেলে আমি বাড়িতে এক মুহূর্তও তিষ্ঠতে পারি নি রে। সারা রাত ঘুম হয় নে। ঘরে বার করি। এত বড় বড় মেয়ে তোরা।'

প্রসাদী বোঝায়, 'না গেলে কাল যে খাওয়া জুটবে না মা। আজ থানায় আগে-ভাগে বডি দেখে এসেছি। একটু বেশি পয়সা পাবো।'

'আমার বড় কষ্ট।' মা দু'চোখ ছাপিয়ে কেঁদে ওঠে।

বাবা সুরজ এগিয়ে আসে। মাকে বোঝায়। 'শীতল, এত কেঁদো না। এতদিন তো দেখালে, খারাপ কিছু হলো? তবু দুটো মেয়ে কাজটা করছে বলে খেতে পাচ্ছি। খোকনটা বেঁচে থাকলে দিন চালানোর এত অভাব থাকত না। আমার তো খ্যামতা আর নেই। চোখটা ঠিক আছে। কানে কম শুনি। চব্বিশ বছর তো তবু করেছি কাজটা। সুরজ চুপ করে যায়। একসময় যেন বিড় বিড় করে, 'আমারও তো বড় কষ্ট শীতল।'

বাবা-মাকে দেখে প্রসাদী ওদের সংসারটা ঠিক বুঝে নিয়েছে, সমস্ত সংসারটা ওর শাসনে সাহসে চলে। প্রসাদীর মুখের ওপর কেউ কোন কথা বলতে পারে না। তেরোটা পেটের সংসার প্রসাদীর কর্তৃত্বে ঠিক টিকে আছে।

প্রসাদী নিজের খেয়ালে রিক্সা চালায়। চাঁপার টর্চের কিলবিলে সপিল আলোর রেখায় রাজুর ভাবনা জড়িয়ে ধরে। হাতঘড়ি দেখে। এখন রাত সাড়ে তিন। রাজুই এই ঘড়িটা দিয়েছিল ওকে। দাদার নাকি বন্ধু ছিল রাজু। ওকে বাবাই একদিন ওদের বাড়ি আনে। বাঁশের কড়ি বসানো মাটি তুষ লেপা দেয়াল, ওপরে পুরনো ছাই-রং ধরা খড়ের মোটা ভারী চাল। মেটে দাওয়া। সামনে বেওয়ারিশ জমির এক

উঠোন। এমন বাড়িতেই রাজু ঢুকে কেমন আপন হয়ে যায়। দিন সাতেক আগে খোকন পাথরপ্রতিমা ঘাটে ফসল বইতে গিয়ে মাথায় ভারী বস্তা সমেত পড়ে যায় আচমকা। কলকাতার হাসপাতালে ভর্তি হয়ে ওখানেই মারা যায়। রেগে যায় দুটি মেয়ে, বউ। রাজুর এই সূত্রেই ওদের বাড়ি ঢোকা। কদিনেই একেবারে আপন। বছর পঁচিশ বয়স, প্রসাদীর থেকে বছর তিনেকের বড়। বেশ গুছিয়ে কথা বলে। যেমন স্বাস্থ্য তেমনি লম্বা-চওড়া।

একদিন কি ভেবে রাজুই ওকে এই ঘড়িটা দেয়। 'এটা নাও'। বলার সময় সকলের থেকে সরিয়ে নিয়ে যায় ওকে। গ্রামের ঝোপঝাড়ের নির্জ্জনতায়।

'কি ব্যাপার।' প্রসাদী ছিল গম্ভীর, অস্বস্তিতে আরষ্ট।

'তোমরা দু'বোনে রাত-বিরেতে এমন কাজ করছ।' প্রসাদীর চোখ দেখে, 'দাম বেশি নয়। তবু তোমার কাজ চলে যাবে। টাইমটা তোমাদের হিসাবের মধ্যে রাখা জরুরী। তাই না?'

রাজু কেমন গুছিয়ে কথা বলত।

'তুমি পয়সা পেলে কোত্থেকে?'

'সেসব ভেবে কি লাভ?' প্রসাদীর জিজ্ঞাসাকে উপেক্ষা করে রাজু। প্রসাদী কোন কথা বলেনি আর। ঘড়ি দেওয়ার আগে। লুকিয়ে লুকিয়ে টাকা পয়সায় দিত ওর হাতে। মনটা কত বড় ছিল ওর। সে সব টাকা কবে থেকে যেন প্রসাদীর সংসারের হিসেবে জমার ঘরে পড়ে যেত। কেউ জানত না। প্রসাদীও কাউকে কোনদিন বলেননি। আর কাকেই বা বলবে? যা কিছুই বোঝে না। এক সময়ে প্রাইমারী স্কুলের পড়া শেষ করে চাষী বাবার হাত ধরে মাঠে যেত প্রসাদী। বাবার সেই সব চাষে কী আনন্দ। সংসারেও অভাব থাকত না। বাবা কিন্তু জোতদারের চাপে চাষবাস ছাড়ে, নগদ টাকা আদায়ে হয় মুটে, শেষে ভাঙা শরীর আর বয়সে ঠিকে যোগাড়ে। প্রসাদীকে জিভে চোখে বলে দ্যাখ, সব ছেড়ে-ছুড়ে ঠিকে কাজ আর কদিনই বা করব। বয়স হচ্ছে না?

প্রসাদী বাবার গায়ে হাত বুলোয় 'তুমি যা পার কর। আমি তো লাস বওয়ার কাজটা বুঝি বাবা। তোমাকে তো আর একাজেও বেরুতে হচ্ছে না। এত সব ভাবছে কেন?'

'চাঁপাটার যা কচি বয়স।' থামে কয়েক মুহূর্ত। ক্লাস সিক্স পর্যন্ত পড়ে আর তো এগোল না।'

'তাতে কি। আমি তো আছি।'

বাবা চুপ করে যায়

প্রসাদী চিন্তার ভারে ক্লান্ত বোধ করে। রাজুর এমন মারা যাওয়াটা ওকে কম ধাক্কা দেয় নি। রাজু কোথায় থাকে কি করে প্রসাদী কিছুই জানে না। চাঁপা ওর খবর রাখে। প্রসাদী পিছন ফেরে। ভ্যান রিক্সা এভাবে একটানা চালানো ওর

কাছে বিরক্তিকর মনে হল। 'কি রে, কথা বলছিস না যে?'

চাঁপা হাতের টর্চ এবার নেভায়। যেন চোখের জল লুকোতে চায় দিদির কাছে। 'এখন কথা বলতে ভাল লাগছে না রে দিদি।'

'একটু চা খেয়ে নিবি?'

'নাহ, থাক্।' চাঁপা একেবারে চুপ। যেন কঠিন অন্ধকারে ও ডুবে যায়।

প্রসাদী রিকসার গতি কমায়। হাত বদল করার ইচ্ছে হলেও চাঁপাকে আর খাটাতে চাইল না। রাজুর সঙ্গে শেষ কবে যেন দেখা হয়েছিল। কবে। এই তো দিন পনেরো আগে। তার আগের দিনই তো চাঁপাকে নিয়ে নদীর ধারে গিয়েছিল। পরের দিন সন্ধেয় এসে বলে, 'তোমার সঙ্গে কিছু কথা আছে।' প্রতিবেশীর এক খড়ের গাদার আড়ালে নিয়ে আসে প্রসাদীকে। গলা নামিয়ে কথাটা বলে। কেমন সমীহ্ করে কথাগুলো বলছিল। কি কারণে ছিল এমন ভয়, সতর্কতা।

প্রসাদীর কাছে রাজুর সেদিনের কথাগুলোর স্বর আর শব্দ কেমন বেমানান শোনায়। কিছু সময় ওর চোখে চোখ রেখে রাজুর ভিতরের কিছু একটা বোঝার চেষ্টা করে। রাজু ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে কি যেন খুঁজছিল। কী? 'নাহ্, পরে বলব।'

'কি এমন কথা যে পরে বলতে হবে?' আর রাজুর চোখে কি কোন লোভ ছিল? কোন গোপন দাবি? কোন বিনিময় ভাবনা?

'পরেই বলব। তবে তোমার কথা নয়, আমার কথা' একটু থেমে গলা নামায়, 'উত্তর দেওয়ার ব্যাপারটা তোমারই।'

হেমন্তের ঠাণ্ডা কেমন মনে নেই, প্রসাদীর সারা শরীর বেয়ে সেই সন্ধেয় এক ঠান্ডার শিহরণ স্রোত তৈরি করেছিল।

কেমন হেঁয়ালি ছিল সে কথায়। প্রসাদী আজ গম্ভীর'। এক সংসার কর্ত্রীর তৈরি মুখোশে কঠিন স্বভাবে নিজেকে ধরে রেখছিল। তবু কেমন এক উৎসুক ভাব আর কৌতূহল দানা বাঁধছিল ওর মধ্যে। ও আর বলেনি। তবু প্রসাদী কেমন নিজের মধ্যেই অবাক হওয়ার মত বদলে যাচ্ছিল। ওর দেওয়া টাকাটায় কি ছিল লোভ, প্রয়োজন? দেয়া-নেয়ার মধ্যে রাজু কি এমন কিছু স্বার্থপরতার গন্ধ পেয়েছিল? নাকি রাজু মহাজনের জমানো টাকার মাপে ঋণ শোধের দাবিতে কোন সুদ ভিক্ষে......'। না.....না।' হঠাৎ ভ্যান রিক্শায় কোথাও জোর ধাক্কা পেয়ে রাস্তা থেকে পাশের ছোট খাদের দিকে চলে যাচ্ছিল। ভারী বডিগুলোই ওকে বাঁচিয়ে দিল। চাকা দুটো ভিজে মাটিতে আটকে গেল বডিগুলোর অস্বাভাবিক ভারের ধাক্কায়।

সেদিনের সেই রাজু নয়, রাজুর দুদিনের বাশি মরা আজ ওর ভ্যানের যাত্রী, ফেলে দেওয়ার বোঝা। রাজু ওর শেষ কথাটা তো এবারেই দেখা করে বলবে বলেছিল? কেমন যেন এক গভীর শূন্যতা ওকে ঘিরে ধরে। পিছনে তাকায়। চাঁপা কি তন্দ্রার মধ্যে থেকে এমন টর্চটা জ্বেলে হাতে ধরে আছে? এত চুপচাপ কেন?

'এই চাঁপা।'

'উঁ'।

'চোখে ঘুম আসছে বুঝি?'

'না। আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছেরে দিদি। আমার আর কিছু ভালো লাগছে না।'

'আমারও তো।' প্রসাদীর ভিতরের এক অসহায় শূন্যতা থেকে শব্দ দুটো বেরিয়ে আসে।' 'বডিগুলো জমা দিয়ে আসি, তারপর না হয় ভাবব।' গাড়ি আস্তে চালাতে থাকে। 'রাস্তাটা আবার খারাপ পড়েছে। একটু নজর দে। না হলে রিক্সাটা অ্যাকসিডেন্ট করতে পারে।'

'ঠিক আছে,' চাঁপা সোজা হয়ে বসে। এতক্ষণ শুধু অন্ধকারে রাজুদার মুখটা ভাবছিল।

মনে পড়ছিল রাজুদার বেশ গুছিয়ে বলা কথাগুলো। একরাতে বাবাকে এই বুড়ো বয়সেও ভ্যান রিক্সা চালাতে হয়েছিল। এমনিতে ওরা দুজনই কাজটা করে। দুজনের কেউ অসুস্থ হলে, কাজে বেরুতে একেবারে অপারগ হলে বাবা বেরোয়। সেদিন দিদি প্রসাদীর ছিল ভীষণ জ্বর। বাবার সঙ্গে চাঁপাকে থাকতে হয়েছিল। চাঁপা ধরেছিল টর্চ, বাবা ভ্যান গাড়িটা চালিয়েছিল। থানা থেকে চারটে পচা-গলা মড়া চাপিয়ে কিছুটা পথ ওরা এসেছে। সুতার বাঁধ নদীর ঘাটের কাছাকাছি। রাত একটা পার হয়ে গেছে। আচমকা রাজুদা এসে হাজির। চাঁপা আঁতকে ওঠে।

'একি। তুমি।'

'ঠিকই আমি। এলাম।' রাজুর মুখ-চোখ সহজ সরল।

'কে রে চাঁপা।' সুরজ প্যাডেলে পা বাড়ায় না। ভারী ভ্যানটা চলে ধীর গতিতে। চাকার শব্দ।

'রাজুদা বাবা।' রাজুদার দেওয়া সুদৃশ্য কাঁচের চুড়িগুলো চাঁপা আলগা করে নেয়, 'আমাদের রাজু।' পিছনে ফিরে তাকায় সুরজ। কোথায় যাবে?

'রামগঙ্গায়'। গলা নামায় রাজু।' কাজ শেষ করে ফিরতে রাত হয়ে গেল। ফেরার পথে আপনাদের সঙ্গে পেয়ে গেলাম। আপনারা নদী পেরিয়ে গেলে আমিও বাড়ির পথ ধরব। অনেকটা হাঁটা।'

সুরজ খুশি। বেশ তো বাবা, চলো। আজ প্রসাদীটার খুব শরীর খারাপ, তাই আমি বেরিয়েছি। তুমি যদি কিছু সময় থাকো, ভালই।'

চাঁপার আগেও কেমন মনে হয়েছিল, রাজুদা বাবাকে মিথ্যে বলেছিল, আসলে দিদি নেই, আমি আছি বলেই ও এসেছিল। কিন্তু তখনি চাঁপার মনে ধাঁধা এসেছিল, রাজুদা এত রাত পর্যন্ত কোথায় কি করে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে। আজও ও চাঁপাকে, ওর দিদি-বাবা-মাকে কিছু বলেনি। বাইরের লোক ভ্যান-রিক্সার সঙ্গে যাবে কেন? থানাতেও তো আপত্তি করতে পারে। ওরা কেউ সেদিনের রাজুদার সঙ্গে যাওয়ার ব্যাপারটা জানায় নি।

চাঁপা গলা নামিয়ে হঠাৎ বলে, 'তুমি মিথ্যে বলছ কেন?' ভ্যান রিক্সাটা ভারী বোঝার জন্যে চাকার শব্দ তুলে এগোয়। সুরজও আজকাল কানে আরও কম শোনে। চাঁপার কথা কানে যায়নি।

'কি মিথ্যে?'

'এখানে কোথায় থাক এত রাত পর্যন্ত? ফিরতে এত রাত।' চাঁপার স্বরে বিস্ময় প্রতিবাদের সঙ্গে জড়ানো থাকে। পূর্ণ চাঁদের মায়া অন্ধকার ভাষায়।

'তোমার জন্যেই তো বললাম।'

'আমার জন্যে।'

'তুমি আছ বলেই তো এসেছি। দিদি তো নেই আজ। কিছুটা সময় তোমাকে একা পাবো।' চাঁপার আলো-অন্ধকার মোড়া মুখ-চোখে দৃষ্টি স্থির রাখে রাজু। দিদিকে ভয় পাই বলেই তো এমন আসা হয় না।'

চাঁপা হঠাৎ চুপ করে গিয়েছিল। মাটির ওপরকার অন্ধকারে চাঁদের আলো মিশে থেকে রাজুদাকে অদ্ভুত দেখাচ্ছিল।

কিছু সময় নীরব থেকে রাজু ভ্যান-রিক্শার কোণটা মুঠোয় ধরে হেঁটে চলে। 'আমার খুব খারাপ লাগে চাঁপা। তোমার মত এতটা পথ কেন যাবে? এ কাজ তোমার নয়।' রাজু থেমে যায়। 'থানা থেকে নদী পেরিয়ে সেই মর্গ কতটা বল তো?'

'কিছু করার নেই রাজুদা। বাবাকে তো দেখছ। এই বয়সে বাবা একা—'

রাজু কিছুটা সময় নেয়। প্রায় চাঁপার মুখের কাছে মুখ এনে বলে, 'আমি কিন্তু তোমাকে এ কাজ করতেই দিতাম না।'

'তুমি।' হঠাৎ থেমে যায় চাঁপা। একভাবে চাঁদের নরম আলোয় রাজুদার চোখে চোখ রাখে। চাঁপার মুখে আর কোন কথা নেই। সেই মুহূর্ত থেকে রাজুদাকে কেন যেন কত নতুন, কত আপন মনে হয়েছিল। চাপা বিস্ময় সারা বুক জুড়ে।

প্রসাদী পিছনে আর তাকায় না। নিজের খেয়ালে যেন ভ্যান-রিক্শা টেনে নিয়ে যায়। চাঁপা ওর দিকে তাকায়। দিদি ভীষণ রাশভারী। যদিও বন্ধুর মত, তুই-তুকারির সম্পর্ক, তবু চাঁপা সব কথা দিদিকে বলতে পারে না। রাজুদার এত সব কথা ও জানেই না। চাঁপা অন্ধকারে রাজুর বুজনো চোখ আর রক্তহীন সাদা মুখটাকে দেখতে চেষ্টা করে। বুকের ভিতরের কষ্টে চাঁপা অস্থির হয়। নতুন করে কান্না ঠেলে ওঠে।

আর একদিনও রাতের এমন কাজের মধ্যে রাজুদাকে দেখে রাস্তায়। তাও আচমকা। দিদি সেদিনও বেরোয়নি। বাবার সঙ্গে চাঁপা। রাত এমনি অন্ধকার। রাস্তায় একটা শক্ত-সমর্থ লম্বা চওড়া চেহারার লোক ওদের গাড়ি আটকায়। বয়স বেশি নয়। রাজুদার বয়সী বা কিছু বেশি বয়সের হতে পারে।

'কি আছে সঙ্গে?'

বাবা বলল, 'থানার লাশ'।

'যাবে কোথায়?'

'ডায়মন্ড হারবার মর্গে।'

লোকটা ভ্যানের পিছনে দিকে চলে আসে। টর্চ জ্বেলে খুঁটিয়ে দেখে। দুর্গন্ধে নাক চাপা দেয়। বাবা বলল, 'তুমি কি নতুন এসেছ বাবা। আমি তো এসব নিয়ে প্রায়ই যাই। সবাই আমাকে চেনে। পুলিশরাও জানে।'

লোকটা বাবার সামনে চলে আসে। 'পুলিশ!' যেন শাসন আর সন্দেহে বলে ওঠে।

'হ্যাঁ বাবা। যারা টহল দেয় রাতে, তাদের কেউ কেউ।'

লোকটা একভাবে বাবাকে দেখতে থাকে। 'এদিকে এখন কোন পুলিশ নেই। আপনাকে বিশ্বাসই বা করব কি করে?

বাবা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। নিশ্চুপ। আর একটা গোপন ভয় মাথা চাড়া দেয়। একবার চাঁপাকে দেখে নেয়। বোঝে, লোকটা চাঁপার দিকে তাকাচ্ছেই না।

হঠাৎ লোকটা বাবার কাছে চলে আসে। 'শুনুন, ছেড়ে দেব একটু পরে। কিন্তু আমার কথা কাউকে যেন বলবেন না। বললে আপনি কোনদিন আর যেতে পারবেন না।'

আচমকা দূরের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসে রাজুদা।

'আরে! মেশোমশাই! চাঁপাও আছ!' থমকে দাঁড়ায় রাজুদা।

'তুমি এঁদের চেনো রাজু?' লোকটা রাজুর চোখে চোখে রাখে।

রাজু হাসে। 'আপনি যান। আমি এদের বুঝিয়ে দিচ্ছি'।

রাজুর মুখে নরম হাসি দেখে লোকটা রাস্তা থেকে সরে দূরের অন্ধকার আড়াল হয়ে গেল।

'কি ব্যাপারে বলতো রাজু?' বাবা জিজ্ঞেস করে, 'তুমি এখনি ফিরছ বুঝি?'

'হ্যাঁ।' রাজুদা থামে।' আপনি একটু অপেক্ষা করুন। ওরা ছেড়ে দেবে।'

'ধরছে কেন?'

'আগেই একটু ওদের কাজ আছে। তাই ছেড়ে দেওয়া অসুবিধে।'

'তুমি একে চেনো?'

'চিনি। ভয় নেই।' একটু থেমে বলে, 'বেশ তো, আমি ওই দূরের অন্ধকারে আছি, ওরা আপনাদের ছেড়ে দিলে আমি আপনাদের সঙ্গে যাব। যেন সাহস দেয়। কথার মধ্যে রাজুদা একবারও চাঁপার দিকে তাকায় না। মুখটা অন্য দিকে ঘোরানো। ভঙ্গি আরষ্ট, নির্বিকার।

সেই সেদিন দেখা হওয়ার পর রাজুদা প্রায় একমাস আপনি ওদের বাড়ি যায় নি। আবার হঠাৎ একদিন দেখা করে।

রাজুদা এসেই বলে, 'আজ কি তোমাদের মর্গে যাওয়ার কাজ আছে?'

চাঁপা বলে, 'না, কদিন হল থানায় কোন বডি আসছে না।'

সন্ধে উত্তীর্ণ। সন্ধে থেকেই আকাশের গোল চাঁদ আকাশ-ছাওয়া তারাদের আলোর সমুদ্রে বিশাল সোনালি নৌকোর মত স্থির ভাসমান। এ বর্ননা চাঁপার নিজের মনের নয়, তবে সেই দেখার চোখ চাঁপার মধ্য যে অনুভব আর অভিজ্ঞতা আনে, তা ওর নিজস্ব।

'আজ আমার সঙ্গে একটু চল চাঁপা।'

'কোথায়?'

'এই নদীর ধার পর্যন্ত। তোমার সঙ্গে একটু কথা বলে চলে যাব।'

চাঁপা একটু যেন ভয় পায়। 'দিদিকে তো জানাতে হবে।'

ওরা কথা বলছিল বাইরে। 'যাও, মত নিয়ে এসো। বলবে, আমি আজ নয়, কাল সন্ধেয় আসব দিদির কাছে। দরকার আছে।'

ওরা চলে আসে নদীর ধারে।

পাড়ের নরম ঘাসে বসেই চাঁপা জিগ্যেস করে, 'রাজুদা, সেদিন অত রাতে রাস্তায় ছিলে কেন?'

'বাঃ, বাড়ি ফিরব না?'

'ওই লোকটাকে তুমি চিনতে?'

'চিনব না কেন, আমার কাজ তো ওদের সঙ্গেই।' হঠাৎ কথা ঘোরায় রাজুদা, 'আর ওদের সঙ্গে কাজ করব না চাঁপা।'

'কেন?'

রাজু কি ভাবে। 'দলে ছ'জন আছি। লাভের অংশ আমাকে অনেক কম দেয়।' অন্যমনস্ক রাজু কিছু ভাবে। 'বিচ্ছিরি ঝগড়াঝাঁটি। দলও ছাড়তে দেবে না। কি যে করি।'

'না, ছেড়ে দাও।'

'ছাড়বই ভেবেছি।' অন্যমনস্ক হয়। বলে, 'সহজে ছাড়া যাবে না।'

'কেন।'

রাজু সতর্ক হয়। 'ছাড়লে আর কাজ পাবো কোথায়?'

চাঁপা বিষণ্ণ রাজুদাকে দেখে।

হঠাৎ রাজু বলে, 'ওসব কথা বাদ দাও তো। যা বলতে এসেছি, সেটাই বলা হচ্ছে না।'

'কি কথা?' চাঁপা আবার ভয় পায়।

রাজু নিরুত্তর। বেশ কয়েক মুহূর্ত কেটে যায়।

'কি, কিছু বলছ না যে।' চাঁপা ডান হাত বাড়িয়ে রাজুকে মৃদু ধাক্কা দেয়।

রাজু সোজা চাঁপার দিকে, 'চাঁপা, আমি যে তোমাকে ভালবাসি বুঝতে পারো না?'

চাঁপা মাথা নিচু করে বসে থাকে। কোন উত্তরই ও ভাবতে পারছে না।

রাজু এগিয়ে আসে ওর দিকে। চাঁপার হাত হাতে নেয়।

'কিছু বলো।' রাজু স্বরে জোর দেয়। 'আমরা তো সংসার করতে পারি।'

চাঁপা একভাবে বসে থাকে।

'এবার ভাল একটা কাজ পেলে আর অসুবিধে কোথায়?'

চাঁপা মুখ তুলে তাকায় রাজুর দিকে। 'দিদিকে ভয় পাই রাজুদা। জানতে পারলে—'

'থাক।' থামিয়ে দেয় রাজু। 'তোমার অসুবিধে নেই তো? দিদির মত আমি নিচ্ছি।'

'কি বলবে দিদিকে? দিদি ভীষণ রাগী। এসব একদম পছন্দ করে না।' চাঁপা রাজুর হাতের মুঠো জোরে চেপে ধরে।

'সে ভার আমার।' সুন্দর করে তাকায় চাঁপার দিকে। 'কাল তো দিদির কাছে আসবো, ঠিক ঘুরিয়ে আসল কথাটা বুঝিয়ে দেব।' চাঁপার হাত ভিজে যায়।

'এত কাঁপছ কেন?'

চাঁপা রাজুর চোখ থেকে চোখ সরাতে পারছে না।

ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। নদীর অজস্র ঢেউয়ের সঙ্গে বুঝি আকাশের তারাদের গুণে যাওয়া। ঠাণ্ডা জ্যোৎস্না গাছের অন্ধকার-ঢাকা পাতাগুলোর ওপর রূপোলি ঝর্ণার মত চুইয়ে পড়ছে। এত চন্দন-স্পর্শের আলোয়, ওরা দুজন কিসে যেন বোবা।

রাজু হঠাৎ চাঁপাকে কাছে টানে। দুপাশের চিবুকে দু'হাতের চাপ নিয়ে প্রবল চুমু খায়। শ্বাসহীন, শব্দহীন। চাঁপাও বেশ কিছু মুহূর্ত বিবশ, স্থির। নিঃশ্বাস বন্ধ। একসময় চোখ খোলে। চোখের সামনে রাজু নয়, তারার নক্সা-কাটা এক আলোর শামিয়ানা চাঁপাকে ঢেকে দিয়ে কতদূর যেন ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে চলেছে। চাঁপা বুঝি আলোয় ভাসে।

চাঁপার হাতের টর্চ গেছে নিভে। এখন সে সবের কোন খেয়ালই নেই।

প্রসাদী এতদিনের অন্ধকারে গাড়ি চালানোর অভ্যাসই প্যাডেল করে চলেছে। রাস্তা এখানে অনেকটাই সমতল।

'চাঁপা বুঝি বসে বসে ঘুমে ঢুলছিস।' প্রসাদী বলে, পিছনে তাকায় না।

সতর্ক হয় চাঁপা দিদির কথায়। আকাশের এত আলো চাঁপাকে কোন ঘোরে যেন টানছিল। টর্চের আলোটা জ্বালল।

'আর বেশি দেরী নেই চাঁপা।' প্রসাদীর স্বরে বুঝি সান্ত্বনা।

চাঁপা নিজেকে ক্লান্ত বিধ্বস্ত মনে করে। রাজুদার মরা শবটার দিকে তাকায় না। তাকাতে পারছে না। রাজুদার তো এই সপ্তাহের শেষ দিকেই ওর সঙ্গে দেখা করার কথা। তা হলে? চাঁপার টাক্‌রা চোখের অবরুদ্ধ জলে যন্ত্রণায় জ্বলে ওঠে।

ভ্যান রিক্‌শা আজ অন্ধকার থাকতেই মর্গের সামনে চলে আসে, চাঁপা ভেতরে আসতে চাইছিল না। মড়াগুলো ভ্যান থেকে খালি হয়ে গেলে চাঁপা তার সামনেই মাটির ওপব বসে থাকে। দু'চোখের গোড়ায় সারারাতের ঘুম-না-হওয়ার আর আকুল কান্নার কালি।

থানার কাগজপত্তর দেখিয়ে মড়া জমা দিয়ে প্রসাদী বেরিয়ে আসে। এবার ফেরার পালা। থানায় দেওয়া মোট টাকার হিসেব মাথায় ঘোরে ওর। নদী পেরোতে নৌকোভাড়া, ভ্যানের মালিকের টাকা আলাদা দিয়ে দিয়েছে। লাশ জমা দিতে বেশ কিছু গেল মর্গের লোকদের হাতে। নিজেদের কিছু খাওয়া-দাওয়ার যে খরচ, তা আজ কমই হয়েছে। আজ বডি আছে তিনটি। অন্যদিনের থেকে কিছু বেশি টাকা হাতে থাকছে।

ভাবতে ভাবতে ভ্যানের সামনে আসে প্রসাদী। ভোরের আলোয় এখনো পুরো অন্ধকার মুছে যায় নি।

প্রসাদী বলল, 'চাঁপা, এবার ফিরি চল্। এখন না, বরং বেশ কিছুটা গিয়ে চা-টা খেয়ে নিবি।' ভ্যান রিক্‌শার সামনে সিটের গা ঘেঁষে দাঁড়াল।

চাঁপা ভ্যানেই আগে থেকে বসে আছে। প্রসাদীর কথায় কোন জবাব দিচ্ছে না।

'আজকের দিনটা রেস্ট পাবো।' প্রসাদী থামে, 'কাল রাতে আবার বডি মিলবে। তাই তো বলছিল না থানায়?' প্রসাদী ওকে কথাগুলো মনে করায়।

চাঁপা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। 'এত অন্ধকার আমার একটুও ভাল লাগে না রে দিদি।' হাঁটু মুড়ে বসা সবল স্বাস্থ্যের পিঠ কান্নায় দমকে কেঁপে কেঁপে যায়। 'আমরা কতদিন রাতের আলো দেখিনি। কতদিন। অন্ধকার ভীষণ ভয় দেখায় দিদি, ভীষণ। আমি আর পারছি না। একটু না।' যেন কান্নার প্রবল জলে-ঝড়ে চাঁপার প্রতিবাদ উথাল-পাথাল হয়।

প্রসাদী হাতের টাকাগুলো গুনছিল। থেমে চাঁপার দিকে তাকিয়ে থাকল নির্নিমেষ। আবার বুঝি রাজুর কথা ভাবছিস।' স্বর কিছুটা স্বগতে উক্তির মত। মুখে এক বিষাদের হাসি লেগে থাকে।

ওর চোখে জল আছে, না একেবারে শুকনো— প্রসাদী কিছু বুঝতে পারছে না এই মুহূর্তে।

হাতের নোটগুলো অন্যদিনের হিসেব থেকে কয়েকটা বেশি। এর পর। রাজু তো আর কোনদিন আসবে না।

নোটগুলো বারবার গুণে যায়।

বিপিনের বান্ধবী

অমর মিত্র

দশ তারিখে গোপালপুর-অন-সীতে রওনা হয়েছিল রেবা আর অভয়। এগারয় পৌঁছনর কথা। সতেরর বিকেলে রওনা হলে আঠেরোর ভোরে ফিরে আসার কথা। আজ বাইশ। শুক্রবার। আজ ও কি আসবে না রেবা বিপিনের অফিসে? বিপিন অপেক্ষা করে আছে রেবার জন্য। এই সপ্তাহটা তার গেল দরজায় চোখ রেখে। স্প্রিং ডোর ঠেলে কেউ ঢুকলে মুখ তুলছে রেবাকে দেখবে বলে। ঘর থেকে বেরিয়ে অন্য ফ্লোরে গেলে, বা বসের চেম্বারে গেলে বিপিন বলে যাচ্ছে তার পিয়নকে, কেউ এলে যেন বসতে বলে। ফিরে এসে জিজ্ঞেস করছে, কেউ এসেছিল নাকি?

আজ না এলে আবার দু'দিন বন্ধ। তারপর সোমবার কি আসবে রেবা? সপ্তাহের প্রথম দিন তো। কাজ থাকে বেশি। আজ শেষ দিন। ঘনমেঘে ছেয়ে আছে দশদিক। শ্রাবণে ঘোর হয়ে আছে সমস্ত শহর। এমন বর্ষায় আসবে কী করে রেবা? মুখখানি অন্ধকার করে বিপিন তার ঘরের পার্টিশান ওয়ালে আঁটা মস্ত নিসর্গ চিত্রের দিকে তাকিয়ে থাকে। ও ছবি সমুদ্রের। নারকেলকুঞ্জ ঘন সবুজ, তার মাথায় ঘন মেঘ, সমুদ্রটি ঘোর কালো। মেঘ আর সমুদ্র একাকার। সমুদ্রে যখন ঢেউ ওঠে, তখন সে দৈত্য। ভয় করে খুব। সেই মেঘ দেখতেই রেবা আর অভয় গেছে গোপালপুর। সমুদ্রে মেঘের কথা রেবা শুনেছিল বিপিনের কাছে। তারপর থেকেই অপেক্ষা করছিল ঘন বর্ষার জন্য। পেয়েছেও তা। সেই দশ-এগার তারিখ থেকে বৃষ্টির আর বিরাম নেই। শহর রোদের মুখই দ্যাখেনি প্রায়। বিপিন খবরের কাগজ খুঁজে খুঁজে ওড়িশার আবহাওয়ার খবর নিয়েছে। সেখানেও ঘোর বর্ষা নেমেছে।

রেবার অফিস খুব কাছে নয়। এই কলকাতার প্রায় মিশে যাওয়া জেলা সদর থেকে প্রায় তিরিশ কিলোমিটার দক্ষিণ পশ্চিমে, হুগলী নদীর তীর ঘেঁষা এক শিল্পাঞ্চলে। রাস্তা খুব খারাপ। ভাঙাচোরা, তার উপর শিল্পাঞ্চল, তেলডিপো বলে বড় বড় ট্যাঙ্কার সমসময় রাস্তা কাঁপিয়ে চলেছে। ওই রাস্তায় অটোতে চেপে রেবা রেল স্টেশনে আসবে। ওইটুকু রাস্তা কী ভয়ানক। বিপিন আর রেবা দেখেছিল একটা বড় ট্যাঙ্কার হাতির মতো পায়ের চাপে যেন পিষে দিয়েছিল অটো রিকশাকে। তার ভিতরে একটি পরিবার ছিল, স্বামী স্ত্রী ও একটি শিশু। ট্রেনে এলে একটু তাড়াতাড়ি এই সদর অফিসে আসা যায়। ভাঙাচোরা রাস্তার বাসে আসতে হলে দেড় ঘণ্টার উপর যায়। তার উপর যদি রাস্তায় কোনো ট্যাঙ্কার বসে যায় তো কখন কে কোথায় পৌঁছবে তার কোনো হিসেব থাকে না। বর্ষায় তো এমন হয়

প্রায়ই। রাস্তার ধারের নরমমাটিতে হেভি ট্যাঙ্কার-লরির চাকা বসে তেরচা হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। রেবা কী করে আসবে এমন সময়ে? বিপিনের যদি ক্ষমতা থাকত কলকাতায় বদলি করে আনত রেবাকে। কিন্তু রেবার তো মাত্র তিনবছরের চাকরি, মফস্বলে কাটাতে হবে আরো ক'টা বছর। আর এই মাস্বল তো তার কাছে দূরের নয়। রেবার শ্বশুর বাড়ি, বাপের বাড়ি অফিস থেকে এক ঘণ্টাব পথ। বরং সদর অফিস আরো দূরের হবে। দূরের না হোক ঝক্কির তো বটেই। মফস্বলে থাকার স্বাধীনতা অনেক।

রেবা হলো বিপিনের নবীন বান্ধবী। রেবার এখন সবে পঁচিশ। বিপিনের সাতচল্লিশ। রেবার যখন বাইশ ছিল, বিপিন ছিল তার দ্বিগুণ বয়সের। বাইশেই রেবা চাকরিতে আসে। বিপিন ছিল তার প্রথম বস। ঠিক তাও নয়, প্রায় বসেরই মতো। রেবাকে অফিস বুঝিয়ে বিপিন চলে এসেছে সদরে যখন, রেবার তেইশ পার হয়েছে সবে। বিপিন তখন পঁয়তাল্লিশ। আরো দুই বছরে রেবা আরো বন্ধু হয়ে উঠেছে তার। রেবা সদরে এলে তার কাছে আসেই। রেবা এলে তার মন ভাল হয়ে যায়। রেবা যদি না আসে বিপিনের মনে মেঘ জমে। কী সুন্দর বিপিনের এই বান্ধবী। তার সহকর্মীরা তো সবাই তারই বয়সী, কেউ কেউ দু-চার বছরের সিনিয়রও, পঞ্চাশ ছুঁয়ে গেছে বা পার হয়েছে সদ্য। সবাই কেমন অবাক চোখে তাকায় যখন বিপিনের সঙ্গেই শুধু কথা বলতে আসে রেবা। রেবার সঙ্গে বিপিন নেমে আসে লিফট ধরে। যেদিন আসে রেবা তাকে বাসে তুলে দিয়ে তবে না বিপিন নিজে ফেরার উদ্যোগ নেয়।

একদিন বিপিনের সহকর্মী সুবল সরকার জিজ্ঞেস করেছে, ওর নামতো রেবা?

হ্যাঁ।

তোমার সঙ্গে খুব ভাব।

আমার কাছেই ও প্রথম জয়েন করেছিল।

সে তো কারোর না কারোর কাছে কেউ জয়েন করেই, তা বলে এত ভাব।

বিপিন তখন হাসে। দ্যাখে সুবলের চোখে ঈর্ষার ভাব ফুটে উঠেছে। বিপিন সেই ঈর্ষাকে উসকে দিতে বলে, আমি যখন বদলি হয়ে আসি, ও কেঁদে ফেলেছিল ঝরঝর করে, খুব নরম মন তো।

ও তো ম্যারেড।

তো কী হয়েছে, এই যে এবার ক্রিকেট টেস্টের পাঁচদিনের টিকিট সমেত অভয়কে পাঠিয়ে দিয়েছিল ও, অভয় ওর হাজব্যাণ্ড।

আশ্চর্য।

আমি কিন্তু রেবাকে বলিই নি টিকিটের কথা, কিন্তু ও জানত আমি ক্রিকেট খুব ভালবাসি, জন্মদিনে গোলাপ নিয়ে হাজির।

বাহ্। সুবল সরকার বলে, মেয়েরা অদ্ভুত হয়।

রেবা এলে সুবল ঢোকে না। দরজা থেকে ফিরে যায়, আবার এক একদিন এসেও পড়ে। বিপিন দেখেছে সুবলের চোখে পিপাসা ফুটে ওঠে তখন। রেবা তো সুন্দরী কথা বলে যেন সর্ব অঙ্গ দিয়ে। কী চমৎকার শঙ্খবলয়, তারপর সোনার তার, গালা আর নোয়ায় বাঁধানো মোটা চুড়ি, একটি শুধু সোনার সরু চুড়ি সমেত ফর্সা মোমের মতো হাত মেলে দেয় এই মস্ত টেবিলের কাচের উপর। রেবা যেন জানে বিপিন তার হাত দেখতে ভালবাসে। লম্বা লম্বা আঙুল, নখে খুব আবছা গোলাপী রঙ লাগানো। কোথাও এক বিন্দু ময়লা নেই। বিপিন জানে রেবা তার পায়েও আলতা পরে। দেখেছে বিপিন তাও। রেবার মুখখানিই বা কত সুন্দর! বিপিনের মনে হয় তাকিয়েই থাকে। যুগল ভ্রূর মধ্যিখানে লাল সোয়েডের টিপ যেন ডবমগ করে, সরু সির্দুরের রেখা সিঁথিতে। ঠোঁটে হাল্কা গোলাপী রঙ, চোখ দুটি একটু ছোট ছোট, কিন্তু যখন মেলে দেয় যেন জলে ধোয়া আকাশ— কী চকচকে। গ্রীবা বাঁকিয়ে যখন কথা বলে রেবা মনে হয় যেন বনের হরিণী। কথাটা আচমকা একদিন বলে ফেলেছিল বিপিন, তাতে কেমন অদ্ভুত চোখে তাকিয়েছিল সে। অবাক চোখে বিপিনকে দেখেছিল। বিপিন প্রসঙ্গ বদলে দিয়েছিল নিজের সঙ্কোচেই।

সুবল বলে, মেয়েটা খুব সুন্দরী।

হুঁ। বিপিন কথা বাড়াতে চায় না।

সুবল বলে, খুব সিম্পল মনে হয়, খুব সাজতে ভালবাসে তাই না?

হ্যাঁ, সব মেয়েই তো। বিপিন বলে, আমার বউ থার্টি নাইন, সাজের ঘটা দেখলে অবাক হয়ে যাবে।

সুবল বলে, এক একজন এমন হয়, হলে কী হয়েছে, মানুষ নিজেকে সাজাবে না কেন, তা তোমারও তো সাজ বেড়েছে। বলে সুবল সরকার হাসে।

বিপিন সতর্ক হয়। রেবাকে নিয়ে কথা বাড়াতে চায় না সে। রেবা তো তারই বান্ধবী। তারকাছেই প্রথম চাকরি করতে এসেছিল বলে তার উপরে রেবার মায়া আছে যেন। কী সুন্দর বলে এখনো, কী ভয় পেয়েছিলাম স্যার, আপনি ভাল করে কথাও বললেন না, মাথা পর্যন্তও তুললেন না, বললেন জয়েনিং রিপোর্ট দিন।

বিপিন হাসে, কী বলব তা হলে?

বাহ্‌রে, নতুন একজন এল কত ছোট আমি বয়সে, বসতেও বললেন না।

বিপিন বলে, তখন কি জানতাম তুমি এত ভাল, আর এত ছোটও, ইস তুমি তো দুধের শিশু।

তাহলে বসতে বলবেন না?

আমিতো দেখিইনি তোমাকে।

হ্যাঁ, আপনি ফাইলে মুখ নামিয়ে বসে আছেন, ঘরে আর কেউ নেই, একটা ঘড়ি শুধু টিকটিক করে চলছিল দেওয়ালে, তা ছাড়া শব্দ নেই, তার আগে আপনি একটা সিগারেট শেষ করেছেন, ঘরে তার গন্ধ ভরে আছে, ভীষণ পুরুষ, পুরুষ।

কথাটা বলে রেবা বোধ হয় টের পেয়েছিল যে কথাটাও পুরুষ পুরুষ হয়ে গেছে যেন। সে মুখ ঘুরিয়ে যে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়েছিল। বিপিনের কাছে এখন ভেসে আসছে ওই সব সময়। যেন মেঘে ভর করেই চলে আসছে তার এই ন'তলার অফিস চেম্বারে। রেবা আসবে, অথচ আসছেনা। কী দুঃসহ এই দিন।

আকাশ মেঘ কুণ্ডলী পাকিয়ে নেমে আসছে নীচে। জলময় হয়ে আছে এই শহর। কাল সমস্ত রাত্তির ধরে ঝিরিঝিরি বৃষ্টি হয়েছে। অনেক রাত্তির পর্যন্ত টেলিভিশানে উত্তম সুচিত্রার সিনেমা দেখেছে বিপিনের বউ অদিতি। বিপিনের মন খারাপ। বালিশে মুখ গুঁজে পড়েছিল। আধোঘুমের ঘোরে গান শুনেছে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের। কতবার দেখা সিনেমা, তবু অদিতি ছাড়ে না, বলে দেখতে দেখতে নাকি হারিয়ে যাওয়া বয়স ফিরে পাওয়া যায়। হয়ত। বিপিনের ঘুমের ভিতরে কালরাতে তো গান ছিলই— আজ ঝরঝর মুখর বাদল দিনে— সমস্ত রাত বাদলের গান যেন প্রজাপতির মতো ডানা মেলে ঘুরছিল বিপিনের ঘুমে। কত রঙ সেই ডানায়। বিপিনের মনে পড়ে যাচ্ছিল অন্য আর এক নারীর কথা। সে এখন এদেশেই নেই। কী সুন্দর গানের গলা ছিল ছায়ার— মধুগন্ধে ভরা...। ছায়া থেকে রেবায় ফিরছিল বিপিন— মেঘের পরে মেঘ জমেছে আঁধার করে আসে— বিপুল আঁধার উঠে আসছিল জলতল থেকে। মেঘ আর সমুদ্র একাকার। জল ফুঁসছিল। মেঘও। জলে মেঘে দশদিগন্ত যেন ভেসে গেল প্রায়। আকাশ ভেঙে পড়ছিল আকাশেই। অমন মেঘ দেখতেই গেছে রেবা আর অভয়। বিপিন বৃষ্টির শব্দ শুনেছিল সমস্ত রাত। বিপিনের বউ কখন যে চোখের জল ফেলতে, তা আঁচলে মুছে ফেলতে ফেলতে, হাসতে হাসতে উঠে এসেছিল বিছানায় তা বিপিন জানেই না। রাতের বৃষ্টি এখনো থামেনি। রাতের ঘোর নিয়ে বিপিন বসে আছে যেন সমুদ্র উপকূলে।

রেবার অফিসের ফোন বিকল। রেবার বাড়িতে ফোন নেই। ফোন নেবে নেবে করছে, কিন্তু সংসারটা তো শুধু রেবা আর অভয়ের না। ওদের বড় পরিবার। রেবা থাকে শ্বশুর, শাশুড়ি, দেওর, ভাসুর, জা, ননদ নিয়ে। এতবড় সংসারে ইচ্ছেমতো ব্যয় করা যায় না, সব সাধপূরণ করা সম্ভব নয়। কিন্তু রেবা তো ফিরে এসে বাইরের ফোনবুথ থেকে ও একটা ফোন করে বলতে পারত ফিরে এসেছি ভালভাবে। কী নিষ্ঠুর। বিপিনের মনে হচ্ছে যেন তাই। অথচ রেবাই না ঝরঝর করে কেঁদেছিল বিপিন তাকে রেখে সদরে চলে আসার দিন। অদ্ভুত। অদ্ভুত মেয়ে ওই রেবা নন্দী।

রেবা বলে, আমি নই আপনিই নিষ্ঠুর বিপিনদা।

নিষ্ঠুর। বিপিন হেসেছিল হা হা করে, কী করে?

বুঝে নিন। রেবা টেবিলের পেপার ওয়েটের ভিতরের ফুল নিয়ে খেলতে চাইছিল একা একা।

কত কারণে তাকে আসা বন্ধ করতে হয়। একবার এসে বলল, কী করে আসি স্যার, ননদের বিয়ের সম্বন্ধটা ভেঙে গেল।

সে কী কেন?

কী জানি। আপনারা পুরুষ মানুষ, আপনারা যা করবেন তাইতো হবে। অভিমান ফেটে পড়েছিল রেবার গলায়, প্রেম ছিল ওদের।

তারপর?

বিয়ের ঠিক, সে চাকরি করতে গেল ব্যাঙ্গালোর, সেখানে গিয়ে সেই জায়গার একটা মেয়েকে আচমকা বিয়ে করে ফেলেছে।

একবার বলল, ম্যালেরিয়া হয়েছে দেওরের, বাড়িতে কেউ কিছুই করবে না, আমিই ব্লাডটেস্ট করলাম, ডাক্তার ডাকা, ওষুধ পথ্যি আনা সব আমার কাজ স্যার, তাই অফিস আসতেও পারছি না, কিন্তু এসব তো করতে হবে, ছুটিও আবার নেই, সবদিক দিয়ে বিপদ।

বিপিন জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ইলশেগুড়ি বৃষ্টির ভেসে যাওয়া দেখছিল। কতদিন আসেনি রেবা নদী। মনে মনে উচ্চারণ করে বিপিন। কেমন মেঘ দেখল রেবা ওই সমুদ্রে। ওখানে বঙ্গোপসাগর খুব তেজী। গর্জমান। ঢেউ মস্ত মস্ত। ঢেউ যখন ভাঙে যেন কামানের গোলার মতো শব্দ হয়। বিপিন মুখ নিচু করল। থুতনি রাখল মস্ত টেবিলের কাচের মসৃণতায়। চোখ মেলে আছে সামুদ্রিক মেঘে। এই একটু আগে একটা সিগারেট শেষ করেছে বিপিন। ঘরে সেই পুরুষালি গন্ধ। গন্ধটাই তো টেনে আনবে রেবা নদীকে। যেদিন প্রথম এল ও এইঘরে, খুঁজে খুঁজে, সেইদূর মফস্বল থেকে দুপুরে বেরিয়ে শেষবেলায় সদরে পৌঁছে, ভিতরে ঢুকে এসে বলেছিল, গন্ধতেই বুঝে গেলাম বিপিনদা এইটা আপনার ঘর।

বিপিন শুনল, বলল, নারকেল বন থেকে বেরিয়ে এলে যেন তুমি।

ওমা কী মেঘ। ওক একী সমুদ্র বিপিনদা, কীভাবে গজরাচ্ছে।

সিংহের মতো।

গা ছমছম করে, তাই না।

তুমি কি সমুদ্রে নেমেছ?

অভয় নামালে, সমুদ্রের কাছে গেলে আমি কেমন হয়ে যাই স্যার।

কেমন?

আচ্ছা সমুদ্রের তো অনেক বয়স।

অনেক, অনেক। বিড়বিড় করে বিপিন। দিনে দিনে প্রাচীন হয়ে যাচ্ছে সে। মাথার ভিতরে কতচুল শাদা হয়ে গেছে। ইদানীং চুল ঝরছেও। হায়রে জীবন। যত ধরে রাখতে চাইছে সে, ততো সরে যাচ্ছে সব। খসে যাচ্ছে যৌবন। কিন্তু সমুদ্রর তো অনন্ত প্রাণ, অনন্ত যৌবন। ক্ষয় নেই, মরে যাওয়া নেই; বিপিন কী করে সমুদ্র হবে?

সমুদ্রর কি প্রাণ আছে বিপিনদা?

বিপিন বলল, সে তুমি জান।

অনন্ত আয়ু সমুদ্রর। ফিসফিস করে রেবা।

বেশ বলেছ।

অন্ধকার হয়ে আসা সমুদ্র উপকূলে দাঁড়িয়ে বেবা বলে, কী আশ্চর্য। আপনি বিশ্বাস করবেন না হয়ত, আমাদের ঘরে যেন অনেক রাত্তিরে সমুদ্র ঢুকে পড়েছিল অন্ধকারে, কী বাতাস, কী নুনগন্ধ, বুনো বুনো, পুরুষ পুরুষ!

কী বলছ তুমি?

হ্যাঁ বিপিনদা, সমুদ্র যেন ভীষণ পুরুষ।

বিপিন দেখছিল সমুদ্র ফুঁসছে। উত্তাল হয়ে ভাঙছে রেবার দুই চরণের কোলে। পায়ের আলতা ধুয়ে যাচ্ছে সামুদ্রিক উচ্ছ্বাসে। দেওয়ালের ওই নিসর্গ চিত্র ভেদ করে হাওয়া এসে আছড়ে পড়ছে বিপিনের টেবিলে। ফাইলপত্র উড়ছে। কাগজ উড়তে উড়তে পাক খাচ্ছে ঘরের ভিতরে।

গোপালপুর-অন-সীতে গিয়ে বিপিনের কথা হয়ত ভুলেই গেছে রেবা।

বিপিন একদিন বলেছিল, এস রাজকুমারী।

ইস। বিপিনদা, রাজকুমারী কেন?

তোমার পা দু'টি অমন ভাবেই মাটি ছুঁয়ে থাকে যেন রেবা নদী।

কেমন ভাবে?

রাজকুমারীর চরণদুটি যেমন মাটি ছোঁয়।

বিপিন টের পায় জৈব গন্ধে ভরে যাচ্ছে ঘর। রাজকুমারী একা বসে আছে অন্ধকার সমুদ্রোপকূলে। সব ভুলে গেছে রেবা। তাই তো হয়। যে সমুদ্রকে চিনতে পারে স্বামী, সংসার, বন্ধু, বান্ধব, স্বজন, পরিজন সব মুছে যায় তার মন থেকে। নাকি অভয়েই সমুদ্র দেখেছে সে। অভয়ের সঙ্গে তার প্রেমের বিয়ে। এখন অভয়কে নিয়েই মেতে আছে সে। অভয়ই তার ধ্যান। বিপিন বন্ধুকে ভুলেই গেছে। হায় সমুদ্র। বালিতে ভরে গেছে বিপিন বন্ধুর অকূল হৃদয়।

খিলখিল করে হাসে রাজকুমারী, ভুলে তো গেছিলামই।

চিনলে কী করে?

গন্ধে।

তার মানে?

অন্ধকারে সমুদ্র গন্ধটা নিয়ে এল।

তোমার অভয় তখন?

অভয়। অভয় তখন ঘুমিয়ে, কী ঘুমোতেই না পারে ও, এই দেখলাম জেগে, কথা বলছি, ও কথা শুনতে শুনতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়ল।

তখন তুমি?

অন্ধকারে একা, কতবড় ঘর, ওই ব্যালকনির ওপারে সমুদ্র ফুঁসছে, ঢেউ

ভাঙছে, আকাশে গ্রহ তারা নেই, একবার মস্ত চাঁদ মুখ দেখিয়েছিল, শ্রাবণের পূর্ণিমা ছিল তো, কিন্তু সেই চাঁদ কোন মেঘে যে ডুবেছে, আমি একা শুয়ে আছি, হাওয়া তছনছ করে দিচ্ছে সব, অভয় ভাগ্যি ঘুমিয়ে ছিল গো, না ঘুমোলে আমি কী করে সমুদ্রের কথা শুনতাম।

না ঘুমোলে আসতই না হাওয়া।

তাইতো হতো হয়ত, যখন অভয় সাড়া দিল না আমার ডাকে, তখনই তো সাড়া দিতে দিতে ঢুকে পড়ল সমুদ্রের গন্ধ, বাতাস! বলতে সামুদ্রিক মেঘে যেন মিশে যায় রেবা এমনই তার মগ্নতা। হাওয়া এবার মন্দগতির। বহুসময় দাপাদাপি করে সমুদ্র এখন ক্লান্ত। রেবার কপালের পাশে দু'একগাছি চুল উড়ছে। চোখদুটি এবার যেন ঘুমোবে।

কান পেতে আছে বিপিন। পায়ের শব্দ শোনা যায় কি? দরজা ঠেলে এল সুবল সরকার, পান পরাগের ফয়েলের মুখ ছিঁড়তে ছিঁড়তে বলল, তোমার বান্ধবী এসেছিল কাল, তখন সাড়ে পাঁচটা হয়ে গেছে, তুমি কাল আগে বেরিয়েছিলে?

বুকের রক্তস্রোত থেমে যায় যেন, বিপিনের গলা বুঁজে যায় প্রায়, পাঁচটা পনেরয়।

হাঁপাতে হাঁপাতে এসেছিল, মনে হয় খুব দরকার ছিল।

মুখখানি অন্ধকার হয়ে গেল বিপিনের। তাহলে রাজকুমারী ভোলেনি। অটো রিকশা, ভাঙাপথ, বৃষ্টি, মেঘ, দুর্যোগ, জ্যাম সব পার হয়ে এসেছিল সমুদ্র ভ্রমণ শেষে। বিপিনের মনে হলো সুবল মিথ্যেকথাও বলতে পারে। হয়ত সুবল খেয়াল রেখেছে কতদিন আসেনি রেবা। তাই সুবল দেখে নিচ্ছে কেমন আছে বিপিন। বিপিন দুচোখ স্থির করে সুবলের চোখে, সুবল পানপরাগ মুখে নিতে নিতে মাথা উচু করে চোখ সরিয়ে নিয়ে বলল, তুমি নেই শুনে কেমন যেন হয়ে গেল, টেলিফোন করে দ্যাখো।

খারাপ, ফলস রিং হচ্ছে।

বর্ষায় এমন হয়, আমার টেলিফোনটা একমাস খারাপ, সারাচ্ছে না, বলল জ্যামে পড়েছিল, না হলে আগেই আসত।

বিপিন বলল, আমি তো ছিলাম উপরে।

কী করে জানব, বলে যাওনি কেন?

বিপিন বলল, বেরিয়েছি সওয়া ছ'টায়, আড্ডা হচ্ছিল।

ও তো চলে গেল, আমার সঙ্গে লিফটে নামল।

বিপিনের বুক থরথর করে ওঠে। এত পথ উজিয়ে এসে ফিরে গেল রাজকুমারী, রেবা নদী। বিপিন সমুদ্রের মেঘে তাকিয়ে নিঃশব্দ হয়। সুবল সরকার না বসে জানালায় গেল, খোলা জানালা টেনে দিচ্ছিল সে, খেয়াল হলো বিপিনের, হা হা করে ওঠে, না, না থাক।

ভিজে যাচ্ছো যে, জল আসছে।

আসুক, এতো ইলশেগুড়ি।

হাওয়াটা ভাল নয়।

আসুক। বলে সমুদ্রে আবার তাকায় বিপিন। সুবল সরকার যেমন এল তেমনি বেরিয়ে গেল। মেঘের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এল রেবা, বলল, অভয়দা, মানে আমার অভয় যখন শুনল, মেঘ করলে সমুদ্রের ভীষণ একরূপ হয়, তা বলেছেন আপনি, বিপিন বন্ধু, তো ও বলল, তাই। ঠিক বলেছেন উনি, চলো সমুদ্রে, এ বর্ষাতেই, কী মেঘ না দেখা যাবে।

আমার কথায় গেলে?

হ্যাঁ, আশ্চর্য, আমার অভয়দা, ওকে তো আগে অভয়দা বলতাম, এখন বলি অভয়, আবার অভয়দাও, যখন যেমন ইচ্ছে হয়, তো আমার স্বামী যেন কেমন। অদ্ভুত।

কেন?

দ্বেষ, ঈর্ষা কিছুই নেই।

তাই?

হ্যাঁ, আমি ওকে বলি ঘুমোতে পারলেই হলো, তুমি শুধু ঘুমোও।

তোমাকে ভালবাসে না?

খুউব।

তুমিও তো?

খুউব। একটা সময় ছিল যখন অভয়কে না পেলে এ জীবন বৃথা মনে হতো, এখনো যখন ও ট্যুরে যায়, শুধু ভাবি কখন আসবে, কিন্তু ওই যে, এত ভাল ও, আপনার দেওয়া ফাউন্টেন পেনটা দেখল, তারপর চেয়েই নিল।

তারপর?

জিজ্ঞেসই করলনা কে দিয়েছে?

তাহলে সেই পেনে অভয় লিখছে?

আমিও লিখি, তবে ওর পকেটেই থাকে, ক্লিপটা কী চমৎকার, এক্সিকিউটিভ শার্টে মানায় খুব, ভ্যান হুসেনের শার্ট কিনে দিয়েছি ওকে।

বিপিনের মুখ নেমে গেল। মনের ভিতরে মেঘ ঢুকতে লাগল সমুদ্র পার হয়ে এসে। দেওয়াল চিত্র থেকে মেঘ আসছে। মেঘ আর মেঘ। বিপিনের চোখ বুঁজে আসে যেন। তখনই দরজা খুলে গেল। পরীর মতো ভেসে এল অভয়ের বউ। মাথার চুলে ইলশেগুড়ি বৃষ্টির বিন্দু, মোমের কৌটার মতো রঙ তার। কপালে শুধু টিপই আছে, আর কোনো সাজ নেই। ভিজেছে রেবা।

ভিজে গেছ যে! উঠে দাঁড়ায় বিপিন।

কালও তো এসেছিলাম।

বিপিন বলল, দেখে মনে হচ্ছে সমুদ্র থেকেই এলে, ওই যে সেই সমুদ্র।

রেবা বসতে বসতে হাসতে চেষ্টা করল, কিন্তু হাসি যেন মুছে গেল ওর বিবর্ণ ঠোঁটের গা থেকে। বর্ষায় ওর সব সাজ ধুয়ে গেছে নাকি। সমুদ্র সব সাজ মুছে দিয়ে ওকে ফেরত দিয়েছে উপকূলে? বিপিন বলল, কাল একটুর জন্য।

হ্যাঁ, এত মন খারাপ হয়ে গেল। রিন রিন করল রেবা।

কেমন মেঘ দেখে এলে গোপালপুরের সমুদ্রে?

আঁচলে ভিজে হাতে মুছে নিতে নিতে রেবা বলল, ওর খুব অসুখ বিপিনদা, সমুদ্রে গিয়ে ওকে নিয়েই তো ঘরে বসে থাকলাম, কী বৃষ্টি, কী ঝড়, হাওয়া, মেঘ, জানালা খোলার উপায়ও ছিলনা, ডাঃ দিবাকর সেন না আপনার চেনা।

চেনা তো।

অ্যাপয়েন্টমেন্ট করিয়ে দেবেন, বিশ-পঁচিশ দিনের আগে তো ডেট পাওয়া যায়না, ওর জ্বরই ছাড়ছে না। গলা বুঁজে গেল রেবার, কী টেনশানই না গেছে গোপালপুরে ক'দিন, এত খারাপ কাটল।

বসো, তুমি যে ভিজে গেছ।

ছাতাটা তুলে নিল ব্যাগ থেকে কাল।

সেই রঙীন ছাতা?

হ্যাঁ আপনি এনে দিয়েছিলেন নেপাল থেকে।

জাপানি, অরিজিনাল।

জানি বিপিনদা, টেরই পেলাম না। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল রেবা।

আকাশ ভেঙে পড়ছে যেন মেঘের ডাকে। মেঘ উঠে আসছে দূর বঙ্গোপসাগর থেকে। বাতাসে শব্দ হচ্ছে শোঁ শোঁ। হাওয়ার বেগ বাড়ছে। মন খারাপ হয়ে গেল বিপিনের। ছাতাটা ছিল তার প্রথম উপহার। পেয়ে কি খুশীই না হয়েছিল রেবা। কত রঙ ছিল কাপড়ে। ঝলমল করত যেন। মেলে ধরলে মনে হতো প্রজাপতির ডানা। ওই ছাতা মাথায় যখন হাঁটত রেবা, মনে হতো প্রজাপতি ভাসিয়েছে রঙীন পাখা।

বিপিন বলল, এসেই ফোন করলেনা কেন?

মাথার ঠিক নেই স্যার, ভেবেছিলাম জ্বর রেমিশন হয়েছে, সেরে গেল, কিন্তু আবার ঘুরে এল যে ফেরার একদিন বাদে, অফিস যাচ্ছি, অফিসের ফোন খারাপ, বাড়ি থেকে যে সকালে বেরিয়ে যে আপনাকে বাড়িতে ফোন করে বলব আমি আসছি, সে উপায়ও নেই। সকাল থেকে কত কাজ, শ্বশুর, শাশুড়ি, ননদ, একটা অসুস্থ মানুষ... আর ফোন বুথটাও অনেক দূরে, একদিন, কবে যেন, কালই, ওরা। সব ভুলে যাচ্ছি, কালই সকালে অফিসে বেরোনর সময় পথ থেকে আপনার বাড়িতে ফোন করলাম, কেউ ধরেনি, রিং হয়ে গেল, মানে আপনি অফিসে বেরিয়ে গেছেন, আর মিসেসও হয়ত ঘরে ছিলেননা তখন, বাচ্চাকে স্কুলে দিতে

গিয়েছিলেন হতে পারে, অফিসে রিং করব কী, দশটার তো অনেক আগে, তারপর বাস চলে এল, এক একটা সময় এমন হয় যে সব এফোর্টই যেন ফেইল করে। কোনোভাবেই যোগাযোগ হচ্ছে না আপনার সঙ্গে, কাল অত কষ্টে করে এসেও না। বলতে বলতে হাঁপাতে লাগল রেবা। ঘন ঘন শ্বাস নিচ্ছে সে। এই বর্ষার ভিতরে, হিমেল প্রকৃতির ভিতরে ও রেবার চোখ মুখ ছেয়ে গেছে অসীম ক্লান্তিতে। অদ্ভুত। আজপর্যন্ত কোনোদিন তো ওকে এমন ক্লান্ত দ্যাখেনি বিপিন। ঝলমলে ভাবটি মেঘে ছেয়ে গেছে যেন। জ্যোৎস্না ঢেকে গেছে গহন গম্ভীর মেঘের আস্তরণে।

বিপিন বলল, ঠিক আছে আমি যোগাযোগ করে নেব ডাঃ সেন-এর সঙ্গে।

না স্যার, আপনি এখন ফোন করে দেখুন না, যদি পেয়ে যান, আমার ভয় করছে।

বিপিনের মায়া হলো, সে টেলিফোন তুলল, ডায়াল করতে লাগল। কিন্তু লাইন পায় না। ফোন এনগেজড। আধঘন্টা ধরে চেষ্টা করল বিপিন। একবারও বাজল না ওপরের টেলিফোন। সমুদ্র বাতাস, মেঘ বৃষ্টি সব ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়েছে। বিপিন দেখল রেবার মুখখানি প্রায় রক্তশূন্য হয়ে গেছে হতাশায়। উঠে পড়ল বিপিন, বলল, তাহলে চলো, চেম্বারে গিয়ে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করি, তোমার সঙ্গে আলাপও হবে, দারুণ মানুষ ডাঃ সেন।

বিপিনের সঙ্গে নীচে নামল রেবা। তার ঘাড় থেকে পিঠ, ব্লাউজের সীমারেখা পর্যন্ত অনাবৃত শরীরটুকু যেন বরফের মতো শাদা ধবধবে, তকতকে, ভিতরটাও যেন দেখা যায়। হাল্কা সোনালি রঙ ধরেছে সেই বরফ-মসৃণতায়। চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে বিপিন, লিফট নামছে। বাইরে বর্ষা ঘন হয়েছে তাই লোকজন নামছে না, উঠছে না হয়ত। লিফট থেকে নেমে এগোতে এগোতে বিপিন বলল, মেঘ পাওনি গোপালপুরে?

ওখানেই তো জ্বরটা শুরু হলো বিপিনদা।

বিপিন বলল, চলে এলে না কেন?

কী জ্বর। আর রিটার্ন টিকিট তো কাটাই ছিল, অত জ্বরে ওকে নিয়ে বিনা রিজার্ভেশনে ফিরব কী করে?

বিপিনের ছাতার নীচে রেবা। গা ঘেষে ওরা হাঁটতে হাঁটতে শেডের নিচে এল। বিপিন বলল। ওখানে গিয়েই অসুখ?

হ্যাঁ, ওই রোগী নিয়ে একদিন তো প্রায় সারারাত্রি জেগে, অচেনা জায়গা, তখন আমি প্রায় কেঁদে ফেলেছিলাম, খুব মনে পড়ছিল আপনার কথা। সমুদ্রটা যেন দানবপ্রায়, কী ঝড়, কী বাতাস, কী গর্জন, ভয় করতে লাগল।

বাইরে সব যেন সমুদ্রের মতো সব আচমকা নিঃশব্দ হয়ে গেছে। দাপাতে দাপাতে যেন কয়েক দণ্ডের জন্য নেমেছে দানব। এখানে মানুষ কম। গাড়িও তাই। বৃষ্টির বেগ বাড়ছে। বিপিন শুনছিল এক চোয়াড়ে ডাক্তারের কথা। সে অভয়কে

দেখতে এসে শুধু রেবাকেই দেখছিল ওই দূর সমুদ্রতীরে। রেবা চিনতে পেরেছিল তার চোখের দৃষ্টি। তখন তার এত ভয় হলো যে সেই ডাক্তারের ওষুধই ফেলে দিল জানালা দিয়ে। তার মনে হচ্ছিল ডাক্তার অভয়কে মেরে তাকে আর আসতে দেবেনা ওখান থেকে। রেবা শুধু ক্রোসিন আর প্যারাসিটামল দিয়ে যাচ্ছে অভয়কে। ডাক্তার দেখল তো কলকাতায় ফিরে। কিন্তু সে তো পাড়ার ডাক্তার, এমনই ডাক্তার সে, টাইফয়েড-ম্যালেরিয়ার ওষুধ একসঙ্গে লাগায়, যেটা খেটে যায়। অন্য ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন দেখে ওষুধ দেয়। সে আসলে ডাক্তারই কিনা সন্দেহ আছে রেবার। আর অভয় যে কেন এত ভোগে? প্রায়ই ওর অসুখ হয়, জ্বরে পড়ে।

বিপিন আর বিপিনের নবীন বান্ধবী দাঁড়িয়ে আছে মুখোমুখি, খুব কাছাকাছি। বিপন্ন রেবা বলে যাচ্ছে অভয়ের কথা। বিপিনের গায়ে তার নিঃশ্বাস পড়ছে। রেবা বলছে, অভয় যেন শিশুর মতো, ও নিজেও খুব ভয় পেয়ে গেছে।

ট্যাক্সি নিয়ে ডাক্তারের চেম্বারে পৌঁছে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে রেবাকে নিয়ে যখন বেরোয় বিপিন তখন অকালসন্ধ্যা নেমেছে এই শহরে। বৃষ্টি হয়েই যাচ্ছে, রাস্তার আলোগুলি জ্বলে গেছে। রেবা বলল, আমি বাস ধরে চলে যাব।

যাবে, আর তো চিন্তা নেই, চলো কোথাও বসে চা খাই।

না, আজ থাক বিপিনদা, দেরি হয়ে যাবে। কেমন বিপন্ন শোনায় রেবার কণ্ঠস্বর।

বিপিন বলল, দেরি হলে কী হবে, বর্ষায় বেরিয়েছ, দেরি তো হতেই পারে।

না, ও অস্থির হয়ে পড়বে।

বিপিন এবার মনে মনে অসন্তুষ্ট হলো। সেতো রেবার কথায় অফিস ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে, রেবা একটুও দাঁড়াবেনা? তাকে কি ভয় পায় রেবা গোপনে? বিপিনের চোখে তার মনের ছায়া পড়ে। তা যেন টেরও পায় রেবা। সে বলল, অসুখ হলে ও কিছুতেই ছাড়তে চায় না, অফিস যেতেও দিতে চায় না।

তাহলে ডাক্তারের খোঁজে বেরোবে কে? বিপিন যেন অসহিষ্ণু।

আমিই। রিনরিন করল রেবা, সবই আমি।

রেবার জবাবের ভিতরে আরো বিপন্নতা ছিল, কী বিষণ্ণতা ছেয়ে গেল রেবাকে। সে যে বিপিনের সঙ্গে রেঁস্তোরায় বসতে পারছে না তার জন্যও তার সঙ্কোচ খুব, কী করবে, সে যে অভয়ের বউ, সে কী করে ইচ্ছে মতো ফিরবে দেরি করে?

নরম হলো বিপিন, সে বলল, ঠিক আছে, চলো তোমাকে একটা ছাতা কিনে দিই, নীল ছাতা।

না, না, আমার স্বামীর অসুখ, আমি কী করে তোমার কাছ থেকে ছাতা নিয়ে ফিরব বিপিনদা, আপনি ঠিক বুঝতে পারছেন না।

তুমি নিজে কিনেছ বলবে, এই বৃষ্টিতে ছাতা ছাড়া চলে?

খুব চলে, এখন ওর অসুখ, এখন নীল রঙের ছাতা কিনলে সবাই কী ভাববে, এখন ওসব চলবে না, এখন ও সব বিলাসিতা।

বিপিন রুক্ষ হয়ে গেল, তাহলে ভিজবে?

হ্যাঁ, স্বামী বিছানায় পড়ে থাকলে স্ত্রী তেল সাবানও ত্যাগ করলে সে প্রসন্ন থাকে। রেবা ডিঙি মেরে বাসের নম্বর দেখছিল। বিপিন দেখছে রেবা যেন কাঁপছে। মনে হচ্ছে তাই। শীত করছে ওর।

কী হলো তোমার?

ও কিছু না, হাওয়া দিচ্ছে তো।

কাঁপছ?

ভিজে শাড়ি শুকোল গায়ে।

এসো ট্যাক্সিতে, তোমাকে এগিয়ে দিই।

ট্যাক্সিতে এক কোণে কুঁকড়ে আছে রেবা। কাঁপছে হি হি করে। ওর গায়ে এখন কম্বল চাপানো দরকার। ওকে বুকে চেপে রাখা দরকার। বিপিনের মনে হলো এখন শরীরই পারে শরীরকে বাঁচাতে। সুস্থ, সবল শরীর দিয়ে ও উষ্ণ হয়ে উঠলে কাঁপুনি কেটে যাবে। কিন্তু রেবা তো সরে গেছে কতটা। আজ ঠিক ওর জ্বর আসবে। জ্বর এল নাকি? বিপিন রেবার দিকে হাত বাড়ায়। বিপিন রেবাকে ছুঁয়ে ফেলল, কী হলো তোমার রেবা নদী, রাগ করলে আমার উপর?

পুড়ে গেল বিপিনের আঙুল। ছিটকে সরে যায় সে। কোথায় রেবা? আগুনের নদী পাশে বসে আছে সে। তাপ লাগছে গায়ে। রেবাকে আর চিনতে পারছে না। দাউ দাউ করে জ্বলে যাচ্ছে যেন রেবা নদী।

বিপিন ফিসফিস করল, গা পুড়ে যাচ্ছে যে।

অস্ফুট গলায় কী জবাব দেয় রেবা তা বুঝতে পারে না বিপিন। তবু সে ডাকল আবার, তোমার যে খুব জ্বর।

জবাব পায়না বিপিন। জ্যামে আটকে আছে ট্যাক্সি। সার সার দাঁড়িয়ে আছে গাড়ি, দুই পথেই। চাকা গড়ালে একটু এগোচ্ছে, আবার দাঁড়িয়ে পড়ছে। সে একটু ঝুঁকে গেল। রেবার গা থেকে যে গন্ধটা নাকে এল তা চেনা নয়। রেবা তো খুব শৌখীন। সাজতে ভালবাসে। গায়ে সুগন্ধী মেখে থাকে। তার ঘরে যখন ঢোকে রেবা আশ্চর্য সৌরভ যেন ছড়িয়ে যায় ঘরের বাতাসে। ওই গন্ধটা রেবার গন্ধ তা জানে বিপিন। সেই গন্ধটা যে আজ পায়নি তা বুঝতে পারল। বরং যে গন্ধটা নাকে এল তা যেন কেমন বুনো বুনো। পুরনো লতাগুল্মের গন্ধ মেখে বসে আছে যেন রেবা। বিপিন মনে করতে চাইল, পারল না, এই গন্ধকে চেনেই না। ঋতুমতী নারীর গন্ধ কি এমন হয়? বিপিন ভুলেই গেছে। সে সরে এসে জানালার কাচ একটু নামিয়ে সিগারেট ধরায়। জানালা দিয়ে ধোঁয়া বের করে দিতে থাকে, কিন্তু

ট্যাক্সির ভিতরটা ঢেকে যেতে থাকে পোড়া তামাকের গন্ধে। এই গন্ধও কি জাগাবে না রেবাকে?

রেবার মাথা ঢলে পড়েছে একদিকে। বিপিন সিগারেটটা বাইরে ফেলে জানালার কাচ তুলে দিয়ে ওর কপালে হাত দেয়, সাড় নেই। রেবার ঘোর ভাঙে না। বিপিন ভাবল মাথাটি কোলের উপরে নেয়, কিন্তু পারল না, কোনো স্পন্দনই নেই যেন রেবার ভিতরে। জ্বোরো নিঃশ্বাস শোঁ শোঁ করছে। বিপিন দেখল ঠোঁটের কোণ দিয়ে কষ বেরিয়ে আসছে। কী হলো রেবার। এমন গন্ধহীন নারীকে সে তো আগে দ্যাখোনি, এমন রূপহীন তো কোনোদিন দ্যাখেনি সে রেবাকে। ঠোঁট একটু ফাঁক হয়েছে। সেখান থেকেও গরম বাতাস বেরিয়ে আসছে। ইস। বিপিনের গা কেমন করে ওঠে। সরে যায় সে। স্বামীর অসুখ তাই সাজেনি। স্বামীর অসুখ তাই সুগন্ধী মাখেনি। গন্ধহীন নারী। বিপিন আরো সরে যায় ওপাশের জানালার গায়ে। বিপিনের তো অসুখ হয়নি যে রেবা তার কাছে সেজে আসবে না। বিপিনের তো অসুখ নেই যে রেবা সুগন্ধ নিয়ে তার পাশে দাঁড়াবে না। সে তো খুব সুস্থ। রমণের মতো সুস্থ এবং সজীব। বিপিন ঝপ করে দরজা খুলে নেমে পড়ল। এমন ঘাম গন্ধ নিয়ে রেবা এল কেন? জ্বর নিয়ে। স্বামীর অসুখ তো বিপিনের কী?

জ্যাম কেটে ট্যাক্সি আবার চলছে। বিপিন ড্রাইভারকে বাইরে থেকে চেঁচিয়ে বলল, গড়িয়া মোড়ে গিয়ে ডাকবে, বলে দিয়ো আমি নেমে গেছি, জ্বর তো তাই ঘুম ভাঙালাম না।

ট্যাক্সি চলল ঘুমন্ত রেবাকে নিয়ে। বর্ষা ঘোর হলো। বিপিন এখন কোনো বারে যাবে, সেখানে চেনা মানুষের সঙ্গে নেশা করবে। ট্যাক্সি কোন পথে গেল তা দেখল না বিপিন। নেশায় টলোমলো হয়ে বিপিন হাসতে থাকে, ঘুমন্ত রেবার ভাগ্যপরীক্ষা হয়ে যাবে আজ। হায়রে জীবন। এ জীবন ভাগ্যের হাতে সমর্পণ করতেই না বেশি ভালবাসে বিপিন। বৃষ্টি ছিল, বৃষ্টিতে ভিজে জ্বর এসেছিল রেবার। রূপ, গন্ধহীন হয়েছিল বলেই না বিপিনের হাত থেকে বেঁচেছে সে আজ। কী ভাগ্য।

শম্ভু বাউড়ি অকস্মাৎ

পার্থপ্রতিম কুণ্ডু

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো শম্ভু বাউড়ি। এবারই প্রথম বিধানসভায় ভোটে জিতে এসেছে। এম.এল.এ-দের আদবকায়দা আদৌ জানে না। বিশবছর ধরে বাঁকুড়াতেই আছে। দলের প্রয়োজনে সদরে এসেছে বহুবার, কিন্তু কলকাতায় একবারও আসা হয়নি। একবার এসেছিল বটে, তবে সেটা স্বইচ্ছায় নয়।

তখন বছর বিশ-বাইশ বয়স হবে। গোটা বাঁকুড়া জুড়ে চলেছে খরা। দাবদাহ। আন্ত্রিক মহামারী আকার নিয়েছে। সেই মহামারী থেকে রক্ষা পায় নি শম্ভু বাউড়িও। তার অবস্থা এতটাই খারাপ ছিল যে, সদর হাসপাতাল থেকে সোজা চালান করে দেয় বেলেঘাটার আই.ডি. হসপিটালে। সেই প্রথম কলকাতা দেখা। দেখা ঠিক নয়, আসার সময় তো কোমায় আচ্ছন্ন। যখন জ্ঞান হল, তখন হাসপাতালের বিছানায়। কলকাতার হাসপাতাল। কেমন গা শিরশির করে এল। রোমাঞ্চ হল। কলকাতা দেখার এমন সৌভাগ্য যে তার হবে, তা সে স্বপ্নেও ভাবে নি। মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে কলকাতা দর্শন। আর প্রথম দর্শনেই মৃত্যু থেকে জীবনে আসা। অজ্ঞান থেকে জ্ঞানে ফেরা। ছিল বাঁকুড়ার অচিন গাঁয়ে, আর আজ হঠাৎ চোখ খুলেই কলকাতা। টানা একমাস ভর্তি ছিল হাসপাতালে। যখন ছুটি হল, তখনই কলকাতা চিনলো। দলের সদর দপ্তরে গেল প্রথম দিন। শুধুই ঘুরে ঘুরে দেখা। কাউকে চেনে না, জানে না। পরিচয় দিল, কেউ বসার কথা বলল না। শুধুই মনের টানে আসা। আত্মীয়তার টানে আসা। দপ্তরে যে যার মত কর্মব্যস্ত। কেউ কাগজ পড়ে, কেউ লেখে, কেউবা শুধুই গল্পগুজব করে। দলের গুরুত্বপূর্ণ নেতা দরজা বন্ধ করে মিটিং করেন। মিটিং শেষ হলে গটগট করে তার পাশ দিয়ে হেঁটে চলে যান। দৌড়ে গিয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে। সকলেই হকচকিয়ে যায়। পায়ে হাত দিয়ে প্রণামের রীতি দপ্তরে নেই। সকলেই এখানে আত্মীয়। সমান। কমরেড। বন্ধু। কেউ কাউকে না চিনলেও বন্ধু। কথা না বললেও বন্ধু। নিজেদের কথা গোপনে দরজা বন্ধ করে বললেও বন্ধু। পরিচয় দেবার পর বসতে না বললেও বন্ধু। এ বন্ধুত্ব ব্যক্তিস্বার্থে নয়, দলের সামগ্রিক স্বার্থে। ব্যক্তিগত শুভেচ্ছা বিনিময়, আদান-প্রদান তাই এখানে তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। এই অবয়বহীন অশনি বন্ধুত্বের টানে একা একা দশ বছরের ভাইপোর সঙ্গে ঘন্টাখানেক কাটিয়ে সে উঠবে বলে ঠিক করেছে, এমন সময় সোরগোল। শম্ভু প্রথম ভেবেছিল একটু আগে দরজা বন্ধ করে যিনি মিটিং করে গটগট করে বেড়িয়ে গেলেন, যাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে গিয়ে একটা বিভ্রাট সৃষ্টি

করেছিল, তিনিই বোধহয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নেতা। কিন্তু তা নয়। অধিক গুরুত্বপূর্ণ কেউ নিশ্চয়, এখন প্রবেশ করবেন, তাই এত তৎপরতা। প্রথমেই লম্বা-চওড়া দুজন এসে এদিক্‌ওদিক তাকিয়ে দশবছরের ভাইপোর হাত ধরে থাকা, সদ্য আন্ত্রিক থেকে সেরে ওঠা শীর্ণ ক্যাবলা শম্ভুকেই সন্দেহ পরবশ হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন সংক্ষিপ্ত ভাবে— 'কি চাই? কাজ যদি হয়ে যায় তবে চলে যান।'

কিন্তু শম্ভু তো যেতেই এসেছে। থাকতে আসেনি। আর কোনো কাজ নিয়েও সে আসেনি, যে কাজ শেষ হবার প্রশ্ন আছে। তবু 'চলে যান' কথাটা হয়তো কমরেড সুলভ বা বন্ধুত্বের হলেও কানে ভালো ঠেকলো না শম্ভুর। গ্রাম্য শম্ভু চলে যাবার জন্য প্রায় উঠেই পড়েছিল, কিন্তু 'চলে যান' কথাটা তাকে আবার বসিয়ে দিল।

— কি বসে পড়লে যে? ভাইপো প্রশ্ন করলো।

— যেতেই তো চাইছিলাম, কিন্তু 'চলে যান' বলল বলেই তো আবার বসে পড়লাম।

— ওরা যদি আবার চলে যেতে বলে?

— আরো ভালো করে গেঁড়ে বসবো।

— আচ্ছা গোঁয়ার তো।

— গোঁয়ারের দেখলিটা কি। শম্ভু বাউড়ি বাপরেও ছেড়ে কথা বলে না।

কোলাহল আরো কাছে এল। কিছুক্ষণ আগে যাঁরা শম্ভুকে যেতে বলেছিলেন তারাও কাছে এল।

— আপনাদের কি চাই?

— আমরা বসে থাকতে চাই।

— কোনো কাজ যদি থাকে তবে এখন তো আর হবে না, আপনারা এখন চলে যান। কাল আসবেন।

— না কোনো কাজ নেই।

— তাহলে শুধু শুধু বসে আছেন কেন?

— এমনি।

— এমনি মানে?

— এমনি।

— এমনি কি কেউ বসে থাকে?

— হ্যাঁ।

— কোথায় থাকেন আপনারা?

— বাঁকুড়ায়।

— সঙ্গে কে?

— ভাইপো।

— কি করতে এখানে এসেছেন?

— বেড়াতে।

— বেড়ানোর আর কোনো জায়গা পেলেন না? শেষে কিনা পার্টি অফিসে?

— সব জায়গায় যাবো। প্রথমে পার্টি অফিস দিয়ে শুরু করেছি।

— পার্টি অফিস দিয়ে কেন?

— আমার পার্টির অফিস বলে।

যে দুজন এতক্ষণ শীর্ণ ক্যাবলা গ্রাম্য শম্ভুকে কোনো বাউণ্ডুলে বা পাগল বলে ভাবছিল, তারা এবার একে অপরের দিকে তাকালো।

— পার্টির চিঠি এনেছেন?

— চিঠি? কিসের চিঠি?

— পরিচয়পত্র। দলের কেউ কোনো চিঠি করে দিয়েছে আপনাকে।

— না।

— তবে?

— তবে আবার কি?

— কেউ আপনাকে পরিচয় করিয়ে না দিলে আমরা তো আপনাকে এখানে থাকতে দিতে পারি না।

— কিন্তু আমি তো একটু থাকবোই।

ভাইপো মদন এবার ভয় পায়। কাকাকে চুপিচুপি বলে, 'তর্কে কাজ নেই, চলো মানে মানে কেটে পড়ি।'

শম্ভু ধমক দিয়ে বলে, 'থামতো দেখি, গাঁয়ে লাঙল নিয়ে জমি চাষের সময় আমাকে তো সকলে শেখাই ছিল, কমরেড মানে বন্ধু। আর আমিতো সেই থেকে কমরেড বনে গেছি। এখন এরা স্বীকার না করলি-ই হল। এখন স্বীকার করলেও বন্ধু। না করলেও বন্ধু।

এরকম মৃদু তর্কের মাঝে ধুতি পাঞ্জাবী পড়া চল্লিশোর্ধ একজন এগিয়ে এসে বেশ বিনয়ী হয়ে বললেন, 'বলুন কমরেড আপনাদের কি অসুবিধা?'

— কোনো অসুবিধে নেই।

— তবে দয়া করে আমাদের সঙ্গে একটু সহযোগিতা করুন।

— কিন্তু আমি আপনাদের অসুবিধাটা করলাম কোথায়?

— না, আমি লক্ষ্য করছি, আপনারা প্রায় একঘন্টা হল চুপচাপ বসে আছেন।

— হ্যাঁ, চুপচাপ বসে আছি বটে, কিন্তু আপনাদের তো কোনো বিরক্ত করিনি। আমি যখন আপনার সঙ্গে দেখা করে আমার পরিচয় দিলাম, আপনি আমাকে বসতেও বললেন না, তাতে তো আমি এতটুকু রাগ করিনি কমরেড। আমি নিজের গরজেই বসেছি। আমি যখন দরোজা বন্ধ

করে মিটিং করা কমরেডকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলাম, আমার দিকে আপনারা সকলে এমন রে-রে করে তেড়ে এলেন যে আমি কোনো অন্যায় করেছি। ব্যস্ত কমরেড আমাকে চিড়িয়াখানার বনমানুষ ভেবে দ্রুত এমন দূরে সরে গেলেন যে আশীর্বাদ করতেই ভুলে গেলেন, তাতেও তো আমি এতটুকু বিরক্ত হইনি কমরেড। আর আমিতো প্রায় উঠেই পড়েছিলাম, কিন্তু আমাকে যখন 'চলে যান' বলা হল, তখনই আবার বসে গেলাম।

— এবার তবে উঠবেন তো?

— না বসবো।

— কিন্তু এখন তো জরুরী বৈঠক। বিভিন্ন দপ্তরের মন্ত্রীরা আসবেন।

— আমি তো বাঘ ভালুক নই যে আমি ওদের খেয়ে ফেলবো।

— কিন্তু দলের শৃংখলা বলে একটা ব্যাপার আছে। আপনি যে বললেন, আপনি আমাদের কমরেড, তবে আপনাকে তো শৃংখলা মানতে হবে। যদি সত্যিই আপনি কমরেড হন, তবে উর্দ্ধতন কমরেডের নির্দেশ যে মানতেই হবে।

এবার আর কোনো জুৎসই উত্তর খুঁজে পেল না শম্ভু। ভাইপোর কানে কানে বললো, 'সাপের সামনে সর্পগন্ধার শেকড় ধরেছে, আর উপায় নেই, যেতেই হবে।'

শম্ভুর মনে আছে, তাকে যখন কমরেড বানিয়েছিল তখন ওপরওয়ালার নির্দেশ মানার কথাও বলেছিল।

সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এল। ভাবলো, এবার সে কি করবে? মদন বললো, 'ঠাকুমা যে কালিঘাটে পুজো দেওয়ার কথা বলেছিল।'

— পুজো? যবে থেকে কমরেড বনেছি, পুজো তো আমি দিই না।

— ঠাকুমা আমাকে আলাদা করে পাঁচ সিকে দিয়ে দিয়েছে। তুমি না দাও আমিই দেবো। আমি তো আর এখনও কমরেড বনি নি।

— আমি কিন্তু আগেভাগে বলে দিলাম মন্দিরে ঢুকবো না। কমরেডদের মন্দিরে ঢোকা নিষেধ।

— ঠিক আছে তুমি সামনে থেকো। আমিই ঢুকবো।

*　　*　　*

শম্ভুর প্রথম কলকাতা দর্শন এভাবেই ঘটেছিল, সে কথা শম্ভুর আজও মনে আছে। সেই বিশবছর আগে সে কি ভাবতে পেরেছিল, এই রকম কমরেডদের সঙ্গে সেও একই চেয়ারে বসবে। ভাবার কোনো অবকাশই ছিল না, যদি না গোটা দলে এমন ভাঙন হত। শম্ভুর অজান্তে এমন একটা দলে এসে শম্ভু পড়লো যে শম্ভুই সেখানে নেতা। গোপালের পালবংশের রাজা হওয়ার মত শম্ভুও এম.এল.এ. বনে গেল অকস্মাৎ। গ্রামের টিপ সই দেওয়া এম.এল.এ. নয়। রীতিমত চারক্লাস পাশ

করা এম.এল.এ.। আর প্রথমবার এম.এল.এ. হয়েই যে মন্ত্রী হবে, এমন কথা শম্ভুর অতি প্রিয়জনও ভাবেনি। হবার কথাও ছিল না তার। কিন্তু দলের একটা নিয়ম আছে। সব মন্ত্রীই যদি শহর থেকে হয়, তবে অজগাঁয়ের লোকেরা কি সেই সরকারকে নিজের বলে ভাববে? আর চোদ্দপুরুষে কেউ কোনোদিন বাউড়ি এম.এল.এ. শোনেনি। এতদিন এলাকার যোগ্যতম প্রধান শিক্ষক হলধর মণ্ডলই ছিলেন এম.এল.এ.। ভাগাভাগির অঙ্কে হলধর মণ্ডল হল সাধারণ। শম্ভু হল নেতা। গ্রামের সকলে উল্লাসিত হল শম্ভুর এই উত্থানে। শম্ভু ভালো লাঙল চালাতে পারে, কিন্তু বক্তৃতা করতে পারে না। সারা বছর সকলের সুখে দুঃখে থাকে। অন্যায় হলে তেড়ে যায়। লোকে ভরসা পায় শম্ভুকে, শম্ভুর কাছে কাউকে যেতে হয় না অভিযোগ নিয়ে। শম্ভুই সকলের কাছে আসে। বর্ন এম.এল.এ. হলধর মণ্ডলের সাক্ষাতের একটা সময় ছিল, শম্ভুর সে সবের বালাই নেই। যে কোনো সময়-ই শম্ভুকে পাওয়া যায়। তাই শম্ভু সহজেই জনপ্রিয় হয়, নেতা হয়ে যায়। নেতা থেকে এম.এল.এ। এম.এল.এ থেকে মন্ত্রীও।

শম্ভু নিজে মন্ত্রী হতে চায় নি। কারণ সে যোগ্যতা শম্ভুর নেই। একথা শম্ভু ভালোভাবে জানে। দলাদলির অঙ্কে শম্ভু যখন এম.এল.এ হবে বলে ঠিক হচ্ছিল শম্ভু তখন বিশেষ আপত্তি করেনি, কারণ হলধর মণ্ডলের জনসেবার বহর দেখে সে ভরসা পেয়েছে, তাঁর চেয়ে বেশি জনসেবা সে করতে পারবে। অতএব এম.এল.এ-র কাজেও তার অসুবিধা হবে না। কিন্তু জীবনে সে কোনোদিন মন্ত্রী দেখে নি। তাই মন্ত্রীর কাজের পরিধি সম্পর্কে সম্যক কোনো ধারণাও নেই। ভোটে জেতার পর প্রথম যেদিন তাকে ডেকে পাঠানো হল সদর দপ্তরে, বিশ বছর আগের মতই তার দশা হতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার নামটা যে ইতিপূর্বেই শহরে এতটা চাউর হয়েছে, তা এসে প্রথমে সে আন্দাজ করতে পারেনি। দপ্তরের হাল-হকিকৎ আর বিশ বছর আগের মত নেই। অনেক পাল্টেছে। তারপর ভোটে জেতার আনন্দে গোটা দপ্তর যেন মাছের বাজার। সকলেই কথা বলছে। কেউ কারো কথা শুনছে না। সকলের হাতেই খাতা পেন্সিল। সামনে অঙ্ক কষে চলেছে। ভোটের পার্সেন্টেজ। কথাটা সে আগেও শুনেছে। কিন্তু বোধগম্য হয় নি। লোকের সঙ্গে সুখেদুঃখে থাকে লোকে ভোট দেয়। যেমন শম্ভুকে দিয়েছে। শম্ভুকে জেতার জন্য কোনো অঙ্ক শিখতে হয়নি। অঙ্কের হিসেবে হয়তো শম্ভুর প্রার্থীপদ জুটেছিল, কিন্তু জেতার জন্য তো সে কোনো অঙ্ক কষে নি। তাই রেকর্ড ভোটে জেতার পরও শম্ভু এখনও 'ভোটের পার্সেন্টেজ' কথাটা বোঝে না।

দপ্তরে এক একটা টেবিল ঘিরে ছোটো ছোটো জটলা। এক একটা টেবিল মানে এক একটা জেলা। এক একটা টেবিল পিছু এক একজন নেতা। হাতে কাগজ পেন্সিল। কেন্দ্রের নাম, এম.এল.এ.দের নাম, ভোটের সংখ্যা, ভোটারের সংখ্যা, ব্যবধান, কত ভোটে কে জিতল, গত বারে কত ভোটে জিতেছিল, এবার বেশি না

কম, বেশি হলে কত বেশি, কম হলে কত কম, কেন বেশি, কেন কম, বেশি হলে এর পেছনে কোন ফ্যাক্টর কাজ করেছে, কম হলে কোন ফ্যাক্টর... বেশ আয়েশি আলোচনা। এক একটা সিট ধরে ধরে চুলচেরা বিশ্লেষণ। শম্ভু অবাক হয়ে ভাবে এতটুকু একটা ঘরে গোটা পশ্চিমবঙ্গ ধরে গেছে। অতোটুকু টেবিলে এক একটা জেলা। শম্ভু এত বছর কাজ করেও নিজের জেলা কেন, কেন্দ্রটাই ভালোভাবে চিনতে পারে নি, আর এঁরা একটা ঘরে বসে গোটা জেলাকে কিভাবে জানছে? শুধুই অঙ্কের হিসেবে? ভোট মানে কি শুধুই অঙ্ক? ভোট যারা দেয়, তারাও কি শুধুই অঙ্কের এক-দুই-তিন ভিন্ন অন্য কিছু নয়? তাদের ভালোলাগা মন্দলাগা বলে কিছু নেই? আর যারা ভোট দিল, তারা কাকে দিল? চিহ্নে না নামে? নামহীন চিহ্ন না চিহ্নহীন নাম? এক নামের সঙ্গে অন্য নামের কোন পার্থক্য নেই? এক-দুই-তিন সব চিহ্ন? এদের কাছে রাম-শ্যাম-যদু সব কত সহজেই এক-দুই-তিন হয়ে যায়। সব এম.এল.এ., সব নাম কেমন চিহ্ন হয়ে যায়। শম্ভুও কি আস্তে আস্তে এমন চিহ্ন হয়ে যাবে? শম্ভু বাউড়িকে যারা ভোট দিয়েছিল, তারাও কি সব এক-দুই-তিন?

ঘরে ঢুকেই চোখে পড়ল কলকাতার টেবিল। এখানে হারের কারণ খুঁজতে একজন মাঝবয়সী ভদ্রলোক লম্বা পেন্সিল দিয়ে পিঠ চুলকোচ্ছেন। ধোপদুরস্ত পাজামা-পাঞ্জাবী পরা এক ছোকরা লম্বা কিং সাইজ সিগারেট খেয়ে রিং ছাড়ছে আপনমনে। খাকি পোষাকপরা একজন, বোধহয় ট্রামের কনডাক্টর হবে (সেবার কালিঘাটে পুজো দিতে গিয়ে এরকম কনডাকটর দেখেছিল শম্ভু) বসার জায়গা না পেয়ে দাঁড়িয়ে আছে ভীড়ের মধ্যে কিসের উৎসাহে?— বোঝে না শম্ভু। শম্ভুও ভীড় ঠেলে, মুখ বাড়িয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করার চেষ্টা করে। সকলেই হারের কারণ খোঁজায় এত ব্যস্ত যে কেউই শম্ভুর কথায় কান দেয় না। কাউকে না পেয়ে শেষ পর্যন্ত ঐ কনডাকটরকেই ডাকে, বলে

— আমি বাঁকুড়ার কমরেড।

— আপনাদের জেলা তো খুব ভালো ফল করেছে। শম্ভু বাউড়ি তো রেকর্ড মার্জিনে জিতেছে।

শম্ভু তখনও জানে না তার দল জেলায় কটা সিট জিতেছে। তবে নিজে যে সবচেয়ে বেশি ভোটে জিতেছে, সে কথা নিজকানেই রেডিওতে শুনেছে। শম্ভু জিজ্ঞাসা করে

— বাথরুমটা কোথায় একটু বলতে পারেন?

— ঐ ওদিকে।

শম্ভু এগিয়ে যায়। চব্বিশ পরগণার গা ঘেঁষে বসে আছে হাওড়া। তার বা পাশে হুগলি, পরে বর্ধমান। হুগলি ও বর্ধমানের মাঝে একটা ছোট্ট হাঁটাচলার জায়গা। ওখানে গিয়ে থমকে দাঁড়ায় শম্ভু। বর্ধমানের টেবিলে বইছে আনন্দের জোয়ার। সকলের হাতেই পেন্সিল, কিন্তু কাগজ নেই। এখানে এমন মার্জিনে সব

জিতেছে যে অন্ত কথার প্রয়োজনই হচ্ছে না। শম্ভু এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে,

— বাথরুমটা কি এদিকেই?

— না।

— তবে যে কলকাতার টেবিল থেকে বলল।

— ওদের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। খবর শোনেন নি, সবকটা সিটেই প্রায় গো হারান হেরেছে।

— আমি বাঁকুড়ার কমরেড।

— আপনাদের রেজাল্ট তো খুব ভালো। শম্ভু বাউড়ি তো রেকর্ড ভোটে...

— কিন্তু আমার যে বাথরুম...

— শেষে ঐ কোণে, বাঁকুড়ার টেবিল দেখছেন, তার পেছনে।

শম্ভু আর দেরী করে না। অনেকক্ষণ তার বাথরুম পেয়েছে। কিন্তু 'ঐ কোণে যে বাঁকুড়া' সেটা তো তার নজরে আসছে না। বর্ধমানের পর মেদিনীপুর-মুর্শিদাবাদ-কোচবিহার-দার্জিলিং, এমনকি দিনাজপুর-পুরুলিয়াও চোখে পড়ছে। অথচ বাকুড়া...? একজন পঞ্চাশোর্ধ রাশভারি, চোখে পুরু লেন্সের চশমা, ধুতি কোচার হাতে নিয়ে যাচ্ছেন। কাউকে না পেয়ে তাঁকেই জিজ্ঞাসা করল শম্ভু।

— আজ্ঞে, বাঁকুড়াটা কোথায় বলতে পারেন?

ভ্রূ কুঁচকে তার দিকে তাকিয়ে বিরক্তি সহকারে বললেন, 'বাঁকুড়া কেন?'

— না একটু বাথরুমে যাবো।

ততোধিক বিরক্ত হয়ে শম্ভুর কথার কোনো উত্তর দেওয়ার প্রয়োজনই মনে না করে গটগট করে হেঁটে চলে গেলেন।

শম্ভু আর চাপতে পারছে না প্রস্রাবের বেগ। যেমন করেই হোক বাঁকুড়া তাকে খুঁজে পেতেই হবে। যে জেলায় তার জন্ম, যে জেলার গ্রামের সঙ্গে তার নাড়ির যোগ, যে জেলার সুখেদুঃখের সে ভাগীদার, সর্বোপরি যে জেলা থেকে সে ভোটে জিতে এসেছে, সেই জেলাকেই আজ তাকে খুঁজতে হচ্ছে হণ্যে হয়ে, তা আবার অন্য কোনো মহৎ কারণে নয়, নিছক বাথরুমের জন্য।

* * *

জেলা থেকে খবর এসেছে, শম্ভু বাউড়ি আজ সদর দপ্তরে আসছেন। সাম্ভাব্য মন্ত্রী হিসেবে তার নাম ইতিমধ্যেই বিভিন্ন সংবাদপত্রে চাউর হয়ে গেছে, শম্ভু তা এখনও জানে না। দপ্তরে ঢুকতে গিয়েই বা পাশের ঘরে দেখেছিল বিভিন্ন কাগজের রিপোর্টাররা ক্যামেরা নিয়ে বসে আছে। সে তখন ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারে নি, তাঁকে ধরার জন্যই বসে আছে রিপোর্টাররা, একে তো রেকর্ড সংখ্যক ভোটে জেতা, তারপর বাউড়ি মন্ত্রী, গরম গরম সংবাদ, যাকে কেউ কোনো দিন চোখেই দেখে নি কলকাতায়, তার সংবাদ আগে ভাগে দেবার জন্য রিপোর্টাররা অধৈর্য হয়ে পড়ল।

সদর দপ্তরের মুখপাত্র রিপোর্টারদের জানিয়েছেন, শম্ভুবাবু সকাল সাড়ে দশটায়

আসছেন দপ্তরে। শম্ভুও সকাল সাড়ে দশটার অনেক আগেই এসেছে। টেবিল কেন্দ্রিক জেলা ধরে গোটা রাজ্য প্রদক্ষিণ করছে প্রায় একঘণ্টা, শুধু নিজের জেলাকে খোঁজার জন্য, তাও আবার সেটা নিছক বাথরুমের নিশানা পাবার তাগিদে। শম্ভুকে না দেখে রিপোর্টাররা অধৈর্য হয়ে বাঁকুড়ার টেবিল কোথায় খুঁজতে শুরু করে, শম্ভুও পিছু নেয়। এরা যেভাবেই হোক বাঁকুড়া খুঁজে নেবেই, আর শম্ভুও বাঁকুড়ার সূত্র ধরে মূত্রত্যাগের জন্য বাথরুম খুঁজে পাবে, এই আশায়। শম্ভু ভাবে আশ্চর্য মিল দুজনের খোঁজার। দুজনের কেউই আসলে বাঁকুড়া খুঁজছে না। রিপোর্টাররা খুঁজছে শম্ভুর জন্য আর শম্ভু খুঁজছে বাথরুমের জন্য। যাই হোক দুপক্ষেরই লক্ষ্য যখন 'বাঁকুড়া' এক সঙ্গে জোট বাঁধতে দোষ কি?

হৈ হৈ করে রিপোর্টাররা খুঁজে নিল বাঁকুড়ার টেবিল, যা কিনা প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টাতেও খুঁজে পায়নি শম্ভু। গিয়েই বললো,

— শম্ভু বাউড়ি এখনও আসেন নি?

— না।

— উনার যে সাড়ে দশটায় আসার কথা ছিল?

— না এলে আমরা কি করতে পারি?

— কখন আসবেন কিছু বলেছেন?

— না।

— আমরা আর কতক্ষণ ওয়েট করবো?

— তা, আমরা কি করতে পারি বলুন?

— শম্ভু বাউড়ির সিট-এর এনালিসিস্‌টা করেছেন?

— কি এনালিসিস জানতে চাইছেন বলুন?

— আলটিমেট মার্জিন কত হল?

— এক লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার দুশ ছিয়াত্তর।

— মোট ভোটার তো দু লক্ষ এক হাজার তেত্রিশ?

— হ্যাঁ।

— গতবারের মার্জিন?

— দু হাজার তিনশ তিয়াত্তর।

— প্রার্থী বদলই কি এর অন্যতম কারণ?

— আমরা প্রার্থী দেখিয়ে ভোট চাই না। আমাদের দলের নীতিই মুখ্য।

— গতবারও তো ঐ একই নীতিতে লড়েছিলেন? তবে এবার এমন হ্যাভক্ মার্জিন?

— আমাদের সরকারের জনমুখী নীতির সার্থক রূপায়ন ঐ কেন্দ্রেই একশ ভাগ হয়েছে, তাই এই ফল।

— তার মানে অন্য কেন্দ্রে একশ ভাগ হয় নি স্বীকার করছেন।

— না। সব ক্ষেত্রে সমভাবে একশ ভাগ হওয়া সম্ভব নয়। সেই লক্ষ্যেই আমরা ক্রমশ এগোচ্ছি।

— কিভাবে আপনারা বুঝতে পারেন কোন ক্ষেত্রে কত ভাগ রূপায়ন হয়েছে?

— ভোটের ফলাফল দেখে।

— ভোটের ফলাফল?

— হ্যাঁ, ভোটের ফলাফল। যেমন ধরুন কোথাও আমরা এক হাজার ভোটে জিতেছি, সেখানে বুঝতে হবে এক ভাগ রূপায়ন হয়েছে।

— অর্থাৎ বলতে চাইছেন এক ভাগ কর্মসূচী রূপায়ন = একহাজার ভোটে জেতা? অর্থাৎ ১০০০ : ১।

— প্রায় সেইরকমই বলতে পারেন।

— তাহলে শম্ভু বাউড়ি একলক্ষেরও বেশি ভোটে হয় জয়লাভ করেছেন সেই অর্থে ওখানে রূপায়ণের হার ১৩৫২৭৬ + ১০০০ = ১৩৫ অর্থাৎ একশ ভাগেরও বেশি।

— একসলিউটলি কারেক্ট।

এইসব আলোচনা শুনে শম্ভুর প্রস্রাবের বেগ কমে এসেছিল। কিন্তু বাঁকুড়া-টেবিলের ইন-চার্জ 'একসলিউট্‌লি কারেক্ট' এমন বেগে বললেন যে প্রস্রাবের বেগ আর সামাল দিতে পারল না। সমস্ত কথা থামিয়ে বাকুড়ার ইনচার্জকে নির্লজ্জের মত জিজ্ঞাসা করল, — 'আজ্ঞে বাথরুমটা কোথায় একটু বলতে পরেন?'

'ইনচার্জ' ভদ্রলোক মুখ না তুলে পেছনে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন বাথরুমের দরজা। এবার মুখটা তুলতেই শম্ভুকে দেখে ভূত দেখার মত চমকে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে, চেঁচিয়ে বললেন— ঐ ঐতো শম্ভু বাউড়ি। রিপোর্টারের দল ক্যামেরা তাক করার আগেই শম্ভু দৌড়ে বাথরুমে ঢুকে গেল। রিপোর্টারের দল তার পিছু নেবার আগেই বাথরুমে ঢুকে ভালো করে ছিটকানি দিয়ে ধীর লয়ে সমস্ত বেগ অবদমিত করল। তারপর চোখেমুখে জল দিয়ে ছাতা আর চটিটা পেতে বাথরুমে বসে পড়ল। বাথরুমের বাইরে দরজার সামনে রিপোর্টারদের হট্টোগোল, আর শম্ভু ভেতরে ছিটকানি দিয়ে সারা দিনের ধকল একটু জিরিয়ে নিচ্ছে চোখ বুঁজে।

* * *

বাথরুমের বাইরে অগণিত রিপোর্টার ক্যামেরা তাক করে দাঁড়িয়ে আছে। শম্ভু ভেতর থেকে শুনতে পাচ্ছে বাইরের কোলাহল। বাঁকুড়ার ইনচার্জের মুখটা চেনা শম্ভুর। প্রাইমারী স্কুলের মাস্টার। স্কুলে যে কবে যায় জানে না। শুনেছে, সবসময় হয় জেলা দপ্তরে, নয়তো রাজ্যে থাকে। নামটা শুনেছিল মনে নেই। তিনিই সকলকে শান্ত করছেন, 'আপনারা এভাবে অধৈর্য হবেন না। উনি সুদূর বাঁকুড়ার প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে এসেছেন। উনাকে নিশ্চিন্তে বাথরুম করতে দিন।

— উনি এতভালো বাথরুম পেয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন নাতো? দেখে যা মনে হল মাঠেঘাটে অভ্যাস।

— মাননীয় এম.এল.এ. সম্পর্কে এ ধরনের কুরুচিকর মন্তব্য শুধু অশোভন নয়, অন্যায়ও।

শম্ভু ভাবে ওরাতো ঠিকই বলেছে। নয়তো বাথরুমের ভেতরে কেউ ছাতা পেতে বসে পড়ে। একটা দুষ্টু বুদ্ধি খেলল শম্ভুর মাথায়। আর একটু বসে থাকলে কেমন হয়?

বাইরে থেকে প্রাইমারী শিক্ষক, হ্যাঁ নামটা মনে পড়েছে, নীরোদবাবু, সুললিত কণ্ঠে ডাকেন— 'শম্ভু বাবু, আপনার হয়েছে। রিপোর্টাররা বাইরে আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। তাড়াতাড়ি করুন।'

শম্ভু কোনো উত্তর দেয় না।

— 'শম্ভুবাবু আপনার শরীর খারাপ লাগছে না তো?'

শম্ভু নিরুত্তর।

বাইরে দৌড়োদৌড়ি, হট্টোগোল। সকলে ভাবে বাথরুমে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে শম্ভু। সেইমত তৎপরতা শুরু হয়। শম্ভু এবার আয়াস ভেঙ্গে ওঠে। ভাবে আর মজা নয়। এবার বেরোনো দরকার। কিন্তু দরজা খুলতে পারে না। ঢোকার সময় রিপোর্টারের তাড়া খেয়ে ভয়ে দরজার ছিটকিনিটা দিয়েছিল একটু জোরেই, কিন্তু এখন টানাটানি করেও তা খুলতে পারছে না। ভয় পায় শম্ভু। চেঁচায়। হাউমাউ করে কেঁদে ফেলে। বলে, 'দরজা খুলতে পারছি না।' বাইরে 'দরজা খুলতে পারছি না'— কথার প্রতিধ্বনী জনে জনে হয়ে সোজা রাজ্যসম্পাদকের কানে পৌছোয়। রাজ্য সম্পাদকও আপদকালীন তৎপরতায় তড়িঘড়ি উঠে দরজা খোলার ব্যবস্থা করে শম্ভু বাউড়িকে উদ্ধার করেন।

বাথরুম থেকে বেরোবার সঙ্গে সঙ্গেই বেশ কয়েকটা ক্যামেরার ফ্লাস ঝলসে ওঠে। টি.ভি ক্যামেরার ঝলমলে আলোয় ঘামে ভেজা শম্ভুকে বেশ চকচকে লাগে। চোখ ঝলসে যায়। বন্ধছাতা দিয়ে আড়াল করে মুখ। এরই ফাঁকে ক্যামেরা তাক করে ক-এক ডজন ফটো তুলে নেয় রিপোর্টাররা।

শম্ভু বাউড়ি আনকোরা এম.এল.এ। ভাবী মন্ত্রীও বটে। রাজ্যসম্পাদক আগলে নিজের চেম্বারে নিয়ে বসান। সাংবাদিকদের ডাকেন নিজের চেম্বারে। প্রাথমিক পরিচয় করিয়ে দেন রাজ্যসম্পাদক স্বয়ং। সাংবাদিকরা প্রশ্ন শুরু করেন একে একে—,

— আপনি কি বিবাহিত?

— হ্যাঁ।

— কয় ছেলেমেয়ে?

— নেই।

ফচকে এক সাংবাদিক আলতো প্রশ্ন করে— 'কারণ জানতে পারি?'

শম্ভু নার্ভাস হয়।' থামতে শুরু করে। রাজ্যসম্পাদক বলেন, 'এরকম অরাজনৈতিক প্রশ্ন না করাই বাঞ্ছনীয়।' আবার প্রশ্ন পর্ব শুরু হয়।

— আপনি এর আগে কোনোদিন ভোটে লড়েছেন?

— না?

— তাহলে এবাব হঠাৎ ভোটে দাঁড়াতে গেলেন কেন?

— হলধর মণ্ডলের দাঁড়ানোর কথা ছিল, হঠাৎ একদিন পার্টি আমাকে দাঁড়াতে বললো।

— কারণ?

— হলধর মণ্ডলকে আসলে ...।' অন্য কিছু বলতে যাচ্ছিল শম্ভু। হঠাৎ-ই চোখে চোখ পড়ে রাজ্যসম্পাদকের। রাজ্যসম্পাদক চোখের ঈশারায় থামতে বলেন। শম্ভু হকচকিয়ে যায়। শম্ভু সাদাসিধে। শম্ভু গোঁয়ার। পার্টির অতো-সতো মারপ্যাঁচ বোঝে না। রাজ্যসম্পাদকের থামতে বলার কারণও তাই বুঝতে পারে না। সে আবার বলতে শুরু করে।

— হলধর মণ্ডলকে আসলে জেলার নেতারা কেউই পছন্দ করেন না।

— কারণ?

— অন্য গ্রুপের।

রাজ্যসম্পাদক শম্ভুর অসমাপ্ত কথাটা টেনে নিয়ে বলেন, 'অন্য গ্রুপ অর্থাৎ অন্য শ্রেণীতে তিনি বিচরণ করছেন বলে আমাদের কাছে খবর ছিল। তার শ্রেণী বিচ্যুতি ঘটেছে।' শম্ভু লাফিয়ে উঠে বলে— 'উনি ঠিকই বলেছেন, এই তো জোনাল কমিটির নির্বাচনের আগে উনিও আমাদের শ্রেণীতে ছিলেন। কিন্তু হঠাৎ ডিগবাজী খেয়ে আজ অন্য শ্রেণীতে ভিড়েছেন। তাই এবার তাকে জোনাল কমিটির কোনো পদও দেওয়া হয় নি, আসলে ডিগবাজী দিতে গিয়ে ল্যাং খেযে গেছেন।'

— শ্রেণী বলতে আপনি ঠিক কি মিন্ করছেন?

রাজ্যসম্পাদক এবার আর শম্ভুকে বলার সুযোগ না দিয়ে নিজেই উত্তর দিলেন,

— শ্রেণী অর্থাৎ আমাদের শ্রেণী। সর্বহারার শ্রেণী। শ্রমিক কৃষক মেহনতী মানুষের শ্রেণী।

হলধর মণ্ডলের ডিগবাজী খাওয়া ও ল্যাং মারার প্রসঙ্গে শ্রেণীর এই ব্যাখ্যার কোনো যোগসূত্র খুঁজে পেল না শম্ভু। তবু রাজ্যসম্পাদকের মুখের ওপর তো আর কোনো কথা চলে না, তাই থেমে গেল শম্ভু। রিপোর্টারের দলও মুচকি হাসল। গ্রুপ ও শ্রেণীর এই অপূর্ব অর্থ সমন্বয় বোদ রাজ্যসম্পাদকের মুখে শুনে মুচকি হাসা ছাড়া বিশেষ কিছু করারও ছিল না তাদের। পেছনে বসে থাকা তরুণ এক সাংবাদিক, সম্ভবতঃ অখ্যাত কোনো-কাগজের হবে, প্রশ্ন করলেন,

— শম্ভুবাবুর শ্রেণী অবস্থান কোন দিকে?

শম্ভু বলল, 'কোনো দিকেই নেই। আমি ঐ দলাদলির মধ্যে নেই। লোকের কাজে লাগি। লোক ভালবাসে, তাই ভোটে জিতেছি।

— কিন্তু ভোটে না দাঁড়ালে তো জেতা যায় না? তা আপনি ভোটে দাঁড়ানোর সময় কোন শ্রেণীতে ছিলেন?

— দেখুন আমি কম পড়াশুনা করা লোক। সম্পাদক মশাই তো আপনাদের আগেই বলেছেন বিস্তারিত ভাবে। শ্রেণীট্রেনি বলে আমাকে ঘাবড়ে দেবেন না। অতো-সতো শ্রেণী আমি বুঝি না। হলধর মণ্ডলের সঙ্গে আমার ঝগড়াও নেই। কিন্তু এলাকার সব কমরেড আমাকেই দাঁড়াতে বলেছিল। শ্রেণী যদি বলেন, তবে যারা আমাকে ভোটে দাঁড়াতে বলেছিল, আমি তাদের শ্রেণীতে।

— আপনি এই যে হায়েষ্ট মার্জিনে জিতলেন, এর পেছনে গোপন রহস্যটা কি?

শম্ভু এবার কি উত্তর দেবে। কিছুক্ষণ ভেবেও কোনো জুৎসই উত্তর খুঁজে পেল না। পরে বলল— 'বলতে পারবো না।'

— আপনি ভোটের অঙ্ক কিভাবে কষেন?

— অঙ্ক আমি জানি না, আর অঙ্কে যে ভোট হয় তাও বিশ্বাস করি না।

— আপনি কি মন্ত্রী হবেন?

— সেই খবর শুনেই তো কলকাতায় এসেছি।

রাজ্যসম্পাদক এবার আর চুপ করে বসে থাকতে পারলেন না। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

বললেন, 'আর কোনো প্রশ্ন নয়, উনি এখন উঠতে চান।'

শম্ভু কথার মারপ্যাঁচ বুঝতে পারে না বলে— 'না না, আমার কোনো তাড়া নেই।'

রাজ্যসম্পাদক বলেন, 'আপনি জানেন না আপনাকে নিয়ে এখন একটা সম্পাদকীয় মিটিং হবে।'

রিপোর্টারদের কথার উত্তর দিতে বেশ ভালোই লাগছিল শম্ভুর। কিন্তু উপাই কি? রাজ্যসম্পাদকের নির্দেশ। উঠতেই হবে। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো শম্ভু। শম্ভু বাউড়ি।

রিপোর্টাররা বললেন— 'আমাদের শেষ প্রশ্ন, মন্ত্রী হয়েই প্রথমে আপনি কি করবেন?

— একটা চটি কিনবো। এই চটিটা বড্ড ভোগাচ্ছে। আর কিনবো একটা পেন। সইটইতো করতে হবে।

ঝাওয়াল

অভিজিৎ সেন

এপ্রিল মাস থেকে মাঝের বন্দরে বাতাস ওঠে। বস্তুত এই বাতাস শীতের আমেজ যেতে না যেতেই শুরু হয়। শীতের উত্তরের হাওয়াকে ঠেলে ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠা মাটির তাপ উপরের আকাশে উঠতে চেষ্টা করে। ফলে সারাদিন ধরে বয়ে চলে একটানা ঘূর্ণি হাওয়া। সকালে বাতাস থাকে মৃদু, বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ বাতাসের বেগ বাড়তে থাকে। শুকনো পাতা, ধুলো আর আবর্জনা কখনো কখনো আকাশে উঠে সূর্যকেই ঢেকে দেয়। রোদ যত কড়া হয়, ঝোড়ো হাওয়ার দাপট তত বাড়ে। ফের সন্ধ্যার দিকে বাতাস আস্তে আস্তে স্তিমিত হয়ে আসে। স্থানীয়রা এই বাতাসকে বলে ঝাওয়াল। আকাশ যদি নির্মেঘ থাকে, তবে ঝাওয়াল অবিরাম চলতে থাকবে। এভাবে প্রাক-মৌসুমী বৃষ্টি না আসা পর্যন্ত এই বাতাস চলতে থাকবে।

সরোজের রিলিফ সেন্টারের অফিস ঘরে লোকটি প্রায় দিনই এসে বসে থাকে। ঠিকাদারদের ফরমায়েস খাটা লোকটির নাম বনমালী। লোকটি ঠিক ভৃত্যশ্রেণীর নয়। কখনো সে ঠিকাদারের জোগানদার। ক্যাম্পগুলোতে রান্নার জন্য প্রচুর কাঠ সরবরাহ করতে হয়। যে ব্যক্তি মূল ঠিকাদার সে অনেকের মধ্যে অর্ডারটা ভাগ করে দেয়। বনমালী কখনো কখনো তাদের একজন। অধিকাংশ সময় চুপচাপ বসে বিড়ি টানে আর দূরের দিকে তাকিয়ে থাকে। দূরের দিকে তাকিয়ে থাকারও বিশেষ অর্থ আছে। কাছের কোনো ব্যক্তির বা বস্তুর দিকে তাকিয়ে থাকলেও মনে হয়, বনমালী দূরকেই দেখছে। কেমন বিষণ্ণ দীন দৃষ্টি তার। অফিসঘরের দ্বিতীয় চেয়ারটিকে একদিকের দেয়ালের কাছে সরিয়ে নিয়ে, চিবুকের নিচে হাত মুঠো করে ধরে ইস্কুল বাড়িটা ছাড়িয়ে সে দূরের মাঠের দিকে তাকিয়ে থাকে। দূরে শস্যহীন মাঠের মধ্যে ধুলোর ঘূর্ণি উঠে প্রবল টানে নাচতে নাচতে মাঠ পার হয়ে যায়। বনমালী দেখে।

ঘরের একমাত্র জানালাটি বন্ধ রেখেছে সরোজ। পিছনের দেয়ালের সঙ্গে কাঁচের পাল্লা লাগানো পাঁচ-ছটি কাঠের আলমারিতে কিছু বই আছে। সে-সব আলমারিতে তালা লাগানো। সরোজের ব্যাগে দু একখান বই সবসময়ই থাকে। ঢোকার দরজার বাইরে চওড়া বারান্দা। মাঝে মাঝে দমকা হাওয়া খড়কুটো, পাতা এবং অন্যান্য আবর্জনা নিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ছে। প্রচণ্ড রোদ্দুরের মধ্যে বাতাসের গর্জন কেমন যেন আকিল বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে মনের মধ্যে। হতাশ্বাস, খিন্ন বিভ্রান্তি। কোনো কাজ নেই। এই কালি-ছেটানো ঝোড়ো হাওয়ার মধ্যে বেরোনোও বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

হাতের বইটা বন্ধ করে সরোজও বাইরের ধুলো ময়লার দাপাদাপি দেখছিল। দেখতে দেখতে ছবির একাগ্রতা হারিয়ে যেতে যেতে কেমন ঝিমধরা একটা পিচ্ছিল, সর্বাংগ নিসপিস করা চেতনা সমস্ত ইন্দ্রিয় জুড়ে চেপে বসে। ঝুঁকে পড়ে মুঠোর উপর চিবুক রেখে প্রচণ্ড তেজি সূর্যের তাপের নীচে প্রবল বাতাসের আস্ফালনে কী যেন হতে থাকে তার শরীরের ভিতরে। কেমন এক আকুল ক্ষুধার জন্ম হতে থাকে। সে ক্ষুধা কি দৈহিক কামনাসম্ভূত, নাকি কোনো পুরানো প্রতিহিংসার হটাৎ জেগে ওঠা জিঘাংসা, নাকি বাপ-মা-ভাইবোনের মত প্রিয়জনের কাছ থেকে বহুকাল দূরে থাকার জন্য বাৎসল্য কিংবা ভালবাসার ক্ষুধা, নাকি এ সমস্ত কিছু মিলিয়ে একটা অনির্দিষ্ট ক্ষুধায় যৌগ বা খেদ, বিভ্রান্ত মস্তিষ্কে সরোজ কিছুই বিশ্লেষণ করতে পারছিল না।

হঠাৎ বনমালী বলল, ঝাওয়াল হল ডানের হাওয়া। যাকে বলে শয়তানের হাওয়া। ঝাওয়ালে দরজা জানালা বন্ধ করে ঘরে থাকতে হয়, জানেন ইনচার্জবাবু?

সরোজ দৃষ্টি ঘুরিয়ে বনমালীর মুখের উপর ফেলে অলসভাবে বলল, শয়তানের হাওয়া! কেমন?

বনমালীর ভাষা অকস্মাৎ আঞ্চলিক হয়ে গেল। বলল, ঐ ঝাওয়াল আপনাকে পাগল কইরে দিতে পারে। জানেন?

বনমালীর সঙ্গে সরোজের একধরনের সম্পর্ক হয়েছিল। বনমালী এই ক্যাম্পের সুবাদে গজিয়ে ওঠা চাপের দোকান থেকে চা এনে দিত সরোজকে। সিগারেট এনে দিত এবং এইসব নিভৃত সময়ে কথা বলে তাকে সাহচর্য দিত।

সে বলল, ঝাওয়াল যদি সন্ধ্যার পরও থাকে, বুঝলেন ইনচার্জবাবু, মানুষ তালে পাগল হয়ে যাতে পারে। আর যদি চাঁদনি রাতেও ঝাওয়াল থাকে তাহলে মানুষ পাগল হয়ে যা খুশি তাই করবা পারে।

বনমালীর কথায় গুরুত্ব দেওয়ার কোনো কারণ এখন পর্যন্ত ঘটেনি সরোজের। তবুও এই অতিপ্রাকৃত রৌদ্রতপ্ত ঝোড়ো বাতাস তার শরীরের ভিতরে কোনো প্রাচীন আলকেমি সম্ভব করছিল।

সে বলল, ঝাওয়াল তো কাল রাতেও ছিল।

বনমালী বলল, কাল রাতে ছিল, পরশু রাতেও ছিল, তার আগের দিনও ছিল।

সরোজের যেন খুব ঘুম পাচ্ছিল। টেবিলের উপর আড়াআড়ি হাত রেখে তার উপরে মাথা রাখল সে।

ক্লান্ত অত্যন্ত শ্লথ দুপুর, তার সর্বাঙ্গ জুড়ে দুরন্ত ঝাওয়াল।

চোখ বন্ধ করে ফেলল সে।

কেমন অতলে তলিয়ে যাওয়ার মত হতাশায় ভরা ক্লান্তি তার শরীরে। ঘুমঘুম আঠায় চোখের পাতা লেগে গেলে হেনাকে দেখল সে। হেনা, খানসেনাদের তাড়া খেয়ে পালিয়ে আসা একটি পরিবারের ছোট মেয়েটি। দরজা,

জানালা বন্ধ করে শরীরের জামাকাপড় আলগা করে হেনা শুয়ে আছে অন্ধকার ঘরের মেঝেতে? তাদের বাসার টিনের চালার উপরে ডানের ঝাওয়াল ক্রমান্বয়ে একের পর এক হাহাকার-দীর্ণ ঝাপটা দিয়ে যাচ্ছে না? মড়মড় করে দুরন্ত বাতাসে পেযারা গাছের ডালপালা আছড়ে পড়ছে না চালের উপর? দরমার বেড়ার উপর আবর্জনার আছড়ে পড়ে ছড়িয়ে ছত্রাখান হওয়া টের পাচ্ছে না হেনা? চোখ বন্ধ রেখেই সে জিজ্ঞেস করল, 'যা খুশি' মানে? 'যা খুশি তাই' করতে পারে মানে?

বনমালী তারপরে কি বলেছিল তা আর ভালো করে শুনতে পায়নি সরোজ। তবে কিছু বলেছিল, তা ঠিক। অস্পষ্ট, অর্ধেক, তলিয়ে যাওয়া ঘুমের মধ্যে শোনা কথাকে মনে হতে থাকে বহুকাল আগে শোনা কথার মত, বধ্যভূমিতে ঘটনার মত। বনমালী নির্ঘাৎ কিছু পাপপুণ্যের কথা বলেছিল, বলেছিল ঈশ্বরের বিধানের বাইরে মানুষের চলে যাওয়ার কথা। কিন্তু সেসব সেই মুহূর্তে সরোজ আর শোনেনি। সে জলের নীচে নেমে যাচ্ছিল যেন, গভীর থেকে আরো গভীরে। তারপরে জলের তলার কাদা দু হাত দিয়ে সরিয়ে মাটির ভিতরে ঢুকে যাচ্ছিল সে, মাটির গভীরে, যেখানে পচা কাদা গাছের শিকড়ে জড়াজড়ি করে আছে সে সবেরও নীচে অসম্ভব কষ্ট করে সে ঢুকে যাচ্ছিল। দু হাত রক্তাক্ত, তার মাথা নীচের দিকে, তার দমবন্ধ হয়ে আসছিল।

ভীষণ কষ্টকর এবং নানা উপসর্গে ভরা একটি ঘুম ঘন্টাখানেক ঘুমিয়ে সে আচমকা জেগেও উঠল। জেগে উঠে দেখল ঘরে সে একা। জুন মাসের আগুনে-হলকাবাহী বাতাসের প্রহারে তার শরীর খর, জ্বালাধরা, দগ্ধ। ঘোর-লাগা চোখে সে বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখল বেলা দুপুর পার হযে গেলেও হাওয়ার দাপট একটুও কমেনি। চেয়ার থেকে উঠে উদ্ভ্রান্তের মত বাইরে বেরিয়ে এল সে। রাস্তা ধরে হাঁটতেও লাগল উদ্ভ্রান্তের মত। হাঁটতে হাঁটতে সে যেখানে এসে দাঁড়াল সেটা সতী-হেনাদের বাসা। সতী হেনার বড় বোন। অসহিষ্ণুর মত দরজার কড়া ধরে নাড়া দিতে লাগল সে।

ভিতর থেকে কোনো স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর বলল, খুলছি।

দরজা খুলল সতী।

— একি, আপনার এরকম চেহারা হয়েছে কেন? কতক্ষণ ঘুরছেন এই রোদ্দুরে আর হাওয়ায?

স্নিগ্ধ, করুণ, আশ্রয়দাত্রী সতী। তার অন্য স্বাভাবিক সময়ের আকর্ষণ। কিন্তু এখন তার স্মিত মুখের দিকে তাকিয়েও হাসতে পারল না সরোজ।

সতী তার মাথার উপর দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, ইস্, আকাশের কী চেহারা হযেছে।

পলি এবং বালির চাদরে মোড়া, যেন ময়লা সীসার চাদর দিয়ে ঢাকা আকাশ।

সরোজ ঘাড় ঘুরিয়ে সেদিকে তাকিয়ে ফের সতীর মুখের দিকে তাকাল। এখানে কেন এসেছে সে?

সরোজ ঘরের মধ্যে ঢুকে এলে দরজা বন্ধ করল সতী। ছায়াচ্ছন্ন ঘরে প্রথমে কিছুই ঠাহর হয় না। বাইরের প্রখর সূর্যালোকে চোখ বুঝি ঝলসে গেছে তার। তার শরীরের সান্নিধ্যে দাঁড়িয়ে দরজা বন্ধ করল সতী।

আন্দাজে একটা চেয়ারের দিকে এগিয়ে গিয়ে বসে পড়ল সরোজ। হাত দিয়ে চোখ রগড়ে সতীকে ভাল করে দেখার চেষ্টা করতে টের পেল চোখের কোণে জমে থাকা বালিতে ঘষা লেগে চোখ জ্বালা করে উঠল। বালি সর্বত্র। মাথার চুলে, মুখের ভিতরে, দাঁতের নীচে সর্বত্র কিচকিচ করছে বালি। কানের এবং নাকের ছিদ্রের ভিতরে বালির অস্বস্তিকর উপস্থিতি। পকেট থেকে রুমাল বের করে মুছতে গিয়ে হঠাৎ খেয়াল হয় আবছা আলোর মধ্যে সতী তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে চোখে কোনো নির্দিষ্ট প্রশ্ন নিয়ে।

সরোজ আচমকা কেমন সংকুচিত হয়ে গেল ভিতরে ভিতরে। খুব চেষ্টা করে একটু হেসে বল, ইস কী বিচ্ছিরি দিন আজ।

সতী স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলল, এক ঘটি পানি দিচ্ছি, মুখ-হাতটা ধুয়ে ফেলুন, কেমন?

সতীর গায়ের থেকে হালকা ল্যাভেণ্ডারের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে সেই ছায়াচ্ছন্ন লম্বা ঘরটির মধ্যে যা সরোজ জানে একেবারেই প্রাকৃতিক। কেমন অনাকাঙ্ক্ষিত— স্বস্তিদায়ক এবং সেকারণে এই মুহূর্তে আরো হতাশার, আরো যন্ত্রণার।

ভিতর থেকে হেনার কণ্ঠ হঠাৎ বলে উঠল, পানি নয়, আপা, জল। হেনার কণ্ঠস্বর যেন উদ্দাম ঝাওবালের একটা ঝাপটা।

সতী বলল, থাম, ফাজিল। সব কিছুতেই পাকামি।

সরোজ চেষ্টা করতে লাগল স্বাভাবিক হতে।

বলল, হ্যাঁ, তাই দিন।

দরজা খুলে মুখে চোখে এবং ঘাড়ে গলায় জলের ঝাপটা দিল সে। জল মাটিতে পড়ার আগেই যেন শুষে যাচ্ছে। ঘরে ঢুকে সতীর হাতে ঘটি দিতে সতী একখানা গামছা তার হাতে এগিয়ে দিল।

কেন যেন ভারি কৃতজ্ঞবোধ হল সতীর কাছে নিজেকে।

হাতমুখ মুছে সতীর দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকাল সে। হঠাৎ রাজ্যের সংকোচ আর আত্মগ্লানি আবৃত করে ফেলল তাকে। এই অপ্রাকৃত প্রহরে এমন বিক্ষুব্ধ শরীর ও মন নিয়ে সে এ বাড়িতে আসলি কি করে।

ভিতর থেকে হেনা আবার বলল, আপা, এবার ওঁকে এক গেলাস 'জল' দিতে পার।

সতী 'ইস' বলে ঈষৎ বিরক্তি প্রকাশ করে ভিতরে চলে গেল। মুহ্যমানের মত সরোজ ঘরের মধ্যে একা বসে থাকল। ঘরের ভিতরটা এখন আর অত

ছায়াচ্ছন্ন নয়, বরং একটা নরম মায়াবি আলো যেন ছড়িয়ে আছে, এমন মনে হল তার। পানশালার মত রহস্যময় একটা লুকানো উৎস আলো যেন কোথাও জ্বলছে। সতী জল এনে দিলে এক নিঃশ্বাসে গেলাস শেষ করে সতীকে ফেরত দিতে গেলে দুজনের হাতে হাতে ছোঁওয়া লাগল। সরোজের ভিতরে কোনো আলোড়ন জাগল না; কিন্তু সতী যেন একটু শিউরেই উঠল।

ভিতর থেকে হেনা বলল, আপা, চা করবে নাকি?

সতী একটু অসহিষ্ণু হয়ে উত্তর দিল, কেন, তুই উঠে করতে পারছিস না?

হেনা বলল, আমার তৈরি চা তো আবার সরোজবাবুর পছন্দ হয় না।

সরোজ সত্যিসত্যিই অবাক হয়ে বলল, এ আবার কবে বললাম আমি?

ছাড়ুন তো ওর কথা। বসুন আপনি, আমি চা করে আনছি। সতী ভিতর দিকে যেতে যেতে বলল, মামু আর মা গেছে ওদিকে একটা বাড়িতে রেডিও শুনতে। কিছু একটা খবর আছে বোধ হয়। আপনি শুনেছেন কিছু?

সরোজ বলল, কিসের খবর? নাতো, কিছু শুনিনি তো।

সে এই পরিবারটির সঙ্গে এই দুতিন মাসে ভীষণ জড়িয়ে গিয়েছিল।

হেনা ভিতর থেকে ফের বলল, দুপুর রোদে টোটো করে রাস্তায় ঘুরলে আর খবর শুনবেন কোত্থেকে।

সতী ভিতরে যেতে যেতে বলল, ইস্ হেনা। তারপরে চাপাস্বরে কিছু একটা নির্দেশ দিল সে হেনাকে। নির্দেশের উত্তরে হেনা বলল, তোমার কোনো ভয় নেই, চা না খেয়ে আমি উঠছি না।

ওপাশের দরজা খুলে সতী রান্নাঘরে চলে গেল। সরোজ একা বসে বাইরের বাতাসের হাহাকার শুনতে লাগল, যদিও এতক্ষণে অনেকটাই ধাতস্থ সে। বনমালী তাকে যে সব কথা বলেছিল এখন সে সব সত্য বলেই মনে হতে লাগল তার। ঝাওষাল শয়তানের হাওয়া, ঝাওয়াল মানুষকে পাগল করে দিতে পারে। ঝাওয়ালে মানুষ সামান্য কারণেই খুন-খারাপি করে ফেলতে পারে। আত্মহত্যা করে। তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় শোনা টুকরো টুকরো কথাকে জোড়া লাগিয়ে নিজের আচরণের কারণ খুঁজে পেয়ে সরোজ স্তম্ভিত হয়ে গেল। চোখ বন্ধ করে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে থেকে সে মরমে মরে যেতে লাগল। শরণার্থী এই পরিবারটির দুটি মেয়ে দুভাবে তাকে আকৃষ্ট করে।

হঠাৎ হাসনুহেনার উগ্রগন্ধ তার মস্তিষ্কের কোষে কোষে নতুন করে একটা বিপর্যয়ের সূত্রপাত করতে সে চোখ খুলতেই দেখল হেনা তার চেয়ার থেকে মাত্র তিনহাত দূরে দাঁড়িয়ে। নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে হেনা তাকে দেখছে।

সরোজ নিজের চোখকেই যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না। হেনার পিছনে দুটি ঘর পেরিয়ে পিছনের যে দরজা খুলে সতী চা করতে রান্নাঘরে গেছে, সেই দরজাটি খোলা থাকায় কিছুটা আলোর উদ্ভাস হেনার পিছনের দরজার ফ্রেমবদ্ধ শূন্য

স্থানটুকুতে। সেই উল্লাসে তার একথা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিল না যে শুধুমাত্র একখানা পাতলা শাড়ির আড়ালে হেনা সম্পূর্ণ নগ্ন।

আটপৌরে ঢঙে শাড়িখানা পরা তার। বাঁ-কাঁধের উপর পিঠকে ঘুরিয়ে এনে ডানকাঁধের উপর আঁচলের উর্ধাংশ ছুঁড়ে দিয়েছে সে। ফলে বাঁ হাতখানা বাহুমূল থেকে সম্পূর্ণ নগ্ন। রবীন্দ্রনাথের রহস্যময়ী নারীর ছবিখানার মতই দরজার ফ্রেমে পাতলা শাড়ির ভিতরে হেনার নগ্ন দেহকাণ্ড পরিষ্কার দৃশ্যমান।

আত্মবিস্মৃত বিহ্বল দৃষ্টিতে সে হেনার দিকে তাকিয়ে থাকল শুধু। এতকাল সে যেন ঘুমিয়েই ছিল। এতকাল কেন সে টের পায়নি যে প্রেম এই পরিমাণ বিপর্যস্ত করতে পারে তাকে? প্রেম না চৈতি-বৈশাখি ঝাওয়াল। কে এই বিভ্রান্তির জন্য দায়ী? বনমালী ঠিকই বলেছিল, ঝাওয়াল উঠলে মানুষ যা-খুশি তাই করতে পারে। নিজের অজানাতেই সে চেয়ার ছেড়ে খানিকটা উঁচু হয়ে উঠল। উগ্র হেনার গন্ধে সারা ঘর ভরে আছে আছে। এই ডি-ওডারেন্টের উৎস কি হেনার পার্থিব শরীর?

হেনা ফিসফিস করে বলল, বসুন, আপা চা নিয়ে আসছে।

আর সঙ্গে সঙ্গেই দরজার কড়া নাড়ার শব্দ। হেনা নিঃশব্দে ভিতরের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল। সরোজ সম্বিত ফিরে পেয়ে দরজা খুলতে সতী-হেনার মামা আবদুল কুদ্দুস এবং মা রুমেলা ভিতরে এল। হাওয়া এবং রোদের তাপে দুজনেই বিপর্যস্ত।

— ওঃ সরোজ। তুমি তাহলে আগেই খবরটা পেয়েছ?

আবদুল কুদ্দুস ভীষণ উত্তেজিত।

— খবর? না, মানে, এখানে এসে শুনলাম—

প্রশ্নের খেই হারিয়ে যাওয়া মানুষের মত অপ্রস্তুত সরোজ।

— বাংলাদেশের মুক্তিফৌজ উল্লেখযোগ জয়লাভ করেছে। ঢাকার সঙ্গে দেশের অন্যান্য জেলাগুলোর যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। সমস্ত রাস্তা রেল ধ্বংস করে দিয়েছে মুক্তি বাহিনী। বিবিসি পাকিস্তানের সমালোচনা করেছে এবং আশা আছে যেকোনো সময় বাংলাদেশের মুক্তির ব্যাপারে ব্রিটেন চাপ সৃষ্টি করতে শুরু করবে। মুজিবনগর থেকে রেডিওর খবর। জয় বাংলা। ভিতর থেকে তোতাপাখির মত স্লোগান দিল হেনা।

— হ্যাঁ স্বাধীন বাংলাদেশ। জয় বাংলা। কি রকম যেন লাগছে শরীরের ভিতরে— বিস্ময়, আনন্দ, অহঙ্কার, দায়িত্বশীল বীর কি না।

— মাসু, কম্যুনিস্ট নয় তো?

ভিতর থেকে হেনা ফের তোতাপাখির মত বলল।

আবদুল কুদ্দুস সস্নেহে হেসে বলল, দি আনফরগেটেবল সকিং বাউ। কিন্তু কি উত্তেজনার খবর বলত?..

— আর এই মুজিবনগর জায়গাটা কোথায়?

হেনা তেমনি অনুত্তেজিত কণ্ঠে জিগ্যেস করল।

— সে প্রশ্ন তো আমারো। হবে কোনো মুক্তাঞ্চলে।

এই মাঝের বন্দরেও হতে পারে।

হেনা মাখনের ভিতর ছুরি চালাবার মত শীতল এবং নিরীহ।

আবদুল কুদ্দুসের আবেগ হতোদ্যম হয় এবং একটু আহতও হয় যেন সে। বসতে বসতে বলল, ঠিকই। তুই-ই বোধ হয় ঠিক। ইতিমধ্যেই দশ লক্ষ খুন, ততোধিক ধর্ষিত।

হেনা বলল, তার মানে কয়েকমাস আগে সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস এবং ঝড়ে কুড়ি লক্ষ, না তিরিশ লক্ষ নিশ্চিহ্ন।

এই শেষ বাক্যটি সম্ভবত হেনার স্বাভাবিক উচ্চারণ। কিন্তু আবদুল কুদ্দুস একেবারে চুপ করে যেতে সে পূর্বেকার মেজাজে ফিরে গিয়ে বলল, এবারকার ইলিশ মাছে কি টেস্ট্ দেখেছ মামু? আর এই জুনমাসেই কি সাইজ! আপা অবশ্য ব্লেড দিয়ে কেটে চার টুকরো বানিয়েছিল—

চা হাতে ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে সতী বলল, মোটেই না, যথেষ্ট বড় টুকরো ছিল, পাকামি না করে উঠে রান্নাঘর থেকে চা নিয়ে যা।

আবদুল কুদ্দুস স্বাভাবিক হওয়ার জন্য চেষ্টাকৃত উচ্চস্বরে বলল, দে, চা-ই খাই। নদী এবং সমুদ্রের উপকূল অঞ্চলে লক্ষ লক্ষ শব এবং ইলিশের ওজন ও স্বাদবৃদ্ধির কার্যকারণ সম্পর্কে তার দুপুরে খাওয়া ভাত পেটের ভিতরে নড়ে উঠে যেন জানান দিল। অন্য প্রসঙ্গে যাওয়ার জন্য সে সরোজের দিকে ফিরে বলল, বল সরোজ, আর কি খবর, বল।

নিজের এই শহরের এবং সারা উপমহাদেশে অসংখ্য খবর। তার মধ্যে আবদুল কুদ্দুসের রেডিও শুনে আসা খবর তার কাছে আদৌ তেমন উত্তেজক মনে হল না। ভাইকে পুলিশ ধরে কি অবস্থা করেছে, কে জানে? ফেব্রুয়ারির বহরমপুর জেল হত্যার পর মে-মাসে দমদম জেলে একই পদ্ধতিতে হত্যা, কলকাতা এবং শহরতলির রাস্তাঘাটে প্রকাশ্য এবং গোপন হত্যা, মুজিবর রহমানের ক্রমশ মহীরুহ হয়ে ওঠা এবং ইন্দিরা গান্ধীর এশিয়ার মুক্তিসূর্য হওয়ার প্রস্তুতি। তার এবং তার মত আরো অজস্র মানুষের এই মুহূর্তে কিছু করার নেই।

কিন্তু এসব কোনো কিছু নিয়েই সে আর আলোচনায় উৎসাহ পাচ্ছিল না। চা খেয়ে, পরে আসব বলে বিকেল নাগাদ বাইরে বেরিয়ে এল সে।

বাইরে সেই উজ্জ্বল হাওয়া একই রকম অথবা বাড়তির দিকেও হতে পারে। ঝোড়ো হাওয়ার দাপটে রাস্তায় লোকজন কম। পকেট থেকে রুমাল বের করে নাকে চাপা দিয়ে সে তার বাসার দিকে হাঁটতে লাগল। যতক্ষণ ও বাসায় ছিল সরোজ শুধু হেনার নড়াচড়া লক্ষ করছিল। এমনকি যখন সে আড়ালে ছিল, যখন

পাশের ছোট ঘরটির অন্ধকারে সে শায়া, ব্রেসিয়ার, ব্লাউজ পরে সভ্যভব্য হচ্ছিল, সরোজ তখনো তাকে দেখতে পাচ্ছিল যেন।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করার আগেই সে জানত ঘরে ঘুম আসবে না। সে যদি তার আর পাঁচজন সহকর্মী শিবির ইন-চার্জের মত পয়সা রোজগারে মনোনিবেশ করতে পারত তাহলে সব থেকে নির্ভরযোগ্য রেহাই হত তার। তাহলে এই ঝাওয়ালের রাতে যখন পিছন দিকের বাঁশের ঝাড় ডানদিকে এগিয়ে এসে বারবার তার চালার অ্যাসবেস্টসের উপর আছড়ে পড়ছে, তখন সে রেহাই খুঁজবার জন্য এমন ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ত না। তার অভিশাপ দেওয়ার ইচ্ছা হতে লাগল যাবতীয় প্রাক্তন ধারণা এবং সে সব তার কাছে যারা বহন করে নিয়ে এসেছে, তাদের। সে তার বাপ-মাকে পর্যন্ত গালাগাল দেওয়ার মানসিক পর্যায়ে এসে ঝট্ করে বিছানার উপরে উঠে বসল।

বাঁশের ঝাড়ে উদ্দাম আন্দোলন অব্যাহত। নানাধরণের জান্তব, যন্ত্রণার আর্তনাদ, হাহাকার ছড়িয়ে পড়তে লাগল সরোজের ঘরখানার সমস্ত আবহ জুড়ে। হঠাৎ ঘরজুড়ে হেনার গন্ধ কুয়াশার মত, যেন সে দেখতে পাচ্ছে, নামতে লাগল। নাসারন্ধ্রে নয়, গন্ধটা সে প্রথমে অনুভব করল নাভিমূলে। সেখান থেকে গন্ধ ভিতরে ঢুকে নিম্নাংশের যাবতীয় শিরা-উপশিরা, ধমনী-রক্তবহ যাবতীয় জালিকা, বৃক্ক, অন্ত্রকোষ এবং প্রস্টেটের তুমুল ইন্দ্রিয়প্রবণ অঙ্গসমূহে, পরে উপরদিকে অন্ত্র, ফুসফুস, হৃদয় ধরে শেষপর্যন্ত মস্তিষ্কের কোষে কোষে ছড়িয়ে পড়ল।

খাট থেকে নেমে দরজা খুলে যখন সে বাইরে বেরিয়ে এল, তখন সমস্ত পাড়া, শহর গভীর ঘুমে। রাস্তায় নামতেই বৈশাখী ঝাওয়াল কোলাহল করে উঠল। অজস্র স্খলিত পাতা রাস্তা জুড়ে। বাতাস সেই পাতার স্তূপ ঠেলে সামনের দিকে নিয়ে তাকে রাস্তা দেখাচ্ছিল। উদ্ভ্রান্তের মত সেই কামজ-ঝাওয়ালের পথ ধরে সে এগোতে লাগল। কোথায় যেন যেতে হবে তাকে, এমন তাড়া ছিল তার। চাঁদের আলোর নীচে সারা শহর মৃত, পরিত্যক্ত প্রাচীন নগরীর মত দেখাচ্ছে। কুকুরেরা তাকে দেখে ঘেউ ঘেউ করলেও কেউ নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে তাড়া করে এল না। বরং উল্টো একদল চিৎকার করতে থাকা কুকুরের দিকে সে ঢিল তুলে ছুঁড়ে দেবার ভঙ্গি করতে কুকুরগুলো একযোগে এমন বিকট আর্তনাদ করে পালিয়ে গেল যে, সরোজ নিজেকে অনিষ্টকারী অশরীরী আত্মার মত স্বেচ্ছাচারী মনে করে কেমন উৎফুল্ল হয়ে উঠল যেন।

নিজের পাড়ার গলি ছেড়ে বড় রাস্তায় পড়েও সে জানত না কোথায় যাবে অথবা জানার ব্যাপারটাই অবিচার্য। তারপর তাকে একটা নির্দিষ্ট দিকে কে যেন তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। পাড়া ছেড়ে সে বাইরের রাস্তায় এল। বাইরের রাস্তা থেকে বড় রাস্তায়। নির্জন বড় রাস্তার মাঝখান দিয়ে একা হাঁটতে হাঁটতে সে আতঙ্কের রোমের মত বাতাসের শব্দ শুনতে লাগল। বাতাসের মধ্যে যেন যন্ত্রণার বায়বীয়

রেণু মেশানো। সেই যন্ত্রণা গড়িয়ে, ছড়িয়ে অজস্র ঝরা পাতার মর্মর শব্দের মধ্যে, মরুভূমির মতো খাঁ-খাঁ চাঁদের আলোর মধ্যে গুমরে মরতে লাগল।

সরোজ বড় রাস্তা ধরে অচেনা গলির মধ্যে ঢুকল। বহুকালের পুরানো নদীর ঘাট, বাস-ট্রাক-ট্যাংক-কামান-স্বয়ংক্রিয় যুদ্ধমেশিন যার প্রাণবায়ু প্রায় হরণ করে নিয়েছে, তাকে যেন ডেকে নিয়ে যাচ্ছিল। যেন অদৃশ্য সুতোয় টানে সে নদীর ঘাটেই এসে দাঁড়াল।

নদীর ঘাটের বটগাছটি বহুবিস্তৃত। দু তিনখানা নৌকা বাঁধা আছে ঘাটের এদিকে-সেদিকে। হাওয়াকে আড়াল করে রাখা সন্তর্পণ আলো। একটি দুটি দোকানের ভিতরে কালিপড়া হারিকেন ল্যাম্প। ভাজার দোকান। চোঁয়ানি মদের গন্ধ। ছোটখাটোর জটলা এখানে ওখানে এবং গুঞ্জন। মাতালের প্রলাপ এবং খুব কাছেই কোথা শহরের হিন্দুস্থানীদের একত্র সঙ্গীত চর্চার হুল্লোড়। নদীর বাঁধ ধরে দরমার, মাটির কিংবা খড়ের ঘর। ঘরগুলো নদীর বাঁধের টানে জমাট বাঁধা এবং মাঝেমধ্যেই গলি ধরে ঢুকে গেছে শহরের ভিতর দিকে। সেইসব ভিতর দিক থেকে 'পলাতক' কিংবা 'বালিকা বধু', 'গঙ্গাযমুনা' বা উত্তম-সুচিত্রার কোনো ছবির গানের অসংস্কৃত টুকরো ভেসে আসছে কখনো কখনো।

অত্যন্ত সস্তা রঙীন জামাকাপড় পরা সস্তা বেশ্যাদের দু-চারজন নদীর বাঁধের উপরেই ঘোরাফেরা করছে গ্রাহকের আশায়। তাদের চেহারা জীর্ণ, বুক এবং নিতম্বের ভেজাল স্ফীতি দেখলেই বোঝা যায়। হাতের লম্ফের আলোয় তাদের ঠোঁটের রঙ মার্কারিক্রোম লাগানো ঘায়ের মত বমি উদ্রেককারী হলেও সেইসব রমনীদের আহ্বান প্রেতলোকের রমনীদের মত অপ্রতিরোধ্য। গরিব শহরবাসীর বেশ্যারা শুধু যে অসম্ভব গরিব তাই নয়, তাদের রূপ-সৌন্দর্য-স্বাস্থ্য এবং যাবতীয় আয়োজনই গরিব। কিন্তু তাতে প্রমোদের মত্ততা কম নয়।

বৈশাখে অগভীর নদীর ক্ষীণ হয়ে আসা ধারাও বাতাসে আন্দোলিত হচ্ছে। তার উপরে কয়েকখানা জেলে নৌকা অনবরত দুলেই যাচ্ছে। ওপাড়ের বালিয়াড়ি ছাড়িয়ে গাছপালা বাড়িঘর সবই ছায়াচ্ছন্ন। কিন্তু নদীর বিস্তার জুড়ে শূণ্যচর, নদী জুড়ে বিধ্বংসী চাঁদের আলো খাঁ খাঁ করছে। মনে হচ্ছে চাঁদের ভিতর থেকে সাদা এসিডের গুঁড়ো ঝরে পড়ছে। মানুষের অন্তরাত্মা পুড়িয়ে খাক করে দেবে এই চাঁদের আলো। বাঁধের উপরে দাঁড়িয়ে সরোজের মনে হল অন্তত পাঁচশো বছর আগের এক দরিদ্র জনপদের মৃত কামনা বাসনারা এই এসিডবর্ষী চাঁদের আলোয় প্রাণ পেয়ে জেগে উঠেছে। কাছে দূরে যারা নড়ছে-চরছে, চলছে-ফিরছে, কথা বলছে-গান গাইছে, তারা প্রকৃত মানুষ হতে পারে, আবার নাও হতে পারে। তারা ছায়াও হতে পারে। হতে পারে দেহী এবং তা সত্ত্বেও প্রাক্তন।

এর ভিতরে সে নিজেও একজন। বাঁধের উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে সে গন্তব্য স্থির

করার আগেই পাশের ছায়াচ্ছন্ন আড়াল থেকে একটি ছায়া এগিয়ে এসে তার পাশে দাঁড়াল।

আসেন ইনচারবাবু।

সরোজ দেখল সেই স্বপ্নাতুর, স্বপ্নের কারিগর বনমালী ঘোষ।

— খুব ঝাওয়ালের রাত আজ। সরোজ বলল।

— খুবই ঝাওয়াল। বৈশাখী ঝাওয়াল। তাবাদে কাক-কোকিল-ডাকা চাঁদনি। চলেন হামার সাথ।

— চলুন।

বাঁধ থেকে নীচে নেমে একটি গলির দিকে এগোতে সরোজের একবার হঠাৎ মনে হল এখন কেউ গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠুক। এই নিয়তির রাস্তার উপরে আড়াআড়ি এসে কেউ চার রাস্তা আটকে দাঁড়াক। দাঁড়িয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে তির্যক দৃঢ়তায় তাকিয়ে থাকুক তার চোখের দিকে। কিন্তু সেসব কিছুই হল না।

বাঁ দিকের একটি গলিতে ঢুকে বনমালী তাকে নিয়ে একটা দরমার বেড়া তৈরি ঘরে এনে তুলল। ঘরটা বসবার বা গ্রাহক আপ্যায়ন করার ঘরের মতো। ঘরটার পিছন দিক দিয়ে ভিতরে যাওয়ার বা বেরিয়ে যাওয়ার দরজা আছে। সে দরজা খোলা এবং সেখানে একটা উঠানের মতো জায়গায় চাঁদের আলো পড়েছে। ঘরটার একদিকে একটা ছোট তক্তপোষ এবং অন্যদিকে খানদুয়েক বিবর্ণ হাতল ছাড়া চেয়ার আছে।

— বসেন ইনচারবাবু।

বনমালী ভিতর দিকের আগলের কাছে যেতেই একজন প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক ভিতরদিক থেকে ঘরে এসে ঢুকল এবং বনমালীকে দেখে একগাল হেসে বলল, ও, বিয়াই? আসিছ?

বনমালী বলল, ইনচারবাবুকে বাল মেয়া দেখাও। কইল কেতার লোক— দেখো তোমার নিন্দা না হয়।

সরোজ চেয়ারের উপরে স্থির হয়ে বসে থাকল। দেয়ালে বোম্বাই সিনেমার নায়িকা সাধনার একখানা চোখ-মারা ছবি বেশ বড়সড়। তার পাশেই ক্যালেণ্ডারে বস্ত্রহরণের বৃন্দাবনলীলা। বাইরের দিকের খোলা দরজা দিয়ে বাতাসের একটা প্রলম্বিত ঢেউ ছবি দুখানাকে কাঁপিয়ে দিয়ে যেতে স্ত্রীলোকটি উঠে দরজার আগল খানিকটা ঠেলে দিল। বলল, এংকা মেয়া দেখামো যে কইলকেতার মেয়াদের কান কাইটে দিবে, বিয়াই।

সে ভিতরের দরজার মুখে দাঁড়িয়ে কাকে ডাক দিয়ে কি যেন বলল।

সরোজের চারপাশের উতল হাওয়া হঠাৎ যেন বন্ধ হয়ে গেল। সে জামার ভিতরে ঘামতে শুরু করল। এ কোথায় এসেছে?

চারজন বিভিন্ন বয়সের বেশ্যা কলরব করতে করতে ঘরে ঢুকে পড়ে একদিকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

দেখেন ইনচারবাবু, হামার বিয়ানের মেয়েরা খুবেই সরেস। মুখে চুলে কু-বাস নেই। বাবুঘরের মেয়াদের মত পোস্কার। গতরও চনমনা— পিছল—

এতগুলো বিশেষণ শুনে সরোজ ভালো করে তাকিয়ে দেখল তাদের। দুজনের বয়স না হলেও চল্লিশ ছুঁয়েছে। পৃথুলা, বৃহৎ-স্তনী। বৃহৎ নিতম্বী, মনে হয়, দুজনে সহোদরা। একই রকম মুখের গড়ন, দেহের ঢক। তার অস্বস্তি অধিকতর হল। সে মুখ ঘুরিয়ে নিতে বাঁদিকের দেয়ালে দরমার জাফরি কাটা একটা জানালার ফোকরে চোখ পড়ল তার। জানালার ফোকড়ের উপরে ভিতর দিকে একটুকরো পর্দা টাঙানো। সেদিকে তাকাতেই তার মনে হল আঙুল দিয়ে পর্দা তুলে বাইরের দিকে দাঁড়িয়ে কেউ তাকে দেখছিল। সে তাকাতেই পর্দা ছেড়ে দিয়ে আড়াল হয়ে গেল কেউ।

ভিতরে চোখ ঘুরিয়ে সরোজ অন্য দুজন বেশ্যার দিকে তাকাল। তাদের একজন জীর্ণ চেহারার, নিশ্চিত দীর্ঘকাল ধরে যক্ষ্মা অথবা অনুরূপ কোনো রোগ পুষে রাখার লক্ষণ তার শরীরে। অন্য স্ত্রীলোকটি বেঁটে, বেঢপ, কুৎসিত। তাদের দুজনের বয়সই বছর ত্রিশের ভিতরে।

সরোজ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বনমালীকে বলল, চল সরকার, আমার এখানে ভালো লাগছে না।

এই কটা কথা বলতেই তার ভয় এবং সংকোচে গলা রুদ্ধ হয়ে এল। তার চারপাশের দরমার দেয়াল ভেঙে পড়ার মত বাতাসের চাপের মধ্যে এমন মনে হল তার। যে সমস্ত পরাজয়ে মানুষের সমস্ত চৈতন্য অপমানিত হয় এবং বাকি থাকে প্রাণভিক্ষা চাওয়ার মত অধঃপতন, সরোজের মানসিক অবস্থা তেমনি। সে তার স্থান থেকে এক পা এগোবার চেষ্টা করতেই বনমালীর বেয়ান বাইরের দিকের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। সরোজের চোখের উপর সরাসরি চোখ রাখল সে। তারপর তার মেয়েদের বলল, যা তোরা। আনোয়ারা আর সরস্বতীকে পাঠায়ে দে। সরোজকে বলল, মেয়া পসন্দ না হলে মাসীর দুন্নাম। তাই কি আমি হওয়া দিবা পারো? বসো বাবু তুমার পসন্দের মেয়া দেখাই।

সরোজ অনেক কষ্ট করে বলল, ননা, তা ন্নয়— শরীর ঠিক লাগছে না—

কয়েক হাজার বছরের অভিজ্ঞতা বনমালীর বেয়ানের চোখেমুখে। কয়েক হাজার বছর ধরে সে সরোজের জন্য অপেক্ষা করে আছে। এত সহজে কি সে চলে যেতে পারে? তবুও গোঙানো গলায় সে বলল, সরকার চল।

বনমালী বলল, বেয়ান, ইনচারবাবুর কটি মেয়া চাই, কইলকেত্তার বাবু তো— তা বাদে বৈশাখী ঝাওয়ালে—

পিছনের অর্গল ঠেলে দুটি মেয়ে ঘরে ঢুকল। তাদের মধ্যে কে আশেয়ারা, কে

সরস্বতী তা বুঝতে অসুবিধা হল না সরোজের। সরস্বতী নেপালী, রাজবংশী, কোচ, রাভা কিংবা অন্য যে কোনো মঙ্গোল গোষ্ঠীর মেয়ে, তা তার চেহারাতেই প্রমাণ। উজ্জ্বল হলদে রঙ, ছিপছিপে, পরিচ্ছন্ন, হতেও পারে সদ্য কৈশোর উত্তীর্ণা। মেয়েটির বুক অনুচ্চ হলেও, তার শরীরে স্বাভাবিক লাস্য প্রচুর। তার ঠোঁট দুটি যেন নিপীড়িত হবার জন্য উন্মুখ। সরোজ দ্বিতীয় মেয়েটির দিকে ফিরেও তাকাল না।

সরস্বতী এগিয়ে এসে তার হাত ধরল। বলল, আসো বাবু। মাসীর বাড়ি কি কেউ ফিরা যাবার তরকে আসে?

পা বাড়াবার আগে কেউ যেন সরোজের মাথাটা দরমার গায়ের জাফারি জানালাটার দিকে ঘুরিয়ে দিল। একটি স্ত্রীলোকের মুখ সেখান থেকে চকিতে সরে গেল। কিন্তু এবার যেন এক লহমার জন্য সে দেখলও তাকে। ভীষণ পরিচিত মুখ। কে হতে পারে সে?

সতী? হেনা?

যার বিছানায় তার পুরো শৈশব এবং কৈশোরের প্রান্ত পর্যন্ত কেটেছে, সে কি সেই নলিনী? নলিনীবর্ণিত সোনাবিবি, আউলাকেশী, সতী পারুলবালা, পাতকিনী সরলা, পাপিয়সী শশিমনিদের কেউ?

সে কি তার মা হতে পারে?

সুখ আর সুখের সিঁড়ি

মলয় দাশগুপ্ত

নিউজার্সি থেকে শুভমের ফোন আসে, 'বাবা, মাকে দাও।' মা সুষমা কাছেই ছিল, হাত বাড়িয়ে তাকে ফোনটা তুলে দিয়ে চিত্তব্রত সুষমার কথা দিয়ে মা-ছেলের সংলাপ বোঝার চেষ্টা করে। এই চেষ্টা এবং কথাবার্তা অনুধাবনের ফাঁকেই একটি ক্ষোভের অনুভূতি যে তাকে আচ্ছন্ন করতে চাইছে তাও সে লক্ষ্য না করে পারে না। আমেরিকা থেকে প্রথম ফোন শুভমের, যার জন্য মা-বাবা দু'জনই উদ্‌গ্রীব ছিল, তা রিসিভ করেও একটা কথাও বলতে পারল না সে ছেলের সঙ্গে। প্রথম ফোনের প্রথম কথা, 'বাবা, মাকে দাও।'

তা সে প্রথম প্রাপ্তিরই অনুভব ছিল। সুষমা মধ্যরাত্রের অলসতায় চোখ বুজে থাকতে থাকতে হঠাৎই বলে উঠেছিল, 'দ্যাখো, দ্যাখো, কেমন দাপাদাপি করছে।'

চিত্তব্রত ঠিক বুঝতে পারেনি। বিছানার বেশির ভাগটা দখল করে ছিল সুষমা। হাত-পা ছড়িয়ে শোয়াটা ওর দরকার। সুষমা যখন, 'দ্যাখো, দ্যাখো' বলে চেঁচিয়ে উঠেছিল তখন সে একটু তন্দ্রায় ছিল। আচ্ছন্নতা কাটিয়ে সুষমার কাছে গিয়ে উদ্বেগে তাকিয়ে রইল তার দিকেই। ঘরে কম পাওয়ারের একটা আলো ছিল, ঘরে অল্প দামের মশারি ছিল, ফলে আলো-ছায়ার একটা মায়া ছিল। চিত্তকে ঘনিষ্ঠ হতে দেখে কি সুষমা সামান্য লজ্জা পেয়েছিল? তবু ওর হাতটা নিজের পেটের ওপর টেনে এনে বলেছিল, 'দ্যাখো কেমন নড়ছে, নির্ঘাৎ একটা দস্যি ছেলে আসছে।'

বউ-এর স্ফীত উদরে, গর্ভের গোপন রহস্যে কান পেতে সেদিন চিত্তব্রত শুভমের আগমনবার্তা শুনতে চেয়েছিল। কিন্তু তেমন কিছু ঠাহর করতে না করতেই সুষমা স্মিত হেসে বলেছিল, 'এই যাঃ, আবার ঠিক হয়ে গিয়েছে।' মা হতে যাওয়ার তৃপ্তি, ব্রীড়া সেই আলোছায়াময় রাতের পরিবেশে চিত্তব্রতকে মুগ্ধ করেছিল, সুষমার গর্ভের গভীরে ঢোকার একটা বাসনা অদম্য হয়ে উঠেছিল।

চিত্তব্রত শুনছে সুষমা বলছে, 'সে কিরে তোর এ্যাতো ভাল লেগে গেল?' 'তুলনাই হয় না, কী বললি, লিভিং কণ্ডিশনের তুলনাই হয় না?' 'স্ত্রী কি একাই বাড়িতে থাকে? একটু 'বোর' করে?' 'এ্যাঁ, কাজ ছাড়া কিছু বোঝে না? তাতো হবেই, নইলে এত উন্নতি করতে পারে? দেখিস বাবা সাবধানে থাকিস।' 'চিঠি দিতে বলছিস? দেব। হ্যাঁ বাবা এখন ভাল আছে। দেবো?'

চিত্তব্রতর হাতে ফোন দিয়ে সুষমা বলে, 'ওর নাকি দারুণ লাগছে।' ফোনে শুভম্ বলে, 'একটু সেট্‌ল হয়ে নিই, তারপর তোমাদের নিয়ে অসব। আরে রোগটোগ কোনো ব্যাপার না। বাবা, এটা একেবারেই অন্য একটা দেশ, য়ু ক্যানট্ ইভেন ইম্যাজিন ইন্ ইওর ড্রিম।'

এক

চিত্তব্রতর ডাক নাম ছিল ধলা। বাবা গান্ধীজীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন, তাই ব্রিটিশরাজের কালেক্টরেটের বড় চাকরি এক কথায় ছেড়ে দিয়ে অক্ষরিক অর্থেই কোদাল নিয়ে নেমে পড়েছিলেন কৃষিকাজে। দেশের বাড়িতে যা কিছু জমিজমা ছিল তাতে ফসল ফলিয়েই চলে যেত কষ্টেসৃষ্টে। মা নিজের হাতে চরকায় সুতো কাটত, মোটা খদ্দরের শাড়ি পরত। বাবার জন্যই কি মার এই কৃচ্ছ্রসাধন ছিল? নাকি মায়েরও নিজস্ব একটা আদর্শ-চেতনা ছিল? চিত্তব্রত ওরফে ধলা এ কথার উত্তর পায়নি। মা মারা গিয়েছিল তার উত্তীর্ণ কৈশোরে। যে সময়টায় মাকে বেশি দরকার, সে সময়েই সে মাতৃহারা হয়েছিল।

বাবার সঙ্গে ছেলের দূরত্ব ছিল মানসিক দিক দিয়েই। বাবা তাঁর নিজের জন্য একমাত্র জগৎ তৈরি করে নিয়েছিলেন। বাবা নিজেকে গান্ধীজীরই ছোট সংস্করণ মনে করতেন। তাই আজীবন দু'টি জিনিসকে আঁকড়ে ছিলেন, এক হাতে কাটা সুতোয় তৈরি পরিধেয়, আর সত্যের প্রতি অন্ধ অনুরাগ। যে অনুরাগ ক্রমশ দেশপ্রেমের চেয়েও বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল তার কাছে। আর এ জন্যই দেশভাগ এবং দেশত্যাগের ঘটনা অন্য পাঁচজন বাস্তুহারার মত তার মনে বিক্ষোভের সৃষ্টি করেনি। জীবনের অনিবার্যতা ভেবে নিয়ে বাবাও দেশত্যাগ করেছিলেন। চিত্তব্রতর তখন বারো বছর বয়স, জন্ম ভিটা ও বাল্যের মনোহর প্রকৃতি ছেড়ে, উড়ে বেড়ানো ঘুরে বেড়ানো দুপুরকে চোখের জলে বিদায় জানিয়ে মা-বাবার হাত ধরে স্টেশনের শান বাঁধানো চত্বরে বসে দাক্ষিণ্যের খিচুড়ি খেতে একটুও ভাল লাগেনি। বালকের ক্ষোভ জমতে জমতে ধিক্কারের রূপ নিয়েছিল। শিশু বয়সে পড়া ছড়ার পংক্তি, 'কবে হবে দেশের স্বাধীন, ভাত-কাপড় আর গয়না/ময়না আমার ময়না কেবল বলে দিনে রাতে, যাতনা আর সয় না।' এরই মধ্যে নিরর্থক হয়ে গিয়েছে তার কাছে।

বাঁচো কিম্বা মরো, এই অবস্থায় দাঁড়িয়েও বাবা কীভাবে যে শান্ত থাকতে পেরেছেন তা পরবর্তীকালেও বিস্ময় ছিল চিত্তব্রতর কাছে। কিন্তু দেশভাগের এই চরম পরীক্ষা যে তাকে বিহ্বল ও সংসারী করে তুলেছিল, একটু বড় হয়েই চিত্ত তা বুঝতে পেরেছে। বাবার সংশয়ের একটা রূপ ছিল রিফিউজি কলোনিতে আশ্রয়

নেওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে। শিয়ালদহ স্টেশনে তাঁবুর নিচে মাথা গুঁজে থাকার সময়ও বাবার মনোভাবের কোনো বহিঃপ্রকাশ ছিলনা। যে দেশে গান্ধীজীর মত মানুষ নিহত হন সে দেশে লক্ষ লক্ষ মানুষ যে এরকমই মৃতপ্রায় হয়ে থাকবে তা যেন ভবিতব্যই। বাবা অসীম ধৈর্যে এই বাস্তবতাকে মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু শিয়ালদহে উদ্বাস্তুর চাপ যখন ক্রমশ বাড়তে থাকে, যখন মানুষের জীবনধারণের মান একেবারে তলানীতে এসে ঠেকে তখন অনেকের কাছ থেকেই প্রস্তাব আসে ট্রেনে চেপে রেল লাইনের দু'পাশে বিস্তীর্ণ জলজঙ্গলে বসতি গড়তে হবে।

সেদিন বোধহয় আত্ম-দংশনে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছিলেন বাবা। ঐ একদিনই দু'চোখ বেয়ে জল নেমে এসেছিল। জবর দখল করার মধ্যে যে পেশী শক্তির প্রয়োগ আছে তাকে মনে মনে কিছুতেই মানতে পারছিলেন না, দেশ যখন বাসস্থানের ব্যবস্থাই করতে পারল না তখন বৌ-ছেলেমেয়ে নিয়ে তিলে তিলে নিঃশেষ হয়ে যাওয়াটাই তো ভাল। মহাত্মাজী যখন প্রাণ দিতে পারলেন তখন আমিই বা পারব না কেন? এমন একটা প্রশ্ন তাঁর মনকে আলোড়িত করেছিল। তবু হারতে হয়েছিল তাঁকে। সত্যাগ্রহে নয়, একটু মাথা গোঁজার সন্ধানে বেরিয়ে পড়তে হয়েছিল দলবদ্ধ জনতার সঙ্গে। এই একবারই যূথের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন বাবা। দুঃখে বা অভিমানে দু'চোখ বেয়ে জল নেমে এসেছিল সেদিন।

দুই

সুষমা বলল, 'নীপুকে বড় দেখতে ইচ্ছে করে। কতদিন দেখিনা মেয়েটাকে।'

চিত্তব্রত দাড়ি কামাচ্ছিল। এখনও নিজের হাতেই দাড়ি কামায়, তবে এখন ইলেক্‌ট্রিকে চলা রেজর অনেক মেহনত বাঁচায়, চামড়াকে চকচকে করে যুবক বয়সের মতই। গালের একটা দিক ছেড়ে অন্য দিকে চলেছে ক্ষুর। চিত্তব্রত অন্যমনা হবে না, দুধের মত ফেনায় ডুব সাঁতার দেয়া ক্ষুরধার যন্ত্রটিকে আয়নার মধ্যে দেখবে শুধু। সুষমার কথায় কান না দিয়ে নির্লিপ্ত দাড়ির দিকেই তাকিয়ে থাকে।

সুষমা কি অপমানিত বোধ করে? নইলে চেঁচিয়ে কথা বলবে কেন?

'শুনেছ কী বলেছি?' আজকাল একটুতেই অসহিষ্ণু হয়ে পড়ে সুষমা।

'হ্যাঁ এবার বল।' ক্ষুর থেকে চোখ ফিরিয়ে বলে চিত্তব্রত।

'বেশ তো বাবুটি সেজেছো। বয়স যে বাড়ে সে খেয়াল আছে?'

'তোমার বয়স কি কমে নাকি?' কথাটা একটু তেরচাই ঠেকে।

'কমবে কেনো? তুমি চাপতে চাও, আমি চাই না।' সোজা জবাব সুষমার।

চিত্তব্রত জানে কোন দিকে কথার জল গড়াচ্ছে। সে মাথার চুল ডাই করে, সপ্তাহে দু'দিন বাড়িতে লোক ডাকিয়ে ম্যাসাজ করায়। সুষমার কোনওটারই দরকার

হয় না, আশ্চর্য রকমের সুস্থ কালো চুল ওর, ডাই করতে হলে শাদা রং লাগাতে হবে। আর বাস্তবিকই তন্বী সে আজও। একটু সমান্য ফ্রি-হ্যাণ্ড করেই পেটে চর্বি জমাকে রুখে দিয়েছে, নিতম্বের স্ফীতি তো একেবারেই নেই। এতএব সেই এক ঘ্যাজর ঘ্যাজর সামাল দেবার মানসে চিত্ত বলে, 'কী বলছিলে বল না।' একেবারে শান্ত তার গলা।

সুষমা তার আগের কথা বলে না আর। মেয়েটার জন্য মন কেমন করার বিষাদ ভাগ করে নিতে চেয়েছিল সে। এখন চিত্তব্রতর উদাসীনতা দেখে সে বুঝতে পারে, সব অনুভূতি ভাগ হয় না। কিছু কিছু আছে যা নিজের জন্যই সঞ্চিত থাকে। মেয়ের জন্য মন খারাপ করাটা সেই কিছু কিছুর মধ্যেই থাক না। বরং সে মল্লিকার কথা পাড়ে, ন'মাসির মেয়ে মল্লিকার শ্বশুরের কথা, 'অবনীবাবু মারা গেছেন দেখেছো?'

চিত্তব্রত হাঁ করে থাকে। অবনীবাবুর মৃত্যু সংবাদ তারা দু'জনে একই সঙ্গে তো কাল টি.ভি-তে দেখল। এর মধ্যেই কি তা ভুলে গেছে সুষমা? না কি কথার জন্যে কথা বলছে ও? একসময় তরুণ দম্পতির একটা খেলা ছিল কথার পিঠে কথা সাজিয়ে চলার। খেলাটায় মজা ছিল, কথা যখনই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ত বা দু'জনের একজনেরও অজানা চরিত্র বা ঘটনা ঢুকে পড়ত তবেই অন্যজন পয়েন্ট পেয়ে যেত। মজার খেলায় চিত্তব্রত সব সময়েই সিরিয়াস থাকত, সুষমা ইচ্ছে করে গুলিয়ে দিত সবকিছু। দিয়ে দুলে দুলে হাসত। এই বুড়ো বয়সে সেই খেলা শুরু করার কোনো অর্থই হয় না।

চিত্তব্রত বলে, 'দু'জনে একসঙ্গেই তো দেখলাম।'

'তা না, 'ওবিচুরি'-টা পড়েছো আজকের কাগজে?'

'না, কাগজ পড়ার সুযোগ পেলাম কোথায়? তুমি মুখস্থ করে ছাড়লে তবে তো 'আমি।'

মিথ্যে বলেনি চিত্তব্রত। সুষমা খবরের কাগজটা পড়ে, আর বেশ খুঁটিয়েই পড়ে। তাই মেনে নেয় অভিযোগ, 'ভালই লিখেছে। স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নেওয়ার কথা, পরে সামাজিক কাজকর্মের কথা। কিন্তু শেষে একটু খোঁচা দিতেও ছাড়েনি। এই শোন, পড়ছি, শেষ জীবনে বড় নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছিলেন। ছিয়াশি বছরের বৃদ্ধকে বৃদ্ধাশ্রমে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে হল।'

মল্লিকার শ্বশুর বলেই কথাটা যেন বেশি বেশি লাগে। ঠিকই তো, ছেলে ছেলের বৌ আরামসে জীবন কাটাচ্ছে আর বুড়ো শ্বশুর বৃদ্ধাশ্রমে মরছে, এর অন্তর্গত বিপন্নতা এখনও আহত করে মনকে। অবনীবাবুর বৃদ্ধাশ্রমে থাকার ব্যাপারে মল্লিকাকেই সবাই দুষেছে। মল্লিকার স্বামী অরূপকে বলেছে, বেচারা। স্ত্রৈণ হওয়াটাই একমাত্র দোষ নাকি তার। সামাজিক মানুষের এই প্রশ্রয়ের মনোভাবকে

কেমন অদ্ভুত মনে হয় চিত্তব্রতর। শ্বশুর, যে বৃদ্ধাশ্রমে গিয়ে থেকেছে, একমাত্র সু-উপায়ী ছেলে যে তাকে নিজের কাছে রাখেনি, তার দায় কেন তারই ওপর পড়বে না? তাকে স্লো বলে মজা করে উড়িয়ে দেওয়া তো মল্লিকা সম্পর্কে আরো বেশি দোষারোপেরই সামিল।

'অবনীবাবু বাড়িতে থাকলে ওদের অসুবিধা তো হতই।' সুষমা প্রসঙ্গ ছাড়তে চায় না।

'হ্যাঁ, অসুবিধা না থাকলে বুড়ো বাপকে কেউ—'

'ছাড়ো ছাড়ো।' আবার অসহিষ্ণু সুষমার কণ্ঠ, 'সুখের সংজ্ঞা আজ বদলে গেছে। নিজের সুখের জন্য বাপকেও ছেড়ে দেয় মানুষ।'

'কিসের সুখ? সুখ কাকে বলে বলতো?'

সুষমা মুখ ঘুরিয়ে বসে বলে, 'জানি না'।

সুষমার এই 'জানি না' সব কিছু থামিয়ে দিতে পারত। কিন্তু থামে না। ফোন বেজে ওঠে তীব্র তীক্ষ্ণতায়। রিসিভার কানে লাগায় চিত্তব্রতই। ওপার থেকে ঝাঁঝালো স্বর, 'চিত্ত, তুমি দেখেছ অবনীদার মৃত্যুর সংবাদটা?'

'হ্যাঁ, কাল টি.ভি-তেও দেখিয়েছে।'

'উনি, উনি নাকি নিঃসঙ্গ হয়ে বৃদ্ধাশ্রমেই মারা গেছেন। এ কথা কি সত্যি?'

'হ্যাঁ, তা তো—' তোতলায় চিত্তব্রত।

'আমি, আমিই ওঁকে ফ্ল্যাটটা করে দিয়েছিলাম। বেশ বড় ফ্ল্যাট ছিল বলে অবনীদা খুব কিন্তু কিন্তু করছিলেন। খুব লজ্জা পাচ্ছিলেন।' একটু থামে ওপাশের কণ্ঠ।

চিত্তব্রত কথা কয় না। জানে এখানেই শেষ হবে না কথা, কোন খেই ধরার জন্য সাময়িক স্তব্ধতা।

'আমি তখন এম.এল.এ হিসেবে ফ্ল্যাট করে দিয়েছিলাম বিপ্লবী অবনী চৌধুরীকে। আর মৃত্যুর সময়ে তাঁকে এইভাবে একা বার্ধক্যকে সঙ্গী করে চলে যেতে হবে? ওঁর একটা ছেলে আছে না?'

'ছেলে আছে, ছেলের বৌ আর নাতি,..ভর ভরন্ত সংসার অবনীদার।'

ওপাশে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে। ক্রোধ কি জল হয়ে ওপারের কণ্ঠকে স্তব্ধ করে দেয়?

চার

সারা আকাশ কালো করে মেঘ জমেছে। চরাচর অন্ধকার ছেয়ে গেছে সব কিছু। উন্মত্ত সমুদ্রের গর্জনও এখন অচেনা লাগছে। দীঘার সমুদ্র পাড়ে বেড়াতে

আসার সিজন নয়। আর সিজন নয় বলেই উন্মাদ সমুদ্র আর ঝড়কে দেখার জন্য এখানটাই বেছে নিয়েছিল চিত্তব্রত। ঠিক হানিমুন নয়, বিয়ের ছ'মাস বাদে প্রথম আউটিং-এ আসা। জানালার কাঁচের ওপরে ঝরঝরিয়ে বর্ষাধারা এসে আঘাত করে। চিত্তকে দু বাহুতে জড়িয়ে ধরে সুষমা চোখ বুজে থাকে, চোখ না খুলেই বর্ষার আমেজ পুরোপুরি বোঝে সে। চিত্তর হাত, চিত্তর ওষ্ঠ আজ লোভী নয়। সমুদ্র আর বর্ষা, মেঘের গভীর গম্ভীর আঁধার সারা শরীর জুড়ে অবসন্ন ভাললাগার অনুভূতি দেয়। সুষমার শরীরকে অসম্ভব হালকা আর নরম মনে হয়। চিত্তব্রত বুঝতে পারে, মন দেহকে ভাষা যোগায়। সুষমা সমর্পিত দেহ সমর্পিত মনের বিম্ব মাত্র। নিশ্চিন্ত এবং সমর্পিত। সুষমার চুলের মধ্যে হাত চালাতে চালাতে অকস্মাৎ চিত্তব্রত অসাড় হয়ে পড়ে। কেঁপে যায় মন, আর সেই কম্পন তাকে আশ্রয়হীনতার অসহায়ত্ব দেয়। সুষমার চুলের মধ্যে মুখ গুঁজে কান্না ঢাকতে চায় সে।

বিজলীকে চুমু খেয়ে চিত্তব্রত একদিন কথা দিয়েছিল, 'তুমি ছাড়া মোর এ জীবনে কেহ নাই, কিছু নাই গো।'

বিজলির সারা মুখ আবিরের মত লাল হয়ে গিয়েছিল। বিজলির চোখ তিরতির করে কাঁপছিল, পরম নির্ভরতায় সে প্রথম পুরুষের প্রথম চুম্বনকে গোপনে সঞ্চিত রেখেছিল।

সুষমার চুলের মধ্যে মুখ গুঁজে কান্না ঢাকতে ঢাকতে চিত্তব্রত বিজলিকেই ভুলতে চায়। কিছুর মধ্যে কিছুনা এক পিঠ চুলের সাম্যের মধ্যে আর একজনকে এইভাবে খুঁজে পাওয়ার কোনো মানে হয়?

বিজলির উপাখ্যান চিত্তব্রত সুষমাকে জানাতে পারে নি। কতকিছু ভেঙে যাবার শঙ্কা সব সময়ই তাকে ভীত করেছে। দু'জনের জীবনে যেন একটা কাঁচের দেয়াল রয়ে গিয়েছে, আঘাত লাগলেই ঝন্‌ঝন্ করে ভেঙে পড়বে তা। চিত্তব্রত অনেক একাকী ক্ষণে সেই কাঁচ ভাঙার শব্দ শুনেছে শঙ্কিত হয়ে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেয়ালটা অটুটই রয়েছে।

কেবল বাবার হাতে একটি থাপ্পর খেয়েছিল চিত্তব্রত ওই বিজলী প্রসঙ্গে। সুষমার মা-বাবা বাবার সঙ্গে কথা বলে যাবার পর বাবা তার ঘরে ডেকে পাঠিয়েছিল চিত্তব্রতকে। বাবার ডাক আর তার তীব্র সন্ধানী চোখ বিবশ করে দিয়েছিল তাকে। বাবার সামনে দাঁড়াতে পারছিল না সে। তবু দাঁড়াতে তো হয়। বাবা কোনো ভনিতা করেনি, স্পষ্ট তার উচ্চারণ, 'সুষমার সঙ্গে তোমার পরিচয় কত দিনের?'

চিত্তব্রত মাথা নিচু করেই বলেছিল, 'দু' বছর। দু বছরই হবে।'

'বিজলীর সঙ্গে?' আরো নির্দিষ্ট, আরো স্পষ্ট কথা।

'মানে, বিজলিকে তো আমি সেভাবে দেখি না। ওকে তো আমি' কথা শেষ

হতে পারে নি, সজোরে গালের ওপর চড়। গালের ব্যথার চেয়েও মনে লেগেছিল বেশি। যে বাবা কোনোদিন কড়া কথা পর্যন্ত বলেন নি। বলপ্রয়োগকে যিনি বাস্তবিকই অধর্ম বলে মনে করেন, সেই বাবার হাতের থাপ্পর চিত্তব্রতকে ব্যথিত করেছিল; বিহ্বল করেছিল। বেদনা আর ক্ষোভের সে মুহূর্তে সে শুনেছিল বাবার কথা, 'সত্যকে স্বীকার করার সাহস নেই কেন তোমার। তুমি জানো, আমি মিথ্যাকে সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করি, আর সেই মিথ্যাকেই সত্য বলে চালাতে চাইছ তুমি?'

বাবা আর-একটি কথাও বলেন নি। চিত্তও অপরাধবোধে মগ্ন হয়ে ছিল। কিন্তু চিত্ত তো আর তার বাবা নয়, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নিজের পক্ষে যুক্তি সাজাতে দ্বিধা করেনি সে। বিজলির বাবা ছিল না, বিধবা মায়ের মেয়ে সে। বিজলির বোনের সংখ্যা চার, ভাইয়ের সংখ্যা তিন। চিত্তব্রতর মনে সবসময় একটা চাপ ছিল, ওই আটটি প্রাণীর গ্রাসাচ্ছাদনের চিন্তার চাপ। বিজলিকে ভালবাসায় খাদ না থাকলেও ওর সংসারের অবস্থা ওকে বিমর্ষ করে রাখত।

সেখান থেকে পালাবার জন্যই সুষমাকে চাওয়া। ওর বিদূষী মনের মধ্যে, ওর বাবার বংশপরিচয়ের মধ্যে চিত্তব্রত ভবিষ্যতের সুখকে দেখতে পেয়েছিল। চিত্তব্রতর সত্য এটাই। চিত্তব্রতর সত্যের সঙ্গে বাবার সত্যের কোনো মিল ছিল না, মিল সম্ভবও নয়। বাবা ঋষি হতে পারেন, কিন্তু রক্তমাংসের মানুষ হতে গেলে ঋষিত্বকে বর্জন করতেই হবে। চিত্তব্রত নিজেকে আর পাঁচটা মানুষেরই একজন বলে মনে করে তাদেরই মত বাস্তব সর্বস্ব হতে চাইল। সুষমাকেই বিয়ে করল সে।

এইভাবে একটি বৃদ্ধ শেষজীবনে বেঁচে রইলেন নিজের সত্যকে নিয়ে। বাবাকে কোনো বৃদ্ধাশ্রমে পাঠায়নি চিত্ত, বাবাই নিজেকে একাকীত্বে মগ্ন করে দিয়েছেন।

পাঁচ

নীপুর চিঠি আসে, "মা, আমার জন্য তোমার মন কেমন করে জানতে পেরে আমিও সারা বিকেল কেঁদেছি। তোমাকে আর বাবাকে দেখতে খুব ইচ্ছা করে। কিন্তু, করব কী। হুট্ করে যাব বললেই তো যাওয়া হয় না। মিমি কিটি-র স্কুল আছে, অর্ণবের অফিসেও দারুণ কাজের চাপ। কাজের চাপ ছাড়াও অন্য একটা কারণ আছে স্টেশন না ছাড়ার। আউট অব স্টেশন হলে যে কোনও সময়ে ও ছিটকে যাবে। প্রমোশনটা হাতিয়ে নেবে অন্য কেউ। অর্ণব একদণ্ডও দিল্লি ছেড়ে যেতে পারবে না। আমরা দু'বছর হলো কোথাও বেড়াতে পর্যন্ত যাইনি। ঠিকই তো, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পদোন্নতি না হলে অন্যেরা পুছবে কেন? মাগো, এই সোসাইটিতে টিকে থাকার জন্য কত যে কাঠ-খড় পোড়াতে হয়। বাবাকে দুঃখ করতে বলো না, তাদের যুগ তো আর নেই। কী আর করবে?"

নীপু তার বাবাকে লিখেছে, "শুভ কত লাকি সেটা একবার ভাবো। বিয়ে করেই বউ নিয়ে ম্যারিকা যেতে পারা কি চাট্টিখানি কথা? এখানে বসে পঁচতে যে হয়নি এটা কতবড় এ্যাচিভমেন্ট বল তো? চিন্তা করবে না, আমরা যে যেখানে থাকি যেন ভাল থাকি এটাই তো বড় কথা। বাবা, তুমি কিন্তু ওষুধ খাবে, মাকেও ওষুধ-টষুধ দেবে। ওল্ড ডে'জ এ্যাগোনিতে একদম ভুগবে না।"

নীপুর চিঠি পড়ে চিত্তব্রতর মনটা তবু হুহু করে ওঠে। এই মেয়েই না বিয়ের আগে পর্যন্ত বাপের গলা জড়িয়ে গল্প করত। সহপাঠী বন্ধুদের কথা, স্কুল বা কলেজের ম্যাডামদের কথা নকল করে কত না হাসাহাসি। বিয়ের কথা উঠলে ঠোঁট ফুলত, চোখ বিস্ফারিত হত আর বাবার চুল ধরে টানতে টানতে মেয়ে বলত, "না না তোমায় ছেড়ে আমি কোথাও যাব না।" সেই মেয়েটা এখন অর্ণব নামের সরকারী অফিসারের বউ হয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওঠার প্রতিযোগিতায় ভিড়ে গেছে।

আর শুভম্ তো আরো সব মজার মজার কথা বলত। মল্লিকার বিয়ের সময় শুভমের পাঁচ বছর বয়স। বিয়ে জিনিবটা বোঝার মত মন তখন নয়। তবু মল্লিকার বেনারসী পরা সাজ, পেন্ট করা মুখ আর আলো, খাওয়া দাওয়া দেখে বিয়েটাকে ভাললেগে গিয়েছিল তার। বাড়ি ফিরে এসে মার কানে কানে বলেছিল শুভম, 'মা আমি বিয়ে করব।'

'তাই নাকি রে?' আহ্লাদে হেসে উঠে সুষমা বুকের মধ্যে টেনে নিয়েছিল আত্মজকে। স্বামীর দিকে তাকিয়ে কপট গাম্ভীর্যে বলেছিল, 'শুনছো, তোমার ছেলে বিয়ে করতে চায়। মেয়ে দেখতে শুরু কর।'

চিত্তব্রতও হাল্কা মুডে ছিল, 'জেনে নাও কোনো গার্ল-ফ্রেন্ড আছে কিনা?'

মজা পাচ্ছিল ওরা দু'জনেই। শুভম্ কিছু বুঝেছিল কি? কিন্তু তাকিয়ে ছিল মায়ের হাসিভরা মুখের দিকে। সুষমার মুখে বিয়ে বাড়ির পান, ঠোঁট রাঙা টুসটুসে, পরনে ঝলমলে শাড়ি, খোঁপায় রজনীগন্ধার গোরে। মায়ের দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে ছিল ছেলে।

'তুই কাকে বিয়ে করবি? কাকে রে?'

'তোমাকে, মা' তোমাকে।' বলে মাকে জড়িয়ে লজ্জায়-আনন্দে মাখামাখি ছেলে ছাড়তেই চাইল না তাকে।

ছয়

চিত্তব্রতর ডায়েরির একটা অংশ : শুভম্ আর এখানে ফিরবে না। আমি জানতাম। ও যখন চিরশ্রীকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার তোড়জোড় করেছে তখনই বিষয়টা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। আমরা চাইনি ও এ্যামেরিকায়

সেট্‌ল্ করুক। এখানে থেকেও তো বড় হওয়া যায়, এ কথা ওরা কেউ মানে না। একটা অদ্ভুত যুক্তি আছে ওদের, এখন আর স্বদেশ-বিদেশ বলে কিছু নেই। তুমি যেখানে থাকবে সে দেশই তোমার স্বদেশ, দেখতে হবে হিউম্যান বিয়িং-এর কতটা উপকারে তুমি লাগতে পার। ওদের চিন্তায় একটা বড় ফাঁকি আছে। অথচ আমি তা ধরতে পারছি না।

শুভম্ আর নীপু দু'জনকে আমরাই তো মানুষ করেছি। আমরা সুখের খোঁজেই ওদের জনারণ্যে পাঠিয়ে দিয়েছি। সবচেয়ে ভাল স্কুলে ভর্তি করে, বিদেশী ভাষায় রপ্ত করে, প্রথমে আমরাই তো দেশের বৃহত্তর সমাজ থেকে ওদের পৃথক করে রেখেছি। ওরা চার পাশের প্রতিবেশীদের সঙ্গে মিশত না, খেলা করত না, ওদের বন্ধু ছিল ওদেরই মত শিকড় থেকে তুলে নেওয়া এক ঝাঁক শিশু। এইভাবে দেশের ভেতরে একটা বিদেশ তো আমরাই ওদের জন্য তৈরি করেছি। এখন আর হা-হুতাশ করে কী হবে? যেদিন শুভম্ আর নীপু একে অপরের সঙ্গে অনর্গল ইংরাজি ভাষায় কথা বলতে পেরেছে সেদিন স্বস্তি আর নিশ্চিন্তির আলোয় আমাদের মুখ আর মন যে উজ্জ্বল হয়েছিল তা কি অস্বীকার করতে পারি?

সাত

সুষমাকে বিয়ে করায় বাবা ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু সে ক্ষোভ বেশি দিন পুষে রাখেননি। সময়ের চলার ছন্দটাকে আয়ত্ত করতে না পারলেও সেই অপারগতাকে ভবিতব্য বলে মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু চাকরি ছেড়ে সুষমার বাবার কথাতে যেদিন চিত্তব্রত কোর্টে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল সেদিন খুবই বিব্রত দেখিয়েছে তাঁকে। জামাইকে নিজের পেশায় আনতে পেরে একজন যখন আত্মসুখে মগ্ন, ঠিক সেই মুহূর্তে আর একজন প্রৌঢ়ের মুখে বিষাদের বিস্তার। চিত্তব্রত জানত যে তার বাবা উকিলের পোশাক পছন্দ করেন না। শুধু পছন্দ না করা নয়, এ পোশাক পরিত্যাজ্য মনে করেন। এম. এ. পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চিত্তব্রত যখন ল'টাও চালাচ্ছিল বাবা তখন বাধা দেন নি। বিষয়টা জেনে নিতে আপত্তি কোথায়, নিজেও যে এম.এ-র সঙ্গে ল' পড়েছিলেন। ছেলের বেলায়ও তা হোক না। বাবা ভেবেছিলেন, ল' পাশ করলেই আইনজীবী হওয়া যায় না। ও জগৎটায় ঢোকার জন্য যে কাঠ-খড় পোড়াতে হয় তা চিত্তর মত ছেলেকে দিয়ে সম্ভব নয়। বাস্তবে ঘটেও ছিল তা'ই, চাকরি পেয়ে যাওয়ার পর আইন পাশের সার্টিফিকেটটাই শুধু ছিল, অন্য কোনো সম্পর্কই ছিল না আদালতের সঙ্গে। সুষমার বাবা যে বড় এ্যাড্‌ভোকেট, এটা একটা পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা সুযোগেরই সামিল, বিবাহের চুক্তিবদ্ধতা এর মধ্যে ছিল না।

অথচ বাবা ভাবতেন, প্রতিষ্ঠিত আইনজীবী জামাইকে জুনিয়র করে ক্রমে ব্যবসাটি তার হাতে সমর্পণ করে দেবার ফন্দী বিবাহের আগেই এঁটেছিলেন। ছেলের ওকালতি পেশা গ্রহণে বাবা আহত হয়েছিলেন, কিন্তু মুখে কিছু বলেননি। চিত্তব্রত যে দিন আদালতে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত পাকা করে ফেলেছে মনে-মনে সেদিনই কেবল বাবার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল, 'বাবা, আমি কোর্টে জয়েন করব ঠিক করেছি।'

বাবার মুখ শীর্ণ দেখাচ্ছিল, ছেলের কথাটা আর একবার ভাল করে শোনার জন্যই বললেন, 'এ্যাঁ, কী? কী বলছ?'

চিত্তব্রত একটু কেঁপে যায়। বাবা তাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন, তুই ছেড়ে তুমিতে, 'চাকরিতে প্রসপেক্ট নেই।'

'শ্বশুর মশাই-এর সঙ্গে এ ধরণের কথা ছিল?'

'না তো।' স্বাভাবিকভাবেই বিপন্নতার অন্য এক মাত্রা টের পায় চিত্ত।

'কপটতা আর প্রবঞ্চনা ছাড়া বড় উকিল হওয়া যায় না।' বাবার বিশ্বাসে একটুও নড়চড় নেই।

বাবা, ভুল, মস্তবড় ভুল করছ। ন্যায় প্রতিষ্ঠার পথে কেউ যদি সত্যসন্ধী থাকতে চায় তো আইন প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে তা পারবে না কেন? অথচ, বাবা একবার যা বিশ্বাস করবেন তা থেকে তাকে নড়ানো কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। চিত্তব্রত সে চেষ্টাও করেনি, বাবার অমতের কথা সে জানত। তবু কেরাণীর চেয়ে উকিলের জীবনও স্বাধীন এমন একটা স্তোকবাক্য দিয়ে নিজের মনকে সে শান্ত করতে চেয়েছে সেদিন। বাবা ছেলের পেশা নিয়ে আর কোনো উৎসাহ বা ঔৎসুক্য দেখাননি, কিন্তু কেবল বয়সের ভারে নয়, দুঃখের ভারেই দিনদিন নুয়ে পড়েছেন।

আট

'দ্যাখো অনিমেষ, তুমি কিন্তু তোমার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছো, আমি কোথায়, কখন থাকব না থাকব তাকি তুমি ডিক্টেট্ করবে?'

'আপনি ওদের হয়ে দাঁড়াবার জন্য ইন্ এ্যাডভান্স টাকা নিয়েছেন, অথচ দাঁড়ান নি। হোয়াট ডাজ্ ইট্ মিন?'

'তুমি আমাকে মিনিং শিখিও না। আমি কারো মত ব্রিফলেস নই যে হাতে যথেষ্ট সময় থাকবে। আমি ওই সময় ঐ কোর্টে হাজির হতে পারিনি।'

'ওদের মরণ-বাঁচন সমস্যার লড়াই। আমিই আপনার কথা ওদের বলেছিলাম। আফটার অল আপনি আমাদের পার্টির সেরা এ্যাডভোকেট্দের 'একজন'।

'সো হোয়াট, তোমরা যা বলবে তা-ই করতে হবে? বিয়ণ্ড মাই ক্যাপাসিটি।'

'আপনি কিন্তু বদলে গেছেন। ওরা পি-এফ-এর টাকা তুলে মালিকের বিরুদ্ধে লড়ছে— কথাটা ভুলে যাচ্ছেন।'

চিত্তব্রত আর ধৈর্য রাখতে পারে না, 'অনিমেষ, য়ু প্লীজ বি আউট। তুমি ভুলে যেও না কার সঙ্গে কথা বলছ।'

অনিমেষ চলে যাবার আগে মরিয়া হয়ে বলে যায়, 'আমি ওদের য়ুনিয়নের প্রেসিডেন্ট। জবাবদিহি আমাকেই দিতে হয়। শ্রমিক-কর্মচারীরা কিন্তু অন্য রকম ভাবছে, আর সে ভাবনা খুব হেল্‌দি নয়।'

অনিমেষ চলে যাওয়ার পরও চিত্তব্রত স্থির হতে সময় নেয়। এ ধরণের ঘটনা কি তার জীবনে প্রথম হলো? টাকা নিয়েও কোর্টে এ্যাপিয়ার না করা, জুনিয়রকে দিয়ে ডেট চেয়ে নেওয়া এটা তো এ পেশার অঙ্গই। কেসটাও তো এমন আহামরি কেস্ না যে জিতে গেলে হৈ হৈ করে কাগজে কাগজে নাম উঠবে। মালিক চুক্তি মানছে না। দশ বছর ধরে কেস ঝুলিয়ে রেখেছে। ফলে ঝুলে আছে পুরো কোম্পানির দশ বছরের বেতনবৃদ্ধি, ডি.এ বৃদ্ধি আর বোনাস দেওয়া। এই যে ঝুলে থাকা আর ঝুলিয়ে রাখা, এ তো আদালতের নিয়মের মধ্যেই পড়ে। যার হাত করার ক্ষমতা যত বেশি সে ততদিন আটকে রাখার ক্ষমতা ধরে। এ সাপ-লুডো খেলা যারা জানে না তারাই অনিমেষের মত চেঁচায়। মালিক তো টাকার জোরে নাজেহাল করবেই শ্রমিকদের, আইনের আওতায় থেকেই তা করবে।

এ কেস্‌টার অন্য একটা দিকও আছে। যার ঘরে এখন কেস আছে, দু দিন আগে সে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে লড়েছে। কলেজেও একই ইয়ারের সহপাঠী। ওর সামনে চিত্তব্রত দাঁড়াক তা ও চায় না। চিত্ত জানে না, মালিকের হাত কতদূর পৌঁছেছে, তবে বিচারক যদি একটা ইচ্ছা প্রকাশ করেই থাকে তো বন্ধুত্বের খাতিরে পেশাগত এথিক্‌স্ রক্ষার জন্য, এমনকি ভবিষ্যতের জন্য সে ইচ্ছেটা না রাখার কোনো মানেই হয় না। অনিমেষের মত মাথামোটা ইউনিয়নবাবুরা এ কথা বুঝবে না।

সুষমা আজ নিজের হাতে চা এনেছে। বাড়ির সামনে ঘাসে ছাওয়া একটা লন করার স্বপ্ন ওদের অনেক দিনের ছিল। সেই শুভম হওয়ার পরেপরেই কলোনির বাড়ি ছেড়ে নিউ আলিপুরের এ বাড়িতে উঠে আসার সময় থেকেই। কিন্তু হয়ে ওঠেনি, সুষমার বাবা মারা যাওয়ার পর বড় হার্ডশিপের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল। এমন একটা সময় গিয়েছে যে পরের দিনের জন্য ভাবতে হয়েছে। পি-পি হওয়ার জন্য এদিক ওদিক ছুটতেও কসুর করেনি। আগের সেই খরা কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই শুভম্-এর আমেরিকা চলে যাওয়া। এখন কোনো স্বপ্ন দেখারই কোনো অর্থ নেই আর।

চা রেখে সুষমা বলে, 'তোমায় যেন টায়ার্ড লাগছে?'

অন্যমনস্কে চিত্তব্রত বলে, 'হবে।'

'শুভর চলে যাওয়ার জন্য?' সুষমা যেন নিজের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে চায়।

'হবে।' বলে চায়ের কাপ তুলে নেয় চিত্তব্রত। বাঃ, ভারি ভাল গন্ধ তো, মনে মনে বলে সুষমার দিকে তাকায়।

সুষমাও নিজের চায়ে চুমুক দিয়ে, চায়ের সুঘ্রাণ নিতে নিতে সেই সেদিনে চলে যায় যেদিন এব তরুণ তার ঠোঁটের ওপর ঠোঁট রেখে বলেছিল, 'তুমি ছাড়া মোর এ জীবনে কিছু নাই, কেহ নাই গো।' সুষমা ভাল গান গাইত, কাঁচ ভাঙ্গার শব্দের মত হেসে, মুখের সমস্ত রক্ত মুখে এনে সরে গিয়েছিল সেদিন সে।

'হাসলে কেন'? চিত্তব্রতর প্রশ্নের উত্তরে সুষমা তাকে এ কথা বলতে পারেনি যে এই একটি কথা, এই একই স্বাদ সে এর আগেও পেয়েছে। সুষমা কোনো দিনই সে কথা চিত্তকে বলেনি। বলতে পারেনি।

চায়ে চুমুক দিয়ে সুষমা কেবল বলল, 'চলো কোথাও যাই, অন্য কোনো জায়গায়।'

সন্ধে হয়ে এলো

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

সন্ধে হয়ে এলো আজ, এ বাড়ির থেকে যেতে হবে,
কেউ তো কোথাও নেই, যদি আসতো এ-বৃদ্ধবয়সে
দেখতাম তাদের মুখপানে কেউ চেয়ে আছে কি না
সেদিনের স্মৃতি নিয়ে ঘরে বা ছাদের পরবাসে।

সামনে ইস্টিশান, আর মাস্টারেরও বাড়ি আছে দূরে
রেলস্টেশানের মতো উপদ্রুত আর কিছু নেই
যার কোলে-পিঠে উঠে মানুষ হয়েছি সর্বক্ষণ
সে চোখে দ্যাখে না আজ, গায়ে হাত বোলায় নির্বোধে।
আমি যে কতটা বুড়ো হয়ে গেছি, যে আজই আপন
মধ্যযমুনার টানে বাঁধে ও সংস্কারমুক্ত করে
প্রেম-ভালোবাসা ছিলো মুঠোর ভিতরে তৎক্ষণাৎ
কী ক্ষতি তাদের যদি দেখতে চাই এ বুড়ো বয়সে
আত্মযন্ত্রণার মতো কষ্ট আর কিছুতেই নেই—
আমি পরিস্কারভাবে বাঁচতে চাই, বাঁচতে চাই আজো।

ছড়া-বিকল্প

অরুণ মিত্র

কবিতার আজ কষ্টেসৃষ্টে পথহাঁটা
যেহেতু তার আষ্টেপৃষ্টে তারকাঁটা।
তার চেয়ে জেনো বাহাদুর মনগড়া
বেপরোয়া এই চার ছত্রের ছড়া।।

আবাদ

মণীন্দ্র রায়

তোমরা আশার কথা চাও
চাও কিছু নতুনের কথা
তোমারাও কিছু তো দিও
পিঙ্গল আকাশে কিছু বিদ্যুৎ ঝিলিক
হয়তো তাহলে এ-হৃদয় জমিনে
আবাদে আবাদে ফলতো সোনা
নতুন এক পৌষের দিনে।

নির্বাসিতের উপকথা

রাম বসু

বসে আছি গাছের গোড়ায়
মুছে যাবো কিছুক্ষণ পরে।
একে একে বন্ধ হল পাতার দরজা
উঁকি দিয়ে দেখেছে নক্ষত্র
ভিতরে ডাকে নি।

দীর্ঘ শূন্য বেলাভূমি
বালির হীরার দিকে অপলক এক বুনো ঘোড়া
শোনে অন্য শতকের গান
পৃথিবীর খার, নুন, হৃদয়ের দগ্ধ আলো
তুলে দিই পতঙ্গের চিত্রিত ডানায়।

গৌরবের দিনগুলি মুখ ভার করে থাকে এক কোণে
ও কেন যে বোঝে না ব্যর্থতাই বিধিলিপি তার।

ফলকে উৎকীর্ণ কবি উদ্ভিদের আলো অভিজ্ঞতা
শরীরের ভাঁজে ভাঁজে ধুলো অস্ত্র নখের আঁচড়।

আজ মনে হয়
চরিত্র নিয়তি নয়, নিয়তি চরিত্র
যা হতে এসেছি আমি তাই-ই হয়ে যাবো
খুরে খুরে উলকি এঁকে
বুনো ঘোড়া চলে যাবে প্রজ্ঞার দীপ্তিতে।

আমি নির্বাসিত
বৃক্ষ ইব স্তব্ধ দিবি
আমি বসে আছি
শেষ আলো ডুববে এখুনি
মাটিতে গোঁড়ালি পুঁতে আকাশে তাকাই
বাঁচার প্রতীক আজ
কর্ণ ও বিদুর।

সে কাহিনী

চিন্ত ঘোষ

দিনটা যেন হাওয়ার হাতে ঘুড়ি
সুতোয় বাঁধা আকাশমুখী তারা
নদীর পেটে ভাঙা পাথর নুড়ি
জনস্রোত প্রবল দিশেহারা।

পড়ন্ত রোদ মাছের মতো ঢেউ-এর কোলে ভাসে
অপরিচিত মানুষজন কোথায় যায় হেঁটে
প্রতীক্ষাই ঘুমিয়ে থাকে অনাবৃত ঘাসে
কী খোঁজে যেন জোনাকিরা অপরিমিত মাঠে।

বাজে খরচ করার মতো সময় হাতে নেই
পাতালে নেমে পাতাল রেলে কোথাও যেতে হবে
আকাশ পোড়ে হাওয়ায় ওড়ে সারাদিনের ছাই
সতত এক জলধ্বনি তৃষ্ণা জাগাবে।

দরজা খোলে ক্ষ্যাপা বাতাস এবং অস্থিরতা
প্রাচীন শিলামূর্তিগুলো অবলীলায় ভাঙে
রাত্রি যেন শোনাতে চায় ভয়ঙ্কর কথা
সে-কাহিনীর মর্ম শুধু অন্ধকারই জানে।

তখন ভূস্বর্গে

সিদ্ধেশ্বর সেন

তখন ভূস্বর্গে শৌখিন শিকারা চলে,
পর্যটন-যাপন কোথায়—
অতর্কিতে, সন্ত্রাসেই, জঙ্গী-হাওয়ায়

তখনই, উত্তরে তুঙ্গ হিমগিরিশিখরে
(লাহোর চুক্তিও শেষ)
পাহাড়ের খাঁজে
গোলাবারুদের লুকানো বাঙ্কারে
ক'হাজার ফিট উপরে, পার্বত্য
সেক্টরে-সেক্টরে—

ছায়া-যুদ্ধ কী ক'রে যেন
প্রায়-যুদ্ধ ব'নে যায়
রণডঙ্কা দেশজুড়ে বাজে
সিন্ধুনদের পাড়ে বুঝি নব-হিন্দুত্বে—
কার প্রয়োজনে, সামরিক-জাতীয়তার উত্থানে।

তাতে, হেলিকপ্টার ওড়ে, কামানের গোলা
মুহুর্মুহু পড়ে—
উপত্যকা-অধিত্যকারও নিশ্ছিদ্র গাম্ভীর্য ফুঁড়ে

কিম্বা লোকালয়ে
পাশাপাশি দেহাতী মানুষ
ও ফৌজি-সমাবেশে

কুরু-পাণ্ডবের সূচ্যগ্র-মেদিনী নাকি
কাঁপে—
সীমান্তের ঢালে

নিয়ন্ত্রণ-রেখা কেন কার অভিপ্রায়ে
নিয়ন্ত্রণ-ই হারায়,
এই প্রশ্ন বেঁধে সমকালে—
কে বা কারা
নাকি 'অপারেশন বিজয়ে' আত্মহারা
মাথায় খুশির তাজ চড়ে—

অথচ কে আজ
অস্ত্রমুখে
দেশবাসী সতেজ যুবার সেনাদেহে
'বীরগতি' এঁকে দেয়—
এত কফিনে-কফিনে
যেন উপঢৌকনেই ঢেকে

দেশ ও জাতিকে
কে যে ফৌজের উর্দি
পরাতেই চায় এক ছাঁচে ঢেলে—

দেশরক্ষা কোথায় এ-উগ্রতন্ত্রের উপাসনায়।
পোখরানের পরের মহড়ায়।
অশনি-সংকেতে, কার্গিলে।।

লোকচর্চা

কৃষ্ণ ধর

চাঁদোয়ার তলায় জড়ো হয় অজস্র খড়কুটো
এলেবেলে মানুষজন ঘুমচোখে রাত্রি কাবার করে
দেয় এই আপন কথার আসরে।

ওদের কিছু নিজস্ব কথা থাকে
সে ভাবার ঠাট ঠমক জানে ওদেরই গা ঘেঁষে থাকা

গোরু ছাগল, নেড়িকুত্তারাও, আর জানে
নিশিপাওয়া গাছবিরিক্ষি ঘেরা জনপদ।
সেই কথাগুলো টোকা হয় লোককথার পুঁথিপত্তরে
অভিধানের পাতায় হয় তার চুলচেরা বিচার
ওরা কথা বাড়ায় না
শুধু তাকিয়ে থাকে অপলকে।

রাত নিশুতিতে ওরা নিজেদের মধ্যে
নক্ষত্রের ভাষায় কথা বলে,
সাধ্য কি অন্য কেউ তার মর্ম বোঝে।

ডিম-ভাঙা কুসুম রঙের একটা ভোরবেলা
সেই কথাগুলো লুফে নিয়ে মাঠে জলে বাতাসে ছড়িয়ে দেয়

আমরা বলি, লোকচর্চা।

বানভাসির শেষে

তরুণ সান্যাল

ঢের দিন পরে হাঁটছি পুরানো রাস্তায়
হয়তো ছিল বর্ষায় ভরাট জল ভিটে বাড়ি ছাপিয়ে
আর নেমে গেছে যখন হিজলের গোড়ায় রেখেছে শাদা দাগ
পচা ডাল কাঠ পাতা বা করুণমুখ শাপলা সবই দেখছি
একটু আধটু বসে যাচ্ছে পা কাদা মাটিতে
তবু হাঁটতে বেশ লাগছে
নাকের সামনেই এক উড়ুক্কু ফড়িং দ্রুত ডানা নাড়ছে
সরতেই চাইছে না
এক মানুষ জলের তলে কত রহস্য ঘুম চোখে
পা ছড়িয়ে এমনি বসে ছিল
এখন এক হাঁটু জল জুড়ে রয়েছে পুরানো রাস্তায়

সামনেই নদীর ট্যাঁক
কাশ ফুল কোষ্টা ক্ষেতে হঠাৎ উড়াল হাঁসগুলি
বেকুব ছররার দাঁত ভেঙে ওরা ভেসে যাচ্ছে জমাট কাফন হয়ে স্রোতে
এক বুক ধানের চাপ চাপ সবুজ ডাইনে-বাঁয়ে
দিক ভুল হতেই পারে
কানাহুলা ঘুরিয়ে মারবে সন্ধ্যা হলে কাদা কোমল পাথার
একটু বাঁযে নাবালে এখন খাঁড়ি পার ডাঙা জমি মানে গ্রাম
একটু ডাইনে দ-আঁচড়ানো কাদাখোঁচার পা।

ঠিক রাস্তায় পা দিচ্ছি তো
হাওয়া বড়ো ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা

দিগন্তে এখন চাঁদ গাছপালার ওপারে মেঘের ভয়ে উঠিউঠি
একটু লাল একটু কাঁসা রং
চেনা রাস্তা তো জল ঝড়েও ভুল হবার নয়

নৌকা নেই, নিদেন শালতিও নেই তালগুঁড়ির ডোঙাও নেই
কি ব্যাপার দেশজুড়ে শুধুই কাদায় কাদা
হাঁটতে গেলে পাও পিছলে যায়।

অপর নাম

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

এখন তোমাকে ফেরৎ নিচ্ছি আকাশ থেকে বাতাস থেকে,
সমস্ত দেয়াল দরজা, বই হয়ে ওঠা অক্ষরকে ডেকে
বলছি ফিরিয়ে দাও ফিরিয়ে দাও ফিরিয়ে দাও...
যেন তুমি এক্ষুনি আসছি বলে পাশ থেকে উঠে গিয়ে হয়েছো উধাও।

আর তুমি স্বাধীনতার অধীনতায় ফিরে যে আসবে না
কেন তখনি তা বুঝতে পারিনি। এখন সময় থেকে ঝরে পড়ে
দুঃখের রাতজাগর কালি, গাঢ় হয় অশ্রুর নোনা,
ঐ চুপ সিক্ত চোখে আকাশে তাকাই, মনে হয় নক্ষত্রদূরত্ব থেকে
তুমি আমার এই না-ঘুম রাত্রিকে দেখছো, তবু ঐ দিকে চোখ রেখে
আমি কিছুই বুঝছি না, স্তব্ধতার অপর নামই তো শূন্যতা।

তুমি নেই তাই আমার অক্ষরের বাজনা ফুরিয়ে গিয়েছে, কথা
এখন আর ব্যঞ্জনা নয় শুধু কথকতা, কে তোমাকে 'আমিতে' ফেরাবে?
দিগন্তে তাকাই— সে তো সনাতন নীল। বাতাসও তার প্রাচীন স্বভাবে
দু-একটা গাছপালা নাড়াচ্ছে, নিশ্বাসেরও অপর নাম যে বাতাস তাও বুঝতে পারি,
তোমাকেও ফেরৎ চাইছি আমি নারী,
কেননা স্বাধীনতাও আমার কাছে এক সুরম্য রমনীনাম
দেশভাঙার মতো যাকে যখনতখন ভেঙেছিলাম।

ইচ্ছে

অমিতাভ দাশগুপ্ত

ছেলেটা বড্ড মনকাড়া আর আদুরে,
তাই তো খোকাকে শুইয়ে এসেছি
কবরখানার মাদুরে।
সারা দিনরাত সেখানে খোকন
ধুলোমাটি নিয়ে খেলে,
বেশি রাগ হলে সবকিছু ছিঁড়ে ফ্যালে।

তার কথা ভেবে মা রেখেছে তুলে
ঝিনুক, দুধের বাটি,
বুকের ভেতরে নরম বিছানা
বিছিয়েছে পরিপাটি,
রোমাঞ্চ কাঁপে বাসনার ঘাসে ঘাসে,

ঘনঘোর কোনও বৃষ্টির রাতে
যদি খোকা ফিরে আসে।

বিজয়ডংকো বাজিয়ে
স্বপ্নে রঙিন-ময়ূরপঙ্খী সাজিয়ে
একদিন ছেলে ফিরে আসবেই
দীঘল, শ্যামলাবরণ,
মাথা হেঁট করে দূরে যাবে জানি
মরণ, ও মহামরণ।

উলটো-যাত্রায়

মোহম্মদ রফিক

এই পোড়া কাঠ, চন্দন-ঘ্রাণ, ধোঁয়া,
সোনার অঙ্গ শ্মশান কি বা মড়া
দু'চারটে ভোজ, নিরন্ন হাহাকার,
কলার পাতায় দু'ফোঁটা ঘিয়ের স্বাদ
প্রতি রোমকূপে হাওয়ার শিরশির
বৃষ্টি যদি বা নামে ঢল তবু খরা
আগুন যদি বা নাও হয় তবু দাহ,
মাটিতে ত্বকের গুহাকন্দর বেয়ে
গজিয়ে উঠবে ঘাস ভেজা-সর্পিল,
আজকের ছাই আগামী সিঁদুর মেঘ
সাতকাহিনীর বজ্র-ছোবল বিষ,
তীরে তমালের ইশারা মেদুর ঘোলা;
ফের ডাক দেয় ভাসান কলস জল
বিপরীত রীতি পুরো অবগাহনের
শরীর শরীর স্রোতের সীমানা স্রোত
লাশের ওষ্ঠ স্পর্শ করে না লাশ;
এই কাঠ যদি জ্বলেই না হয় কাঠ
সোনার অঙ্গ অবনী বহিয়া চিতা।

কত দূরে

শ্যামসুন্দর দে

খুলে দাও জানালাটা
বাতাস আসুক ঘরে
অচিন বাতাস
দূর করে দেবে তোমার ঘরের
গতরাতের সঞ্চয় জাঁকালো আঁধার।
মনগড়া শাস্ত্রের নাম আড়াল করে
কতদিন বেঁধে রাখবে রথের ঘোড়া
মিথ্যে ভয়ের রশিতে।
আজো তো অভাগীর আগুনের বাসনা
আপন আত্মজের হাতের
ভিটের মায়া ছেড়ে গফুর
হাজার মানুষের ভিড়ে
মহেশের ছায়া পড়ে মনের মুকুরে।
আরো কত বঞ্চনার দিন
পথ অন্বেষণ।
আকাশ জুড়ে ভাসানো মেঘে
চৈত্রদিনের কৃষ্ণচূড়ায়
প্রশ্ন ওড়ে হাওয়ায় হাওয়ায়
কতদূর বসন্তের দিন।

দায়িত্ব নিয়েছ বলে

(জয় গোস্বামীকে)

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

তুমি তবে দায়িত্ব নিয়েছ বলে হ'লে বাঙ্ময়
এক বুক ভালোবাসা এক যুগ জমে আছে কথা
তুমিই বলবে বলে মসীতে রক্তমোক্ষণের ছায়া লেখ
কলসে ঝর্ণার জল শহর গ্রামের দুঃখ পথ চঞ্চলতা
ঘাম রক্ত রুজিরুটি আরও কিছু স্বপ্ন ধানসিঁড়ি
আলপনা নিকনো উঠনে চিত্রিত উজ্জ্বল পিঁড়ি
সব কথা তুমি বলবে শস্যের প্রান্তর মহাবন
পর্বত সানুতে সন্ধ্যা জ্বলে ওঠে অভীক লণ্ঠন
তোমার বুকের মত আমারও হাড়মাস ছিন্ন তীরে
দলিতের বুকের বুলেট ভস্মস্নাতা পোখরানে বালির গভীরে
সবাই দেখেছি সবই, তুমি শুধু দ্যাখো বুঝি বেশি
এক যুগ ভালোবাসা জয়দেবে বাউল চণ্ডালিনী এলোকেশী
তুমি তবে দায়িত্ব নিয়েছ উদযাপন করো বনের জন্মদিন
মেরুদণ্ড শ্রমে বাঁকে— তুমি জানো ক্ষুধার কাছে
ধরণীর স্বপ্ন মূল্যহীন

সমীক্ষণ

মণিভূষণ ভট্টাচার্য

বারান্দার এককোণে টিয়া ও টগর,
একজন টবে আর অন্যজন দাঁড়ে,
টিয়া চায় ভেজা ছোলা কাঁচালঙ্কা
বনের আড়ালটুকু চায়—
টগর কোমল হয় সারে জলে শুভ্রতায় আনন্দ জানায়,
দুজনের মাঝখানে রয়েছি তৃতীয় জন হয়ে,
হৃৎপিণ্ডে জড়িয়ে আছে সোনালী লোভের ঊর্ধ্বফণা।

যখন সমস্ত দিক চুপচাপ— আদিগন্ত তৃষ্ণা পড়ে আছে—
হঠাৎ তিনদিক থেকে ছুটে এলো তিনটে ডাকিনি,
ভবিষ্যৎ বলে তারা মিশে গেলো মরুর জ্যোৎস্নায়,
টিয়ার প্রার্থনা আছে নিঃশব্দ নীলের আহ্বানে—
টগরের রয়েছে মেদিনী,
কেবল আমার জন্য নির্ধারিত নির্মমতা—
পাতালের তিনখণ্ড ভবিষ্যৎবাণী।

আমার নিঃশ্বাসে বাংলা

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

আমার নিঃশ্বাসে বাংলা; বুক ভ'রে টেনে নিই
বাংলার বাতাস;
বাংলার জলবায়ু, মাটিতে বেড়েছে হাড়মাস।
বাংলার আকাশ থেকে বৃষ্টি পড়ে, স্নান করি সেই ধারাজলে;
মুখ থেকে মাতৃভাষা অনর্গল ঝরে।
আমি কাজে ও চিন্তায়
স্বপ্নে ও দুঃস্বপ্নে, পূর্বপুরুষের কোন্ পুণ্যফলে
পেয়েছি বাংলার মতো স্নেহার্দ্র কোমল মাতৃভাষা।
কে আমার মুখ থেকে মাতৃভাষা
কেড়ে নিতে চায়?

মানুষ যা জন্মসূত্রে পায়
তার মতো সহজ, আপন আর কেউ নয়;
মাছেরা যেমন
জলেই জীবন পায়— তলিয়ে স্বচ্ছন্দে ভেসে ওঠে;
অতসী-করবী-রক্তজবা-সন্ধ্যামণি যে রকম
বাংলার মাটির রসে স্নিগ্ধ হয়ে ফোটে,
অপরাজিতার রঙে বাংলার আকাশ প্রতিবিম্বিত যেমন
সহজ প্রসন্ন, আমি সেরকমই স্বাভাবিক
জীবন পেয়েছি
তোকে ভালোবেসে অনুক্ষণ।

আমার শরীরে লেগে ধুলোমাটি; চৈত্রের বাতাস
ধুলো মুখে নিয়ে ছোটে, আমিও ছুটেছি
　　　　　　　　ক্ষেতে, মাঠে
ধুলো গায়ে; শৈশবেই
　　　　আমিও কেটেছি দাঁতে ঘাস,
তার স্বাদে আচ্ছন্ন থেকেছি; আজো
　　　　　　　　স্মৃতি ঘেঁটে কাটে
দিনরাত, আরো কতো জীবন্ত মুহূর্ত।
　　　　　　　　মা'র মুখ মনে পড়ে—
ঘুমপাড়ানিয়া গান গেয়ে ঘুম পাড়াতেন রোজ;
　　　　　　　　আমি শুয়ে শুয়ে
শুনেছি কখনো, গল্প রূপকথার, রাজপুত্র হয়ে
ছুটিয়েছি ঘোড়া, পার হয়ে চলে গেছি তেপান্তর;
নিশুতি রাতের চরাচরে
　　টু-শব্দ ছিলো না, ছিলো শুধু ঝিঁঝি পোকাদের
　　　　　　　　একটানা স্বর
রাত্রিকে রহস্যময়ী ক'রে তুলতো।
　　　　　　মা আমার তখনো শিয়রে।
বাংলার আকাশ জুড়ে ফুটে উঠতো এক আকাশ তারা;
খালের ওধার থেকে শেয়ালেরা প্রহরে প্রহরে
ডেকে উঠতো; কারা যেন বাজিয়ে করতাল
মৃদঙ্গ, কীর্তনে আত্মহারা।

গরু ছেড়ে দিয়ে মাঠে রফিক রাখাল
হা-ডুডু খেলছে। নদী উন্মাদ উত্তাল
　　　　　　　　ফুঁসছে রাগে,
গরুর লেজ ধ'রে নদী পার হচ্ছে বুধনেরা,
　　　　　　　　　　রশিদ আহমেদ;
সন্ধ্যা নামে, হাট শেষে বাড়ি ফেরে হাটুরেরা;
　　　　　　　　　বহুকাল আগে
যেমন দেখেছি, সেই দেখা আজো বাংলার মাটিতে
রয়েছে তেমনি। আমি
　　　　ওদেরই একজন হ'য়ে আছি কতোকাল।

আমার বাংলা মন্বন্তরে ও দাঙ্গায় হ'লো লাল।
নিরন্নের আর্তনাদে আমার দরিদ্র পিতা
দু'চোখের পাতা
এক ক'রতে পারেননি; ঈশ্বর-বিশ্বাসী পিতা
ঈশ্বরের কাছে
অসহায় মানুষের জন্যে কিছু করুণ প্রার্থনা
করেছেন; কিন্তু মূক-বধির ঈশ্বর
সাড়া দেয়নি তাতে; দেশ
দাঙ্গায়, অজস্র রক্তপাতে
ভেসেছে; উচ্ছিন্ন হয়ে অনির্দেশে দিয়েছিলো পাড়ি
আমাদের পিতা কিংবা পিতামহ।
আমরা তাঁদেরই ব্যর্থ উত্তরাধিকারী;
আমাদের মাটি হ'লো ফুটিফাটা, প্রিয় মাতৃভাষা
মুখ থেকে কেড়ে নিচ্ছে বিদেশী, বিভাষা;
আমার খণ্ডিত বাংলা, বাংলা ভাষা, প্রিয় মাতৃদেশ,
তাকে 'বাংলা' বলে ডাকতে লজ্জা পায়—
এমন লজ্জাও
রয়েছে; আমার চোখ ভরে ওঠে জলে;
আবার আগুন হয়ে দপ্ করে জ্বলে। আমি তা-ও
সংযমে, শাসনে বেঁধে ভাবি—
দুঃখ হলেও অশেষ,
ফিরে পাবো মাতৃভাষা, কেড়ে নেবো
সপ্রেমে, স্ববলে।

বসন্তোৎসব

সব্যসাচী দেব

বসন্তের শেষ, জ্বলছে চৈত্রের
শুকনো পাতা জুড়ে আগুনরং;
বাজে না ঋতুগান, শূন্যে হাত তুলে
বিফল এঁকে যাওয়া অভিজ্ঞান।

হয়ত এভাবেই শুধছি ঋণ যত,
হয়ত এভাবেই বৃষ্টিস্তর
মিথ্যে হয়ে যায়, শরীরে জেগে ওঠে
অচল মুদ্রার শীলমোহর।

শিখিনি ব্যবহার ভাষার, শব্দের—
পঙ্‌ক্তি জুড়ে ফাঁপা অহংকার;
ঘিরেছে চারপাশে অন্ধ বধিরের
মুখোশঢাকা মুখ, ব্যস্ত ভিড়।
এমনই হোলিখেলা, এমনই উৎসব
এমনই বিনিময় দুজনে আজ;
শরীরি অভিমান ফুরিয়ে যায় দ্রুত
শিরায় ছুটে যায় তরল বিষ।

দুজনে দেখা হলো, চৈত্রদুপুরের
হাওয়ায় ভেসে আসে বোবার গান;
দুজনে দেখা হলো, এ ওকে ছুঁতে গিয়ে
দুহাতে জমে ওঠে ভস্মশেষ...

ইরিনা

গণেশ বসু

শ্মশানে চুম্বন ওড়ে। আর নয়। এভাবে চলে না।

তোমাকে বিব্রত করি? পদতল কেঁপে যায়? ধু ধু রোদে ঝরে
অনুরাগ? চতুর-ভ্রূকুটি জ্বলে? স্তব্ধ গান? শোনো
তোমাকে নিয়েই তবু এ বন্দিশিবিরে আজো মরে বেঁচে আছি।

ঝানু দাবাড়ুর চালে জাতপাত ফুঁসে ওঠে এই দেশে হাজার হাজার
মরণের ঝাঁপি খোলা, মাফিয়া মস্তানে ছেয়ে রাজনীতি, ক্ষমতার ভাগ-বাঁটোয়ারা
ছিন্নভিন্ন করে দেয় বুদ্ধপূর্ণিমার রাত, আর

সোক্রাতেস মুখ ঢাকে এ-সময় ধারালো ধাক্কায়
বাঁচার মাশুল গুণে, নিরঞ্জন মেঘপুঞ্জ শাখায় শাখায়
হাহাকার ছুঁড়ে দেয়, মোড়ে মোড়ে দুঃখের সঞ্চয়।

এখনো তোমাকে খুঁজি, তোমার ও-মুখে আমি ভরে রাখি দিন
রোমন্টিকের বেলাভূমে শুয়ে আছো আমার বাহুতে মাথা রেখে
সুবর্ণ-সুষমা নিয়ে মরালীর সন্দীপন, অনতিকাছেই
সোঁ সোঁ ঢেউ ভেঙে যায় যেন কোন্ অলৌকিক মায়াবি মূর্ছনা
বাতাসে বাতাসে ওড়ে, মিড়ে মিড়ে অন্তরা আভোগে,
সূর্যের অনন্ত রেণু ছুঁয়ে যায় প্রেমে প্রেমে তোমার আমার
মিলিত ঝর্ণার মতো আবেগের একেকটা দুপুর।

প্রতীক্ষার শেষ আছে? প্রশ্ন জাগে, কোথায় কীভাবে আছো, জিন কাঠামোর
বদলে কি মগ্ন তুমি? r.DNA শুষে নেয় সব অনুভূতি?
জানি না কিছু, প্রশ্ন জাগে, প্রশ্ন জাগে, অথবা কি আজো
দাপিয়ে বেড়াও সেই উজ্জীবন সুরে সুরে মানুষের ভিড়ে?
আর সে-ভিড়ের মাঝে কখনো কি হবো আমি তোমার বেহালা?

কোথায় এখন তুমি? কীভাবে এখন আছো? বুকের ভিতর
গুমোট বাতাস যেন দম নেয়, কাতর ঘন্টার ধ্বনি— যেন সব শেষ হয়ে গেছে।
তারাগুলি নিভু নিভু, ভয়াবহ নীরবতা, পরতে পরতে শোকসভা
মনীষার, নির্বিকার মুখোশেরা আলোকিত। চুপচাপ তুমি—
দূরত্বের মতো তবু পিষে মারে ঘনিষ্ঠ গোধূলি
সিন্সার স্ট্রাসের পার্কে, ভিড়ের ভিতরে জিন্স নেচে যায়; শ্মশানচুম্বন?

দ্বিধা থরো থরো কাঁপে, কোথায় এখন তুমি কীভাবে রয়েছো
প্রবাসের ঝিঙে ফুল এ জন্মের উপহার ইহুদি ইরিনা?

তিমিরাশ্রয়ে

সাগর চক্রবর্তী

একজন অসম্পূর্ণ মানুষের স্পর্ধা নিয়ে আমি
নদীকে বললাম : তুই সমুদ্র তো নোস।
কী করে সমস্ত নুন মধু করে দিতে হয় জানিস না যখন
এ্যাতো নুন ধরে কেন রাখিস, সজনি! জমিন, আবাদ
জ্বলে যায়, অন্নহীন হয়ে যায় তোর নষ্টামিতে।

নদী তার যথাযথ শক্তি নিয়ে গোঙায়, আমাকে
বললো : তোমরা কেন বারবার রক্তমাখা হাত ধুয়ে নাও
বারবার চোখের জল, শরীরের নাগরিক উপার্জন পাপ, অসভ্যতা
বাণিজ্যিক পড়তা লাভ মুনাফার ক্ষয় ধুতে নামো এসে আমার গভীরে।

এসব সংলাপ শুনে হেলেপড়া মান্ধাতা বটগাছ
বিবর্ণ-পাতার ফিসফিসানিতে শব্দ বাজালো : শেম, শেম।
নল খাগড়া, কণ্টিকারী নীরবে জানালো সহমত।

একজন অচরিতার্থ মানুষ যেমন তার শ্রেণীর স্বভাবে
আকাশে তাকায়,
আমি তাকালাম, অ-বাক আকাশ
অন্ধকার।

হাত বাড়িয়েই আছি

চিন্ময় গুহঠাকুরতা

হাত বাড়িয়েই আছি, কখন যে হঠাৎ
অনেক সুবর্ণমুদ্রা ঝরে পড়বে হাতের তালুতে
নিশ্চিত আনন্দ দেবে এবং উত্তাপ।

হাত বাড়িয়েই আছি, অজস্র বৃষ্টির বিন্দু
ক্ষরিত মধুর মত এনে দেবে শীতল আশ্বাস
এবং প্রশান্তি, যার বড়ো প্রয়োজন।

হাত বাড়িয়েই আছি, শেষ বিকেলের রোদ
সবটুকু ধরে রাখব বুকের পাঁজরে
সঞ্চয়ের যত তৃষ্ণা শেষবার চেয়েছি মেটাতে।

হাত বাড়িয়েই, কখন আর একটি হাত
মুঠোর ভেতরে ধরে পরম আদরে
ফিসফিস করে চলবে, বেলা শেষ, ঘরে ফিরো এসো।

হাত বাড়িয়ে আছি, অপার আকাঙ্ক্ষা বুকে নিয়ে
মাথার ওপরে সূর্য, আমি নতজানু
আমৃত্যু ভিখারি হয়ে একা বসে আছি।

কৃষ্ণচূড়ার প্রসঙ্গে

শুভ বসু

আকাশে এখন সে কৃষ্ণচূড়া নেই, যে
সেখানে নিজের দর্পণে তুমি নিজের মুখের ছবি
দেখতে পেয়েছ ভেবে সময়ের কাছে স্বপ্নের অঙ্গীকার
রাখার স্পর্ধা জানাবে এবং উদাস পথের রেখা
চিনে চিনে পথ হাঁটার স্বপ্নে মশগুল হয়ে উঠে
পরমতা সে যে আত্মলোপেরই আর একটি নাম তবে
এই কথাটুকু বুঝে ওঠাকেই জানবে চরম প্রজ্ঞা।

আমরা এখনো এই ধন্দেরও সীমান্তে এসে
জীবনের দিকে মেলে যে দিয়েছি সূর্যমুখীর জিজ্ঞাসা,
এই আশ্বাসটুকু একেবারে শেষ আশ্বাস জীবনের
এ জানাটুকুই এ তাবৎ পথ চলতে পারার পাথেয়,
এই জ্ঞানটুকু সঞ্চয় হলো এতাবৎ এত প্রচুর চড়াই ভেঙে।

মানুষের কাছে মানুষের নীল কামনার শিখাগুলি
একে একে নিভে আসছে দেউটি, এ জানাটুকুই চূড়ান্ত।
আমাদের এত জন্মের এত স্বপ্নের তবে কোথাও অর্থ নেই?
মনে মনে এটা পুরো মেনে নেয়া অসম্ভব যে, তাই
এখনো স্বপ্ন আমাদের পুরো অস্তিত্বের আশির-নখর
সংজ্ঞার্থের লালনেও এত প্রবল শক্তি ধরে।

যে কোনো একদিক

রত্নেশ্বর হাজরা

একবার এদিকে আর একবার ওদিকে
যেতে যেতে
আপাদমস্তক টলোমলো—
এখন এভাবে আর নয়।
একটু নিজের মতো ভাবো
একটু নিজের মতো চলো।

বিভিন্ন কথায় কান দিয়ে স্বপ্নগুলো
ভেঙেছ নিজেই
মাঝে মধ্যে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলে—
অথচ খোঁজোনি নিজস্বতা
খোঁজোনি নিজের কণ্ঠস্বরও
হেঁটে গেছ অলীক মিছিলে।

ঘুড়ি উড়িয়েছো— তবে অন্য কারো হাতে
রেখেছ লাটাই
ভুল ছন্দে বেজেছে সরোদ—
বলেছ শেখানো কিছু বুলি
দেখেছ নকল-করা ছবি—
দুর্বলতা বোঝোনি, নির্বোধ।

স্রোত সাবলীল নেই— মাঝে গতিপথে
পাথর জমেছে
চিন্তাভাবনা এখনও মানায়—
অতএব মুখোমুখি বসো
কোন্‌দিক তোমার— ঠিক করো—
যে কোনো দিকে কি যাওয়া যায়।

আমাদের সংকেত

বাসুদেব দেব

পঞ্চাশ ষাট সত্তর আশির সব কবিতা
ঘুমোচ্ছে শীতের রাতে কুয়াশার চাদর জড়িয়ে
ফুটপাথের ছেলেটা না হয় একটু আগুন জ্বালিয়ে দিক

চটজলদি নাম হাততালি ছবি-ছাপা সব
পড়ে আছে ভাঙা বোতল টুকরো কাঠের সঙ্গে জড়াজড়ি
চতুর্দিকে জমে উঠছে বাদামের খোলার মতো
জীবনযাপনের স্থূলতা
চতুর্দিকে অবমানিত মনুষ্যত্ব, ছেঁড়াজামা, রক্তমাখা চপ্পল...

কুয়াশার মধ্য দিয়ে ভেসে যাচ্ছে তাদের স্বপ্ন
নক্ষত্রখচিত সেই গান, মৃত্যুহীন সেই গরিমা
কিছু নিচেই মাতাল ও পুলিশের প্রভূত বন্ধুতা
শরীর ছিঁড়ে খুঁড়ে আদিম আগুন খোঁজার অভিযান
ভোরের আকাশ বা নদীর হাওয়া কেমন অবান্তর এখন

কেবল টিকে থাকার জন্য এই আত্মসেবা এই পিশুভক্ষণ
কাগজের নোটে ছাড়া জীবনের যেন আর কোন অর্থ নেই
ফুটপাথের ছেলেটা জ্বালিয়ে দিচ্ছে আগুন
হ্যাঁ ঐ তো আমাদের সংকেত—

সন্ন্যাসে

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

সুগন্ধভর শরীর তোমার
সেদিন এসেছিল...
খোলাই ছিল দরজা আমার

আমিল থেকে মিলে।

তোমার নামে পাহাড় ছিল
নদীও তোমার নামে...
কখন গোলাপ পাপড়ি ছিল

তোমার চিঠির খামে।

বাঁচবো বলে সটান ছিলাম
চিতা-কাঠের পাশে,
শ্মশানে ফুল ফুটতে দিলাম

প্রেমের সন্ন্যাসে।

প্রেম ছিল না কামরাঙাতে
হলুদ পাখির ডাকে,
চোখ গেল কার মান ভাঙাতে

এমন দুর্বিপাকে।

কেবলই একটার পর একটা

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

একটানা টিপ্‌টিপে বর্ষা। ভিজে সেঁতা খবর কাগজের
অনেকটা লেখা উঠে গেছে ব'লে শান্ত লাগে। সূর্যও
বেলা করে উঠছে, যেন তাইতেই বেঁচে বর্তে কোনোমতে।
নইলে যা দিনকাল। দানা খেয়ে, কিংবা রোগে শোকে রাস্তার মশানে
কেবলই একটার পর একটা ঘুরে পড়ে শুনি।
মাছ বেচত, ছেলেকে পড়াতে ঘুরত ভোর থেকে রাতে,
উঠতি ঠিকেদার, বাড়তি প্রোমোটার, কিংবা শুধুই ফেরে পড়া,
গানের রিক্‌শায় চেপে ঘোর রাতে ফিরত মাতাল—
শুনি, নেই। কে পোড়ায়, কে দেয় হরিবোল।
নতুন ফ্ল্যাটের মাল বইতে বেরিয়ে গেছে ম্যাটাডোর।
ডোম-পুরুত, কর্পোরেশনের চুল্লি— পতা নেই তারও। শুধু
আপন অন্ত্যেষ্টি সেরে এক পাড়া গাছ চলে গেল।
পাড়ার কুকুরটা নোংরা শুঁকে খালি ঘুরছে সেখানটা।
আর ওই দুখের প্যাকে মরা খাটালের একটা গোমুখ আমার
রাত জাগা চোখদুটো বিঁধে চেয়ে আছে, কিছুতেই
চোখ ফেরায় না। টিপ্‌টিপে বর্ষার-শব্দ বাইরে একটানা...

এই দুর্দিনের ঝড়ে

নন্দদুলাল আচার্য

কুয়াশার পথে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ
একশা হয়েছি বৃষ্টির রেণু মেখে।
কথা ছিল তুমি আসবে দিঘির পাড়,
কোথায় হারালে আমাকে একাকী রেখে?

অনেক চড়াই উৎরাই পার হয়ে,
অপেক্ষা করে কাটালাম এতকাল।

মা মরেছে জ্বরে, ভাইকে মেরেছে ওরা,
কোন দোষ নয়, ভাই ছিল নকশাল।

সামলে নিয়েছি দারুণ দহন, শোন,
চাকরি পেয়েছো, নাকি সেই টিউশনি?
বোনের বিয়ে কি এখনো পারনি দিতে,
পারুলের কেন খবর পাই না কোনো?

মেঘে মেঘে দ্যাখো বয়স তো হল ঢের,
আমার কথা কি কক্ষনো মনে পড়ে?
তোমাদের কথা ভুলতে পারি নি আজো,
খুব মনে পড়ে, এই দুর্দিনে ঝড়ে।

তিনটি কবিতা

ভাঙা পিরিচ

সুশান্ত বসু

ভাঙা পেয়ালার নিচে পড়ে আছে
কবেকার শুকনো তাপ, স্ফটিক শর্করা
হারানো শীতের দিন—
ও মুগ্ধতা তুমি তারই ওমে
চুপ করে বসে ডাকো,
সাক্ষী তার এ ভাঙা পিরিচ।

তাপের ভাষা

হাতে তোমার কুরুশকাঁটা
বুনে যাচ্ছে হাজার নক্‌শা—
দূরের পাহাড়, স্তব্ধ আকাশ
চরন্ত এক মেঘের সারি;
তারই মধ্যে তোমার হাতে
পশম বুনছে তাপের ভাষা?

ও আমার পাথর

ও আমার পাথর।
তোমার নীরবতার ভিতর থেকে
চুঁইয়ে পড়ছে কতো বছরের জমা জল।
ও আমার পাথর,
স্তব্ধ কথার ভিতর থেকে
ঝিকিয়ে উঠছে হারা-দিনের তাপ,
ঝিকিয়ে উঠছে আলোর মঞ্জরী।

অচ্যুত

অমিতাভ গুপ্ত

মাটি কেঁপে উঠেছিল কুড়োতে পারিনি তাই কাঠকুটো, বনে
মনে হল আরণ্যক মানব ও মানবীর মতন স্পন্দনে
ঈশ্বরঈশ্বরী
উন্মোচিত, এভাবেই, শ্রী
লক্ষ ক'রে মনে হয় মৃত্তিকাগর্ভের মতো সমস্ত সম্মত

ক্ষতসৌন্দর্যের দিকে প্রবাহিত এই-যে জীবন
অরণ্যঢেউয়ের মতো যেরকম ভেসে যায় বন

ঢেউয়ের বাঁধন
যেভাবে আঁকড়ে ধরে চৈত্রফাল্গুনের মতো হলুদ বা মৃদু সবুজাভ

জল থেকে জলেই এসেছি তাই জলে ফিরে যাব

জাগো। রাতের মতন নিশাচর ও দুঃস্বপ্নের আঁচলটি ধরো
খোলো
শারীরিক বস্ত্রের মতন সদর, ও
অন্যান্য দরজাজানলা। ওলো
সই
ইচ্ছে করে তোদের কাছে মনের কথা কই
কিন্তু সে নহি আমি, সে নই
কবির গুরুর মতো মহাজনগীতিকার মতো চিত্রাঙ্গদা
বাক্য থেকে জল ঝরে জল থেকে ঝর্ণা আর ঝর্ণা থেকে কথা

যেভাবে ছড়িয়ে ছিল এই কাগজের পরে ধুলোর মতন নীরবতা
পিচ্ছিল মাছের মতো পুরাণের দশমাবতার
যেভাবে গভীর জলে গভীর গভীরতর জলে চলে যায়
যেমন মধুরভাবে তোমাদের ঈর্ষা ক্রোধ আমাকে সাজায়
যেভাবে রূপের বুক থেকে রূপান্তর
ঈশ্বরীঈশ্বর
যেভাবে সদরখোলা প্রেতাবিষ্ট মাঠের শংকর
মনে হল মেঘছেঁড়া ঝড়

একা কাঁদি

তুলসী মুখোপাধ্যায়

যতক্ষণ বেঁচে আছি— ঠিক ততক্ষণ বাঁচার মতন বাঁচা চাই
জীবনের অহঙ্কারে সুভাষিত জয়কারে দশদিক দাপিয়ে বেড়াই।
বক্ষ ফাটিয়ে জল, শিরদাঁড়' খাড়া করে গৌরবে সৌরভে—
এই দ্যাখো, কেমন আমি বাঁচার বিগ্রহে বেঁচে আছি
আমি নই মৃত্যু-তাড়নাভীত দ্রোহহীন তুচ্ছ মশা মাছি।

জীবনসঙ্গিনী সহ পুত্র কন্যা এবং প্রতিবেশী আত্মীয় স্বজন
তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদী বিদ্রূপের বিষ ছুঁড়ে ছড়ায় গর্জন :
ধুঁকে ধুঁকে এরকম কাকলাস বেঁচে থাকা— এ কেমন জীবন?
চর্তুদিকে কতশত সুমধুর সুনধর জৈব সমারোহ—
আসলে তোমার ভেতরে নেই একতিল উচ্চাকাঙ্ক্ষী মোহ।

দশবাই বারোঘরে কিম্ভুত ভয়ে ডরে একা বসে কাঁদি :
তাহলে কি ঘোরতর পলায়নে জীবনবিমুখ রণে
আমি এক ভণ্ড আস্ফালন এবং ইত্যাদি...

জীবনের রণাঙ্গনে দমন দহনে বিশ্বগ্রাসী কৌরব রৌরব
দেখেও মূর্খের স্বর্গে জেহাদী আহ্লাদে
হয়তো বা আমি এক নপুংসক নিষ্ক্রিয় পাণ্ডব।

হওয়া না-হওয়ার অর্থ

অরুণাভ দাশগুপ্ত

ঘরে ঢুকতেই দেখি ফিরে গেছ
চিরকুটে লেখা 'যদি পার, এসো,'
আমার হয় না যাওয়া
আলস্যে নাকি ভয়ে,
তার চেয়ে বেশি অপরাধবোধ, কিছুটা বা সংশয়ে।

সময়ে শিখিনি হওয়া-না হওয়ার অর্থ,
সময়ে হল না নিজেকেই মেলে ধরা,
সময়ে তোমারও খোঁপায় ফোটেনি ফুল
লগ্নভ্রষ্ট এ ঘর আমার শুধু চিরকুটে ভরা।

আবার ঘুরবে চাকা

শান্তিকুমার ঘোষ

সমুদ্র তেমনই আছে। আজো রূপোচ্ছ্বাস
ভেঙে পড়ে সূর্যাস্তসৈকতে। শুধু আমি
দাঁড়িয়েছি পুনর্নব ফের তীর্থগামী।
ঝাউবীথি কেয়াঝাড়ে জাগে অধিবাস।
আছে কি স্তম্ভিত সূর্যের সপ্তাশ্ব রথ।
অপ্সরী গন্ধর্বদের করি দণ্ডবৎ
বাঁশী করতাল শুনছি যাদের। নদী
চন্দ্রভাগা সিন্ধু-নীলে মেশে নিরবধি।

আবার ঘুরবে চাকা : উড়বে কেতন
শুভ ও সুন্দরের। দুপাশে মানুষজন
— স্বচ্ছল বসতি আসে আনন্দের ভোজে,
কালো মেয়ে বেরলো যে দেবতার খোঁজে।
জলতলে ঠিকরে উজ্জ্বল নীলমণি।
ঊর্ধ্বে নীড় ও আকাশ মাটির বন্ধনী।।

যুদ্ধ রক্তপাত নয়

স্বদেশরঞ্জন দত্ত

যুদ্ধ, রক্তপাত নয়, এসো ভালোবাসি।
তোমাকেও প্রিয় বলে ডাকি।
যদি নাও
এনেছি দুহাতে দেখো পূর্ণিমার রাখি।

আমার বন্ধুরা কেউ যুদ্ধ করে না
প্রতিবেশি বন্ধুরা কেউ কখনোই যুদ্ধপ্রিয় নয়
মাঝরাতে ঘুম ভাঙে বন্ধুদের ডাকে

আমারে বুকের মধ্যে বন্ধুদের বাড়ি
প্রতিবেশিদের বাড়ি জলে ডুবে যাবার আগেই বুকে
তুলে নিয়ে আসি
বিনিময়ে তারা কি কখনো রক্ত যুদ্ধ চায়?
আমার যে প্রতিবেশি বন্ধুরা সহায়।

আমার বুকের মধ্যে বন্ধুদের বাড়ি
— মস্ত বড় ঘর-পাশে খোলা মাঠ-বাগান-আকাশ—
সারারাত ভালোবাসাবাসি সারারাত
বাতাসের রাত
আমার শরীরে বন্ধু চুম্বনে চুম্বনে ছবি আঁকে
চুম্বনের দাগে হাত রেখে ঠোঁট রেখে বেঁচে আছি
আমাকে বাঁচিয়ে রাখে বন্ধুদের আসমুদ্র হিমাচল হাত
— সারারাত বন্ধুদের হাত—

যুদ্ধ কেন রক্তপাত কেন এসো ভালোবাসি।

সাম্প্রতিক

ব্রত চক্রবর্তী

আমপাতা আমপাতায় রোদ্দুর হয়ে
একটা গোটা দিনের পেছনে
ধাওয়া করার কথা ছিল।

কিন্তু চারপাশে তাকিয়ে দেখছি,
কিছু-মিছু পাবার আশায়
এর পেছনে ও, ওর পেছনে সে
ধাওয়া করেছে।

লোকজন যে যার মুখ নিয়ে
যদি কথাবার্তা বলতে আসে,
আমি বুকের দরজা দু-হাট খুলে দাঁড়াই।
কিন্তু কথাগুলোকে কথার আড়রাখা থেকে
বাঁচাতে বাঁচাতে টের পাই, কেউ তার
মুখ আনেনি সঙ্গে ক'রে, মুখোশ এনেছে।

মুখোশের দোকানে কতবারই তো গেছি,
কিন্তু বললে বিশ্বাস করবেন না,
কিনে উঠতে পারিনি।

নদী যেখানে গিয়ে সমুদ্রে মিশে যায়,
আমাকে সেই তোলপাড় দেখাও জীবন।
এই কথা বলতে বলতেই চোখে পড়ে
ভালবাসাকে কপিকল ক'রে
কুয়োয় বালতি ফেলে লোকজন
জল তুলতে চাইছে।

বাসে দুজন লোক এ ওকে
ঠেলা দিয়ে বলল, কাগজে লিখেছে

'শতাব্দী না কী একটা জিনিস ফুরিয়ে আসছে।
অন্যজন নির্বিকার মুখ করে বলল, তাতে কী;
আর একটা কিনে নিলেই চলবে।

চলবে চলছে, চলছে বলবে
এই যে দিনগুলো,
এর মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমার
গায়ে কাঁটা দেয় যখন দেখি—
আমপাতা তার রোদ্দুরের ভাগ
জামপাতাকে দিতে দিতে
চাপা নিচু গলায় বলছে;
কষ্ট পেয়ো না, থেকো।...

বলেছিলাম একদিন

রানা চট্টোপাধ্যায়

জানি কোলাহল থেমে যাবে একদিন
বলেছিলাম পাদানির নিচের চাকাও থামবে
কতো কথা পিচ হ'য়ে জমে আছে রাস্তায়
একটু উত্তাপ পেলে ঘামবে।
মিছিলকে তাই বলেছিলাম এগিয়ে চলো—
সজনেখালি কিংবা ধুবুলিয়া থেকে
　　　　আরো দূর চলো হে;
থেমো না ঘড়ির কাঁটার মতো লাগাতার বলো
লাল ভালবাসা পতাকায় মুড়ে চলো হে,
অভিমান আর লোহিতকণা জ্যোৎস্না মেখে।

আর তাই লোকালয়ের শেষের মহাসাগর
ধীবরকে ডাকে ডেকে নেয়
রূপোর আঁশ শান্ত হয়ে আসে, ডাগর
মেয়েটাও বিবাগী হ'য়ে যায়

যখন নুনের স্বাদও ভুলে যায় রন্ধনশালা।
তবু একখণ্ড এই শরীর যার কোন মূল্য নেই
মিছিল পৌঁছুবে পৌঁছুবেই
ভাঙবে গজদন্ত মিনার, হায় ফুলমালা।

ছবি হ'য়ে থাকলে ছবি না হওয়া মুখগুলি
বলবে— 'এও একদিন আমাদের সঙ্গে ছিলো'।
এখন শান্ত নির্জনতা, কৃষ্ণচূড়াগুলি
রাত্রির ধীবর সঙ্গে নিলো।
পাদানির নিচে চাকার কোলাহল
থামে, আবার শুরু হয় একদিন ধর্মের কল।

কমরেডশিপ

রাহুল পুরকায়স্থ

সূর্যাস্ত সন্ত্রাসপ্রিয়, আরো কিছু পথ
এগিয়ে গিয়েছো তুমি, প্রাচীন রক্তের
আভারাঙারেখা ধরে যেমন সহজ
জীবনের দিক থেকে সরিয়েছো মুখ

বেদনা বিস্মৃতপ্রায়, এখন ফোয়ারা
কিছুটা রঙিন, আর কিছু সাদা-কালো
সুরের সাম্পান ঘিরে ঘনায় আঁধার
তবু বেঁচে থাকা, তবু বিদ্যুৎ চমকালো

জেনেছি পথের শেষে আরো পথ বাকি
রাঙা পথ ভাঙা পথ যেভাবে আক্রোশ
দিগন্তে ছড়িয়ে দেয় মলিন আকাশ
আলোড়ন নীরবতা স্লোগান স্লোগান

তোমার আগুন আজ আমাকেও বলে—
অগণিত মৃতমুখ, তবু বেঁচে থাকা

বৃষ্টি আর নৌকার গল্প

প্রবীর ভৌমিক

এক.

কোথাও নেমেছে বৃষ্টি
কোথাও নেমেছে গূঢ়, কূট, জটিল সংকেত।
তুমি সচেতন হও
ভিতরে, ভিতরে তুমি সচেতন হয়ে ওঠো হে মেধা আমার।
মেঘ ডেকে ওঠে, বিদ্যুৎ চিকুরে জাগে
মাংসের রক্তিম আভাস।
তোমার শোণিত হিম সাম্প্রতিক
তুমি বিদ্যুতের স্পর্শ নাও
শিরা-উপশিরা জুড়ে রক্তের তড়িত গতি খেলা করতে দাও।
মৃত্যুর মতন এক জ্বরে সমাচ্ছন্ন তুমি
প্রতিটি রোমের মধ্যে বিদ্যুতের স্বেচ্ছাচার টেনে আনো।
কেন না নেমেছে বৃষ্টি উন্মাদের মতো।

প্রাক-কথনের দিনে বরষাপ্রেরিত ছিল
দৃষ্টি ও সংকেত—
আমার জন্মের দিন বরষা শ্রাবণে—
সংকেতপ্রধান তুমি
দেখা হয়েছিল এক বরষা আষাঢ়ে
সেই থেকে ভেসে যাওয়া
বৃষ্টি পাওয়া ছেলে-মেয়ে
একটি যুবক আর একটি যুবতী।
মুহূর্তে বুদ্‌বুদ্ ফেটে যায়।

মুহূর্তের চিহ্ন মুছে দেয়— শরীর সন্ত্রাসে
সেও তো বরষা ছিল
উন্মাদের আলোড়ন শুরু হয়
বৃক্ষপতনের গন্ধ, খানা-খন্দ দিয়ে
জল ছুটে যায়।

ঘন অন্ধকার রাত্রি মাটি ও জলের মুহুর্মুহ
বিপরীত রতিক্রিয়া।
শান্ত বুকে নেমে আসে রমনী চোখের আনন্দ অশ্রু।
তুমি সেদিনের স্বেচ্ছাচার, রক্তের আমিষ গন্ধ
মেঘে ঢাকা জ্যোৎস্নার গোপন যৌনতা
বিস্মৃত হয়েছো।
সৃজনের প্রয়োজনে অনিবার্য এই স্বেচ্ছাচার
এই রক্তের আমিষ গন্ধ
তুমি বিস্মৃত হয়েছো।
এবার তোমাকে আমি সতর্ক করবোই।

একটি নৌকো দুলছে নদীর বুকের পরে
বৃষ্টি পড়ছে, বৃষ্টি পড়ে
নদীর বুকে একটি নৌকো অন্ধকারে

অবগাহন-তৃষায় নামে ঘাটের কাছে একটি মানুষ
নৌকো তাকে ডাক দিয়ে নেয়
দুই-এর ভিতর কাঁপতে থাকে অল্প আলো।

জল বেড়েছে নৌকো এখন উথাল-পাতাল
অবিমৃষ্য হাওয়ায় ভাসে নৌকো এবং একটি মানুষ।
হঠাৎ আলো নিভিয়ে দিয়ে
নেমে আসছে নিকষ কালো একখানি রাত।
হাওয়ায় ভাসে শীৎকার আর আমিষ গন্ধ।
নদীর বুকে একটি মানুষ, একটি নৌকো অন্ধকারে।

তিন.

সেদিনই ভেসেছে খণ্ড
নৌকো গেছে পাড়ার পাড়ায়
নৌকো গেছে প্ররোচিত করে
মৃদু আলো আর মৃদু অন্ধকার নিয়ে।

নৌকো যাবে চাঁদবেনেদের হাটে
বরষা-গোপন-গন্ধ মুছে ফেলে
নৌকো যাবে বুকে ক'রে বাণিজ্য পসরা।

সেদিনই ভেসেছে খঞ্জ
স্বপ্নে পাওয়া অপ্সরার সাথে।

সব ভালো, সব মন্দ শেষ করে
ফিরে আসে খঞ্জ আজ মূক ও বধির।
সে দেখেছে অগ্নি, নদী, ঘূর্ণি আর
সেতুর অতলে
ধড়হীন মুণ্ড এক ঘোরে দিকে দিকে।

নৌকা নেই, নৌকা গেছে
সৌভাগ্যগঞ্জের দিকে।
সেতুর অতলে এক ধড়হীন মুণ্ড শুধু
ভারসাম্য রেখেছে সেতুর।

চার.

তুমি সেই খঞ্জ মানুষটিকে
কোন অন্ধকারে ছেড়ে দিয়ে এলে।
সেতো শুধু অবগাহনের জন্য ঘাটে এসেছিল
তাকে কেন মিথ্যা প্রলোভন টেনে এনে
ছেড়ে দিলে এই মূক, বধির সময়ে।
আজ তোমাকে আমি সতর্ক করবই
আজ তোমাকে যৌন শীতলতা হেতু
হিম রক্ত আর হিম অস্তিত্ব সংকট হেতু
সতর্ক করবই—

ভিতরে ভিতরে তুমি পুনরায় সচেতন হয়ে ওঠো
হে মেধা আমার—
আবার নেমেছে বরষা
এ বরষা মুহূর্তের নয়
আবার দুলেছে নৌকা প্লাবনে নদীতে
তুমি সচেতন হও
দুই-এর ভিতরে দুলছে মৃদু আলো
তুমি সচেতন হয়ে ওঠো।
এবার আষাঢ়ে এবার শ্রাবণে
পুরাতন ক্রীড়া শুরু হোক।

দ্বীপে, দ্বীপে নতুন সৃজন
বুকে ফল, মাতৃবুক প্রেম আর
অমৃতের দুগ্ধে ভরে যাক
এবারের আষাঢ়ে-শ্রাবণে।

কইনা আর আমাকে নিয়ে

রণজিৎ সিংহ

নক্ষত্রেরা খুব কাছে— একেবারে হাতের নাগালে। আমি যেন
তাদের ধরতে পারি। আমি যেন লুকোচুরি খেলতে পারি
তাদের সঙ্গে।

আমরা কি আকাশের খুব কাছে পৌঁছোতে পেরেছি?
না কি এখানে বায়ুমণ্ডলে ধুলো নেই, ধোঁয়া নেই,
কালি নেই, নেই দীর্ঘশ্বাস— তাই নক্ষত্রেরা এত কাছে।
তাই নক্ষত্রেরা এত ঝলমলে আর স্নিগ্ধ আর তারা
আমাদের এত বন্ধু।

কইনা আর আমাকে নিয়ে নক্ষত্রদলের খেলা আজ।
আকাশের যে প্রান্তে তাকাই নক্ষত্রেরা ভেসে ওঠে। যে দিকে
হাঁটতে থাকি নক্ষত্রেরা সঙ্গ নেয়। নক্ষত্রের আলোকের
খেলা কইনা আর আমাকে নিয়ে।

উন্মুক্ততা আড়ালকে ধূলিসাৎ করে। আমাদের আবরণ,
আমাদের মোহময় সব আবরণ, হাওয়া উড়িয়ে দিই।
নক্ষত্রের আলোকের অবিরল ধারায় কইনা আর আমি
আজ পূর্ণস্নান করি।

সে আমার গোপন কথা

প্রণব চট্টোপাধ্যায়

গোপন অসুখের মতো
আমার দৈনন্দিনের ভুল-অপচয়
জয়-পরাজয়ের গোপন কথা
আমি লুকিয়ে রেখেছিলাম
পৈত্রিক সিন্দুকে
নকসী কাঁথার ভাজে।

একদিন চাবি খোলা পেয়ে
সেইসব নিষিদ্ধ কথারা
একেবারে লোকালয়ে হাটখোলা।

আমি আমার সন্তানের
বল্লমের মতো জিজ্ঞাসার
একেবারে মুখোমুখি।

শোনো হে।
ঠিক এভাবেই আমি আমার
মরণের কথাও গোপন রেখেছি এতকাল।।

কলকাতার জন্মদিন

জিয়াদ আলী

আকালের বছরে তোর জন্ম আমি জানি
তবু এতো হৃষ্টপুষ্ট হয়ে গেলি তুই যে কীভাবে।

ক্লাইভ যুদ্ধে জিতে যে-বাড়িতে ফূর্তি করেছিল
তাদেরই বংশধর নেতা হয়ে জ্ঞান দেয় আইনসভায়,

তারা লেখে ইতিহাস, বলে
চার্ণক কলকাতা এলে কলকাতার জন্ম হয়েছিল।
কলকাতা ছিল না যেন কলকাতা ভূগোলে তার আগে।
এসব আজব তত্ত্ব যে গেলায় তার মূর্তি বসছে রেড রোডে।

তোর বাবা ভুখা পেটে মরেছিল তেতাল্লিশ সনে
তিনজন গোরা সৈন্য শুকনো পাঁউরুটি দেবে বলে
তছনছ করেছিল তোর কচি বোনটার দেহ।
তুই তো তখন শিশু মাত্র চারমাস,
তোর কি সে-সব কথা মনে থাকে? তুই
হৃষ্টপুষ্ট হয়ে বেশ আছিস মৌতাতে।

ডানহাত-বাঁহাত

বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত

যে-অসহায়তা নিয়ে আজ দুটি হাতের একটিকে—
ডানহাত-বাঁহাত করি... ভ্রম হয়, রাগ হয় খুব;
সেই তো দাঁড়িয়ে থাকা একলা আঁধার এককোণ,
কোণের জলকাদা শ্যাওলাতলে দেখা মিশকালো ডুবের
একহাত-দুহাতই শুধু গভীরের রূপ।
গভীরতা মানুষের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ছিঁড়ে-নিতে
এখনো কি অগভীর এই পৃথিবীতে
এসে পড়ে? এসেছে একভাগ স্থল স্মরণে-মননে
তার তিনভাগ জলের?

এখনো শহরতলি স্থলপদ্মঘেঁষা সব মিলনপুর/নগর ইত্যাদি
রেলপথের ঢালসহ এপার-ওপার
ভাঙা রাস্তা কাঁচা ড্রেন বাস-রিক্শ-ভ্যান
মাছি ভনভনের মতো জলেস্থলে বাতাসচালিত হাতদুটির
মেরামতি-কাজ নকশা বরকন্দাজির দিনেরাতে
কাজের মেয়েলি ফর্দ হাতে নিয়ে পুরুষ-প্রকৃতি

লড়ে; আর আলিঙ্গন ও চুম্বনের আঙ্গিকসর্বস্বতা থেকে—
পরস্পরবিচ্ছিন্ন দাঁড়িয়ে-থাকা দুইজনের এই এককোণ

কোণের এ-বিশদতা, বিষণ্ণতার এই ঠেক
আমাদের কনুই-টেবিল
সম্পর্কের
বর্তমান কাল— দেখি ভূতেরই মতন
মার্বেল একটি-দুটি...
এই জল-জঙ্গলের প্রচ্ছন্নতার স্থানকাল
পাত্রবর্জিত পোর্সেলিন
পোর্সেলিনেরই ভবিষ্যতে—
চিনি দুধ কফিতে মেশানো একচুমুক
তিতকুট সম্পর্ক,
ক্রমে, বন্ধুস্থানীয় হয়ে উঠলো নাকি— বলো,
হাতের মার্বেল।

প্রচ্ছন্ন

অজয় চট্টোপাধ্যায়

স্মৃতির সংগ্রহ। ঘাঁটাঘাঁটি হতেই ভাসে : সে এসেছে '৭২-এ। স্থানীয় লোকেরা আঙুল উঁচিয়ে বলে বাংলাদেশী। তুচ্ছতাসূচক সম্বোধন। '৪৭ থেকে '৬০ সাল অবধি যারা পঃ বঙ্গে এসেছে তাদেরও এ পাড়ের বাসিন্দারা সুনজরে দেখেনি কোনদিন। ঘটি-বাঙাল সম্পর্ক আল্লা হো আকবর-বন্দে মাতরম দ্বন্দ্বকেও ছাপিয়ে গেছে কোন কোন সময়। তা সত্ত্বেও বাঙালরা হীনমন্যতায় ভুগেছে এমন বিরল দৃষ্টান্ত নেই। উৎখাত হয়ে এ পাড়ে এসেছে, শিক্ষায় চাকরিতে সংস্কৃতিতে রাজনীতিতে অংশ নিয়েছে। খাপ খুলেছে। ভাগ বসিয়েছে। বিস্তার করেছে একাধিপত্য। ঘটিদের অনুভবে বৈরীতা ছিল যেমন সম্ভ্রমও ছিল তেমন। যোগ্য প্রতিপক্ষ হিসেবে মর্যাদা দিত। চিত্রটা পালটে যায় '৭২-এর পর। প্রাক '৭২-এ হিন্দু উদ্বাস্তুরা খুঁটিপোতা রক্তবীজের ঝাড় আখ্যা পাওয়া সত্ত্বেও গোঁ-প্রত্যয় এবং উৎকৃষ্ট মনীষার স্বীকৃতি আদায় করেছিল। ততদিন তারা ছিল পূর্ববঙ্গীয়। বাংলাদেশ হওয়ার পর বাঙালী মুসলিমরা খুঁজে পেল নিজস্ব আইডেনটিটি। হিন্দু বাঙালীরা খোয়াল শেকড়। "বাংলাদেশী" পরিচয় মুখ্য হল। এ ব্যাপারে পূঃ বঙ্গীয়-পঃ বঙ্গিয় এক। প্রাক '৭২ উদ্বাস্তুদের ধন ছিল না। মান ছিল। বাংলাদেশীদের ধন ও মান দুই খোয়া যায়। আসলে রেবতীর ভাবনায় উচ্চবর্গীয় বলতে বাংলাদেশে কেউ পড়ে ছিল না। হিন্দু সমাজ বলতে যা বোঝায় তা ছিন্ন। নিচুতলার মানুষ সর্ব অবস্থাতেই খণ্ড। তাই এত হেনস্থা।

আত্মচরিত অধ্যয়নই রেবতীর এখন পাঠ্যবিষয়। প্রিয় চর্চা। মস্তিষ্কে কিলবিল করতে করতে উপল-ব্যথিত, চরিতাভিধান নাড়াচাড়া করতে করতে রেবতী হাঁটতে থাকে।

সে এসেছিল সব দিয়ে থুয়ে। সঙ্গে করে এনেছিল সংগ্রহ করা অনেক শিক্ষাগত সাক্ষ্য। সেও তো হয়ে গেল প্রায় ২৭ বছর। কম সময়? আজকের কাগজে কার্গিল যুদ্ধের খবর আছে। যুদ্ধের অভিজ্ঞতা তার আছে। সুদুর বিগত সেই সব অভিজ্ঞতা সেই সব ভগ্নতা বেদনা কালের প্রবাহে পার হতে হতে ক্লান্ত। নিরুত্তাপ।

রাস্তার ধার ঘেঁসে সার সার ঝুপড়ি। শিবির হিসেবে স্বীকৃত না হলেও শিবির। এই সব শিবির রেবতীর কাছে স্মৃতির ঝাঁপি। চোখের ওপর ভর করে পদ্মার কোল ঘেঁষে এক ইট গাঁথনি টিনের ছাউনির জীর্ণ বসতি। যে ভূখণ্ডে পদ্মার প্রবাহ নেই তা পৃথিবী হলেও ওর কাছে আজো যেন দেশ নয়। ভূখণ্ড মাত্র। স্মৃতি-চঞ্চলতায় সত্তার বিভাজনে ভেতরটা রেবতীর খা খা করে। রুদ্ধ নিঃশ্বাস আকুতিতে রেবতীর মাথা ঢলে ঢলে পড়ে।

ঝেঁপে বৃষ্টি এলো। রেবতীর ভাবনা খেই হারায় শিরশিরে অনুভবে। সম্বিত আসে জলের ঝাপটায় সর্বাঙ্গ ভিজে যাওয়ার উপক্রম। প্রায় দৌড়ে রেবতী এসে আশ্রয় নেয়, সামনে যে গাড়ি বারান্দা আছে তার নীচে।

ঝেঁপে বৃষ্টি হচ্ছে। গরমে হাঁসফাঁস দশার স্থগিতাদেশ। রাস্তার ছেলেমেয়েরা নেমে পড়েছে রাস্তায়। মেতেছে জলকেলির স্ফূর্তিতায়। ট্রাফিক পুলিস হাওয়া। যানবাহনের গতি ছত্রভঙ্গ। থৈ থৈ আলুথালু। রেবতী দেখল গাড়ি বারান্দাই অনেকের গৃহস্থালী। পথচারীদের অতর্কিত জমায়েতে তাদের সংসার বিপর্যস্ত। পথে নামার প্রশ্ন নেই। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রেবতী পর্যবেক্ষণ করতে থাকে অস্থায়ী গৃহস্থালী।

কেউ উনুন ধরিয়েছে। ধোঁয়া উড়ছে। কারো হাত উঠছে নামছে। ফটাস ফটাস কয়লা ভাঙছে। রান্নার তোড়জোড় চলছে। একটা উনুনের গনগনে আঁচে হাঁড়ি থেকে ফ্যান উথলে পড়ছে। ফুরসতে নেই কেউ। বাচ্চা বাগে আনতে মুখে মাই গুঁজে দিয়েছে মা। একদিকে চুকচুক শব্দ আর একদিকে ত্বরিতে যোগাড় সারা। গাড়ী বারান্দা রূপ নিয়েছে অদ্ভুত এক ভবঘুরে আশ্রমে। আশ্রমই বটে। সত্যি বড়লোক বলে একটা জাত ভাগ্যিস ছিল। ধনী সম্পর্কে রেবতীর সম্ভ্রম জাগে। রক্তচোষা বলে যতই গাল পাড়া হোক পূর্বেকার ধনীদের দিল ছিল। সংগ্রহের পরিমাণ দেখাতে গিয়ে তাদের দানের পরিমাণকে খাট করে দেখান হয়েছে। তারা গরিবদের কথা ভাবত গরিবদের আশ্রয় দিত। অশন বসনে যতই মগ্ন থাকুক চিন্তার সড়কে আর্তদের স্থান ছিল। পারা ওঠা আড়শিতে ঘনিষ্ঠ হয়ে একটি মেয়ে মুখশ্রী পরখ করছে। মুখের ওপর ছায়া পড়ে। প্রসন্ন ও মেঘলা। দ্বন্দ্বময় অভিব্যক্তিতে ভ্রূ সন্ধি হ্রস্ব ও আয়ত। সৌন্দর্য নির্মাণের ছলাকলা শরীরে প্রয়োগ করতে নিমগ্ন। সজ্জার দাবী মেটাচ্ছে। পারিপার্শ্বিক সম্পর্কেও হুঁশিয়ার। কলহে অংশ নিচ্ছে। তার রোমান্স গড়ার আয়োজন নিয়ে কে বুঝি ফোড়ন কাটল জাত তুলে। আর যায় কোথায়। আঁতে ঘা লাগে। ঘা হজম করার বান্দী সে নয়। উত্তেজনার পারা চচ্চর করে চড়ে। নাকের ফিনফিনে পাটা ফোলে। সর্বাঙ্গ থরথর। জবাবে সে বল্ল : এর আর বাকি থাকে ক্যান, কাপড় তুল্যে দিচ্ছি আয় ঠাপ্যে যা নাউ খাটনির পো। ৩টে শিশু চোর-পুলিস খেলায় ছুটোছুটি করছে। ওই ওদের খেলা।

রেবতীর দৃষ্টির মগ্নতা চোট খায়। তার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল এক ভদ্রবেশী। সপসপে শরীরে ছুটে এসে আশ্রয় নিল গাড়ী বারান্দায়, আর এক বিপন্ন। মুখোমুখি হতেই পরস্পর চকিত।

— আরে আপনি। কেমন আছেন, ভালো তো। যাকে তাক করে বলা তিনি জবাব দিচ্ছেন,

— যা দিনকাল ভাল আর থাকতে দিচ্ছেন কই। পে কমিশন ঝুলে আছে তিন বছর। কী যে প্রসব করবে সবই ঈশ্বরের কৃপা। স্ট্যাগনেশনে আটকে আছি চার

বছর। কবে ছাড় পাব কোথায় ফিকসেশন হবে ওপরওয়ালা জানে। বোল কিস্তি ডি এ ভোগে যাবার জোগাড়। এদিকে বাজার দেখুন যেন চৈত্রের খড়। মুদ্রাস্ফীতির ছোঁয়ায় দাউ দাউ করে জ্বলছে।-

রেবতী আশ্চর্য হয়। কিছু বছর আগে চিত্রটা ছিল অন্য। পরিচিত গণ্ডীর মধ্যে ধনী মধ্যবিত্ত গরিবদের মিশ্রণ ছিল, বৈভব এবং অভাবের স্বস্তিকর সহাবস্থান ছিল। অভাব বা ঐশ্বর্য তা কেউ হাট করত না। সাজিয়ে গুছিয়ে বাজারে পণ্য করত না। দেখা হলে, কেমন আছেন? উত্তরে মিষ্টি হাসত। বলত, ভাল। আপনি? ছেলেপুলে?

আর কিছুই নয়, ক্রলিং। আত্মসর্বস্বতা। পণ্য-মূল্য-বাজার এই হচ্ছে গ্রাহক পরিষেবা। এই নিয়ে জগৎসংসার। বিশ্লেষণটা মনে এসেছিল আলপটকা। গেঁথে গেল সামনের হোর্ডিংয়ে চোখ পড়তে।

Chairman is coming, Dear, I have to meet him at the airport. Then there is lunch on meeting and cocktail party in the evening. Really a big day today. So I must be best. SHREE RAM SILKs Terene Suit and eighty twenty shirt. Thanks to you for your wonderful selection. সিল্ক টেরিনের সুট আর আশিবিশি সার্টে দুরন্ত হলেই চলবে না। অটো চাই মোবিলিটির জন্য। অতএব গাড়ি চাই। একদিকে চার্মিং প্রিয়া আর এক দিকে প্রায় দ্বিতীয়া স্ত্রীর মতো রূপগুণে চুম্বকটানে স্বতন্ত্র। Wife takes one half. She needs you, your time and attention— a good half of you. What do you do with your other half the working half?

বাঃ। পণ্য এবং প্রিয়া কেমন অঙ্গাঙ্গী হয়ে যাচ্ছে না। প্রিয়ার দু হাত জড়ান। আলুথালু বসন বিরহী পোজ। খাই খাই ভাব। ভলাপচুয়াস মহিলা। লাস্য চোখে আহ্বান জানাচ্ছে; জীবন দু-দিনের জন্য বৈত নয়। এস বড়সাহেব ও ছোট কেরানি এস চেয়ারম্যান ও খাস বেয়ারা সুখোচ্ছ্বাসের এই প্রমোদ তরণীর সহযাত্রী হও।

ক্ষুধা গতি এবং ক্লান্তির দ্যোতক। ব্যঞ্জন পানীয় দ্রুতগামী যান হতে পারে বিজ্ঞাপনের যোগ্য বিষয়। তা না বিজ্ঞাপনে শোভা পাচ্ছে উন্মোচিত স্বাস্থ্যের এক মহিলা— যে কিনা স্বাস্থ্য প্রদর্শন করছে ঘনিষ্ঠ সঙ্গ দিচ্ছে। আবেদন ছড়াচ্ছে : ডিয়ার বিফোর গোয়িং টু লাঞ্চ প্লিজ টেক কেয়ার অফ ইয়োর ড্রেস। রিমেম্বার রেমণ্ডস সুটিং সার্টিং।

বোঝ কাণ্ড। কী সে থেকে কী সে। গবেষণামূলক পর্যবেক্ষণে রেবতীর গা নেই। আছে উদাস দৃষ্টিপাত। ভারি আলস্য-বিলাসী ভঙ্গি। রেবতী আলস্য ঝাড়ে। আলস্য বেশি পাত্তা পেলে আখেরে লস। সে ত আর মাসমাইনের চাকুরে নয়। তাকে খুঁটে খুঁটে অর্থ সংগ্রহ করতে হয়। জনে জনে ফিরি করতে হয় মেধা। আমার মেধা আছে আয় কে নিবি আয় আমার মেধা। সকাল ছটা থেকে সাড়ে নটা, ওদিকে সন্ধ্যে পাঁচটা থেকে রাত নটা ব্যাচ বাই ব্যাচ বিক্রি করি বিদ্যে। দশটা থেকে সন্ধ্যে বিশাল ফাঁক ভরাট হয় খেপ খেটে। দুটো থেকে চারটে পর্যন্ত বাড়ি

বয়ে আকাট এক ছাত্র ঠেঙাই। টিউশনিটা খুব প্রিয়। কারণ বিবিধ। বাবা করপোরেটেড ওয়ার্লডে ঢুকে যায় নটার মধ্যে। মাও অফিসজীবী। নাকে মুখে গুঁজে ঘর ছাড়ে নটার কাঁটায় কাঁটায়। মাইনে করা মাসির নজরে ছেলেটি সারাবেলা একা। সে ওদের ব্যাপার। আমার কিছু যায় আসে না। আমার যায় আসে এইট্টি-নাইনট্টি পারসেন্ট নিয়ে বাবা-মায়ের যে কোন উদ্বেগ নেই তাতে। ছাত্রটির কাছেও লেখাপড়াটা একটা খেলা। যে খেলায় ওর আনন্দ খেলে। জয়ে নয়। এই টাইপ ছাত্র পড়িয়ে আরাম আছে। পরিশ্রম নেই টেনশন নেই অথচ মাসকাবারী দক্ষিণা উত্তম। এরা এখন বিরল প্রজাতি। মার্কসীট তাক করে গার্জেনরা নোট ছাড়ে। নম্বর কম হলে হল্লা করে। বিদ্যে সেলেবেল। সেটা নতুন কিছু কি।

শৈশব স্মৃতির এক প্রসন্ন-আবদ্ধ অধ্যায় রেবতীকে পীড়িত করছে উন্মনা করছে। কান পাতলেই যেন শুনতে পায় সেই গুনগুনানি। লেখাপড়া করে যে গাড়ি ঘোড়া চড়ে সে। প্রবাদ যে কী বলে তার কিছুই বোধগম্য হয় না। অবশ্য প্রবাদ যে জালি তারও প্রচার আছে। প্রবাদ থেকেই তারা বিপরীত নমুনা তুলে আনে। যে প্রবাদ ঘোষণা করে দুষ্টু গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল, পরক্ষণে পালটি খেয়ে নতুন সুর তোলে। নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল।

সে যাই হোক বিদ্যাসাগরকে সে মান্য করেছে। মাছ-বিদ্ধ একাগ্রতায় পুঁথিকে করেছে জগত সংসার। খেলার মাঠ কল্পনার মায়াময় জগত চলে যায় প্রবাসে। পুঁথির সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন সহবাস। ফল ফলল। এক দাড়ির ধারাবাহিকতা নিয়ে সংগ্রহ করল একটার পর একটা এবং শেষ ডিগ্রি। ভাবল এবার আমারে পায় কেডা। শিক্ষক-কেরানি কোন চেয়ারে ঠাঁই হল না। দরখাস্ত, ধরা করা, বাঁ হাতে গুঁজে দেওয়া সব করেছে কবে। নিস্ফল কর্ষণ। বুঝল সফলতা মানেই কোন ষড়। নীচের দিকে টানের বক্র খেলা। আস্থা আর নেই পড়ে আছে আস্থার ভগ্নস্তূপ। আস্থা খুইয়ে বয়স খুইয়ে অগত্যা ঝুলে পড়ল স্বনিযুক্ত পেশা মাদুরপাতা ব্যবসায়। অনেক বছর রগড়ে মাদুর লাটে। বেঞ্চ বসে। বেঞ্চের খদ্দের হিসেবে আসে বিদিশা।

রেবতী চমকে উঠল। এক ভিখিরি খঞ্জনা বাজিয়ে নুপূরের ধ্বনি তুলে দুলে দুলে গাইছে। গ্রাম ভেঙে আজ এসেছি শহরে/এনেছি দুঃখ/এনেছি মৃত্যু/এনেছি রোগ/এনেছি শোক—

আশ্চর্য বৈকি। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রর গান ভিখিরির গলায়। তাও কোন কালে, না যখন কমিউনিস্টদের অশৌচ চলছে।

পকেট থেকে রুমাল বের করে চেপে চেপে রেবতী ঘাড় মোছে। না। বৃষ্টি থামার কোন লক্ষণ নেই। এই বসন্তে বিশ্রি বৃষ্টি। বানান কবিদের স্বভাব। বড্ড বানায় তারা। অদ্ভুত বসন্ত ঋতু নিয়ে কবিরা পাহাড়প্রতিম কাব্য জুড়ে ঘটা করে জড়িয়ে রেখেছেন যে বর্ণময় বর্ণনা তার সমর্থন খুঁজলে ভ্রষ্ট হতে হবে। শীত নেই।

ঠান্ডা ঠান্ডা আমেজও নেই। উদাসী হাওয়া নেই। গায়ে ঘা গোলান অনুভব। যানবাহন ঘোঁট পাকিয়ে দিতে আছে অকাল বর্ষণ।

ক্রমে বৃষ্টি ধারা মুমূর্ষু। যানবাহন বিন্যস্ত। নাগরিক শ্রী ফিরে আসছে। রেবতী ত্রস্ত হয়। তাকে যেতে হবে অনেকদূর। যাওয়া নয় যেন পাড়ি। এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে। গতিমন্থর বাসটা চোখে পড়তেই রেবতী লাফিয়ে উঠে পড়ল। পা দানিতে পা রেখে ঝুলে রইল হনুমানের মতো। ঝুলন্ত দ অবশ্য সাময়িক। কয়েকটা স্টপ পার হয়ে নির্দিষ্ট এক স্টপ এলে হুড়মুড় করে প্রচুর যাত্রী খসতে থাকে। ভেতরটা ফাঁকা হয়। জানালার ধার নয় তার পাশের সিট পেয়ে যায় রেবতী। সিট পাওয়া মাত্র ঘুমতে শুরু করে। ঘুমতে ঘুমতে পাশের লোকটির গায়ে থেকে থেকে ঢলে পড়ছে। লোকটি কড়া চোখে তাকায়। ধমক দেয় দেয়। দেয় না। বিরক্তির বদলে তার মায়া হয়। আহা ঘুমোক, ওরে জাগায়ো না। ও যে বিরাম মাগে।

একটা স্টপেজ এসে বাস থেমে আর নড়ল না। এবার লোকটি রেবতীর গায়ে কনুই ধাক্কা দেয়।

— ও মশাই, নামুন।

রেবতী চোখ কচলাতে কচলাতে থতমত খায়। বলে— পৌঁছে গেছি।

— পৌঁছাব না? আচ্ছা লোক মশাই আপনি। চল্লিশ মিনিটের জার্নিকে ভেবেছিলেন অনন্ত যাত্রা।

রেবতী মনে মনে হাসল। ঘুমিয়ে পড়তে ওর এমন কিছু লোকসান হয় নি। বসেই দেখে নিয়েছিল যাত্রীদের মধ্যে মহিলা বলতে যা দু-এক পিস ছিল সব প্রৌঢ়া।

রিক্ত স্বাস্থ্যে রেবতী সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে উঠছে শিথিল পায়ে। সিঁড়ি ও ছাত্রের ঘরের সন্ধিস্থলে দেখা হয়ে যায়, প্রায় ঠোকাঠুকি। বুক ছাতা হয়ে নামতে উদ্যত। চাক্ষুস আলাপ হয়নি। ছাত্রর মুখ থেকে শোনা বর্ণনা থেকে সনাক্ত করতে পারল এ হচ্ছে জাতভাই। অংক দেখান। পাশে সরে রেবতী তাকে পাশ দেয়। আমারি বঁধুয়া আন বাড়ি যায় আমারই আঙিনা দিয়া।

ঘড়ি দেখে রেবতী। ঠোঁটের কোণে হাসির উল্লাস। স্বগতক্তি : তোমার হল সারা আমার হল শুরু।

॥ ২ ॥

ব্যাপ্ত জ্যোৎস্না। প্রসন্ন সালোকময়তা। আলো আছে আলোর উঁাট নেই। যেন প্রদোষ। চোখ টাটায় না। স্নিগ্ধ প্রকাশ। বেঞ্চির লোহার পিঠে হেলান দিয়ে ছড়িয়ে বসে আছে রেবতী। গা ঘেসে বিদিশা। সে সামনের দিকে ঈষৎ ঝুঁকে, বাঁকা দেহে। মুখে কথার খই ফোটাচ্ছে। চন্দ্রপাত বনভূমি জলাশয় নির্জনতা; উৎকৃষ্ট পটভূমি।

তৎসহ বিপরীত লিঙ্গের নৈকট্য চাঁদে পাওয়া মানে এমন বিরল ক্ষণেই না উদ্ভব হয়. লঘুতর অনুভূতির। কত না ঘুমন্ত অভিলাষ জড়িয়ে রাখে সংরাগে আশ্লেষে। তার যৌবন একদিকে ধুঁসছে আর একদিকে ২৮-এর উপোসী সতীত্ব ব্রীড়াবদ্ধতার বেড়া টপকাচ্ছে।

রেবতীর মুখ কথাহারা। পলকহীন দৃষ্টি। ঝুঁকে ছিল প্রায় ঢলে পড়ল বিদিশা। চুলের ঝুটি ধরে ঝাকানি দেয়।— কী দেখছ অমন করে। শুধোয় বিদিশা।

— দারুণ মানিয়েছে। কী শাড়ী গো— বাঙ্গালোর?

— খুব উঁচু নজর হয়েছে তোমার না। বাঙ্গালোর নয় গো মশাই খাঁটি মুর্শিদাবাদ সিল্ক। চৈত্র সেলে কিনেছি। মাত্র চারশো আশিতে।

— যাই বলো বাংলার তাঁত বাংলার শিল্পের কোন জবাব নেই। সমুদ্রগড়ের তাঁতীর বুনন নকশার হাত অনবদ্য। খ্যাতি ম্যাঞ্চেস্টার অবধি।

— আমায় ছেড়ে শাড়ী নিয়ে পড়লে। তুমি কি গো— বিদিশা ধাতায়। শাসনে দুষ্টুমির ইসারা আছে। আসকারা আছে উসকানি আছে। ভেতরে ভেতরে ফুটছিল প্রশ্রয়ে। ওথলাল। কানের পাশে ঝরা চুল আঙুলের আদরে গুছিয়ে দেয়। নাকের ডগা কচলায়। গালের পাশ ঘুরিয়ে আনে। আধ-চাঁদ আদুর পিঠে হাত রাখে। বুলোয়। আঙুলের কিরিকিরি কাটে।

বিদিশা বুঝল রেবতীর এখন পূর্ণ ঘোর। মাখামাখি কাতর। বিদিশা আলগা হয় অথচ হয় না। নিজেকে টানটান করে। কূট বুদ্ধির ফসল। মাথায় হিসেব কাজ করে। বাছাধন মোহে আছে। মোহচ্ছিন্ন হলে অপেক্ষা করছে নিষ্ঠুরতা। চেনা আছে। মরদ জাতটাই সংসার বিবাগী। ভ্রমর বৃত্তি সহজাত ঝোঁক। দখলি স্বত্ব কায়েম হলে আর ফিরে তাকায় না। নিজেকে আবছা রাখতে হয়। রহস্য তাকাল তবেই টান। আর যতক্ষণ টান ততক্ষণ আশ। নিজেকে দামী না করলে দাম পাওয়া যায় না। ভেক চাই। ঘোর থাকতে কোপ দাও। বাজিয়ে নাও টেকসই হবে কিনা। জ্ঞান নিজের নয়। পই পই করে শেখান মায়ের শিক্ষা। বিদিশা মাকে মান্য করল। না উপেক্ষা না সাড়া। বিদিশা নির্বিকার। রেবতীর আবেগ ভোঁতা হয় বিদিশার শীতল প্রতিদানে। এমন ব্যাজার মুখ করে আছে কোনক্রমে সফর পোহালেই বাঁচবে। বিদিশার বাহুমূল স্তনবিভাজিকা হাট। দেখে দেখে রেবতীর ইচ্ছে হয় শুধোয় এতই যদি ধনি তবে আর সাধাসাধি কেন। অবদমিত কিন্তু তার মানে এই নয় রেবতী নিষ্ক্রিয়। এক তরফা হলেও আলগা আদরের পাটে সে লিপ্ত। বাহ্যবিভঙ্গের লিপ্ততায় উপোসী অঙ্গ হা হা করে। উপশম হয় না অন্তর্দাহ। অগত্যা আদরের আল বেয়ে সম্ভোগের ক্রিয়াভূমিতে প্রবেশার্থী। আগ্রাস হোঁচট খায়। বিদিশা অদ্ভুত নির্লিপ্ত। বিদিশা শরীর গুটিসুটি করে, ছলছলে চোখে আঁচল খসে। এক দফা দাবী পেশ করে। ঘ্যানঘ্যান করে আশ্বাসিত হতে।— বাড়িতে আমার মন বসে না। সারাদিন ধরে চলে মায়ের উপদেশ বাবার শাসন দাদার গঞ্জনা। আমার সহ্য হয়

না। আমাকে তুমি উদ্ধার করো।

প্রাণস্পন্দিত নশ্বরকান্ত শরীরী মহোৎসবে রেবতীর সমগ্র শিরা উপশিরা জর্জর। শেষ আশ্রয়ের মতো ওর ইচ্ছে হয় রবীন্দ্রনাথের গানের কলিটা একটু উলটে পালটে গায়। তোমায় যে সব দিতে হবে সে তো আমি জানি, তোমার যে সব কিন্তু প্রভু—

।।৩।।

চার বাচ্চাকাচ্চার এক গার্জেন মানে হোলসেল খদ্দের— তার পিছু পিছু চল্লিশাভিমুখী রেবতী বিদ্যাবুদ্ধি লজ্জা জলাঞ্জলি দিয়ে নাড়ুগোপালের মতন গতিশীল। বিরল দৃশ্য নয়। চোখ-সহা, ওত পেতে ছিল এক ভদ্রলোক। শাঁসাল মক্কেলের সঙ্গে কথাবার্তা দরাদরি শেষ করে যেই মুখ ফিরিয়েছে অমনি মুখোমুখি— বাবা, আমার মেয়ে বিদিশা। তোমার সঙ্গে কিছু কথা আছে।

রেবতী বুঝল জল ঘোলা হয়েছে। সংযত স্বরে বলল,— বেশ সন্ধের পর আসুন। কোচিং সেন্টারে।

সন্ধে উতরে গেছে। একটা ব্যাচ উঠি উঠি আর একটা ব্যাচ বসি বসি। উঠন্ত আর বসন্তদের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি কলরব। এমন সময়ে ওরা ঢুকল। রেবতী ওদের ভেতরে নিয়ে এলো। এখানে ছোট একটা রক আছে। নিভৃতি আছে। চেয়ার আনার উদ্যোগ নিতেই, থাক থাক শব্দ তুলে বাতাসে পাল্লা তোলে। বসে পড়ে রকের ওপর। পাশে হাত দেখিয়ে ভদ্রলোক বলেন,— ও হচ্ছে আমার ছেলে।

রেবতী মধ্য তিরিশ যুবককে চিনতে পারল। এলাকার নামী যুবক। তার অস্তিত্ব মানেই সন্ত্রাস। পদভারে এলাকা কাঁপে। ভদ্রলোক নিজেকে সামলে নিতে কিছু সময় নেন। অন্তর্গত উত্তেজনা থিতিয়ে এলে একনাগাড়ে শুরু করেন— বাবা তোমাদের নিয়ে পাড়ায় টি টি পড়ে গেছে। আমাদের তো সমাজে বসবাস করতে হয়। বুড়ি মানে বিদিশা আমার একমাত্র দায়। উড়নচণ্ডী পিতা আমি নই। কিছু কিছু করে গুছিয়েছি। পাকা মত পেলে বাকিটা যোগাড় যন্তরে নামব। তোমায় আমি ফাঁকি দেব না বাবা। আমার যা যা সঞ্চয় সবই দেব থোব। তুমি কথা দাও। বলে মুখটা ভাসিয়ে রাখেন। ভাসন্ত এক বিষণ্ণ বিগ্রহ। যেন শীতার্ত রাত্রি চেয়ে আছে সূর্যের দিকে।

রেবতীর পায়ের নীচে বসুন্ধরা টলে ওঠে। তার কবি সত্তা নারী বিষয়ে কত না রঙীন কল্পনার জাল বোনে। নারীর শরীর নারীর মুদ্রা নিয়ে কথা না রোমাঞ্চ ইসারা। সেদিক দিয়ে বিদিশা তার কল্পলোকে দখল নিতে পারেনি। মিশেছে মিশেছে। এক ধরনের বিনোদ পায। ঐ পর্যন্ত। তা বলে লগ্ন হয়ে যেতে হবে জীবনভর। প্রবল বাধা আসে। তাছাড়া...।

এখন তার আলুথালু অবস্থা। পসার জমানর খাঁত খোঁত রপ্ত হয়নি। মন্দা বাজার। ছন্নছাড়া কুমার জীবন। ভাঁড়ে মা ভবানীর পদধ্বনি। টো টো, রেঁস্তোরাবাজী, নিভৃতি জুটলে গা ঘস্টাঘস্টি এই ছিল বরাদ্দ। প্রতিষ্ঠা এলে ভাববে দাম্পত্য সুখ। এই ছিল প্রকল্প। ফেঁসে যাওয়া মানে চৌচির জীবনচর্চা। না না। রেবতী আমতা আমতা করতে থাকে। পরক্ষণে কথারহিত। অবশ হয় কোর। নজর করে সর্বাঙ্গ লেহন করছে এক শীতল দৃষ্টি। দারা সিং মার্কা কাঠামো। পেশী শক্তির ভাষা ঃ বেশী ট্যাণ্টাই ম্যাণ্ডাই বেগড়বাই করেছ কি ধুনে দেব। তপার শান্ততা বিরাজিত। রেবতী বুঝল এই শান্ততা আপাত শান্ততা। সবসর শেষ হলে গ্রাসে নামবে।

রেবতী চোখ মোদে। চোখের ওপর ভর করে বিদিশার আদল। দ্রাবিড় কাঠামো। নয়নাভিরাম নয়। বাবু সমাজে প্রদর্শনযোগ্য নয়। প্রকাণ্ড কাঁধ, মোটা, চ্যাপ্টা মুখ, কালচে বর্ণ। গড়ন এমন কিছু সুচী নয় শ্রীময়ী নয়। কর্কশ গলা। বিদ্যার চেয়ে বয়স চচ্চর করে এগিয়ে। পুঁথির সঙ্গে আড়ি। রটনা মনে আসে। পাগল ছাগল নারী/পুঁথির সঙ্গে আড়ি। যদিও নাম দেখে মনে হয় শিক্ষিত পরিবারের কাছাকাছি বাস।

ভাবের ঘরে চুরি না করলে কবুল করা ভাল সৌন্দর্যে বিদ্যায় খামতি আছে। তা থাক। এসব সত্ত্বেও একপ্রকার সেক্সীও বটে। প্রচুর স্বাস্থ্য, ওথলাল ঠোঁট, অপরিমেয় বুক... ভোগ ভোগ উসকানি। এক ধরনের চাপা উদ্দাম ইচ্ছে, পাওয়ার ইচ্ছে সম্ভোগের ইচ্ছে মোহগ্রস্ত মনের ওপর তরঙ্গের মতন ওঠানামা করতে থাকে। আকর্ষণ-বিকর্ষণের এ-এক লীলাময় সংঘাত। আলাপ চালিয়ে যাচ্ছেন বাবা। আসলে কিন্তু কলকাঠি নাড়ছে পুত্রসখা। বিয়ের বিপক্ষে অন্তত স্থগিতাদেশের বিপক্ষে মত দিতে উদ্যত হয়েও স্তব্ধ হয়ে যায়। সাহস আসে না। পেশীশক্তি কথাবিরহী। তাতে কি। স্তব্ধ থেকেও ব্যাপ্ত করছে ভাষা। যার সার অর্থ বর্জনের লাইনে গেছ কি অপেক্ষা করে আছে খঞ্জ জীবন।

রেবতী হাড়ে হাড়ে টের পায় প্রেমে অনেক হ্যাপা। হাই-টেক যুগেও। ক্রিয়া আছে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই। আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা অন্তত ফস্টিনষ্টির ময়দানে ধোপে টেকে না।

আকুতি আছে। জোরাজুরি নেই। কেবল পুত্রসখার উপস্থিতিই কড়া ডোজ। কাজ হয়। ভেতরের বিদ্রোহী ফোঁসফাঁস নেতিয়ে পড়ে।

।। ৪ ।।

এক পড়ন্ত দুপুর। সমারোহহীন তাড়াহীন গৃহস্থালী। অবারিত বাতাস ভেতরে ঢুকে গঠন করছিল প্রসন্ন শুদ্ধতা। সহসা তা চুরচুর করে ঝরে যায়। আড়ি পাতা

স্বভাব নয় রেবতীর। কাটা কাটা মন্তব্য তার কানে এসে বিঁধছে। উত্তীর্ণ দুপুরের শ্রান্ত রোদে এক ঝলক ঝাঁঝ। পড়শী এক প্রৌঢ়া এসেছেন তালাশ নিতে। বিনিয়ে বিনিয়ে তার নানান জিজ্ঞাসা। প্রশ্নে প্রশ্নে জেরবার বিদিশা উত্তর ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায় বুড়ি ছোঁয়ার মতো। আলাপ অব্যাহত রেখে প্রৌঢ়া বিদিশার কবজিতে হাত রাখেন। হাতে গলায় কানে ক্রমান্বয়ে আঙুলের স্পর্শ প্রদক্ষিণ করতে থাকে। অবশেষে তার আঙুল বিদিশার নাকের পাটায় যেখানে ফুটো আছে অথচ নাকছাবি নেই সেখানে স্থির হয়।

— তোমার বর খুব চালাক না। সব বুঝি লকারে।

বিদিশা আড়ষ্ট। বিব্রত গলায় বলে,— না না আমার যা যা দেখছেন তাই সব।

— সে কী বউমা। দু পক্ষেরই বাপ-মা আছে। তাদের কাছ থেকে আদায় হয়। কুটুমরাও দেয়থোয়। তুমি তো আর ঝুপড়িবাসী নও। সোহাগের এই সময় কর্তারাও এটা ওটা গুছিয়ে দেয়। চওড়া করে হাসে বিদিশা। রগড়ে গলায় বলে,— বাপ নির্ধন, সোয়ামি কুঁড়ে। কে দেবে মোর অলংকার গড়ে।

চলবে অনেকক্ষণ। পার্থিব পিণ্ডের অস্বীকার করতে রেবতী ঘর ছাড়ে। সন্ধে হলেই ছাত্র আসবে। আসুক। এসে ফিরে যাক। আজ বাণিজ্যের হাট ধর্মঘট। আজ সে টো টো করবে। হাঁটবে। শুধু শুনবে। শুধু দেখবে। ফিরে যাবে তার প্রিয় বিগত অভ্যাসে।

হাঁটতে থাকে রেবতী। নানান চিন্তায় জর্জর হয়ে। বিষয়ের কোন ঐক্যসূত্র নেই। শৃঙ্খলাহীন ভাবনার জগাখিচুড়ি। তারই মধ্যে সব প্রসঙ্গ ছাপিয়ে সংসার চরিত অধ্যয়নই মুখ্য হয়। ইদানীং লক্ষ করেছে, পথে ঘাটে আড্ডায় জমায়েত মানেই কানে ভাসে একটা বিষয়— যা আলোচনার কেন্দ্র জুড়ে থাকে। প্রসঙ্গ সমানাধিকার। বিষয়টা ওকেও খুব নাড়া দেয়। সমানাধিকারের একটা দিক হল স্বাধীনতার আস্বাদ। মতামত-সিদ্ধান্ত-গতিবিধি-ভোগ, সর্বক্ষেত্রে সমান অধিকার। বেশ। মেয়ে সমাজও ইসুটাকে বেশ নিচ্ছে। তা নিক। কিন্তু ভাববার আরো একটা দিক আছে। আর্থিক সহযোগিতার দিক। যৌথ দায়িত্ব। যৌথ যোগ্যতা। যৌথ রোজগার। তবেই না প্রকৃত যৌতক। তার ফলে আসে উন্নত জীবনযাত্রা। ভোগ বাড়ে। আরাম আসে। গল্প কথা নয়। নিজস্ব অভিজ্ঞতা। ঐ তো রতন। কী ছিল। হতশ্রী সংসার। যেই চাকরিকরা বউ পেল, যৌথ আয়ের দাপটে ঘরোয়া শ্রী পালটে গেল।

এদিকে বিদিশার অন্তস্থলও একই বিষয়ে উথাল পাথাল। এমনিতে মিষ্টভাষী। সহিষ্ণু। তারও মুখ ফসকে বেরিয়ে আসছে খোঁটা। দায়িত্বের বেলায় পুরুষ একা। আর দাবীর ক্ষেত্রে সাম্য। দু মুখো নীতি নয়। ঠেস, মেজাজ দিন দিন রুক্ষ হচ্ছে। আসলে অভাবের ফাঁক ফোকড় যত বড় হচ্ছে সংযম তত গলছে। অপমান লাগে। সবার মনে হয় ওরই বা দোষ কি। বাজার যা আখড়া। সামাল দিতে হিসসিম খাচ্ছে

বেচারা। সচ্ছল পরিবারের দিকে তাকালে যেমন দেখা যায় মেয়েরাও কেমন নেমে পড়ছে রোজগারে। নিজের প্রতি ধিক্কার আসে বিদিশার। তেমন বিদ্যে নেই চাকরি পাবে বা ঘরে বসে টিউশনি করবে। কারিগরি জ্ঞান নেই যে কিছু বানাবে। বানিয়ে বাজারে বেচবে। নিজেকে মনে হয় নিস্ফলা।

দিচ্ছিদেব করে খালি ব্লাফ। ধার দিয়ে চোট দেবে। এ হতে পারে না। আজ একটা হেস্তনেস্ত করার শপথে মরীয়া ললিত। রাগে গড়গড় করতে করতে ললিত এসে দাঁড়ায় রেবতীর দরজার গায়ে।

— রেবতী বাড়ি আছো নাকি।

হাঁক শুনে বিদিশার মগ্নতা ছিন্ন হয়। দরজা খুলে দিতেই মুখোমুখি।— আরে আপনি। আসুন। আসুন। নিজে সরে পাশ দেয় ঢুকতে। ললিত বসলে বলে,— একটু বসুন চা করে আনি। ও এসে যাবে।

ললিত ভদ্রতাসুলভ আপত্তি জানায়— থাক থাক অবেলায় আবার চা কেন।

বিদিশা চোখ কপালে তোলে— ওমা চায়ের আবার বেলা অবেলা আছে নাকি।

দায়সারা ভদ্রতা, 'চা খাবেন তো—' জিজ্ঞাসা নয়। যে জিজ্ঞাসায় তৃষ্ণা থাকলেও সায় দেওয়ার প্রবৃত্তি উবে যায়। এ আবেদনের প্রকৃতি আলাদা। কোন মতামতের তোয়াক্কা না করে বিদিশা চা তৈরীর আয়োজনে গমনার্থী।

চায়ে তৃষ্ণা ছিল না। কিন্তু আপ্যায়নের ভঙ্গি এবং মেজাজের প্রকাশ এমন সুন্দর যে মনে হয় এক কাপ নয় এক পট চা এনে দিলেও পান করবার ইচ্ছে জাগে। ললিতের মনে হয় এ মেয়ে বড়ই অতিথি-বৎসল। চা-এর সঙ্গে টা আনবে নির্ঘাৎ। ও তাই গলা চড়ায়— শুধু চা কিন্তু। অপাঙ্গে তাকায় বিদিশা। মেনে নেয় প্রস্তাব— বেশ শুধু চা-ই আনব।

নিরালা ঘরে বসে ললিত ধন্দে পড়ে। ভেবে এসেছিল রেবতীকে বাগে পেলে এক চোট নেবে। খেজুড়ে আলাপ নয় কাজের কথা পাড়বে স্ট্রেট। এখন মনে হচ্ছে বসি আরো কিছুক্ষণ।

বিদিশা চা আনছে। কথা রেখেছে। ধীর আড়ম্বরপূর্ণ ভঙ্গিতে নিয়ে আসছে শুধু এক কাপ চা। কাপ সমেত ডিসটা দিতে উদ্যত বিদিশা। অন্তরঙ্গ উদ্যোগ বিলি আর হাত পেতে নেওয়া নয়। এ যেন অর্পণ আর গ্রহণ।

ললিত ক্ষণিক আনমনা হয়ে পড়েছিল। ছাড়া-ধরার সন্ধিক্ষণে, মুহূর্তের হিসেব প্রথার ওধার। ব্যাস ঘটে গেল দুর্ঘটনা। গরম এক ঝলক চা চলকে পড়ে ললিতের তালুতে। সঙ্গে সঙ্গে হাতের ঝাপটা। উঃ আঃ কাতরোক্তি।

বিদিশা হতভম্ব। বিহ্বল। ত্রস্তে ছিন্ন করে বিহ্বলতা। —ইস। ক্ষিপ্র হাত কাপ-ডিস টেবিলে রেখে এক গ্লাস জল নিয়ে আসে। চটজলদি আঁচল ভিজিয়ে নেয়। মুঠো চেপে জল ঝরিয়ে ভিজে আঁচল আস্তে আস্তে লেপে দিচ্ছে ছ্যাকা লাগা ত্বকে।

স্নেহস্পর্শ কি বাড়তি স্থায়িত্ব পেয়ে যাচ্ছে। আরাম লাগছে। প্রলেপে স্নিগ্ধ হচ্ছে ত্বক। প্রচ্ছন্ন আস্কারায় ললিত কি বেশিক্ষণ ধরে রাখল কষ্টের অহিলা।

সেবা পর্ব শেষ। আলগোছে সানন্দার পাতা ওলটাচ্ছে ললিত। রেবতীর জন্য অলস প্রতীক্ষা। নীরবতা ভঙ্গ করল বিদিশা— আমি জানি আপনি কেন এসেছেন। এটা ওর ভারি অন্যায়। কত দিন হয়ে গেল।

ললিতের ভেতরটা অনুতাপে পুড়তে থাকে। মনে হয় বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। নেহাত ঠেকায় পড়ে নিয়েছে। মেরে তো দেবে না। আর একটু মধুর করলে কী এমন যাবে আসবে। যতই হোক বাল্য বন্ধু তো বটে। নিজেকে শোধরায় ললিত। বলে— ওরই বা দোষ কি। বেচারা উদয়াস্ত খাটছে। অবস্থা ফিরলে না হয় ফেরত দেবে। যাক ওকে আর পাওনাগণ্ডা নিয়ে কিছু বলবেন না। বলতে বলতে ললিত বার দরজার দিকে এগোয়।

বিদিশা এগিয়ে দিতে দরজা অবধি আসে। বিদায়ের পূর্বক্ষণে একটা পাল্লায় ঠেস দিয়ে স্মিত হাসে। আশ্বস্ত করে,— আপনি যে এসেছিলেন তাও বলব না।

দৈন্যপীড়িত জীবনে আমোদ প্রবাসী। রেবতীর ক্ষেত্রে এ নিয়ম ঠোক্কর খায়। বিদিশার স্বাস্থ্যময় সঙ্গ, রসবতী শাখাপ্রশাখার অঙ্গাঙ্গী প্রশ্রয় রেবতীর হা-হা স্নিগ্ধ করে। ক্লান্তি হরায়। আজ অন্য রকম ঘটল। যথারীতি ধোয়ামোছা গোছগাছের পাট তুলে বিদিশা পুরুষালি কোলপুষ্ট হতে প্রথা মাফিক আলগা হয়, তো রেবতী নিঃসার। ভোগ্য পণ্য হওয়া ছাড়া যে রমনীর অন্য কোন সার্থকতা নেই তাকে অন্তত স্ত্রী হিসেবে ভাবতে আজ তার অবসাদ।

রাত প্রায় ১০টা বাজে বাজে। ধূলাক্কার ক্লান্তি বাহিত শরীরে রেবতী বাড়ি ফিরলে দেখে কোন সাড়া নেই। ইতি উতি তাকাতে নজরে আসে ঘরের এক কোণে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছে বিদিশা। কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদে জর্জর করে। কোন উত্তর নেই। অনেক পীড়াপীড়িতে ফল ফলে। করতলে ঢাকা মুখ ভাসায়। বড় চোখে তাকাল। অতল— তোমার বন্ধু আমার হাত ধরেছে। স্বামীত্বের দর্পে স্ফীত হল রেবতী— এতবড় স্পর্ধা।

— আমায় কুপ্রস্তাব দিয়েছে।

মাটিতে পা ঠেকে রেবতী। গর্জায়।— ঠিক আছে। শুয়োরের বাচ্চার সঙ্গে হিসেব তোলা থাকল।

রেবতী ঘটা করে চান করল। জলকেলি এবং পেটে দানাপানি পড়তে সর্বাঙ্গ এলিয়ে আসে। আস্তে আস্তে ক্ষণ যত ক্ষয় হচ্ছে ক্ষয়ে যাচ্ছে বিদ্বেষ আক্রোশ। ঝরে যাচ্ছে সমর মনোভাব। মনে হচ্ছে উত্তেজনামশত যুক্তির দিকটা গ্রাহ্য করেনি। করলে, প্রসঙ্গটা অতটা গুরুত্ব পাবার যোগ্য হত না। সংশোধিত যুক্তিবাদী। রেবতী বিদিশাকে ডাকে। কাছে বসায়। পাদ্রীসুলভ বরাভয় ভঙ্গিতে উপদেশ দেয়— তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে বেশি কচকচি করছ। মফস্বলী পবিত্রতা

গ্রামীণ অভিমান এখনো তোমার মনে ধিকি ধিকি টিকের আগুনের মতন টিকে আছে। তাই এতো ছুৎমার্গ ইনহিবিশন। ধৈর্য ধরো। ক্রমশ শহুরে পবিত্রতা গ্রাস করবে। তুমি চালাক হবে। চৌকোশ হবে। যুক্তি দিয়ে ব্যাপারটা বোঝ তাহলেই একলাপনার বিলাসিতা ঘুচে যাবে। ভূমিকা সেরে মূল প্রসঙ্গে চলে আসে। হাত ধরেছে তো কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়েছে। হাতটা ধুয়ে নিলেই পরিষ্কার হয়ে যাবে। বাইরের দিকে তাকাও। ট্রেনে বাসে ট্রামে ভিড়ের সুযোগ নিয়ে পুরুষেরা চটকে দিচ্ছে না কত মেয়েছেলেকে। আমাকে দেখছ না কেমন করে প্রতিদিন আত্মা বিকিয়ে যাচ্ছে গার্জেনদের কাছে ছাত্রদের কাছে পাওনাদারদের কাছে। কথাগুলো উদগার করতে পেরে রেবতীর অহং তৃপ্ত হয়। সহ্য করুক অত্যাচারের সমানাধিকার।

দলিত ভুজঙ্গীর মত বিদিশা তাকায়। কর্মে অপটু হতাশ পুরুষগুলো গাদা গাদা চিন্তার ভরতুকি দিয়ে অতিশয় চালাক সাজে। কেন জানি আজ কথাটা মনে এলো বিদিশার।

চাকা ঘুরেছে। বিদিশা এখন রোজগারে হাত পাকিয়েছে। নানান অর্থকরী কাজে লিপ্ত। ছেলে-ছোকরাদের দিয়ে ফ্যাক খাটায়। প্রতিষ্ঠিতদের দিয়ে বরাত জোটায়। নানান ধরনের লোকের আনাগোনায় ঘর সর্বক্ষণ গমগম করে। বিদিশার চারপাশে অনুক্ষণ বৌদি বৌদি গণরব। স্বনিযুক্ত পেশা। কমিশন ভিত্তিতে অর্ডার সাপ্লাই করে। উদয়াস্ত লড়ছে। সত্যি বলতে কি বিদিশার খাটনি সংসারকে স্বচ্ছলতার ঘাটে পৌছে দিয়েছে। নিম্ন মধ্যবিত্তর খাল ডিঙিয়ে উচ্চবিত্তের বেলাভূমিতে এখন বসবাস। এখন আমরা এক কথায় হাইটেক বিপ্লবপুষ্ট তৃতীয় বিশ্বের মধ্যবিত্ত বাঙালী। সংযোগ এবং সংযোগহীনতায় পুষ্ট অন্তরঙ্গ জীবন। জনজীবন। স্বামী ও স্ত্রীও একে অপরের প্রতিযোগী মাত্র।

রেবতী হাড়ে হাড়ে এই সত্য টের পায়। অবশ্য এই তো সে চেয়েছিল। সর্বাঙ্গে লেপটে থাকা ভোগ্য পণ্যের কলঙ্ক বিদিশা মোচন করেছে। প্রকৃত অর্থেই এখন সে সখা। তারই ইচ্ছের আদলে গড়ে ওঠা। দিনরাত খাটছে বিদিশা। দেখতে দেখতে গড়ে উঠল লাগোয়া ঘর। কোলের ছেলেমেয়ে নিয়ে নির্বাক শয্যা-রতির অবসান। বেশ মনে আছে প্রথম যে দিন ঘরটার দখল নেয় সে কী সমারোহ। পণ্য সম্ভারে প্রাচুর্যে রঙে রূপে গন্ধে নতুন আদল। গা ধুয়ে পরিপাটি হচ্ছে বিদিশা। রেবতীর দিকে চোখ পড়তেই থামা।

— শুয়ে আছো যে।

— ডিভানটা বেশ। আরাম আসে। বিশ্রাম নিচ্ছি।

— বাঃ, ভর সন্ধ্যেয় পড়ে পড়ে বিশ্রাম নিচ্ছ। তুমি কী গো—

— তাহলে এসো শুয়ে শুয়ে শ্রম করি।

— তবে রে, চিরুনি হাতে বিদিশা তেড়ে যায়। চিরুনি চ্যুত। চুলের ঝুটি ধরে

ঝাঁকানি দেয়। ভর্ৎসনা করে,— পাজী কোথাকার। দিন দিন ধাড়ী হচ্ছ আর রস বাড়ছে।

কিছুই নয়, খুনসুটি। রসেবসে থাকলে যে উদ্দীপনা আসে তারই বহিপ্রকাশ। কিন্তু সিঁদুরে মেঘ আভাস পায় রেবতীর নজরে। ও চমকে ওঠে। ওর চোখ এড়ায়নি। বিদিশার চোখের ক্লিশ্টতার ছায়া। সোহাগ স্পর্শেও উদ্বাস্তু দৃষ্টি এবং আনুষ্ঠানিকতার কেমন যেন সংকেত। জীবন ক্লিন্ন হলে, হা-হা অর্ন্তভূমির উৎস থেকে যা উৎসারিত হয়।

অনেক পেয়েও রেবতী যন্ত্রণায় ভোগে। মুক্তি আসে না। রাস্তার কোচিংয়ে নিভৃতিতে হরেক বন্ধন তাকে অনুসরণ করে। সন্দেহের বন্ধন বিমর্ষতার বন্ধন উত্তেজনার বন্ধন। বন্ধনে বন্ধনে জর্জর রেবতীর এই সময় গান্ধীজীকে মনে পড়ে। সম্ভোগের অন্তর্গত ট্রেজেডির বীজ আঁচ করেই কি তিনি ভারতীয় সমাজে বিলাসের জীবনকে পরবাসী করতে চেয়েছিলেন। হায় গান্ধীজী ভারতের মাটিতে তুমি পা পেলে না। আদর্শে কর্মে জীবনভঙ্গিতে তুমি নেই। টিকে আছ ফটোতে আবক্ষ মূর্তিতে উদ্ধৃতিতে খাদির রিবেটে সরকারী ছুটিতে। বেঁচে থাকলে নিশ্চিত বিলাপ করতেন : রেখো মা দাসেরে মনে।

ঠিকই এমন একটা সময় এসেছিল যখন ওরা থাকত যে যার মতো। আলগা আলগা। প্রথম প্রথম ভালই লাগত। ঘটাঘটি নেই। ঘ্যানঘ্যান নেই। কটুক্তি নেই। বচসা নেই তিক্ততা নেই। বন্ধন না থাকলেও একটি বন্ধনের তৃষ্ণাই যে সহস্র বন্ধনের বাড়া মর্মে মর্মে তা সে টের পাচ্ছে। আজ পারস্পরিক বিশ্বাস আস্থা মর্যাদাবোধের ছিন্ন বেষ্টন ফিরে পেতে চাইছে রেবতী। বড্ড দেরী হয়ে গেল? হোক না। বেটার লেট দ্যান নেভার। আজই বিদিশার সঙ্গে বোঝাপড়া চাই।

এক অদ্ভুত টানে প্লাবিত হয়ে রেবতী বিদিশাগামী হয়। ডাক দেয়— বিদিশা। বি-দি-শা...।

যেন যুগের ওপার হ্যতে ভেসে এলো ডাক। নাম ধরে কাটা কাটা উচ্চারণে ডাক। বিদিশা আমূল চমকে উঠল। লঘু পায়ে আচ্ছন্ন গতিতে সে কাছে আসে। কাতর গলায় রেবতী ভিখারি হয়— একটা কথা বলব। অদ্ভুত চোখে তাকায় বিদিশা। ছোট ছোট চোখে বিশাল জিজ্ঞাসা— কী কথা।

— আজ নয় কাল বলব। শুনে বিদিশা কোন পীড়াপীড়ি করল না।

সেই কাল আজ এসেছে। ভাল রকম মহড়া ছিল। বেশ গুছিয়ে বলতে শুরু করল— তোমার সঙ্গে বোঝাপড়া আছে। শোনামাত্র, ঋজু হয়ে দাঁড়িয়েছিল বিদিশা। মুখটা নত করল। মুহূর্তের জন্য সারা শরীরে কম্পন ছড়ায়। নিরাপত্তা বোধে আতঙ্কিত, ফ্যাকাসে গলায় বলে,— বোঝাপড়ার কি আছে। তুমি যেমন চাইবে তাই হবে।

— না না এভাবে চলে না বিদিশা। দু জনেরই প্রচুর ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে। তুমি কথা দাও আজ থেকে আমরা পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্ত এবং আস্থাশীল থাকব। বড় বড় কথার তাৎপর্য বিদিশার মাথায় কিছুই ঢুকল না। কিন্তু ও বুঝল রেবতী ভাব করতে চাইছে। বিদিশা কি সচেতনে প্রস্তুত হচ্ছিল। ওর যুগ্ম মুখ সন্ধিপ্রবণ। তা লক্ষ করে রেবতীর উৎসাহে জোয়ার আসে।— আজ আর কোলাহল নয়। কোন বাড়তি অতিথি নয়। আমিও টিউশনিতে যাচ্ছি না। গোটা দিন শুধু তুমি আর আমি।

—বেশ তো।

রেবতী দেখল স্ত্রীত্বের গৃহপালিত মায়া এখনো সুকুমার রেখেছে বিদিশার মুখ।

নির্ভার রেবতী চটিতে পা গলায়। বারমুখো হতে উদ্যোগী হলে বিদিশা শুধোয়— চল্লে কোথায়।

— একটু আড্ডা মেরে আসি। অনেক জমেছে। খোলসা করতে হবে।

— ওসব মতলব আজ ছাড়ো। এসো আমার সঙ্গে। হাত লাগাও। জমিয়ে রাঁধি। স্বাদ বদল করি।

শাসন মধুর রাগে। রেবতী নেওটা বনে যায়। নাম কা ওয়াস্তে আপত্তি জানায়। প্লিজ যাব আসব।

— প্রমিস? বিদিশা চোখ পাকায়।

— প্রমিস।

রেবতী লঘুছন্দে হাঁটতে থাকে। ঠেকে এসে দেখে ধূ ধূ। খোঁজাখুঁজি না করে রেবতী পিঠটান দেয়। ফুলের দোকানটার সামনে থমকে দাঁড়ায়। ইতস্তত করে অবশেষে কাছে যায়। বেছে বেছে পাপড়ি দিয়ে ঘেরা বোঁটাসমেত আধ ফোটা ২টো গোলাপ কেনে। শালপাতায় মুড়ে সুতো দিয়ে বেঁধে পকেটে রাখে। অনেক সুস্থির লাগছে। স্বামীত্বের অধিকার থেকে তাকে যে বঞ্চিত করেনি বিদিশা এটা ভেবে, যে নৈরাশ্য তাকে পীড়িত করছিল এতদিনে তা দূর হল।

বাড়ি ফিরে ভারি খুশি হল রেবতী। কথা রেখেছে বিদিশা। বাহুল্য কোলাহল নেই। নিঃসঙ্গ প্রার্থনায় বাড়িটা তারই প্রতীক্ষা করছে। ঘরটা বেশ ছিমছাম পরিচ্ছন্ন লাগছে। আসবাবপত্রে বিদিশার হাত পড়েছে সদ্য, তাই এমন ঝকঝকে। জানালায় দরজায় রঙীন আকাশী পর্দা ঝুলছে। প্রসন্নতায় ভরে উঠছে মন। কাজের ফাঁকে বিদিশা এ ঘরে ঢুকলে রেবতী পকেট থেকে ফুল দুটো বার করলো। দুটো ফুলই বিদিশার হাতে বাড়িয়ে দিল। বিদিশা ফুল নিয়ে নাকে শুঁকল— একদম তাজা। রঙটাও রেয়ার। বোঁটা শুদ্ধু ফুল আমার খুব ভাল লাগে। বিদিশা তারিফ করল। ফুলটা নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে এবং ঘ্রাণ নিয়ে

লঘু হাস্যে, কটাক্ষে দীঘির ছায়া নামিয়ে— সব ফুল একা কেন। একটা তুমি নাও, বলে একটা ফুল বাড়িয়ে ধরে, রেবতী হাত বাড়ায়। অঞ্জলি পাতে। বলে— দাও।

দিতে দিতে বিদিশা ফোড়ন কাটল— তোমার ফুলই তোমাকে দিচ্ছি।

রেবতী হাসল।— তবু তুমিই সব দিলে। দিতেও দিলে নিতেও দিলে।

বকেয়া কাজ মনে পড়তে বিদিশা ক্ষিপ্র পায়ে ঘর ছাড়ে।

কেবল রান্নার ক্ষেত্রে নয় প্রসাধনের প্রতিও বিদিশা আজ খুব যত্নশীল। ফুলিয়া তাঁত বক্র রেখায় বেষ্টন করে আছে শরীর। অগ্রহায়ণের পাকা ধানের খোলের মত। হাত কাটা লাল জামা। অর্ন্তবাস নেই। টু বাই টু রুবিয়ার অন্তর ভেদ করে স্তনের আবছা উল্লাস। ব্যাপ্ততা। এমনিতেই ওর ওটা বেশ বড়সড়। এক মুঠি নয়। ব্রা শাসিত না থাকায় এক্ষণে লুজ লুজ। ওথলান। বিশালে উচ্ছ্বসিত। রসবতী দেখায়। ঠোঁটে গাঢ় লিপস্টিক। মিত আহারী হয়ে, কপট শ্রম করে ঝরিয়ে দিয়েছে বাড়তি মেদ। কৃশতা এবং বনসাই চুলে ঝরে গেছে কয়েক দাপ বয়স। কালচে রঙ কেমন ফিকে হয়ে এসেছে। চোখে মায়াঞ্জন থাকলে দেখতে ফর্সা ফর্সা লাগে। বেশ লাগছিল দেখতে। যেন প্রেমধারা সাজে অভিসার সাজে। দর্শনের পূর্ণ আশ মেটার আগে সেই যে গেল আসার নাম নেই।

গুরু ভে জে ঝিমুনি আসছে। আজ রেবতী আলস্য পাত্তা দিতে চায় না। ঢুল তাড়াতে কলঘর যায়। চোখেমুখে জলের ঝাপটা দেয়। চাঙ্গা হতে হতে ভাবে ঐ ওর বদ অভ্যেস। কিছুতেই একান্ত হতে তাড়াতাড়ি আসে না। অপেক্ষার তর সইতে হয়। এমনকি বিয়ের প্রথম দিকেও তাই করত। রাতের দ্বিতীয় যাম প্রায় কাবার করে ও আসত। অনুযোগ করলে বলত : আমার যে লজ্জা করে। আজও কি লজ্জার সেই উত্তরাধিকার বহন করছে। অতিষ্ট রেবতী হাঁক দেয়।— কই গো পান দিলে না। শুনতে পেল বিদিশা। মনে মনে হাসল। বাহানা, তর সইছে না, সাড়া দিল কণ্ঠস্বরে।

— তুমি আবার পানের ভক্ত হলে কবে থেকে।

— যা খাওয়া খাইয়েছো। পান না হয় মুখশুদ্ধি যা হয় কিছু নিয়ে এসো তো।

বিদিশা মনে মনে হাসে। সব ছল। মেয়ে কুনো হলে পুরুষগুলো সমন করে। বুঝেও বিদিশা মুখ ঝামটা দেয়।

— যাচ্ছি গো যাচ্ছি। আর একটু সবুর কর। একেবারে সব তুলে আসছি। ততক্ষণ এফ এম শোন।

রেবতী যখন অপেক্ষায় ক্লান্ত হতে হতে দীর্ণ বিদীর্ণ বিদিশা আসে। ঘেমো মুখ আঁচলে ঘসতে ঘসতে। রেডিওতে গান হচ্ছিল। বিদিশা ঢোকামাত্র রেবতী

নব ঘুরিয়ে অফ করে— বন্ধ করলে যে। কীর্তন তোমার ভাল লাগে না। বিদিশা প্রশ্ন ছোঁড়ে।

— লাগে যদি তা দূর থেকে ভেসে আসে। বিদিশা কথায় ইস্তফা দেয়। ক্ষিপ্র পায়ে চলে আসে রেবতীর নিকটতমে। বাঁকা হয়ে দাঁড়ায়। পাছাপেড়ে শাড়ীতে পাছা দ্রষ্টব্য করে। জামার হুকে হাত রাখে। বিলোল কটাক্ষে বলে,— খুলি?

াবুক পড়ল পিঠে। রেবতী চমকে ওঠে। একি দেখছে সে। এতো মায়ের রূপ নয়। কন্যার আদল নয়। বধূর শোভা নয়।

ভেবেছিল জীবনের হাটে পকেট মেরে পার পাবে। পেল না। উলটে জীবনই রেবতীর পকেট মেরে দিয়ে একেবারে দেউলে করে ছেড়ে দিল।

দ্বৈরথ

কেশব দাশ

মালখানা ছেড়ে বেরিয়ে আসে বংশী। রাত জেগে শালিমার রেল ইয়ার্ডে ডিউটি দিয়েছে। ডিউটি খতম হতেই সকালে লাইন ধরে মালখানার ঠেকে ঢুকে পড়েছিল। দু ভাঁড় ঝাঁঝাল তরল গলায় ঢেলে রাত জাগার ক্লান্তি শরীর থেকে নিকেশ করে ঠেক ছেড়ে বেরিয়ে এলো এখন।

নাইট শিফটে ডিউটি থাকলে রাতভিতে কখনো নেশা করে না বংশী। বংশী সিগন্যাল ম্যান। শালিমার রেল ইয়ার্ডের। নেশা করে ডিউটি করলে. কখন কি ভুলভাল সিগন্যাল দিয়ে দেবে, তখন হাতে হ্যারিকেন। অখেশ যাদব নেশা করে রাতে সিগন্যালে ডিউটি দিত। একদিন নেশার ধুনকিতে লাল বাতির সিগন্যাল দেওয়ার বদলে নীল বাতির সিগন্যাল দিয়ে দিল। ইঞ্জিন সামনে এগোতে গিয়ে আটকে গেল কাফলিং-এ। চাকরি থেকে মাসপিন হয়ে গেল অখেশ যাদব।

নেশার তড়াসে পা-টা একটু টলে বংশীর। সকালের রোদটুকু বড় চড়া মনে হয়। বড় ঝলমলে উজ্জ্বল। সূর্যের আলোর সাতটা রঙ ঘোর লাগা চোখে ঝলকে ওঠে। বংশী হাতের চেটো দিয়ে চোখ দুটো কচলে নেয়। পায়ের টাল সামলে নিয়ে স্বাভাবিকভাবে হেঁটে চলে। বংশী তো আর দু-দিনের নেশাড়ি নয়, যে, একটু পেটে পড়লেই একেবারে বেহেড হয়ে যাবে।

বংশী এখন সোজা ঘরে চলে যাবে। ঘরে গিয়ে স্নান করবে। খাবে। তারপর বিছানায় শুয়ে ঘুম দেবে লম্বা। একটানা।

লাইন ধরে বংশী গুড সেডের দিকে এগোয়। গুড সেডের আগে প্লাটফর্ম। লম্বা টানা প্লাটফর্ম পাঁচটা। গুডস্ ট্রেনগুলো ঢোকে প্লাটফর্মে। মাল খালাস করে। কোনো যাত্রীবাহী ঢোকে না। অথবা ছাড়েও না শালিমার থেকে। সুতরাং প্লাটফর্মগুলোয় মানুষজন তেমন নেই। ফাঁকা। এক নম্বর প্লাটফর্ম ধরে বংশী হাঁটতে থাকে। প্লাটফর্ম পার হয়ে ও ডাইনে বাঁক নেবে। সামনে পড়বে রেল গেট। রেল গেট পার হয়ে একটু হাঁটলেই পড়বে রেল কলোনি। কলোনিতে ওর ঘর। বংশী এখন ঘরে যাবে।

প্লাটফর্মের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ একটা কান্না, কোনো শিশুর, ওয়াঁও ওয়াঁও স্বরে— শুনতে পায়। বংশী থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। আশেপাশে মানুষজন কেউ নেই, তাহলে বাচ্চার কান্না ভেসে আসে কোত্থেকে? বংশী দাঁড়িয়ে পড়ে কান্নার উৎস অনুধাবন করার চেষ্টা করে। আবার কানে পৌঁছায় 'ওয়াঁও ওয়াঁও...' বংশী ঘুরে দাঁড়ায়। একটু তফাতে প্লাটফর্মের কিনারে যে সাবেক অশ্বত্থ গাছটা, তার নিচে আসে। গাছটার গোড়ায় একটা বেদি। সিমেন্টের। গাছটার

চারধারে বেড় দেওয়া। বংশী ঘুরে বেদিটার পেছনে চলে যায়। আর তখন ওর চোখে পড়ে একটা শিশু রেলিংটার কিনারে ভুঁয়ে পড়ে রয়েছে। শিশুটার গায়ে একটা ছেঁড়া ন্যাকড়া জড়ানো। শিশুটা খুদে একরত্তি। সম্ভবত কয়েক ঘন্টা আগেই ও পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হয়েছে। সকালে সূর্যের ওম আজই প্রথম ওর শরীর স্পর্শ করল।

বংশীর মাথায় নেশার ঘোর, বাতাস লাগা কলা পাতার মত, ছিঁড়ে ফাল ফাল হয়ে যায়। ভুঁয়ে পড়ে থাকা শিশুটার জন্য ওর মন মমতায় ভরে ওঠে। এখন কি করে বংশী? বংশী প্লাটফর্ম ধরে দৌড়তে থাকে। একটু যেতেই প্লাটফর্মের গায়ে বুকিং অফিস। বংশী অফিসের ভেতর ঢুকে যায়। সকাল শিফটের কয়েকজন বাবু বসে রয়েছে। সকলেই চেনে বংশীকে। বংশীকে পড়িমরি আসতে দেখে একজন প্রশ্ন করে, 'কি হয়েছে রে বংশী?'

'একটা বাচ্চা...'

'কিসের?'

'মানুষের। একটা বাচ্চা ছেলে...'

' কি হয়েছে?

'পড়ে আছে, বাইরে, প্লাটফর্মের ধারে একটা অশ্বত্থ গাছ আছে, তার নিচে।'

' পড়ে রয়েছে?'

বংশী বলে, 'হ্যাঁ।'

বংশীর দেওয়া খবরটার মধ্যে ওরা কিছু গোপন রহস্যের ইঙ্গিত পায়। চ তো দেখি—' বলে সবাই হু হু করে অফিস ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে পড়ে। বুকিং অফিসের বাইরে বসেছিল একজন লোডার আর খালাসি। তাদের কানেও সংবাদটা পৌছে যায়। তারাও বাবুদের পিছু নেয়। মুহূর্তে অশ্বত্থ গাছটা ঘিরে মানুষের একটা জটলা তৈরি হয়ে যায়। জটলায় মানুষ ফিসফাস করে নিজেদের মধ্যে। গুঞ্জন ক্রমশ যার উচ্চকিত হয়ে ওঠে।

'এ তো একটা বেজন্মা।'

'এ নিশ্চয় কোনো নষ্ট মেয়েছেলের কাজ।'

'তাই তো। সুখ মারাতে গেছিল, ফেঁসে গেছে, এখন...'

'কি যে পড়ল দিনকাল।'

'তাই তো!'

'আর দু-দিন বাদে, দেখবেন, মেয়েমদ্দগুলো কুত্তার মতো পথে ঘাটে বেলাল্লাপনা করে বেড়াবে।'

'দেশের আর কিছু রইল না মশাই।'

'বেজন্মায় ভরে যাবে সারা দেশ...'

'ছিঃ ছিঃ ছিঃ'

ধিক্কার দিয়ে একে একে সবাই সটকে পড়ল। বংশী একা দাঁড়িয়ে রইল বেকুফের মতো। বাচ্চাটা কচি হাত দুটো নাড়ছে একটু একটু করে। এতটুকুন ফুটফুটে বাচ্চা। যেন একটা ছোট্ট পুতুল। আর বলিহারি যাই, যে ওকে এখানে ফেলে দিয়ে গেছে, সে কি একটা মানুষ নয়? ওই সিমেন্টের বেদিটার ওপর শুইয়ে রাখতে পারে নি। এভাবে ভুঁয়ের ওপর ফেলে রেখে যায় কেউ? আসলে শিশুটাকে মারতেই চেয়েছিল সে, কিন্তু নিজের হাতে মারতে পারে নি পাপের বোঝা বেড়ে যাবে এই ভয়ে। তাই স্বাভাবিকভাবে ওর মৃত্যু সুনিশ্চিত করার জন্য ভুঁয়ে শুইয়ে রেখে গেছে। কিন্তু এভাবে মাটিতে শুইয়ে রাখলে বাচ্চাটাকে পোকা-পতঙ্গে ছেঁকে ধরবে। গায়ে তো ওর এখনো আঁতুড়ের আঁশটে গন্ধ। ওর শরীর বেয়ে সুর সুর করে উঠে আসবে ঝাঁক ঝাঁক ডেঁয়ো পিঁপড়ে। ওর আধ ফোঁটা চোখ দুটো কুরে কুরে খাবে। ওইটুকু শরীরে কতটুকুই বা প্রাণ ওর।

বংশী সামনে হেঁট হয়ে দুই হাতের তেলোয় বাচ্চাটাকে তুলে ধরে। সন্তর্পণে সিমেন্টের বেদির ওপর শুইয়ে দেয়। সোজা হয়ে দাঁড়ায়, এবং হাত দুটো ঝেড়ে নিয়ে ভাবে, এবার আমার দায়িত্ব খালাস। সবাই তো মজা দেখে পালাল। আমিই বা উদোর পিণ্ডি ঘাড়ে নিই কেন...

বংশী গাছতলা ছেড়ে সামনের দিকে পা বাড়ায়। কয়েক পা গেছে, আবার সেই কান্না, শিশুটার— 'ওয়াঁও ওয়াঁও...'। ওর পা দুটো যেন মাটিতে গেঁথে যায় হঠাৎ। আর এগোতে পারে না। অবোধ মনটা ওর বুকের ভেতর আঁচড়ায়। মমতার টান আবার ফিরিয়ে আনে গাছতলায়।

শিশুটা কলের পুতুলের মতো হাত দুটো নাড়ছে। ওর খিদে পেয়েছে নিশ্চয়। আহা-রে। বংশীর মন শিশুটির প্রতি স্নেহে আর্দ্র হয়ে ওঠে। এভাবে বেদির ওপর পড়ে থাকাও নিরাপদ নয়। চিলে ছোঁ মারতে পারে। কাকে ঠোকরাতে পারে। কুকুর নিয়ে যেতে পারে মুখে করে। 'কিন্তু আমি কি করব।' নিজের মনকে নিজে খেঁকিয়ে ওঠে বংশী। নিজের ওপর রাগ হয়। শিশুটার ওপর রাগ হয়। কটমট করে তাকায় শিশুটার পানে। 'কি কুক্ষণে যে এপথ মাড়িয়েছিলাম। সকালের নেশাটা গেল চটকে। তার ওপর উটকো ঝামেলা যতসব।'

বংশী ইতস্তত করতে করতে শিশুটার পাশে বেদির ওপর বসে পড়ে। সবাই তো মজা লুঠে কেটে পড়ল। কিন্তু যেহেতু ও প্রথম দেখেছে শিশুটাকে মাটিতে পড়ে থাকতে, তাই ওর একটা দায় থেকেই যায় শিশুটির প্রতি। এই দায় এখন ও ঝেড়ে ফেলে পালাতে পারে না। এই দায়বোধ ওর চেতনাকে দংশন করে। শিশুটা মরবেই, এভাবে পড়ে থাকতে থাকতে, নাও যদি চিল কুকুরে টেনে নিয়ে যায়, মরবেই, পড়ে থাকতে থাকতে, খিদের রোদের তাপেতে, মরবেই...

বংশী আর একটু সরে বসে ছেলেটার কাছে।

ছেলেটা মরবেই, আর সে মৃত্যুর পাপ কি বংশীর লাগবে না? কারণ বংশী

প্রথম দেখেছে ছেলেটাকে পড়ে থাকতে। ওর অজ্ঞাতে ছেলেটা মরলে ওর কোনো দায়িত্ব থাকত না। পাপবোধও জাগত না মনে। কিন্তু এখন নিজের দায়িত্ব এড়িয়ে পালায় কিভাবে?

দু-হাত বাড়িয়ে শিশুটাকে কোলে তুলে নিতে চায় বংশী। কিন্তু নেবেই বা কিভাবে? যে মানুষটা ফেলে রেখে গেছে, সে এতই পাষণ্ড যে, সঙ্গে একটা কাঁথাও দেয় নি। বংশী নিজের জামা খোলে গা থেকে। জামাটা পাট করে রাখে বেদির ওপর। দুই হাতের তেলোয় শিশুটাকে তুলে নিয়ে রাখে পাট করা জামার ওপর। অতঃপর জামার তলা দিয়ে হাত ঢুকিয়ে শিশুটাকে কোলে তুলে নেয়।

প্লাটফর্ম ধরে গুডস সেডের দিকে এখন যাবে না বংশী। ওখানে লোডার খালাসিরা বসে আছে। বাবুদেরও চোখে পড়ে যেতে পারে। ওকে এভাবে দেখলে ওরা হাসাহাসি করবে, পিড়িক দেবে। তার চেয়ে উল্টো পথে ঘুরে যাওয়া ভালো।

বংশী শিশুটাকে বুকের কাছে আঁকড়ে ধরে লাইন টপকে টপকে হাঁটতে থাকে। কোলে আশ্রয় পেয়ে শিশুটা মুঠো করা দুটি হাত পাকিয়ে লম্বা একটা হাই তোলে। চোখ দুটো ওর বুজে আসে। এতটুকুন জিভ বাড়িয়ে ঠোঁটের কিনারা চোষে।

বংশী বোঝে ছেলেটার খিদে পেয়েছে। লাইন পার হয়ে বংশী শালিমার দু-নম্বর গেটে আসে। সামনে দয়ারামের চায়ের দোকান। ও দোকানের সামনে এসে দাঁড়ায়। দোকানের ভেতর তখন কয়েকটা লোক বসে চা খাচ্ছিল। সকালে বংশীকে কোলে বাচ্চা নিয়ে অনাথের মতো দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ওরা আশ্চর্য হয়।

'কিস্‌কা বাচ্চা রে বংশী?'

'পড়া হুয়া থা।'

'কিধার?'

'প্লাটফর্ম কো বগল।'

'উটা লিয়া?'

'লিয়া তো। নহি তো পড়া রহতে রহতে মর যায়গা।'

'বেকুফ!'

একজন বলে, 'তোহার ঘরমে বালবাচ্চা নেহি?'

'হ্যায়। এক লেড়কা, এক লেড়কি।'

'ঔরৎ?'

'ও ভি হ্যায়।'

'তো পয়দা কর লে। দো চাহে চায়। রাস্তা সে উঠা লিয়া কিঁউ? বেকুফ কাঁহেকা!'

সবাই হেসে ওঠে হো হো স্বরে। বংশী দয়ারামকে বলে, 'তনি সে দুধ দে দয়ারাম।'

দয়ারাম ছোট কাচের গ্লাসে একটু দুধ দেয়। বংশী চামচে করে দুধ নিয়ে

বাচ্চাটার ঠোঁটে ঠেকায়। তৎক্ষণাৎ স্ফুরিত হয় ঠোঁট দুটো। ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই বাচ্চাটা দুধঃ খায় চুক চুক করে। এমন যত্ন করে দুধ খাওয়াতে দেখে দোকানের একজন বলে, 'মালুম হোতা তোহ্‌র পেটসেই পয়দা হুয়া ঈ বাচ্চা।'

আবার সবাই হেসে ওঠে।

দয়ারাম বলে, 'অভি ক্যা করনা ই বাচ্চাকো লেকে?'

বংশী বলে, 'ওহি তো সোচতা।'

'এক কাম কর' দয়ারাম বলে, 'থানে মে চলা যা। থানা মে হাকেলা কর দে।'

বুদ্ধিটা মনে ধরে বংশীর। ছেলেটাকে থানার হেপাজতে তুলে দিতে পারলে ঘাড় থেকে দায় নাবে। দুধ খাওয়ানো হলে বাচ্চাটাকে নিয়ে হাঁটতে থাকে। মিনিট চার হাঁটার পর পৌঁছে যায় শালিমার থানার সামনে।

থানায় তখন ওসি ছিলেন না। সেকেণ্ড অফিসার ডিউটিতে ছিলেন। তিনি চেয়ারে বসে শরীর আলগা করে। সামনে টেবিলের ওপর তাঁর মাথার টুপিটা রাখা। তাঁর মাথার ওপর মা কালীর ছবি। পেছনে ফাটক। ফাটকের ওপ্রান্তে কয়েকটি মহিলা। তারা ফাটকের গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের দাঁড়ানোর ভঙ্গি বড় বদখদ বেপরোয়া। তাদেরপরনের কাপড় চোপড় অসংবৃত। বুকের আঁচল খসে পড়া। দেখলেই বোঝা যায়, লাইনের মেয়ে। রাতে তুলে এনে পুরে দিয়েছে ফাটকে।

বংশী গুটি গুটি পায়ে সেকেণ্ড অফিসারের সামনে এসে দাঁড়ায়। কোলে বাচ্চা, গেঞ্জিও পায়ে, নাইট ডিউটি দেওয়া উস্কো খুস্কো চুল, বংশীকে দেখে, সেকেণ্ড অফিসারের চোখ দুটো বিস্ময়ে ছোট হয়ে যায়।

'বাবু, এই বাচ্চাটা...'

'কি হয়েছে?' খেঁকিয়ে ওঠেন সেকেণ্ড অফিসার।

'পড়েছিল, লাইন ধারে...'

ফাটকবন্দী মেয়েগুলো হেসে ওঠে হি হি শব্দে। গতর দুলিয়ে বলে, 'দেখুন গো বাবু, কেমন খানকি ব্যবসা চলছে ভদ্দর ঘরে।'

সেকেণ্ড অফিসার হুংকার দিয়ে ওঠেন টেবিল চাপড়ে, 'চোপ চোপ—'

অফিসারের ধমকানিতে ওদের হাসি থামে না। বরং বাড়ে। নাক নেড়ে ঠোঁট বেঁকিয়ে শ্লেষ ভরা স্বরে বলে, 'আমরা খাতায় নাম লেখানো খানকি, আমাদের ওপর হম্বিতম্বি। যা না, ধর না গে ভদ্দর ঘরের বেবুশ্যেগুলোকে...'

মেয়েছেলেগুলোর কথায় কান দেন না অফিসার বাবু। চেয়ার ছেড়ে তিনি বংশীর দিকে ধেয়ে আসেন। 'বেরো ব্যাটা, বের হ— সকাল বেলাই বেজম্মা দর্শন। সারাদিন আজ মাটি হল—'

'বাবু, কার বাচ্চা... জমা করে নিন বাচ্চাটাকে।'

'কেন রে ব্যাটা, এটা কি মাদারের আশ্রম, থানা— বের হ এখান থেকে...

কেষ্ট বের করে দে তো লোকটাকে ঘাড় ধরে বাইরে...'

হাবিলদার কৃষ্ণচন্দ্র তড়িঘড়ি বংশীকে থানার বাইরে বের করে দেয়। বংশী আবার বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে পথের ওপর দাঁড়ায়। নিজেকে এখন বড়ই হতাশ লাগে। যেন ওর এখন বড়শি গেলা দশা। আগুপিছু হিসেব না করে গিলে নিয়ে গলায় আটকে গেছে। এখন আর ওগরাতে পারছে না। বংশী ভেবেছিল থানায় বাচ্চাটার একটা হিল্লে হয়ে যাবে। কিন্তু তা হল না। অফিসার বাবু খেদিয়ে দিল। কেউ একটু সহমর্মিতার হাত বাড়ায় না শিশুটার জন্য। বংশী বোকা, তাই সে ফেঁসে গেল। বংশী নিজেকে নিজে ধিক্কার দেয়। বাচ্চাটাকে নিয়ে ঘরে যাওয়ার কথাও ভাবতে পারে না। তাহলে ওর বৌ সুধা আজ লঙ্কাকাণ্ড বাঁধিয়ে বসবে। বৌকে ওর বড় ভয়। বংশী ভাবনার কোনো দিশা খুঁজে পায় না। একবার মনে হয়, হাত দুটো একটু আলগা করে দিলেই বাচ্চাটা কোল থেকে ভূঁয়ে পড়ে যায়। আর ক্ষীণ পলকা প্রাণটুকু তৎক্ষণাৎ ফুড়ুৎ হয়ে যায় ওর দেহ থেকে। অথবা আর একটু এগিয়ে গেলে সেডোর পেছনে একটা বিল আছে। মজা। কচুরি পানা ভর্তি। জায়গাটুকু নিরিবিলি। বংশী বিলের কাছে গিয়ে টুপ করে বাচ্চাটাকে কচুরিপানার জঙ্গলে ফেলে দিতে পারে। কাক পক্ষীতেও টের পায় না তাহলে। বিপাকে পড়ে এসব বৈরী বুদ্ধি ওর মাথায় চাগিয়ে ওঠে, কিন্তু ও কিছুই করতে পারে না। আসলে বংশী নেশাড়ি আনপড়। কিন্তু ওর সরল সাদামাটা কিছু বিশ্বাস আছে— পাপপুণ্যের। বাস্তবতার নিরিখে সে বিশ্বাসের সারবত্ত্ব সে কখনো যাচাই করার, প্রয়োজন অনুভব করে নি। তাই বিশ্বাসের গণ্ডিটা পার হতে পারে না। তাই ঠকে।

সাত সতের ভাবতে ভাবতে বংশী ঘরের দিকেই যায়। গুডস্ সেড পার হলেই রেল কলোনি। রেলের অধস্তরীয় কর্মী— গ্যাংম্যাস সিগন্যাল ম্যান সুইপার লোডার লেবার এসব কুলি কামিনদের আবাস। ব্রিটিশ আমলের তৈরি খুপরি। জানালা নেই। গ্রীষ্মে ঘর তেতে তাওয়া হয়ে যায়। বর্ষায় জল চোয়ায় ফাটা ছাদ চুইয়ে। কলোনিতে ঢোকার মুখে বাল-কৃষ্ণের মন্দির। বংশী বাচ্চা কোলে নিয়ে মন্দির চাতালে বসে পড়ে। মন্দিরের ভেতর নাড়ু হাতে গোপালের বিগ্রহ। বৃদ্ধ পূজারী ব্রাহ্মণ বেরিয়ে আসেন। বংশীকে দেখে বলেন, 'বেটা, তুম পরেশান কিঁউ?'

'বহুৎ মুসীবৎ মে গির গয়া বাবা।'

'ক্যা মুসীবৎ?'

'ঈ বাচ্চা...'

'হাঁ বোল...'

'রাস্তামে পড়ে হুয়ে থে।'

'তু ঈসে উঠা লিয়া আপনা হাত সে...'

'হাঁ বাবা।'

'বহুৎ আচ্ছা কাম কিয়া।'

'মগর খানদান, ইসকা জনম ক্যা— কই পাতা নহি, বেজম্মা—'

'তো ক্যা? ঈ তো শয়তান নেহি— ইনসান হ্যায়। ইনসানকা আওলাদ— হ্যায় না?'

'হ্যাঁ বাস।'

'তু ইসে পালন কর, রখছা কর।'

'মগর...'

'বেটা, তু নন্দবাবা হো।'

'ম্যায় বংশী হুঁ।'

'নহি তু নন্দবাবা হো।' জানতা নন্দবাবা কৌন? যশোদা কৌন?'

'নেহি বাবা।'

'নন্দ বাবাকে বাল-কিষণ কো পালা থা, রখছা কিয়া থা। তু ইসে রখছা কর...'

২

তখন বংশীর বৌ সুধা চুলায় রুটি সেঁকছিল। বংশীর মেয়ে মেনি, দশ এগার, বছরের— রুটি বেলে দিচ্ছিল মায়ের পাশে বসে। ঘরের সঙ্গে লাগোয়া এক চিলতে পরিসর, সেটাই ওদের হেঁসেল। এমন সময় বাচ্চা কোলে বংশী এসে দাঁড়াল ছাঁচতলায়। তার চেহারা কাকতাড়ুয়ার মতো বিধ্বস্ত। তাকে দেখতে লাগছিল এতটাই বিবর্ণ ও নিরুপায় যেন ধরে বেঁধে তাকে হাঁড়ি কাঠে গলা ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। মেনিই প্রথম দেখল বাপকে, আর তৎক্ষণাৎ 'মাগো—' বলে সুধার মনোযোগ টানার চেষ্টা করে। সুধা চুলায় আগুনে উল্টেপাল্টে রুটি ভাপাচ্ছিল। মেনির ডাকে মুখ তোলে, এবং তখন দৃষ্টি আটকে যায় স্বামীর দিকে। বাচ্চা কোলে স্বামীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সুধার সীমন্তে দগদগে সিঁদুর লেপা চোয়াল ওঠা কালচেটে মুখের ভাব বদলে যায়। বিস্ময়ে যেন ঠুলি ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে চায় দুটি চোখ।

'এ আবার কি?'

বংশী নিরুত্তর।

'কার বাচ্চা এটা?'

'তবু নিশ্চুপ বংশী।

সুধার সন্দেহ ক্রমশ প্রত্যয়িত হতে থাকে। 'বলবে তো কোথা থেকে পেলে ওটাকে?' সুধার গলায় বাঁশ চেরায়ের শব্দ। কর্কশ।

বংশী চমকে ওঠে। স্যাঁতানো স্বরে বলে, 'রাস্তায় পড়েছিল।'

'মানে?'

'ডিউটি সেরে ফিরছিলাম, দেখি পড়ে আছে। কেউ নিল না। পড়ে থেকে তো মারাই যাবে, তাই...'

'তুলে নিলে?' বিস্ময়ে সুধার চোখ দুটো আরো বড় হয়। গলার স্বরমাত্রা চড়ে যায় আরো এক পরত। কপাল চাপড়ে বলে, 'হা ভগমান। এ আহাম্মককে নিয়ে আমি কি করি। এ যে কলঙ্কের বোঝা, জানো না?'

অপরাধ বোধে বংশীর মাথা আসে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে।

'কোন বারো ভাতারি মাগীর ছা, কলঙ্কের ভয়ে রাস্তায় ফেলে দিয়ে গেছে, তুমি তাকে ঘরে তুললে? এখনই আমি ওকে ভাগাড়ে ফেলে দিয়ে আসব।' বলে ঝটিতি উঠে আসে সুধা।

মেনি এতক্ষণ মায়ের ফোঁস ফোসানি আর বাবার মিঁউ মিঁউ করার মধ্য থেকে ঘটনা ঠাওর করার চেষ্টা করছিল। কিছুটা ঠাওর করতে পেরেছে, কিছুটা পারে নি। তবে এটুকু বুঝেছে, বাচ্চাটা কুড়োনো। এখন মাকে বাঘিনীর মতো ধেয়ে আসতে দেখে ভয়ে 'না মা, না—' বলে আর্তনাদ করে ওঠে, এবং এক ঝটকায় বাবার কোল থেকে বাচ্চাটাকে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে নিজের বুকে আঁকড়ে ধরে। সুধা রাগে মেয়ের মাথার চুল মুঠি করে ধরে। চুলের গোছ নাড়তে নাড়তে বলে, 'ঘর জ্বালানি মাগী, দে আমার হাতে দে ওকে, দে—'

'দেবো না—' বলে ফুঁসে ওঠে মেনি। এক ঝটকায় মাথার চুল ছাড়িয়ে নিয়ে তফাতে সরে দাঁড়ায়। সুধার হাতের মুঠোয় রয়ে যায় মেনির মাথার কিছু ছেঁড়া চুল।

বংশী বোঝে, পশ্চাৎপসারণের এই সুযোগ। দড়িতে ঝোলানো গামছাটা টেনে নিয়ে বংশী সুর সুর করে পালায়।

রাস্তায় কলের নিচে বংশী স্নান করে গা ডলে ডলে। অন্য দিনের চেয়ে বেশি সময় নেয় স্নান করতে। আসলে ওর ঘরমুখো হতেই সব ভয়। অবশেষে 'যাহ্, যা হবে দেখা যাবে' এমন একটা নিরাসক্ত ভাব মনে জাগিয়ে তুলে ও আজকের সমগ্র ঘটনা মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে চায়। বংশী স্নান সেরে গুটি গুটি পায়ে ঘরে ফেরে। দেখে, হেঁসেলের দাওয়ায় বসে সুধা তর্জন করেই চলেছে। বংশীকে দেখে তর্জনের মাত্রা আরো বেড়ে যায়। 'ওরে ও মুকপোড়াটা, আমি কে বাঁজা? আমি কি বাচ্চা পেটে ধরিনি, ধরতে পারি না, যে, তোকে রাস্তা থেকে একটা নিঃবংশের ব্যাটাকে কুড়িয়ে আনতে হবে। একটা বোকা মাতালের হাতে পড়ে আমার সারা জীবন জ্বলে পুড়ে খাক হলো গা। হা ভগবান, এই নিকেছিলে তুমি আমার কপালে। বাবা গো, এর চেয়ে কেন তুমি আমার গলায় কলসি বেঁধে নদীতে ডুবিয়ে দিলে না গো...'

সুধা মাথা চাপড়ে কাঁদতে বসে। বংশী বোঝে, হাওয়া বেগতিক। সুতরাং সুড়ুৎ করে ঘরে সেঁধিয়ে যায়। বাসী ভাতের থালাটা খুলে গোগ্রাসে গিলতে থাকে। খাওয়া হলে হাত মুখ ধোয়। তারপর একটা চাদর বগল দাবা করে নিয়ে ঘর ছেড়ে

বেরিয়ে আসে।

কলোনির পথ ধরে বংশী পুবে হাঁটা দেয়। কলোনির ডাইনে বাঁক নিলেই পড়ে নদী গঙ্গা। নদীর কিনারে একটা বটগাছ। শূন্যে ডালপালা ছড়ানো মহীরূহ। নিচে সিমেন্ট মাজা বেদি। গাছটাকে বেড় দেওয়া। বংশী বেদির ওপর বসে। ঘর থেকে নিয়ে আসা চাদরটা বিছোয়। চাদরের ওপর কাৎ হয়ে শুয়ে পড়ে। গাছের ছায়া আর নদীর শীতল বাতাসে ওর দুচোখ মুহূর্তে ঘুমে জুড়ে আসে। বংশী ঘুমিয়ে পড়ে।

তখন নদীর ওপারে ওই যে কলকাতা বন্দর, তারপর জাহাজ কারখানা, তারও পরে, দূর পশ্চিমে নদীর কূলে সূর্যটা হেলে পড়েছে। তখন বংশীর ঘুম ভাঙে। তখন বিকাল পড়ন্ত। ঘুম ভাঙতেই বংশীর মাথায় দুঃস্মৃতি হয়ে সকালের ঘটনাগুলো ভিড় করে। এখন ঘরে ফিরতে হবে ভাবতেই ওর অনুভূতিগুলো ভীষণ পাতি পানসে হয়ে যায়। অথচ ঘরে না ফিরেই বা করে কি। বংশী চাদরটা ভাঁজ করে নিয়ে উঠে দাঁড়ায়। নদীর তীর ছেড়ে বাড়ির দিকে হাঁটা দেয়।

ঘরের চৌহদ্দিতে পা রেখে ও সুধার গলা পায় না। নিস্তব্ধ চতুর্দিক। ঘরের দরজাটা ভাঁজানো। সুধা তাহলে কি নেই ঘরে? কেউ কি নেই? কুড়োনো ছেলেটাই বা কোথায়? বংশীর মনে ধন্দ জাগে। হঠাৎ কুড়োনো শিশুটার জন্য উদ্বেগ বুকে কাঁটা হয়ে বেঁধে। বংশী পা টিপে টিপে ভাঁজানে দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়। একটা পাল্লা ঈষৎ ফাঁক করে ভয়ে ভয়ে ঘরের ভেতর দৃষ্টি চালায়। দেখে, কুড়োনো বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে মেঝের ওপর বসে রয়েছে সুধা। সুধার একটা স্তন অনাবৃত। সুধা কুড়ানো বাচ্চাটাকে দুধ খাওয়াচ্ছে। নিজের বুকের।

৩

বংশীর নিজের ছেলেটার বয়স বছর দেড়। নাম মুক্তো। মুক্তোর হাঁটা এখনো সড়োগড়ো হয় নি। টলোমলো পায়ে হাঁটে। জিবের আড় ভাঙেনি সম্পূর্ণ। তো তো স্বরে কথা বলে। ঘরে হঠাৎ একটা নতুন শিশুর আবির্ভাব ও মেনে নিতে পারে না। শিশুটাকে দেখিয়ে বলে, 'ওতা যে?'

মেনি বলে, 'ওটা ভাই।'

'না বাই নয়।'

'হ্যাঁ ভাই, ভাই তো—'

'না বাই নয়, বাই নয়...' ছোট্ট মাথাটা ঝাঁকিয়ে শিশু প্রতিবাদ জানায়। শেষপর্যন্ত কেঁদে ফেলে ভ্যাঁ করে। কাঁদতে কাঁদতে বলে, 'ওতে আমি মাব্ব।'

'না মারতে নেই লানা' বলে মেনি মুক্তোকে কোলে তুলে নেয়। 'ভাইকে মারে নাকি কেউ? তোমরা খেলবে দুজনে। কাঁদে না, কাঁদে না...'

বংশীর উপস্থিতিতে সুধা বাচ্চাটার ধারে কাছে ঘেঁষে না বড় একটা। মেনিই আগলায় দিনের বেশির ভাগটা। রাতে কাঁথা ভিজিয়ে চিৎকার জুড়লে, সুধা স্বামীকে ঠেস মেরে বলে, 'নাও, সামলাও তোমার সাধের খোকাকে। শখের বহর কত।'

বলে বটে, আবার নিজেই কাঁথা বদলে দেয়।

কুড়োনো ছেলেটার প্রতি সুধার টান আছে কিনা, থাকলেও কতটা, তা ঠিক হদিশ করে উঠতে পারে না বংশী। আসলে শিশুটাকে কুড়িয়ে এনে ঘরে তোলার জন্য স্বামীর প্রতি সুধার যতটা রাগ, ততটাই অভিমান। অভিমান এ কারণে যে, সুধার মনে হয়, কুড়োনো ছেলে ঘরে এনে স্বামী তার নারীত্বকেই হেয় করেছে।

দিন দশেক পর একটা গাড়ি এসে থামে কলোনিতে ঢোকার মুখে, বাল-কৃষ্ণ মন্দিরের সামনে। দুধ-সাদা গাড়িটা। ঝাঁ ঝকঝকে। মারুতি জিপসি। গাড়ির জানালা খুলে একটা মুখ বাইরে বেরিয়ে আসে। মন্দিরের বৃদ্ধ পূজারীকে জিজ্ঞাসা করে, 'ইধার এক আদমি, বংশী নামকা, কাঁহা রহতে হ্যায় জানতে?'

'কৌন বংশী?'

'রেল ইয়ার্ডমে কাম করতা— সিগন্যাল ম্যান।'

'ও ঘর—' বৃদ্ধ পূজারী আঙুল তুলে দেখিয়ে দেন। গাড়ির জানালা বন্ধ হয়ে যায়। গাড়িটা হুস করে এগিয়ে যায়।

বংশীর ঘরের সামনে গাড়ি থামে। বংশীর দরজায় গাড়ি থামতে দেখে কৌতূহলি মানুষ জুটে যায় কোথা থেকে। গাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসেন অযোধ্যাপ্রসাদ। দশাসই পৃথুল শরীর তার। গায়ের ত্বকে মাখনে রঙ ও পেলবতা। অযোধ্যাপ্রসাদকে নামতে দেখেই চিনতে পারে অনেকে। অযোধ্যাপ্রসাদের নাম শোনে নি, হাওড়া শহরে এমন মানুষ কমই আছে। অযোধ্যাপ্রাসাদ যতটা পাওয়ারওলা ততটাই পয়সাওলা। তাঁর ক্ষমতার হাত এতটাই লম্বা যে, প্রশাসনের শিখরও ছুঁয়ে যায় সহজে। অযোধ্যাপ্রসাদের দুটো কাঠ-চেরাই কল নদীর কিনারে। দুখানা তেলের মিল-বঙ্গলক্ষ্মী আর ভারতলক্ষ্মী। খানছয় বাস চলে হাওড়া রুটে। ইদানীং প্রমোটরি ব্যবসাতেও নাকি অদ্বিতীয় হয়ে উঠেছেন।

রোগা প্যাংলা বংশী বেরিয়ে আসে ঘর থেকে। তার শুখনো মুখ যুগপৎ ভয় বিস্ময়ে আরো শুখনো দেখায়। অযোধ্যাপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করেন, 'তুম বংশী?'

'হাঁ সাব।'

'তুম সে কুছ জরুরী বাত হ্যায়।' বলে ওকে আড়ালে নিয়ে যান। ভাই বেরাদারের মতো নিজের এতটা ভারি হাতে রাখেন বংশীর কাঁধের ওপর। বলে, 'রাস্তে মে পড়া হুয়া এক লেড়কা মিলি তুমে— ছোটা সে?'

'হাঁ, মিলি।'

'কাঁহা হ্যায় ও লেড়কা?'

'ঘরমে।'

'দেখ ভাই, তুম হমে ও লেড়কা দে দে।'

এতক্ষণে অযোধ্যাপ্রসাদের আগমনের কারণ উপলব্ধি করতে পেরে বংশী দীর্ঘ একটা শ্বাস ছাড়ে।

'নেহি, হম মুফৎ সে লেগা নেহি' অযোধ্যাপ্রসাদ বলেন। 'রুপিয়া দেগা— বিশ হাজার...'

বিশ হাজার। নিঃশ্বাসটা আবার গলার কাছে এসে আটকে যায়। এবার খুশীতে। হৃদপিণ্ডে রক্ত চলকে ওঠে। এত টাকা পাওয়া তো দূরের কথা, বংশী দেখেই নি কখনো ছুঁয়ে।

অযোধ্যাপ্রসাদ বলেন, 'হমারা এক ভাতিজা হ্যায়, দিল্লী মে রহেন বালে, উঁচা খানদান, রুপিয়া ভি বহুৎ, মগর বালবাচ্চা নেহি। দশ সাল সাদি হুয়া অভি তক কৈ লেড়কা পয়দা হুয়া নেহি। য়ৌর হোগা ভি নেহি— ডাংতারনে বাতায়া। তে হমে ইস লেড়কা কো ভাতিজাকা পাশ ভেজেগা। ও আপনা লেড়কা সমঝ কর পালে গা।'

বংশীর ইচ্ছা অনিচ্ছাগুলো নগরদোলার মতো ঘুরপাক খায় অনবরত। ওকি উত্তর দেবে ভেবে পায় না। ইতস্তত করে। অযোধ্যাপ্রসাদ বলে, 'ক্যা তুমে সোচনা হ্যায়?'

বেঁচে যায় বংশী। বলে, 'থোড়া সোচনে দিজিয়ে সাব।'

'ঠিক হ্যায় সোচো। হাম পরশু রোজ আয়গা, পাক্কা এহি টাইমসে।'

পরশু ঠিক একই সময় আসেন অযোধ্যাপ্রসাদ। 'ক্যা কুছ ফয়সালা কিয়া?'

নিরুত্তর বংশী মাথা চুলকায়। অযোধ্যাপ্রসাদের মুখ বিরক্তিতে থম মেরে যায়। কিন্তু সংযত স্বরে বলে, 'ভাও ক্যা কমতি মালুম হোতা? ঠিক হ্যায় বাবা, ঔর পাঁচ জাদা দে গা। পুরা পঁচিশ। তু সোচকে চলে আ হামারা মকান।'

অযোধ্যাপ্রসাদ বলে যান।

খবরটা পাঁচ কান হতে হতে অনেকেই জেনে ফেলে। বুকিং অফিসের ক্লার্ক সমরবাবু ধরে বংশীকে। 'হ্যারে বংশী, তোর সেই কুড়োনো বাচ্চাটার দাম উঠেছে নাকি পঁচিশ হাজার? তুই শালা জম্পেশ মাল মাইরি। ব্যবসা বুঝিস। আমরা সেদিন বাচ্চাটাকে দেখে নাক সিঁটকে পালিয়ে এলাম। তুই তুলে নিলি। ছেড়ে দে ছেড়ে দে, যা পাস তাই লাভ। পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা।'

বংশী কি করবে কিছু ভেবে স্থির করতে পারে না। দ্বন্দ্বের টানাপোড়ন চলতেই থাকে ওর মনে। এক এক সময় টাকার অংকটা মাথায় আসলেই বুকের ভেতর লালসার আগুন ওঠে দাউ দাউ করে। আবার ওই কচি মুখটার পানে তাকালে মমতায় পিছু হটতে হয়। তখন নিজেকে মনে হয় হীন ষড়যন্ত্রী।

স্ত্রী সুধাকে বলে, 'সুধা, ওই যে একটা লোক এসেছিল, গাড়ি করে...'

'জানি।'

'লোকটা বলছিল...'

'কি বলছিল তাও জানি।'

'এখন কি করি বলত?'

'কি করবে তুমিই বল না।'

'বলছিল ছেলেটাকে দিলে পঁচিশ হাজার টাকা দেবে। আমি ভাবছি কি, দিয়েই দিই। এতগুলো টাকা...'

'তার মানে তুমি ছেলেটাকে বিক্রি করবে?'

বংশী নিরুত্তর।

'আচ্ছা, তোমার নিজের ছেলে মুক্তোকে কেউ যদি পঁচিশ হাজার টাকায় কিনতে চায়, তাহলে তুমি নিজের ছেলেকেও তুলে দেবে তার হাতে?'

প্রশ্ন বড় তীক্ষ্ণ। তপ্ত শলাকা হয়ে বংশীর বুকে বেঁধে। অথচ এতটুকু রাগতে পারে না বংশী সুধার ওপর। সুধার কথায় দু-চোখে লোভের নির্মোক সরে যায়। সত্যিই তো, সে কি পারত নিজের ঔরসজাত ছেলেকে বিক্রি করতে পঁচিশ হাজার টাকায়? কিংবা তারও বেশি, অনেক বেশি টাকার বিনিময়ে?

সুধা বলে, 'তুমি ছেলেটাকে পথ থেকে কুড়িয়ে এনে প্রাণ দিলে, আমি বুকে তুলে নিলাম, সেই ছেলেকে টাকার লোভে তুলে দেব অন্যের হাতে? আমরা গরিব, তা বলে কি টাকার লোভে এতবড় পাপ কাজটা করব আমরা? সে পাপ কি তোমার লাগবে না? আমার আর দুটো সন্তানের লাগবে না?

বংশী মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে বৌয়ের দিকে। একই সাথে ঘর করছে এতদিন, তবু কত না অজানা রয়ে গেছে সুধা।

৪

বংশী একদিন সুধাকে বলে, 'ছেলেটার তো একটা নাম রাখতে হয়।'

সুধা বলে, 'তুমি রাখো না।'

'আমি রাখতে পারব না ওসব। মুখ্যু সুখ্যু মানুষ আমি।'

সুধা দু-দণ্ড ভাবে। বলে, 'ওর নাম রাখো মানিক। আমার এক ছেলের নাম মুক্তো, আর এক ছেলের নাম মানিক। বেশ হবে।'

'শুধু মানিক, না কুড়োনো মানিক।'

'কুড়োনো কুড়োনো করো না তো বলছি।' মুখ ঝামটা দিয়ে বলে সুধা।

বংশী হো হো স্বরে হেসে ওঠে। ক্ষণেক পর বলে, 'আচ্ছা, যে মেয়েছেলেটা বাচ্চাটাকে বিইয়ে পথে ফেলে দিল, তার ওপর তোর রাগ হয় না?'

'এ প্রশ্ন আমায় করছ কেন?'

'বল না, বল না। তোর রাগ হয় কি হয় না?'

'রাগ হয়, আবার হয়ও না।'

'এ কেমন হেঁয়ালির কথা হল।'

'দেখো, কোনো মা কি নিজের পেটের সন্তানকে নিজের ইচ্ছায় পথে ফেলে দিতে পারে— পারে কি? যত হোক সে মা-তো।'

'তা ঠিক।' বংশী সুধার কথায় সায় দেয়।

সুধা বলে, 'আসলে ভগবানের সৃষ্টিটাই বড় এক টেরে। মেয়েছেলে ব্যাটাছেলে দুজনের শরীরেই কামনা লালসা দিয়েছে ভগবান। অথচ ফাঁসার কল দিয়েছে শুধু মেয়েমানুষকে। পুরুষ হাজার বার পা পিছলেও কিছু হবে না। অথচ মেয়েমানুষ একবার লালসার ফাঁদে পা দিলেই সর্বনাশ।'

বংশী আশ্চর্য হলে বলে, 'তুই এসব শিখলি কোত্থেকে সুধা?'

সুধা হাসে। বলে, 'এসব আর শেখার কি আছে। সংসার করতে করতেই মেয়েরা শিখে ফেলে এসব।'

আরো দিন দশ পর শালিমার থানায় সেকেণ্ড অফিসার আসেন জিপ হাঁকিয়ে। বংশীর ঘরের সামনে জিপ দাঁড়ায়। থানার মেজো বাবুকে দেখে বংশী তেমন আশ্চর্য হয় না, যেহেতু তাঁর আগমনের কারণ মোটামুটি আঁচ করতে পারে।

'হ্যাঁ রে বংশী, বোকাটা, অযোধ্যাপ্রসাদ যে তোকে দেখা করতে বলেছিল।'

'দেখা করেছি।'

'অতো বড় লোক, তার মুখের ওপর তুই না করে দিলি।'

'দিলাম।' বংশীর নিস্পৃহ উত্তর।

'বংশী, ভাইটি আমার, শোন...' মেজো বাবু বেশ মিষ্টি মাখা স্বরে বলেন, যে স্বরের সঙ্গে সেদিন সকালে থানায় বসা এই মেজোবাবুর খেঁকুড়ে কর্কশ স্বরের মিল নেই। '... তুই তো ছেলেটার মুখ চাস, না কি, অ্যাঁ— অযোধ্যাপ্রসাদ যখন নেবে বলেছে, তখন ধরে নে, ছেলেটা সুখেই থাকবে, রাজার হালে...'

বংশীর বলতে ইচ্ছা করে। একটা বেজন্মার সুখের জন্য আপনার এত মাথা ব্যথা কেন বাবু? ওর মুখ দেখলে তো আপনার দিনটাই মাটি হয়।

তবে এসব কথা মুখে বলে না বংশী।

'... আর তোকে তো পঁচিশ দেবেই বলেছে। যাক, আমি বলে কয়ে না হয় আরো পাঁচ বাড়িয়েই দেবো। তিরিশ। তুই হ্যাঁ করে দে—'

'শুধু তিরিশ কেন বাবু, অমন আর একটা তিরিশ দিলেও আমি ও বাচ্চা দেবো না।'

বংশী হঠাৎ এমন কাঠ কাঠ উত্তরে চমকে ওঠেন মেজোবাবু। কেউ যেন হঠাৎ ওর অনুভূতিতে গরম ছেঁকা দিয়ে দিল। মেজো বাবুর দুই গাল সহ চিবুকটা ঝুলে পড়ে। চোখ দুটো বিস্ময়ে ছোট হয়। কণ্ঠস্বরে মিষ্টতা উবে যায়। বলেন, 'এই তোর শেষ কথা?'

'হ্যাঁ বাবু।'

'বেশ দেখা যাবে।' এক লাফে উঠে পড়েন জিপের ভেতর। ঘর ঘর যান্ত্রিক একটা শব্দ ছড়িয়ে জিপটা উধাও হয়।

৫

পড়শিরা বলাবলি করে, 'বংশী সত্যিই একটা বোকা মাতাল, নইলে কেউ এমন মওকা হাতছাড়া করে।'

'তিরিশ হাজার। কম টাকা? শালা, তোর জীবনের ভোল বদলে যায়।'

'তাও তো কুড়োনো ছেলে। নিজেদেরই দুটো কোন ভাত জোটে না। খাওয়াবি কি ওটাকে।'

'বুদ্ধুকে কে বোঝাবে বল না। বোঝাতে গেলে বলে, যাও যাও আমি যা বুঝি তাই করব।'

গুডস সেডের অ্যাকাউন্টস-এর বড় বাবু সেদিন বলেন, 'হ্যাঁ রে বংশী, তোর বাড়িতে না কি ভি আই পি-র মেলা। থানার মেজো বাবু, অত বড় বিজনেসম্যান অযোধ্যাপ্রসাদের আনাগোনা রোজ তোর বাড়িতে। এবার কি টাটা বিড়লাও আসবে না কি রে— হা হা হা...'

টাটা বিড়লা আসে না, তবে সাক্ষাৎ শমন হয়ে আসে ছোট মুন্না। সাকরেদ সহযোগে একটা ঝড়ো হাওয়ার মতো ঢুকে যায় বংশীর ঘরে। 'এই বংশী, শালা, শোন এদিকে...'

ছোট মুন্নাকে দেখে বংশীর পা থেকে ব্রহ্ম তালু পর্যন্ত একটা শীতল শিরশিরানি বয়ে যায়। কণ্ঠনালি শুখিয়ে আসে। বুকের ভিতর প্রাণ পাখিটা ভয়ে ডানা ঝাপটায়।

'ঘরে কি অনাথ আশ্রম খুলেছ, অ্যাঁ— শল্‌লা। রাস্তা থেকে বাচ্চা তুলে এনে ঘরে পুরছ। কেন, ওই তো তোর মাগ রয়েছে— বিইয়ে যা না যত খুশী।'

আণ্ডার ওয়ার্ল্ডের কিং ছোট মুন্না। নাম করা ওয়াগন ব্রেকার। ভস্মলোচনের মতো দৃষ্টি। যার ওপর পড়ে তার সম্পূর্ণ বিপদ।

'শল্‌লা, খুব যে ফুটাঙ্গিবাজি অ্যাঁ— থানার মেজো বাবু, অতো বড় শেঠ অযোধ্যাপ্রসাদের মুখের ওপর না করে দিস। এই দেখ, চিনিস তো আমায়, খেয়ে নেবো, বুঝলি, চিবিয়ে চিবিয়ে... আজ রাতের মধ্যে যদি অযোধ্যাপ্রসাদের বাড়ি না দিয়ে আসিস ছেলেটাকে, কাল সকালে তুইও যাবি ভোগে আর ছেলেটাকেও তুলে নিয়ে যাবো— দেখি কটা বাপ আছে তোর রোখে...'

যেমন ধেইয়ে এসেছিল ছোট্ট মুন্না, তেমন ধেইয়ে চলে যায়। কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে বংশী । অনড় অচল। কুল কুল করে ঘাম নামে শরীরে। নিজেকে বড় খিন্ন বিপন্ন মনে হয় এই মুহূর্তে। অথচ ওর দোষ কি তা ও ভেবে পায়

না। শিশুটা পথে পড়েছিল, কেউ তুলে নিল না। শিশুটা মরতই পড়ে থাকতে থাকতে, তাই সে বুকে তুলে নিয়ে ঘরে এনেছে। এতে ওর অপরাধ কোথায়? সে তো কারো সন্তান চুরি করে আনে নি। বংশী বেশ বোঝে। শিশুটাকে ছিনিয়ে নেবার জন্য তিনটে বড় মাথা একজোট হয়েছে। তারা গোপনে সাঁট সলা করছে শিশুটাকে কেড়ে নেবার জন্য।

বংশী বৌকে বলে, 'কি করি বল দেখি সুধা?'

সুধা বলে, 'তাই তো, আমি কিছু ভেবে উঠতে পারছি না।'

'ছোট মুন্না যখন ঢুকেছে এর মধ্যে তখন তো ছাড়বে না। কাল সকালেই নিয়ে যাবে জোর করে।'

'কেন গো, কেন নিয়ে যাবে ওরা আমার বাছাকে...' বুক ছেঁচা করুণ আর্তি হয়ে বেরিয়ে আসে প্রশ্নটা সুধার কণ্ঠ থেকে। কিন্তু এ প্রশ্নের উত্তর বংশীর জানা নেই। সে শুধু জানে তাদের জীবন পোকা পতঙ্গের মতো। ভারি পায়ের পায়ের চাপে পোকা পতঙ্গরা পিষে মরবেই। কেন মরবে সে প্রশ্নের উত্তর সে পাবে কোথা তার নিরেট মাথা থেকে?

'সুধা, চল আমরা পালাই এখান থেকে।'

'তারপর...'

'অনেকদূরে কোথাও চলে যাবো।'

'যাবে কি? চাকরি তো তোমার এখানে। কি লাভ মরে সকলে এক সাথে।'

আশার আলোটা দপ করে নিভে যায় মুহূর্তে। নিজেকে বড় অসহায় লাগে বংশীর। যেন খোঁটায় বাঁধা গরু একটা। খোঁটার পরিসরটুকুই তার অধিকারের আওতা। যতই মাথা চালুক, মুক্তি তার নেই, খোঁটায় রাস টান রয়েছে তার মুক্তির আকাঙ্খা। বড়ই ছটপট করে বংশী। সন্ধ্যায় উচাটন মন নিয়ে আসে সেই বাল-কৃষ্ণের মন্দিরে। বসে মন্দির চাতালে। ভেতরে শিশু গোপালের মূর্তি। নাড়ু হাতে। মুখে তার সেই হাসি-ভুবনজয়ী সর্বসংকটমোচনী।

পূজারি বৃদ্ধ আসেন বংশীর কাছে। বংশী কাতর স্বরে বলে, 'বাবা, হম নাজেহার হো গয়ী বাবা, ও বাচ্চাকো লি কা...'

পূজারি হাসেন, স্মিত। বলেন, হম সব জানতা হ্যায় বেটা।'

'অভি হম ক্যা করে?'

'তু উসে রখছা কর। চারে তরহ্ কংসনে ফ্যায়লা হুয়া হ্যায়। তু নন্দবাবা হো। তু কংসকা হাত সে বাল-গোপাল কো রখছা কর।'

'মগর ক্যায়সে?'

'ও তুমহে সোচনা হোগা বেটা। রাস্তা তুমহেই নিকল নে হোগা।

তখন রাত। ভোরের ক্ষীণ আলোটুকুও ফোটে নি তখনো। বংশী বিছানা ছেড়ে ওঠে। সুধাকে ডাকে, 'সুধা, সুধা...'

সুধার ঘুম ভেঙ্গে যায়। ঘুম জড়ানো স্বরে বলে, 'কি হল?'

'ওঠ, আমরা হাওড়া সদরে যাবো।'

'কেন?'

'সকালে সদর কোর্ট খুললেই আপিল করব। বিচার চাইব আদালতে।'

'কিসের আপিল।'

'আমাদের মানিককে আমাকের কাছে রাখার অধিকার চাইব।'

'কি হতে তাতে?'

'আদালতের রায় বের হওয়ার আগে ওরা বাচ্চাটাকে কেড়ে নিতে পারবে না। আর আমার বিশ্বাস, আদালতের রায় আমাদের দিকেই যাবে।'

'কিন্তু এখনো তো রাত্রি।'

'হোক রাত্রি। ভোরের জন্য বসে থাকলে ওদের কানে খবর পৌছে যাবে। তখন ভেস্তে যাবে সব। মেনি মুক্তো-মানিকদের তোল টেনে।

সুধা বিছানা ছেড়ে ওঠে। মশারির বাইরে এসে বলে, 'সারা রাত ভেবে বেশ বুদ্ধি বের করেছ দেখছি।'

বংশী হাসে। ক্ষীণ। বলে, 'এত বড়, দেশে একটু কি ন্যায় বিচার পাবো না রে সুধা?'

নতুন সৃষ্টির বীজ

অনন্ত দাশ

চেতনায় ওড়ে এক হংসগতি মেঘ
ধূসর আকাশ ছোঁয় দিকচক্রবাল
এভাবে কি থাকা যায় দূর মফস্বলে?
স্মৃতিচক্রে পাক খায় লতাতন্তুজাল

চুপচাপ বসে আছি সন্ধ্যায় একাকী
এত দুঃখ এত দাহ এত যে যন্ত্রণা
কী ক'রে লুকিয়ে রাখি শীর্ণ করতলে
শব্দ-খুরে উড়ে যাচ্ছে ধুলোবালিকণা

সন্দেহ সংশয় আর ঘন অন্ধকারে
অর্জুন তো দেখেছিল মুগ্ধ বিশ্বরূপ
আজীবন খুঁজে ঐ ভাঙাচোরা মুখে
আমি পাই না কোনও অখণ্ড স্বরূপ।

অনেক তো ঘোরা হলো জ্যোৎস্না প্রতিপদে
যা কিছু দেখেছি এই ক্ষুদ্র পরিসরে
তাই আমি তুলে রাখি কৃপণের মত
নতুন সৃষ্টির বীজ ধ্বংসের ভিতরে

ঋষিলোক থেকে দূরে

গোবিন্দ ভট্টাচার্য

প্রণত বিন্ধ্যকে তুমি আদেশ দিয়েছ
　　　　অবনত থাকো
সমুদ্রকে বলেছ ফিরে যেতে
যজ্ঞশেষে ব্রাহ্মণকে রুগ্ন গাভী দিয়ে
পুত্র নচিকেতা, তাকে তুমি মৃত্যুকে দিয়েছ।

ঋষিলোকবহির্ভূত অগণ্য অবাধ্য মানুষ
সেখানে তোমার কোনো দণ্ডবিধি নেই
তারা জানে মৃত্যুতে কখনো
　　মধু বহন করে না বাতাস
সিন্ধু কদাপি ক্ষরণ করে না মধু
সমস্ত আদেশ তুচ্ছ করে
অশ্রুবিন্দুগুলি মৃত্যুকে দহন করেছে।

অন্ত্যেষ্টির পরে স্বর্গ ও সন্ন্যাস সমভাবে
　মানুষের কাছে তুচ্ছ হতে থাকে।

সে কাঠের ঘোড়াটাই

সত্য-গুহ

পাতাল পুরীর গল্প অন্ধকারে ভয় দেখাত
　　ঠাকুমার শুয়ে থাকা বেলায় একদা
কে জানত লুটরাজ খুন জখম এতো মোহনীয়
লোভাতুর হাওয়া চাটে নারীমাংস বালিকার
　　রোদ্দুর রক্ত করা রাতে
আজ মনে পড়ে
আমার তৃষ্ণা ছিল ঠাকুমার মুখের নির্মাণ

পাতাল পুরীতে বন্দী রাজকন্যার
মুক্তির হাসির
সম্ভাব্যও ছিল, তা বলছি কেন না
আসি যে পক্ষীরাজ ঘোড়া চড়ে দিয়েছি উড়ান
পাতালের দিকে, সে কাঠের ঘোড়াটাই
আমার নতুন নাতি ব্যবহার করে।।

ছোট কাগজের জন্য দুকলম

মৃণাল দত্ত

পরিহাসিকা শবনম বললে :
বড় কাগজে কেন লেখো না মৃণাল?
আমি পলক না পরা-চোখে বললুম,
সে তো পোষা কুকুরের মতো ল্যাজনাড়া,
উর্দ্ধমুখী হয়ে প্রসাদ কুড়নো,
নির্দেশিত পথে চলা। বর্ণহীন।
সে তো আদিষ্ট হয়ে চলে যাওয়া
শিমূলতলার নরম পাহাড়ে,—
মধ্যরাতে উন্মত্ত নারী শরীরে শব্দ খোঁজা,
সে তো খালাসিটোলার সুরাগর্ভ থেকে
ফিরে এসে/নিশীথ যামিনীতে/
কলকাতা শাসন করা।
অথবা ইচ্ছে হলে বলতেও পারো
শব্দ খুঁজতে খুঁজতে চলে যাওয়া
অরণ্য অন্ধকারে যোনীপথে
উরুতে
জঙ্ঘায়
স্তনাগ্রে।
এমন নয় যে আমি সুরা চিনি না
এমন নয় যে আমি নগ্ন নারী দেখি নি।
তবু ছোট কাগজে লেখা
মনে নিজস্ব উষ্ণরক্তে স্নান করা,

বহতা নদীর স্রোতে/সততার শ্রমে/
শব্দের নির্মাণে মেতে ওঠা;
মেধা ও মননের যুগলবন্দীতে
অবিরত জীবনসন্ধানী হয়ে থাকা।
শবনমের চোখ কৃষ্ণা হরিণীর মতো
চকিত 'বিহ্বল মায়াময়,
বললে, তোমাদের যাত্রাপথ আলোকিত হোক
খদ্যোত অহঙ্কারে।।

মেলা শেষে

অমরেশ বিশ্বাস

না-দেখা কিশোরীর অনুভবে
টানা এক দীর্ঘ চিঠি লেখা হবে
মেলা শেষ;
মধ্য শর্বরীর অলৌকিক সঙ্গীতের রেশ
কানে বাজে,— ঠোঁট আর হাতের মুদ্রায়
রোশনের কথকের ছাপ— রামকিঙ্করের মূর্তি হয়ে ঘনায়
মনের অতলে—
এখন সনাতন ভাসে— একতারার সহজ জলে
কেলি করে পার্বতী,— ঘুরে ঘুরে গোল হয়ে নাচ
আউল বাউল হয়ে এক দুই তিন্ চার পাঁচ
নীল পাড়ে দুধ-শাদা শাড়ি
রঙ চাপা স্বপ্নও দেখি মনোমুগ্ধকারী
অচিন পাখি শুক হয়, বসে থাকে চন্দনের ডালে
সব বৃথা, জোয়ারের জলে বার তিন না আঁচালে
সরোদে আমজাদ বাজে বুকে আঁকা গণেশ পাইন
মৃত্যুর পরেও না হেঁটে গেলে বাদ যাবে শক্তির আইন
বাউলই তো হবে— আজ নয় কাল
পাত্রমিত্র, ভুলে গিয়ে গাঁয়ের রাখাল
কে হবে সাধের সঙ্গিনী?
খোঁজো তাকে যে আজও রয়েছে একাকিনী।

সম্পর্ক

মঞ্জুষ দাশগুপ্ত

ঘরের ভিতরে আজ গভীর জঙ্গল।
ছেঁড়া বালিশের তুলো ফ্লুরোসেন্ট আলো
ছাইছায়া সরাতে পারে না।
নিঃশব্দ এমন যেন শুধু এক ঘড়ি কিটকিট।
সম্পর্ক ভাঙার মন্দ মহড়ার পরে
দুটি দ্বীপ দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে।
চারপাশে নীলজল ঢেউস্মৃতি।
আঁকাবাঁকা নিয়ন্ত্রণরেখা। ঠাণ্ডা বরফের দেশে
যুদ্ধ শেষ।
আবার যুদ্ধের জন্যে এখন প্রস্তুতি।

আমরা কি পাঠ নেব শিশুদের কিণ্ডার গার্টেনে।

'কোন হরিণ বাঘ ডাকে'

দীপেন রায়

পাথর, শুধু চড়াইয়ে উঠে যাওয়া,
সাগর নয়, পাহাড় খাঁজে
মানিয়ে গেল বসন্তে পূর্ণিমা।
উঁচু নীচু অসমতল জীবন,
বাপের কাঁধে চড়ে
যেতে যেতে ঘুমন্ত এই শিশু
স্বপ্ন দেখে চাবুক অবিকল।
ঘাড়ে পিঠে অমানবিক খোকা
গড়িয়ে-নামে সাদা জলের স্রোত।
হাসিটা খুব চেনা চেনা,

দু'চোখ ফোটা প্রকৃতি সে
বাড়িয়ে গেল আনন্দ উৎসুক।
তোমাকে পাই পাহাড়-বরফ
তোমাকে পাই বাংলা খড়-ধানে
খবর ছাপতো বটতলা
খোদাই কাঠ চিৎপুরের হাটে।
আমার ছিল কলকাতা
শহর জুড়ে ভাতের হাঁড়ি ফোটে।
আমার ছিল হাসির সুড়সুড়ি
এখানে 'কোন হরিণ বাঘ ডাকে'।

জীবনানন্দ

প্রদীপ দাশশর্মা

কাঁহাতক আর যূথিকার কথা বলবো মশাই
জীবনানন্দ একদিন ভুলভাবে তাকে 'বনলতা সেন' বলে ডেকেছিলেন
চলন্ত সিঁড়িতে সে একবার ওপরে ওঠে পরক্ষণে নেমে আসে
তাহার হৃদয় মোটেও ঘাস নয় আজ, সময়ের কমেে রক্তাপ্লুত
এই নারীর যোনী নেই, স্তন নেই, উরু নেই, নিতম্ব নেই
নীড়ের কথা সে পরে বলবে, ওসবের সময়ও নেই তার
এখন যুদ্ধ, শ্রেণী যুদ্ধটুকু বানানো কথা মার্কস সাহেবের, এখন
পুরুষের সঙ্গে দ্বৈরথ, কারণ পেটেন্ট-অ্যাক্ট অনুযায়ী মানবকে
কৃষিকাজ সেই-ই শিখিয়েছে, অতএব লভ্যাংশ চাই তার
এসব গণনা যূথিকাকে আক্রমণ করে, উৎপাদন-বিমুখ করে
অন্যের শ্রমে ভাগ চায়, এভাবেই জোয়ার, ভুট্টা, বাজরা, ধানের
দুধ থেকে আমলকির শিরা পর্যন্ত তার, সুদখোরী রাষ্ট্রের মত
যূথিকা দাঁড়িয়ে থাকে ব্রা উড়িয়ে লোগোর জগতে, বহুজাতিক।
যূথিকা কবে বলেছিল প্যারিস কমিউনের কথা মনে নেই আর, পাঠককুল
ক্ষমা করবেন ঘাই হরিণীকে... নষ্ট শসা ফলিয়েছে...

ইস্তাহার

পঙ্কজ সাহা

হাত তোল দুহাত মাথার উপরে
তারপর সীমান্ত পেরিয়ে যাও।

শরণার্থী শিবিরের দিকে যাচ্ছে
সাঁজোয়া বাহিনী

রেডক্রসের উপর বসে শিস দিচ্ছে
একটি পাখি

সংবাদ কলমেরা লিখে নিচ্ছে
তথ্যের গুঁড়ো মৃতের সংখ্যার ভগ্নাংশ

ইতিহাস পাতা ওল্টাচ্ছে
এই তো সময়
তুমি মাথার উপরে দুহাত তুলে
বেছে নাও কোন দিকে যাবে।

শরণার্থী শিবিরের দিকে যাচ্ছে...

কাকাতুয়া

প্রতিমা রায়

জীবনে আর একবার
শেষবার
সামনে গিয়ে দাঁড়াবো নিরবরণ হয়ে
সব শেষ হলে,

তুমি দেখো শিল্পীর চোখ নয়, মন নিয়ে
ভরাট করে তুলো প্রথম উলঙ্গ ভয়াল সৃষ্টির কালো আকাশ জঙ্গল
চিরে চিরে ডানা ঝাপটাচ্ছে একরাশ নীল লাল কাকাতুয়া
আর তীব্র বিশাল ডাক ছাড়ছে।

তবুও থাকে

অনির্বাণ দত্ত

সহজভাবেই নিতে তো চাই... সমস্তকিছু
তারপরেও যে কোন্ অপমান নিচ্ছে পিছু—
ঠিক জানি না।

ফিরিয়ে দিলে হাতের ছোঁয়া, তবুও থাকে
বুকের ঠিক মধ্যিখানে— একটা জড়ুল;
সেটাই বুঝি পাখির ডানায় ছোঁয়ার মতো
অতলান্ত ঐ সে দ্বীপে...
সেটাই বুঝি জন্মদাগের চিহ্নপলাশ—
করছি কবুল।

তবু শান্তি ধুয়ে যাচ্ছে এই বিকেলে
অনেক যত্নে ছাপ তুলেছ যা নিকেলে;
মরচেগুলো তবুও থাকে, ওঠে না সে...
ধ্বস্ত কিছু চিহ্ন শুধু নিচ্ছে পিছু :
উর্দ্ধশ্বাসে।

নিজেকে শনাক্ত করো

জয়ন্তী রায়

নিজেকে যাচাই করো,
বিশ্লেষণ করো,
আঙুল তোলার আগে
নিজেকে শনাক্ত করো
কোন সূক্ষ্ম মুহূর্তের
তুমিই ঘাতক ছিলে কিনা,
চতুর খেলার মাঠে
কে কাকে মেরেছে আগে,
কার তীক্ষ্ণ বাক্যজাল
ঝড়ের প্রলয়
ছিঁড়ে নিয়ে গেছে ফুল
মধ্যরাতে গভীর বিজনে,
কার ক্ষীণ অমনস্ক পথচারিতায়
ঘটে গেছে সর্বনাশ,
নিজেকে যাচাই করো,
বিশ্লেষণ করো,
আঙুল তোলার আগে
নিজেকে শনাক্ত করো,
কোন সূক্ষ্ম মুহূর্তের
তুমিই ঘাতক ছিলে কিনা।

জাতক

গৌতম ঘোষদস্তিদার

জল ও নদীর কথা এতবার বলেছি
তোমাকে যে মুখস্থ হয়ে গেছে তোমার
জলের ভিতর ভিজে চুপসে গিয়েছিল
যে-সব রঙিন কাগজের নৌকো

তাদের কথা তোমাকে বলিনি কখনও
রাতে বা দুপুরে পাতালে বা গুহায়
কিন্তু শুক্রবার নামে যে-নৌকোটি
আমি কালো উপন্যাসের পাতা ছিঁড়ে
বানিয়েছিলাম সামান্য আলো আর
অনেকটা অন্ধকার মিশিয়ে তা
শেষরাতে নিস্তরঙ্গে ভাসতে-ভাসতে
পৌঁছে যাবে তোমার স্তব্ধ বিছানার কাছে
এমনই বিশ্বাস ছিল আমার আগাগোড়া
কিন্তু শনিবার দুপুরের আগেই
তুমি টেলিফোনে স্পষ্ট জানিয়ে দাও
যে তেমন-কোনও ঘটনাই আদপে
অথচ কী অদ্ভুত দ্যাখো রবিবার সকালে
অঝোর বৃষ্টির মধ্যে লাল মেঘের মতো
তোমার একটি ফুটফুটে ছেলে হল
ভাঙা নৌকোর উপর নদীর চড়ায়।

আগস্ট ষোলো, নিরানব্বই

রূপা দাশগুপ্ত

... যেমন এই বিকালবেলা রাস্তা ঘুরে এসে থমকে দাঁড়ায়
মধ্যশহরে... শহরের মধ্যবিন্দুতে এক একটা হোর্ডিং... আমাকে
দেখুন... গোলাপজামা যুবক আমাকে দেখুন... আমাকে দেখুন
কেমন অশ্বত্থের পাতা হয়ে রূপকথার রাজমহল তুলে দিচ্ছি আপনাদের
হাতে... আমাকে দেখুন সুখী আর পরিতৃপ্ত... উপযুক্ত বয়সে
প্রতিষ্ঠা উজ্জ্বল সম্পর্ক দুচারটি সামাজিক হিতকর্ম বিনোদনে সংস্কৃতি
তারপর হুস্... শিরস্ত্রাণে উড়োজাহাজের ছায়া ফুট্কি ফুট্কি
যাত্রীদের বাতি... দয়া করে আমার পিছনে দাঁড়াবেন না।

ঘোরের ভিতর এক পাগল হেঁচ্কি তুলছে, আমাকে বাঁচাও। ঘোরের
ভিতর তার লালা রক্ত নিচ্ছে সবজি। ঘোরেরই ভিতর শিং আর

শুঁড় গজিয়ে উঠছে ভরসার আশপাশ। খবরগুলোর ছোট ছোট
লাইন দগদগে হয়ে উঠছে। তার ছুরিব ফলা নখ কাত্‌কাত্‌ ছিঁড়ে
দিচ্ছে দাঁড়িপাল্লা ছবি। ভন্‌ভন্‌ মাছিগুলোকে মুঠোয় রেখে ধরাছাড়া
খেলায় সে মজার জাদুকর। সারাজীবন ফ্যাসফেসে এক মজা
তার প্রলাপ অথবা ফুসমন্তর। বিকালগুলো প্রতিটি বিকালের মত।
সারি সারি পা অবিকল মোদ্দা পায়ের গড়ন... চলাফেরা।
ঘ্যানঘেনে বৃষ্টির ছাঁদনায় কোথাও কোন রামধনু নেই...।

ক্ষিপ্র এক হরিণের কাছে হেরে গেছে এক কবি। একথা লিখতে
গিয়ে কবির কলম ব্যথা। ততক্ষণে হরিণের চোখ চশমা পরেছে।

গুটিকর পংক্তি ব্যবধান

ঋজুরেখ চক্রবর্তী

ক্রোধ ও দুঃখের মাঝে এই মাত্র গুটিকয় পংক্তি ব্যবধান। রচনা প্রত্যক্ষ হেতু— বন্দনে গোলপোস্ট, নীল জাল, মশারির অথবা শূন্যের— চিরাচরিতের আলো বেঁকে এসে এখানে পড়েছে— আমাদের উদ্বেগ দুশ্চিন্তাগুলো সেই থেকে একরমই সামন্ততান্ত্রিক। লোকে বলবে এইটুকু রক্ষণশীলতা ভাল— এই ঘর, এই আধো-অন্ধকার স্মৃতি, আর এই নশ্বরতা। টিমটিমে বাতি জ্বলছে গ্যারাজের টিনের শেডের নিচে বর্ষণবিমুখ। দুই হাতে ধরেছি বিস্তার, দেখো, পোড়া কাগজের ঘ্রাণ কোন দিকে কতটা ছড়ায় আমি বলে দিতে পারি, বলে দিতে পারি কার অভিধানে ব্যঞ্জনবর্ণের কিছু ভুল উচ্চারণ দেওয়া আছে। দুই চোখে দেখেছি নরক, তাকে বোঝা-না-বোঝার মতো সঞ্জীবনী মন্ত্র পড়ে জাগিয়েছি সারাটা কৈশোর, বড় তাড়াতাড়ি বড় হয়ে গেছি। টিনের শেডের নিচে যে বাতিটি বর্ষণবিমুখ জ্বলে থাকে সারা রাত, আমি তার পেশাদারিত্বের কাছে বিনীত ছাত্রের মতো গিয়ে বসি, অভিজ্ঞতা ধার করে আনি, চুমো খাই পায়ে, আর আলিঙ্গনে পুড়ে যাই আপাদমস্তক। ক্রোধ ও দুঃখের মাঝে এই মাত্র গুটিকত পংক্তি ব্যবধান থেকে যায়, থেকে যায় ভালবাসাবাসি।

আশ্চর্য গল্প

সব্যসাচী সরকার

সে বিভিন্ন রকম, সুখে ও সন্তাপে
এ গলি সে গলি ঘোরে, থাকে কফি ও কফিনে
শবাধারে ঘুমোয় শোকে

সে চরিত্রহীন, যে বয়সের যা
হাওয়া বুকে বইছে না
গ্রীষ্মে ছাতায় শীতে ওড়নায়
ধ্বংসে ও জন্মে পিছু ছাড়ে না

আশ্চর্য গন্ধ, বাজারে নতুন পারফিউম
মাখুন
কালো শাদা পিঠোপিঠি গন্ধ
বাউণ্ডুলে

সিন্ধুবালা

নীলাদ্রি ভৌমিক

যদি কোনো গুপ্ত ব্যথা ফের জাগে নাচের আসরে—
ধর এক নাচনির আলগা আলস্যে, তার পায়ের পাতায়
গানের সুরের ঢেউ ঘুরে ঘুরে নাচে ও ভাসায়
সেই তালে তাকে ছুঁয়ে ক্ষতচোখে— শব্দহীন প্রলাপের মত
আহত মানস খুলে, বালিশের তুলো খুলে, নির্বাচিত স্বপ্নের ভিতর
বাউণ্ডুলে নেশা পায়ে যদি সেই নাচ আরো ক্যাজুয়াল হয়—

কবিকে সাহস দিও, কুয়াশা নামানো মাঠে, স্বাভাবিক, অনুচ্চ ইচ্ছায়

সন্ন্যাসী রাজা

দুলাল ঘোষ

এ ধর্মসন্ত্রাসে কোনো শিরস্ত্রাণ নেই
শুধু আছে
শব্দ-নিরোধক শরীরে
ডিটিপিতে ছাপা গেরুয়া পোশাক

এতকাল
রক্তের বিনিময়ে শত্রুই চিনেছো যারা
নেমে এসো—
পাথরে পাথর ভেঙে গড়ে তোল
সুউচ্চ সোপান

সন্ন্যাসী রাজা দেখে নিতে চান
নিজ চোখে, মাথা গুনেগুনে
স্বর্গাদপি গরিয়সী মায়ের—
ঠিক কতজন, আরজ সন্তান।

রঙবদল

প্রদীপ পাল

জন্মদাগ দেখে যিনি বলেছিলেন তোমার ভবিষ্যত
মরপৃথিবীতে তিনি আর নেই, রয়েছে ঠিকুজি
তাতেই জানা গেছে তোমার বিপদ-আপদ
তোমার সুখ-ঐশ্বর্য এবং মহামৃত্যুর পরওয়ানা

বছরের পর বছর জেগে আছো তুমি
তুমিই চিত্রকর, তুমিই বাদ্যবাদক, তুমিই কথকঠাকুর

পালক খসিয়ে খসিয়ে তুমি এখন দেশপ্রভু
মাটিঘর ছেড়ে তোমার নিবাস এখন বৃক্ষতল

কি দ্রুত পাল্টে গেলে তুমি যাযাবর হে, ছিঃ

অন্ধ

সৌগত চট্টোপাধ্যায়

সারা বিকেল খুঁজে বেড়াই তোকে
ঠাণ্ডা হাওয়া পাঁজর চিরে ঢোকে
বুকের মধ্যে গজিয়ে ওঠে অসুখ
নৃশংস এই ভালোবাসা বুকের কাছে আসুক
　　　　　　বুকের মধ্যে ভাসুক
ভালোবাসলে পেতেও পারো তিনমুখো এক শামুক
ঝড়ের রাতে ভালোবাসা বৃষ্টি হয়ে নামুক
মন নয় তো পাথর রাখি মনে
ঘরের মধ্যে হিংসা চটুল পাকিয়ে ওঠে
　　　　　　ঘরেরই চার কোণে
এ হেন রাত যেমন
যেমন তেমন ছুটে বেড়ায়
মনেরই মন কেমন
অথচ এক সোনায় মোড়া খবর
পত্রহানি ঘটলে আমি তোমার কাছে ঋণী
　　　　　　শুধু তোমার কাছেই ঋণী
চোখ নেই যার সেই ডাক্তার
তোমায় আমি চিনি

নদীর সঙ্গে

বিশ্বজিৎ রায়

যে-নদীর ছবি ভেসে আসে
আমি তাকে দেখিনি কখনও,
কেন আজও সে এত হতাশে—
আকাশেতে মেঘ জমে ঘন।

আমার কি কথা ছিল কোনো?
আমাদের কথা ছিল কোনো?
যে ছবিতে ধূসরতা জমে,
আমি কি তা দেখিনি কখনও?

এইভাবে বেঁচে থাকা যদি,
স্বাভাবিক চলে যাওয়া জানি—
তোমার কি মনে পড়ে নদী
গাছের সঙ্গে কানাকানি?

পথ আজ বেঁকে বেঁকে দূরে
নিয়ে গেছে, রাখে নি তো দায়—
তবু কেন অলস দুপুরে
নদী আসে, নদী ডেকে যায়?

শিল্পীর ইচ্ছেগুলো

শঙ্কর বসু

নৃত্যময় সরস্বতী গড়তে গিয়ে
শিল্পী এক শবর যুবতী গড়ে ফেললেন—
ডিস্কো থেকে ছেলে উঠে এল কালো চোখ
বুকে বসিয়ে দিলেন দুটো সম্মোহন বিস্ফোরক

আর শ্রোণীদেশে অনন্ত যৌবন
আর্ট কলেজের ন্যুড স্টাডি শিখিয়েছিল
চোখ নাক ঠোঁট গ্রীবা ও জঙ্ঘা
এখন ইচ্ছে করে পিকাসোর মত
বুকের জায়গায় চোখ আর
চোখের জায়গায় বুক বসাতে
অজন্তার গুহাচিত্রে রোদচশমা
অথবা যুবতীর পিঠে ঘোড়ার মুখ
কিন্তু অভ্যাসমত সব ঠিক গড়তে হবে। তাই
শুধু মগজকে খালি রেখে
সেখানে নিজের ইচ্ছেটুকু পুঁতে দিলেন।

দাও চিহ্ন— ও মেয়ে, ও মাটি

দীপশিখা পোদ্দার

জাতীয় পতাকার মত অবসন্ন পড়ে আছে মেয়ে।
রোগা মেয়ে, তুমি উৎসব হয়ে উঠেছিলে একদিন।
হয়ে উঠেছিলে, নাকি তোমাকে উৎসব ক'রে
নেচে উঠেছিল মূঢ় মাটি?
বোবা মেয়ে, হিসেব রাখনি জানি—
পঞ্চাশ বছর কত সূর্য ডুবে যাওয়া-হিমরাত তোমাকে ছুঁয়েছে;
বিবর্ণ কুলুঙ্গি থেকে ছেঁড়া শাড়ি
অমীমাংসিত দাওয়ায় এখনো উড়ছে পত্‌পত্‌;
তার কথা ভাবো মেয়ে, বোবা মেয়ে,
নিজের নামের পাশে লেখো তার নাম।
তার স্বপ্নকথা লেখো। নিজস্ব রক্তের কথা,
বিভিন্ন বিকেলে বদলে বদলে যাওয়ার কথা
লিখতে ভুলো না।
জলপানের দিকে ছুটে যাচ্ছে আত্মস্বর। তোমার নিজের মাটি,
ভূমিখণ্ড, তোমার সবুজ,
কেন ভেসে যাবে বিপরীত বিরুদ্ধ হাওয়ায়?

ওঠো মেয়ে, স্ব-পথ মাড়িয়ে সারা চলে গেছে
উচ্চারণ ফেলে
রক্তমাখা শেষ শ্বাস ফেলে সাথীদের...
একা মেয়ে, তবু জেগে ওঠো আজ
অনুকূল ঘুম থেকে জেগে ওঠো

লুটোনো আঁচল তুলে নাও।

নাগরিক

সুমন গুণ

১
বিমর্ষ টিফিনকৌটো হাতে নিয়ে বসে আছো, পাশে
সহকর্মী, ঝুঁকে
দুতিনটি যুবক

বারোটা কুড়ির ক্লাসে যেতে যেতে হাই ওঠে, পরিশ্রম হয়
২
গাছের ছায়ার নীচে জল, চারপাশে
দুপুরের রোদ, ট্রাম, ক্লান্ত লালবাড়ি
৩
ফুটপাতে থালা, খোলা আঠারো, দূরের
জানালায় অস্পষ্ট সংসার

আড্ডা

বিশ্বনাথ কয়াল

এমন দারুণ গরমে তোমরা কারা হে
আড্ডায় মেতে আছ।
তবু অস্থিমজ্জা জুড়ে জমাট শীতলতা;
দেখ চারপাশে নদী নালা গাছপালা
ইতর প্রাণে গরু ও ফড়িং। মানুষ ও পাখির ডানা
বেওয়ারিশ শ্বাসে কাতর হাঁপায়।

এমন দারুণ গরমে তোমরা কারা হে
প্রণয় দুঃখ সুখ বেকারবাহার
তুল্যমূল্য বাণী সব শব্দবিলাস
দেখ জলের কলে শীর্ণ বিকেল জুড়ে
নারী ও যুবতী, মহিলা সব
দারুণ শব্দকানে আসর সাজায়।

এমন দারুণ গরমে তোমারা কারা হে—
আড্ডা যদি হৃদয় কোথায় বেবাক উদোম।
পলাশ ছুঁয়ে দুপুর যদি আগুন ঝরায়
আড্ডা যেমন গরমশেষে
রাতের বাতাস সাগর শুষে
কোথায় তোমার বর্ষা ও অঙ্কুরাভাব।

রাজাদের গল্প

আনন্দ ঘোষ হাজরা

রাজারা কখনও দরোজা স্পর্শ করেন না।
দরোজা স্পর্শ করার সুখটাই জানেন না। খুব আস্তে আস্তে নব্‌টা ঘুরিয়ে
দরোজাটা ছুঁয়ে আলতো ক'রে ঠেলা দেওয়ার অথবা জোরে ধাক্কা দেওয়ার
আশ্চর্য অভিজ্ঞতা তাঁদের নেই। দরোজার পাল্লার ফাঁক দিয়ে আধো আলো
আধো অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে পা ফেলে, ঘরের ভেতর ঢুকে, সহসা একটা
কিছু
লক্ষ ক'রে থমকে দাঁড়িয়ে যাওয়ার বা অবাক হয়ে ওঠার সুখানুভূতি তাঁদের
কখনই হবে না।
কারণ, রাজাদের জন্যে দরোজা অন্যেরা খুলে দেয়। রাজা যাবে ব'লে
দরোজা হাট ক'রে খোলা থাকে। ঘরের ভেতরটা আলোকিত করা থাকে।
রাজা সব কিছুই স্পষ্ট দেখতে পান। অকস্মাৎ থমকে দাঁড়ান না।
রাজাদের জন্য দরোজা অন্যেরা খুলে দেয়; রাজারা কখনও
দরোজা স্পর্শ করেন না।

সমকাল

অত্রি ভৌমিক

আজ অনেক কিছুর সাথে সন্ধি ক'রে
বেঁচে থাকা শুধু।
তোমার হলুদ পাবণের দিনে
মনের সামীপ্য চেয়েছিল এলোমেলো·হাওয়া
রক্তিম হয়ে উঠেছিল সকাল তোমার সম্ভাষণে।
সে দিন ছিল অভিমানী কবিতার দিন।
আজ অন্যপথে এসে অনেক পাওয়ার মাঝেও
শূন্য রিক্ত হয়ে আছি।

এখন সময়ের কীট কুড়ে কুড়ে খায়
যা কিছু ভালোলাগার আমার নির্মমভাবে।
সেই মাঠ-সবুজ, জল-সবুজ আর
মন-সবুজের মাঝে পড়ে থাকে প্রিয় সব গান,
অন্য সমারোহে বিচরণ করি আজ—
নাকে আসে শুধু তেজস্ক্রিয় ঘ্রাণ।

রাস্তাঘাট

কালীকৃষ্ণ গুহ

টেনিস খেলার মাঠ
দেখায় রাস্তাঘাট

রাস্তা ঘিরে বাড়ি
আস্থায়ী সঞ্চারি

সঞ্চারিত থাকা
অতীত জুড়ে আঁকা

সমস্ত অঙ্গনে
বিরহ ছিল মনে

সব বিরহের গান
পরম-বিলের ধান

আর কিছু নেই বলার
'ম্যায় কাশীকা জুলহা—'

বলেছিলেন কবীর
সেই বলাটা স্থির

কালপুরুষের কুকুর
দেখছে অনেক দূর

এক একদিন

নীরদ রায়

যার কথা মনে হল
সাতদিনের বাসী থুথু আটকে পড়ে গলায়, ঘিনঘিন করে ওঠে না—
এক একদিন সকালবেলা হঠাৎ তাঁর সংগে দেখা হলে
কেন যে বলতে ইচ্ছে করে— দাদা ভালো আছেন তো—
যে লোকটা কোনোদিন কবিতা পড়ে না, শোনে না হেমন্ত মান্না দে,
তাঁকেও কখনো কখনো ঘুমিয়ে থাকা এক নদীর পাশে দেখলে
কেন যে মনে হয় তাকে শোনাই কিছুটা হেমন্ত আর এক লাইন জীবনানন্দ,
মানুষের ভালোর উল্টো দিকে যিনি সারাজীবন দৌড় ঝাঁপ করে গেলেন—
পাশের বাড়ির কোনো ছেলেমেয়ে উচ্চমাধ্যমিক স্টার পেলে—
যিনি বুকে ব্যথায় সারারাত ঘুমোতে পারেন না ঠিকমতো,
পি. এফ. এল. আই. সি. থেকে চড়া সুদে লোন নিয়ে
বড় রাস্তার পাশে কেউ একটা বাড়ি করলে
গোপনে সর্বনাশকে যিনি দেখিয়ে দেন সেই বাড়িতে ঢোকার রাস্তা,
তাঁকে, বাজারে যাওয়ার রাস্তায় দেখা হলে
কেন যে বলতে ইচ্ছে করে— দাদা বাড়ির সবাই ভালো তো?
এক একদিন সোজা রাস্তাগুলি আমার
অকারণে এইভাবে হঠাৎ হঠাৎ বেঁকে যায় কেন?

সংহতিই অগ্রগতির ভিত্তি

হাজার পাথরের টুকরোই তৈরী হয়
একটি প্রাসাদ। প্রাসাদটি দৃঢ়, মজবুত।
বহু জাতি, ধর্ম ভাষা এবং আচারের
সমাহারে আমাদের দেশ। আচরণে
পৃথক—কিন্তু বিশ্বাসে এক।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

EVEREADY
Give me Red

PARICHAY AUGUST-OCTOBER 1999 Reg. No. 13273 WB/EC-265

সম্পাদনা দপ্তর : ৮৯, মহাত্মাগান্ধী রোড, কলকাতা- ৭০০ ০০৭

ব্যবস্থাপনা দপ্তর : ৩০/৬ ঝাউতলা রোড, কলকাতা- ৭০০ ০১৭

পরিচয়

দাম : চল্লিশ টাকা
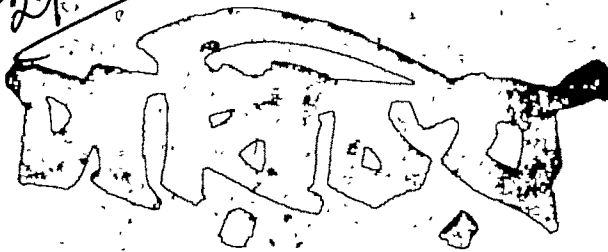
এ-সংখ্যায়

আলোচনা

মার্ক্স মৃত্যুর পর প্রাসঙ্গিকতা : অমর্ত্য সেন

অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী : কমল সমাজদার

শিক্ষা চিন্তায় রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র : অশোক মুস্তাফি

অমর্ত্য সেনের রাজনৈতিক অবস্থান : বাসব সরকার

প্রসঙ্গ লোরকা : পাবলো নেরুদা

লোরকার কবিতার অনুবাদ : বিষ্ণু দে ও অমিতাভ দাশগুপ্ত

উপন্যাসে

শাইলকের বাণিজ্য বিস্তার (শেষ পর্ব) : শাহ্‌যাদ ফিরদাউস

পুস্তক আলোচনা, কবিতা ও অন্যান্য

সংহতিই অগ্রগতির ভিত্তি

হাজার পাথরের টুকরোই তৈরি হয়
একটি প্রাসাদ। প্রাসাদটি দৃঢ়, মজবুত।

বহু জাতি, ধর্ম ভাষা এবং আচারের
সমাহার আমাদের দেশ। আচরণে
পৃথক—কিন্তু বিশ্বাসে এক।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই. সি. এ—১৫২/৯১

মুহূর্তের অসতর্কতা

মারাত্মক অগ্নিকাণ্ড

গোটা বছর আগুন এড়াতে কয়েকটি সাধারণ সতর্কতা মেনে চলুন

★ বৈদ্যুতিক তার ও সংযোগস্থলগুলি ত্রুটিমুক্ত রাখুন।

★ অন্যায়ভাবে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করবেন না।

★ তেল, পেট্রোল প্রভৃতি দাহ্য পদার্থ আগুন থেকে দূরে রাখুন।

★ আগুন লাগলে সঙ্গে সঙ্গে ১০১ ডায়াল করে দমকলে খবর দিন।

★ অহেতুক উত্তেজনা ছড়াবেন না। দমকল কর্মীদের কাজে অনভিপ্রেত হস্তক্ষেপ করবেন না।

পশ্চিমবঙ্গ অগ্নি নির্বাপক সংস্থা

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই. সি. এ. ১৫২ / ৯১

বামফ্রন্ট সরকারের লক্ষ্য
পঞ্চায়েতের অনুকূলে ক্ষমতা ও সম্পদ
বিকেন্দ্রীকরণ

পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে বামফ্রন্ট সরকার এক অনন্য নজীর গড়ে তুলেছে। প্রকল্প রূপায়ণে স্থানীয় মানুষের সহায়ক কমিটি গঠনের মাধ্যমে পঞ্চায়েতের কাজকর্ম আরও গণমুখী হয়ে উঠেছে। গ্রামোন্নয়নের পরিকল্পনা তৈরী ও কার্যকরী করার ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। ত্রিস্তর পঞ্চায়েত মহিলাদের জন্য এক তৃতীয়াংশ এবং তপশিলী জাতি উপজাতিদের জন্য জনসংখ্যার অনুপাত অনুযায়ী আসন সংরক্ষিত।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই. সি. এ—১৫২/৯৯

ঐক্যই শক্তি

"বহুর মধ্যে ঐক্য উপলব্ধি

বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য স্থাপন—

ইহাই ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত ধর্ম।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই. সি. এ ১৫২ / ৯৯

মিশনারী গ্রাহাম স্টেইন্‌স্‌ ও তাঁর দুই শিশু পুত্র

সুবোধ চন্দ্র সেনগুপ্ত

পান্নালাল দাশগুপ্ত

কবিতা সিংহ

পরিচয়

নভেম্বর-জানুয়ারী ১৯৯৯
কার্তিক-পৌষ ১৪০৬
৪-৬ সংখ্যা ৬৮ বর্ষ

প্রবন্ধ

পুস্তক পরিচয়

বিষয় সূচি

কবিতা

উপন্যাস

কবিতাগুচ্ছ

সম্পাদনা দপ্তর : ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭

রঞ্জন ধর কর্তৃক বাণীরূপা প্রেস ৯-এ মনোমোহন বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ব্যবস্থাপনা দপ্তর ৩০/৬, ঝাউতলা রোড, কলকাতা-১৭ থেকে প্রকাশিত।

মার্ক্স মৃত্যুর পর

আধুনিক অর্থনীতিতে প্রাসঙ্গিকতা *

অমর্ত্য সেন

কার্ল মার্ক্সকে মনে পড়ে, বৃটিশ মিউজিয়ামের এক সুপ্রাচীন কর্মিকে একথা জিজ্ঞাসা করা নিয়ে, অর্ধ শতকেরও বেশি আগে একটা ছোট্ট মজার গল্প ছিল। 'মিঃ মার্ক্স,' মিঃ মার্ক্স ?' অনেক কষ্ট করে ভেবে তিনি বলেন 'আপনারা সেই দাড়িওয়ালা ভদ্রলোকের কথা বলছেন যিনি ওইখানে বসে কাজ করতেন ? একদিন হঠাৎই তিনি চলে যান, আর—জানেন—তারপর আর কেউ তাঁর কথা শোনে নি।'

মাত্র কয়েক দশক আগেও মার্ক্স সম্পর্কে পেশাদার অর্থনীতিবিদদের দৃষ্টিভঙ্গি এই বিশ্বাসটাই প্রতিপন্ন করতে সচেষ্ট ছিল যে মার্ক্সের নাম কেউ শোনেনি, অন্ততঃ এই গোষ্ঠীর কেউ তো নয়ই। মার্শাল কিম্বা পিগু অথবা কেইন্‌স কিম্বা রবার্টসন প্রমুখ লেখকদের রচনায় মার্ক্সের অর্থনৈতিক ধারণা সম্পর্কে তাঁদের প্রতিক্রিয়া খোঁজার চেষ্টা কেউ করলে তা বৃথা হবে। সেখানে বড়ো জোর একটা দুটো কথায় মার্ক্সকে খারিজ করে দেওয়ার মতো কোন মন্তব্য অথবা যথারীতি কোন কিছুই পাওয়া যাবে না। চল্লিশের দশক এবং তারপর থেকেই বড়ো মাপের পরিবর্তন ঘটে যায়। মার্ক্সবাদী কিম্বা অর্থনৈতিক ধারণার ইতিহাসের বিশেষ আগ্রহের এলাকা ছেড়ে হঠাৎই পেশাদার অর্থবিদ্যার উপরে মার্ক্সের ব্যাপক এবং জোরালো প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

---

* মার্ক্সের মৃত্যু শতবার্ষিকীতে দি স্টেট্‌সম্যান পত্রিকায় ১৪ মার্চ ১৯৮৩ 'মার্ক্স সিন্স হিজ্ ডেথ, রেলিভান্স টু মডার্ন ইকনিমিকস' শিরোনামে মূল নিবন্ধটি প্রকাশিত হয়। অমর্ত্য সেন নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর দি স্টেট্‌সম্যান পত্রিকা তাঁর অনেক নিবন্ধের মতোই এটাও পুনঃ প্রকাশ করেন। ২২ অক্টোবর ৯৮ তারিখের স্টেট্‌সম্যান থেকে এই পত্রিকার সৌজন্যে নিবন্ধটির ভাষান্তর প্রকাশ করা হলো। —সম্পাদকমণ্ডলী

এটা ছিল তিরিশের দশকের মন্দার বিলম্বিত প্রতিক্রিয়া, যা কিছু ব্যতিক্রমী চিন্তা বাদ দিলে, মার্ক্সের রচনার ধারার সঙ্গেই সঙ্গতিপূর্ণ ছিল, সমকালের অর্থনীতিকদের চিন্তায় যার কোন আভাস মেলেনি। আর অংশতঃ এটা ছিল শক্তিশালী অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়নের উদ্ভবের প্রতিক্রিয়া। একদিকে অর্থনৈতিক বিকাশ ও উন্নয়ন আর অন্য দিকে বৈষম্য ও দারিদ্র্য নিয়ে যুদ্ধোত্তর বছরগুলিতে যে চিন্তা ভাবনা সুরু হয় তার জন্যেই মার্ক্সকে এড়িয়ে যাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে।

এখন, মৃত্যুর শতবর্ষ পরে মার্ক্সকে প্রায় সারা দুনিয়ায় সর্বকালের একজন বিরাট অর্থনীতিবিদ বলে মেনে নেওয়া হয়েছে। সেই 'দাড়িওয়ালা ভদ্রলোকের' অর্থনৈতিক ধারণা সম্পর্কে না জেনে থাকাকে আর সুরুচির চিহ্ন বলে কেউ মনে করেন না, বরং তাকে অর্থনৈতিক নিরক্ষরতা বলেই গণ্য করেন।

উপেক্ষিত বৈশিষ্ট্যসমূহ

আধুনিক অর্থনীতির উপরে মার্ক্সের অভিঘাত বাস্তবিকই খুব জোরালো। মার্ক্সের অর্থনৈতিক ধারণাগুলি এ পর্যন্ত যতোটা প্রভাব বিস্তার করেছে, তারপর তাদের থেকে আরো বেশী কিছু পাওয়া যাবে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষণীয় যা কিছু আছে সেগুলি কি এখনো শেখা হয়নি? সাম্প্রতিক বছরগুলিতে মার্ক্সের বিশ্লেষণ যে বহুমুখী এবং একাগ্র মনোযোগ আকর্ষণ করেছে তা সত্ত্বেও আমি দেখাতে চেষ্টা করবো তার থেকে শেখার মতো আরো অনেক কিছু রয়ে গেছে।

মার্ক্সবাদী আরো সাধারণভাবে বলতে গেলে মার্ক্সীয় অর্থনীতি নিয়ে যতো কাজ হয়েছে মনে হয় সেগুলি নির্দিষ্ট একটা ধারার মধ্যেই আবদ্ধ থেকেছে, সেই সব কাজের ফলাফল প্রায়শই খুব গুরুত্বপূর্ণ হলেও মার্ক্সীয় অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে আরো বহুদিক রয়ে গেছে এই সব আলোচনা যার উপরে সুবিচার করতে পারেনি। মার্ক্সের উপর সুবিচার করা আমার এই নিবন্ধের মূল লক্ষ্য নয় (বিরাট প্রতিভাকে প্রায় অনিবার্য ভাবেই নানা অবিচার সহ্য করতে হয়), মার্ক্সীয় দৃষ্টিকোণের অপেক্ষাকৃত উপেক্ষিত বৈশিষ্ট্যগুলি যা আলোর দিশারীর মতো, সেগুলি তুলে ধরে আমাদের নিজেদের উপরে সুবিচার করাই আমার লক্ষ্য।

মার্ক্সীয় দৃষ্টিকোণের দুটি দিক, (১) ব্যক্তির সামাজিক প্রকৃতি এবং

(২) অর্থনৈতিক প্রগতির বিচারে 'ওয়েলফেয়ার' এর বিপরীতে 'বিত্তম' এর উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ, আমার বিশ্বাস, আধুনিক অর্থনীতিতে বিশেষ ভাবে উপেক্ষিত হয়েছে। এই দুটি প্রশ্নের সঙ্গে, বিশেষতঃ প্রথমটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত একটা তৃতীয় বিষয় আছে, যথা প্রণোদন (ইনসেন্টিভ) এবং প্রেষণার (মোটিভেশন) প্রশ্ন। আধুনিক অর্থনীতিতে এই তিনটি বিষয়ের—এবং তাদের সম্পর্কে মার্ক্সের ধারণার প্রাসঙ্গিকতা আলোচনার উপরেই আমি মনোনিবেশ করবো।.

চিরায়ত অর্থনীতি তত্ত্বের কেন্দ্রীয় ধারণা যা আধুনিক অর্থনীতি চর্চায় অধিগ্রহণ করা হয়েছে, তা হলো তথাকথিত 'র‍্যাশনাল' ব্যক্তির ধারণা। এই ব্যক্তিটি হলো এমন একজন মানুষ যার পছন্দগুলির সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা আছে, স্পষ্ট এবং স্বাধীনভাবে অনুভূত ব্যক্তিগত স্বার্থবোধের সঙ্গে তার পছন্দগুলি সম্পূর্ণতা যুক্ত, এবং সে নিজের পছন্দ গুলি যথা সম্ভব পূরণ করার উদ্দেশ্যেই নানা অর্থনৈতিক কাজকর্ম করে থাকে। অর্থনীতির অধিকাংশ সাধারণ তত্ত্ব এই ধরণের মানুষদের আচরণ এবং বাজারী ব্যবস্থায় গড়ে ওঠা তাদের ভারসাম্য সম্পর্কের নানা দিক আবিষ্কারের চেষ্টাতে নিবদ্ধ। কৌতূহলকর ভাবে চিহ্নিত এই সব 'র‍্যাশনাল' ব্যক্তিদের মধ্যে পণ্য বিনিময়ে দাম উদ্ভূত হতে দেখা যায়, আর এই ধরণের সম্পর্ক উৎপাদন, নিযুক্তি এবং অর্থনীতির অন্যান্য ফলাফল নির্ধারণ করে থাকে বলে মনে করা হয়। আধুনিক অর্থনীতির আধুনিকতম শাখাগুলির অন্যতম সাধারণ ভারসাম্য তত্ত্ব অনুমিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে কল্পিত সম্পর্কের সুবিস্তৃত আবিস্কারের প্রতিনিধিত্ব করে।

আপাতঃ দৃষ্টিতে মনে হতে পারে মানুষে সম্পর্কে মার্ক্সীয় নিরিখের সঙ্গে ব্যক্তি সম্পর্কে এই ধারণার অন্ততঃ পুঁজিবাদী ব্যবস্থার যেখানে পুঁজি-পতিরা মুনাফা সর্বোচ্চ করতে আর শ্রমিকরা সাধ্যমতো বেঁচে থাকার চেষ্টা করে, তার বিশেষ কোন বিরোধ নেই। কিন্তু আসলে স্বাধীন 'র‍্যাশনাল' ব্যক্তিবর্গের এই কল্পিত দুনিয়া, মার্ক্সের 'সামাজিক প্রাণীর' বিশ্লেষণ, যারা 'সামাজিক সত্তা সম্পর্কে সচেতন হয়েই কাজ করে,' তাদের থেকে বহু দূর। যেমন Grundrisse গ্রন্থে মার্কস লিখেছেন অর্থনীতিকরা ধরে নিয়ে থাকেন যে 'প্রতিটি মানুষের মনে তার ব্যক্তিগত স্বার্থ ছাড়া আর কিছুই নেই' আসলে 'বোঝা দরকার যে এই ব্যক্তিগত স্বার্থটাই ইতোমধ্যে সামাজিক ভাবে

নির্ধারিত স্বার্থ হয়ে গিয়েছে'। সমাজ যে মূল্যবোধ ও মতাদর্শ নির্ধারণ করে দেয় সেটাই ব্যক্তির স্বার্থ ধারণার অঙ্গীভূত হয়ে তার আচরণের মধ্যে প্রতিফলিত হয়।

দৃশ্যতঃ সমধর্মী অর্থনৈতিক কাঠামোর অধীন বিভিন্ন সমাজে, যেমন বৃটেন ও জাপান, অর্থনৈতিক কার্যাবলীর তীব্র পার্থক্য নিয়ে সম্প্রতি প্রকাশিত সমীক্ষায় দেখা যায় সমাজের প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে ব্যক্তি স্বার্থের ধারণাগত বিভিন্নতার গুরুত্ব অপরিসীম। স্বার্থের দায়বদ্ধতা এবং লক্ষ্যমাত্রার বিভিন্নতার ধারণাগত দিকের বাস্তব বৈপরীত্য নিয়ে সাম্প্রতিক কালে মিশিয়ো মোরিশিমা, টাইবর স্কিতোভকি এবং অন্যরা তাঁদের আলোচনায় বহুদিকের উপরে যেভাবে আলোকপাত করেছেন, ব্যক্তিকে সামাজিক সত্তারূপে গণ্য করার মার্ক্সীয় দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের আরো নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে।

পুঁজিবাদের পতন নানাভাবে ব্যাখ্যার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা ছাড়া যাঁরা মার্ক্সীয় ধারণাগুলির অন্য প্রয়োগ দেখতে পান না (বিভিন্ন ধরণের প্রাক্-পুঁজিবাদী, পুঁজিবাদী এবং সমাজতন্ত্রী সমাজগুলির কার্যক্রম, সক্রিয়তা এবং পতনের দিকগুলিও তাদের সাহায্য ব্যাখ্যা করা যায়), মার্ক্সীয় যুক্তির এই ধরণের প্রয়োগ তাঁদের কাছে সন্দেহজনক ঠেকবে। কিন্তু মার্ক্স আমাদের বোধের জন্যে কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর সরল সাধারণ সামান্যকরণ ছাড়াও আরো অনেক কিছুই রেখে গেছেন। তাই মার্ক্সীয় ধারণার আলোয় কোন অর্থনীতির সক্রিয়তা বোঝার জন্যে কোন সমাজ শুধু পুঁজিবাদী কিম্বা সমাজতন্ত্রী কিনা সেটা দেখার বদলে আরো অনেক দূরে যেতে হবে।

প্রণোদন

স্বার্থগত ধারণার বিষয়টি অবশ্যই প্রণোদন ও প্রেষণার (incentive and motivations) প্রশ্নের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে যুক্ত, বস্তুগত প্রণোদন গুরুতরভাবে খর্বকারে চীন যে পরীক্ষা সম্প্রতি চালিয়েছে, সেই প্রেক্ষিতে এই প্রসঙ্গ বিপুলভাবে আলোচিত হয়েছে। বস্তুগত প্রণোদন বাতিল করা যাবে না, চীনের বর্তমান সরকার এ বিষয়ে সুদৃঢ় মতে উপনীত হয়েছেন, কারণ ব্যক্তির চেতনা সামাজিক প্রয়োজনের নিরিখেই পরিচালনা করা—

মাও-য়ের এই সাহসী ধারণা সফল হয়নি। কাজ অনুযায়ী নগদ টাকা দিয়ে যে প্রণোদন সৃষ্টি করা যায় তা বাতিল করা যেতে পারে একমাত্র 'কমিউনিস্ট সমাজের উচ্চতর পর্যায়ে'. 'ক্রিটিক অব দি গোথা প্রোগ্রামে' মার্ক্সের বক্তব্য ও যুক্তির সঙ্গে এই নৈরাশ্যবাদী ধারণার বিশেষ পার্থক্য নেই।

মুখ্যতঃ এটি হলো অভিজ্ঞতালব্ধ ধরণা, এবং চীনের ঘটনাবলীকে এই বিষয়ে মার্ক্সের সতর্ক বিচারমূলক সিদ্ধান্তের প্রমাণ হিসাবে দেখা যেতে পারে, যেহেতু বস্তুগত প্রণোদন বাতিল করা নিয়ে পরীক্ষায় মনে হয়েছে উৎপাদনশীলতা কমেছে এবং অদক্ষতা বেড়েছে। একদিকে কর্তৃত্বপরায়ণতা ও খামখেয়ালীপনা এবং অন্যদিকে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার এক সুদুর্লভ সহযোগে 'গ্রেট লীপ্ ফরোয়ার্ড' ও 'কালচারাল রেভোলিউশন' এর কর্মসূচি যেভাবে কার্যকর করা হয়েছে তার সঠিক খবর যতো বেশি পাওয়া যাচ্ছে তাতে সঙ্গতভাবেই আমরা বিস্ময় প্রকাশ করে বলতে পারি যে বস্তুগত প্রণোদনের বদলে রাজনৈতিক চেতনা প্রয়োগে মাওয়ের সাহসী স্ট্র্যাটেজি সত্যই যথাযথ ভাবে আদৌ পরীক্ষা করা হয়েছিল কিনা।

রাজনৈতিক শিক্ষা এবং 'সামাজিক সত্তার' 'অনুশীলনের মধ্য দিয়ে 'কালচারাল রেভোলিউশান' সম্পর্কে মাওবাদী ধারণা ও অন্তদৃষ্টির সঠিক প্রয়োগ না হওয়া (ক্ষমতা ক্রমাগত ছোট থেকে আরো ছোট গোষ্ঠীর হাতে কেন্দ্রীভূত হওয়া) আর পার্টিকে ঘিরে গড়ে ওঠা বিকৃত রাজনৈতিক সংগঠন আর বৃদ্ধ মাও স্বয়ং হয়ে পড়েছিলেন 'কালচারাল রেভোলিউশনের' প্রধান শত্রু। সাধারণ সমস্যার সমাধান এখনও হয়নি, এবং সামাজিক সচেতনতা আর ব্যক্তিস্বার্থ ধারণা যা হলো কেন্দ্রীয় প্রশ্ন যা মার্ক্স এমন জোরালো ভাবে উত্থাপন করেছিলেন, সেটা পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক উভয় সমাজের বিশ্লেষণে তীব্র আকর্ষণ ও তর্কের বিষয় হয়ে থাকতে বাধ্য।

অর্থনৈতিক অগ্রগতির বিচারে 'ওয়েলফেয়ার' ধারণার বিপরীতে ক্রিডম বা মুক্তির ধারণার উপরে মার্ক্স যে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন, সেটাই এখন আলোচনা করবো। উপযোগিতা অথবা নিজের কল্যাণ সম্বন্ধে ব্যক্তির নিজস্ব ধারণা চিরায়ত ওয়েলফেয়ার অর্থনীতির এটাই হলো মৌল পরিবর্তনশীল উপাদান। সমকালীন আলোচনায় এই ধারণার অবর্ধিত আদিম রূপের উপর যে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হতো, মার্ক্স আদৌ তা সহ্য করতে পারতেন না। অংশতঃ এই দৃষ্টিকোণ যা 'মানুষদের বিভিন্ন আন্তর সম্পর্ক-

গুলিকে শুধুমাত্র উপযোগিতার সম্পর্কে রূপান্তরিত করতো' মানুষের আচরণের এই স্থূল ব্যাখ্যাকে মার্ক্স মানতে পারেন নি। আর অংশতঃ প্রগতি বিচারের একমাত্র মাপকাঠিকে ইউটিলিটারিয়ানরা যখন সুখের মনস্তত্ত্বেই আবদ্ধ রাখতে চেয়েছিলেন, মার্ক্স সেই বিষয়ী মনোভাবও পছন্দ করতে পারেন নি। আরো গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো, মার্ক্স তাঁর দীর্ঘ উৎপাদনশীল বৌদ্ধিক জীবনে মানুষের অবস্থা বিচারে জনগণ সদর্থক অর্থে যে মুক্তিতে বিশ্বাস করে, মানুষের সেই মুক্তির প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন। মানুষ কি করতে পারে বলে অনুভব করে তার উপরে নয়, মানুষ ঠিক কি করতে পারে, তার উপরেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিলেন। উপযোগিতার পরিমাণগত ধারণা, সাধারণভাবে বলা যায়, কোন মতেই মুক্তির ধারণার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ পারে না।

যথার্থ এলাকা

উৎপাদিকা শক্তিগুলির মধ্য দিয়ে অভাব জয় করাকে মার্ক্স অর্থনৈতিক প্রগতির দিকে কেবলমাত্র প্রথম—কিন্তু প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ বলে দেখে ছিলেন 'তার পরে' 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে তিনি লিখেছেন, 'সুরু হয় একান্ত ভাবে নিজের জন্যেই মানবিক সম্ভাবনার বিকাশ, যা হলো মুক্তির প্রকৃত এলাকা, যদিও তার সমৃদ্ধি ঘটতে পারে কেবল অভাব পূরণের ভিত্তির উপরে'। শ্রম দিবস হ্রস্বতর করার জন্যে মার্ক্সের সুবিদিত আগ্রহ যাকে তিনি প্রগতির 'মৌল পূর্বশর্ত' বলে গণ্য করতেন, মানুষকে আরো বেশি স্বাধীনতা দেওয়ার উপরে গুরুত্ব আরোপ করার সঙ্গে তার গভীর সম্পর্ক ছিল।

এমন কি শ্রেণীহীন সমাজের লক্ষ্য মাত্রাকে মার্ক্স যুক্ত করে ছিলেন সেই সমাজের সঙ্গে যেখানে 'ব্যক্তি মানুষ ব্যক্তি হিসেবেই অংশ গ্রহণ করবে'। তাঁর বক্তব্য হলো 'ব্যক্তি মানুষের এই জোট (আধুনিক উৎপাদিকা শক্তি সমূহের উন্নততর স্তরের ধারণা যার ভিত্তি) তাদের নিজস্ব নিয়ন্ত্রণে ব্যক্তির অবাধ সক্রিয়তা ও বিকাশের পরিস্থিতি গড়ে তুলতে পারে' (জার্মাণ ইডিওলজি' এঙ্গেলসের সঙ্গে যৌথ ভাবে রচিত গ্রন্থে)। অবশ্যই এটা তরুণ মার্ক্সের রচনা, কিন্তু 'দি ক্রিটিক্ অব্ দি গোথা প্রোগ্রাম' (১৮৭৫) গ্রন্থেও দেখা যায় প্রবীণ মার্ক্স 'শ্রম বিভাজনের কাছে ব্যক্তির দাসত্বমূলক অধীনতাকে' শেষ

পর্যন্ত পরাভূত করে শ্রমকে 'কেবল মাত্র জীবন যাপনের উপায় না করে, জীবনের মৌল প্রয়োজনে' রূপান্তরিত করার জন্যে সমভাবে ভাবিত রয়েছেন।

স্পষ্টতই দেখা যায় যদি মুক্তিকে প্রধান লক্ষ্য বলে ধরা হয়, তাহলে উপযোগিতা কিম্বা সুখ আর প্রগতি বিচারের মাপকাঠি হতে পারে না, যেহেতু তারা—সাধারণ ভাবে কোন সময়েই সমমাত্রিক নয়। এরই মধ্যে রয়ে গেছে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা একদিকে আধুনিক ওয়েলফেয়ার অর্থনীতির এবং অন্যদিকে পরিকল্পনা ও সরকারী নীতির প্রায় কেন্দ্রীয় প্রশ্ন। যেমন দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় বিশুদ্ধ মনস্তাত্ত্বিক ঘটনা হিসেবে 'গ্রামীণ জীবনের নির্বোধ সরলতা' হয়তো সুখের পরিপন্থী নয়, কিন্তু সেই সুখী মানুষটি জীবনে খুবই কম কাজ করার স্বাধীনতা ভোগ করে। মার্ক্সীয় স্বাধীনতা ধারণার প্রেক্ষিতে তাই একই ভাবে বলা যায়, ভারতের প্রাপ্তবয়স্ক জন সংখ্যার দুই তৃতীয়াংশের নিরক্ষরতা স্বাধীনতার অস্বীকৃতি বলেই সরাসরি পরিত্যাজ্য, সেটা মানুষকে অসুখী করেছে কিনা সেই প্রসঙ্গ অনেক দূরবর্তী এবং অনেক গৌণ প্রশ্ন।

আধুনিক অর্থনীতিতে মার্ক্সের প্রভাব এখনই খুব জোরালো, এবং মার্ক্সের আরো অনেক ধারণা আছে যা অর্থনীতিতত্ত্বে ব্যাপকতর ভিত্তিতে বিকশিত ও ব্যবহৃত হওয়ার যোগ্য। আপেক্ষিক ভাবে উপেক্ষিত আরো অনেক যেসব বিষয়গুলি রয়েছে সেগুলি বুনিয়াদি এবং মৌল ধরণের বলেই একাজ অনেক আকর্ষক এবং গুরুত্বপূর্ণ। মৃত্যুর একশ বছর পরেও মার্ক্সের মধ্যে সজীবতা রয়েছে প্রচুর।

ভাষান্তর : বাসব সরকার

অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী

কমল সমাজদার

।। এক ।।

স্বনামধন্য মার্কসবাদী পণ্ডিত ও প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামীর কথা আমরা ভুলে যেতে বসেছি। দর্শনের কৃতি ছাত্র ও পরে দর্শনের জনপ্রিয় অধ্যাপক, ক্ষুরধার বক্তা, মননশীল প্রবন্ধকার অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত মার্কসবাদকে ভারতের পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে প্রয়োগ করতে নিরন্তর চেষ্টা করে গেছেন। এর ফলে তিরিশ ও চল্লিশের দশকে, কেবলমাত্র বঙ্গ দেশে নয়, ভারতের বিভিন্ন স্থানের মানুষের কাছেও অধ্যাপক গোস্বামী অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও ভালবাসা পেয়েছিলেন। বহুগুণের অধিকারী এই স্বল্পায়ু বিস্মৃত প্রায় পণ্ডিত সম্বন্ধে কিছু কথা বলাই আমাদের এই লেখার উদ্দেশ্য।

১৯০৯ সালে বাংলার ফরিদপুর জেলার এক পরম বৈষ্ণব বংশোদ্ভব পরিবারে সুরেন্দ্রনাথ জন্ম গ্রহণ করেন। এই জেলার রাজেন্দ্র কলেজের ছাত্র ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ। এই কলেজ থেকে দর্শনে অনার্সে প্রথম শ্রেণী পান সুরেন্দ্রনাথ। সুরেন্দ্রনাথের এই নজর কাড়া সাফল্য সে সময়ে বিশেষ আলোড়ন তুলেছিল।

দর্শনে এম. এ. পড়ার জন্য তিনি কলকাতায় এসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। দর্শনের কৃতবিদ্য ছাত্র সুরেন্দ্রনাথ এই সময়ে গভীর অনুসন্ধিৎসার সঙ্গে মনুসংহিতা পাঠ শুরু করেন। মানব সমাজের সকল সমস্যার সমাধান এই গ্রন্থের মধ্যেই পাওয়া যাবে, এই ধারণায় তখন তিনি ছিলেন অবিচল। অবশ্য এই ধারণা গড়ে ওঠার পেছনে তাঁর পারিবারিক পরিবেশ এবং জাতীয়তাবাদী দেশ প্রেমিক আন্দোলনও কিছুটা প্রভাব বিস্তার করেছিল একথা স্বীকার করা দরকার।

কিন্তু অপূর্ব স্বশক্তির বলে, সুরেন্দ্রনাথ মনু সংহিতার প্রভাব কাটিয়ে ওঠেন এবং ধীরে ধীরে মার্কসবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন। মনু থেকে মার্কসবাদের উত্তরণ একদিকে যেমন সুরেন্দ্রনাথের জীবনে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা, তেমনি এর ফলে আমরাও পেলাম এক মার্কসবাদী পণ্ডিতকে, প্রগতি লেখক আন্দোলনের এক পুরোহিতকে, বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় এক প্রতিভাময়

লেখককে, কমিউনিস্ট কর্মকাণ্ডের এক সুদক্ষ সংগঠককে।

সুরেন্দ্রনাথ যে সময়ে মার্কসবাদ অনুশীলন করতে শুরু করেন, সে কালে মার্কসবাদ সম্বন্ধে কোন গ্রন্থ সংগ্রহ করা কঠিন ব্যাপার ছিল। ইংরেজ সরকারের কঠিন নিষেধের বেড়াজাল এড়িয়ে যে সব বই এদেশে এসে পৌঁছতো তা-ই বিভিন্ন সূত্র থেকে সংগ্রহ করে অধ্যয়নের রেওয়াজ ছিল। সুরেন্দ্রনাথের মার্কসবাদের চর্চা প্রসঙ্গে, এসব কথা মনে রাখা দরকার।

॥ দুই ॥

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনে এম. এ পাশ করার পর সুরেন্দ্রনাথের অধ্যাপনা জীবন শুরু হয়। বঙ্গবাসী কলেজ, চট্টগ্রাম কলেজ, বেথুন কলেজ ও সংস্কৃত কলেজে তিনি অধ্যাপনা কাজে বিভিন্ন সময়ে রত ছিলেন। মনস্বী অধ্যাপক ডঃ জগদীশ ভট্টাচার্য্যের কাছে শুনেছি, আচার্য্য গিরিশ চন্দ্র বসু বঙ্গবাসী কলেজে বিভিন্ন বিষয়ে অধ্যাপনার জন্য সে সময়ের কয়েকটি রত্নকে তাঁর কলেজে এনেছিলেন। এই সব সেরা রত্নদের অন্যতম ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপনায় সুরেন্দ্রনাথ বিশেষ সুনাম অর্জন করেন। আপাদ মস্তক বাঙালী অধ্যাপক গোস্বামী যথেষ্ট প্রস্তুতি নিয়েই ছাত্র ছাত্রীদের সামনে উপস্থিত হতেন এবং তাঁর আলোচনায় সাহিত্য বিজ্ঞান কাব্য ও দর্শন পরস্পর হাত ধরাধরি করে চলতো। কলেজে অধ্যাপনাকালে যেমন বিভিন্ন কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা তাঁর ক্লাসে ভীড় করতেন, তেমনি বিশ্ববিদ্যালয়েও তাঁর অনবদ্য বিশ্লেষণ, বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে তাঁর স্বচ্ছন্দ পদচারণা অনেকের কাছেই ছিল বিস্ময়ের বস্তু। গভীর দুঃখের বিষয় যে, অসময়ে মৃত্যু এসে আমাদের ভেতর থেকে এই প্রতিভাধরকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়। ১৯৪৪ সালে (মতান্তরে ১৯৪৫-এর ৩০ মার্চ) দুরন্ত বসন্ত (কলেরা) রোগে বঙ্গবাসী কলেজ হোস্টেলে অধ্যাপক গোস্বামীর জীবনাবসান হয়। দেশ হারায় এক আত্মনিবেদিত প্রাণ অধ্যাপক ও সুদক্ষ সংগঠককে।

॥ তিন ॥

প্রগতি লেখক আন্দোলনের একেবারে সূচনা পর্ব থেকেই অধ্যাপক গোস্বামী এই আন্দোলনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন।

১৯৩৫ সালে প্যারিসে লেখক শিল্পীদের বিশ্ব মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। রলাঁ্যা ও বারবুস এই সম্মেলনের সংগঠনে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলেন। ডঃ মুল্‌ক্‌রাজ আনন্দ এই সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন।

১৯৩৬ সালে লক্ষ্ণৌ শহরে কংগ্রেসের সর্ব ভারতীয় অধিবেশন বসে। এই অধিবেশন চলার সময়ে অনেক আলাপ আলোচনার পরে এক স্থিরীকৃত ইশ্‌তেহার-এর ভিত্তিতে লক্ষ্ণৌতে প্রগতি লেখক সংঘের প্রথম সর্বভারতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।

এই অধিবেশনে প্রখ্যাত হিন্দী ও উর্দু সাহিত্যিক প্রেম চন্দ্‌ সভাপতিত্ব করেন। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু ও মৌলানা হসরত মোহানী অধিবেশনে বক্তৃতা দেন। ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে বেশ কয়েকজন স্বনামধন্য লেখক এই অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন। এদের মধ্যে ছিলেন যশ্‌পাল, সুমিত্রানন্দন পন্থ, রসীদা জহান, ফয়েজ আহ্‌মদ ফয়েজ, সাজ্জাদ জহীর, আম্বুরি রামকৃষ্ণ রাও, অধ্যাপক হীরেন মুখার্জী প্রমুখ।

অধ্যাপক সুরেন গোস্বামীর যাওয়ার কথা থাকলেও ব্যক্তিগত অসুবিধার জন্য তিনি লক্ষ্ণৌ যেতে পারেন নি। অধ্যাপক গোস্বামীর প্রেরিত প্রবন্ধটি সম্মেলনে পাঠ করেন অধ্যাপক হীরেন মুখার্জী। অধ্যাপক মুখার্জী লিখেছেন, "বেশ মনে আছে 'ধন্য ধন্য' রব উঠেছিল। সুরেন বাবুর সেই অমূল্য প্রবন্ধটি ১৯৩৯ সালে প্রগতি লেখক সংঘের ক্ষণস্থায়ী পত্রিকা 'নিউ ইণ্ডিয়ান লিটরেচর'-এ প্রকাশ হয়েছিল।" [১]

১৯৩৬ সালের ১৮ জুন বিশ্ব বরেণ্য সাহিত্যিক গর্কির জীবনাবসান হয়। গর্কির মৃত্যুতে অ্যালবার্ট হলে এক শোকসভার আয়োজন করা হয়। এই সভার আহ্বায়কদের ভেতরে ছিলেন আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, কাজী নজরুল ইসলাম, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, ডঃ ধীরেন্দ্রনাথ সেন, খগেন্দ্রনাথ সেন, অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী ও অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। এই সভায় প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও আইনজ্ঞ ডঃ নরেশ চন্দ্র সেনগুপ্তের সভাপতিত্ব করার কথা থাকলেও, তিনি উপস্থিত হতে না পারায় প্রখ্যাত সাংবাদিক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার সভাপতিত্ব করেন। আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে গর্কির এই শোকসভা থেকেই বাংলা প্রগতি লেখক সংঘ গঠন করা হয়। সংঘের সভাপতি পদে ডঃ নরেশ চন্দ্র সেনগুপ্ত ও অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামীকে সম্পাদকের পদে নির্বাচিত

করা হয়।

১৯৩৬ সালেই আর একটি মর্মন্তুদ ব্যাপার ঘটে। স্পেনে প্রতিষ্ঠিত রিপাবলিকান সরকারকে উচ্ছেদ করার জন্য ফ্যাশিস্ত ফ্র্যাংকো সর্বাত্মক সামরিক অভিযান শুরু করে দেন। এই ফ্যাশিস্ত আক্রমণকে প্রতিহত করে রিপাবলিকান সরকারকে রক্ষার জন্য রঁল্যা সারা বিশ্বের কাছে এক উদাত্ত আহবান জানান। তাঁর এই আবেদনে ভারতের শিল্প সংস্কৃতি, মহলে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি হয়। 'লীগ এগেন্টস্ট ফ্যাশিজম এন্ড ওয়্যার'-এর সারা ভারত কমিটি গঠনের প্রচেষ্টা শুরু হয়।

শ্রী ধনঞ্জয় দাশ লিখেছেন, "রবীন্দ্রনাথ তখন কলকাতায়। বঙ্গীয় প্রগতি লেখক সংঘের সম্পাদক অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখেরা এই কমিটির প্রেসিডেন্ট পদ গ্রহণের অনুরোধ নিয়ে কবির কাছে উপস্থিত হলে তিনি সেই প্রস্তাবকে সানন্দে সম্মতি প্রদান করেন। স্পেনে অনুষ্ঠিত অমানুবিক ফ্যাশিস্ত বর্বরতায় রবীন্দ্রনাথের মন তখন ক্ষুব্ধ-বিচলিত। তিনি ফ্যাশিস্ত বর্বরতার তীব্র নিন্দা ও ভর্ৎসনা করে স্পেনের গণতান্ত্রিক সরকারের সাহায্যের জন্য এই সময় তাঁর স্বদেশবাসীর উদ্দেশে এক আহবান জানান। সর্বভারতীয় এই কমিটিতে রবীন্দ্রনাথ হলেন সভাপতি, কার্যকরী সভাপতি (চেয়ারম্যান) ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হলেন যথাক্রমে কে. টি. শাহ ও সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। কমিটি সদস্য: আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় সরোজিনী নাইডু, বম্বে ক্রনিকল-এর সম্পাদক আর এস ব্রেলভি, মাদ্রাজের ডেলি এক্সপ্রেস-এর সম্পাদক কে শান্তনম, আর এস রুইকর, তুষারকান্তি ঘোষ, ডঃ ধীরেন্দ্রনাথ সেন, অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, সাজ্জাদ জহীর, ইন্দুলাল যাজ্ঞিক, স্বামী সহজানন্দ, এন. জি. রঙ্গ, এস. এ. ডাঙ্গে, পি ওয়াই দেশপান্ডে, ডাঃ সুমন্ত মেটা, মিঞা ইফাতিকারউদ্দীন, কমলা দেবী, জয় প্রকাশ নারায়ণ, দেবেন সেন, নবকৃষ্ণ চৌধুরী, ডাঃ সুরেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।"[৭]

১৯৩৬ সালের শেষের দিকে প্রগতি লেখক সংঘ-এর দ্বারা 'Towards Progressive Literature' নামে একটি সংকলন প্রকাশিত হয়। এই সংকলনে লিখেছিলেন, অধ্যাপক ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সুধীন্দ্র নাথ দত্ত, সাজ্জাদ জহীর, মামুদজ্জাফর, অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

১৯৩৭ সালের সেপ্টেম্বর / অক্টোবর মাসে অধ্যাপক হীরেন মুখার্জী ও অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামীর সম্পাদনায় 'প্রগতি' সংকলন প্রকাশিত হয়। স্বনামধন্য সাহিত্যিক আইনবিদ ড. নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এই সংকলনের মুখবন্ধ রচনা করেছিলেন।

অধ্যাপক গোস্বামী মাঝে মাঝে শান্তিনিকেতনে যেতেন। এই সূত্রে কবির সঙ্গে তাঁর নিয়মিত যোগাযোগ ঘটেছিল। 'প্রগতি'কে রবীন্দ্রনাথ যে আশীর্বাণী জানিয়ে ছিলেন, অধ্যাপক গোস্বামী সানন্দে তা নিয়ে এসেছিলেন।

প্রগতি সংকলনে লেখা দিয়েছিলেন ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, সজনীকান্ত দাস, অধ্যাপক ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বিভূতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রবোধ কুমার সান্যাল, বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, বিধায়ক ভট্টাচার্য, সমর সেন, ও অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী। কার্ল মার্কস, আঁদ্রে জিদ, ই. এম. ফস্টার, টি. এস. এলিয়ট, সোভিয়েত ইউনিয়নের কবি আলেকজান্দার ব্লক, গোলাম গফুর ও কারা বিয়েস্কের লেখার অনুবাদ সংকলনে থাকে। অনুবাদকেরা হলেন আবু সয়ীদ আইয়ুব, অধ্যাপক নীরেন্দ্রনাথ রায়, সৌম্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর, আবদুল কাদির, অধ্যাপক বিষ্ণু দে, অরুণ মিত্র, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, পবিত্র মুখোপাধ্যায়। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা দেরীতে আসায় ছাপানো যায় নি।

এই সংকলনে অধ্যাপক গোস্বামীর 'সাহিত্যে বাস্তব ও কল্পনা' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। অধ্যাপক গোস্বামী লেখেন…'সমাজের পরিবর্তনশীল ঐতিহাসিক জীবনের ধারা অতীন্দ্রিয় অদৃষ্ট শক্তির লীলাক্ষেত্র নয়; ধনোৎপাদন ও ধনবন্টনের পদ্ধতি ঐতিহাসিক ধারার নিয়ামক রূপে সর্বদাই বর্তমান থাকে। সুতরাং সমাজের মানুষের সুখ-দুঃখ ও আশা-আকাঙ্ক্ষা যে বিশিষ্ট ঐতিহাসিক পরিস্থিতির রূপায়িত সমস্যা, তার সমাধানের জন্য কল্পনার অঙ্গুলি নির্দেশ ঐতিহাসিক অগ্রগতির সূর্য সংকেত রূপে গ্রহণ করা যায়। কারণ বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির সঙ্গে সাহিত্যিক কল্পনার শুভদৃষ্টি ঐতিহাসিক ভবিষ্যতের গতিপথের দিকে বদ্ধ লক্ষ্য না হয়ে পারে না। ঐতিহাসিক পরিবর্তনের পরিণত ফল বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি ও সাহিত্যিক কল্পনা উভয়েরই কাম্য।'[৩]

অধ্যাপক গোস্বামীর মনোধর্মের সাক্ষাৎ আমরা উদ্ধৃত অংশটিতে বিশেষ করে পাই।

১৯৩৮ সালের ডিসেম্বরে কলকাতায় আশুতোষ কলেজের আশুতোষ মেমোরিয়াল হলে নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘের দ্বিতীয় সর্বভারতীয় সম্মেলন হয়। রবীন্দ্রনাথের ভাষণ পাঠের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের উদ্বোধন হয়। ডঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তকে সভাপতি করে একটি অভ্যর্থনা সমিতি গঠন করা হয়েছিল। দু'দিন ব্যাপী এই সম্মেলনের সভাপতিমণ্ডলীতে ছিলেন ড. মুল্‌ক্ রাজ আনন্দ, সুধীন্দ্র নাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, পণ্ডিত সুদর্শন ও শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। আলোচনায় অংশ নেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, হিরণ কুমার সান্যাল, আহ্‌মদ আলী, বলরাজ সাহনী, আবদুল আলীম, সাজ্জাদ জহীর, আলী সর্দার জাফরী, প্রবোধকুমার সান্যাল। প্রমথ চৌধুরী, অধ্যাপক শাহেদ্ সুরাবর্দী, অধ্যাপক নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত প্রমুখ বিদগ্ধজন সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

এই সম্মেলনের সাফল্যের পেছনে অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথের অক্লান্ত পরিশ্রম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রয়াত সাংবাদিক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ও বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় সম্মেলনকে প্রচার মহলের কাছে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন।

প্রগতি লেখক সংঘের শাখা স্থাপনের ব্যাপারেও অধ্যাপক গোস্বামী বিশেষ ভাবে উদ্যোগী হয়ে উঠেছিলেন। ১৯৩৭ সালে তিনি প্রগতি লেখক সংঘের বিস্তারের জন্য ঢাকা যান। অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও সাজ্জাদ জহীরও অধ্যাপক গোস্বামীর সঙ্গে ঢাকায় গিয়েছিলেন। সে সময়ের তরুণ লেখক রণেশ দাশগুপ্ত ও অন্যান্য লেখক বৃন্দের সাহচর্যে ঢাকায় প্রগতি লেখক সংঘের কেন্দ্র গড়ে ওঠে।

অত্যন্ত ব্যস্ততার ভেতরে দিন কাটলেও অধ্যাপক গোস্বামী নিজ জন্মভূমি ফরিদপুর জেলাকে ভুলতে পারেন নি। বাংলার বিভিন্ন জেলায় প্রগতি লেখক সংঘের কেন্দ্র গঠন করার সঙ্গে সঙ্গে ফরিদপুরেও অধ্যাপক গোস্বামী প্রগতি লেখক সংঘের একটি কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন।

॥ চার ॥

১৯৪১-এর ২২শে জুন হিটলারের বাহিনী অভূতপূর্ব অস্ত্র সমাবেশ করে

অতর্কিতে সোভিয়েট ইউনিয়ন আক্রমণ করে।

সোভিয়েটের উপর দানবীয় ফ্যাশিস্ট আক্রমণের সংবাদ একদিকে যেমন সারা জগৎকে স্তম্ভিত করে তুলেছিল, তেমনি বাংলা-তেও তীব্র আলোড়ন তুলেছিল। স্নেহাংশু আচার্য্য, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, জ্যোতি বসু প্রমুখ সোভিয়েট-সুহৃৎ সমিতি (Friends of the Soviet Union) গঠন করার ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগী হন। ড. ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত সমিতির সভাপতি এবং অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও স্নেহাংশু কান্ত আচার্য্য—সমিতির সম্পাদকের দায়িত্বভার নিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণীর জন্য সমিতির পক্ষ থেকে অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী শান্তিনিকেতন যান। এই সম্পর্কে আলোকপাত করে অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, "কবি রাজী হলেন সোভিয়েট সুহৃৎ সমিতির পৃষ্ঠপোষক হতে, তবে সাবধান করে দিয়ে বললেন যে, ইংরেজ নিজের স্বার্থে সোভিয়েটকে সাহায্য করবে বলছে বটে, কিন্তু 'বিশ্বাস করো না ওদের ; তোমরা কম্যুনিস্টরা ওদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে গা-ভিজা দিয়ো না।' কম্যুনিষ্ট পার্টিরও চিন্তা তখন ঐরূপই ছিল—তাই সুরেনবাবু দেখালেন রবীন্দ্রনাথকে পার্টির সদ্য গৃহীত প্রস্তাব, কবি পুলকিত হলেন।"[8]

কেবলমাত্র কলিকাতা বা তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলেই নয়, বাংলার সেই কর্মমুখর দিনগুলিতে যখন যেখান থেকে ডাক এসেছে, সেই ডাকে সাড়া না দিয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকতে পারেন নি অধ্যাপক গোস্বামী। সুদূর ঢাকায় অনুষ্ঠিত একটি সভার বিবরণ দিয়ে প্রখ্যাত সাহিত্যিক রণেশ দাশগুপ্ত লিখেছেন, "ঢাকায় ১৯৪২ সালের জানুয়ারীতে স্থাপিত হয় সোভিয়েট সুহৃৎ সমিতি। ঢাকায় সোভিয়েট ইউনিয়নের পক্ষে একটি চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

এর পরই ঢাকায় ৮ মার্চ একটি ফ্যাসিবাদ বিরোধী সম্মেলন ডাকা হয় সুতাকল শ্রমিকদের সহায়তায়। এ সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন প্রখ্যাত কমিউনিষ্ট শ্রমিক নেতা শামসুল হুদা, অধ্যাপক সুরেন গোস্বামী, জ্যোতি বসু, বঙ্কিম মুখার্জী, স্নেহাংশু আচার্য, প্রমুখ বিশিষ্ট নেতা ও বুদ্ধিজীবীরা। সম্মেলনের সূচনাতেই ফ্যাসিবাদের একদল উন্মত্ত সমর্থক এবং কিছু সংখ্যক বিভ্রান্ত যুবা সম্মেলন পণ্ড করতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। তারা তখন সম্মেলনের দিকে আগতদের উপর আক্রমণ চালাতে শুরু করে। এই

সময়ে সোমেন চন্দ লাল পতাকা হাতে রেল শ্রমিকদের একটি মিছিল নিয়ে সম্মেলন মণ্ডপের দিকে আসছিলেন। সম্মেলনের উপর আক্রমণের পরিচালকেরা এই মিছিলটির উপর অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং সোমেন চন্দকে পৈশাচিকভাবে হত্যা করে।"[৫]

॥ পাঁচ ॥

দর্শনের কৃতবিদ্য অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী এদেশে মার্কসবাদ প্রচারে এক অনন্য ভূমিকা নিয়েছিলেন। তিরিশের দশকে বা চল্লিশের দশকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত অধ্যাপক গোস্বামী এই অসাধারণ কাজে ব্রতী ছিলেন। ছাত্র, মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজের কাছে অধ্যাপক গোস্বামীর বক্তৃতা ছিল বিশেষ আকর্ষণের বিষয়।

প্রয়াত কমরেড চিন্মোহন সেহানবীশ এ বিষয়ে লিখেছেন, "শুধু বই বা পুস্তিকা লিখেই নয়, ক্লাস নিয়ে বা বক্তৃতা মারফৎ যাঁরা বিভিন্ন সময়ে মার্কসের শিক্ষাকে জনসাধারণের কাছে পৌঁছবার চেষ্টা করেছিলেন, তার মধ্যে রাধারমণ মিত্র (দর্শন ও ইতিহাস) সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী (দর্শন) অমরেন্দ্র প্রসাদ মিত্র (অর্থনীতি ও রাজনীতি) প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।"[৬]

ইয়ুথস্ কালচারাল ইনষ্টিটিউট এক সময়ে আমাদের সাংস্কৃতিক আন্দোলনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ছাত্ররা এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন ; পরবর্তীকালে এই সংগঠনের অনেকেই বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষ সুনাম পেয়েছিলেন। এই সংগঠনের সঙ্গে অধ্যাপক গোস্বামীর জড়িত থাকার কথা উল্লেখ করেছেন প্রয়াত কমরেড চিন্মোহন সেহানবীশ, "ইয়ুথস্ কালচারাল ইনষ্টিটিউট বা y.c.I-এর একটি কাজ ছিল পণ্ডিতদের দিয়ে নানা বিষয়ে বক্তৃতার ব্যবস্থা করা। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী।"[৭]

কলকাতার ঐতিহ্যমণ্ডিত অ্যালবার্ট হলে (বর্তমানের কফি হাউস) এক সময়ে সঙ্গীত, সাহিত্য, সমাজ, দর্শন, ধর্ম বিষয়ক আলোচনার প্রাণকেন্দ্র ছিল। বাঙালী শিক্ষিত সমাজ এখানে মনস্বী ব্যক্তিদের বক্তৃতা শোনার জন্য ভীড় করতেন। এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে এখানে বক্তাদের ভেতরে ছিলেন, ভগিনী নিবেদিতা, ব্রহ্ম বান্ধব উপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিপিন চন্দ্র পাল,

পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য, অ্যানি বেসান্ত প্রমুখ গুণী জন। পরবর্তী কালে ভারতের রাজনৈতিক ঘটনাবলীর বিশ্লেষণের অন্যতম কেন্দ্রস্থল হিসেবে পরিগণিত হয় অ্যালবার্ট হল। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন ভারতীয় বংশোদ্ভব ব্রিটিশ কমিউনিষ্ট নেতা সাপুরজী সাকলাতওয়ালা, সরোজিনী নাইডু, ডঃ রামমনোহর লোহিয়া, অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, অধ্যাপক হীরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, মৃণালকান্তি বসু প্রমুখ।

॥ ছয় ॥

কয়েক বছর আগে, 'সংবাদ প্রতিদিন' সংবাদপত্রে প্রখ্যাত সাংবাদিক শ্রী শংকর ঘোষ একটি গ্রন্থ সমালোচনা করতে গিয়ে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সম্বন্ধে অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথের নিজস্ব চিন্তার কিছু পরিচয় দিয়েছেন। শ্রী শংকর ঘোষ লিখেছেন, "রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ নিয়েই একদিন সুরেন গোস্বামীর সঙ্গে কথা হয়েছিল। অল্প বয়স সুলভ ঔদ্ধত্যের সঙ্গে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আপনার তো ধর্মে বিশ্বাস নেই, আপনি রামকৃষ্ণ পরমহংসের বিষয়টি কি ভাবে ব্যাখ্যা করেন। সুরেন গোস্বামী তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়েছিলেন, "রামকৃষ্ণ হিস্টিরিয়ার রোগী ছিলেন, হিস্টিরিয়ার ফিট্ হত, লোক বলত সমাধি। বিবেকানন্দর তবু সমাজ সেবা, সমাজ সংস্কারের কর্মসূচি ছিল, সে গুলি সমর্থন করা যায়। রামকৃষ্ণর সে সব কিছুই ছিল না।"[৮]

মার্কসবাদী পণ্ডিত অধ্যাপক গোস্বামীর উক্তিটি উধৃত করার জন্য শংকর ঘোষকে সাধুবাদ জানাই। তাঁর বহু উক্তিই চিরকালের জন্য হারিয়ে গেছে। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সম্বন্ধে অধ্যাপক গোস্বামীর কোন পূর্ণাঙ্গ আলোচনার সাক্ষাৎ পাওয়া গেলে, অধ্যাপক গোস্বামীর আর একটি মূল্যবান পরিচয় আমরা পেতাম।

॥ সাত ॥

পরিচয় এর সঙ্গে অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। পরিচয়-এর আড্ডায় অধ্যাপক গোস্বামী যোগ দিতেন এবং বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনায় অংশ নিতেন। 'পরিচয়'-এ তাঁর বহু প্রবন্ধ, কবিতা-ও প্রকাশিত হয়েছে।

'পরিচয়'-এ অধ্যাপক গোস্বামী বহু গ্রন্থের সমালোচনা করেছেন। আমরা তার মধ্যে কয়েকটির কথা উল্লেখ করছি।

১৩৪২ বঙ্গাব্দের পরিচয়-এর বৈশাখ সংখ্যায় অধ্যাপক গোস্বামী A. N Whitehead-এর Nature and life গ্রন্থের সমালোচনা করেন।

১৩৪৩ বঙ্গাব্দের পরিচয়-এর পৌষ সংখ্যায় অধ্যাপক গোস্বামী Sidney Hook-এর From Hegel to MARX ও T. A. Jackson-এর 'Dialectics' গ্রন্থের বিস্তৃত সমালোচনা করেন।

টি. এ. জ্যাক্‌সনের 'ডায়ালেকটিক্‌স্' গ্রন্থটির অধ্যাপক গোস্বামী কৃত সমালোচনার কিছু অংশ আমরা উদ্ধৃত করছি, "বহু তত্ত্ব ও তথ্যের সমন্বয়ের গুরুত্বে সমৃদ্ধ টি. এ. জ্যাকসনের ডায়ালেকটিক্‌স্ পুস্তকখানিতে বিষয় বস্তুর সামান্য অবতারণার পরই মার্কসের 'ফয়েরবাখ বিষয়ক প্রস্তাব' সম্বন্ধে বিশদ এবং সুদীর্ঘ আলোচনা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। নৃত্যে, সঙ্গীতে, চিত্রে, সাহিত্যে ও জীবনে আজ অস্তোন্মুখ সংস্কৃতির রঙীন ভাবালুতার মোহ সমাজের চেতনাকে দিবাস্বপ্নের মায়াজালে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, একমাত্র বস্তুবাদের রূঢ় আঘাতই তার স্বপ্নের পানপাত্রকে চূর্ণ করে জাগ্রত পৃথিবীর নিরাবরণ সত্যের সঙ্গে নূতন করে পরিচয় করে দিতে পারবে। শুভস্য শীঘ্রম্।"[৯]

'পরিচয় ছাড়াও অন্যান্য পত্র-পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ। ১৯৩৯ সালে জানুয়ারী মাসে 'অগ্রণী' প্রকাশিত হয়। অগ্রণীর লেখকমণ্ডলীর মধ্যে অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথও ছিলেন।

অধ্যাপক গোস্বামীর কাছে যাঁরাই লেখা চাইতেন তাদের বিমুখ করতেন না অধ্যাপক গোস্বামী। এর ফলে নানা জায়গায় অধ্যাপক গোস্বামীর লেখা প্রকাশিত হয়েছিল। সি পি আই (এম) নেতা জয়কেশ মুখার্জী লিখেছেন, "নও জোয়ান' নভেম্বর সংখ্যার জন্য লিখি এবং তা প্রকাশিত হতে দেরী হয়। এতে অধ্যাপক সুরেন গোস্বামীর লেখা 'প্রগতি সাহিত্যের প্রস্তাবলী' নামে একটা প্রবন্ধ ছিল।"[১০]

তাঁর কয়েকটি কবিতা 'পরিচয়'-এ প্রকাশিত হয়েছিল। উল্লেখ করা চলে যে, চল্লিশের দশকের গোড়ার দিকে অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও আবু সয়ীদ আইয়ুব-এর সম্পাদনায় আধুনিক বাংলা কবিতার একটি সংকলন প্রকাশিত হয়। এই সংকলনে অধ্যাপক গোস্বামীর কবিতা স্থান পেয়েছিল।

॥ আট ॥

অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী কেবলমাত্র অধ্যাপনা অথবা সাহিত্য আন্দোলনের মধ্যে নিজেকে নিয়োজিত না রেখে কমিউনিষ্ট পার্টির বিচিত্র কর্ম প্রবাহের সঙ্গেও ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েছিলেন।

১৯৩৮ সালে কুমিল্লার নেত্রকোণায় সারা ভারত কিষাণ সভার সর্বভারতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে প্রখ্যাত সাংবাদিক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের সঙ্গে অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামীও উপস্থিত ছিলেন।

আন্দামান রাজবন্দী সহ বিভিন্ন কারায় আটক রাজবন্দীদের মুক্তি আন্দোলনে, ট্রেডইউনিয়ন আন্দোলনে ও বে-আইনী ঘোষিত কমিউনিষ্ট পার্টির বিভিন্ন কাজে অধ্যাপক গোস্বামী পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করেছিলেন। অধ্যাপক গোস্বামীর এই বহু ব্যাপ্ত কর্মধারার জন্য কেবলমাত্র তাঁর সমমতা-বলম্বীরাই নয়, যারা তার সঙ্গে একমত হতে পারতেন না, তাঁরাও অধ্যাপক গোস্বামীকে বিশেষভাবে স্নেহ করতেন। এদের ভেতরে প্রখ্যাত সাংবাদিক হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ ও বরেণ্য সাহিত্যিক সজনীকান্ত দাস-এর নাম উল্লেখযোগ্য।

॥ নয় ॥

১৯৪৪ সালে (মতান্তরে ৪৫ সালে) বঙ্গবাসী কলেজ হোস্টেলে থাকার সময়ে বসন্ত (কলেরা) রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রায় বিনা চিকিৎসায় অধ্যাপক গোস্বামীর আকস্মিক জীবনাবসান হয়।

অধ্যাপক গোস্বামীর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে গোপাল হালদার লেখেন, "অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামীর অকাল বিয়োগে আমরা ব্যক্তিগত ভাবে অনেকেই বিশেষ বেদনা অনুভব করেছি। সুরেন্দ্রনাথ আমাদের অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন। 'পরিচয়ের' এবং বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের পক্ষেও তার বিয়োগ অত্যন্ত ক্ষতিকর হল। তিনি বহুকাল থেকেই 'পরিচয়' গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন ; 'পরিচয়ে' তাঁর প্রবন্ধ, কবিতা, সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছে। তবু প্রগতি সাহিত্য সঙ্ঘের প্রথম সম্পাদক রূপেই বাঙালী শিক্ষিত সমাজ হয়ত সুরেন্দ্রনাথকে বিশেষ ভাবে জানতেন।"[১১]

পরম বন্ধু, সহযাত্রী অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথের অশেষ গুণের কথা উল্লেখ করেছেন অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 'তরী হতে তীর' গ্রন্থে। অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথের অকাল মৃত্যুর কথা স্মরণ করে অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়

লিখেছেন—"সমুজ্জ্বল একটা আলো নিভে গেল, কিন্তু প্রায় এমন নেপথ্যে যে ব্যক্তিজীবনের অকিঞ্চিৎকরতাই যেন মৃত্যু দিয়ে ঘোষণা করে গেলেন। ১৯৪৪ সালে এই দুর্ঘটনা, দিন তারিখ মনে পড়ছে না, ইন্দো সোভিয়েট জার্নালে এবং 'জনযুদ্ধ' সাপ্তাহিকে তাঁর সম্বন্ধে লিখেছিলাম তাও হাতের কাছে নেই ; মহৎ কীর্তির সম্ভাবনা লুপ্ত হল, বাস্তবিকই এক স্মরণীয় মনস্বী চলে গেলেন।"[১২]

কেবলমাত্র 'তরী হতে তীর' গ্রন্থেই নয়, অধ্যাপক মুখার্জীর একাধিক প্রবন্ধ ও বক্তৃতায় বার বার ফিরে এসেছে তাঁর এই প্রিয় সুহৃদের কথা। অধ্যাপক মুখার্জী তাঁর 'মার্কসবাদ ও মুক্তমতি' গ্রন্থটি উৎসর্গ করেছেন অধ্যাপক গোস্বামী ও আরও দুই বহুমান ভাজন কে। উৎসর্গ পত্রে অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ তাঁর অননুকরণীয় ব্যঞ্জনাধর্মী ভাষায় লিখেছেন, 'অধুনা বিস্মৃত প্রায় হলেও এ যুগের চিন্তা ও কর্মে যাঁদের অবদান মহামূল্য, বাংলার প্রগতি প্রয়াসে একদা যাঁরা ছিলেন প্রকৃত প্রাজ্ঞ পুরোধা, যাঁদের জীবন ও জনহিতে বিবিধ প্রযত্ন ছিল আত্মচিন্তার সংস্পর্শ মুক্ত ; সেই তিন চরিত্রের বাঙালী মনস্বী—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ও সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামীর স্মৃতির উদ্দেশে এই গ্রন্থ সমর্পিত হল।'[১৩]

॥ দশ ॥

প্রায় ৫৩/৫৪ বছর আগে অধ্যাপক গোস্বামীর অকালে জীবনাবসান হয়েছে। তাঁর স্মৃতিরক্ষার জন্য কারোর পক্ষ থেকে কোনরূপ চেষ্টা করা হয়নি। এ-কালের মানুষ অধ্যাপক গোস্বামীর অবদান সম্বন্ধে একেবারেই অবহিত নন।

মার্কসবাদী পণ্ডিত অধ্যাপক গোস্বামীর উপযুক্ত স্মৃতি রক্ষার ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগী হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। বিভিন্ন কলেজ ম্যাগাজিনে, অজস্র পত্র-পত্রিকায়, পরিচয়, অগ্রণী সহ কমিউনিষ্ট পার্টির বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ইংরেজী ও বাংলাতে বহু মননশীল প্রবন্ধ লিখেছিলেন অধ্যাপক গোস্বামী। এই সকল প্রবন্ধ সংগ্রহ করে তাঁর রচনাবলী প্রকাশ করা দরকার। তাঁর রচিত কবিতারও একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করা প্রয়োজন।

শিয়ালদহের হায়াৎ খাঁন লেনে, স্কট লেনে ও শ্যাম বাজারের পাঁচ মাথার

মোড়ের কাছে অধ্যাপক গোস্বামী বসবাস করেছিলেন। এরই কাছাকাছি কোন রাস্তার নাম অধ্যাপক গোস্বামীর নামে করা যায় কিনা কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের পুনর্নামাকরণ কমিটি তা ভেবে দেখতে পারেন।

অধ্যাপক গোস্বামীর স্মরণে প্রতি বছরে স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করা সম্ভব কিনা, এ বিষয়ে চিন্তা করার জন্য বাঙলা অ্যাকাডেমীকে অনুরোধ করি।

পরিশেষে পরিচয় বিনম্র শ্রদ্ধা জানাচ্ছে এই মনস্বী কে।

সূত্র নির্দেশ :

১। তরী হতে তীর, হীরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, পৃ. ৩০১,
২। মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক, ধনঞ্জয় দাশ, পৃ. ১৩
৩। তদেব, পৃ. ১৬
৪। তরী হতে তীর, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, পৃ. ৪১৭
৫। সোমেন চন্দের পরিচিতি ও পটভূমি, রণেশ দাশগুপ্ত, কালান্তর, ২৪ মার্চ, ১৯৯৬
৬। বাংলা ভাষায় কার্ল মার্কস, চিন্মোহন সেহানবীশ, পরিচয়, ৩৭ বর্ষ ১০-১২ সংখ্যা, ১৯৬৮
৭। ৪৬ নং-একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন প্রসঙ্গে, চিন্মোহন সেহানবীশ, পৃ. ২
৮। গ্রন্থ সমালোচনা, শংকর ঘোষ, সংবাদ প্রতিদিন, ৪ এপ্রিল, ১৯৯৪
৯। পরিচয়, পৌষ সংখ্যা, ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ
১০। কেউ ভোলে, কেউ ভোলে না, জয়কেশ মুখার্জী, গণশক্তি, ১ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬
১১। পরিচয়, গোপাল হালদার, ১৪ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ১৩৫২ বঙ্গাব্দ।
১২। তরী হতে তীর, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, পৃ. ৪৬৭
১৩। মার্কসবাদ ও মুক্তমতি, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, (উৎসর্গ পত্র).

শিক্ষা চিন্তায় রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র

অশোক মুস্তাফি

কলকাতায় শ্রীনিকেতন শিল্প বিপণি কেন্দ্রের উদ্বোধনী ভাষণে (৮ই ডিসেম্বর ১৯৩৮) সুভাষ চন্দ্র বলেন যে সম্ভবতঃ ১৯১৪ সালে তিনি একদল ছাত্রসহ শান্তিনিকেতনে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং ছাত্রদের করণীয় বিষয় সম্পর্কে কবির কাছে উপদেশ প্রার্থনা করেন। কবি তাঁদের পল্লী উন্নয়নের কাজে আত্মনিয়োগ করার উপদেশ দেন। সেদিন তাঁরা কবির এই উপদেশের সঠিক মর্ম গ্রহণ করতে পারেন নি একথা সুভাষচন্দ্র স্বয়ং পরে লিখেছেন (পৃঃ ১ 'রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র— (নেপাল মজুমদার)। প্রায় দু'বৎসর পরে (১৯১৬) ওটেন সাহেবের ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে প্রেসিডেন্সী কলেজের কর্তৃপক্ষ যখন সুভাষকে কলেজ থেকে বিতাড়িত করেন তখন রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়কে কেন্দ্র করে সমসাময়িক দেশব্যাপী উত্তেজনাকে উপলক্ষ্য করে 'ছাত্র শাসন তন্ত্র' প্রবন্ধটি রচনা করেন ('সবুজ পত্র' চৈত্র, ১৩২২)। মর্ডান রিভউ এপ্রিল ১৯২৬ প্রসঙ্গত কবি বাংলার তদানীন্তন লাটসাহেবকে এই প্রবন্ধটির একটি ইংরাজী তর্জমা করে পাঠান এবং ছাত্ররা যে ভয়ংকর অবমাননা এবং অপমানের ফলে এবম্বিধ আচরণ করতে বাধ্য হয়েছিল সেই কথাটি বিশেষ করে তাঁকে অবগত করেন। কবির আশা ছিল লাটসাহেব চ্যান্সেলার হিসাবে ছাত্রদের সম্পর্কে চূড়ান্ত কোন ব্যবস্থা গ্রহণের আগে বিবেচনা এবং সহৃদয়তার সঙ্গে তাদের কথাটা বিচার করবেন। একক-ভাবে সুভাষচন্দ্রকে উল্লেখ করে কিছু না বললেও যাতে 'ছাত্র বহিষ্কারের শাস্তি' কিছুটা লঘু হয় তার সুপারিশই তিনি করেছিলেন (পৃঃ ১২৮, স্বভাবত স্বতন্ত্র রবীন্দ্রনাথ। নিত্যপ্রিয় ঘোষ)। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অবশ্য সুভাষচন্দ্রকে ক্ষমা করতে পারেন নি এবং বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যক্ষ গিরীশ চন্দ্র বসু তাকে নিজের কলেজে ভর্তি করে নিতে চেয়েছিলেন এবং অবশেষে স্যার আশুতোষের আনুকূল্যে তিনি স্কটিশ চার্চ কলেজে ভর্তি হতে পেরেছিলেন।

'ভারতের মুক্তি সংগ্রাম' গ্রন্থে সুভাষচন্দ্র লিখেছেন যে অসহযোগ সম্পর্কে কবির সঙ্গে দেশে ফেরবার পথে জাহাজে আলোচনা করেছিলেন এবং তাঁর ধারণা হয়েছিল যে নীতিগত ভাবে কবি অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন না। তাঁর আরো ধারণা হয়েছিল যে আধুনিক বিজ্ঞান ও ভেষজ বিদ্যা সম্পর্কে মহাত্মার মতের অনুবর্তী হওয়ার কবির পক্ষে সম্ভব হয় নি।

কিন্তু 'সুভাষ চন্দ্রের এই ব্যাখ্যায় কিছুটা ত্রুটি ছিল—কেন না রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজীর অসহযোগ তত্ত্ব, বয়কট ও চরকা আন্দোলন সম্পর্কে যে নীতিগত ভাবে বিরোধী ছিলেন তা 'ভারতের মুক্তি সংগ্রাম' গ্রন্থের মধ্যেই স্বীকৃত হয়েছে। অসহযোগ আন্দোলনের ত্রি-বর্জন নীতি যে কবির স্বীকৃতি লাভ করে নি তা তিনি নিজেই বলেছেন ঐ গ্রন্থে—"পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি ও সভ্যতার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করাই অসহযোগ আন্দোলনের লক্ষ্য এমন একটা ধারণা হওয়ায় কবি "সংস্কৃতির ঐক্য" শিরোনামায় কলিকাতায় একটি তেজোদৃপ্ত ভাষণ দিলেন এবং পৃথিবীর অন্যান্য অংশের সংস্কৃতি ও সভ্যতা হইতে বিচ্ছিন্ন করার যে কোনো প্রচেষ্টাকে স্পষ্ট ভাষায় নিন্দা করিয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলি বর্জ্জনের বিরোধীতা করিলেন। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব' প্রবন্ধে এর জবাবে বলেন ভারতকে তাহার নিজস্ব সংস্কৃতি রক্ষা ও উহার বিকাশ সাধন করিতে হইবে আর তাহা করিতে গিয়া যদি ব্রিটিশ প্রভাবযুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সকল বর্জন করিতে হয়, তাহাতে আপত্তির কিছু নাই।" (পৃঃ ৬১, "ভারতের মুক্তি সংগ্রাম")। বলা বাহুল্য যে কলকাতায় ফিরেই সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধুর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয় ভাবে যোগ দেন এবং জাতীয় বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষপদে বৃত হন। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা বর্জন সংক্রান্ত মন্তব্যের বিরোধিতা করে আমেদাবাদ কংগ্রেসের সভাপতির ভাষণে চিত্তরঞ্জন বলিষ্ঠ বক্তব্য রাখেন। (নারায়ণ, ফাল্গুন, ১৩২৮) এবং বলেন যে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতাকে বরণ করার পূর্বে ভারতীয় শিক্ষা ও সভ্যতার আত্ম-স্বরূপ উপলব্ধি করতে হবে। কংগ্রেসের গঠন মূলক কর্মসূচীর অন্তর্গত জাতীয় শিক্ষার আদর্শকে সুভাষ চন্দ্র কিন্তু অন্তর থেকে গ্রহণ করেছিলেন আরো এই কারণে যে সদ্যজাগ্রত ছাত্র সম্প্রদায় থেকে দেশমুক্তি আন্দোলনের কর্মী সংগ্রহ করা সম্ভব এবং দেশের পরিস্থিতি নিরপেক্ষভাবে বিচার করলে তাঁর মতে এই সিদ্ধান্ত অনিবার্য যে, একমাত্র জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই ছাত্ররা অধিকতর সুস্থ পরিবেশে লেখাপড়া করতে পারবে। সুভাষ লিখেছেন মনোভাবে ও দৃষ্টি-ভঙ্গীতে ভারতীয় উদার পন্থীদের বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষীয়গণের সহিত খুবই মিল ছিল যাহারা কংগ্রেসের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলি বর্জনের নীতিতে ভীষণ অসুবিধায় পড়িয়া গিয়াছিলেন (পৃঃ ৬০, মুক্তি সংগ্রাম)। তাঁর নিশ্চিত ধারণা ছিল যে, যে সব ছাত্র অসহযোগের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে সরকারী বা সরকার নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে বেরিয়ে এসেছিল অথচ অধিকতর সুস্থ পরিবেশে যাদের পড়াশুনা চালিয়ে যাবার ইচ্ছা ছিল। তাদের পক্ষে এই নবস্থাপিত জাতীয় প্রতিষ্ঠান গুলিতে যোগ দেওয়া একমাত্র সমীচীন কাজ বলেই ধরে নিতে হবে। তিনি এও বলেন যে, সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে,

কারিগরী অথবা মানবিক সামাজিক বিদ্যা শিক্ষার জন্য বোম্বাই, আমেদাবাদ পুণা, নাগপুর, বারানসী ও পাটনা প্রভৃতি স্থানে এরূপ প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। তবে এদের সবগুলিতেই সুতোকাটা বাধ্যতামূলক ছিল। এই খানেই কবির নীতিগত আপত্তির একটি প্রশ্ন নিহিত আছে, যদিও তাঁর নিজস্ব শিক্ষাতত্ত্ব ও মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী তিনি অসহযোগকে কেন্দ্র করে প্রধানত রাজনৈতিক বুদ্ধি প্রণোদিত বিদ্যালয় বর্জনের নীতিকে মানতে পারেন নি। তাঁর সত্যের আহ্বান 'চরকা শিক্ষার মিলন' প্রভৃতি প্রবন্ধে তা সপ্রমাণ। তিনি দেশের জনগণের, বিশেষ করে গ্রামের দরিদ্র মানুষের স্বার্থের কথাই চিন্তা করেছিলেন। এবং বলেছিলেন যে, এদের পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের সুযোগ থেকে বঞ্চিত রাখা অন্যায়। বস্তুতঃ গান্ধীজী এই অসহযোগের সময় অথবা তারও পরে অনেক পরে বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনা উপস্থাপনের সময়ে মূলতঃ তাৎক্ষণিক ফলপ্রসূতি এবং অভিজ্ঞতাবাদের উপরেই বেশী নির্ভর করেছেন, শিক্ষার সমস্যাকে গান্ধীজী তত্ত্বগত দিক থেকে তেমন আলোচনা করেন নি যদিও তিনি 'টলস্টয় ফার্ম' সবরমতী ও সেবাগ্রামে, রবীন্দ্রনাথের মতই শিক্ষাদানের ব্যাপারে বাস্তব পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু 'জনগণ' শব্দটিকে পূর্ণ তাৎপর্যের সঙ্গে ব্যবহার করে এসেছেন তাঁর 'ন্যাশনাল ফান্ড" (১২৯০, কার্তিক, ভারতী) "জিহ্বা আস্ফালন" "হাতে কলমে," "টাউন হলের তামাসা" প্রভৃতি প্রবন্ধ গুলিতে জনশিক্ষা প্রসারের কর্মসূচী এবং ফলপ্রসূ নীতি গ্রহণের মধ্য দিয়ে তিনি পল্লী অঞ্চলে জনসংযোগ ও গণ চেতনার উদ্বোধন করতে চেয়েছেন এবং শহর ও গ্রামের শিক্ষাগত ব্যবধান সঙ্কীর্ণতর করতে চেয়েছেন। প্রচলিত শিক্ষাবিধি ও আদর্শের ক্ষেত্রে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থা ও সুযোগ সীমিত থাকবে শুধু শাহরিক উচ্চ গোষ্ঠীর মধ্যে তা তিনি কখনই চাননি। গ্রামের দুঃস্থ ছেলেমেয়েদের জন্য বৃত্তিগত এবং কারিগরী শিক্ষার কথা তিনি বিশেষ করে ভেবেছেন, শুধু গান্ধীজীর মত চরকা, তকলি এবং কুটির শিল্পের একান্ত সমর্থনে না গিয়ে। গ্রাম ভারতবর্ষে গণশক্তির একটা বিকল্প কেন্দ্র তিনি গড়ে তুলতে চেয়েছেন দেশের প্রকৃতি এবং ঐতিহ্য অনুযায়ী। বঙ্গভঙ্গের সময়ে যে জাতীয় বিদ্যালয় সৃষ্টির স্বপক্ষে তিনি বলিষ্ঠ বক্তব্য রেখেছেন, অসহযোগের ভিন্নতর আবহাওয়ায় কিন্তু তাকে তিনি সমর্থন জানাতে পারেন নি। সেটা এই কারণে নয় যে অসহযোগ-কালীন জাতীয় বিদ্যালয় গুলি ছাত্রদের ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থানে সহায়ক হবে না। বরং প্রধানত এই কারণে যে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রাপ্ত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ দেশের দূরতম গ্রামগুলিতে এই শিক্ষাকে অর্থবহ করে তুলতে সমর্থ হবেন না।

কলকাতা বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ থাকাকালীন সুভাষচন্দ্র একবার কবি-সন্দর্শনে যান শ্রীসাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথ পরিহাস করে তাঁকে বলেন, "কি সুভাষ, তোমরা কলেজের নাম বিদ্যাপীঠ দিয়েছ কেন ? বিদ্যা ওখান থেকে কি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছেন ? (পৃঃ ৪২ সুভাষচন্দ্র ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র। সাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়) যদিও এই সাক্ষাৎকারে কবি সুভাষের সঙ্গে শিক্ষা বিষয়ক অনেক কথার আলোচনা করেছেন তা হলেও তার এই শ্লেষাত্মক মন্তব্যটি থেকে অসহযোগ কালে জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মারফৎ আসলে কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবকদের একত্রিত করা হচ্ছিল। কবির সেই ধারণাটি প্রকাশ পেয়েছে। বঙ্গভঙ্গ রদের পর জাতীয় শিক্ষা সম্পর্কে শাহ্রিক বিত্তবানরা যে নিরুৎসাহ হয়ে পড়লেন তার থেকে কবি এই অসহযোগের সময়কার রাজনৈতিক আন্দোলনের ধাক্কায় জাতীয় শিক্ষার তাৎক্ষণিক প্রচেষ্টাকে নিঃসংশয়ে গ্রহণ করতে পারেন নি। ১৯২৩ সালে মেদিনীপুর শিক্ষা সম্মিলনীতে কিন্তু সুভাষ তাঁর ভাষণে রবীন্দ্রনাথকে উদ্ধৃত করে বলেন যে বাস্তব জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক বিহীন প্রকৃতি বিরুদ্ধ ঔপনিবেশিক শিক্ষায় ছাত্র "কি মুখস্থ করিতে, নকল করিতে এবং গোলামি করিতে শেখে না ?" (উপাসনা", ১৩৩০, বৈশাখ)। জাতির জীবনে দীর্ঘদিনের সঞ্চিত লঘুচিত্ততার বিরুদ্ধে একটা সুপরিকল্পিত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তিনি জনমত গড়ে তুলতে চাইছিলেন। রংপুর যুব সম্মিলনীতে প্রদত্ত ভাষণে তিনি কবির সুরে সুর মিলিয়ে বললেন, "জনশিক্ষার বহুল প্রচার দ্বারা দেশের আত্মমর্যাদা বুদ্ধি জাগিয়ে তুলতে হবে।" (তরুণের স্বপ্ন)

১৯২৮ সালের মার্চ—জুন মাসে সিটি কলেজ হোস্টেলে সরস্বতী পূজা করার উপলক্ষ্যে একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে ; এই ঘটনার দুই বিরোধী শিবিরের নায়ক রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র। ব্রাহ্মশাসিত সিটি কলেজের রামমোহন হোস্টেলে ছাত্ররা সরস্বতী পূজোকে কেন্দ্র করে যে আন্দোলন গড়ে তোলে তাতে তাঁরা সুভাষের সোৎসাহ সমর্থন পেয়েছিলেন। সুভাষচন্দ্র তাদের সংযত থেকে এবং শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে এই আন্দোলন চালিয়ে যেতে বলেন। অপরপক্ষে রবীন্দ্রনাথ এই আন্দোলনকে নিন্দাবাদ করলেন। এই আন্দোলনের ফলে সিটি কলেজের একটি অর্থনৈতিক সঙ্কট উপস্থিত হল এবং রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর ভাণ্ডার থেকে একলক্ষ টাকা ঋণ দিয়ে সিটি কলেজ কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করেন। এই সম্পর্কে ১৩৩৫ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসে

প্রবাসীতে তিনি লিখলেন, "যাঁরা ভারতের রাষ্ট্রীক ঐক্য ও মুক্তি সাধনাকে তাঁদের সমস্ত চেষ্টার একমাত্র লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করেছেন তাঁরাও যখন প্রকাশ্যে এই ধর্মবিরোধকে পক্ষপাত দ্বারা উৎসাহই দিচ্ছেন, তাঁরাও যখন এই স্বরাজ-নীতি গর্হিত আচরণে লেশমাত্র আপত্তি প্রকাশ করতে কুণ্ঠিত, তখন স্পষ্টই দেখছি, আমাদের দেশের পলিটিক্‌স্‌-সাধনার পদ্ধতি নিজের ভীরুতায়, দুর্বলতায় নিজেকে ব্যর্থ করার পথেই দাঁড়িয়েছে।" (পৃঃ ১২৯, "স্বভারত স্বতন্ত্র রবীন্দ্রনাথ", নিত্যপ্রিয় ঘোষ) এখানে উল্লেখ করতে হয় যে রামমোহন ছাত্রাবাসের তৎকালীন সব কজন ছাত্রই ছিল হিন্দু, কেবল একজন ছিল ব্রাহ্ম। এঁরা কলেজে পূজো করতে চান নি, হোস্টেলেই দেবীপূজার সঙ্কল্প নেন। কর্তৃপক্ষ তাদের আপত্তি না শোনায় ছাত্রদের জরিমানা করেন। কর্তৃপক্ষের এই স্বৈরতান্ত্রিক আচরণের বিরুদ্ধে সিটি কলেজের তরুণ ছাত্ররা অ্যালবার্ট হলে একটি সভার আয়োজন করেন ১লা মার্চ তারিখে। সেদিন সভাপতিত্ব করেছিলেন শ্রদ্ধাভাজন স্বামী অভেদানন্দ। আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে সুভাষচন্দ্র বলেন যে, "লক্ষ্য রাখতে হবে এই আন্দোলন যেন ঠিকপথে চালিত হয়। কর্তৃপক্ষ যদি আপোষ চান আমি তাতে আপত্তি করব না। ছাত্রদের বলব অত্যুৎসাহের বশে কোন অন্যপথে যেও না। ফলাফল বুঝে পদক্ষেপ নিও। হিন্দুধর্ম্ম উদার ও পরমত সহিষ্ণু—প্রবীণ ব্রাহ্মরা কেন হিন্দুছাত্র-দের ধর্ম্মীয় মনোভাবকে আঘাত করছেন আমি জানি না।" ("ফরোয়ার্ড", ২রা মার্চ, ১৯২৮) সুভাষচন্দ্র যে ছাত্রদের প্ররোচনার মুখেও সংযত ও স্থির-ভাবে সিদ্ধান্ত নিতে বলেছিলেন এবং তাদের উত্তেজিত করতে চান নি, উপরের উক্তি থেকে তা সপ্রমাণ ; কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এই বিরোধে মধ্যস্থতা করবার অনুরোধ জানিয়ে ছাত্ররা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ চার্যকে পত্র দিয়েছিল। কিন্তু পরিবর্তে কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের সরস্বতী পূজো করাকে শৃঙ্খলাভঙ্গ বলে অভিহিত করলেন এবং মাথাপিছু ছাত্রদের দশ টাকা করে জরিমানা বহাল রাখলেন। অধ্যক্ষ হেরম্বচন্দ্র মৈত্র শুধু সহসা গ্রীষ্মের ছুটি ঘোষণা করে ছাত্রদের রামমোহন হোস্টেল ছেড়ে যাওয়ার উপদেশ দিলেন। তিনি হুমকি দিলেন যে এই নির্দেশ না মানলে ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় বসাই তিনি বন্ধ করে দেবেন। বস্তুতপক্ষে বাংলাদেশের কিছু কিছু স্কুল ও কলেজের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ছাত্রদের এই সময়ে বিরোধ ঘনীভূত হচ্ছিল। তার মূল কারণ বোধকরি সাইমন-বিরোধী হরতালে ছাত্রদের যোগ-দানকে কর্তৃপক্ষ সুনজরে দেখেন নি। বরিশাল সরকারী স্কুল খুলনার দৌলতপুরে কলেজে এবং কলকাতার স্কটিশচার্চ ও সিটি কলেজে এই এই সাইমন বিরোধকে কেন্দ্র করে গোলযোগের সৃষ্টি হয়েছিল। (পৃঃ ২৯৮, "সুভাষচন্দ্র" ৩য় খণ্ড, পবিত্র কুমার ঘোষ) ২৯শে মার্চ তারিখে

অ্যালবার্ট হলের সভায় সুভাষচন্দ্র বলেন যে "অনন্তকাল কলেজের গোলমাল জিইয়ে রাখা যায় না" এবং "কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আপোষ মীমাংসা যদি সম্ভব হয় তবে তাই করতে হবে"। তিনি বলেন যে, কর্তৃপক্ষ বারংবার শৃঙ্খলার প্রশ্ন তুললেও ছাত্রদের ধৈর্য্য, সাহস ও সংযমের সঙ্গে সংগ্রাম পরিচালনা করতে হবে, যদি তারা বোধ করে যে তাদের আন্দোলন ন্যায় ও সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত। ১৯২৮ সালের ৪ঠা এপ্রিল শ্রদ্ধানন্দ পার্কে আয়োজিত একটি সভায় সুভাষ বলেন যে, একটি সংবাদপত্র তাঁর বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলনে উস্কানী দেওয়ার অভিযোগ এনেছেন এবং প্রসঙ্গত প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে তাঁর বিতাড়নের প্রসঙ্গও অবতারণা হয়েছে। তিনি মন্তব্য করেন, 'ঐ বিতাড়ন আমার জীবনকে নতুন পথে মোড় ফিরিয়েছিল। বাঁধা পথে যখন আর চলতে পারি না, এখনই আত্মশক্তি সম্পর্কে সচেতন হওয়ার সুযোগ আসে।' তিনি বলেন যে ছাত্রদের এই আন্দোলন-পরায়নতা হল যুগেরই লক্ষণ। আসলে তাঁর ধারণা ছিল যে 'উপাসনার স্বাধীনতা'র নীতিকে কেন্দ্র করে তাঁর মতপার্থক্যই-ছাত্রদের এই আন্দোলনের মূলে। উপরন্তু প্রবীণ নেতা বিপিনচন্দ্র পাল এবং যতীন্দ্রনাথ বসু যখন এই বিষয়ে সুভাষকে একটি আপোষ-মীমাসার প্রস্তাব জানিয়েছিলেন, তাকে স্বাগত জানিয়ে তিনি একটি বিবৃতি দেন। ১৯২৮ এর ১৯শে জুন তারিখে। তিনি বলেন, 'রবিবাবু এবং মিঃ এন্ড্রুজ এই ব্যাপারে আসিয়া পড়িয়াছেন দেখিয়া বড়ই দুঃখিত হইয়াছি। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় ব্যক্তির নিরপেক্ষ থাকাই সঙ্গত ছিল।...তাঁহার প্রবন্ধে তিনি সিটি কলেজের ব্যাপার সম্পর্কে হিন্দু মুসলমানের প্রশ্ন আনিয়াছিলেন। ধৃষ্টতা হইলেও বলিব উঁহার এই যুক্তি অসার। সিটি কলেজের ব্যাপারে প্রকৃতপক্ষে ঘরোয়া ব্যাপার। ইহা ঠিক শাক্ত-বৈষ্ণবের দ্বন্দ্বের ন্যায়। আর এক প্রশ্ন উঠান হইয়াছে যেখানে এতদিন ছাত্ররা এই পূজা করেন নাই, সেখানে এবার কেন এত জোরের সহিত এই আন্দোলনের আরম্ভ হইয়াছে। তবে কি দেড়শত বছর পরাধীন থাকার জন্য এখনও স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত হইয়াই থাকিতে হইবে?' (পৃঃ ২১১, প্রথম খণ্ড, 'জয়শ্রী রচনাবলী)

সিটি কলেজ হোস্টেলে সরস্বতী পূজা অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে পত্র-পত্রিকায় যে বিতর্কের সূত্রপাত হয় তাতে পৃথকভাবে রবীন্দ্রনাথের অবস্থান সম্পর্কে কয়েকটি মন্তব্য প্রয়োজন। বস্তুত সিটি কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ব্রাহ্ম সমাজ তাদের ধর্মাদর্শের ভিত্তিতে কলেজে বা হোস্টেলে পৌত্তলিক পূজা অনুষ্ঠান অনুমোদন করতেন না সেখানে ওখানকার ছাত্ররা সরস্বতী পূজা অনুষ্ঠানে কৃত সংকল্প হয়। তাঁর নিজের দিক থেকে কবি কোনদিনই এই ধরণের সাম্প্রদায়িকতা বা ধর্মোন্মাদনা নীতিগতভাবে সমর্থন করতেন না।

সেই কারণে ছাত্রদের এই অন্যাষ্য দাবীর তীব্র সমালোচনা করে ১৯২৫-এর মে মাসের 'মডার্ন রিভিউ' কাগজে তিনি সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশেষ কোন ধর্মানুষ্ঠানের অনুমতি দেওয়া সঙ্গত নয়। কেননা দৃষ্টান্ত হিসাবে এটি সমর্থনযোগ্য নয় এবং একবার অনুমতি দিলে মুসলমান বা অন্য সম্প্রদায়ের ছাত্ররা নিজনিজ ধর্মানুষ্ঠানের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ব্যবহার করতে চাইবে। কবি এই ধরনের সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মোম্মদনার সমর্থনে বিখ্যাত দেশনেতারা অগ্রণী হয়েছেন বলে ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত বোধ করেন। বিশেষ করে যখন এই নেতারা সমানেই জনগণের কাছে জাতীয় ও রাজনৈতিক ঐক্যের জন্য আবেদন করছেন। অবশ্য সুভাষচন্দ্রের নাম তিনি এই প্রসঙ্গে কখনই উল্লেখ করেন নি, যদিও ক্ষুব্ধ কবি গভীর আক্ষেপে ১৩৩৫-এর ২৩শে বৈশাখ সংবাদপত্রে এই ঘটনা সম্পর্কে একটি পত্র দেন যা ১৩৩৫-'প্রবাসী'র জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এই প্রসঙ্গে এটা স্বীকার্য যে, সে সময় কিছু হিন্দু ঘেঁষা জাতীয়তাবাদী নেতা এই বিতর্ককে বেশ কিছুটা তিক্ত করে তোলেন : (পৃঃ ৩৮৮, ২য় খণ্ড—'ভারতের জাতীয়তা ও আন্তজাতিকতা ও রবীন্দ্রনাথ' : —নেপাল মজুমদার)।

প্রসঙ্গত একথা বিশেষভাবে স্মর্তব্য যে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ছাত্রদের ন্যায্য আন্দোলনকে একাধিকবার সমর্থন করেছিলেন। বঙ্গভঙ্গের সময় খ্যাত কুখ্যাত কার্লাইল তবে "মডার্ন রিভিউ"-এর প্রবন্ধ এবং "প্রবাসীতে" প্রকাশিত চিঠিতে ব্যক্তিগতভাবে সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে কবি সরাসরি কোনো সমালোচনা না করলেও তিনি যে সুভাষচন্দ্রের ভূমিকা ও কার্যের সমালোচনা করার জন্য রামানন্দবাবুকে তখন অনুরোধ জানিয়েছিলেন. সেটা অনেককাল পরে প্রবাসী সম্পাদককে লেখা আর একটি চিঠিতে সপ্রমাণ। কবির তখনকার অনুরোধ, রামানন্দবাবু ছাত্রদের আন্দোলনকে অন্যায় মনে করলেও, রক্ষা করতে পারেননি। কিন্তু সিটি কলেজ কর্তৃপক্ষের আচরণের বিরুদ্ধে সুভাষের নিন্দাবাদে কবির প্রতিক্রিয়া সাময়িকভাবে তীব্র হলেও পরে তাঁর মনে হয়েছিল যে রামানন্দবাবুকে ঐ সম্পর্কে সমালোচনায় তৎপর হতে যে অনুরোধ করেছিলেন তা হয়তো সঙ্গত হয়নি। একাধিক কারণে কবির ২৫-১-৩৮ তারিখে রামানন্দবাবুকে লেখা চিঠিটি উদ্ধৃত করা যেতে পারে। "সিটি কলেজের বিরুদ্ধে সুভাষ বসুর অন্যায় আক্রমণে প্রসঙ্গে তার আচরণের নিন্দা করার অনুরোধ আপনাকে জানিয়েছিলুম, কিন্তু তার পরেই মনে হয়েছিল প্রস্তাবটা সঙ্গত নয়। বিশেষত সুভাষ আগামী কংগ্রেস অধিবেশনে যে পদ পেয়েছেন, তার সম্মান কোনো আলোচনা দ্বারা ক্ষুণ্ণ করা আমাদের কর্তব্য হবে না। সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেলেও অন্যায়কে আমি ক্ষমা করতে পারি নে এ আমার দুর্বলতা। বিধাতা আমাকে ভোলবার

অসাধারণ ক্ষমতা দিয়েছেন কেবল এই ক্ষেত্রে আমার স্মরণশক্তি কাঁটাগাছ রোপণ করতে ছাড়েনা এটা আমার পক্ষে না আরামের না কল্যাণের। আপনি আমাকে অনুতাপের সম্ভাবনা থেকে রক্ষা করেছেন।" (পৃ. ৬৭২, ৬ষ্ঠ খণ্ড, "ভারতে জাতীয়তা, আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ"—(নেপাল মজুমদার) (প্রবাসী, মাঘ, ১৩৩৫, পৃ. ৫৭৫-৭৬) ঠিক এই যুবকংগ্রেসের পরই মীরাবেনকে এক চিঠিতে (সম্ভবত সুভাষচন্দ্রের মন্তব্য সম্পর্কে) ১৯২৯ সালের ২০শে জানুয়ারী রবীন্দ্রনাথকে লেখেন যে বাংলার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের একাংশের মধ্যে কংগ্রেস অধিবেশনে সত্যসন্ধানে একটা অনীহা তিনি লক্ষ্য করেছেন। তিনি আরও লিখেছেন যে, মহাত্মাজী যদি তপস্যার প্রবক্তা হন তাহলে কবি স্বয়ং হলেন আনন্দের কাব্যকার এবং মহাত্মার আশ্রমে তাঁর চিন্তার মাহাত্ম্যই বাস্তবরূপ গ্রহণ করেছে। (পৃ. ৪১৭, ২য় খণ্ড, "ভারতের জাতীয়তা, আন্তর্জাতিকতা ও রবীন্দ্রনাথ"—নেপাল মজুমদার) প্রকৃতপক্ষে কবি নিজেও শিক্ষা সপ্তাহ উপলক্ষ্যে ১৯৩৬ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত এক সভায় যেমন বলেছিলেন যে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার "অকিঞ্চিৎ-করত্বের মূলে রয়েছে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার অস্বাভাবিকতা, দেশের মাটির সঙ্গে এই ব্যবস্থার বিচ্ছেদ"। তেমনি ঔপনিবেশিক ভারতের প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থার ত্রুটি সম্পর্কে বলেছেন যে এটি অনাধুনিক এবং একপেশে, বলেছেন "পাশ্চাত্য বিদ্যার সঙ্গে আমাদের মনে যোগ হয়নি—জাপানে যেটা হয়েছে পঞ্চাশ বছরের মধ্যে। তাই পাশ্চাত্য শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বরাজের অধিকারী।" তাঁর মতে অবশ্য সেই আপন করার সর্বপ্রধান সহায় হল আপন ভাষা। জাপানের বিজ্ঞানচর্চার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় এবং সেখানেও মাতৃভাষা অনেকটা সহায়ক হয়েছে। আয়ারল্যান্ডের সুপ্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থা ইংরেজও দিনেমাররা যে আইরিশ ভাষাকে অবমাননা করে ধ্বংস করতে চেয়েছিল সেকথাও তিনি উল্লেখ করেছেন "শিক্ষা সংস্কার" নামক প্রবন্ধে। (১১০৬, "ভান্ডার")

উপরন্তু কবি রাশিয়ায় জনশিক্ষা প্রসারের ব্যাপক ব্যবস্থার কথাও উল্লেখ করে ঔপনিবেশিক ভারতের বিচিত্র অভিসেচন ক্রিয়া সম্পর্কে আক্ষেপোক্তি করেছেন। শিক্ষার প্রসার ও উন্নতি বিকাশের ক্ষেত্রে যে দৃষ্টান্তগুলি রবীন্দ্রনাথ তুলে ধরেছেন সুভাষচন্দ্র সেই দৃষ্টান্তগুলিকে আমাদের সামনে রেখেছেন শিক্ষার পরিচালন ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক নীতির সোৎসাহ সমর্থন করতে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক পরিবেশকে নিশ্চিত করতে। তাই এক্ষেত্রে শিক্ষাকে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের আশা-আকাঙ্খার সঙ্গে যুক্ত করতে নিজের মৌল সমাজদর্শনের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে সুভাষচন্দ্র একটি সমন্বিত কর্মধারার কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে প্রকৃত জাতীয় শিক্ষাদান

অসম্পূর্ণ থাকাত বাধ্য কেননা শিক্ষা নিয়ন্ত্রকবর্গ ক্ষমতার জোরে দেশবাসীর ইচ্ছাশক্তিকে বাস্তবে রূপান্তরিত করতে বাধা দেবে। সেই কারণে তিনি দেশের রাজনৈতিক মুক্তি এবং ক্ষমতা দখলকে পরিপূর্ণভাবে জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তনের একটি প্রার্ক শর্ত বলে মনে করেছেন। এখানে কবির শিক্ষা-ভাবনার সঙ্গে তাঁর মৌলিক পার্থক্য। অধিকন্তু রবীন্দ্রনাথের একটি নিজস্ব শিক্ষাতত্ত্ব ছিল অপরপক্ষে সুভাষচন্দ্র তত্ত্ব জিজ্ঞাসায় ঐভাবে প্রবৃত্ত হননি তাই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের যুগে তাঁর মতো লোকনায়ক যেমন রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতার দাবী অথাৎ অন্ন বস্ত্র এবং শিক্ষার দাবী আদায়ের লড়াই চালিয়েছিলেন, অন্যদিকে তেমনি অব্যবহিত পরিবেশে অন্যান্য গণতান্ত্রিক অধিকার সহ শিক্ষার অধিকার রক্ষা ও সম্প্রসারণের দাবীতে সোচ্চার হয়েছিলন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর রূপকল্পিত গল্প "তোতাকাহিনী"র মধ্যে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে ইঙ্গিত করে বলেছেন যে, স্কুল-কলেজের বদ্ধপরিবেশে শিক্ষার্থীর প্রাণের স্ফূর্তি আদৌ সম্ভব নয়; সুভাষচন্দ্র কলের শিক্ষার উপর আদৌ আস্থাশীল ছিলেন না। তিনি বলেছেন, "এই কলের শিক্ষায় মানুষ বড় কল গড়তে পারে কিন্তু মানুষ গড়তে পারে না।" বিবেকানন্দের আদর্শে মানুষ গড়ার উপরেই তাঁর ঝোঁক ছিল বেশী এবং হয়ত সেই কারণেই কেতাবী শিক্ষায় বিশ্বাসী ছিলেন না—শিক্ষাকে সর্বতোভাবে প্রাণধর্মী করতে চেয়েছেন এবং অনুরূপ কারণেই প্রাণের দাবীকে মেটাবার জন্য বহুমুখী শিক্ষার স্বপক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। দেহ ও মনের বিকাশ সমভাবে ঘটাতে পারে এমন শিক্ষাপ্রণালী উদ্ভাবনে তিনি সচেষ্ট ছিলেন। জাতির প্রয়োজন অনুযায়ী বিশিষ্ট শিক্ষাপ্রণালী তিনি চেয়েছিলেন। মেদিনীপুরে আহূত জাতীয় শিক্ষা সম্মেলনে তাই তিনি বলেছেন, "লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে যে শিক্ষা প্রণালী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গড়িয়া উঠিয়াছে তা কোনোমতেই জাতীয় শিক্ষা হইতে পারে না।" রবীন্দ্রনাথও শিক্ষা ভাবনায় ক্ষেত্রে সর্বপ্রথমে অনুকৃতিকে বর্জন করতে চেয়েছিলেন। পক্ষান্তরে স্বদেশী সমাজ (১৯০৫) শীর্ষক বক্তৃতায় তিনি দেশপ্রেম সঞ্চারী পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের কথা উচ্চারণ করেছেন। সুভাষচন্দ্রও মেদিনীপুরে প্রদত্ত বক্তৃতায় জাতীয় সমাজনীতি, ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিলেন। ইংরাজের অধীনে যে শিক্ষাপ্রণালীর প্রচলন হয়েছিল আমাদের জাতীয় শিক্ষার আদর্শের ধারার সঙ্গে তার কোনো মিল নেই। তিনি আরও বলেছেন যে, শিক্ষাক্ষেত্রে বাহ্যিক অর্থবিনিয়োগের পরিমাণ থেকে শিক্ষার প্রগতিকে পরিমাপ করা না বরং আদর্শ বিরহিতভাবে শিক্ষায়তনের জন্য যত সুরম্য প্রাসাদ রচিত হচ্ছে জাতীয় শিক্ষার আদর্শের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের

মত তিনিও সার্বজনীন শিক্ষা, শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণের জন্য মাতৃভাষা এবং জীবনমুখী শিক্ষাব্যবস্থার স্বার্থে তথাকথিত পরীক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তনের পক্ষে মতপ্রকাশ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার মধ্যদিয়ে মূলত চিত্তের স্বাধীনতার কথাই বিশেষভাবে বলেছেন অপর পক্ষে সুভাষচন্দ্র রাজনৈতিক বন্ধনমুক্তির আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করতে শিক্ষাকে একটা হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে চেয়েছেন। কালান্তর গ্রন্থে কবি ইংরাজ প্রবর্তিত উচ্ছিষ্ট শিক্ষাপদ্ধতি যে আমাদের চিন্তার ক্ষেত্রে বিজাতীয়করণকে প্রশ্রয় দিয়েছে, তাঁর মতে তা যেমন সত্য তেমনি ইংরাজ প্রদত্ত পঙ্গু শিক্ষা গ্রহণের ফলেও কিছু মানুষ আবার পরাধীনতার মর্মবেদনা অনুভব করেছে। দু'জনেই পাশ্চাত্যে দীর্ঘদিন কাটিয়ে এই সত্যেই উপনীত হয়েছিলেন যে এদেশে দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতার সহাবস্থান তর্কাতীতভাবে বিপজ্জনক। ইংরাজী শিক্ষাকে ধীরে ধীরে বর্জন, ভারতের প্রতিটি অঞ্চলে আঞ্চলিক ভাষার সমৃদ্ধি সাধন এবং সর্বভারতীয় ভাষা হিসাবে হিন্দীকে গ্রহণের ক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্রের হিন্দীকে গ্রহণের ক্ষেত্রে সুভষেচন্দ্রের শিক্ষাচিন্তা এবং গান্ধীর শিক্ষাভাবনার কিছুটা অনুবর্তী ছিল, অবশ্য দুটি ভিন্ন অর্থে।

১৯৩১ সালের মে মাসে রবীন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্রকে অনুরোধ জানান যে জাপানী যুযুৎসুবিদ তাকাগাকি সান্‌কে কলকাতা কর্পোরেশনের অধীনে নিযুক্ত করে ছেলেমেয়েদের যুযুৎসুশিক্ষার ব্যবস্থা করতে (৩।৪ বৈশাখ, ১৩৩৮)। সুভাষচন্দ্রের মেয়রের কার্যকাল তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল ; তাছাড়া কংগ্রেসের গৃহবিবাদ তখন খুবই তীব্র আকার ধারণ করেছে। উপরন্তু নূতন মেয়র বিধানচন্দ্র রায়কে লেখা ২৫শে এপ্রিল, ১৯৩১-এর চিঠিতে কবি নিজেই জানিয়েছেন যে পূর্ববঙ্গ সফরে ব্যস্ত ছিলেন বলে হয়তো সুভাষচন্দ্র এ চিঠির জবাব দিতে পারেন নি। তাছাড়া ১৯৩০ সালেই আমেরিকায় অসুস্থ হয়ে পড়েন অসুস্থ কবির সম্পর্কে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে সুভাষচন্দ্র একটি তারবার্তা প্রেরণ করেন। সুতরাং তিনি ইচ্ছাপূর্বক কবির চিঠির জবাব দেন নি কোন কোন লেখকের এ ধারণা বোধহয় অযৌক্তিক। কিন্তু একথা ঠিক যে দু'জনের ক্ষেত্র ছিল বিভিন্ন এবং শিক্ষার প্রসঙ্গ ব্যতিরেকে অন্যান্য বিষয়েও উভয়ের মধ্যে নীতিগত মতপার্থক্য এমনকি ভুল বোঝাবুঝিও হয়েছিল। ১৯৩৮ সালে না সুভাষের পৃষ্ঠপোষণায় ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটি গঠিত হল এই কমিটিতে জাতীয় শিক্ষার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সুষ্ঠুবিচার বিবেচনা এবং পরিকল্পনার জন্য পাঁচটি উপসমিতি গঠিত হয়। রবীন্দ্রনাথ পরিকল্পনা সমিতির সর্ববিধ ক্রিয়াকর্ম বিশেষ করে সমবায় যৌথ খামার, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষ এবং সর্বোপরি শিক্ষা সংক্রান্ত আলোচনার বিষয় যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন বলে অনিল চন্দ জহরলালকে ১৯৩৮

সালের ২৮শে নভেম্বরে লেখা একটি চিঠিতে জানান (পৃঃ ৭৯, 'সুভাষ-চন্দ্র ও ন্যাশনাল প্ল্যানিং শঙ্করীপ্রসাদ বসু)

১৯৩৮ সালের ৮ই ডিসেম্বর কলকাতায় শান্তিনিকেতন শিল্পবিপনী কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন সুভাষচন্দ্র। অনুপস্থিত কবি তাঁকে একটি বার্তায় সম্ভাষণ করেছিলেন 'তোমরা স্বদেশের প্রতীক' বলে। তিনি রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রের কাছে এই আবেদন জানিয়েছিলেন যে, শান্তিনিকেতন, শ্রীনিকেতনে তিনি যে কর্মমন্দির রচনা করেছিলেন, তা যেন সুভাষচন্দ্র প্রমুখ রাষ্ট্রনেতার আনুকূল্যে শাশ্বত আয়ু লাভ করে। প্রত্যুত্তরে সুভাষ বলেন, "যে শিক্ষা দিবার জন্য ভারতে তথা বিশ্বের একটি কোনে যে প্রতিষ্ঠান গড়া হইয়াছে, সেই আদর্শ যখন বিশ্বমানবের মনে প্রতিষ্ঠা পাইবে এবং দিকে দিকে শত সহস্র শান্তিনিকেতন শ্রীনিকেতন গড়িয়া উঠিবে তখন বীরভূম জেলার এই শান্তিনিকেতন শ্রীনিকেতন থাকুক বা না থাকুক তাহাতে কিছু যায় আসে না। কবির অভিমানের সুরটি ধরতে পেরে সুভাষচন্দ্র বলেছেন যে দেশবাসীর কাছে এই প্রতিষ্ঠানগুলির প্রকৃত মর্যাদা অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত হবে যদিও পথপ্রদর্শকদের কথা সাধারণ মানুষ সব সময় সম্যক্ উপলব্ধি করতে পারে না। সুভাষের এই ভাষণে কিন্তু রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রবাসী, ১৩৪৫-এর পৌষ সংখ্যায় লিখলেন যে কবি সুভাষচন্দ্রকে শান্তিনিকেতন শ্রীনিকেতনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কবির কাঙ্ক্ষিত আশ্বাস স্পষ্ট করে দিতে পারতেন। সুভাষচন্দ্রের এই ভাষণটির প্রকৃত অর্থ তাঁর মানন্দবাবু হয়তো অনুধাবন করতে পারেন নি। এবং একে ব্যঞ্জনার্থে না নিয়ে বাচ্যার্থেই নিয়েছেন। অতঃপর ১৯৩৯ সালে ২১শে জানুয়ারি শান্তিনিকেতনে কবি সুভাষচন্দ্রকে আহ্বান করে বলেন যে, শাহরিক আনুষ্ঠানিক শিক্ষালয় নামক কারাগার থেকে দেশের ছেলেমেয়েদের মুক্ত করতে শান্তিনিকেতনে তিনি একটি সত্যিকারের শিক্ষাসত্র স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। দেশে যারা অপমানিত কবি তাদেরই সম্মান দেওয়ার আয়োজন করেছিলেন, পড়া পাখি —বুলি বলা গতানুগতিকের দল সৃষ্টি করতে চান নি। কবি সুভাষকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'যতগুলি ছেলে মেয়েকে পেরেছি কারাগার থেকে মুক্ত করার সাধনা করেছি—তার আনন্দ তুমি বুঝবে, তুমি কারাবাস ভোগ করেছ।' (পৃঃ ৭৩, 'বক্তা রবীন্দ্রনাথ,' তারিণীশঙ্কর চক্রবর্তী) সুভাষ প্রত্যুত্তরে কবিকে বললেন। 'আপনার শান্তিনিকেতনের ও শ্রীনিকেতনের সার্থকতা ও

প্রয়োজনীয়তা থাকবেই থাকবে। শুধু তাই নয় এরকম সাধনা ভারতের দিকে দিকে স্থানে স্থানে গড়ে উঠবে।' (পৃঃ ১৫০, 'রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র', নেপাল মজুমদার) অবশ্য তাঁর প্রাণের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে না পারছে, ততদিন পর্যন্ত কবিসৃষ্ট শিক্ষাসত্রের প্রয়োজনীয়তা থাকবেই। ঐ দিন সন্ধ্যায় সিংহসদনের সামনে ছাত্রদের এক সভায় সুভাষচন্দ্র শান্তিনিকেতনের শিক্ষাদর্শ ও জাতীয় আন্দোলনে ছাত্রদের কর্তব্য সম্পর্কে তথা এই প্রতি-বৈশিষ্ঠ্য সম্পর্কে বলেন 'এখানকার শিক্ষার সঙ্গে জাতীয় আদর্শের একটা সংযোগ আছে। সেই কারণে এখানকার প্রচেষ্টার মধ্যেই, একদিকে একটা বিদ্রোহের ভার রয়েছে আর অপরদিকে মানুষের প্রাণের সম্পদ শিক্ষা ও কর্মের মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তোলবার একটা বিরল সুযোগও রয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র দু'জনেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দিদার্সে'ও অনন্বয়সাবসে সমান যচেষ্ট। আর শুধু ব্যক্তিগত শিক্ষার্থী জীবনের অভিজ্ঞতা নয়, দু'জনেই শিক্ষাদান কার্যে নিজেদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে একই সত্য উপলব্ধি করেছিলেন দুজনের পক্ষেই পরাধীন ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে ইংরাজী শিক্ষার উপযোগিতাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা ঐতিহাসিক ভাবেই ছিল অসম্ভব। 'সভ্যতার সঙ্কট' নিবন্ধে অন্ন-বস্ত্র পানীয় এবং শিক্ষার অভাব ইংরাজ শাসনে শিক্ষিত মানুষের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছে, বিশেষ করে অন্য দেশের সঙ্গে ভারতে ইংরাজ শাসনের তুলনা করে। ৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪০-এর শ্রীনিকেতনের অষ্টাদশতম উৎসবে যন্ত্র-সভ্যতার যুগে এই প্রতিষ্ঠানের উপযোগিতা সম্পর্কে কবি বলেন যে এই শহর আর গ্রামের মানুষের বৈষম্যকে দূর করেছে, এবং এখানে প্রদত্ত শিক্ষার মধ্য দিয়ে দেশবাসী মানুষ হয়ে ওঠে—"সেখানে বিরোধ নেই অনৈক্য নেই।" মিস রাথবোনকে লেখা চিঠিতে তিনি বলেছেন যে আমাদের অপশিক্ষিত করবার বহুবিধ চেষ্টা সরকারী ভাবে ইংরাজ আমলারা করলেও ইংরাজী চিন্তাকে আমরা ব্যবহার করেছি আমাদের সাংস্কৃতিক স্বাচ্ছন্দ ও উদারতাকে অক্ষুন্ন রাখতে। ভাষা যে প্রকৃত অর্থে আত্মীয়তার আধার একথা ভারত-ব্যাপী মিলন সংঘটনের উদ্দেশ্য সফল করার ক্ষেত্রে কবি বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। তাই ১৯২৩ সালে কাশীতে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে তিনি সাম্রাজ্যবাদী জাতিদের নিজেদের ভাষাকে অন্যের উপর চাপাবার প্রবণতাকে সমূহে নিন্দা করেছেন। বস্তুত শিক্ষার

আদর্শ ও প্রচলিত শিক্ষাবিধির বৈপ্লবিক পরিবর্তন এবং শিক্ষাক্ষেত্রে সম্পূর্ণ দেশোপযোগী কর্মধারা প্রসারে রবীন্দ্রনাথের মত গুরুত্ব আর কেউ দেন নি। তাই মেলা যাত্রা। জাদুবিদ্যা, সমবায় প্রভৃতির মাধ্যমে গ্রামের নির্বিত্ত মানুষের কাছে পেঁাছনোর ব্যাপারে সুভাষবন্দ্র রবীন্দ্রনাথের অনেকটা ভাবানুসারী। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ "তপোবন" প্রবন্ধে শিক্ষার মাধ্যমে ভারত বর্ষের যে সত্যকে উপলব্ধি করতে চেয়েছিলেন অথবা "বিদ্যা সমবায়" প্রবন্ধে যে আদর্শে পেঁাছতে চেয়েছিলেন তা স্বদেশিকতা নয় বরং বিশ্বজনীনতা। অপর পক্ষে সুভাষচন্দ্রের শিক্ষাচিন্তার ক্ষেত্রে এই স্বদেশিকতার প্রতি একটা ঐকান্তিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। মূলত শিক্ষার সামাজিক মূল্যকে পরাধীন দেশবাসীকে বিশেষ ভাবে বোঝাবার জন্য।

অমর্ত্য সেনের রাজনৈতিক অবস্থান
(বিতর্কের জন্যে)

বাসব সরকার

অমর্ত্য সেন নোবেলজয়ী হয়েছেন অর্থনীতিবিদ হিসেবে। তাঁর 'সামাজিক চয়ন' তত্ত্ব ওয়েলফেয়ার অর্থনীতিতে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। নোবেল কমিটি তার বিশেষ উল্লেখ করেছেন প্রাসঙ্গিক বিবৃতিতে। সেখানে রাজনৈতিক কোন প্রসঙ্গ পরোক্ষ ভাবেও আসেনি। দেশে ফিরে প্রায় তিন সপ্তাহ ধরে নানা সভায় বিশেষ অনুষ্ঠানে, সম্বর্ধনায় তিনি সামাজিক চয়ন তত্ত্বের দুরূহতার কথা নিজেই বলেছেন এবং শ্রোতৃমণ্ডলীর সামনে তার যথাসাধ্য সরল উপস্থাপনার চেষ্টা করেছেন। তাছাড়া আমাদের দেশেরও নানা জ্ঞানীগুণীজন গৌড়জনের সুবোধ্য করে অনেক প্রবন্ধ নিবন্ধ রচনা করে চলেছেন। বর্তমান নিবন্ধে তার অক্ষম পুনরাবৃত্তির কোন প্রচেষ্টা করা হবে না।

সামাজিক চয়ন তত্ত্বের নিরিখে অমর্ত্য সেনের বক্তব্যের রাজনৈতিক তাৎপর্য কিভাবে আলোচনা করা যায় তারই একটা সূত্রপাত এখানে করা হচ্ছে। গোড়াতেই বলে নেওয়া দরকার অমর্ত্য সেন নিজে রাজনৈতিক মতামত কিম্বা আদর্শগত অবস্থান ঘোষণা করার কোন চেষ্টাও করেন নি। কিন্তু নানা বক্তব্যের মধ্যে বিশেষতঃ সাংবাদিক সম্মেলনগুলিতে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর তিনি যা বলেছেন তার থেকে অমর্ত্য সেনের রাজনৈতিক অবস্থান বোঝার মতো ইঙ্গিত যথেষ্টই ছিল। আরো লক্ষ্যনীয় হলো এইসব রাজনৈতিক কথা নোবেলজয়ীকে প্রশ্নোত্তর কালে বলতে হয়, কারণ সাংবাদিক নানা প্রশ্ন বিতর্কিত বিষয়ে মতামত জানতে চাইবেন, সেটাই রীতি। সেই সব প্রসঙ্গে কিম্বা প্রশ্নে তাঁর মতামত হঠাৎই বলা কোন মন্তব্য ছিল না। সেগুলি সবই ছিল গভীর চিন্তা প্রসূত বক্তব্য, যার থেকে অমর্ত্য সেনের রাজনৈতিক অবস্থানের একটা সুসঙ্গত ধারাবাহিক ধারণা করা যায়।

অমর্ত্য সেন কি বামপন্থী, মার্ক্সবাদী, কোন র‍্যাডিক্যাল মতাদর্শে বিশ্বাসী এই ধরণের নানা প্রশ্নের জবাবে তাঁর একটাই বক্তব্য 'না'। 'বামপন্থী কিম্বা মার্ক্সবাদী কথাগুলির মধ্যে একটা বিশেষ 'ইজমের' ধারণা নিহিত,

অমর্ত্য সরাসরি তেমন কোন মতাদর্শ কিম্বা পথের প্রতি একান্ত আনুগত্য অস্বীকার করেছেন। 'কোন পন্থীর ভূত' হওয়াতে তাঁর আপত্তি আছে। কারণ তার মধ্যে চিন্তার একটা আরোপিত সীমাবদ্ধতা মেনে নেওয়ার ব্যাপার থাকে। অমর্ত্য নিজেকে মুক্তচিন্তার মানুষ বলেছেন। কিন্তু সেই মুক্তচিন্তার স্বাধীনতা একান্তভাবে কাঙ্খিত বলেও প্রায় একই সঙ্গে এটাও জানিয়ে দিয়েছেন সেটা মোটেই ব্যক্তিকেন্দ্রিক কোন একমাত্রিক ধারণা নয়। সেই মুক্তচিন্তাটাও সামাজিক অসংখ্য বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত, তার থেকেই উৎসারিত।

তাঁর কিছু প্রবন্ধে সরাসরি (পরিচয়ের এই সংখ্যায় অমর্ত্য সেনের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য) মার্ক্সের উদ্ধৃতি দিয়ে এবং অন্যত্র মার্ক্সের কথাটাই নানা ব্যাখ্যার সূত্রে টেনে এনে অমর্ত্য বলেছেন মানুষের পছন্দ-অপছন্দ অর্থাৎ 'চয়ন' এবং চিন্তাভাবনাগুলিও সামাজিক পরিবেশ পরিস্থিতি নিরপেক্ষ নয়। বরং তাদের প্রেক্ষিত সব সময়েই সামাজিক ভাবে নির্ধারিত। সুতরাং তার চাওয়া পছন্দগুলি যদি একান্তভাবে আত্মকেন্দ্রিক হয়, যদি নিজের সুখ দুঃখের সঙ্গে তার একনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে তাহলে সেটা এমনই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী হয়ে পড়ে যা কোন সুস্থ সমাজের পক্ষে গ্রহণযোগ্য থাকে না। উনিশ শতকের ইউটিলিটারিয়ান জীবন দর্শনের প্রতি তাঁর সামান্যতম সমর্থন নেই, অমর্ত্য সেন সেকথা স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন। একথা উল্লেখ করাই যথেষ্ট উনিশ শতকীয় ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ থেকেই পুঁজিবাদী বিকাশের স্বর্ণযুগ সুরু হয়ে ছিল। সেই সূত্রেই চালু হয়েছিল স্পেনসারীয় সামাজিক ডারউইনবাদ, নৈতিকতা মূল্যবোধহীন এক 'আত্মসুখপরায়ণ' সমাজ জীবনের তত্ত্ব। তার পোষাকী রাজনৈতিক নাম ছিল লিবারালইজম' বা উদারনীতিবাদ। এহেন উদারনীতিবাদের আতিশয্য উদারনৈতিকতার শ্রেষ্ঠ দার্শনিক জন স্টুয়ার্ট মিলের অসহ্য বোধ হওয়ায় শেষ জীবনে তিনি 'সমষ্টিবাদের' দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। মিলের সমষ্টিবাদী বক্তব্য তাঁকে বৃটেনের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় 'first of the great prophets এর মর্যাদা দেয় সেই দেশে সংস্কারবাদী সমাজতন্ত্র ধারণার গোড়াপত্তন করে, যা পরে 'ফেবিয়ান সমাজতন্ত্র' নামে পরিচিতি লাভ করে। জহরলাল ভারতে যে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা চিন্তা করেছিলেন সেটা ছিল 'ফেবিয়ান সমাজ-তন্ত্র' অনুসারী ধারণা।

অমর্ত্য সেন নেহরুর পঞ্চাশের দশকের আর্থ-সামাজিক কিছু কর্মসূচির উল্লেখ করে বলেছেন সেগুলি যদি আন্তরিকতার সঙ্গে রূপায়িত হতো তাহলে শতাব্দীর শেষ দশকে যে ঘনায়মান সংকট এদেশে দেখা যাচ্ছে, তার অনেকটাই হয়তো এড়ানো যেত। তার অর্থ অবশ্যই এটা নয় যে অমর্ত্য সেনের রাজনৈতিক অবস্থান নেহরু সমাজতন্ত্রীদের কাছাকাছি কোন এক বিন্দুতে। কেন যে তা বলা যাবে না, সামাজিক চয়ন তত্ত্বের ব্যাখ্যায় অমর্ত্য নিজেই তার কারণ বলেছেন। 'চয়ন' সামাজিক পরিবেশ, পরিস্থিতি নির্ভর অর্থাৎ সামাজিক ভাবে নির্ধারিত। সুতরাং অসম সমাজে চয়ন বৈষম্যমূলক হবে, সেটাও স্বাভাবিক। কোথাও 'চয়ন' প্রকৃত অর্থে সামাজিক হতে গেলে সমাজের গরিষ্ঠসংখ্যক মানুষের আশা আকাঙ্খার প্রতিফলন তার মধ্যে হওয়া জরুরী হয়ে পড়ে। সেটাই অমর্ত্য সেনের রাজনৈতিক অবস্থান বোঝার চাবিকাঠি।

সমাজের গরিষ্ঠসংখ্যক মানুষ নিজের পছন্দ অপছন্দ প্রকাশের অবস্থায় তখনই আসতে পারবে যখন তাদের অধিকার চেতনা আসবে, সেই অধিকার তারা পেতে সচেষ্ট হবে এবং পাওয়া না গেলে দাবি করতে পারবে। একেই অমর্ত্য বলেছেন Capability বা সক্ষমতা। এই সক্ষমতা শুধু একটা ধারণা নয়, কারণ সেই রকম ধারণা আমাদের সংবিধানের মৌলিক অধিকার অধ্যায়ে গত প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরেই রয়েছে। সক্ষমতাকে সাধারণ মানুষের জীবনে বাস্তবায়িত করে তোলার নিরন্তর প্রয়াস সামাজিক ভাবেই চালাতে হয়। অমর্ত্য সেন দীর্ঘদিন ধরে সাহারা দক্ষিণ আফ্রিকা (Sub Saharan Aftica) ভারত ও চীনসহ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে সাধারণ মানুষের জীবন-যাত্রা, বিশেষত দারিদ্র্য ও ক্ষুধা নিয়ে যে অতি মূল্যবান গবেষণা করেছেন, তাতেই প্রমাণিত যে সক্ষমতা কোন কাগুজে অধিকার নয়। আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার সঙ্গে তার নাড়ীর যোগ আছে।

অর্থনীতির দিক থেকে অমর্ত্য যাকে সক্ষমতা বলেছেন, যেমন তাঁর পঞ্চাশের মন্বন্তরের বিশ্লেষণে দেখা যায় দেশে খাদ্য শস্যের যোগানে তেমন বড়ো মাপের ঘাটতি না থাকলেও প্রথমতঃ সরকারি বণ্টন ব্যবস্থার বিপর্যয় দ্বিতীয়তঃ সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বিপুল ঘাটতি, আর তৃতীয়তঃ বাঁচার অধিকার সম্পর্কে চেতনার অভাব ৩০ লক্ষ মানুষের মৃত্যু ঘটিয়ে ছিল। তিনি এটাও দেখিয়েছেন খাদ্যশস্যের বণ্টনে সরকারি ব্যবস্থার অতিকেন্দ্রিকতা

বিপর্যয় সৃষ্টি করে পঞ্চাশের দশকে চীনে বহু মানুষের মৃত্যু সেটাই প্রমাণ করে। অমর্ত্য নির্দেশিত এই সব কারণগুলির মধ্যে প্রথমটি রাজনৈতিক ব্যবস্থাগত, দ্বিতীয় ও তৃতীয়টি যথাক্রমে আর্থ-সামাজিক ও সামাজিক সাংস্কৃতিক চেতনাগত বিষয়।

রাজনৈতিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে অমর্ত্য সেন সুস্পষ্ট ভাবে monolithic polity-র বিরোধিতা করেছেন। একশিলা রাজনৈতিক ব্যবস্থা যে অনিবার্য ভাবে ব্যাপকতম ভিত্তিতে আমলাতন্ত্রের জন্ম দেয়, দশ বছর আগে বিদ্যমান সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় সেটা প্রমাণ করেছে। একশিলা রাজনৈতিক ব্যবস্থায় যে তার কোন প্রতিকার সম্ভব নয়, চীনের সাম্প্রতিক সামাজিক রাজনৈতিক চিত্রেও তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে প্রচুর। বিদেশী পত্র পত্রিকায় চীনে ভয়াবহ দুর্নীতির, মূল্যবোধহীনতার যে সব তথ্য পাওয়া যাচ্ছে, সরকার বহু মৃত্যুদণ্ড দিয়েও যার সমাধান করতে পারছেন না, তার থেকে বোঝা যায় একশিলা রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে উদ্ভূত দুর্নীতির সহজ নিরাময়ের পথ নেই। অমর্ত্য সেনের প্রাসঙ্গিক বক্তব্য এ বিষয়ে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। এক বক্তৃতায় তিনি সম্প্রতি মন্তব্য করেছেন ভারতীয় অর্থনীতি চীনা মডেল থেকে অবশ্যই অনুসরণ যোগ্য কিছু হদিশ পেতে পারে, কিন্তু চীনের রাজনৈতিক ব্যবস্থার মডেল নৈব নৈব চ। একশিলা রাজনৈতিক ব্যবস্থা, তা সে প্রাক্তন সোভিয়েত কিম্বা বর্তমান চীন যাই হোক না কেন, ভারতের অনুসরনীয় নয়।

অমর্ত্য সেন সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন শুধু ভারত নয়, দারিদ্র্যক্লিষ্ট, ক্ষুধা ও বঞ্চনা পীড়িত তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলিতে গণতন্ত্রের কোন বিকল্প নেই। এবং এই গণতন্ত্র অমর্ত্য সেনের বক্তব্য অনুযায়ী হতে হবে political plurality, রাজনৈতিক বহুত্ববাদী ব্যবস্থা। কারণ নানা মতের দ্বন্দ্ব সংঘাত যেমন হবে কর্মসূচি নিয়ে, তেমনই হবে মতাদর্শ নিয়ে। লক্ষনীয় ভারতসহ তৃতীয় দুনিয়ায় অমর্ত্য মানুষের সক্ষমতার ধারণাকে এই রাজনৈতিক বহুত্ববাদের কাঠামোর মধ্যে বাস্তবায়িত করার কথা বলেছেন। যেমন দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় স্বাধীনতা উত্তরকালে ভারতে বড়ো মাপের কোন দুর্ভিক্ষ হয়নি, তার অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে রাজনৈতিক বিরোধী পক্ষের অবদানের কথা বলেছেন। সরকারের উপর নজরদারি নিয়ত বজায় রাখা এই বিরোধী পক্ষের কাজ, যারা সরকারি যে কোন বক্তব্যকে নিজেদের গণভিত্তি,

গণসংযোগের ভিত্তিতে ক্রমাগত যাচাই করে তার সত্যাসত্য নির্ণয় করতে পারেন। গণমুখী কোন কল্যাণধর্মী সামাজিক কর্মসূচি সফল করতে রাজনৈতিক বহুত্ববাদের কোন বিকল্প আছে বলে অমর্ত্য মনে করেন না।

শান্তিনিকেতনে পৌঁছানোর দিনেই এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি radical left বলে নিজেকে মনে করেন কিনা অথবা তাঁকে এইভাবে তুলে ধরা হলে তিনি কি বলবেন জিজ্ঞাসা করা হলে, অমর্ত্য সেন পাল্টা প্রশ্ন করেন radical left বলতে যদি কোন বিশেষ মতাদর্শের প্রতি প্রশ্নহীন আনুগত্য বোঝায় তাহলে তাঁর বক্তব্য স্পষ্টতঃ না। কিন্তু radical left বলতে যদি বোঝায় ভারতের মতো দেশে জনজীবনের দারিদ্র্য, বঞ্চনা, পীড়ন দূর করতে বিস্তৃত, অর্থবহ কর্মসূচী তাহলে তাঁর এই নামে আপত্তি নেই। কোন মতাদর্শের প্রতি প্রশ্নহীন আনুগত্য নয়, মানুষের জীবনযাত্রার দিকে লক্ষ্য রেখে ক্রমাগত কর্মসূচীর, ধ্যান-ধারণার পরিবর্তন ঘটানোর মতো মানসিকতাই তাঁর কাঙ্খিত। অমর্ত্য প্রায় এক নিঃশ্বাসে বলেছেন তিনি বিশ্বাস করেন tolerant polity-তে, যেখানে মতের কেবল আদান-প্রদান নয়, সংযোগও হবে এক ব্যাপক সহনশীলতার পরিমণ্ডলে, মানুষ সব জেনে সব বুঝে সকলের স্বার্থে একটা সার্বিক কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারবে।

অমর্ত্য নিজেকে liberal democrat বলেছেন। কিন্তু তাঁর liberalism ক্লাসিকাল উদারনীতিবাদ নয়। কারণ সেই উদারনীতিবাদ পুঁজিবাদী অসম সমাজব্যবস্থার জন্মদাতা। তাঁর উদারনীতিবাদ রাজনীতিতে পরমত সহিষ্ণুতার কথা বলে। বহুদিকের অভিজ্ঞতা, বিচার বিশ্লেষণের আলোয়, পরিবেশ পরিস্থিতি অনুযায়ী সঠিক ও কার্যকর পথ ও পদ্ধতি গ্রহণের কথা বলে। কেবল নিজের মতের, কর্মসূচির অভ্রান্ত তাকে অবিচলভাবে আঁকড়ে থাকে না। দুনিয়ার নানা দেশ জনজীবনের দুর্বিষহ সমস্যা সমাধানে ঠেকে শিখে যে কর্মসূচি নিয়েছে, ভারতসহ তৃতীয় দুনিয়ার অধিকাংশ দেশ সেটা অনুসরণ করতে পারে। এটা খোলা মনের, যুক্তিবাদী বিচারের কথা যা কোন কিছুকে 'পন্থীর ভূত' বলে গিয়ে বাতিল করতে চায় না।

অমর্ত্যর উদারনীতিবাদ যে পুঁজিবাদের বিপরীত মেরুর ব্যাপার, সামাজিক চয়নে সক্ষমতার কথা বলে তিনি সেটাও বুঝিয়ে দিয়েছেন। মার্ক্সের একালে প্রাসঙ্গিকতা আলোচনায় অমর্ত্য স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন সমাজের অর্থ-

নৈতিক বনিয়াদ সমতা ভিত্তিক না হলে, তার রাজনৈতিক কাঠামো বহুত্ববাদী, গণতান্ত্রিক হয় না। এটাও সেই মার্ক্সীয় base-superstructure সম্পর্কের ধারণা। তৃতীয় দুনিয়ায় তার প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে অন্ততঃ তাঁর কোন সংশয় নেই। তবে এই superstructure বলতে তিনি ফলিত সমাজতন্ত্রের রাষ্ট্র ব্যবস্থা যে বোঝাতে চান নি, সেটা যে কোন একশিলা ব্যবস্থা নয়, অমর্ত্যর চীনের রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে মন্তব্যে সেটা খুবই স্পষ্ট। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, অর্থনৈতিক সমতা প্রতিষ্ঠিত না হলে কোন সমাজে নিম্নবর্গের সক্ষমতা সৃষ্টি হয় না। অমর্ত্য অর্থনীতির ভাষায় যাকে Capability বা সক্ষমতা বলেছেন, রাজনীতির পরিভাষায় তারই নাম empowerment, মানুষের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়া। মানুষ যেখানে নিজের ক্ষমতা অনুভব করে, নিজের প্রয়োজনে তার ব্যবহার করতে চায় এবং পারে সেই ব্যবস্থাই প্রকৃত গণতন্ত্র। বলা বাহুল্য এই ব্যবস্থা শুধু ভোটের রাজনীতি নয়, আবার ভোটের রাজনীতি বিরোধী কোন মতাদর্শের প্রতি অন্ধ আনুগত্য নয়।

রাজনৈতিক ব্যবস্থা অর্থাৎ superstructure কেমন হবে, সে বিষয়ে অমর্ত্য সরাসরি মার্ক্সের humun emancipation এর কথা বলেছেন। সম সমাজের লক্ষ্য হবে, তার সর্বাঙ্গীন প্রস্তুতি থাকবে মানবমুক্তির পরিবেশ, পরিমণ্ডল গড়ে তোলার দিকে। মার্ক্সের মতে মানবমুক্তি ঘটলে মানুষ আর আত্মকেন্দ্রিক, আত্মসুখপরায়ণ, স্বার্থপর থাকতে পারে না। কারণ মুক্তির ধারণা একান্তভাবে সামাজিক। বস্তুতঃ রাষ্ট্রতন্ত্রে, অধিকার, সাম্য, স্বাধীনতা মুক্তি ইত্যাদি সেই সামাজিক ব্যবস্থাগত বিষয়, যা রাজনীতির আধারে রূপায়িত হতে থাকলে সমস্ত সংকীর্ণতা পরিহার করে প্রকৃত সামাজিক হয়ে ওঠে। তখন ব্যক্তির মতামত সামাজিক স্বার্থের সঙ্গে কোন মৌল দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে না। অমর্ত্য সেনের সামাজিক চয়ন তত্ত্ব সেই মানব-মুক্তির দিকে বলিষ্ঠ এক পদক্ষেপ।

বলা বাহুল্য সেই সামাজিক চয়ন সমাজের চলতি কাঠামোর মধ্যে আসতে পারেনা। আবার তাকে জোর জবরদস্তি করেও আনা যায় না। সামাজিক বাস্তবতার নিরিখে তার কর্মসূচি নির্ধারণ করতে হবে। ভারতের মতো পিছিয়ে থাকা দেশে তার প্রথম কাজ তাই নিরক্ষরতা দূরীকরণ, সার্বিক শিক্ষা, সার্বিক স্বাস্থ্য, সামাজিক পরিষেবা সুনিশ্চিত করা। সেকাজে

যেমন রাষ্ট্রকে উদ্যোগ নিতে হবে তেমনই স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলির সাহায্যও নিতে হবে। সংবিধান প্রদত্ত অধিকারগুলি এদেশে যে কাগজে অধিকার হয়ে আছে অধিকাংশ মানুষের জীবনে তা দূর করার জন্যে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার কথা বলেছেন। এখানে রাষ্ট্রের ভূমিকার অগ্রগণ্যতা আছে বোঝাতে প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় হ্রাসের কথা বলেছেন, বিরোধিতা করেছেন সরকারের দেশকে পারমানবিক শক্তিধর দেশে পরিণত করার নীতির। এই সব কোন কথাই সংগোপনে স্বগতোক্তির মতো বলা নয়। বেশ মুক্তকণ্ঠে বলা। সেখানেই অমর্ত্য মনে করেন রাজনৈতিক বামপন্থা যখন সামাজিক সক্ষমতা সৃষ্টির জন্যে শ্রেণীহীন সমাজের কথা বলে, তার জন্যে সংগ্রাম করতে চায়, তখন তৃতীয় দুনিয়ার সামাজিক প্রেক্ষিতে তার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে কোন প্রশ্ন থাকতে পারে না। কারণ এই সামাজিক স্থিতাবস্থা বজায় রেখে মানুষের সক্ষমতা বৃদ্ধি, সামাজিক চয়ন সম্ভব হবে না।

অমর্ত্য সেন স্পষ্টতই বলেছেন ভারতে সামাজিক সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ সফল করতে গেলে মানবিক অগ্রগতির জন্যে সামাজিক কর্মসূচি নিতে হবে, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের সুরক্ষা, লিঙ্গগত বৈষম্য থেকে সব রকমের বৈষম্য দূর করা যার গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হবে। বলা বাহুল্য পশ্চিমী দেশগুলিতে ওয়েলফেয়ার ষ্টেটের কর্মসূচির আদলে তার সবটা রচনা করা অর্থহীন। তৃতীয় দুনিয়ায় ওয়েলফেয়ারের সংজ্ঞা, ধারণা আলাদা। যেখানে সমাজে গোড়ার কাজ অসমাপ্ত রয়ে গেছে, সামাজিক স্থিতাবস্থায় আবদ্ধ হয়ে থেকেছে উন্নয়নের সর্বনিম্ন ধারণা, সেখানে সে কাজ গোড়া থেকেই করতে হবে। সমসমাজ গড়ার কাজ তার পরবর্তী ধাপ। সেই সমসমাজ গড়ার কাজ কবে, কেমন ভাবে সুরু হবে সেটাও নির্ভর করবে মানুষের সামগ্রিক চেতনা বিকশিত হওয়ার মধ্য দিয়ে।

অমর্ত্য বলেছেন সেটা এক রাজনৈতিক প্রক্রিয়া। তার রীতি পদ্ধতি স্থির করবেন রাজনীতিকরা। তিনি সরাসরি কোন দলীয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত নন, থাকতে চানও না। আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার বিশ্লেষণ থেকে সমস্যার স্বরূপ বোঝা ও বলাটাই তাঁর কাজ। তাকে রূপ দেওয়ার কাজ রাজনীতিকদের। কিন্তু এরই মধ্য দিয়ে অমর্ত্য সেনের রাজনৈতিক অবস্থানের স্পষ্ট একটা রূপরেখা পাওয়া যায়। মানুষের মুক্তি সম্ভব করার জন্যে অর্থনৈতিক

রূপান্তরের কর্মসূচিতে তাঁর আস্থা আছে। তবে তার রীতি প্রকরণে উপর থেকে অভ্রান্ততার শিকলে বাঁধা কোন ইজমের ছক্ চাপিয়ে দেওয়ার দরকার নেই। রূপায়নযোগ্য কোন লক্ষ্যমাত্রা সামনে থাকলে মানুষ তার অগ্রগতির পথ নিজেই খুঁজে নেবে বহুজনের মিলিত উদ্যোগে। তখন চেতনার যে স্ফুরণ ঘটবে সেটাই হবে তাদের আগামী দিনে এগিয়ে যাওয়ার উপকরণ। রাজনীতির জন্যে মানুষ নয়, মানুষের জন্যেই রাজনীতি। আর সেই পথেই ঘটবে মানব মুক্তি, এক শোষণহীন স্বশাসনের সামাজিক পরিমণ্ডল। অমর্ত্য সেনের রাজনৈতিক অবস্থান সেই পথের ইঙ্গিত দেয়।

সাইকেল তুমি কোথায়

(অমর্ত্য সেনের জন্য)

তুষার চট্টোপাধ্যায়

সাইকেল তুমি কোথায় ?
সময়ের অন্যমনস্কতায়
দূরে দাঁড়িয়ে দ্বিধা নখ খুঁটছে মুখে
আমি চোখ বুজলে দেখতে পাই
একটি মসৃণ সাইকেলের সৌজন্য
যার পেছনে ছুটে চলেছে
মা হারা পাঠভবনের রুকোর শৈশব।

ইন্টারনেটের শুভ্রতায় বার্তা বিনিময় করে
কফিহাউস আর পৌষমেলার মাঠ
কম্পিউটারে অস্থির হয় উত্তর আধুনিকতার বিনির্মাণ
আর উত্তর উপনিবেশের আলাপাচার।

সাইকেলের চাকা জরিপ করে
মাঠ-ঘাট ভাঙাচোরা মুখ
সনাক্তবিহীন আর্তনাদ খুঁজে পায়
রথের রশি আর বাউলের আলখাল্লা
স্বেচ্ছাচারী সাইকেলের চাকায় ঘোরে গ্যালিলিওর পৃথিবী
শীতল পাটির মাতৃস্নেহে
প্রশান্ত হয় রক্তকরবীর লাল আর বেলফুলের শুভ্রতা

সনাক্তবিহীন মাতৃহারা
হাজার রাকার দুঃখ আজো
শৈশবের সাইকেলের দিকে হাত বাড়িয়ে
সাইকেল তুমি কোথায় ?

ফেদেরিকো গার্সিয়া লোরকা

পাবলো নেরুদা

[স্পেনের মৃত্যুঞ্জিৎ কবি ফেদেরিকো গার্সিয়া লোরকা-র জন্মশতক এবার। চিলির মহান কবি পাবলো নেরুদা তাঁর আত্মজীবনীতে লোরকা-র সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকার নিয়ে যা লিখেছিলেন, সেই অংশটির অনুবাদ এখানে প্রকাশ করা হল।]

১৯৩২-এ চিলিতে ফিরে এলাম। আমার দুটি বই 'উজ্জ্বল শিকারী' ও 'পৃথিবীর বাসিন্দা' প্রকাশিত হল।

১৯৩৬-এ বুয়েনস্ এয়ার্স-এ বাণিজ্য দূত নিযুক্ত হলাম এবং সেখানে পৌঁছলাম আগস্ট মাসে। ফেদেরিকো গার্সিয়া লোরকা প্রায় একই সময়ে সেখানে তাঁর শোনিত পরিণয়' নাটকটির অভিনয় দেখতে এলেন। নাটকটি মঞ্চস্থ করছিলেন লোলামেমব্রিভ্-এর দল। সেখানেই ফেদোরিকোর সঙ্গে আমার আলাপ। বন্ধু-বান্ধব আর সাহিত্যিকরা প্রায়ই আমাদের দু'জনকে তাঁদের খানাপিনার আসরে নিমন্ত্রণ জানাতেন। অবশ্য আমাদের দু'জনের বদনাম করা লোকেরও অভাব ছিল না। সেবার প্লাজা হোটেলে পি, ই. এন ক্লাব আমাদের জন্য এক নৈশভোজের আয়োজন করেছিলেন।

...আমরা দু'জন সেই ভোজসভার জন্য একটি বক্তৃতার খশড়া করেছিলাম নাম দিয়েছিলাম 'স্যাল স্যালিম্যোঁন'। আপনাদের মত আমিও কথাটির অর্থ বুঝিনি। কিন্তু ফেদেরিকোর উর্বর মাথায় সব সময়ই কল্পনার চমক খেলত। সে আমাকে বুঝিয়েছিল—যখন একজোড়া বুল ফাইটার একসঙ্গে দুটো ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের সঙ্গে লড়াই করে যারা হয়তো সহোদর বা রক্তের নিবিড় সম্পর্কে বাঁধা, তখন এই বুল ফাইটিংকে বলা হয় অ্যাল অ্যালিম্যোঁন। ভোজসভায় পেশ করার জন্য তাই এহেন ভাষণ তৈরি করা হল।

সে রাতের আসরে আমরা তাই করেছিলাম। আমাদের দুজন ছাড়া এই পরিকল্পনার খবর আর কেউ জানতেন না। নৈশাহারের শেষে পি. ই. এন এর সভাপতিকে ধন্যবাদ জানাতে আমরা একসঙ্গে উঠে দাঁড়ালাম আর বুল ফাইটারদের মতই একসঙ্গে বলা শুরু করলাম।

বক্তৃতার বিষয় ছিল ঃ স্প্যানিশ কবি রুবেন দারিও। রুবেন কবিও

স্প্যানিশ সাহিত্যের এক প্রবীণ স্রষ্টা। অন্তত আমাদের দু'জনের মত হচ্ছে তাই। আমাদের ভাষণটি ছিল এরকম—

নেরুদা ঃ ভদ্রমহিলারা—

লোরকা ঃ ভদ্রমহোদয়গণ, বুল ফাইটিং-এ এক ধরণের লড়াই আছে যার নাম 'বুল ফাইটিং স্যাল স্যালিম্যোন'। এই লড়াইতে দু'জন ম্যাটাডোর একটা লাল কম্বল নিয়ে একটি ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের সঙ্গে লড়ে সেটিকে হারিয়ে দেন।

নেরুদা ঃ একটি বিদ্যুৎ বন্ধনে যুক্ত আমি ও ফেদেরিকো দু'জন একসঙ্গে এই সম্মানের জন্য আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

লোরকা ঃ এরকম সভায় এটাই রীতি যে, কবি তাঁর নিজের ভাষায় কথা বলবেন—যে ভাষায় রুপোলি ঝিলিক বা কঠোরতা যা-ই থাকুক কেন, সেই ভাষাতেই তিনি সঙ্গী সাথীদের প্রতি সম্ভাষণ জানাবেন।

নেরুদা ঃ আজ আমরা আপনাদের সঙ্গী হিসেবে নিয়ে আসছি একজন মৃত ব্যক্তিকে। এক জাঁকালো সময়ে যে ঝলমলে জীবন ছিল তাঁর ভাষা সেই জীবনের কাছে তিনি আজ মৃত।

অনেক মৃত্যুর মধ্যে একটি মরণ এসে গোপন অন্ধকারে সরিয়ে নিয়েছিল তাঁকে। আমরা তাঁর প্রজ্জ্বল ছায়ার মাঝখানে দাঁড়াব; তাঁর নাম ধরে ডাকতে থাকব, যতক্ষণ না ঐ শূন্য থেকে লাফিয়ে এসে তাঁর শক্তি আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায়।

লোরকা ঃ প্রথমে একটি পেঙ্গুইন পাখির মতই কোমল ও দরদী সঙ্কেতিক আলিঙ্গন জানাচ্ছি আমাদের নিদারুণ, অব্যর্থ কবি আমাদো ভীলার'-কে। এর পর আমরা এমন একটি নাম ধরে ডাকতে চাই তাঁকে, যা শুনে টেবিলে রাখা মদের গ্লাসগুলি কেঁপে উঠবে, কাঁটাচামচগুলি ছুটে যাবে ক্ষুধার্ত দৃষ্টির সামনে আর সাগরের জোয়ার টেবিলের ঢাকনা ভিজিয়ে দিয়ে যাবে। সেই নামটি হচ্ছে স্পেন তথা আমেরিকার কবি রুবেন—

নেরুদা ঃ দারিও। কারণ ভদ্রমহিলারা…

লোরকা ঃ এবং ভদ্রমহোদয়গণ…

নেরুদা ঃ এই বুয়েনস্ এয়ার্স্-এ কোথাও কি আছে রুবেনদারিওর নামে একটি রাস্তা –

লোরকা ঃ কোথাও কি আছে রুবেনদারিওর একটি পাথুরে মূর্তি—

নেরুদা ঃ রুবেন বাগান ভালোবাসতেন, কোথাও কি আছে তাঁর নামে একটি উদ্যান…

লোরকা ঃ কোনও ফুলওয়ালি কি তার দোকানে রুবেনদারিও গোলাপ সাজিয়ে রাখে…

নেরুদা ঃ কোথাও আছে কি রুবেনদারিও আপেল নামে গাছ ? কোথাও কি বিক্রি হয় 'রুবেনদারিও আপেল'

লোরকা ঃ কোথাও কি আছে রুবেনের করতলের ছাপ…

নেরুদা ঃ আপনারা বলুন, কোথায়, কোথায় ?

লোরকা ঃ রুবেনদারিও ঘুমিয়ে আছেন নিকারাগুয়ায়। প্লাস্টারে বানানো এক সিংহের মূর্তির তলায় মর্মরখচিত সেরকম সিংহমূর্তি অনেক বড়লোকের প্রাসাদের সিংদরজায় শোভা পায়।

নেরুদা ঃ সিংহের জনক হয়েও হায় তাঁর কপালে জুটল কিনা হুকুম-মাফিক বানানো প্লাস্টারে তৈরি এক সিংহ মূর্তি। যিনি সমস্ত মানুষকে উৎসর্গ করলেন তারার সাম্রাজ্য, তাঁর নামে একটি তারাকেও চিহ্নিত করলেন না কেউ।

লোরকা ঃ তাঁর এক একটি শব্দের মধ্যে আছে অরণ্যের ধ্বনি। তাঁর শব্দের রাজ্য নির্মাণ করত লেবুর নীলাভ পাতার মত এক গ্রহলোক, তৈরি করত ত্রস্ত হরিণীর পলাতক ছন্দ বা শম্বুকের ভয়ার্ত শূন্যতা। রুবেনদারিওর দৃষ্টি নিয়ে সাগরের জোয়ারে আমরা ধাবমান রণতরীতে ছুটেছি। দুপুরের ধূসর আকাশকে বন্দী করার জন্য তিনি সৃষ্টি করেছিলেন গড়ের মাঠের মত বিরাট বিরাট শব্দের ফাঁদ। বসন্ত বাতাসকে তিনি ডাকতেন নিবিড় বন্ধুতার ভরা বুক দিয়ে। তিনি হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন ঐতিহাসিক করিন্থিয়ান সাম্রাজ্যের স্তম্ভে—যেখানে সময় সম্পর্কে ছিল তাঁর সন্দেহ, বিদ্রূপে মেশানো করুণা।

নেরুদা : তাঁর উজ্জ্বল নাম যেন তাঁর জীবনের সবটুকু সুঘ্রাণ বহন করে থাকে, ধারণ করে তাঁর হৃদয়বেদনা, উদীয়মান ভাস্বরতা, নরকের দ্বিতীয় সিঁড়িতে তার পদপাত, যশের সাম্রাজ্যের শীর্ষে আরোহন—অপ্রতিদ্বন্দ্বী এবং অনন্য কবি হিসেবে তিনি নতুন ভাবে জীবন্ত হয়ে উঠুন।

লোরকা : তিনি তাঁর সময়ের অগ্রজ ও সবুজ সব কবিকেই তাঁর নিজের ভঙ্গিতে লিখতে শিখিয়েছিলেন এমন ভাবে, যা আর কোনও কবিই শেখাতে পারেন নি। ভালো ইনকাম হয়নি ও হয়নি রামোন হিসেবেই—সবাই তাঁর ছাত্র ছিলেন, এমনকি মাচা ভাইয়েরা রুবেনদারিওর লেখায় ছিল জল আর রাসায়নিক সামগ্রী যা বই পুরোনো ভাষার পেট থেকে বেরিয়ে আসত। কি তাঁর আগে স্প্যানিশ ভাষার এত রং। স্ফুলিঙ্গ এর রূপ আর কেউ দেখেনি। রুবেনদারিও নিজের জমির মতই গোটা স্পেনদেশটাকে জরিপ করেছিলেন।

নেরুদা : তারপর একটি সমুদ্রের উত্তরে জোয়ার তাঁকে ছুঁড়ে ফেলল চিলির উপকূলে। তাঁকে রেখে এল সেখানে। রুবেনদারিও সেই জায়গায় পড়ে রইলেন পাথরের মত। সমুদ্রের নোনতা ফেনা এসে বারবার তাঁকে ধুয়ে দিল। ভালপারাইসো-র কালো ধোঁয়ায় ভরা বাতাস তাঁকে শুনিয়ে গেল লবণ সাগরের গাথা।—আসুন আজ রাতে হাওয়া দিয়ে তাঁর বিগ্রহ গড়ি, তারপর সেই ধোঁয়া, স্বর আর পরিবেশ দিয়ে ঐ বিগ্রহের প্রাণসঞ্চার করি, যে প্রাণ ধারণ করবে তাঁর কবিতা আর সীমাহীন স্বপ্নকে।

লোরকা : আমি কিন্তু হাওয়ায় গড়া এই মূর্তির শরীরে রক্তিম প্রবালের মত শোণিত ধমনী বসাতে চাই। একটা ছবিতে ঝলসে ওঠা বিদ্যুৎ রেখার মত দিতে চাই স্নায়ু। দিতে চাই বৃষল মাথা যার মুখে থাকবে তুষারের অল্পক। তাঁর অদৃশ্য চক্ষু চোখের গভীরে ভরে দিতে চাই ব্যর্থ মনোরম এক ধনকুবেরের কয়েক ফোঁটা চোখের জল। ফাঁকা মাঠে ছুটে চলা বাঁশির সুর। সুরাপ্রেমের নমুনা হিসেবে কনিয়াক মদের বোতলের

মিছিল। স্বাদের আকর্ষনীয় অনুপস্থিতি আর শব্দের ঠাট ঠমক যা তাঁর কবিতাকে মানুষের খুব কাছে নিয়ে এসেছিল। তাঁর এই উর্বরসফলতা কোনও নিয়ম, কোনও রীতি মাফিক লেখাপড়ার দাসত্ব করেনি।

নেরুদা ঃ ফেদেরিকো গার্সিয়া লোরকা হচ্ছেন একজন স্প্যানিশ আর আমি চিলির লোক। আজ আমরা একজোটে এসেছি এমন একজনের ছায়াকে সম্মান জানাতে যিনি আমাদের চাইতে অনেক মহিমান্বিত গান শুনিয়েছেন সবাইকে, যিনি তাঁর তুলনারহিত স্বর দিয়ে অভিবাদন জানিয়েছেন আর্জেণ্টিনার মাটিকে, যে মাটির ওপর আজ আমরা দাঁড়িয়ে।

লোরকা ঃ পাবলো নেরুদা একজন চিলিয়ান আর আমি এক স্প্যানিয়ার্ড। সেই নিকারাগুয়া—আর্জেণ্টিনা চিলি আর স্বপ্নভুক কবি রুবেনদারিওকে—

উভয়ে ঃ সসম্মানে স্মরণ করছি আর এই গ্লাস তুলে তাঁর গৌরবে আজ আমাদের দুজনকে মণ্ডিত করার জন্য আপনাদের সবাইকে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাচ্ছি।

সভা ভেঙে যাওয়ার পর আমরা নীরবে যে যার পথে রওনা হলাম।

অনুবাদ ঃ অমিতাভ দাশগুপ্ত

লোয়েকা-র দুটি কবিতা

ঊষর দেশ

নিঃশব্দ দেশ
অন্তহীন
রাত্রির।
(জলপাই বনে বাতাসে
বাতাস পাহাড়ে পাহাড়ে)।
এ দেশ
প্রাচীন
পিদিমের
আর দুঃখের।
এ দেশ
গভীর ইঁদারার।
এ দেশ
মৃত্যুর, চক্ষুহীন মৃত্যুর। ॥ অনুবাদ : বিষ্ণু দে ॥

সাগর জলের গান

দূরে হেসে চলে সমুদ্র।
সফেন দশন, ওষ্ঠে ইন্দ্রপ্রস্থের কপাট।
'অ দুঃখী মেয়ে, খোলা বুকে কি বিকিকিনি করতে যাচ্ছো তুমি ?'
'মশায়, সমুদ্রের জল ফিরি করি।'
'অ আঁধার-যুবক,
তোমার রক্তে কী বয়ে নিয়ে চলেছো ?'
'মশায়, সমুদ্রের জল।'
'মা, কোত্থেকে আসে এত নোনতা চোখের জল ?'
'মশায়, সমুদ্রের জল আমার কান্নার ভাঁড়ার।'
'হৃদয়, কোন পাতাল থেকে উঠে এল এই সুগম্ভীর রিক্ততা ?'
'সমুদ্রের জল বড় তেতো মশায়।"

দূরে হাসিতে হয়লাপ সাগর।
সফেন দশন, ওষ্ঠে ইন্দ্রপ্রস্থের কপাট।

অনুবাদ : অমিতাভ দাশগুপ্ত।

কমিউনিস্ট আন্দোলনে জোয়ার-ভাটা

অমলেন্দু সেনগুপ্ত আগে 'উত্তাল চল্লিশ' নামে একটি বই লিখেছিলেন। তাতে চল্লিশের দশকে বৃহৎ বঙ্গে কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিবরণ দেওয়া হয়েছিল। 'উত্তাল চল্লিশ' সমাদৃত হয়; বইটি এখন প্রায় দুষ্প্রাপ্য। আলোচ্য গ্রন্থে বিবরণ আবার শুরু হয়েছে ১৯৬২-তে। শেষ হয়েছে ১৯৭৭এ। এই সময় সীমার আগে এবং পরে ঘটনাবলির উল্লেখ নেই। উল্লেখ সামান্য ভাবে থাকলে বোধ হয় ভাল হ'ত।

আখ্যায় 'জোয়ার ভাটা' শব্দ দুইটি অর্থবহ। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে নেতৃত্বের দ্বারা সৃষ্ট এক ধরনের বিচিত্র জোয়ার ভাটা লক্ষ্য করা যায়। কমিউনিস্ট আন্দোলনের জোয়ার ভাটার কার্যকারণ ছিল ভিন্ন ধরনের। তবে এ কথা বোধ হয় বলা যায় যে, ভারতীয় উপমহাদেশে নানা কারণে কোন আন্দোলনেই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত জোয়ার ছিল না। আন্দোলন শুরু হয়েছে, পরিব্যাপ্ত হয়েছে, আবার খুব একটা ফলপ্রসূ না হলেও থেমে গিয়েছে। অবশ্য বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এর ব্যতিক্রম।

কমিউনিস্ট আন্দোলনে কেন যে ভাটা পড়ে, আবার কেন যে জোয়ার আসে, তা এই বই পড়লে কিছুটা বোঝা যায়। ভারত-চিন যুদ্ধ শুরু হ'ল। ষাটের দশকের মধ্যভাগ থেকেই বঙ্গে কমিউনিজম দুর্বল ছিল। এই যুদ্ধের ফলে তার মেরুদণ্ড প্রায় ভেঙে গেল। পার্টি ভাগ হয়ে গেল। একটি দলে বেশ নাম করা বুদ্ধিজীবীদের প্রাধান্য ছিল; এই দলের লোকরাই প্রতিস্পর্ধী দলটিকে—বেশ মনে পড়ে—"আমোদ-প্রমোদের পার্টি" বলত। একটি বিখ্যাত, এবং এখন লুপ্তপ্রায় বইয়ের দোকানে বই কিনতে গিয়ে এই ধরনের কথা স্বকর্ণেই শুনেছি। অথচ দেখা গেল যে, শেষোক্ত দল, অথবা মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি বড় হচ্ছে; সতত সঙ্ক্রমান এই পার্টি বঙ্গে বামপন্থী আন্দোলনকে নেতৃত্ব দিচ্ছে। কিন্তু, আবার এল এক মারাত্মক বিভাজন। নকশালপন্থীরা আলাদা দল করলেন। এবং প্রচলিত ধারাটিকেই বর্জন করলেন। কমিউনিস্টগণ এবং অন্যান্য বামপন্থীগণ যখন নানাবিধ বিতর্কে, সংঘর্ষে, বিবাদে দিশেহারা, তখন দেখা গেল প্রতিক্রিয়ার দাপট, শাসনতান্ত্রিক ফ্যাসিবাদ, জরুরী অবস্থা। অবশেষে ১৯৭৭-এর সাধারণ নির্বাচনে সি, পি,

এর-এর নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গে বাম-ফ্রন্ট ক্ষমতা লাভ করল। বাম-ফ্রন্ট এখনও ক্ষমতায় আসীন থেকে বিশ্বরেকর্ড সৃষ্টি করেছে।

এই সমস্ত ঘটনার বিবরণ রচনা করেছেন অমলেন্দু সেনগুপ্ত। পাঁচটি পর্বে বিভক্ত এ বইতে মোটামুটি চল্লিশটি বিষয় আলোচিত হয়েছে ভারত-চিন সংঘর্ষের অভাবনীয় পরিণামস্বরূপ পার্টি-ভাগ। দ্বিতীয় পর্বে প্রাধান্য পেয়েছে শ্রমিক আন্দোলনের বিস্তার, এবং খাদ্য আন্দোলন। তৃতীয় পর্বে অধীত হয়েছে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠনের পটভূমি এবং নকশালবাদের সূত্রপাত। চতুর্থ পর্বে বিবৃত হয়েছে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের গঠনের ও পতনের ইতিহাস, ভূমিসংস্কার আন্দোলন, নকশালি কৃষি বিপ্লবের মহড়া, নানাবিধ অত্যাচার, হত্যাকাণ্ড, এবং কংগ্রেসের পুনরাগমন। পঞ্চম পর্বের বিষয়গুলোর মধ্যে আছে ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাস, গণহত্যার রাজনীতি, রেল-ধর্মঘট, জয়প্রকাশ নারায়ণের আন্দোলন, জরুরি অবস্থা, বিশ্রী ব্যবস্থা এবং ১৯৭৭-এর নির্বাচনে স্বৈরাচারের অবসান। লেখক এ সমস্ত কিছুই নিজে দেখেছেন ; এ হ'ল বাল্যকাল থেকে সাম্যবাদী এক লেখকের দৃষ্টিতে বঙ্গে সাম্যবাদের পতনোত্থানের বর্ণোজ্জ্বল চিত্রাবলি এবং প্রধানত তারজন্যই গ্রন্থটি আদরনীয়।

হয়তো এসব বিষয় সম্বন্ধে একাধিক খণ্ডে পাদটীকা-পরিশিষ্ট শোভিত বিশাল বই লেখা যেতে পারে। হয়তো তা লেখা হবে। কিন্তু ৩০৮ পৃষ্ঠার এই বাংলা বইটিও যে একটি আকরগ্রন্থ, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। লেখক বহু রকমের উৎস থেকে তথ্য এবং প্রমাণ আহরণ করেছেন, কথাও বলেছেন তিনি ৪৩জন ব্যক্তির সঙ্গে। তাঁদের মধ্যে অনেকেই খ্যাতনামা। অবশ্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁর তেমন কিছু কথা হয়নি। এখানে চারু মজুমদারের, সরোজ মুখোপাধ্যায়ের, বিনয় চৌধুরীর, জ্যোতি বসুর মুখের কথা নেই। তা নাই বা থাকল। যাঁদের কথা আছে, তাঁদের কোন কারণেই অবহেলা করা যায় না। এই সব সাক্ষাৎকার থেকে পাওয়া কথার জন্যও বইটি মূল্যবান। নিজের কথা, অথবা মনের কথা মাঝে মাঝে বেরিয়ে আসতে চাইলেও লেখক নানা রকমের প্রমাণ ব্যবহার করে তা যেন চেপে রেখেছেন। হয়তো নিজের কথা লেখাও দরকার ছিল। প্রমাণের প্রাধান্যের জন্য তা হয়ে ওঠেনি।

লেখকের ভাষা খুব সুন্দর। এখন যে বিচিত্র পরিভাষায় ইতিহাস লেখা

হয়, তা বুঝতে হ'লে এক ভিন্ন ধরনের সাক্ষরতা প্রয়োজনীয়। লেখককে বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ দিতে হয় এ জন্য যে, তিনি সচেতনভাবে সেই রকমের পরিভাষাকে বর্জন করেছেন। সুন্দর ভাষা, প্রয়াণ কবিদের সুন্দর সব কবিতার উদ্ধৃতির জন্য, একই সঙ্গে শোভাময় এবং সুরভিত।

যে সব ঘটনার বিবরণ এই বইতে আছে, তাতে কমিউনিস্টদের ভূমিকা বা অবস্থান সম্বন্ধে বুর্জোয়াদের তির্যক মন্তব্য এবং নাসিকাকুঞ্চন অদ্যাবধি প্রচলিত। কমিউনিস্টদের অপকর্মের জন্যই না কী বঙ্গ থেকে "মূলধন" বা পুঁজি মহারাষ্ট্রে, গুজরাটে, অন্ধ্রে, তামিলনাড়ুতে, কর্ণাটকে পালিয়ে চলে গিয়েছে। বুর্জোয়া পত্র-পত্রিকায় কখনও বামপন্থী সাম্যবাদী আন্দোলনের একটিও গঠনমূলক সিদ্ধান্ত, একটিও সদর্থক পরিণতি আলোচিত হয় না। অথচ, এই বইটি পড়ে এই মনে হয় যে, সদর্থক কর্মে ব্রতী হওয়ার জন্যই ১৯৭৭-এ বাম-জোট রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করে। আধুনিক পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে যেমন বিধানচন্দ্র রায়ের স্থান বিশিষ্ট, তেমন জ্যোতি বসুরও বিশিষ্ট স্থান।

পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্ট আন্দোলনে দুইটি চিন্তা ছিল ; এক, যা আছে তার মধ্যে থেকে লোকস্বার্থে দেশস্বার্থে কাজ করার চিন্তা ; দুই, যা আছে তা গুঁড়িয়ে দিয়ে, ভেঙে দিয়ে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটানর চিন্তা। দ্বিতীয় চিন্তাই ভাল-ভাল ছেলেমেয়েদের আকর্ষণ করেছিল। বহু অমূল্য প্রাণ নষ্ট হয়ে যায়। গণহত্যা হয়। তাতে এই দেখা গেল যে, অগণিত মানুষ যখন অন্ধকারে ডুবে আছে, তখন বজ্রানলে আপন পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে একলা চলা ফলপ্রসূ হয় না। মানুষকে আলোতে আনতে হলে শুধু ধ্বংস নয়, সৃষ্টিও দরকার। সৃষ্টি করা হয় ; নবনির্মাণ শুরু হয় ; যে চেতনা ছিল না, তা সৃষ্টি হয়, তীক্ষ্ণ হয়, পরিব্যাপ্ত হয়। হয়তো এইরূপ সদর্থক পরিবর্তনেও বেশ কিছু দুর্বলতা থেকে গিয়েছিল। তাতেও সুবিধাবাদীগণ এবং বস্তাগুন্ডা কখন কখন দুধের সর খেয়েছে। আখের গুছিয়েছে, নীল থেকে লাল হয়েছে। কিন্তু সৃষ্টি থেমে যায়নি ; নবনির্বাণ হয়নি, চেতনা অপসৃত হয়নি। সেই জন্যই তো এখনও প্রতিক্রিয়ার দালাল আর জোত-দাররা ভীষণভাবে সক্রিয়।

অমলেন্দু বাবুর বইটি পড়ে যা মনে হয়, তা লিখলাম। বইটির কয়েকটি ত্রুটি আছে। এখানে পটভূমি এবং পরিণতি অনালোচিত। এখানে অন্যান্য

বামপন্থী দল সম্বন্ধে প্রায় কোন তথ্যই নেই ; অথচ, তাদের বাদ দিয়ে তো পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থা বা বামজোট ফুলকুসুমিত হয়নি। এটি গুরুতর ত্রুটি। কথা না বলার ত্রুটি। কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতৃত্ব সম্বন্ধে একটিও কথা নেই। সুদীর্ঘ এই আন্দোলনে 'বাবু'দের প্রশ্নাতীত প্রাধান্য কী লেখকের আলোচ্য ছিল না? উত্তাল চল্লিশে হয়তো তা প্রয়োজনীয় ছিল অনিবার্য। ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর পরেও তা প্রয়োজনীয়, দুর্নিবার হয়ে থাকবে কেন? পরে কী মুটিয়ামজুর ক্ষেতচাষী জেলে কৈবর্ত পোদ বাগদি সাঁওতাল ভুই মালিদের মধ্যে এমন একজন সাচ্চা কমিউনিস্টকে খুঁজে পাওয়া গেল না, যিনি প্রাদেশিক স্তরে বা কেন্দ্র-স্তরে নেতা রূপে মান্যতা পেতে পারেন? সাম্যবাদী সাহিত্যে এঁদের বিশিষ্ট স্থান; কিন্তু উচ্চস্তরের নেতৃত্বে এঁদের স্থান নেই। অদ্যাবধি বাবুদেরই নেতৃত্ব। 'বাজারি' পত্র-পত্রিকার এই প্রশ্ন: বাবু কেন বাবু হয়ে থাকেন না? কী দরকার তাঁর সাম্যবাদী হওয়ার? বৃদ্ধ বয়সে জ্যোতি বাবুকেও সর্বদা এই প্রশ্নের মুখোমুখি হ'তে হয়। এই রকম অশেষ এবং অখণ্ড এক প্রশ্নের জবাব দেওয়া মুস্কিল হয়ে পড়েছে। তার একটা প্রধান কারণ, প্রচলিত নেতৃত্বের বিকল্প জোয়ার ভাটা থেকে উত্থিত হয়নি।

এই বিষয়টি হয়তো লেখক ভেবে থাকতে পারেন। কিন্তু তা তিনি ঘূণাক্ষরেও আলোচনা করেননি। আলোচনা করা দরকার।

—রমাকান্ত চক্রবর্তী

★ জোয়ার ভাটার ষাট-সত্তর—অমলেন্দু সেনগুপ্ত
পার্ল পাবলিশার্স, ১৫০.০০

একজন অবহেলিত অথচ মূল্যবান লেখক

আমাদের সমালোচকরা প্রায়ই ধরাবাঁধা এবং নিরাপদ পথ দিয়ে হাঁটেন। পত্রিকা, প্রকাশক অথবা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানই অনেক ক্ষেত্রে সাহিত্যিকের মূল্যায়নের মাপকাঠি। এরই ফাঁকে ফাঁকে হঠাৎই কোন কোন লিটল ম্যাগাজিনে চমকে দেওয়ার মতো উপন্যাস বা গল্প ছাপা হয়। কেউ কেউ পড়ে,

অনেকেই পড়ে না। অনেক কষ্টে কোন ছোট প্রকাশককে ধরে হয়তো বই বের করা যায়, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই লেখক নিজের পয়সায় বই ছাপেন। স্বাভাবিক ভাবেই এই সব বই বেশিরভাগ পাঠকেরই চোখ এড়িয়ে যায়। সমালোচকদের তো বটেই। সাহিত্যের সব শাখার ক্ষেত্রেই একথা সত্য। কথা সাহিত্যের ক্ষেত্রে তো বটেই। তাই অনেক পড়ার মতো বই-ই পড়া হয়ে ওঠে না। স্বীকার করতে লজ্জা নেই যে মাণিক চট্টরাজের গল্প-উপন্যাসের ক্ষেত্রেও আমার তাই ঘটেছে। বন্ধুবর পরমেশ আচার্য যদি মাণিকের তিনটি বই পড়ার সুযোগ না করে দিতেন তাহলে একটা অভিজ্ঞতা থেকে অবশ্যই বঞ্চিত হতাম।

তিনটি বইয়ের প্রথমটি হল গল্পের সংকলন 'সুখময়ের স্বপ্ন'। গল্প আছে চারটি ; সুখময়ের স্বপ্ন, হাবা ঠাকুরের বিয়ে, কিঙ্করের ফলার এবং পুরন্দর-পুরের ডাক্তার সাহেব। দ্বিতীয় বই 'গোপালের শিক্ষাদীক্ষা'ও গল্পের বই। এতেও চারটি গল্প পাওয়া যাবে। গোপালের শিক্ষাদীক্ষা, বে-নজীর, ভাই-রাস এবং কোলকাতার কোয়েল। তৃতীয়টি একটি ছোট উপন্যাস 'অভিমানী',। মাণিকের হয়তো আরো বই আছে, কিন্তু আপাতত তা হাতের কাছে নেই। তাই ওই বই কটি নিয়েই কয়েকটি কথা বলার চেষ্টা করা যাক। প্রথমেই উপন্যাসটির কথা। কারণ তিনটির মধ্যে এটি প্রকাশিত হয়েছে আগে (১৯৮৪)। সুখময়ের স্বপ্ন এবং গোপালের শিক্ষা-দীক্ষা যথাক্রমে ১৯৮৮ ও ১৯৯৫-এ। এদের পরে আর কোনো সংস্করণ হয়েছে বলে জানা নেই।

অভিমানী বাংলা উপন্যাসে অন্যতম ব্যতিক্রমী রচনা। তারাশঙ্করের হাঁসুলীবাঁক আর মাণিকের পটভূমি মনে হয় কাছাকাছি। তবে তারাশঙ্কর গোটা বইটি আঞ্চলিক উপভাষায় লেখেন নি। কেবল বাঁশবাদীর জঙ্গলে ঘেরা কাহারপাড়ার মানুষগুলির মুখে তাদের ভাষা বসিয়েছেন। মাণিক গোটা উপন্যাসটি লিখেছেন আঞ্চলিক উপভাষায়। কেবল প্রথম আড়াই পাতায় লেখকের নিজের ভাষায় বক্তব্য, তারপরেই অভিমানীর জবানবন্দী সুরু। তারপর থেকে গোটা উপন্যাসের চরিত্র ও ভাষা এক হয়ে গেছে। সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোঁড়াই চরিত মানসের' সঙ্গে এর অনেকটা মিল। তবে ঢোঁড়াই-এ উপন্যাসের ফাঁকে লেখকের নিজের ভাষাও ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু মাণিকের উপন্যাসের সবটাই অভিমানীর নিজের ভাষায় নিজের কথা। তারই ভাষায় তারই জীবনকাহিনী বলার জন্য, তা অনেক আন্তরিক হয়ে ওঠে,

পাঠকও তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়। পোস্ট-মর্ডানিস্টরা মনে করেন যে কবিতা বা গদ্য পড়ে জানবার জন্য লেখকের প্রয়োজন নেই, পাঠকই ওগুলো বিনির্মাণ করে পড়বে। প্রতিটি শব্দেরই কিছুটা আক্ষরিক অর্থ থাকে, আর কিছুটা থাকে লেখকের মনে। পরবর্তীকালে নতুন অর্থ খুঁজে নেওয়ার দায়িত্ব পাঠকের। অভিমানীর ব্যবহৃত অনেক শব্দ, প্রবাদ ও প্রবচন কেবল তার বেদনাটিই বুঝিয়ে দেয় না, আজকের পাঠকের কাছে তা নতুন তাৎপর্য নিয়ে আসে।

গোটা উপন্যাসটি দাঁড়িয়ে আছে একদিকে অভিমানী এবং অপরদিকে হাঁসা বাগদীর নিজেদের কথ্যভাষায় আত্মকাহিনী বর্ণনার উপর। এ কাহিনী চিরকালের 'নিভৃত গ্রাম্য ভারতবর্ষে'র ভয়াবহ বঞ্চনা আর দারিদ্র্যের কাহিনী। এর সবটাই হয়তো আমাদের জানা, কিন্তু জেনেও আমরা হয়তো না জানার ভাণ করি। অভিমানী যখন আক্ষেপ করে বলে, 'আমাদের যৌবন তো তালগাছের ছ্যা। সংসারের ঘসটানি লেগে আর কদিন তা টেকে বলো। শুন্য ধুনুচিটো পড়ে আচি—ধুয়ো-গন্ধ কিছুই নাই। তবু মুকপোড়াদের লজ্জা নাই, এই ধুনুচিতেই ধুনো দিতে আসে,' তখন বোঝাই যায় যে এই উপমা এবং বাগ্‌ভঙ্গি ছাড়া অন্য কিছুতেই তার যন্ত্রণা বোঝানো যেত না। আবার হাঁসা বাগদী যখন ফটিকবাবুর এম. এল. এ হওয়ার রহস্যটি এইভাবে ফাঁস করে দেয়, 'একেই বলে কপালের নাম গোপাল। বকতোড়ের ফটিক কায়েত মাগের কাপড় কাচত আর ধান সিজুইতো। আর পার্টী মিডিং-এ ডাকতে গেলেই বলত, 'আমার গোরুর দড়ি অজিয়েচে, আমার এখন যাবার যো নাই।' সে লোক শুধু বাঁড়ুজ্জে মশাই-এর ব্যোগ বইয়েই রেমেলে হয়ে গেলেন'— তখন বোঝাই যায় যে রাজনীতির আসল চেহারাটি এদের ঠিকই জানা আছে। এইসব চরিত্রগুলিকে তাদের পরিবেশ এবং ভাষা সহ মানিক অবিকৃতভাবে তুলে ধরেন। কেবল স্থানীয় ভাষাই নয়, লোকাচার, সংস্কৃতি, রীতিনীতি কোনো কিছুকেই নাগরিক আধুনিকতার ছাঁচে ঢালাই হতে দেন নি। বস্তুত এই ধরণের লেখকদের জনপ্রিয় না হওয়ার এইটেই সবচেয়ে বড়ো কারণ। যে কারণে মাটির গন্ধ গায়ে মাখা গ্রামীণ গায়কের লোকসঙ্গীতের বদলে সহরের কৃত্রিম নাগরিক উচ্চারণের ক্যাসেটের বাণিজ্যিক সাফল্য, সেই একই কারণে মাণিক চট্টরাজদের ব্যর্থতা।

স্বীকার করি বা না করি লেখার বিষয়কে এখন 'আমরা' আর 'ওরা' এই ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুভাগে ভাগ করা হয়। এই ভাবেই সমাজের উচ্চ-

বর্গ -নিম্নবর্গ, পুরুষ-নারী নাগরিক-গ্রামীণ মানুষ এদের ভেদাভেদ কল্পিত হয়ে থাকে। স্বভাবতই যাঁদের রচনায় এই 'ওরা' প্রাধান্য পায় তাঁরা কেবল এস-ট্যাবলিসমেন্ট-ই নয়, এলিটিস্ট লেখক এবং সমালোচকদের অবহেলার শিকার হন। বোধহয় এর মূলেও এক ধরনের কমপ্লেক্স কাজ করে। শুধু উপন্যাস-টির ক্ষেত্রেই নয়, ছোট গল্পের ক্ষেত্রেও মাণিক তাঁর নিজের পথ ধরেই চলেন। অনুরাগী পাঠক হিসেবে আমার এমনও মনে হয়েছে যে ছোটগল্পে তাঁর হাত অনেক পাকা। দুটি বইয়েই (সুখময়ের স্বপ্ন এবং গোপালের শিক্ষাদীক্ষা) অন্তত এমন কয়েকটি গল্প আছে যা রীতিমতো চমকে দেয়। বাংলা ছোট গল্পের ঐতিহ্যের সঙ্গে এগুলি সম্পূর্ণ খাপ খেয়ে যায়। যে লেখক কিংকরের ফলার, পুরন্দরপুরের ডায়ার সাহেব অথবা গোপালের শিক্ষা-দীক্ষার মতো গল্প লিখতে পারেন বাংলা ছোটগল্পের আলোচনায় তাঁর অনুপস্থিত থাকাটা রীতিমতো অন্যায়। 'কিংকরের ফলার' একটি অসাধারণ গল্প। 'ঘিলু পাতলা ছিটেল' কিংকরের জীবনের একমাত্র সাধ ভালোমন্দ খাওয়া। অথচ দারিদ্রের সংসারে একবেলার পান্তাভাত জোটানোই তো মুশকিল। স্ত্রী সোনামুখীকে এই আবুঝ স্বামীর সমস্ত ঝক্কি সামলাতে হয়। এমন কি, ঠাকুরের কাছেও কিংকরের একমাত্র প্রার্থনা, 'হে গবিন্দ, পরমানন্দ, ফলারে বসিয়ে দাও হে আনন্দ'। মোরকাঁদির বাবুদের বাড়িতে ফলারের এক নেমন্তন্ন সে জুটিয়ে ফেলে। কিন্ত খেতে বসে প্রবল ঝড়ে সে বাঁশ সমেত সামিয়ানা চাপা পড়ে। সেই অবস্থাতেও কিংকর কিন্তু পাতা ছাড়ে না। তারই মতো চাপাপড়া এক কুকুরের হাত থেকে মুখের লুচিটি বাঁচাতে গিয়ে সে কানে কামড় খায়। এর অনিবার্য ফল জলাতঙ্ক রোগ এবং শোচনীয় মৃত্যু। তার স্ত্রী সোনামুখী শেষে রাস্তার এক কুকুরকে ভালোমন্দ খাইয়ে সান্ত্বনা পায়। তার ধারণা নিজেই রূপ পাল্টে কুকুর হয়ে এসেছে। কিংকরের খাদ্য লোলুপতা নিয়ে একটি গতানুগতিক হাস্য-রসের গল্প হতে পারত, কিন্তু ক্রমশ তা এক চিরন্তন জীবনযন্ত্রণার কাহিনী হয়ে যায়।

'পুরন্দরের ডায়ার সাহেব' তীব্র শ্লেষাত্মক গল্প। একে রাজনৈতিক স্যাটায়ারও বলা যায়। পুরন্দরপুর থানার জবরদস্ত দারোগা দীনেশ রায় এতদাঞ্চলে ডায়ার সাহেব নামেই পরিচিত। জালিয়ানওয়ালাবাগের নায়ক ডায়ারের মতোই সে হিংস্র ও কুটিল। ধনী আড়তদার গদাধর গপাই-এর বাড়ীতে নকশাল হামলা ঠেকানোর জন্য থানা থেকে যে দুজন কনস্টেবলকে

পাঠানো হল সেই শ্যামাচরণ এবং অর্জুন সিং একটা গুলি না ছুঁড়েই প্রাণ বাঁচাতে পালিয়ে আসে। তাদের চাকরি এবং নিজের যশ বাড়ানোর জন্য এই দারোগা এক অভূতপূর্ব কৌশলের সাহায্য নেয়। প্রথমে সে কনস্টেবল দুজনকে পুকুরে গুলি ছুঁড়ে রাইফেল খালি করতে বলে, তারপর দুজনকে থানার গারদে বেঁধে রেখে পিছনে তীর চালিয়ে তাদের মারাত্মকভাবে আহত করে। তখন এই কনস্টেবল দুজন হয়ে গেল সশস্ত্র উগ্রপন্থীদের সঙ্গে অসম-সাহসিকতার সঙ্গে লড়াই করে মারাত্মকভাবে আহত কর্তব্যপরায়ন সেপাই। দারোগারই উদ্যোগে পুলিশ সাহেব এসে তাদের 'শৌর্যচক্র পদক' দান করেন। সমস্ত পুলিশ প্রশাসনব্যবস্থা, আইনশৃঙ্খলার কাঠামোর ভাঁওতার দিকটি মাণিক এইভাবে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন। তবে এক অর্থে 'গোপালের শিক্ষাদীক্ষাই' বোধহয় মাণিকের মনের কথাটিকে তুলে ধরতে চেয়েছে। গ্রামের ইউনিয়ন বোর্ডের ইংরেজী না-জানা প্রেসিডেন্ট নবকুমার তার একমাত্র সন্তান গোপালকে ইংরেজি শেখানোর জন্য পাঠশালায় ভর্তি করার ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু গোপাল স্বদেশী আন্দোলন ও স্বদেশী গানেই মেতে ওঠে, আর পিতা নবকুমার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে ভেট দিতে গিয়ে চরম অসম্মানিত হয়। 'যাহাদের স্বার্থরক্ষায় মহিমা কীর্তনে গ্রামবাসী এমন কি ধর্মপত্নী সত্যবালাও পর হইয়া গিয়াছে, একমাত্র সন্তানকে যাহাদের ভাষায় শিক্ষিত করিয়া তুলিবার আত্মগৌরব সুখ অনুভব করিতে চাহিয়াছেন আজ তাহারাই নবকুমারের মাথায় জুতো মারিল।' তাই ছেলে গোপাল এবং বাবা নবকুমার দুজনের কণ্ঠেই 'বন্দে মাতরম' এবং বাপ-বেটা দুজনেই স্বদেশী হয়ে যায়। এই গল্পটিকে আলাদা গুরুত্ব দেওয়ার কারণ আছে। এখানেও বিদেশী বনাম স্বদেশীর দ্বন্দ্ব। ক্রমাগত উৎস থেকে বিচ্ছিন্ন হবার প্রবণতা শুধু ভোগবাদী ও জীবনবিমুখ সংস্কৃতিরই জন্ম দেয় নি. আসল দেশটাই এইসব তথাকথিত শিক্ষিতদের কাছে অজানাই থেকে গেছে। তাই মানিকের প্রায় সমস্ত রচনাই এই উৎসের খবর জানানোর আকুলতা। সেই সঙ্গে কোথায় যেন রয়েছে এলিটিস্ট সাহিত্যিক ও সমালোচকদের বিরুদ্ধে একটি সূক্ষ্ম নালিশ। সাহিত্য নিয়ে যারা এত মাতামাতি করেন তারা আসল সাহিত্যের চেহারাই তো দেখলেন না।

—বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য

---

১. অভিমানী ॥ বি. বি. প্রকাশন ॥ নয় টাকা ॥ ২. গোপালের শিক্ষা-দীক্ষা ॥ প্রকাশক : শম্ভু চট্টরাজ ॥ ৩. সুখময়ের স্বপ্ন ॥ প্রকাশক শম্ভু চট্টরাজ ॥ দাম : আঠারো টাকা ॥

শতবর্ষে তুলসীচন্দ্র গোস্বামী
১৩০৫—১৩৬৪

"Flashed and faded like a meteor"—K. P. S Menon

প্রতি বছরই আমরা বহু মনীষী ও কৃতী ব্যক্তিদের শতবর্ষ জয়ন্তী উদ্‌যাপন করে থাকি। বঙ্গাব্দের ১৪০৫ এবং ইংরিজি ক্যালেণ্ডার এর শতাব্দী শেষের যে বছরগুলি তাকে ছুঁয়ে আছে সেখানে যেন শতবার্ষিকীর তালিকাটি অন্যান্য বছরের চাইতে বেশী লম্বা ও উজ্জ্বল তারকা খচিত। বিদেশের বার্টোল্ট ব্রেশ্‌ট ও পল রোবসনকেও বাঙালীরা স্মরণ করতে ভোলেনি। এলোমেলো কিছু নাম করতে গেলে মনে আসে সুভাস বোস, কাজি নজরুল, জীবনানন্দ, তারাশঙ্কর, বনফুল, নীরেন রায়, দিলীপ রায় ইত্যাদি, ইত্যাদি এবং তুলসীচন্দ্র গোস্বামী।

তুলসী চন্দ্রের মত অমন উজ্জ্বল সম্ভবনাময় জীবন আতস বাজির মত জ্বলে উঠে সহসা কেন ম্লান হতে হতে মিলিয়ে গেল জানবার কৌতূহল জাগে।

তুলসীচন্দ্র গোস্বামী আজ খানিকটা বিস্মৃত হলেও তিরিশের দশকে 'পরিচয়' পত্রিকার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। 'পরিচয়-এর আড্ডা' বইটিতে শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষের রোজনামচার প্রথম দিনটি এবং দিনলিপির শেষ তারিখে আড্ডার যে বিবরণ পাওয়া যায় তার দুটিতেই দেখা যাচ্ছে তুলসীচন্দ্র উপস্থিত ছিলেন। শ্যামল কৃষ্ণ অবশ্য আরও লিখেছেন, "প্রথম তিনচার বছর নিয়মিত হাজির থেকে [তুলসী চন্দ্র] মাঝে আসা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তারপর তাঁর উপস্থিতির মধ্যে থাকতো বড় বড় ফাঁক। ব্যক্তিগত জীবনের কিছু বিপর্যয়ের জন্য সক্রিয় রাজনীতির পরিমণ্ডল থেকে সরে এসে পরিচয় গোষ্ঠীর ইন্টেলকচুয়াল আবহের মধ্য হয়তো তিনি পরিত্রাণ খুঁজেছিলেন। কিন্তু তা বিশেষ ফলপ্রসূ হয়নি।"

পার্টলি গ্রামের এক যযমান ব্রাহ্মণ, লক্ষ্মণ চক্রবর্তী, চৈতন্য পার্ষদ অদ্বৈত মহাপ্রভুর একমাত্র দৌহিত্রীকে বিবাহ করেন। তাঁর পুত্র রামগোবিন্দ চক্রবর্তী পদবী পরিহার করে প্রথম 'গোস্বামী' নামে পরিচিত হন। এই রামগোবিন্দই

হলেন শ্রীরামপুরের বিখ্যাত ধনবান জমিদার ও তুলসীচন্দ্রের পিতা রাজা কিশোরীলাল-এর পূর্বপুরুষ।

শ্রীরামপুরের তৎকালিন অধিপতি, দিনেমার রাজ ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে যখন নিজ অধিকার সত্ব বিক্রি করতে উদ্যোগী হন, তখন তুলসীচন্দ্রের এক পূর্ব-পুরুষ রঘুরাম ইংরেজদের সঙ্গে অন্যতম প্রতিযোগী খরিদ্দার হিসেবে শ্রীরামপুর কিনে নেবার জন্য বার লক্ষ টাকা দাম ডেকেছিলেন। কিন্তু ইংরাজ সরকার বাহাদুর নাকি সেই কেনা-বেচায় বাদ সাধে এবং নিজেরাই শ্রীরামপুর হস্তগত করে। আসল ঘটনা যাই হোক, এই কিংবদন্তি থেকে অনুমান করা করা যায় পাটুলির চক্রবর্তীরা শ্রীরামপুরে গোস্বামী উপাধী ধারণ করে প্রচুর ধন সম্পত্তির অধিকারী হয়েছিলেন। সামাজিক বিবর্তনের এই অলিখিত ইতিহাসও কম কৌতুহলের বিষয় নয়।

অক্সফোর্ডের সতীর্থ এ. এন. তাম্বি তুলসীচন্দ্রের বিষয়ে লিখেছেন, —he was the only Indian who owned a Rolls Royce—I could even remember how he handed over the counter a cheque of 4000 Guinneas as down payment'।[২]

উপরোক্ত ঘটনা বিশের দশকের গোড়ার দিকের। বছর কুড়ি পরের একটি সাক্ষাৎকারে অন্য আর এক ছবি তুলে ধরেছেন হীরণ কুমার স্যানাল। তাঁর 'পরিচয়ের কুড়ি বছর' বইটিতে তিনি লিখেছেন, "সময়টা মোটামুটি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কাল—একদা রোলস রয়েস-বিহারী তুলসী বাবুর সঙ্গে একদিন ট্রামে দেখা—মোটা মোটা রাজনীতি সমাজনীতির বই নিয়ে ভিড়ের মধ্য দাঁড়িয়ে আছেন। (বললেন) 'বিধান সভার লাইব্রেরিতে ফেরত দিতে যাচ্ছি।' (হীরণ বাবু বলেন) 'আপনাকে ট্রামে দেখে একটু আশ্চর্য লাগে। তবে পেট্রল র‍্যাশনিং-এর দৌরাত্মে আপনাদের বন্ধু নলিনী সরকারও ত কাগজে পড়লাম ট্রামে যাতায়াত করছেন। হেসে তুলসী বাবু বললেন, "নলিনী আর ট্রামে চড়া ছেড়েছে ক'দিন'।" মাত্র দু দশকের ব্যবধানে এই অর্থবহ তির্যক সংলাপ জমিদারদের অধোগতি আর ব্যবসাদারদের উত্থানের একটি নিটোল ছবি বলে মনে হয়। অবশ্য একটা বিষয়ে সঠিক নির্ণয় করা যায় না। তখন তুলসী চন্দ্র কি তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সর্বোচ্চ অবস্থান, বাংলার অর্থ মন্ত্রীর পদে বহাল ছিলেন? সেদিন ট্রাম যাত্রী হওয়া তাঁর এক মন্ত্রী সুলভ ভঙ্গিমা মাত্র হলে ব্যাপারটার অন্য মানে করতে হয়।

ছাত্রাবস্থায় তুলসী চন্দ্র খুব একটা মিশুক স্বভাবের ছিলেন না। খানিকটা মুখচোরা ছিলেন বলেই মনে হয়। তাঁর সতীর্থ ও ভবিষ্যৎ জীবনের অন্তরঙ্গ সুভাস বোস বা দিলীপ রায়ের সঙ্গে প্রেসিডেন্সি কলেজে তাঁর পরিচয়টুকু পর্যন্ত ছিল কি না বোঝা যায় না। ১৯১৯ সালে অক্সফোর্ড যাবার পরের দশকটিতে দেশে বিদেশে তাঁর অকস্মাৎ অত্যুজ্জল বিকাশকে সত্যি আত্মস-বাজির সঙ্গে তুলনা করা চলে। অক্সফোর্ড মজলিস-এর প্রথমে তিনি সেক্রেটারি ও পরে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। সহপাঠি পি. এন. হক্সর, কে. পি. এস মেনন তাঁর অসাধারণ বাগ্মিতার স্মৃতি চারণা করেছেন। তিনটি দেশের তিনজন ভবিষ্যত প্রধান মন্ত্রী, যথাক্রমে এ্যান্টনি ইডেন, সলমন বন্দরনায়কে ও লিয়াকত আলি খানের সঙ্গে তাঁর দহরম মহরম ছিল শোনা যায়। ১৯২৩ সাল অবধি ইংলন্ডে থেকে তিনি ইতিহাসে বি. এ পাশ করে ব্যরিস্টার হয়ে দেশে ফেরেন।

দেশে তখন স্বাধীনতা সংগ্রামের এক সন্ধিক্ষণ। মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে মত ও পথের অমিল হওয়ার জন্য দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও মতিলাল প্রমুখ স্বরাজ্য পার্টির পত্তন করেছেন। তুলসী চন্দ্রর জবানীতে এই মতবিরোধ সম্বন্ধে কিছু অন্তর্দৃষ্টি পাওয়া যায়। "Mahatmaji is the head and supreme authority of spinning wanted an autonomous organisation for spinning, wanted most of the Congress fund the remnant of the Tilak fund for his spinners. In December 1921, both Das and Motilal Neheru regarded the rejection of Lord Readings offer by the Mahatma as a colossal political blunder !" তাঁরা মহাত্মা গান্ধীর মতের বিরুদ্ধে লেজিসলেটিভ এ্যাসেম্বিলতে যোগ দিয়ে ভেতর থেকে মন্টেগু-চেমসফোর্ড রিফর্মস ও ডায়ার্কি বানচাল করে তার অন্তঃসার শূন্যতা প্রমাণ করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

পলিটিকাল ব্লান্ডার কথাগুলি বর্তমান বাম রাজনীতির ক্যাম্পে একটি বিতর্কিত উক্তির কথা মনে করিয়ে দেয় যার নিস্পত্তি এখনও হয়নি। উপরোক্ত ক্ষেত্রে, ইতিহাস অচিরেই প্রমাণ করে দেয় যে অভিজাত সাংসদীয় রাজনীতির পথ একটি অসার অন্ধ গলি। মহাত্মা গান্ধীর জন জাগরণের পন্থাই স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল আন্দোলন হয়ে ওঠে। স্বরাজ্য পার্টি সমাজের ওপর মহলে অল্পকাল চমক জাগিয়ে মঞ্চ থেকে বিদায় নেয়।

রাজা কিশোরীলালের মৃত্যু হয় ১৯২৩ সালের জানুয়ারি মাসে। পিতার মৃত্যুর অল্পকাল পরেই তুলসী চন্দ্র অক্টোবর মাসে স্বরাজ্য পার্টির সদস্য হন। ঠিক কি উপায়ে তিনি চিত্তরঞ্জন দাসের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন তার বিষদ বিবরণ আমাদের জানা নেই। কিন্তু আমরা জানি দেশবন্ধু তুলসীচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও গুরুস্থানিক ছিলেন। চিত্তরঞ্জনকে "the greatest Bengali since Chaitanya" বলে অভিহিত করেছেন তুলসী চন্দ্র।

মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে তুলসী চন্দ্র সেণ্ট্রাল লেজিসলেটিভ এ্যাসেম্বলির সদস্য হয়ে দিল্লী যান। তখন সেই সভার বিরোধী দলনেতা ছিলেন মোতিলাল নেহেরু। সেখানকার অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে ছিলেন, লালা লজপত রায়, বিপিন চন্দ্র পাল, বিঠল ভাই প্যাটেল, মদন মোহন মালব্য মহম্মদ আলি জিন্না প্রমুখ। অচিরেই তুলসীচন্দ্র এ্যাসেম্বেলির ডেপুটি লিডার তথা চিফ হুইপ নির্বাচিত হন।। চিত্তরঞ্জন যখন স্বরাজ্য পার্টির সভাপতি, ও মোতিলাল সাধারণ সচিব সেই সময়ে তুলসীচন্দ্র অর্থ সচিব নির্বাচিত হন।

স্বরাজ্য পার্টির নেতারা সেই সময়ে একটি নিজস্ব মুখপত্রর প্রয়োজন অনুভব করছিলেন। চিত্তরঞ্জন দাসের অনুরোধে তুলসীচন্দ্র বিপুল অর্থ ব্যয়ে Indian Daily News সংস্থাটি ছাপাখানা সমেত কিনে নিয়ে স্বরাজ্য পার্টিকে লিজ দেন।

১৯২৩ থেকে ১৯২৮ মাত্র এই পাঁচবছর তুলসী চন্দ্রর রাজনৈতিক জীবনের উত্থান পর্ব বলে চিহ্নিত করা যায়। এই সময়ে তিনি প্রথমে Central Legislative Council এ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯২৪ সালে বিধান চন্দ্র রায় রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথকে বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কনউনসিল-এর নির্বাচনি প্রতিযোগিতায় হারিয়ে দেন। বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বোসের "The election campaign was mainly the work of Tulsi Goswami"।

১৯২৫ সালে দেশবন্ধু তুলসী চন্দ্রকে নিজস্ব প্রতিনিধি নির্বাচন করে বিলেতে সেক্রেটারির অফ স্টেট লর্ড বার্কেনহেড-এর কাছে পাঠান। আলোচনার বিষয় ছিল স্বায়ত্ব শাসনকে সত্যিকারের অর্থে পূর্ণ করে তোলা। বার্কেনহেড নাকি পার্লামেণ্টে সেই বিষয়ে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘোষণা করতে

যাচ্ছিলেন। কিন্তু তার ঠিক আগেই দুর্ভাগ্যবশতঃ ১৬ই জুন চিত্তরঞ্জন মারা যান। তুলসীচন্দ্রকে বিফল মনোরথ হয়ে দেশে ফিরতে হয়। তিনি বলেছেন : "The promised statement in the House of Lords was postponed by nearly three weeks and it was well known that the statement which was eventually made was very different from the one which originally drafted." তুলসীচন্দ্রর রাজনৈতিক জীবনে চিত্তরঞ্জনের মৃত্যু হল প্রথম বিপর্যয়।

দেশবন্ধুর প্রয়াণে স্বরাজ্য পার্টির নেতাদের মধ্য নিদারুণ অন্তর্কলহ শুরু হয়। তুলসীচন্দ্রর পরিশীলিত মন সে সমস্ত মেনে নিতে পারেনি। তিনি নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিলেন। ১৯২৮ সালের এপ্রিল মাসে তুলসী চন্দ্র ইন্ডিয়ান পার্লামেন্টারি ডেলিগেশন-এর নেতা হিসেবে টরন্টো যান। সেখানে যে স্মরণীয় বক্তৃতাটি দেন, সেইটিই তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সম্ভবনাময় পর্বের শেষ কীর্তি।

"ফরওয়ার্ড"কাগজটির গোড়াপত্তন থেকে তার প্রাণপুরুষ ছিলেন তুলসী চন্দ্র গোস্বামী। পত্রিকাটি তুলসী চন্দ্রের প্রতিভার আর একটি দিক, তাঁর ক্ষুরধার লেখনি ও সুউচ্চ মানের সাংবাদিকতার সাক্ষ্য বহন করে। আঠাশ সালের শেষের দিকে সরকার ফরওয়ার্ড-এর প্রকাশ নিষিদ্ধ করে দেয়। তুলসী চন্দ্রর জীবনীকার বলেছেন। [It] virtually marked the end of Goswami's meteoric political career !" ১৯৩১ সালে মোতিলাল নেহেরুর মৃত্যুও তাঁর পক্ষে মর্মান্তিক হয়।

পরবর্তীকালে দেশের রাজনৈতিক মঞ্চে তুলসীচন্দ্র তাঁর উচ্চাসনটি পুনরধিকার করবার বার বার চেষ্টা করেছেন কিন্তু কখনই তেমন সফল হননি। ১৯৩৭ সালে তিনি বেঙ্গল লেজিসলেটিভ এ্যাসেম্বলির সদস্য হন। কিন্তু ১৯৪০ সালে মৌলানা আজাদ কংগ্রেস পার্লামেন্টারি পার্টি থেকে তুলসী চন্দ্রকে বহিস্কৃত করেন। ১৯৪৩ সালে তুলসীচন্দ্র নাজিমুদ্দিন সরকারে অর্থমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেছিলেন। ঘটনাটি তাঁর প্রাক্তন রাজনৈতিক অন্তরঙ্গদের বিশেষ করে শরৎচন্দ্র বসু প্রমুখকে বিরূপ করেছিল। সে যাই হোক, অর্থমন্ত্রী হিসাবে বিয়াল্লিশ সালের মম্বন্তরের পর তাঁর বাজেট ও Agricutural Income Tax Bill এর প্রস্তাবনা দুটি স্মরণীয় ঘটনা। শেষোক্ত বিলটি জমিদারী উচ্ছেদের প্রথম সাংসদীয় পদক্ষেপ। কৌতুকের বিষয় হল

জমিদারী প্রথার সোচ্চার সমালোচক হওয়া সত্ত্বেও বাংলা দেশের একজন বৃহত্তম জমিদার ও Land Holders Assosiation তাঁকে বার তিনেক সভাপতির আসনে বসায়।

তাঁর রাজনৈতিক জীবনের গৌরবময় পর্যায়ের অবসানে, ভগ্ন স্বাস্থ্য, ভগ্ন মনোরথ তুলসী চন্দ্র রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে পুনঃপ্রবেশ করবার একাধিক বিভিন্ন প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। সত্যরঞ্জন বকসীর সঙ্গে "সিন্থেসিস পার্টি" গঠনের উদ্যোগ "ফরওয়ার্ড" কাগজকে "লিবার্টি" হিসেবে পুনরুজ্জীবীত করার প্রচেষ্টার মতই ব্যর্থ হয়। ১৯৫২ সালের সাধারণ নির্বাচনে (বিধানচন্দ্র রায় তখন পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী) তুলসী চন্দ্র শেষবারের মত নির্দলীয় প্রার্থী হিসেবে হুগলীর যে কেন্দ্রটি থেকে দাঁড়ান সেটি তাঁর প্রাক্তন জমিদারী ছিল। কমিউনিস্ট প্রতিদ্বন্দ্বী পাঁচুগোপাল ভাদুড়ির কাছে তিনি পরাজিত হন। বছর কুড়ি আগে একই জায়গা থেকে "দাদাবাবুর" এক কথায় প্রজারা মুখ্যমন্ত্রীত্বর ম্যারাথনে রানরস আপ বিধানচন্দ্রকে ভোট দিয়ে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথকে হারিয়ে দিয়েছিল।

শেষ জীবনে তুলসী চন্দ্র যখন প্রাসাদোপম পৈতৃক বাড়ি ছেড়ে সম্ভবত ভাড়া বাড়িতে বাস করছিলেন সেই সময়কার এক স্মৃতি সত্যেন্দ্রনাথ বোস রেখে গেছেন। "...he seemed a changed man. The fire in him had died down. ...He passed away on January 8 1957।"

এই একই তুলসী চন্দ্র গোস্বামীকে অক্সফোর্ডে পি. এন. সাপ্রু, ও এম. সি, চাগলার সঙ্গে বলা হত "ঠাই ঠরানিটিউ"। নির্মল চন্দ্র, নলিনী সরকার, শরৎ চন্দ্র বোস ও বিধানচন্দ্র রায়ের সঙ্গে বলা হত বাংলার "থিগ ঢ়িভিই"। জহর লালের চাইতে তিনি আট বছরের ছোট, কিন্তু যে পর্যায় জহরলাল জাতীয় জীবনে তেমন প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হননি তখন তুলসী চন্দ্র একজন সর্বভারতীয় নেতা। প্রমথ চৌধুরী নাকি একবার রাজধানী সফর থেকে ফিরে বলেছিলেন—দিল্লীতে যেখানেই গিয়েছেন সেখানেই সকলের মুখে একটি নাম, টিঃ সি. গোস্বামী।

আলোচ্য বইটির একটি প্রধান আকর্ষণ হল পার্লামেন্টারিয়ান হিসেবে তুলসী গোস্বামীর অসাধারণ প্রতিভা ও সাফল্যের সঙ্গে পাঠকের প্রত্যক্ষ পরিচয় করিয়ে দেওয়া। তাঁর সুলিখিত প্রস্তাবনাগুলির উপস্থাপনা তাৎক্ষণিক বিতর্কের ক্ষুরধার জবাবগুলির চমক পার্লামেন্টারি ডিবেটের অসাধারণ

উৎকর্ষের নজির। তিনি ট্রেজারি বেঞ্চের সাহেবদের তাঁদেরই ভাষায় তাঁদেরই সৃষ্ট ইনস্টিটিউশনের উচ্চতম আদর্শে নিশ্চুপ করে দিতেন। সংসদীয় গণতন্ত্র আমাদের দেশে আজ পঞ্চাশ বছরের প্রবীণ। চিৎকার চ্যাঁচামিচি, ধাক্কা ধাক্কি, হাতাহাতি, মাইক ছোঁড়া জুতো ছোঁড়া ইত্যাদি অশালীন আচরণ অবলম্বন না করে কি অসাধারণ মর্মভেদী সমালোচনা করা সম্ভব তার পাঠ নেওয়া উচিত তুলসী গোস্বামীর বক্তৃতাগুলি মন দিয়ে পড়ে। ইংরাজি ভাষার অমন অনবদ্য প্রয়োগ অল্প সংখ্যক ভারতীয় আয়ত্ত করতে পেরেছেন। সংস্কৃত, বাংলা, ইংরাজি, ফরাসী ইত্যাদি ভাষায় নানা বিদ্যা চর্চার বৈদগ্ধ তাঁর লেখা ও বলার ছত্রে ছত্রে। কিন্তু নীরদ চৌধুরীর কোটেশনের ফুল-ঝুরির মত তাতে উগ্র পাণ্ডিত্যের খোঁচা নেই। তাঁর প্রথম জীবনের লেখা মেসপোটেমিয়ার সমস্যা ও ইংরাজি ভাষা শিক্ষার বিষয়ে আলোচনা, ইরাকের তৈল যুদ্ধ বা বামফ্রন্ট সরকারের শিক্ষানীতির পরিপ্রেক্ষিতে আশ্চর্য রকমের প্রাসঙ্গিক। তাঁর লেখা জহরলালের "আত্ম-জীবনী"র পুস্তক সমালোচনার মত উচ্চমানের লেখা আমি খুব কম পড়েছি। সুনীতি চট্টোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ বোস, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ তুলসী চন্দ্রর সহবত, বৈদগ্ধ ও সততার গুনপনা তারিখ করেছেন। তাঁর দু' একটি নির্বাচিত লেখা স্কুল কলেজের পাঠ্যপুস্তকে তালিকাভুক্ত হবার যোগ্যতা রাখে।

যে অল্প স্বল্প তথ্য সামগ্রী আমাদের হাতে এসেছে তা নাড়াচাড়া করতে করতে একটি অদম্য কৌতূহলের শিকার হতে হয়। কেন এবং কি করে অমন উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় জীবন হঠাৎ ম্লান হতে হতে ধোঁয়ার মধ্যে মিলিয়ে গেল? দু' একটি অনুমানের ঝুঁকি নেওয়া যাক। তাঁর দুই "ফাদার ফিগার" চিত্তরঞ্জন ও মোতিলাল-এর অকাল মৃত্যু তুলসীচন্দ্রর পক্ষে মর্মান্তিক হয়েছিল সন্দেহ নেই। তাঁর জীবনীকার স্পষ্টই বলেছেন "so little is known about his life that pephaps no comprehensive biography of him will ever be written···inexplicable and sudden black-outs were some of the strange riddles in his enigmatic carreer."

তাঁর ব্যক্তিগত জনসংযোগের ক্ষেত্রে নিতান্তই সীমিত ছিল। শিক্ষা, সামাজিক অবস্থান ও শক্তিধর পৃষ্ঠপোষকদের আনুকূল্যে তিনি সহসা তৎকালীন রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের একেবারে কেন্দ্রে প্রক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। পাণ্ডিত্য ও অসাধারণ বাগ্মিতার জন্য অচিরেই দেশের শিক্ষিত উচ্চ মহলের

দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তথাকথিত "WEST MINIS-TFR MODEL"-এর সাংসদীয় রাজনীতিতে তাঁর ব্যুৎপত্তি ও কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। কিন্তু তাঁর অভিজাত জীবনধারা, পরিশীলিত মন রাজনীতির দৈনন্দিন দ্বন্দ্ব কলহ ক্ষুদ্রতার মধ্য নিমজ্জিত থেকেও বৃহত্তর লক্ষ্যে স্থির থাকার মানসিকতা তাঁকে দেয়নি। জনগণের নেতা হয়ে ওঠা হয়তো আদপেই তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তবু বলতে হয় এ সমস্ত অনুসন্ধান বিশ্লেষণের পরেও তুলসীচন্দ্রর পলিটিক্যাল মৃত্যুর ব্যাখ্যার মধ্যে অনেক ফাঁক থেকে যায়।

গ্রীক বা আরবদের সঙ্গে তুলনা করলে ভারতীয় ঐতিহ্যের মধ্যে ইতিহাস চেতনার অভাবের কথা সকলেই জানেন। বর্তমানে সে অভাব উত্তরোত্তর পূরণ হচ্ছে। কিন্তু জীবনী সাহিত্যের ক্ষেত্রে, দু'-একটা উদাহরণ বাদ দিলে, বাংলা ভাষায় একই ধরনের দৈন্য আজও ঘোচেনি। ছোট বেলার পাঠ্য-পুস্তকগুলিতে যেমন হত, অমুকের পিতা আদর্শ পুরুষ ছিলেন এবং তাঁর মাতা আদর্শ নারী এবং মহাপুরুষটি নিজে পিতা মাতা (বা বকলমে গতানুগতিক মূল্যবোধগুলিকে) অত্যন্ত শ্রদ্ধা ভক্তি করতেন। এই ধরনের ছক আজও চালু আছে। ক্ষণজন্মা মৌলিক প্রতিভাধর অথচ রক্তমাংসে গড়া এক একটি বড় মাপের মানুষকে আমরা মেকি মূল্যবোধের ভেজাল ময়েন দিয়ে মেখে ফেলে আমাদের ব্যবহারে ব্যবহারে ক্ষয়ে যাওয়া ছাঁচে ঠেসে দিই। ছাঁচের মধ্যে খাপ খায়না এমন মাল মসলা চোখের আড়াল করে ফেলি। তাই নজরুল, সুভাষ বোস, এমনকি রবীন্দ্রনাথের জীবনের কিছু তথ্যের উল্লেখ বা বিশ্লেষণ করার প্রচেষ্টাকেও আমরা বাঙালীরা তাঁদের প্রতি অশ্রদ্ধার প্রকাশ বলে মনে করি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, জীবনানন্দ দাশ, ঋত্বিক ঘটকের সঙ্গে আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের নিবিড় পরিচয় ঘটিয়ে দিতে পারি এমন জীবনী চর্চা ও গবেষণা, আমরা বাঙালীরা, কি আজও করতে পেরেছি? অথচ ব্রেশ্ট-এর বহুকামিতা, রোবসন ও এড্উইনা মাউণ্টব্যাটেনের সম্পর্ক নিয়ে তাঁদের জীবনীকারদের কোনও জুগুপ্সা নেই। এই দুটি বড় মাপের মূল্যায়ন করবার সময়ে তাদের জীবনের সামগ্রিক চর্চা ও অনুসন্ধান কোনও কাল ছায়াপাত করেনা। তুলসীচন্দ্রর পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনার মাল মসলার মত সেগুলিও অবলুপ্ত হলে আমরা ভবিষ্যতের কাছে চিরতরে দোষী হয়ে থাকবো।

—জয়ন্ত ঘোষ

ফ্রুট প্রিন্ট্স অব্ লিবার্টি : সিলেকশন্স্ ফ্রম দি রাইটিংস্ অব তুলসী চন্দ্র গোস্বামী।

প্রকাশক। তুলসী বীণা ট্রাস্ট, পৃঃ ৪৩০, দাম—২৮ টাকা।

ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব : সুভাষচন্দ্র ও জহরলাল

সুভাষচন্দ্র ও জহরলাল, গান্ধী পরবর্তী দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বের দুই প্রধান পুরুষ। দুজনেরই রাজনৈতিক জীবনে কার্যকর প্রবেশ অসহযোগ আন্দোলনের সূত্রে। জহরলাল অবশ্য রাজনৈতিক জীবনের শিক্ষানবিশি করেছেন কিছুটা আগের থেকে, পিতা মোতিলালের ছত্রছায়ায় জালিয়ানওয়ালা বাগের উত্তাল রাজনীতির পর্বে। সুভাষ তখন বিলেতে আই. সি. এস পরীক্ষার ছাত্র। কিন্তু সুভাষের দেশব্রতী চিন্তাধারার স্ফুরণ ঘটেছে ছাত্রজীবনে, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ প্রমুখদের চিন্তা, অবদানের সংস্পর্শে। দেশের সেবাকেই তিনি জীবনের ব্রত করার সংকল্প করেছেন, তার মাধ্যম প্রত্যক্ষ রাজনীতি অথবা অন্য কিছু হবে কিনা সেটাই কেবল অনিশ্চিত ছিল। নেহরুর জীবনে এই ধরনের সেবাব্রতীর সংকল্প তখন লক্ষ্য করা যায় নি। গান্ধীর সংস্পর্শে না আসলে তাঁর জীবনের গতি কোন পথে যেত বলা মুস্কিল।

সুভাষচন্দ্র ও জহরলাল দুজনেই আদর্শবাদী। জহরলালের ছাত্রজীবনে বিলাতে কিছু ভারতীয় নেতার চিন্তাভাবনার সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিল, আর পরিচয় হয়েছিল ফেবিয়ান সমাজতন্ত্রীদের সঙ্গে। সেই ফেবিয়ান প্রভাব তাঁর জীবনে বজায় ছিল স্বাধীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরেও। এই রকম কোন সমাজতন্ত্রী ধারণার সঙ্গে সুভাষের পরিচয় ঘটেছে অনেক পরে, যখন তিনি সর্বভারতীয় না হলেও বাংলার নেতৃত্বে অভিষিক্ত হয়েছেন। তাই জহরলালের চিন্তাভাবনায় প্রথমে সমাজতন্ত্রের ফেবিয়ান ভাষ্য এবং পরে সোভিয়েতের কর্মসূচির সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়, সমাজতন্ত্রের মতাদর্শগত যে বনিয়াদ গড়ে তোলে সুভাষের জীবনে তার অনুপস্থিতি অস্বীকার করা যায় না। তিরিশের দশকে জহরলাল একটা সময় নিজেকে মার্ক্সবাদী সমাজতন্ত্রী বলতে দ্বিধা করেননি, যদিও ভারতে তার প্রয়োগ ঠিক সোভিয়েতের পথে ঘটবে না, সেকথাও বলেছিলেন। সুভাষচন্দ্রের সমাজতন্ত্র ভাবনায় মার্ক্সবাদী অনুষঙ্গ কোন দিনই খুব প্রকট ছিল না, বলেই সমকালীন মুখ্য মতাদর্শের চরিত্রগত বৈপরীত্য গোড়ার দিকে ধরতে পারেন নি। তাই, ভারতের বিশেষ

পরিস্থিতিতে কমিউনিজম ও ফ্যাসিজমের মেলবন্দন ঘটানোকে তিনি কাঙ্খিত পথ বলে মনে করেছিলেন।

আসলে সুভাষচন্দ্র দেশের অবস্থার দ্রুত উন্নতিতে ফ্যাসিবাদের জাতীয় সমাজতন্ত্রী কর্মসূচিকে প্রকৃষ্ট পথ বলে মনে করেছিলেন, সেটা প্রকৃত সমাজতন্ত্র কিনা, সেই বিচার করার তাগিদ অনুভব করেন নি। জহরলালের মানসিকতার সঙ্গে এখানেই ব্যবধান দুস্তর। কমিউনিজম ও ফ্যাসিজমের মধ্যে কোন মেলবন্ধন ঘটানো তাঁর কাছে অকল্পনীয় ছিল। মতাদর্শকে তিনি সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্যমাত্রার সঙ্গেই সম্পর্কিত করতেন, তার ভিন্নতর কোন প্রয়োগ করার কথা ভাবতে পারেন নি। মতাদর্শের ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গির এই মেরুগত ব্যবধান,এই দুই নেতার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও ভূমিকার পার্থক্য বুঝতে সাহায্য করে।

গিরিশচন্দ্র মাইতি 'স্বাধীনতা সংগ্রামে সুভাষচন্দ্র ও জহরলাল' গ্রন্থে এই দুই নেতার রাজনৈতিক অবদানের অনুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন। একজন প্রকৃত গবেষকের অনুসন্ধিৎসা নিয়ে তিনি যে বিপুল তথ্যের সমাবেশ করেছেন, সেখানে সুভাষচন্দ্র ও জহরলালকে দ্বন্দ্ব সহযোগিতার বিচিত্র প্রেক্ষিতে পাঠকের সামনে উপস্থিত করা হয়েছে। দুজনের রাজনৈতিক জীবনের প্রথম বিশ বছর দেশের মাটিতে গান্ধী কেন্দ্রিকতার সূত্রে আবর্তিত হয়েছে। তার মধ্য দিয়ে মাঝে মাঝে বিরোধিতা সত্ত্বেও জহরলালের গান্ধী নির্ভরতা আর সুভাষের গান্ধী বিরোধিতা শেষ পর্যন্ত প্রকট হয়ে উঠেছে। দেখা যায় সুভাষ ও জহরলাল যখন গান্ধী বিরোধী অবস্থান নিয়েছেন, তখন তাঁরা পরস্পরের ঘনিষ্ঠ সহযোগী। আর যখনই রাজনৈতিক বিশ্বাস, বিচার বিশ্লেষণে তাঁরা পরস্পর সহমত পোষণ করতে পারেন নি, সেখানেই গান্ধী একজনকে ব্যবহার করতে চেয়েছেন অন্যজনের বিরুদ্ধে। তবে একথাও স্বীকার্য জহরলাল যেভাবে নিজেকে গান্ধীর ইচ্ছার কাছে সঁপে দিয়েছিলেন, সুভাষ কোনদিনই তা করতে পারেন নি। এখানেই সুভাষচন্দ্রের অনন্যতা।

সুভাষচন্দ্রের ধ্যান-জ্ঞান ছিল দেশের মুক্তি। সেখানে তিনি গান্ধীর ভূমিকাকে দেখেছেন লক্ষ্য পূরণের হাতিয়ার হিসেবে। যদি গান্ধীর নেতৃত্ব জাতির স্বাধীনতা আনতে পারে সুভাষ তাহলে গান্ধীর একনিষ্ঠ অনুগামী বলে নিজেকে ঘোষণা করতে এতোটুকু দ্বিধা করবেন না। আর গান্ধীর পথ

যদি জাতীয় মুক্তির লক্ষ্য থেকে কিছুমাত্র সরে যায়, তাহলে তিনি গান্ধী বিরোধিতাতেও পিছু পা হবেন না। জাতীয় আন্দোলনে গান্ধীর ভূমিকার অপরিসীম গুরুত্ব স্বীকার করেও তার কার্যকারিতাকে স্বপ্ন সফল করার নিরিখে একমাত্র বিচার্য করে তোলা, সুভাষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল। এখানে ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা, ভক্তির কোন জায়গা ছিল না। জহরলাল কিন্তু গান্ধীর নেতৃত্বের অপরিহার্যতাকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। গান্ধীবিহীন আন্দোলন করার কথা তিনি ভাবতেও পারেন নি। ফলে নেহরু ও সুভাষের বাস্তব পরিস্থিতির বিচারে যখনই পার্থক্য ঘটেছে তখনই হ্যাঁ-গান্ধী অথবা না-গান্ধী প্রসঙ্গ প্রধান হয়ে উঠেছে।

যতোদিন সুভাষচন্দ্র নেতাজী হন নি ততোদিন জহরলালের সঙ্গে সম্পর্কে এই গান্ধী ফ্যাক্টর মুখ্য ছিল। কিন্তু নেতাজী পর্বে সেই দ্বন্দ্বের যখন অবসান ঘটে, যখন অন্তত গান্ধী কেন্দ্রিকতা কোন পিছুটান হিসেবে কাজ করেনি, তখন কিন্তু সুভাষ উপলব্ধি করেন দেশের মাটিতে গণআন্দোলন উত্তাল করতে গান্ধীর সাহায্য দরকার। শুধু আজাদ হিন্দ ফৌজের বীরত্ব আত্মত্যাগ যথেষ্ট নয়। সুভাষচন্দ্র নেতাজী হয়েও গান্ধীর ভূমিকাকে অনুঘটক রূপে চিন্তা করতে বাধ্য হয়েছিলেন, যে ধারণা দেশত্যাগের পূর্বে তাঁর তেমন স্পষ্ট ছিল না। দেশের জন্য সর্বস্ব পণ করলেও সাধনার ধন যে অনায়ত্ত থেকে যেতে পারে, সুভাষচন্দ্রের মনে তার রূপরেখা যদি আগে ধরা পড়তো, তাহলে সুভাষ-জহরলাল-গান্ধী সম্পর্কের বিকাশ হয়তো ভিন্ন পথে ঘটতো। যা হয়নি তার জন্যে অনুশোচনা, কিম্বা না করার জন্যে সমালোচনা করার দৃষ্টিকোণ থেকে একথা বলা হচ্ছে না, এই সম্ভাবনার দিকটা সুভাষচন্দ্র উপেক্ষা করেছিলেন, এই ত্রয়ীর সম্পর্কের টানাপোড়েনে সে কথা মনে হতে পারে। গিরিশ বাবু এই দিকটি আলোচনা করলে পাঠক উপকৃত হতো।

লেখক হিসেবে এই গ্রন্থে সুভাষ-জহরলাল দ্বন্দ্ব সহযোগিতার যে বিস্তৃত প্রেক্ষাপট গিরিশ বাবু তুলে ধরেছেন, তা অবশ্যই বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে। কিন্তু তা সত্ত্বেও দু'একটি প্রশ্নও থেকে যায় যার উত্তর এই গ্রন্থে মেলে না। যেমন প্রথমতঃ জাতীয় আন্দোলনে শুধু জাতীয় স্বাধীনতা একমাত্র বিবেচ্য ছিল, সমাজ পরিবর্তনের প্রসঙ্গ তোলা জরুরী ছিল না কি? এখানে গান্ধী ও সুভাষচন্দ্রের সাধনার মধ্যে মৌলিক ভেদ নেই। যেহেতু দুজনেই রাজনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে ছিলেন, সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্যে নয়।

আর এখানেই জহরলালের সঙ্গে তাঁদের দুজনের মৌলিক পার্থক্য। গ্রন্থে এই দিকটি অনালোচিত।

দ্বিতীয়তঃ জাতীয় স্বাধীনতা এসে গেলে দেশের সব সমস্যার সমাধান হবে এই ধরনের একটা সরলীকৃত বিশ্বাস সুভাষচন্দ্র, গান্ধীসহ কংগ্রেসের প্রথম সারির নেতাদের আকৃষ্ট করেছিল। নেহরু অন্ততঃ সেই ধরনের বিশ্বাসে প্রভাবিত হননি। গিরিশবাবু এই দিকটিতে আলোকপাত করবেন প্রত্যাশা ছিল। তৃতীয়তঃ হিংসা অহিংসার দ্বন্দ্বে সুভাষচন্দ্র ও জহরলাল কেউই গান্ধীর অনুসারী ছিলেন না। তবু নেহরু শেষ পর্যন্ত গান্ধীর সঙ্গে ছিলেন শুধু কি গান্ধীর উত্তরাধিকারী মনোনীত হওয়ার জন্যে? লেখকের বিশ্লেষণে খটকা দূর হয় না। চতুর্থতঃ সুভাষের মতো প্রবল আত্মবিশ্বাস জহরলালের ছিল না, তাঁর চরিত্রে হ্যামলেটীয় দোদুল্যমানতার কথা নেহরু নিজের মুখেই স্বীকার করেছেন। আত্মবিশ্বাস মহৎগুণ সন্দেহ নেই, কিন্তু আত্মবিশ্বাসের আতিশয্য চূড়ান্ত লক্ষ্য পূরণের সহায়ক নাও হতে পারে।

গিরিশবাবু স্বাধীনতা সংগ্রামের যে প্রেক্ষাপটে সুভাষচন্দ্র ও জহরলালের ভূমিকা ও নেতৃত্বের মূল্যায়ন করেছেন সেখানে সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে একটা অপরিসীম শ্রদ্ধা, মুগ্ধতাবোধ কাজ করেছে। তিনি কোন তথ্যের বিকৃতি ঘটাননি একথা ঠিক কিন্তু তার উপস্থাপনে এই মুগ্ধতাবোধ চেপেও রাখতে পারেন নি। অবশ্য স্বীকার্য গ্রন্থকারের বিপুল শ্রম ও অধ্যবসায় যার জন্যে এই তথ্যের সমাবেশ সম্ভব হয়েছে। পাঠকরা এখানে এমন অনেক তথ্য পাবেন যা অজানা, যা সহজলভ্য নয়। গিরিশবাবুর শ্রম সার্থক। গ্রন্থটির বহুল প্রচার অবশ্য কাম্য।

—বাসব সরকার

'স্বাধীনতা সংগ্রামে সুভাষচন্দ্র ও জহরলাল' গিরিশচন্দ্র মাইতি ১৯৯৮ মডেল পাবলিশিং হাউস, দাম—ষাট টাকা।

আশা-আকাংখা-আশংকার প্রশ্নে স্বাধীনতা আন্দোলন ও স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষ

কোনো দেশের জাতীয়তাবাদ এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উৎস, প্রেক্ষাপট এবং তার পরবর্তী সামাজিক রাজনৈতিক অবস্থার তাৎপর্য বিশ্লেষণে সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পরিবেশ, পরিস্থিতি ও ঘটনার পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া অনুধাবন একান্তই প্রয়োজন ; বিশেষ করে সেই দেশ যদি ভারতবর্ষের মত বিশাল, জটিল এবং ব্যাপক সামাজিক শক্তিসমূহ সমন্বিত এক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা হয়। আন্দোলনের স্বপক্ষে সর্বস্তরে জনসমর্থন থাক বা না থাক সমস্ত প্রকার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনই জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের উদ্যোগে পরিচালিত হয়। শিক্ষিত এলিট সম্প্রদায়ের সংগঠিত বিক্ষোভ বা অসংগঠিত অনগ্রসর শ্রেণীর স্বতঃস্ফূর্ত বিপ্লব এই দুটি ধারার পারস্পরিক মিশ্রণ ও অবিরাম বিচ্ছেদ ও মিলনের মধ্য দিয়েই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে বোঝার চেষ্টা করা উচিত। মূলতঃ সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থেকে ব্যবসায়ী পুঁজি ও শিল্প পুঁজিবাদী রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় উত্তরণের পথে ভারতে বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণীর পারস্পরিক সম্পর্কের ঘাতপ্রতিঘাতেই নিয়ন্ত্রিত হয়েছে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন। ভারতীয় রাজ-রাজরা, জমিদার-ভূস্বামী শ্রেণী (পাশ্চাত্য ভাবনায় যাকে নোবিলিটি বলা হয়), প্রাচীন ও সংস্কারমুখী ধর্ম ও ধর্মীয় আন্দোলন, সামন্ততন্ত্র-ধনবাদী-ব্যবস্থার মিলিত ফসল মধ্যবিত্ত শ্রেণী, নবোদ্ভূত ব্যবসায়ী গোষ্ঠী, সংগঠিত ও অসংগঠিত শ্রমিক কৃষকশ্রেণী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও ভিন্ন ভিন্ন দলিত জাতীয় গণগোষ্ঠী-বুদ্ধিজীবি শ্রেণী প্রভৃতির প্রায় সর্ববিষয়ে মতানৈক্য মতভেদ ও ভিন্নতা সত্ত্বেও বেশ কিছু বিষয়ে সমন্বয় ও সহমত ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে এক অনন্য রূপ দিয়েছে। এই প্রেক্ষাপটেই জাতীয় গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি দেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পঞ্চাশবছর পূর্তি উপলক্ষ্যে "স্বাধীনতা আন্দোলন ও স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষ, আকাঙ্ক্ষা, আশা ও সম্ভাবনা" গ্রন্থটি প্রকাশের উদ্যোগ করেছেন।

ইতিহাস-রাজনীতি-অর্থনীতি-সংস্কৃতির বিভিন্ন শাখায় সতত বিচরণশীল পঞ্চাশজন বিদগ্ধ সমাজবিদের মূল্যবান প্রবন্ধের সংকলন এই গ্রন্থ। সম্পূর্ণ গ্রন্থটি পাঠ করলে গ্রন্থের অভ্যন্তরের প্রবন্ধগুলির দুটি মূল প্রতিক্রিয়া আবিষ্কার করা যায়। এক ধরনের প্রবন্ধে স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে আশাভঙ্গের ও ক্ষোভের প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত হয়েছে। অন্য ধরনের প্রবন্ধ

গুলিতে সেই আশাভঙ্গের প্রতিবিধানের দিশা দেখা যাচ্ছে কিনা সেই ভাবনা প্রকাশিত হয়েছে। এই প্রবন্ধ সংকলনটিকে মুখ্যতঃ পাঁচটি বিষয়গত সারণীতে ভাগ করা যায়। এগুলি হল যথাক্রমে—(ক) রাজনৈতিক ঘটনার সালতামামি ও বিবরণ বিশ্লেষণ ; (খ) অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও উন্নয়নের অসঙ্গতি ও তার মূল্যায়ন ; (গ) জীবনবোধ ও মানবিক মূল্য-বোধের প্রশ্ন ; (ঘ) সামাজিক ঘটনার তাৎপর্য বিশ্লেষণ এবং (ঙ) সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ সমন্বিত বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধান।

রাজনৈতিক ঘটনার বিবরণ ও বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে প্রবীণ বামপন্থী নেতা শ্রী বিনয় চৌধুরী একটি বিশ্লেষণমুখী নিবন্ধে ভারতের সাংবিধানিক ব্যবস্থার দুর্বলতার উৎস সূত্র হিসাবে ব্রিটিশ শাসনাধীন ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের অন্ধ অনুসরণকেই চিহ্নিত করেছেন। তাঁর মতে এই কারণেই কেন্দ্রের উপর নির্ভরশীলতা বেড়েছে, রাজ্যসরকারগুলির "অটোনমি' ব্যাহত হয়েছে, যা অর্থনৈতিক-সামাজিক বিকাশের ক্ষেত্রে অসমতা বৃদ্ধি করেছে এবং এই ধরনেব বঞ্চনার মনোভাব থেকে সমগ্র দেশে আঞ্চলিকতা বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী দীনেশ দাশগুপ্ত স্বাধীন দেশ সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের ব্যথা প্রকাশ করেছেন, কিন্তু কেন এমন হল তার বিশ্লেষণ করেননি ; তুলনায় সুধাংশু দাশগুপ্ত বেশ কিছু নতুন তথ্য ও ঘটনার সংযোজন ঘটিয়ে ১৯৩৪-৩৫-এর পর বিপ্লবী আন্দোলন স্তিমিত হয়ে গেল কেন ; তার ব্যাখ্যা করেছেন। জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী আন্দোলন, সন্ত্রাসবাদ এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের ভিন্ন ভিন্ন ধারা-উপধারা নিয়ে অমলেন্দু দে, বাসব সরকার, গৌতম নিয়োগীর রচনাগুলি এই গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য সংকলন। অমলেন্দু দে ভারতের মুক্তি সংগ্রামের দুটি বিরোধকে চিহ্নিত করেছেন। এর একটি মৌল বিরোধ—ভারতবর্ষের বিভিন্ন শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের মানুষদের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসন থেকে মুক্তি অর্জনের কারণে ব্রিটিশদের সঙ্গে বিরোধটি হলো মৌল বিরোধ। অপরটি হ'লো গৌণবিরোধ। ভারতবর্ষের মত বিশাল দেশে বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, জাতি। শ্রেণী ও সম্প্রদায়গুলির মানুষদের অন্তঃকলহ ও অন্তর্দ্বন্দ্ব-এর মধ্যেই এই গৌন বিরোধটি লুকিয়ে আছে। অমলেন্দু দে'র মতে, ভারতের সকল রাজনৈতিক দলই এই মৌল ও গৌণ বিরোধগুলি সম্বন্ধে সচেতন, তবুও এই গৌণ বিরোধসমূহ সমাধান করে, কিভাবে মৌল বিরোধটি সমাধান করা যায় তার চেষ্টা করেন নি ; ফলে ঐক্যবদ্ধ ভারত গঠন করতে পারেননি। বাসব সরকার সন্ত্রাসবাদী তত্ত্বের উদ্ভাবন ও বিবর্তনের এক সফল রাজনৈতিক চিত্র তুলে ধরেছেন। উনিশ

শতকের শেষ দশক থেকেই ভারতে প্রকৃত অর্থে যে সন্ত্রাসবাদের সূচনা হয়েছিলো, তার চরিত্র ছিল প্রতিবাদী এবং সেই সময়ে এই আন্দোলনের পেছনে কোনো মতাদর্শগত তাগিদ তেমন দেখা যায়নি। পরবর্তীকালে বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে হিন্দুত্ববাদ সঞ্চারিত হলেও, বিশ ও তিরিশের দশকে জাতীয় বিপ্লবীরা হিন্দুত্ব চেতনা অতিক্রম করতে পেরেছিল। ১৯৪৮-৫০ এর কমিউনিস্ট সন্ত্রাসবাদী ধারণাকে বামপন্থী সংকীর্ণতাও ৬৭'র নকশালবাড়ী সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনকে জঙ্গী কৃষক আন্দোলনরূপে চিহ্নিত করে সরকার দেখাতে চেয়েছেন স্বাধীন ভারতে শাসক শ্রেণী নিজেদের প্রাধান্য বজায় রাখতে আর বিচ্ছিন্নবাদীরা নিজেদের ক্ষুদ্র-স্বার্থ সিদ্ধির আশায় সন্ত্রাসবাদ ব্যবহার করেছে। গৌতম নিয়োগী স্বাধীনতা সংগ্রামের উপনিবেশ বিরোধী লড়াইয়ের ও আন্দোলনের চরিত্র বিচার করে ১৩বি ধারা উপধারা আবিষ্কার করেছেন। ভারতীয় সংবিধানের "সেকুলারত্ব নিয়ে আবদুর রউফ, জিন্না-গান্ধী-সুভাষের সম্পর্ক নিয়ে শ্রীরঞ্জিত সেনের, গান্ধীবাদী রাজনীতির বিবর্তন বিষয়ে শৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-এর রচনা গুলি খুবই মূল্যবান। আবার "স্বাধীনতার সালতামামি", "দেশবিভাগের প্রেক্ষাপটে স্বাধীনতা আন্দোলন", বা মহাবিজয়ের পুনর্মূল্যায়ণ প্রভৃতি প্রবন্ধে এমন কিছু নতুন চিন্তার আলোক স্থান পায়নি, যা ইতিহাস চর্চায় নতুন দিক নির্দেশ করতে পারে।

প্রাক্ স্বাধীনতা পর্বে ও স্বাধীনতা উত্তরকালে ভারতবর্ষের অর্থনীতি, শিল্পায়ন, কৃষিবিপ্লব ও উন্নয়ন পরিকল্পনা বিষয়ে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ এই সংকলনের অন্তর্গত হয়েছে। এগুলির মধ্যে সুকোমল সেনের 'পঞ্চাশ বছরের অর্থনৈতিক নীতির কঠিন শিক্ষা', অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়ের "স্বাধীনতা ও শিল্পোন্নয়ন", আশিস দাশগুপ্তের 'স্বাধীনোত্তর ভারতে অর্থ-নৈতিক নীতির বিবর্তনের ইতিহাস" প্রভৃতি রচনায় পরিকল্পনা ও পরি-কল্পনা বহির্ভূত খাতে উন্নয়নের মাত্রাগত পরিবর্তনশীলতা এবং সাম্প্রতিক সময়ের উদার অর্থনীতি ও বিশ্বায়নের প্রসঙ্গও আলোচিত হয়েছে।

এই সংকলনের সর্বোৎকৃষ্ট সংযোজন হলো সামগ্রিক জীবনবোধ বা মূল্য-বোধের প্রশ্ন জড়িত প্রবন্ধগুলি। সুকুমারী ভট্টাচার্য মূল্যবোধের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন "জীবনের যে সব নৈতিক ও মানবিকবোধ জীবনকে অর্থবহ করে তোলে, ব্যক্তির কাছে তার জীবনকে মূল্যবান করে, তাই মূল্য-বোধ।" এই প্রেক্ষাপটে নতুন আকারে প্রশ্ন উঠলো দেশ পরিচালিত হবে

কার স্বার্থে ? শিক্ষিত, বিত্তবান, রক্ষণশীল নেতাদের না আপামর সাধারণের ? অতীব দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে হয়, "বহুজনহিতায়, বহুজন সুখায়, লোকানু কম্পায়ৈ" বুদ্ধের এই আদর্শমন্ত্র অতিক্রম করার শক্তি বা সাধ্য নেতা ও সাধারণ জনতা কেউই দেখাতে সক্ষম হচ্ছেন না। তাই বোধহয় প্রাজ্ঞ মনস্বী অরুণ মিত্র জনগণের বিবেকী সত্তার জাগরণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। একইভাবে দেশ বিভাগ ও দেশের সার্বিক উন্নতির বিকল্প পথ তৈরীর চেষ্টা ও তার ব্যর্থতার ইতিহাস চর্চার মধ্যদিয়ে গৌতম চট্টোপাধ্যায় মূলতঃ মানবিকতার প্রশ্নেই প্রয়োজনীয় একটি আলেখ্য তৈরী করেছেন। রমাপদ চৌধুরীর "অনেক কিছু পেয়েছি, হারিয়েছি বেশী", রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্তের "অনৈক্যের ইতিহাস, ঐক্যের সাধনা" প্রভৃতি প্রবন্ধগুলির মূল সুরটি মানবিক মূল্যবোধের দায়বদ্ধতার নিগড়েই আটকে আছে।

সামাজিক ঘটনাবলীর তাৎপর্য বিশ্লেষণ ও সাংস্কৃতির মূল্যবোধ সমন্বিত প্রবন্ধগুলির মধ্যে চিত্তব্রত পালিত, মনা চৌধুরী, যশোধারা বাগচী, মালিনী ভট্টাচার্য-এর প্রবন্ধগুলি বিবরণধর্মীতার উর্দ্ধে উঠে আত্মানুসন্ধানের বেশ কিছু মৌলিক জিজ্ঞাসার অবতারণা করেছেন। পঞ্চাশ বছরের নাট্য সংস্কৃতির ব্যাপ্তির বিশ্লেষণে খুব সঙ্গতভাবেই কুমার রায় বলেছেন নাট্যশিল্প চর্চাকে মেলাতে হবে দেশের প্রাণের সঙ্গে, জাতির অবচেতনস্তর থেকে খুঁজে আনতে হবে আবেগ আর অনুভূতিকে আর এইসব আবেগ অনুভূতির উপযুক্ত চয়নেই প্রস্ফুটিত হবে জাতীয় নাট্যসংস্কৃতি।

পঞ্চাশ বছর পেরিয়ে এসে জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে, সাহিত্য, অর্থনীতিতে, শিল্পে-কৃষিতে, রাজনীতিতে, জীবনযাপনে এবং মানবিক সম্পর্কের মূল্যবোধে দেশপ্রেম কতদূর আমরা ভারতীয়রা ধরে রাখতে পেরেছি, কতদূরে তা আমাদের জীবনচর্চায় ও ভাবনায় অনুরণিত হতে পেরেছে—তারই একটি প্রামাণ্য সংকলন এই গ্রন্থটি। সাংবাদিকতা সুলভ বিবরণধর্মী ইতিহাস চর্চার কতিপয় প্রবন্ধ বাদ দিলে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে আত্মসমালোচনামূলক এই গ্রন্থটি নিশ্চিতভাবেই এক উল্লেখযোগ্য ও প্রয়োজনীয় সংকলন। —কুন্তল মুখোপাধ্যায়

স্বাধীনতা আন্দোলন ও স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষ ঃ

আকাঙ্খা আশঙ্কা সম্ভাবনা—

সম্পাদনা—আশিস নিয়োগী—জাতীয় গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি।

মূল্য—১৫০'০০ টাকা।

তারাশঙ্করের উপন্যাস

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম শতবর্ষে তাঁর ঔপন্যাসিক প্রতিভার মূল্যায়নের চেষ্টায় অনেকগুলি ছোটবড় লেখা বেরিয়েছে। ঐ সব পুস্তক পুস্তিকার ভিতর কোন কোনটি নিছকই মরশুমি, আবার কোনটি দেশ ও জাতির ইতিহাস সমাজ অর্থনীতি রাজনীতি ধর্মীয় উত্থান পতন ক্রম-বিকাশের সঙ্গে সম্পর্কের প্রাসঙ্গিকতায় উজ্জ্বল। ডঃ অমরেশ দাশ ও তাঁর গ্রন্থে তারাশঙ্কর সম্বন্ধে বহু ব্যবহৃত কিছু স্তুতিবাক্য কিংবা আপ্রাসঙ্গিক কিছু হঠকারী মন্তব্যের উল্লেখে দায় সারতে চান নি বরং একজন শিল্পী তাঁর শিল্পকর্মের ভিতর দিয়ে কেমন ভাবে প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠেন বিনম্র সচেতনতায় তাকেই অনুসরণ করতে চেয়েছেন। আপাত-সরলতার আড়ালে এ কাজটি যে কত কঠিন তা তারাশঙ্করের উপন্যাস পড়লেই বোঝা যায়।

তারাশঙ্করের লেখা ষাটখানারও বেশী উপন্যাসের মধ্যে লেখক মাত্র পাঁচখানিকে আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কারণ জানাতেও তিনি ভোলেন নি "জীবিকার দায় এবং সামাজিক কর্তব্য—উভয় কারণেই তারাশঙ্কর অনেক উপন্যাস লিখেছেন। অনেক লেখাই তাই ভালো হয়নি।" 'পটভূমি'র এই মন্তব্যই বুঝিয়ে দেয় যে লেখক যথাসম্ভব নির্মোহ দৃষ্টিতে তারাশঙ্করের ঔপন্যাসিক প্রতিভার মূল্যায়ণে সচেষ্ট হবেন। তাঁর মতে যেখানে তিনি অনন্য, স্বরূপে ও স্বমহিমায় নক্ষত্রবৎ উজ্জ্বল এমন উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ পাঁচটি নিয়ে এই পর্যালোচনা।" ধাত্রী দেবতা, গণদেবতা (পঞ্চগ্রাম সহ) কবি, হাঁসুলী বাঁকের উপকথা, আরোগ্য নিকেতন এ যে অনন্য কথা সাহিত্যিককে পাওয়া যায় তাঁকে সমগ্ররূপে ধরার জন্য অমরেশ বাবু মোট আটটি অধ্যায় ব্যয় করেছেন। এই অধ্যায় গুলির ভিতর থেকেই উঠে এসেছে এই দেশের ইতিহাসের প্রতি দায়বদ্ধ, সুখদুঃখ বিরহমিলন কাতর নর-নারীর জীবন যুদ্ধের সঙ্গে নাড়ির টানে আবদ্ধ এক শিল্পীর ঐতিহ্যলব্ধ এবং বহু পরিশ্রমে অর্জিত জীবনের দর্শন ও কাব্য।

সাহিত্য সমালোচনার বহু পদ্ধতির মধ্যে একটি হ'ল সমালোচক বিষয় সংক্রান্ত তাঁর তত্ত্বজ্ঞানকে আদর্শ (model) রূপে সামনে খাড়া করে সমালোচ্য গ্রন্থখানির গুণাগুণ বিচার করে থাকেন, আরেকটি হ'ল রচনার

বিষয় ও বিন্যাসকে যথাসম্ভব বিশবস্ত আনুগত্যে অনুসরণ ক'রে ক্রমাগত নিজের মননশীলতাও অভিনিবেশ প্রয়োগ ক'রে যাওয়া যাতে দেশ ও কালের সীমায় বাঁধা অথচ সেই বন্ধন মোচনে সদা উন্মুখ এক স্রষ্টার সত্তা, সমা-সমালোচক ও পাঠকের সামনে ধীরে ধীরে উন্মোচিত নিমীলিত হ'তে পারে। যে-কোন জনপ্রিয় তত্ত্বের চেয়ে এই পদ্ধতি অনেক বেশী কার্যকর, কেননা জীবনই এখানে প্রধান শিক্ষক যে জীবন প্রবহমান, ভাঙাগড়ার ভিতর দিয়েই লক্ষ্যাভিমুখী।

স্রষ্টা তারাশঙ্করের স্বরূপ নির্ণয়ে লেখক ঐ পদ্ধতিই গ্রহণ করেছেন। 'চৈতালী ঘূর্ণী' থেকে যে ঔপন্যাসিক নিজের চারিপাশের সমাজ সংসারের পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেকেও ভাঙতে ভাঙতে গড়েছেন, সময়ের অভিঘাতে আবিষ্কার করেছেন নিজেকে, পূর্ণতার উপলব্ধির আকাঙ্ক্ষা যাঁকে কাল থেকে কালান্তরে, স্থান থেকে স্থানান্তরে চেনা জগৎ থেকে অচেনা জগতে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে তাঁকেই লেখকও আবিষ্কার করতে চেয়েছেন ঐ পাঁচখানি উপন্যাসের ভিতর থেকে। এই সন্ধানের ঝুঁকি, কঠিন ব্রত উদ্‌যাপনের বন্ধুর পথ আনন্দেই বরণ করেছেন অমরেশবাবু।

প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো আটটি যে মূল অধ্যায়ে তিনি ঔপন্যাসিক তারাশঙ্করের গড়ে ওঠার পটভূমি এবং পাঁচখানি উপন্যাসের নানা দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন সেগুলি একই সঙ্গে পরস্পর সংযুক্ত আবার স্বতন্ত্র ও বটে। তাই প্রত্যেকটি অধ্যায়ই পৃথক বিচার বিশ্লেষণের দাবী রাখে। তবে এখানে স্থানাভাবে প্রধান দু'একটি বিষয়ের প্রতিই দৃষ্টিক্ষেপ করা হচ্ছে মাত্র।

প্রথমে ধাত্রীদেবতার কথাই ধরা যাক্। এক বিশেষ সময়ের বাঙালীর স্বদেশ চেতনা ও রাজনীতি এর সীমা বলে বাঙালীর দেশাভিমানের সঙ্গে এর স্বাভাবিক যোগ। উপন্যাসের নায়ক শিবনাথের শেকড় ক্ষয়িষ্ণু জমিদারীতে আর শিক্ষা-দীক্ষায় তার বেড়ে ওঠা পুঁজিবাদী সমাজের জীবন রসে। তার স্রষ্টা তারাশঙ্করেরও দীক্ষা সেকালের কাছে আর শিক্ষা একালের। সাম্রাজ্য-বাদী শক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলনের সঙ্গেও উভয়ের নিবিড় যোগ। হয়তো এজন্যই যুগপৎ মানসিক দৃঢ়তা এবং এক ধরনের রোমান্টিক স্বপ্নচারিতা শিবনাথের বড় হয়ে ওঠার ইতিহাসকে এতখানি জীবন্তও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছে। কেবলমাত্র মা আর পিসিমার অভ্যন্তরীণ পারিবারিক বিরোধে

নয় ঐ সময়ের সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক বৈপরীত্যের সংঘর্ষের ভিতর থেকেও বুঝে নিতে হয় শিবনাথকে। পাঠক এ-দিক থেকে কিছুটা অতৃপ্ত রেখেছেন তারাশঙ্কর; সমালোচক অমরেশবাবুর লেখাতেও এই দ্বন্দ্বের দিকটি আরো একটু সমাযোগ পেলে ভালো হত। সাম্রাজ্যবাদের শোষণযন্ত্র কলকাতায় বিপ্লবী সন্ত্রাস থেকে সশস্ত্র বিপ্লবের পথে যাত্রার প্রস্তুতি এবং অসংগঠিত শ্রমিক শ্রেণীর সংগঠিত হওয়ার উদ্যোগ যদি শিব নাথের মতো স্পর্শকাতর যুবকের চোখে না পড়ে থাকে তবে সে দোষ একা তারই। গণদেবতার আলোচনা ও বিশ্লেষণে কিন্তু অমরেশবাবু একেবারে লক্ষ্যভেদ করেছেন। ঔপন্যাসিকের ভারতদর্শন তথা "মহাকাব্যিক উপন্যাস রচনায় সাফল্য লেখকের অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে।" এক আশ্চর্য ও অবিস্মরণীয় উপন্যাস কবিতে তারাশঙ্কর যেন নিজেই নিজেকে অতিক্রম করে গেছেন। উপন্যাসের বিষয় প্রেম নিতাই বসন প্রমুখ তথাকথিত অন্ত্যজ নর-নারীর প্রেম। ঔপন্যাসিক সচেতন ভাবেই হিন্দুসমাজে ব্রাত্য মানুষ জনের মধ্যে স্রষ্টা ও প্রেমিকের চরিত্র পরম শ্রদ্ধা ও যত্নে এঁকেছেন। অমরেশ বাবু ঠিকই লিখেছেন 'মধ্যবিত্তের জীবন দৃষ্টি পরিহার করে তিনি এখানে জীবনকে দেখেছেন বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিতে এবং সামগ্রিক ভাবে। 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথার শিল্প মহিমার কথা বলতে গিয়ে সমালোচক সঙ্গতভাবেই আঞ্চলিক উপন্যাসের গুণ আর একটি বিশেষ মানব গোষ্ঠীর জীবন মরণের সংগ্রাম মুখর মহা কাব্যধর্মিতার প্রসঙ্গ এনেছেন। সমাজ ও প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়তে লড়তে নর-নারীর প্রাতিস্বিক রূপ কেমন ভাবে দানা বেধে ওঠে তা যেমন এই উপন্যাসের বিষয় তেমনি গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের জীবনে সংস্কারের শেকড় কত গভীর পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে সেই দিকটির উপরও ঔপন্যাসিকের দৃষ্টিভঙ্গী অনুসরণ ক'রে লেখক সাধ্যমতো তাঁর বিচারের আলো ফেলেছেন। আরোগ্য নিকেতন-এ 'আশঙ্কিত এবং আসন্ন মৃত্যুর অনুষঙ্গে' জীবনের গল্প বলা হয়েছে। জীবন ও মৃত্যু ও জীবনের রহস্য উন্মোচনের প্রয়াসের হাত ধরেই চলে এসেছে নতুন পুরাতনের দ্বন্দ্ব। তারাশঙ্কর বিশ্বাস করতেন সাহিত্য এবং আধ্যাত্মিক জীবনে কোনো বিবাদ নেই। মন্তব্যটি অবশ্যই তর্কাতীত নয়, তবে তাঁর বিশ্বাসের স্বপক্ষে শিল্পী সারাজীবন যত সন্ধান করেছেন তারই অন্যতম ফসল 'আরোগ্য নিকেতন'। মৃত্যুর রহস্য ভেদ করতে গিয়ে বারে বারে জীবনের কাছে ফিরে আসার এই কাব্যের বিচারে

অমরেশবাবু যে সচেতন সপ্রতিভ আবেশের এক পরিমণ্ডল রচনায় সফল হয়েছেন সেজন্য তাঁকে সাধুবাদ জানাতে হয়।

'ভাষা' অধ্যায়টি এই সমালোচনা গ্রন্থের উঁচু মানকে কিছুটা ক্ষুণ্ণ করেছে বলে মনে হয়। তাঁর বলার বিষয় অনেক থাকলেও কেমন করে বলতে হয় তা তিনি জানতেন না—এমন অসাবধানী অবিবেচনা প্রসূত উক্তির আজ হয়তো আর প্রতিবাদ করারও দরকার পড়ে না তবে ভিন্ন ভিন্ন উপন্যাসের পরিবেশ রচনা পরিস্থিতির বিশ্লেষণ, সর্বোপরি নানা চরিত্রের মেজাজ ও মর্জির রকম ফের বোঝাতে গিয়ে তারাশঙ্করও যে তাঁর ভাষায় প্রয়োজন মতো বিচিত্র বর্ণসমাবেশ ঘটিয়েছেন, সেখানেও যে তিনি ঈর্ষণীয় অধিকারী সে বিষয়ে আরো বিস্তারিত আলোচনা অবশ্যই দরকার ছিল। প্রতিমা প্রতীকের আলোয় তারাশঙ্করের শিল্পরীতির মূল্যায়নের দায়িত্ব কি অমরেশ বাবু নিতে পারতেন না? যা নেই তা নিয়ে এই আপশোষটুকু বাদ দিলে 'তারাশঙ্করের উপন্যাস' গ্রন্থটি আমাদের সমালোচনা সাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন সন্দেহ নেই।

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

তারাশঙ্করের উপন্যাস ঃ ডঃ অমরেশ দাশ। বামা পুস্তকালয়

দাম—আশি টাকা

বাংলা নাটক ঃ মরাঠি নাটক

সর্বসাকুল্যে দুশ আটত্রিশ পাতার বই। অথচ এত তথ্য সম্বলিত গ্রন্থ সাম্প্রতিক কালে অন্তত আমার বিশেষ চোখে পড়েনি? তার উপর বাংলা ভাষায় প্রাদেশিক সাহিত্যের সুলুক সন্ধানও বিশেষ পাওয়া যায় না, কেননা বড়জোর হিন্দী সম্পর্কে সাধারণ কিছু জ্ঞান থাকলেও দক্ষিণী সাহিত্যের প্রতি জনগণের আগ্রহেরই অভাব? অথচ আমরা জানি, তামিল, তেলেগু, মালয়ালাম এবং মারাঠী ভাষায় বহুকাল ধরে সৃষ্টিশীল রচনা চলে আসছে এবং ঐ সব ভাষায় বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন কালজয়ী নাটক উপন্যাস ও কাব্যের অনুবাদ কিংবা ছায়ানুসরণ হচ্ছে? ডঃ বিপ্লব চক্রবর্তী নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করার সময় বিন্দুমাত্র আলস্য না দেখিয়ে দক্ষিণী ভাষার নানা গ্রন্থ ও লেখক সম্পর্কে কিভাবে তন্নতন্ন অনুসন্ধান করেছেন; তার সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের সংযোগ খুঁজে ফিরেছেন তার মূল্যবান উদাহরণ সম্প্রতি প্রকাশিত তাঁর রচিত 'বাংলা নাটক ঃ মরাঠি নাটক' গ্রন্থটি। এখন একটি পরিশ্রমসাধ্য গ্রন্থ রচনার জন্য ড. চক্রবর্তী আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন।

ব্রিটিশ সরকার ও পরবর্তী স্বাধীন ভারতের সরকার কত না নাটক নিষিদ্ধ করেছে যুগের পর যুগ? বাংলা নাটক নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে দুটি বই লিখতে গিয়ে প্রাদেশিক ভাষায় নিষিদ্ধ গ্রন্থগুলি সম্পর্কে আমার পক্ষে আলোকপাত করা সম্ভব হয়নি? এই অভাববোধে আমি নিজেই পীড়িত হচ্ছিলাম। ড. চক্রবর্তী আলোচ্য গ্রন্থের প্রথম পর্বের দ্বিতীয় অংশে কয়েকটি সারণের সাহায্যে বিভিন্ন নাটকের নাম, নাট্যকারের নাম এবং নাটক নিষিদ্ধ হওয়ার বছর উল্লেখ করে অসাধ্য সাধন করলেন। তাঁর সিদ্ধান্ত হল, বাংলা ও মরাঠি নাট্যকাররাই দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ঢেউকে নাটকের মধ্যে রূপায়িত করায় এই দুই ভাষার নাটকের উপর রাজরোষ বেশি পড়েছিল। পরবর্তীকালে তাঁর এই আলোচনা আমার গ্রন্থকে সাহায্য করবে, এ কথা আগেই স্বীকার করে রাখছি। তবে, গ্রন্থকারের কাছে অনুরোধ রইল, পরবর্তী সংস্করণে তিনি যেন স্বাধীনোত্তর কালেও মরাঠি নাটকের উপর শাসকশ্রেণীর অপ্রসন্ন দৃষ্টি পড়েছিল কিনা, সেই বিষয়টি আলোচনা করেন।

যদি ধরেও নেওয়া যায়, বাংলা নাটকের বিকাশের ধারা নিয়ে ইতিপূর্বে একাধিক গ্রন্থ লেখা হয়েছে তবু এ কথা ঠিক একেবারে ১৯৯০-এর বাংলা নাটক সম্পর্কিত দিক নির্দেশ সেই সব বইতে নেই। প্রসঙ্গতঃ বাদল সরকারের 'বাকি ইতিহাস' (পৃঃ ৮৫), মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'চন্দ্রলোকে অগ্নিকান্ড' (পৃঃ ৮৮), শম্ভু মিত্রের 'চাঁদ বণিকের পালা' (পৃঃ ৯২-৯৩), উৎপল দত্তের 'টিনের তলোয়ার' (পৃঃ ৯৫), মনোজ মিত্রের 'চাকভাঙা মধু' (পৃঃ ৯৬), অরুণ মুখোপাধ্যায়ের 'জগন্নাথ (পৃঃ ৯৮), অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় অনূদিত 'তিন পয়সার পালা' (পৃঃ ৯৯) এবং সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'প্রাণের প্রহরী' (পৃঃ ১০০) নাটক সম্পর্কিত আলোচনা বাংলা নাটকের আলোচনার বৃত্তকে পূর্ণতা দিল এই গ্রন্থে। সেদিক থেকে নাট্যসাহিত্যের পড়ুয়ারা এই গ্রন্থ থেকে উপকৃত হবেন অবশ্যই।

উনিশ শতক ও বিশ শতকের মরাঠি নাটকের ইতিহাস পর্যালোচনা করতে বসে বিপ্লববাবু একদিকে যেমন তথ্যের সংগ্রহে নিষ্ঠার পরিচয় রেখেছেন তেমনি বিষ্ণুদাস ভাবের নাটক থেকে শুরু করে বিনায়ক জনার্দন, কোলহটকর খাদিলকর, ওয়েরেরকর, বাসুদেব খের, দীননাথ মঙ্গেশকর, নরসিংহ চিন্তামনি বোলকার, দেশপান্ডে, ভরতক, অনন্ত কানেকার প্রমুখ নাট্যকারদের পৌরাণিক ঐতিহাসিক সামাজিক নাটক সম্পর্কে নানা গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। এরা সবাই মূলত চল্লিশের দশকের পূর্ববর্তী নাট্যকার ?

এল চল্লিশের দশক। মুম্বাইয়ে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম প্রকাশ্য সম্মেলন হয় ১৯৪৩-এর মে মাসে। ঐ মাসেই প্রতিষ্ঠা হয় ভারতীয় গণনাট্য সংঘের। প্রথম মরাঠি গণনাটক তুকারাম সরমল করের 'দাদা' অভিনীত হল ১৯৪৩ সালেই। এ বিষয়ে নানা কৌতূহল মেটাতে পারে ড. চক্রবর্তীর এই বইটি। প্রগতি নাটকের মধ্যে দেশাই গুরুজীর কাঙাল ভারত (১৯৪৭), নানা যোগের 'ভারতী' (১৯৫২), আন্নাভাউ সাঠের 'মাঝি মুম্বাই' (১৯৫৬) উল্লেখযোগ্য। বাংলার নবনাট্যের মতই মরাঠি নবনাট্যের নতুন নতুন পরীক্ষাও শুরু হয়। আসে নাট্যরূপান্তরের জমজমাট গতি। কত নাট্যকার! অজস্র নাটক। এঁদের মধ্যে আবার ব্যতিক্রমী নাট্যকার হলেন বিজয় তেন্ডুলকর। তাঁর 'সান্ডতা। কোর্ট চালু আছে' (বাংলায় রূপান্তর 'চোপ আদালত চলছে), 'ঘাসীরাম কোতওয়াল' প্রভৃতির মঞ্চসাফল্যে প্রায় অতুলনীয়।

বিপ্লববাবু সাম্প্রতিক মরাঠি পথনাটকের প্রসঙ্গ, একক অভিনয়যোগ্য নাটক রচনার প্রতি উৎসাহ, সর্বোপরি দলিত নাটক রচনার প্রতি আগ্রহ নিষ্ঠার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। চতুর্থ পর্বের শেষে মরাঠি নাটকের যে কুড়িটি প্রবণতার প্রতি গ্রন্থকার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল: মরাঠি নাটকে সঙ্গীতে বাহুল্য; অ্যাবসার্ড নাটক রচনার প্রতি ঝোঁক: সেক্স ও ভায়োলেন্স প্রধান নাটকের সংখ্যাবৃদ্ধি, পৌরাণিক নাটকে আধুনিক জীবনের প্রতিফলন; মরাঠি নাটকে ফ্রয়েডীয় চিন্তার প্রতিবিম্ব। এরই পরম্পরা হিসেবে চতুর্থ পর্বে 'বাংলা ও মরাঠি নাটক পারস্পরিক সংযোগ ও প্রভাব' সুন্দর ভঙ্গিতে ব্যাখ্যাত। বর্তমান গ্রন্থে প্রতিটি ইংরাজী সালের উল্লেখ, বাংলা নাটক ও মরাঠি নাটকের কালপঞ্জী দুই ভাষার নাট্যের পাশাপাশি, তুলনামূলক এই আলোচনা গ্রন্থের মূল্য বাড়িয়েছে।

বিপ্লববাবুর ভাঁড়ারে মরাঠি সাহিত্যের অনেক রসদ এখনো লুকানো আছে। আমরা চাই, তিনি অন্ততঃ দুটি বই আরও লিখুন, বিষয় হোক এরকম—'বাংলা কথাসাহিত্য: মরাঠি কথাসাহিত্য'। 'বাংলা কাব্য: মরাঠি কাব্য।'

—রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা নাটক: মারাঠি নাটক
বিপ্লব চক্রবর্তী
রত্নাবলী, কলকাতা—৭০০০০৯,
মূল্য—৯০ টাকা

পদাতিকের কথা

অমিতাভ তার আত্মজীবনী 'পদাতিকের কথা'র ভূমিকায় লিখেছে 'আমার জীবনী লেখার উদ্দেশ্য নয়; আমার জীবনটা এমন কিছু নয় যা নিয়ে লেখা যায়।' কিন্তু তবুও সে নিজের কথাই লিখেছে বর্তমান গ্রন্থে। অবশ্য এই গ্রন্থে তার ব্যক্তিগত জীবনের কথা কমই আছে; তার রাজনৈতিক জীবনের কথাই বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। কিভাবে কিশোর বয়স থেকেই সে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে এবং পরবর্তীকালে রাজনীতিকেই তার জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে বেছে নেয় সেই কাহিনীই বর্তমান গ্রন্থে স্থান লাভ করেছে। অবশ্য তার রাজনীতিতে যোগদানের পিছনে তার পরিবারের বিশেষ অবদান

ছিল। তার দুই দাদাই সক্রিয়ভাবে রাজনীতি করতেন এবং দু'জনেই কারাবাস করেছেন।

১৯৫৩ সালে অমিতাভ মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজে এসে ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসে ভর্তি হয়। তার সঙ্গে তার এক দিদিও ঐ একই ক্লাশে ভর্তি হন। অমিতাভর সঙ্গে আমার পরিচয় তখন থেকেই। অমিতাভ মণীন্দ্র চন্দ্র কলেজে ভর্তি হওয়ার আগে সে আশুতোষ কলেজে ভর্তি হয়েছিল তা আমি জানতাম না। অমিতাভ লিখেছে, "মণীন্দ্র কলেজে প্রথম দু'বছর ফার্স্ট ইয়ার এবং সেকেণ্ড ইয়ার স্বতন্ত্র সত্তা বজায় রেখেই একসঙ্গে কাজ করেছি। দু'বছরেই আমি সর্বসম্মতিক্রমে ছাত্র ইউনিয়নের শ্রেণী প্রতিনিধি ছিলাম।' মণীন্দ্র চন্দ্র কলেজে অমিতাভ ইন্টারমিডিয়েট ক্লাশ থেকে আমার সহপাঠী ছিল ঠিকই কিন্তু তার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয় বি. এ. ক্লাশে পড়ার সময়। বোধহয় 'স্বতন্ত্র সত্তা' বজায় রাখার জন্যই ঐ দু'বছর তার সঙ্গে আমার পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়নি। আমরা মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজে পড়বার সময় থেকেই ছাত্র ফেডারেশনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ি। অমিতাভ যে রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত ছিল তার ছাত্র সংগঠনের নাম ছিল বিপ্লবী ছাত্র ব্যুরো। তার দল কমিউনিস্ট পার্টির গণসংগঠনগুলোর সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেয়। সেই অনুযায়ীই অমিতাভ তার মণীন্দ্র চন্দ্র কলেজের ছাত্র-জীবনের প্রথম দু'বছর স্বতন্ত্র সত্তা বজায় রেখে কাজ করে। পরে তার দলের একটা বৃহৎ অংশ যখন কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেয় তখন আর তাকে স্বতন্ত্র সত্তা বজায় রাখতে হয়নি। তখন সে ছাত্র ফেডারেশনের সক্রিয় কর্মী হিসাবেই কলেজে কাজ করেছে। যাই হোক বি,এ, পড়বার সময় ছাত্র ফেডারেশনের কাজ-কর্মের মাধ্যমে আমরা পরস্পরের কাছে আসি। কিন্তু অমিতাভর ঐ কলেজে ভর্তি হওয়ার পূর্বের ইতিহাস আমি কিছুই জানতাম না। হয়তো আমার ক্লাশের সহপাঠীদের মধ্যে কেউ কেউ জানত, কিন্তু আমি জানতাম না। সে-সব তথ্য জানলাম তার 'পদাতিকের কথা' পড়ে। অমিতাভর সঙ্গে আমাদের পরিচয় আরও ঘনিষ্ঠ হয় 'খসড়া সংস্কৃতি পরিষদের' কাজ-কর্মের মাধ্যমে। অমিতাভ লিখেছে 'খসড়া সাংস্কৃতিক পরিষদ'। কিন্তু ওটা হবে 'খসড়া সংস্কৃতি পরিষদ'। এই 'খসড়া সংস্কৃতি পরিষদের' নানা অনুষ্ঠানে যারা নিয়মিত অংশগ্রহণ করত তাদের সবারই নাম অমিতাভ দিয়েছে। প্রসঙ্গতঃ একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি। অমিতাভ অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচিতি

দিতে গিয়ে শুধু 'যাত্রা-পালাকার' লিখেছে। আমার কাছে ব্যাপারটা সঠিক মনে হয়নি। অসিত যাত্রার জন্য পালা লিখে এবং পরিচালনা করে খ্যাতি অর্জন করে অনেক পরে। তার প্রধান পরিচয় সে একজন দক্ষ অভিনেতা। নান্দীকার প্রযোজিত একাধিক নাটকে সে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অভিনয় করেছে। সুতরাং তাকে শুধু যাত্রা-পালাকার বলে পরিচয় দিলে তার প্রতি অবিচার করা হয়। আত্মজীবনীর লেখককে সত্যের প্রতি নিষ্ঠাবান হতে হয়। তা না হলে তার আত্মজীবনী ত্রুটিপূর্ণ হয়। মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজের ছাত্রছাত্রী কর্মীদের যে তালিকা সে দিয়েছে তাও অসম্পূর্ণ মনে হল। এত বছর পরে সবার নাম মনে রাখা সম্ভব নয় তা মানি। কিন্তু সে তার ভাগ্নে কল্যাণ দাসগুপ্তের স্ত্রী অঞ্জলির নাম বিস্মৃত হল কী করে? অঞ্জলি তো এক সময় 'খসড়া সংস্কৃতি পরিষদে'র হয়ে 'প্রস্তাব' নাটিকায় দীপেন এবং অজিতেশের সঙ্গে অভিনয় করেছিল।

প্রত্যেক আত্মজীবনীর মধ্যে কিছু আত্মপ্রচার লুকিয়ে থাকে। লেখক যতই নিজেকে আত্মপ্রচার বিমুখ বলে জাহির করুন না কেন, কিছুটা নিজেকে অন্যদের সামনে তুলে ধরবার ইচ্ছা আত্মজীবনীর লেখকের মধ্যে কাজ করে। না হলে তিনি আত্মজীবনী লিখতে বসেন কেন? অমিতাভ তাঁর 'পদাতিকের কথা'য় নিজের কথাই শোনাতে চেয়েছে। সেই প্রসঙ্গে এসেছে তার আর, সি, পি, আই দলে যোগ দেওয়ার ইতিহাস এবং পরবর্তীকালে সেই দল ত্যাগ করে অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদানের কথা। আর, সি, পি, আই দলের মতাদর্শগত যে বিরোধের ইতিহাস সে লিখেছে তার সত্যতা যাচাই করার অভিপ্রায় এবং যোগ্যতা আমার নেই। সেটা পারবেন তাঁরাই যাঁরা একসময়ে তার সঙ্গে আর, সি, পি, আই দলের হয়ে কাজ করেছেন। আত্মজীবনী হিসাবে তার গ্রন্থ পাঠকদের কাছে কতটা আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে সেটাই আমাদের আলোচ্য। মণীন্দ্র চন্দ্র কলেজে ছাত্রজীবন শেষ করার পর সে শিক্ষকতাকে পেশা হিসাবে বেছে নেয় এবং সেই সূত্রেই নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়। এই সংস্থার প্রতিনিধি হিসাবেই সে চেকোশ্লাভাকিয়ায়ও গিয়েছিল। এই শিক্ষক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ফলে সে যাঁদের সংস্পর্শে এসেছে তাঁদের কথাও লিখেছে। এঁদের মধ্যে যাঁর কথা সকলের আগে এসেছে তিনি হলেন শিক্ষক আন্দোলনের প্রয়াত নেতা সত্যপ্রিয় রায়। ১৯৬৯ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রীসভায় সত্যপ্রিয় রায়

যখন শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন তখন অমিতাভ তাঁর রাজনৈতিক সহকারীর কাজ করেছে। শিক্ষক আন্দোলনের আর এক বিশিষ্ট নেতা, যিনি বহরমপুরে উগ্রপন্থীদের হাতে নিহত হন, সেই সন্তোষ ভট্টাচার্যের কথাও বলেছে। শুধু সন্তোষ ভট্টাচার্যই নন্, সত্তরের দশকের সেই কালো দিনগুলোতে নিহত হয়েছিলেন শিক্ষক আন্দোলনের কয়েকজন প্রথম সারির নেতা। আক্রান্ত হয়েছিলেন বহু শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং শিক্ষাকর্মী। বহু শিক্ষক ও শিক্ষা-কর্মী স্কুল ছাড়া ও বাড়ী ছাড়া হন। অমিতাভ শিক্ষক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকার ফলে এইসব ঘটনায় বিচলিত হয়েছে, মর্মাহত হয়েছে। প্রয়াত নেতা প্রমোদ দাশগুপ্ত সম্বন্ধে সে যে স্মৃতিচারণ করেছে তাও সেই আপাত-কঠোর মানুষটির চরিত্রের অন্য দিকটি অনুভব করতে পাঠকদের সাহায্য করবে। আসলে অমিতাভ সেখানেই রাজনৈতিক ঘটনাবলীর নীরস বিবরণ ছেড়ে কোন ব্যক্তি সম্বন্ধে স্মৃতিচারণ করেছে সেখানেই এই আত্মজীবনীটি সুখপাঠ্য হয়ে উঠেছে।

'পদাতিকের কথা'র উপসংহারে অমিতাভ লিখেছে 'পদাতিকে'র পদযাত্রা শেষ হয়নি। বিপদ অসুবিধাকে ধৈর্যের সাথে গ্রহণ করে বাকি জীবনের সব সময়টুকু বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদে গভীর আস্থা নিয়ে তার পতাকাকেই আঁকড়ে ধরে থাকবো।' সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশের ঘটনাবলী থেকে শিক্ষা নিয়ে গণসংগঠনগুলোকে পার্টির সিদ্ধান্ত রূপায়ণের কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা উচিত নয় বলে সে মনে করেছে। কিন্তু প্রশ্ন হল, তার একক ইচ্ছাতে তা কি হওয়া সম্ভব? সে তো সাধারণ একজন পদাতিক মাত্র। তার ক্ষুদ্র কন্ঠ কি যথাস্থানে পৌঁছবে? এই আশঙ্কার কারণ হল, সে যে সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছে সর্বত্রই তার বিপরীত কাজই হতে দেখছি। তবু এই দুঃসময়ে সে যে সমাজতন্ত্রবাদের উপর আস্থা বজায় রাখতে পেরেছে সেটাই বড় কথা।

—সুবন্ধু ভট্টাচার্য

পদাতিকের কথা—অমিতাভ সেন
পরিবেশক ন্যাশনাল বুক এজেন্সী
১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩।
মূল্য—পঁয়ত্রিশ টাকা।

সাহিত্য সমালোচনা

গল্প বা উপন্যাস বিচারের ক্ষেত্রে আমাদের প্রথম সমস্যা হচ্ছে—আমাদের শিল্প সাহিত্য কাদের জন্য উদ্দিষ্ট ? ১৯০৫ সালে লেনিন জানিয়েছিলেন, শিল্প ও সাহিত্য সেবা করবে 'কোটি কোটি শ্রমজীবী মানুষকে।' প্রসঙ্গক্রমে একথাও ভাবতে হবে কিভাবে সেবা করতে হবে। সাহিত্য সাধনা কি নিয়োজিত হবে জনপ্রিয়তার স্বার্থে না কি সমন্নতকরণের কাজে ? সাহিত্য শিল্পের আলোচনাকালে আমাদের ভুললে চলবে না যে-যখন আমরা শিল্প-কর্মে নিযুক্ত হই তখন আমরা কাজ করতে চেষ্টা করি আমাদের নিজেদের কালের ও দেশের জনগণের জীবন থেকে সংগৃহীত শৈল্পিক ও সাহিত্যিক কাঁচামালের উপর। কেননা, যে কোন সাহিত্যকর্মই হচ্ছে ভাবাদর্শগতভাবে একটি নির্দিষ্ট সমাজজীবনের প্রতিফলনকারী মানব-মস্তিষ্কের উৎপাদন। বর্তমানে আলোচ্য পুস্তক তিনটির আলোচনাকালে আমরা মনে রাখতে চেষ্টা করবো যে, কোন শিল্পকর্মই হঠাৎ গজিয়ে ওঠা কিছু নয়। সমাজে চলমান দ্বন্দ্বের প্রতিফলনেই সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়। এবং একারণেই সাহিত্যপাঠ রসাস্বাদনেই শেষ হয় না—আমাদের চিন্তাকেও তা প্রভাবিত করে।

মোট সতেরটি গল্প নিয়ে গৌর বৈরাগীর গল্পগ্রন্থটি লেখকের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। তরুণ লেখকদের আন্তরিক বন্ধুত্বের কারণে লেখক বই প্রকাশে কোন সমস্যায় পরেননি। অনুষ্টুপ প্রকাশনার মাধ্যমে গ্রন্থটি প্রকাশ করতে পারায় লেখকের "প্রাপ্যের চেয়ে প্রাপ্তি অনেক অনেক। আমি গর্বিত।" ঘোষণাটি 'কিছু কথা'য় কেন সে করলেন বোঝা গেল না। গল্পের মধ্যে রসদ থাকলে তা প্রকাশ করাটাই প্রকাশকের কর্ম। কেননা, পাঠকরা পড়েন এবং প্রকাশকের বাণিজ্য সফল হয়। যাই হোক, একথা বলতে দ্বিধা নেই যে, লেখক বাক্য রচনায় ক্রিয়াপদ বর্জনে যে সাহস দেখিয়েছেন এবং অনেক গল্পেই বাক্য ব্যবহারে অকারণ পুনরুক্তি করে বেশ বিরক্তির সঞ্চার করেছেন ; যেমন ঃ

> হাত দুটো দুপাশে ছড়ান। দুচোখ বোজা। চোখ দুটো সেই সকাল থেকেই। তারপর থেকে পাতা দুটো একবারও খোলেনি··· গলার ভেতর ঘড় ঘড় শব্দ। [এখন কেমন ? পৃঃ ২২]
>
> আবার ২৩ পাতায় 'শ্বাস প্রশ্বাসের কাছে সেই একই রকম ঘড় ঘড় শব্দ। শুধু ওই শব্দটুকু ছাড়া। গলার কাছে নলীটা ওঠানামা করছে। বুকটাও। চোখ দুটো বোজা।

২৫ পাতার বর্ণনা : অনিমেষ বাইরে চোখ রাখল। জানালার বাইরে। ওপাশে বাগান। ছোট্ট। বাগানে সবুজ। গন্ধরাজ। একটা তাজা গোলাপ চারা।
'তখন অন্ধকার নামবে' গল্পের বর্ণনা : আড়াই কাঠার ধারে ধারে সুপুরি চারা। দুটো জবা। একটা টগর। গন্ধলেবু। পেছনে দুটো হাইব্রিড পেঁপে। বেঁপে ফল আসে। শুধু কদমগাছটাই তখন শিশু। [পৃঃ ১০৭]

ক্রিয়াপদহীন এই কাব্যগন্ধী ভাষার এই চিত্রধর্মিতা গল্পের পরিবেশ রচনায় খুব সার্থক হয়েছে বলে আমাদের মনে হয় না। তবে পাঠশেষে বলা যায়, লেখকের দৃষ্টি আছে। যেসব ছোট ছোট দুঃখ কথা প্রত্যহ বেতেছে ভাসি, তারই কিছু কথা নিয়ে লেখা গল্পগুলি অবশ্যই ছোট গল্পের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করেছে। গল্পগুলিতে একধরনের মৃদু বিদ্রূপ লক্ষ্য করা যায়। যেমন 'খেলতে খেলতে গল্পটি। ১৯৮৫-তে লেখা হলেও কাহিনীবৃত্তটি আজও সমানসত্য। মধ্যশ্রেণীর উচ্চাকাঙ্খা, সন্তানকে বড় করার নামে যে প্রহসন আজকের সমাজে কুৎসিত পরিবেশ তৈরী করছে তার অনবদ্য আলেখ্যে লেখকের সমাজ মনস্কতা ধরা পড়েছে। 'টুম্পার মুখে হিন্দি সিনেমার নায়কের বদলে পরিচিত ভিলেনের ছবি। অবিকল।' অনবদ্য। লেখকের কাহিনী নির্বাচন ভালো। বাক্যরচনায় আরো নিপুণতা আশা করি। ছাপা বাঁধাই ভালো।

শুভমানস ঘোষ তাঁর কড়কথা গল্পগ্রন্থের 'দুচার কথা'-য় জানিয়েছেন, 'এ বইয়ের সব গল্প সংশয়াতীত ভাবে সাবালক পাঠক প্রত্যাশী।' ঘোষণাটিতে আত্মবিশ্বাস যথেষ্টই রয়েছে, গল্পের কাহিনীগুলিও মন্দ নয়—সমকালীন রাজনীতি, দাম্পত্য সম্পর্কের ভাঙন ইত্যাদি ইত্যাদি। 'ভাইরাস' গল্পে দুই বন্ধুর ভালোবাসা আবিষ্কার মুগ্ধ করে। 'আরও এক মৃত্যু' গল্পে সুরেশবাবুর অ্যাবভ অ্যাভারেজ হয়ে ওঠার আখ্যান' কিংবা 'পাখীর অদৃশ্য পালক'-এ শ্রুতি ও দ্যুতিময়ের ভাঙন পুনরুদ্ধারের কাহিনীতে বর্তমান সময়কে লেখক বেশ মুন্সীয়ানার সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। ভাষা সাবলীল এবং বুদ্ধিদীপ্ত।

শ্রীদেবাশীষ রায় কৃত প্রচ্ছদটিও বেশ সাবালক। তবে ভেতরের পাতার মুদ্রণ আরো ভালো হওয়া আবশ্যক।

শেখ বাকের আলি প্রণীত 'অলীক কথা' উপন্যাসটি 'ষড়যন্ত্রের শিকার মৃত্যুহীন অমর কবি বেঞ্জামিন মোলায়েজকে উৎসর্গ করেছেন লেখক।

উপন্যাসটি পাঠ করলে বোঝা যায় যে, লেখকের উৎসর্গ পত্রটির সঙ্গে কাহিনীর সম্পর্ক অতি নিবিড়। বিখ্যাত স্বপ্নমেলার শিল্পী রসিক বেরসিকরা আড্ডায় বসেছেন—কিন্তু সব আড্ডাবাজরা নিজেদের আড্ডা ত্যাগ করে জমেছেন কবিদের আড্ডায়। উপন্যাসটির শেষ পর্যন্ত এই কবিদেরই বিজয় মিছিল। পৃথিবীর যাবৎ ধর্মীয় নেতাদের ধর্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ নয়—জীবন যে স্বর্গের যাবতীয় সুখোল্লাসে তৃপ্ত নয়—পয়গম্বরের চেয়ে কবিতা যে বড় এই স্বপ্নিলম্ব উপন্যাসটির উৎসকেন্দ্র। ১১৯ পাতায় এই কাহিনীরই পরিক্রমা।

আসলে সুখ-দুঃখ মিশ্রিত পার্থিব জীবনের প্রতি লেখকের মায়াময় আকাঙ্খার প্রতিবেদনই উপন্যাসটির মর্মবস্তু; বুদ্ধ-খৃষ্ট-মহম্মদ এখানে এসেছে লেখকের উপলব্ধ সত্যকে প্রতিষ্ঠার জন্য—কাহিনীর মধ্যে সেকারণেই কোন ব্যক্তি নায়ক বা নায়িকা হয়ে ওঠেনি।

লেখকের ইচ্ছা আন্তরিক। তবে লেখার সর্বত্র পারম্পর্য রক্ষিত হয়নি। উদ্দেশ্যহীন জীবন কি মানবের অভিপ্রেত? ২০ পাতায় বলছেন; 'আমাদের কোনো লক্ষ্য নেই। আরো উদ্দেশ্যহীন। মুখে যা আসবে তাই অমৃতসম।' আবার ৯০ পাতায় 'পাপকে নির্বিষ করতে পারে একমাত্র সুন্দর। আমরা সেই সুন্দরেরই উপাসক মাত্র।' কেননা, 'শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ পয়গম্বরের চেয়েও মহান হতে পারে'—[১১৭ পাতা]

লেখক জীবনের মহাকাব্য রচনায় ব্রতী হয়েছেন। সাধু প্রচেষ্টা। তবে কাহিনীবৃত্তটি বড় দীর্ঘ হয়েছে—আসলে একটি বড় গল্পকে উপন্যাস করা হয়েছে। ভাষা ভালো, কাহিনী অনুসারী। প্রচলিত প্রবাদসমূহের ব্যবহার জীবনাকুসারী। প্রাক্-কথায় লেখক বন্ধুবর শ্যামলবরণ সাহার কাছে ঋণ স্বীকার করেছেন প্রচ্ছদ এঁকে দেবার কারণে, অথচ শীর্ষপত্রের পেছনে লেখা রয়েছে প্রচ্ছদ : মদন সরকার—আসলে কে এঁকেছেন মনোরম প্রচ্ছদটি?

সর্বশেষে বলা যেতে পারে, তিনজন লেখকই গল্প বলতে চেয়েছেন মূলত মধ্যশ্রেণীর সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। লিখন ক্ষমতার ব্যবহার কেন হবে না 'কোটি কোটি শ্রমজীবী মানুষের জন্যে?

—মৃণাল দত্ত

গৌর বৈরাগীর গল্প / গৌর বৈরাগী, অনুষ্টুপ, ৫০'০০
শুভমানস ঘোষ, ওয়ান্ চার, ৩৫'০০
অলীক কথা / শেখ বারো আলি, পি ডি পাবলিকেশন, ৩০'০০

'সাত-সতেরো' – জনজীবনের

শিবাশিস দত্ত'র 'সাত-সতেরো' পশ্চিম বাংলার ব্যাপকার্থে গাঙ্গেয় অববাহিকার সাতটি জেলা, কলকাতা মহানগর ও শহরতলীর জনজীবনের একটা চালচিত্র। শিবাশিস চোখ খুলে, খোলা মনে মানুষদের দেখেছেন সমাজ জিজ্ঞাসার মনোভাব নিয়ে,কোন তত্ত্বের নীতি বৈশিষ্ট্যের প্রমাণ খোঁজার তাগিদ থেকে নয়। সেই দেখার ধারাবিবরণী একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের স্বতন্ত্রতা ধর্মী গ্রন্থ 'সাত-সতেরো'। জনজীবনের এই চালচিত্র অনতি অতীতের। গত প্রায় পাঁচ দশক ধরে এই রাজ্যে যে সমূহ পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে, সেটাই এই চালচিত্রের প্রেক্ষাপট রচনা করেছে।

একথা সাধারণভাবে স্বীকৃত যে জনজীবনের বহতা ধারা সমাজের কোন অংশকেই আগাগোড়া একই রকম থাকতে দেয় না। কিন্তু মানুষ কতোটা বদলাবে, পরিবর্তনের ধারায় একটা গ্রহণ বর্জনের দিক থাকে, সেই প্রক্রিয়া সচেতন ভাবে না ঘটলেও। তাই নতুনের পাশাপাশি কিছু জিনিস থেকে যায় যা সাবেকী, গতানুগতিক। ফলে যা নতুন সেটাও যেমন তার কিছুটা নতুনত্ব হারায়, তেমনি যা পুরনো সেটাও থাকতে পারে না আগের মতো। শিবাশিসের দেখা এই গ্রাম জীবনের ছবি গুলির বিষয়বস্তু লক্ষ্য করলেই সেটা বোঝা যাবে।

শিল্পায়ন, নগরায়ণের অভিঘাতে পশ্চিম বাংলার এই সব জেলায় গ্রাম জীবনে একটা আপাতঃ সচ্ছল জীবন যেমন চোখে পড়ে তেমনই খুব চেষ্টা করে না খুঁজেও দেখা যাবে সমাজের একাংশে দারিদ্র্য রয়েছে যথেষ্ট। তা তো নির্মূল হয়নি নির্মূল হওয়ার সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে না। এই ধরণের মানুষদের সঙ্গে একালে যুক্ত হয়েছে আরো কিছু মানুষ, যারা কার্যতঃ ঠিকানাহীন, কারণ তারা উদ্বাস্তু নয়, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সব খোয়ানোর দলে পড়ে না কোন ত্রাণ শিবিরের বাসিন্দা নয় তারা। তারা সামাজিক রাজনৈতিক কোথাও বা অর্থনৈতিক কিম্বা মূল্য বোধের ঘাটতি জনিত কারণে ঠিকানাহীন। 'তাহাদের কথা' শিরোনামে তাদের প্রসঙ্গ মনে দাগ কাটার মতো। এই রকমই আরো কিছু জীবন যাপনের ছবি লেখক তুলে ধরেছেন। যাদের এক পা গাঁয়ে এক পা শহরে, যাদের সংসারের দায়িত্ব আছে, অথচ

সংসার জীবনের স্বস্তিটুকু নেই। মালতী দীপা কিম্বা দীপার মা ঠিক এই রকমই জীবন যাপন করছে বছরের পর বছর।

মহানগরের চৌম্বকীয় আকর্ষণে সারা রাজ্যের মানুষ যখন শহরমুখী হয়ে ওঠার প্রবল তাগিদ অনুভব করে তখনও সেই একমুখী টানে গা ভাসিয়ে দেওয়ার ইচ্ছে থাকলেও শক্তি, সামর্থ্য থাকে না অনেকেরই। তাই একটা টানাপোড়েন চলে অবিরাম যেখানে শেষ পর্যন্ত জয় হয় শহুরে ভাবের। তবে সেই শহুরে ভাব গ্রাম জীবনের আর্থ সামাজিক বনিয়াদে কোন প্রতি-ষ্ঠানিক আদল গড়ে তোলার বদলে চালান করে তার ভোগবাদী মানসিকতা, মেয়েদের মনে রূপটানের চর্চা; বিউটি পার্লারের জম্মা দেয় বিনোদনের জন্যে ভি ডি ও ক্লাব আর 'সেগ পিকচার্সের' রমরমে বাজার।

মানুষের দৃশ্যমান জীবনের যে চেহারা উন্নয়নের প্রাথমিক অভিঘাতে কিছুটা বদলে যায়, ভাঙাচোড়া সাবেকী জীবনের নড়বড়ে ভিৎ যে তাতে ভেঙে পড়ে না এই অভিজ্ঞতা সব দেশেরই। তাই উন্নয়নের কর্মসূচিতে কোথাও কোথাও জমে ওঠে টি ভি। তবে একটা জিনিস তা হলো সমাজে ব্যাপক ভাবে একটা আত্মসম্মান বোধ, স্বাবলম্বী হওয়ার আকাঙ্খা, যা নিম্নবর্গের জীবনেও বলিষ্ঠ ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। বাংলার আদিবাসী সমাজেও যে তার ছোঁয়া লেগেছে তার ছবি রয়েছে গড় জঙ্গল বিষ্ণুপরের পরিবৃত গ্রাম জীবনে। যদিও অন্যত্র আদিবাসী জীবন জঙ্গলের অধিকার হারিয়ে, মাদলে বোল তুলতে ভুলি যাচ্ছে।

খোলা মনে মানুষ আর গ্রাম দেখতে শিবাশিস জেলায় জেলায় ঘুরে বেড়ানোর সময় এমন কিছু মানুষের দেখা পেয়েছেন যারা প্রায় অন্য কালের অন্য সমাজের মানুষ। যেমন নালিকুল বাজারের রবীনবাবু, কাটোয়ার পাবনা কলোনির বাসিন্দা ট্রেনের হকার কল্যাণ দত্ত, পবিত্র মাসি, সিঙুর গোপালনগরের সুকুমার দা ও সুজিত হরিপাল ঘোষ পাড়ার নন্দলাল, মাটি কাটার দলের গৌরহরি, মেদিনীপুরের মুড়াভাঙ্গা গ্রামের মালতী মমু। এ-সবেরই পাশাপাশি শিবাশিস দিয়েছেন গ্রাম বাংলার অঞ্চলের 'দশঠাকুরী প্রথা' মেলাক গ্রামের 'নুড়ি বাবা'র খবর। পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ। জন জীবনের রাজনীতিকরণ, রাজনৈতিক দুর্নীতি, ভোট কালচার আর বাংলার বারো মাসে তেরো পার্বণের মতো 'ভোটের পরব' কথা। এই ধরণের কিছু কথা দৈনিক পত্র পত্রিকাতেও থাকে খবর হয়ে। শিবাশিসের ধারা-

বিবরণী সে জাতের নয়। জানা কথা আরেকবার মশলা দিয়ে পরিবেশন করার বদলে এখানে দেওয়া হয়েছে জানা কথায় নতুন মাত্রা। এই রকম বহুতর খণ্ড চিত্রের সমাহারে গড়ে উঠেছে সমকালের গ্রাম জীবনের এক অনবদ্য ছবি, যার বেশির ভাগটাই অজানা ছিল।

'সাত-সতেরো' চিত্র মালার দ্বিতীয় অংশে রয়েছে শহর জীবনের ছবি। যেমন প্রথমেই 'বিরজু বড় হয়ে কি করবে' তার একটা অন্তরঙ্গ চিত্র, যেখানে বিরজু বিশেষ থেকে নির্বিশেষ সত্তায় পরিণত হয়ে যায়। 'দুনের মেলা' রচনায় সাধুবাবা, তাকে ঘিরে ভক্তবৃন্দের উদ্বেগ আর উন্দীপনার লোক দেখানো কিম্বা লোক হাসানো কাহিনী, বৃদ্ধ সাধুবাবার কাগজের বাটিতে জমানো ছানার পায়েস খুঁটে খেতে প্রায় শিশুতে পরিণত হওয়ার ছবি, ছেলে মানুষ করার ছেলে মানুষি ছবি, ইংরেজি শেখার হৈচৈ পর্ব, পুজোর ভাবনা, গঙ্গাজলে ভক্তির কথা, কফি হাউসের আড্ডা, আর কিছু সহযাত্রী, সহযোগী মানুষদের কথা যেমন হেমদা, ভামদা কথা, সেক্স ওয়ার্কার আর যৌন শিক্ষার কথা এবং আরো কত কি।

এই সব টুকরো টুকরো ছবির মিছিলকে 'সাত-সতেরো' গ্রন্থের ভূমিকায় তারাপদ সাঁতরা মশায় বলেছেন ক্যামেরার 'স্ন্যাপ শট'। এই আলোচকের কিন্তু মনে হয়েছে এগুলি মুভি ক্যামেরার ছবির মতো। সম্পাদকের হাতে এমন মুভি ক্যামেরার ছবিগুলি একটা নিটোল কাহিনীর রূপ নেয়, কোন সমাজতাত্ত্বিক 'সাত-সতেরো' থেকে তেমনই পেতে পারেন সমকালীন গ্রাম শহরের আলোড়িত জীবনের একটা দলিল চিত্রের উপকরণ। শিবাশিসের দৃষ্টিভঙ্গিতে জীবনকে জানার ইচ্ছা, আকাঙ্খার এমন একটা তীব্র আগ্রহ আছে, চলমান জীবনের অন্তরঙ্গ ছবি তুলে ধরার মধ্য দিয়ে সমাজতত্ত্বের আলোচনাকে জীবনমুখী করতে সাহায্য করে। লেখক ঘুরেছেন অনেক কিন্তু ভাবতাড়িত হয়ে নয়, বিশ্বাসের প্রামাণিকতা খোঁজার তাগিদেও নয়। তাই এতে মানুষের একটা মিছিল চোখে পড়ে, যাদের আপাতঃ স্বাতন্ত্র্যের মধ্যেও রয়েছে একটা জীবন বোধের অন্বেষা, যা হার মানতে চায় না। শিবাশিসের বাচনভঙ্গিতেও রয়েছে সরস কৌতুক, দেখা ছবিকে কথায় ফুটিয়ে তোলার ক্ষমতা যা হয়তো সহজাত।

—বাসব সরকার

'সাত-সতেরো' শিবাশিস দত্ত, কথাশিল্প, ১৯৯৮ দাম : পঁয়ষট্টি টাকা

দ্বিতীয় জন্ম : পাঠকেরও

সত্যপ্রিয় ঘোষ প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল জুড়ে বাংলা প্রগতি সাহিত্যের একজন কারিগর রূপে আমাদের কাছে সুপরিচিত এক নাম। একজন কথা সাহিত্যিক ও সাহিত্য সমালোচক রূপে প্রগতি সাহিত্য ধারার সঙ্গে যুক্ত পাঠক ও লেখকরা তাকে একান্তই আপনজন মনে করেন। সত্যপ্রিয় বাবুর গোর্কি বা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়সহ নানা প্রসঙ্গের মূল্যবান সাহিত্য পর্যালোচনাগুলির নিবিড় পাঠ করলেই যে কোনো সচেতন সাহিত্যব্রতী পাঠকই এক্ষেত্রে অবশ্যই সহমত পোষণ করবেন। তাঁর প্রকাশিত উপন্যাস এবং অপ্রকাশিত পাঠেও এই প্রতীতি জন্মানো অসম্ভব নয় যে এই সুযোগ্য লেখক আজ জীবন সায়াহ্নে পৌঁছেও তাঁর প্রাপ্য যথাযোগ্য সম্মানটুকু থেকে বঞ্চিতই রয়ে গেলেন। সত্যপ্রিয় ঘোষের দ্বিতীয় সংকলন 'দ্বিতীয় জন্ম' এর জন্য 'প্রত্যয়' প্রকাশনীর সুরেশ ভদ্রকে ধন্যবাদ।

আসলে সংকলনের দশটি গল্পের নামই রাখা যেত 'দ্বিতীয় জন্ম'। কিন্তু দশটি বিভিন্ন নামেই গল্পগুলির পরিচিতি। নাম বিভিন্ন হলেও তিনটি বিষয়ে সকল গল্পেরই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এক। ১। গল্পের পাত্র-পাত্রী যাদের নিয়ে লেখক লিখতে চেয়েছেন তারা সকলেই সমাজের চোখে ব্রাত্য এবং অন্ত্যজ শ্রেণীর। ২। ঘটনা পরম্পরায় এদের জীবনের পরিবর্তন ঘটেছে যা দ্বিতীয় জন্ম হয়েছে ৩। মধ্যবিত্ত তথাকথিত শিক্ষিত সমাজের অন্তঃসার শূন্যতা ও ভন্ডামী নগ্নভাবে প্রকাশিত হয়েছে। ৪। এছাড়া চতুর্থ বৈশিষ্ট্যটি উল্লেখ করা যা অত্যন্ত জরুরী তা হ'ল সংকলনটির অন্তত অর্ধেক গল্পে উঠে এসেছে দেশভাগ জনিত দুঃখ বেদনা ও হাহাকারের চালচিত্র।

'দ্বিতীয় জন্ম' নামক কাহিনীটিকে আর একটু পল্লবিত করলে অনায়াসে উপন্যাস বলা যেত। লেখকের গল্প বলার ধরণে কিছু মৌলিকত্ব রয়েছে। একটু তির্যক ভঙ্গিতে প্রয়োজনীয় হিউমার মিশিয়ে তিনি কাহিনীর পারিপার্শ্বিকতা ও চরিত্রের যে উপস্থাপনা করেন—তাতে আপাত দৃষ্টিতে লেখকের নিরুত্তাপ ও নিস্পৃহ মনের প্রকাশ ঘটলেও—নানা খুঁটিনাটি ডিটেলে তা পরিপূর্ণ। তখনই বোঝা যায় কাহিনী থেকে লেখককে আপাত ভাবে দূরবর্তী বলে মনে হলেও তিনি এর প্রতিটি চরিত্রের সঙ্গে

নিবিড়ভাবে যুক্ত। গল্পের প্রতিটি ঘটনা, বিষয় ও কুশীলবদের তিনি অত্যন্ত কাছ থেকে দেখেছেন এবং ঘনিষ্ঠ ভাবে চেনেন। এমনকি এদের অতীত জীবনের কাহিনীও যে লেখকের অজানা নয় তাও বোঝা যায় টুকরো টুকরো ফ্লাশ ব্যাকে সেগুলির আলেখ্য থেকে। অনেকগুলি গল্পের স্থান বা এলাকা হয় শিয়ালদহ রেলইয়ার্ড, তার অফিস বা তৎসংলগ্ন বেলেঘাটা ক্যানাল (মারাঠা ডিচ) সংলগ্ন অঞ্চল। বোঝা যায় কর্মসূত্রে বা অন্যভাবে প্রবীণ লেখক এসব আধা বস্তি বা দরিদ্র অঞ্চলের নানা ধর্ম বর্ণ ও ভাষাভাষী মিশ্র মানব গোষ্ঠীকে অত্যন্ত কাছ থেকে শুধু পর্যবেক্ষণই নয়, তাদের হৃদয় ছুঁয়েও দেখেছেন।

'দ্বিতীয় জন্ম' গল্পের সময়কাল ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর অযোধ্যায় বাবরি মসজিদ ভেঙে ফেলার পরবর্তী দাঙ্গার রক্তাক্ত ও থমথমে মুহূর্তের আগে পরে। ভারতবর্ষ জুড়ে এই সাম্প্রদায়িক হানাহানি শুরু হয়ে যাবার পরেও কোন আশ্চর্য শক্তিতে পূর্ব কলিকাতার ট্যাংরা অঞ্চলের ময়লা খালের পাশে বিবিবাগান বস্তিতে হরনাথ চক্রবর্তীর ছোটপুত্র অধ্যাপক কৃষ্ণ মহম্মদ চক্রবর্তীর সঙ্গে অজ্ঞাতকুলশীলা এতিমা হক এর শুভ বিবাহে কোন ব্যাঘাত কেন ঘটলো না সেই রহস্যের সন্ধান পাওয়া যাবে, এই গল্পের মূল নায়ক, ওপার বাঙলা থেকে এসে যার দ্বিতীয় জন্ম ঘটেছিল—সেই বরদা প্রসন্ন ঘোষ ওরফে বরদা উকিল ওরফে উকিল দাদুর জীবন আহুতির মাধ্যমে।

'দ্বিতীয় জন্ম' হয়েছিল আরো একটি উপন্যাসোপম বড়গল্প 'গ্রামে'র নায়ক ভবনাথ বিশ্বাসেরও। সর্বস্ব খুইয়ে পূর্ববঙ্গ থেকে চলে এসে দমদম এলাকার লালগড়ে উদ্বাস্তু কলোনীর মধ্যে তিনি আবিষ্কার করেছিলেন একটি জিনিষ প্রাণ থাকতে কখনও খোওয়া যায় না—তা হল অর্জিত বিদ্যা। তাই বরিশাল জেলার পিরোজপুরে মহকুমায় চন্দ্রদ্বীপ পরগণায় মহিষাপোতা গ্রামের সাতপুরুষের ভিটামাটির মায়া পরিত্যাগ করে এলেও মহিষাপোতা ন্যাশনাল পাঠশালার হেডপণ্ডিত ভবনাথ বিশ্বাস পাঠশালাটির মায়া ছাড়তে পারেন নি। ওই নামেই তার 'দ্বিতীয় জন্মে দমদমের এই লালগড়ে পাকা-পাকি বাস করতে এসে খুললেন 'মহিষাপোতা ন্যাশনাল 'পাঠশালা (কোচিং স্কুল)'। অপর কোনও শিক্ষক না থাকলেও তিনি হলেন প্রধান শিক্ষক—সেই মহিষাপোতার মতই। কিন্তু এ হেন শিক্ষকও পারলেন না তার সাত কন্যার পর ঘর আলো করা একমাত্র পুত্র সন্তান গোবিন্দ মাণিক্য কে মানুষ

করতে। গোবিন্দ বারো বছর বয়স থেকেই সবচেয়ে ভাল শিখলো 'পেটো ঝাড়তে, যত্রতত্র যাকে তাকে ঝাড় দিয়ে বেড়াতে, ওয়াগণ ভাঙ্গতে এবং ছুরি চলাতে।" তারপর একদিন যখন লালগড়ের দক্ষিণের দৃশ্যপটটি দ্রুত পালটে গিয়ে কালীরাদহের জলাভূমিকে আজকের কালিন্দী হাউসিং এস্টেট বানানোর জন্য সরকারি লরিতে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের তিরিশ হাজার সি এফ টি ঘেঁস এসে পড়লো—তখন গোবিন্দ মাণিক্যর বাহিনীর নতুন রোজগারের উৎস ঘেঁস খুঁড়ে কয়লা উত্তোলন ও বিক্রয়। তারপর একদিন লালগড়ের দাদুর সাতরাজার ধন এক মাণিক গোবিন্দ মাণিক্য চাপা পড়ে গেল সেই ঘেঁসের সুড়ঙ্গের নিচে। মাটি তাকে গ্রাস করলো। ভবনাথ বিশ্বাস, হেডপণ্ডিতের দ্বিতীয় জন্মও ব্যর্থ হয়ে গেল নীরব হাহাকারে।

'তাস' গল্পের ছিন্নমূল উদ্বাস্তু পরিবারটির দ্বিতীয় জন্ম ঘটে কলকাতার কলাবাগান বস্তির একটি বড় সড় এজমালি হলঘরে। লেখকের বর্ণনায় ঘরটি বিশাল এবং জিনিসপত্র মেলা। রাতে শয়নের জন্য তেরোটি বিছানা পেতে ফেলার পর ঘরটাকে দেখায় যেন বড়োসড়ো একটা স্টিমারের পাটাতন, তার একটা কেবিনও আছে আবার। ট্রাংক উপর উপর রেখে এবং একপাশে কাপড় চোপড়ের আলনা দিয়ে পার্টিশন করে দিব্যি একখানা ঘেরা তৈরি হয়েছে, রাত্রে সেখানে শয়ন করেন গৃহকর্তা শ্যামলকান্তি। দেশের স্বাধীনতার লাভের জন্য পার্টিশনের আগে এই পরিবারটির বিত্তের জোর তেমনটি না থাকলেও এক ঘরে গোটা পরিবারকে রাত কাটাতে হত না। কলকাতার কলাবাগান বস্তির মধ্যে কুড়িখানা ঘরসমেত ছ-তলা একটা বাড়ির তিন তলার এই ঘরটি আকৃতিতে অন্য ঘরগুলির তুলনায় দ্বিগুণ তো বটেই, উপরন্তু এর দেয়াল জুড়ে রামায়ণের রঙিন ফ্রেসকো। পূর্ব-দক্ষিণ জুড়ে টানা খোলা বারান্দা এক দেয়াল জুড়ে আবার কাঠের আলমারি বসানো—উদ্বাস্তুদের পক্ষে পঞ্চাশের দশকে মহানগরীর বুকে এ রকম বাসস্থান তো স্বর্গ। এই স্বর্গ আয়ত্ত হয়েছে কেননা জ্যেষ্ঠপুত্র মনোজ রেলের চাকুরে, পূর্ব পাকিস্তান থেকে বদলি হয়ে তাকে কলকাতায় আসতে হবার দরুণ রেলের পুনর্বাসন ব্যবস্থার সে এটি পেয়েছে। ছেচল্লিশের দাঙ্গা উপদ্রুত কলাবাগানের হিন্দু পরিত্যক্ত এই শূন্য ভবনটি রেলতরফে ভাড়া নেওয়া হয়েছে, কুড়িটি ঘরে কুড়িটি পরিবারকে পুনর্বাসিত করা হয়েছে আটচল্লিশ সালে। এখন পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি। রাত্রে ঘরটা স্টিমারে পরিণত হলে ও চিন্তা কী, আড়াল খুঁজতে

চাও তো বারান্দায় পালাও না। সেখানে যা ইচ্ছে করো। হাসো, কাঁদো, কবিতা লেখো, নিষেধ তো নেই কিছুতে।”

এ হেন ঘরের পরিবারটির একমাত্র সখ রাত্রে তাসের আসর বসানো। সখ ? না ব্রে-খেলার মাধ্যমে নিজে গাধা হয়ে আর অন্যকে গাধা বানানোর মজা উপভোগ করে দিনগত পাপক্ষয়কে একটু সহনীয় করে নেওয়ার চেষ্টা, কিন্তু অরুণার কী হবে ? অরুণার বসন্তের দিন গুলি থেকে একটা একটা করে পাতা যে ঝরে যাচ্ছে। গল্পকারের ভাষায়—

“মনোজের ঠাকুমা অর্থাৎ নির্মলকান্তির মা আশি বছরের বুড়ি মহামায়া ঘরটার এক কোণে হয়ে বসে গুমরে গুমরে পোড়াকপালের কাঁদুনি গাইছিলেন তিনি ধকধকে চোখে ঝামটা দিয়ে বললেন, ‘খেলবি খেলবি তোরা খেল, অরুণা শান্তা যেন না খেলে, পেত্যহ হারা রাইত উজাগের কইরা তাস খেললে শরীলের থাকে কিছু ? কাইল আইব মাইয়া দেখতে, আর অখনে তেনারা রাইত পোয়াইব তাস খেইলা! তুই মাইয়ার বাপ, খুড়া, তোর একটু হুশ নাই! পিছা মার কপালে! কয়না, জিব পুড়ল আস্ত দোষে, কি করব আমার হরিহর দাসে।’

“আরে ঐ সম্বন্ধটা তো হইব না। দেখতে আইব আহুক। হইব না সে জানা কথাই।” নির্মলকান্তি বললেন। তিনি অরুণার পিতা।”

‘পাগলা ঝোরা’ গল্পটি আর এক অরুণাকে নিয়ে বলা। ইনি অরুণা দিদিমণি, মেয়েদের স্কুলের টিচার। দুপুরের বালক বিভাগের স্কুলের এক ছাত্রর বেয়াদপির শাস্তি তিনি দিয়েছিলেন। তারপর যা হয়—ছাত্রদের অযৌক্তিক রোষ-ক্ষোভ-ধর্মঘট-ঘেরাও। যে সহকর্মীরা ছিল অরুণার প্রতি স্নেহশীলা এই উটকো ঝামেলায় পড়ে তারাও যেন কেমন বদলে যায়। অরুণা কোনও ভুল করেনি জেনেও তারা বিরক্ত হয়ে উঠতে থাকে অরুণার প্রতি। মধ্যবিত্তশ্রেণীর স্বার্থপরতার চেহারাটা গল্পকার এভাবেই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে চেয়েছেন। ছাত্ররা পরে অবশ্য সুবিধাপ্রসূত ব্যবহারই করে। অরুণার কাছে ক্ষমা চায়। ছাত্র-শিক্ষকের নিবিড় সম্পর্কের একটি মানবিক খণ্ডচিত্রও গল্পটিকে সমৃদ্ধ করেছে।

‘মেল’ এবং ‘ট্যাহা’ গল্পদুটি সমধর্মী। রেলের বিভাগীয় অফিসের এক অফিসার হাওড়া বিভাগ থেকে বদলি হয়ে যাচ্ছেন অনেক দূরে, সকরিগলি-ঘাট। আর চাপরাসীটি বদলি হচ্ছে একই অফিসের এক সেকসন থেকে অন্য

সেকশনে। অফিসের ইউনিয়নের বাবুরা কিছু একটা বিপ্লবাত্মক ঘটনা ঘটানোর নেশায় বা সখে ঠিক করে চাপরাশি ঢোরা কুর্মি-রই বিদায় সম্বর্ধনার ব্যবস্থা করবে। হৈ হৈ করে তা হয়েও যায়। হাতে রসগোল্লার ঠোঙা আর গলায় মালা পরে ঢোরা কুর্মী একেবারে হতবাক—কিংকর্তব্যবিমূঢ়। সে ভাবতে বসে একা নির্জনে পায়খানা ঘরে লুকিয়ে—তবে কি সত্যই তার নব-জন্ম হল। যুগ কি সত্যিই পাল্টালো? নয়তো এত সম্মান তার চৌদ্দ পুরুষ তো কোনো কালে পায়নি। কিন্তু অচিরেই তার স্বপ্নভঙ্গ হল। ফেয়ারওয়েলের মাত্র কিছু সময় পরেই বড়বাবুর পান আনতে অস্বীকার করার ফলে (আসলে তো ঢোরা কুর্মী বাবুদের দেওয়া এই অনুষ্ঠানকেই অন্তত আজকের মত মর্যাদা দিতে চাইছিল—সে তো বিশ্বাস করেছিল এই সম্মান সত্য) যেভাবে অফিসের বাবু সমাজ তার উপর মারমুখি হয়ে উঠল তাতে বাবুদের তথাকথিত প্রগতিশীল বিপ্লবের ফানুস গেল ফেঁসে। পেটি-বুর্জোয়া মানসিকতা ও শ্রমিকশ্রেণীর চেতনা যে মিলতে পারে না তা ঢোরা কুর্মী নিজের মত করে বুঝে নিল। তেলে-জলে মিশ খায় না।

'ট্যাহা' গল্পের উমারানী সরকার স্কুলের পরিচারিকা। নতুন কিছু করার আগ্রহে প্রধান শিক্ষিকা সহ আরও দু'তিন জন স্কুলের পারিতোষিক-দানের অনুষ্ঠানে আচমকাই তার হাতে একটা কাগজে লিখে মানপত্র ধরিয়ে দিয়েছিল। সঙ্গে ফুলের মালা এবং কাশ্মীরী শাল। ঢোরা কুর্মীর মত উমারানীও সে সময় বিহ্বলতায় প্রায় অচেতন। এমনকি মানপত্রটি সুন্দরভাবে লিখে কেন বাঁধিয়ে দেওয়া হ'ল না—সে ছোটপদে চাকরি করে বলে না গরীব বলে—এমনধারা কূট চিন্তাও উমারানীর মাথায় আসেনি। বস্তুত কাগজের টুকরোটা প্রধান শিক্ষিকার কাছ থেকে নেওয়াও প্রয়োজন মনে করেনি সে। মাসখানেক পরে শুভবুদ্ধি সম্পন্না এক তরুণী শিক্ষিকা মাধুরী (যে প্রকৃতই জানত স্বামী পরিত্যক্তা এই মহিলার সামান্য বেতনের অর্থেই কত দরিদ্র পরিবারের ছাত্রীর পড়াশোনা চলে—তার খবর) মানপত্রটি বাঁধিয়ে, সুন্দর করে শিল্পীকে দিয়ে অলঙ্করণ করে নিয়ে হাজির হল উমারানীর কুটিরে। তখন উমারানী কি বলতে পারে না 'গরীব মাইনষের লগে আবার তামাসা।' কিন্তু মাধুরীর শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতা উমারানীর এই বিশ্বাস অন্তত প্রতিষ্ঠা করেছিল যে অন্তত মাধুরী তামাসা করছে না। সে সত্যিই তার গুণগ্রাহী। সমধর্মী গল্প হলেও ঢোরা কুর্মীর প্রতি বাবু সমাজের অবিচার খানিকটা

লাঘব হয় বোধহয় উমারানীর প্রতি রাধুরীর স্নেহময়ী ও শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণে। তখনই বোঝা যায় শুধু শ্রমিক শ্রেণী নয় মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকেও একজন ভাল বিপ্লবী তৈরি হতে পারে—এই ধারণা কেন সঠিক।

রেলের অফিসে স্বামীর (ফায়ার ম্যান) কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুর পর সদ্য চাকুরি পাওয়া মালতীও (পিওন) বুঝতে পারে তার সাথে দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া আপিসের বাবুদের (দিদিদের নয়) ব্যবহারে কেমন যেন সহমর্মিতার অভাব। শুধুমাত্র নীচুতলার লোক বলে নয় একজন স্ত্রীলোক রূপেও সে পুরুষকেন্দ্রিক কর্মস্থলে কেমন যেন অপাঙ্‌ক্তেও। তাই দেখা যায় 'আলোকিত অন্ধকার' গল্পে অফিস সুপারিনটেন্ডেন্ট হরমোহন নন্দী চিৎকার করছেন "এ জাতকে যত লাই দেবে ততই এরা মাথায় উঠবে।...ওগো মেয়ে কী যেন তোমার নামটি, মালতী, তুমি এদিক পানে এসো।...মেয়েছেলে পিওন এ আপিসে অচল, তা সরকার যখন ঘাড়ে ফেলল বইতে হাব।

আমি কাজ চাই, বোয়েচ।... মাথাটাতা আর ঘুরচে না তো? মাথা ঘুরবেই বাপু, এই বাজারে ঝপাং করে চাকরিতে ঢুকেই তিনশো ছত্তিরিশ টাকা চুয়াত্তর পয়সা মাস মাইনে। বপে রে! আমার বড়ো ছেলে ডিস্টিংশনে বি. এ. পাশ করে টিউশানি করে একশোটি টাকা উপায় করতে হোদিয়ে যাচ্ছে। আর তুমি? ইংরিজি এ. বি. সি. ডি. চেনো না কিন্তু ঢুকেই তিনশো ছত্রিশ টাকা চুয়াত্তর পয়সা মাস মাস। তদুপরি উইডো পেনশন, তা বেশ, তা বেশ। ....এই বাজারে কি চাকরিই পেয়েচ, অ্যাঁ।...কিন্তু মেয়ে, এ খবর রাখো কি, ঐ সার্কুলার আসা ইস্তক অফিসের কত বাবু লাইনে ঝাঁপাতে উদ্যত হয়ে আচে? ঠিক কিনা কালী? বল? ঐ যে হাজরা, ও-ও ঝাঁপাতে চায়নি? আয় তোতে-আমাতে একসঙ্গে ঝাঁপাই।"

অফিসের বড়বাবুর এই জাতীয় আক্ষেপের মধ্যে পুরুষ শাসিত সমাজের একটি দৃষ্টিভঙ্গিও যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে দিনগত পাপক্ষয়ের মধ্যে অতিবাহিত বঞ্চিত কেরাণী সমাজের রিক্ততার হাহাকারও যা মনকে স্পর্শ না করে পারে না। তাই পিওন মালতী চক্রবর্তীর প্রতি আপাত রুক্ষ ব্যবহার সত্ত্বেও ও. এস হরমোহন নন্দীর প্রতিও পাঠকদের সমবেদনা জাগে। লেখক এখানে সফল শুধু নয—ধনবাদী সমাজের শ্রেণীবিন্যাসের প্রকৃত রূপকারের কৃতিত্বও তার।

সত্যপ্রিয় ঘোষের কলমের তীব্র শ্লেষে বিদ্ধ হয় সমকালীন মধ্যবিত্ত বুদ্ধি-

জীবি সমাজ। একজন ভূগোলের অধ্যাপিকা যিনি নাবালিকা শিশুদের গৃহ পরিচারিকার কাজে খাটান প্রায় ক্রীতদাসীর মতন, ভিক্ষুক শিশুকে তাড়ান পথের কুকুরের মতন এবং সেই কাজে তার সশস্ত্র সাথী হয়ে যিনি এগিয়ে আসেন তিনি নামী কোনও দৈনিক সংবাদ পত্রের সহযোগী সম্পাদক —যার এবারকার সম্পাদকীয় বিষয়বস্তু হল শিশু শ্রমিকদের উপর শোষণের প্রতিবাদ। বুদ্ধিজীবি সমাজের এই দ্বিচারিতার চিত্র আঁকা হয়েছে 'কলম এবং তার খাপ' গল্পে।

'দলছুট' গল্পে বেজী নামে চিত্র গল্পকার এঁকেছেন তারক চালচলো-হীন, জন্ম-পরিচয়, শিক্ষাদীক্ষা হীন একদল কিশোর কিশোরী তাদের আমরা নিত্য দেখি স্টেশনে, প্লাটফর্মে, রেলইয়ার্ডের আশে পাশে। ফুটপাতে, পথে ঘাটে। তাদের শৈশব কৈশোর বলে কিছু যেন নেই। জন্মের পর থেকেই তারা যেন প্রাপ্তবয়স্ক। প্রয়াত সমরেশ বসুর কোনো কোনো গল্পে তার ছবি রয়েছে যেমন 'পরিচয়ে' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত খিচক বাজা সমাচার'। সত্যপ্রিয় বাবুও তাদের জীবনের ট্রাজেডী ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর অনুতপ্ত কলমে।

গল্প গ্রন্থটির অন্যতম মর্মস্পর্শী গল্প হল 'আগে বালির বস্তা' যার নায়ক যুবক দেবাশিস দত্ত। লেখকের ভাষায় : "দেবাশিসের মতো ছেলে শেষে এমন কান্ড করবে তা আমার কল্পনার বাইরে ছিল। দেবাশিস আমার ছাত্র। আমার খুব প্রিয় ছাত্র।···দেবাশিসের বাপ নিতাই দত্তকে আমি পার্টিশনের আগের থেকে চিনি। পার্টিশন মানে স্বাধীনতার আগে নিতাই উত্তর বাংলার পাবনা জেলার ছোট একটা শহরে এক হাইস্কুলের পিওন ছিল বটে কিন্তু দেবাশিস স্কুলপিওনের ছেলে না। দেবাশিসের যখন জন্ম হয় তখন নিতাই রেলের বয়লার মেকার খালসী।" একজন খালসী কি ইস্কুলের পিওনের চাইতে বেশী কুলীন? হয়তো হবে। নয়তো দেবাশিস কেন লেখাপড়া শিখবে কেনই বা স্কুলে রবীন্দ্রনাথের 'শুচি' কবিতা নাট্যরূপ দিয়ে মঞ্চস্থ করবে; কেনই বা হতে চাইবে কবি অথবা দার্শনিক। বামপন্থী রাজনৈতিক দলের একনিষ্ট কর্মী এবং লিটল ম্যাগাজিনের পাতায় নিয়মিত কবিতার লেখক কবি দেবাশিস দত্তকে কেনই বা পেটের তাগিদে রেলইয়ার্ডের কুলির চাকুরিতে ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে একমণী বালির বস্তা তোলার পরীক্ষা দিতে হয়, কিভাবে সে ব্যর্থ হয় এবং গোটা জীবনের ব্যর্থতার জ্বালা বুকে

নিয়ে তাকে সেই কাণ্ডটাই ঘটাতে হয়—যা শত শত বেকার যুবক যুগ যুগ ধরে আমাদের দেশে করে আসছে—সেই হৃদয় বিদারক কিংবা মাথায় রক্ত তুলে দেওয়ার কাহিনী আমাদের শুনিয়েছেন সত্যপ্রিয় ঘোষ।

'দ্বিতীয় জন্ম' সংকলনে যে গল্পগুলিকে গল্প বলা হচ্ছে পাঠকরা পড়লেই বুঝতে পারবেন এর একটিও গল্প নয়। প্রত্যেকটিই সত্য ঘটনা—যা সেই পঞ্চাশের দশক থেকে আজ পর্যন্ত ঘটে এসেছে, ঘটে চলেছে। সামাজিক দায়বদ্ধ, মানবতাবাদী সাহিত্যিক রূপে সত্যপ্রিয় বাবু তাকে ভাষা দিয়েছেন মাত্র। দেশ বিভাগের যন্ত্রণা তিনি জানেন। এই গ্রন্থের প্রতিটি গল্পই এই দেশ বিভাগ জনিত কারণে ছিন্নমূল হয়ে যাওয়া মানুষজন ও তাদের সন্তান সন্ততিদের জীবন সংগ্রামে জয় পরাজয়ের অমোঘ কাহিনী। শুধুমাত্র দেশভাগ বা উদ্বাস্তু জীবনের (বা তাদের দ্বিতীয় জন্মের) বাস্তবস্পর্শী দলিল মাত্র এই ছোটগল্প সংকলনটি নয়—এগুলির মধ্যে আমাদের প্রাত্যাহিক জীবনের এমন কিছু সত্য উপাদান লুকিয়ে রয়েছে যা আমাদের ভাবায়। এবং কাঁদায়।

—সুশান্ত

দ্বিতীয় জন্ম সত্যপ্রিয় ঘোষ। প্রত্যয় ২৪/১ বি, ব্রিক রো, কলকাতা-১৪ মূল্য : ষাট টাকা। প্রচ্ছদ : আলী আকবার।

স্মৃতিচারণা : সময়ের দলিল

পরিকল্পিতভাবে এ দেশের কমিউনিস্ট আন্দোলন, বিশেষত গ্রাম-গ্রামান্তর এই আন্দোলনের প্রসার সম্পর্কে প্রামাণিক ও বিস্তৃত ইতিহাস লিখিত হয় নি। অথচ গ্রামের অশিক্ষিত ও পশ্চাৎপদ কৃষক দিন-মজুর আর খেটে খাওয়া নানাবিধ জীবিকার গরীব মানুষের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাব বিস্তার কমিউনিস্ট আন্দোলনের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কংগ্রেসকে বাদ দিলে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও নিপীড়িত জনগণের স্বার্থে কাজ করার এমন ঐতিহ্য আর কোন রাজনৈতিক দলের নেই। অসংখ্য কর্মীর কত দুঃখবরণ স্বার্থত্যাগ ও আত্মবলিদানের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে এই ঐতিহ্য। তাই সেই সব কর্মীদের কথা ও তখনকার ঘটনাবলীকে বাদ দিয়ে কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস সম্পূর্ণ হতে পারে না। আর সেই ইতিহাস যদি অলিখিত থাকে তবে সেটাও হবে এক অপূরণীয় ক্ষতি। তবে সান্ত্বনার কথা এই যে, পুরনো দিনগুলির সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত কেউ কেউ স্মৃতিচারণার মাধ্যমে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরতে চেষ্টা করছেন। এই উদ্যোগ অবশ্যই অভিনন্দন যোগ্য এঁদের কাছে কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস সম্পর্কে আগ্রহী মানুষের কৃতজ্ঞতার সীমা নেই, অন্যদিকে এঁদের লেখা থেকেই হয়ত একদিন সামগ্রিক ইতিহাসের মালমশলা সংগ্রহ করা হবে।

আজকের আলোচ্য গ্রন্থটিও স্মৃতিচারণামূলক। লিখেছেন কুমার মিত্র। তিনি ও তাঁর অগ্রজ সমর মিত্র ছিলেন চল্লিশ দশকে খুলনা জেলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের অগ্রণী নেতা। সমর মিত্র ছাত্রাবস্থায় জাতীয় কংগ্রেসের ডাকে লবণ সত্যাগ্রহে যোগ দিয়ে আইন অমান্য করে জেলে যান। সেই সময় সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সহিংস ও অহিংস উপায়ে সংগ্রামরত বেশ কয়েক হাজার যুবক ইংরেজের কারাগারে বিনাবিচারে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। তাঁদের মুক্তির দাবিতে দেশব্যাপী আন্দোলনের ফলে ৩৮-৩৯ সালে সরকার তাঁদের মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। সমর মিত্রও ছিলেন এঁদের মধ্যে। উল্লেখযোগ্য, জেলখানায় রাজনৈতিক বন্দীদের অধিকাংশ রুশ বিপ্লব ও মার্কসবাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, এবং জেলের বাইরে এসে তাঁরা কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়ে শ্রমিক-কৃষক ও গরীব জনসাধারণকে সংগঠিত করে

সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক গণসংগ্রাম পরিচালনার কর্মসূচী গ্রহণ করলেন। সমর মিত্রের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কুমার মিত্র ও তাঁর কিছু সংখ্যক বন্ধু কমিউনিস্ট আন্দোলনের সর্বক্ষণের কর্মীরূপে আত্মনিয়োগ করেন, খুলনার পাইকগাছা থানার কয়েকটি গ্রামকে কেন্দ্র করে। এঁরাই কমিউনিজম ও মার্কসবাদ, এই দুটি শব্দের সঙ্গে খুলনার গ্রামের মানুষের প্রথম পরিচয় ঘটালেন। তাদের সামনে রাখলেন বিভিন্ন গণসংগঠনের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান। কিন্তু তাদের সংগঠিত করার কাজটা আদৌ সহজ ছিল না। প্রথম সমস্যা ছিল বিশ্বাস অর্জন করার। নানা সমস্যায় জর্জরিত দারিদ্র্য পীড়িত ও শোষিত কৃষক দিনমজুর জেলে তাঁতি ইত্যাদি পেশার মানুষ স্বাভাবিক কারণেই উঁচু সম্প্রদায়ের প্রতি সন্দিহান, কেননা মহাজন জোতদার জমিদার প্রভৃতি মানুষ তো এই উঁচু সম্প্রদায়েরই অন্তর্ভুক্ত।

এ কথা বলা অতিরঞ্জিত হবে না যে চল্লিশ দশকের কমিউনিস্টদের প্রায় সবাই ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ আদর্শবাদী। কুমার মিত্রের স্মৃতিচারনায় সেই সময়ের কর্মীদের আদর্শনিষ্ঠা শৃঙ্খলা ও ত্যাগের দীপ্তি প্রতিটি পৃষ্ঠায় ফুটে উঠেছে। ত্রিশের দশক থেকে বর্তমান কাল—এই সময়কে ঘিরে তাঁর অভিজ্ঞতার দলিলচিত্র। আমরা দেখতে পাই কেমন করে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় আন্দোলনের বিকাশধর্মিতার নিয়ম মেনেই তার প্রবাহে যুক্ত হয় কমিউনিস্ট ভাবধারা, যা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষকে সমাবিষ্ট করে। ত্রিশের দশকের লবণ আন্দোলনের সত্যাগ্রহী সমর মিত্রই চল্লিশের দশকে কমিউনিস্ট হয়েও সাম্রাজ্যবাদকেই প্রধানতম শত্রুরূপে চিহ্নিত করছেন। কিন্তু এর পাশাপাশি তাঁরা সাধারণ মানুষের সমস্যাও দুঃখকষ্ট সম্পর্কে চোখ বুজে থাকেন নি। বরং এই সব ব্যাপারে বেশি পরিমাণে নজর দিয়ে স্বাধীনতা প্রাপ্তির মধ্যেই যে তাদের মূল সমস্যার সমাধান নিহিত রয়েছে সেই উপলব্ধিই তাদের মধ্যে সঞ্চারিত করা হতো।

যারা খুলনা জেলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন, কুমার মিত্র ছিলেন তাঁদের একজন। প্রথম থেকেই তিনি সর্বক্ষণের কর্মী, এবং নিজের যোগ্যতায় সাধারণ সদস্যপদ থেকে এক সময় পার্টির জেলা কমিটিতে যেতে পেরেছিলেন। অতএব তাঁর স্মৃতিচারণা তথ্যবহুল হওয়াই স্বাভাবিক। তাঁর সময়ের খুলনা জেলার ছোট-বড় অনেক কর্মীর পরিচিতি যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে বহু বিপর্যয় ও উত্থান পতনের ঘটনাবলীর মধ্যে জনচেতনার

ক্রমবিকাশের ধারা। সঙ্গে সঙ্গে এসেছে সেই সময়ের সমাজ জীবন ও সাংস্কৃতিক জগতের আরও অনেক ব্যক্তিত্ব ও ঘটনাবলীর প্রসঙ্গ। অবশ্য সব-চেয়ে গুরুত্ব পেয়েছে চাল্লিশ দশক। সেটাই স্বাভাবিক। এই দশকটির মত গুরুত্বপূর্ণ ও ঘটনাবহুল দশক বোধহয় এই শতাব্দী আর দেখেনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ; জার্মানি কর্তৃক সোভিয়েট রাশিয়া আক্রান্ত এবং কমিউনিস্টদের বিচারে যুদ্ধের চরিত্র বদল—সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ থেকে জনযুদ্ধ; তথাকথিত জাতীয়তাবাদীদের সমালোচনা উপেক্ষা করে পথে পথে 'জনযুদ্ধ' পত্রিকা বিক্রি; সম্ভাব্য জাপানী আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ার জন্য গেরিলা-যুদ্ধের প্রস্তুতি ও ট্রেনিং; যুদ্ধজনিত দুর্মূল্যতা ও জিনিসপত্রের আকাল; দুর্ভিক্ষের করাল আবির্ভাব অনাহারে ঘরে ঘরে হাহাকার ও মৃত্যু, বাজার থেকে সমস্ত খাদ্যদ্রব্য উধাও; কমিউনিস্টদের সর্বশক্তি নিয়ে ত্রাণকার্যে ঝাঁপিয়ে পড়া, খাদ্য আন্দোলন, লঙরখানা খুলে ক্ষুধিত মানুষের মুখে খাদ্য জোগান দুর্ভিক্ষই শেষ নয়, নতুন ফসল উঠার মুখে ভয়াবহ আন্ত্রিক রোগের মহামারি মহামারি কবলিত মানুষের সেবা কাজে আত্মনিয়োগ, মেডিকেল রিলিফ সেন্টার খোলা; দুর্ভিক্ষ ও মহামারির ফলে জেলে তাঁতি ইত্যাদি পেশা সংকট এবং তাদের সেইসব সংকট মোচনের জন্য নানাবিধ পরিকল্পনা কার্যকরী করা; তীব্র সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ভ্রাতৃত্ববোধ জাগিয়ে তোলার প্রচার; তেভাগা আন্দোলনের মধ্যে কৃষকদের শ্রেণীচেতনার প্রকাশ; দেশ বিভাগ; পূর্ব পাকিস্তানের উগ্র সাম্প্রদায়িক শক্তি ও সরকার কর্তৃক কমিউ-নিস্টদের উপর ভয়াবহ দমননীতি; কারাবরণ কয়েক বছরের জন্য; কারা মুক্তির পরপারও অসংখ্য মানুষের মত পূর্বপাকিস্তান ত্যাগ করে এদেশে আসা; নতুন অবস্থায় নতুন করে জীবন সংগ্রাম আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য, এখান-কার নানা অভিজ্ঞতা ইত্যাদি ইত্যাদি। একজন কমিউনিস্টের দায়বোধ থেকে প্রতিটি পরিস্থিতিতে কুমার মিত্র তার যথাযোগ্য কর্তব্য নির্ধারণ করেছেন। আরও অনেক নিবেদিত প্রাণ কর্মীর মত একটি আদর্শ ও স্বপ্ন বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে তিনিও ছিলেন দৃঢ়সংকল্প বদ্ধ। তাঁদের সময়কার নিষ্ঠা ও ত্যাগবরণের মানসিকতা বর্তমান যুগে দুর্লভ। কুমার মিত্র তাঁর স্মৃতির ভান্ডার উজার করে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন একটি হারিয়ে যাওয়া সময়ের ছবি। এই একান্ত আত্মকেন্দ্রিকতার যুগে সেটাকে কল্পিত ছবি বলে মনে হতে পারে। তবু প্রকৃত ইতিহাসবিদ ও সমাজতত্ত্ববিদের কাছে এর

মূল্য রয়েছে। সামাজিক বিবর্তনের সেই অধ্যায়টিকে উপযুক্ত মর্যাদায় তাঁরাই হয়ত একদিন চিহ্নিত করবেন, আর সেই কাজে কুমার মিত্রের মত আরও অনেকের স্মৃতিচারণাই হয়ত হবে তাঁদের কাছে ইতিহাসের প্রধান মালমশলা।

—রঞ্জন ধর

যুগান্তরের পথিক, কুমার মিত্র, সচ্চিদানন্দ পাঠাগার, গড়িয়া, কলকাতা ৭০০০৮৪, দাম পঞ্চাশ টাকা।

খুলে যাক অন্ধকারের দ্বার
ভেঙে যাক অন্ধঘরের দ্বার

লেখক শ্রী প্রফুল্ল কুমার সরকার এক অভিনব পদ্ধতিতে একটি মূল্যবান গ্রন্থ আমাদের উপহার দিয়েছেন। 'ধর্মসন্ত্রাস বনাম বিজ্ঞান চেতনা।' অজয় ও আনন্দের চিঠির চাপান উতোর। অজয়ের সমস্যা জিজ্ঞাসা আনন্দের যুক্তি-উত্তর। অবশ্য লেখক প্রথমেই তার 'নিবেদন'-এ কবুল করেছেন—ধর্মসন্ত্রাস বনাম বিজ্ঞান চেতনা' পাণ্ডিত্য অহমিকার ফসল নয়, এ হলো 'নিজ হাতে গড়া মোর কাঁচা ঘর খাসা 'জাতীয় সৃষ্টি'। লেখকের বিনয়। অথচ এই বিনয়ী লেখকের কলমেই আমরা জানলাম—ধর্ম কি? বিভিন্ন ধর্মের উৎপত্তি কি জন্য; এর পেছনে কারা; কি তাদের উদ্দেশ্য? দুর্বলচিত্ত মানুষের বুকে কি ভাবে ধর্ম বাসা বেঁধে কুসংস্কারে পরিণত হয়? কি উদ্দেশ্যে ধর্মে ধর্মে হানাহানি,—অর্থাৎ ধর্ম সন্ত্রাস।

অজয় ও আনন্দ দু'জন অন্তরঙ্গ বন্ধু। সংখ্যালঘু। সাবেক পূর্ব পাকিস্থানে লেখাপড়া করেছেন, বড় হয়েছেন। অধুনা বাঙলা দেশেও একসঙ্গে ছিলেন। কোন এক অজ্ঞাত কারণে ১০ই ডিসেম্বর'৯২ এর পূর্বে আনন্দ বাংলাদেশ ত্যাগ করে ভারত তথা কলকাতায় বাস করছেন, আর অজয় পড়ে আছে বাংলাদেশেই। ৬ই ডিসেম্বর'৯২ সেই অভিশপ্ত দিনের ৩ দিন পরে শুরু হলো অজয় ও আনন্দের চিঠিপত্রে যোগাযোগ। প্রথমে অজয়ের চিঠি তারপর আনন্দের উত্তর—এই রকম ছয় আর পাঁচ মোট ১১ টা চিঠি নিয়েই এই ধর্মসন্ত্রাস বনাম বিজ্ঞান চেতনা।

লেখকের বস্তুনির্ভর যুক্তি ও কলমের অনবদ্য মোচড়ে অজয়ের সব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন অত্যন্ত সাবলীল ও দৃঢ় প্রত্যয়ে। আর আমাদের চোখের সামনে একের পর এক ভেসে উঠেছে ধর্মের ভয়ঙ্কর রূপ। নিষ্পেষণের কালো হাত। লেখক প্রশ্ন তুলেছেন যা নেই তাকে বিশ্বাস করে আস্তিক—আর যা আছে তা বিশ্বাস করে আমরা নাস্তিক হলাম কি করে? মানুষ যদি ঈশ্বরেরই সৃষ্টি হয় তবে একজন মানুষ ভাল কাজ করে স্বর্গে—আর এক জন অন্যায় করে নরকে শাস্তি ভোগ করেন কেন? সেই শাস্তি তো ঈশ্বরেরই প্রাপ্য। তর্ক নির্ভর বিশ্লেষণে দেখিয়েছেন—ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই, ধর্মের

সৃষ্টি কর্তা কিন্তু মানুষ মুখোসধারী স্বার্থন্বেষী। তারা প্রথমে ধর্মের আফিং খাইয়ে বোকা ও দুর্বল চিত্ত মানুষকে বাগে আনার চেষ্টা করে আর সেই চেষ্টা ফলপ্রসূ না হলেই শুধুমাত্র অন্য ধর্মকেই নয়—নিজ ধর্মকেও গলা টিপে ধরে।—উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন পূর্ব পাকিস্থান ও পশ্চিম পাকিস্থানের লড়াই। ইরাক-কুয়েত যুদ্ধ।

লেখক অত্যন্ত বিনীত ভাবে জানিয়েছেন—'আমি বিজ্ঞান বিষয়ের ছাত্র ছিলাম না।' ছাত্র না হয়েও বিজ্ঞান, বিশেষ করে জ্যোতির্বিদ্যার তার অসাধারণ পাণ্ডিত্য শিক্ষকের স্তর ছুঁয়ে ফেলেছে। তার অসামান্য লেখনীতে রূপ কথার মহাকাশ আমাদের কাছে জীবন্ত হয়ে ধরা দেয়। আমরা জানতে পারি—গ্রহ-উপগ্রহ বিপুল নক্ষত্ররাজির অস্তিত্ব উদ্দেশ্য কার্যকারিতা। বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় ও তার অবাধ বিচরণ। বিজ্ঞানীদের দুরূহ সমস্যা ও তার দুর্বোধ্য সমাধান—লেখক কত সহজ করেই না আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

বিশাল বিষয় নিয়ে লেখা এই ক্ষুদ্র পরিসরের বই শুধু মাত্র কৌতূহলী পাঠক নয়, জিজ্ঞাসু ছাত্রদেরও খুব উপকারে আসবে।

পরিশেষে অত্যন্ত বিনম্র চিত্তে একথা বলতে চাই যে—আনন্দের অকাট্য যুক্তি মেনে অজয়ের নবজন্ম হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু যারা যুক্তি দিয়ে আখের বোঝেন, আর ঈশ্বরকে রাখতে চান যুক্তির বাইরে, এ ছাড়া রয়েছে আমাদের দেশের অসংখ্য নিরক্ষর মানুষ জ্ঞানের আলো যেখানে পৌঁছয় নি, অন্ধকারে যাদের বাস—কবজ, মাদুলী তুক্‌তাক্ যাদের ভরসা, যারা এখনও বিশ্বাস করেন—সন্তান না জন্মানো শুধুমাত্র নারীত্বের অক্ষমতা, তাদের চোখ উন্মীলিত করবে কে?

—দুলাল ঘোষ

ধর্মসন্ত্রাস বনাম বিজ্ঞান চেতনা। লেখক প্রফুল্ল কুমার সরকার প্রকাশক: বিশ্বদেব বিশ্বাস বেলেডাঙ্গা চাকদহ, দাম—পঁয়তাল্লিশ টাকা।

ট্র্যাজিক নায়ক সুভাষচন্দ্র

'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের ট্রাজিক নায়ক সুভাষচন্দ্র'—কোনো গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ নয়। নিছক এক বারো পৃষ্ঠার পুস্তিকা। লেখক বলাই চক্রবর্তী। সুভাষচন্দ্রের সমগ্র রাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডের এক মার্কসীয় সমীক্ষা। পুস্তিকাটিতে তথ্য যেমন আছে তেমনি আছে লেখকের চমক দেওয়া মন্তব্য।

সুভাষচন্দ্রের অনন্য একক ব্যক্তিত্ব তৎকালীন সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলির কাছেই স্পর্ধিত ব্যতিক্রম। তাই সুভাষচন্দ্রকে নিজেদের মাপে ছোট করে ছেঁটে ফেলতে চেয়েছিলেন। গান্ধীজীর ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সুভাষ ব্যক্তিত্বের লড়াই-ই যে কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্রের টিকে না থাকার কারণ, তা তিনি স্পষ্টতঃ কোথাও বলেননি অথচ বিভিন্ন উদ্ধৃতি দিয়ে বলতে চেয়েছেন 'গান্ধী নীতির কূটকৌশলকে ভারতীয় জাতীয় স্বার্থে ধাতস্থ করার প্রয়োজন ছিল সুভাষ-চন্দ্রের।' তা তিনি পারেন নি শুধুমাত্র আবেগ সর্বস্ব জাতীয়তা বোধের জন্য।

তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টির সুভাষ বৈরীতা প্রসঙ্গ নিয়ে এই পুস্তিকায় এক দীর্ঘ আলোচনা আছে। তথ্য ও তত্ত্ব দিয়ে তিনি বুঝিয়েছেন সুভাষচন্দ্র ও ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সম্পর্ক—'সমন্বয় ও সংঘাত'-এর।

ওটেন সাহেব সুভাষকে গ্রীক উপকথার হাইক্যারাসের সঙ্গে তুলনা করেছেন। আবার নীরোদ সি চৌধুরী বলেছেন সুভাষ কলকাতার এলিটদের প্রতিনিধি। ভাষণ কান পাতলা, অথবা লেখকের নিজের উপমা সুভাষ যেন মহাভারতের কর্ণ, ট্রাজেডির নায়ক, তার ভাগ্য যেন নিয়তিতাড়িত, মেপে জুপে চলতে পারলে স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হতে পারতেন। মন্তব্যগুলি বিতর্কিত হলেও মজা লাগে পড়তে।

এই ক্ষুদ্র পুস্তিকার প্রতিটি পাতায় অসংখ্য পুস্তকপাঠের প্রতিলিপি, উদ্ধৃতি আছে, তিনি হিমালয়ের মত বিরাট, দিগন্তের মত প্রসারিত, আকাশের মত সমুন্নত, অথচ ধূলিধূসর মৃত্তিকায় লীন।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে কোনো ব্যক্তিত্বের মূল্যায়ন করতে হলে গান্ধীর প্রাসঙ্গিকতা অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু পুস্তিকার প্রথমপর্বে

গান্ধীর প্রাপ্য ভূমিকা অনালোচিত ছিল। ২য় সংস্করণে তাই 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন : গান্ধীজী ও সুভাষচন্দ্র' শিরনামে একটি ৪ পৃষ্ঠার সংযোজন দেওয়া হয়েছে, নয়তো স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে যেকোনো আলোচনাই গান্ধী বর্জিত হলে পক্ষপাতদুষ্ট হত।

পরিশেষে সুভাষচন্দ্রের দর্শনে তৎকালীন কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের প্রভাব প্রধানতঃ চিত্তরঞ্জন দাশ-এর প্রভাব তেমনভাবে উল্লেখিত হয়নি। সুভাষচন্দ্রের জীবনদর্শনে চিত্তরঞ্জন দাশের প্রভাব বহুলাংশেই ছিল তা সুভাষচন্দ্র নিজেই স্বীকার করেছেন। পরে হয়তো তাঁর নিজস্ব বিপ্লবী রোমান্টিকতায় তেমন ভাবে চিত্তরঞ্জন দাশের প্রভাব ধরা পড়েনি, তবুও।

—প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায়

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে ট্রাজিক নায়ক-সুভাষচন্দ্র □ বলাই চক্রবর্তী □ দাম ৫ টাকা

"উত্তরা" ও প্রবাসী বাঙালিদের সাহিত্য উদ্যোগ

নিজেদের ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে প্রবাসী বঙ্গ সন্তানগণ যে কত অনুভূতিপ্রবণ, দেশের নানা প্রান্তে দীর্ঘ প্রবাস-জীবনের মাধ্যমে তা প্রত্যক্ষ করার সুযোগ আমার হয়েছিল। অবশ্য এ অভিজ্ঞতা অন্তত চল্লিশ বছর আগের। এর মধ্যে প্রবাসী মানুষের জীবন ও দৃষ্টিভঙ্গীর অনেক পরিবর্তন ঘটেছে কঠিন বাস্তবতার তাগিদে, কিন্তু তথাপি তাঁদের সেই অনুভূতিপ্রবণতা যে একেবারে শুকিয়ে যায়নি তার সাক্ষ্য বহন করে নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের লখনৌ শাখার মুখপত্র "উত্তরা"। ১৪০৪ বঙ্গাব্দের তৃতীয় সংখ্যাটি সম্প্রতি আমাদের কাছে পৌঁছেছে। তিন শতাধিক পৃষ্ঠার বৃহৎ কলেবর, বৈচিত্র্যপূর্ণ ও মূল্যবান বহু রচনার দ্বারা সমৃদ্ধ। সংখ্যাটিতে রয়েছে সাধারণ বিভাগ ও ক্রোড়পত্র বিভাগ। এই বৃহৎ সংখ্যাটির প্রচ্ছদ ও পরিসজ্জা দৃষ্টিনন্দন। প্রচ্ছদ এঁকেছেন অরুণাভ রায়।

সাধারণ বিভাগে রয়েছে রবীন্দ্রনাথের একটি অপ্রকাশিত চিঠি। বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত এই চিঠির তারিখ "৫ই মাঘ ১৩০৪"। ছোট্ট একটি চিঠির মধ্যে ফুটে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের কর্মভারাক্রান্ত জীবনের ছবি। এক জায়গায় তিনি লিখেছেন—"মুহূর্তমাত্র সময় পাইনে—বিছানা থেকে রাত্রি সাড়ে তিনটেয় উঠে শুতে যাই এগারোটার সময়।" প্রবন্ধগুলির বিষয়বস্তু বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, লোকসংস্কৃতি, স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী, স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে উপেক্ষিত সংগ্রামীদের কথা, 'রুদালী' পুস্তক ও সিনেমার পটভূমিতে "নীচু মহলের" মানুষের জীবন, স্বামী বিবেকানন্দের সাম্যবাদী চিন্তাধারা ইত্যাদি। লেখকদের মধ্যে রয়েছেন ডঃ নমিতা মন্ডল, সুরেন্দ্র মোহন চাকী, কার্তিক লাহিড়ী, বাসব সরকার, সুধীন্দ্রনাথ কানুনগো, সুমিতা সিংহ চক্রবর্তী ও রঞ্জন ধর। প্রবন্ধ ছাড়াও স্মৃতিকথা লিখেছেন তরুণ দে, গল্প লিখেছেন উষা রায়, অলোক কুমার সেনগুপ্ত, সন্ধ্যা সিংহ, মাধবী বন্দ্যোপাধ্যায়, নিশীথ ঘোষ ও গীতা। স্কেচ এঁকেছেন বনানী বিশ্বাস। আর আছে অনেক কবিতা যার রচয়িতার মধ্যে আছেন মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, অমিতাভ দাশগুপ্ত, কৃষ্ণদুলাল চট্টোপাধ্যায়, গৌতম চক্রবর্তী,

অমল ভট্ট, গোপালকৃষ্ণ গুহ, মাধবী বন্দ্যোপাধ্যায়, কাবেরী মুখোপাধ্যায় ও বনানী বিশ্বাস।

উত্তরা-র এই সংখ্যাটি নিঃসন্দেহে অতীব মূল্যবান হয়ে উঠেছে তার ক্রোড়পত্রের জন্য যার মুখ্য বিষয় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দিলীপ কুমার রায় ও শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত। এই সব বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাগুলির সঙ্গে রয়েছে অনেকদুষ্প্রাপ্য ছবি।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে লিখেছেন সুদেব রায়চৌধুরী—"অবনীন্দ্র স্মৃতি", ডাঃ রামদুলাল বসু—"কালি কলম মন ও অবনীন্দ্রনাথ", শর্মিষ্ঠা বসু মল্লিক—"নিবেদিতার চোখে অবনীন্দ্রনাথ", ডাঃ মুকুল বন্দ্যোপাধ্যায়—"ওবিন ঠাকুর ছবি লেখে", জ্যোতির্ময় সাহা—"অবনীন্দ্র ঘরানা", শৈলেন দাস—"অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁর সৃজনধর্মীতা", ঋত্বিকা ঘোষ দস্তিদার—"রবীন্দ্র-অবনীন্দ্রের ছবি বিষয়ে কিছু কথা" এবং অর্ধেন্দু কুমার দে—"সোনার লিপা—রূপোর রেখা"।

দিলীপ কুমার রায় সম্পর্কে লিখেছেন তারাপ্রসাদ দাস—"পণ্ডিচেরীতে প্রবাস কালীন দিলীপ কুমার রায়", উমা সান্যাল—"আমাদের বাড়িতে দিলীপ কুমার রায়" সত্য সাধন চক্রবর্তী—"দিলীপ কুমার রায়ের রমন্যাস : প্রেম অভয়", বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য্য—"রমাঁ্যা রলাঁ্যা ও দিলীপ কুমার," পুলক চট্টোপাধ্যায়—"বিদেশের সঙ্গীত আসরে দিলীপ কুমার", সমীরণ দাশগুপ্ত—"দিলীপ কুমারের সংস্কৃতি চিন্তা", সুবীর চৌধুরী—"রেকর্ডে-ক্যাসেটে দিলীপ কুমার", অনিলেন্দু গুপ্ত—"দিলীপ কুমার ও সুভাষচন্দ্র এক নিবিড় বন্ধুত্ব", এবং ডাঃ ইন্দ্রানী—"দিলীপ কুমার এক অসামান্য ব্যক্তিত্ব।"

"শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত" অধ্যায়ে রয়েছে বারোটি প্রবন্ধ ও দুটি কবিতা। লেখকদের মধ্যে রয়েছেন ডাঃ সোমপ্রকাশ চট্টরাজ—"অভিনব মাস্টারের অমৃত সন্ধান," জ্যোৎস্নেন্দু চক্রবর্তী—"কথামৃতের ভবসাগরে", অসীম মুখার্জী—"রামকৃষ্ণ কথামৃত", ডাঃ মনমোহন ব্যানার্জী—"টলস্টয় ও কথামৃত ভাবনা", ডাঃ প্রফুল্ল কুমার সরকার—"কথামৃত ও বাংলা সাহিত্য", শোভনলাল দত্তগুপ্ত—"কথামৃতের ভাষা", রেবতীভূষণ রায়—"কথামৃতের আধুনিকতা", শোভন সুন্দর মিত্র—"কথামৃতের গল্পধর্মিতা", সুরঞ্জনা বিশ্বাস—"কথামৃতের লোকায়ত ভাবনা", ইলা মিত্র "কথামৃতের হাস্যরস" দেবব্রত রাহা—"কথামৃতের সঙ্গীতময়তা" এবং অজিত কৃষ্ণ ভৌমিক—কথামৃতের

চলচ্চিত্রময়তা"। এ ছাড়াও রয়েছে কৃষ্ণদুলাল চট্টোপাধ্যায় ও গৌতম চক্রবর্তীর দুটি কবিতা।

ক্রোড়পত্রের তিনটি বিভাগের অনেক প্রবন্ধের মধ্যেই রয়েছে মানসিক চাহিদা মেটাবার উপযোগী বহু মূল্যবান তথ্য। দুঃখের বিষয় স্থানাভাবে সেই সব প্রবন্ধ সম্পর্কে আলাদা ভাবে আলোচনার সুযোগ নেই। নিঃসন্দেহে একটি সংখ্যার মধ্যে প্রবন্ধের এই বিপুল সমাবেশ 'উত্তরা' সম্পাদক প্রবীর বসু ও তাঁর সহকারী বৃন্দের বিশেষ কৃতিত্ব ও প্রশংসা দাবী করে।

—রঞ্জন ধর

বিবিধ প্রসঙ্গ

ধিক্কার ধিক্কার ধিক্কার

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির পতন ইঙ্গ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের পথ পুরো উন্মুক্ত করে দিয়েছে। ইরাকের উপর ইঙ্গ-মার্কিণ বর্বর ক্ষেপনাস্ত্র ও বোমা বর্ষণ তারই প্রমাণ। আন্তর্জাতিক আইন, নীতি বা নৈতিকতার কোন তোয়াক্কা না করে গত ডিসেম্বর মাসে যে ভাবে ইঙ্গ-মার্কিণ বিমানবহর ও ইরাকের উপর হানা দিয়ে নির্বিচারে বোমাবর্ষণ করেছে তা মানব সভ্যতার ইতিহাসে আর এক কলঙ্কজনক অধ্যায়ের সংযোজনা। সেই সঙ্গে তৃতীয় বিশ্বের অর্থাৎ এশিয়া, আফ্রিকা ও লাটিন আমেরিকার দেশগুলির পক্ষেও হুশিয়ারী। ইরাকের উপর এই হামলার মধ্যে দিয়ে ইঙ্গ-মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদ এশিয়া, আফ্রিকা এ লাটিন আমেরিকার বিকাশশীল দেশগুলির জন্য যে বার্তা প্রচার করতে চাইছে তা হল—ইঙ্গ-মার্কিণ তদারকির বাইরে স্বাধীন বিকাশের চেষ্টা বিপজ্জনক। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বা ইউনাইটেড নেশনের ভূমিকা ও ক্ষমতাকে কার্যত উপেক্ষা করে ইঙ্গ-মার্কিণ প্রভুত্বের হুকুম জারী করা হল। একদিকে বাজার অর্থনীতির বিশ্বায়নের মধ্যে দিয়ে তথাকথিত বহুজাতিক পুঁজির একচেটিয়া কারবার অন্যদিকে পেশী শক্তির এই বর্বর আস্ফালন বিশ্বের বিকাশশীল দেশগুলির উপর স্থায়ী আধিপত্যের পরিকল্পিত প্রয়াস সন্দেহ নেই। এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের কৌশল গুণগতভাবে পাল্টে গেছে। আক্রমণকারী দেশের উপর যুদ্ধের আঘাত

লাগে না। আক্রান্ত দেশের ক্ষয়ক্ষতি ও নির্বিচার গণহত্যা সংঘটিত হয় আক্রমণকারীর ক্ষতি ছাড়াই। কেননা এখন আর সামনা সামনি সৈন্যে সৈন্যে যুদ্ধ হয় না। আকাশে অলক্ষ্যে থেকে কিংবা দূরে থেকে উৎক্ষেপণের সাহায্যে যুদ্ধ হয়। যা ব্যয় ও প্রস্তুতি সাপেক্ষ। সোবিয়েত রাশিয়ার পতনের পর মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রই এ ব্যাপারে সবচাইতে বেশী প্রস্তুত এবং ক্ষমতার অধিকারী। ইরাকের উপর বোমাবর্ষণ তারই ঘোষণা।

মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট বিলক্লিণ্টন ব্যক্তিগত ব্যাভিচারের কলঙ্ক চাপা দিতে যে আন্তর্জাতিক কলঙ্কের উদাহরণ স্থাপন করলেন তাও বিশ্বের ইতিহাসে বিরল ঘটনা। কোন ধিক্কারই বুঝি এই অন্যায়ের পক্ষে যথেষ্ট নয়। আরো লজ্জার কথা ব্রিটেনেই শ্রমিক দলের (Labour Party) নেতা ও প্রধান মন্ত্রী টনি ব্লেয়ার ইরাকের উপর এই বর্বরোচিত হামলার দোষর হয়েছেন। হায় লেবর পার্টির ঐতিহ্য! ধিক! টনি ব্লেয়ার ধিক!

আশার কথা লেবর পার্টির এ্যালেন সিম্পসনের মত বামপন্থী নেতারা টনিব্লেয়ারের এই সাম্রাজ্যবাদী নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছেন। কিন্তু ব্রিটেনের রাজনৈতিক নেতৃত্ব মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে যে গাটছড়া বেঁধেছে তা ছিন্ন করা সম্ভব নয়। বিশ্বের আকাশে এই ইঙ্গ-মার্কিণ নয়া সাম্রাজ্যবাদের করাল ছায়া সর্বগ্রাসী রূপ নিতে চলেছে। কাজেই সাধু সাবধান।

ভারতের মত বিকাশশীল দেশের সামনে পণ্য অর্থনীতির যে সোনার হরিণ হাজির করা হয়েছে তার মোহে 'মউ' 'মউ' করে লক্ষণ রেখা অতিক্রম করার অর্থ ইঙ্গ-মার্কিণ স্বর্ণ সাম্রাজ্যের নিশ্চিত শিকার হওয়া। যত তাড়াতাড়ি আমাদের বোধোদয় হয় ততই মঙ্গল। ইরাকের ঘটনা সে ইঙ্গিতই বহন করে।

দুঃখের ও লজ্জার কথা এরকম একটা বর্বর ঘটনাও আমাদের রাজনীতি বা বুদ্ধিজীবি সমাজকে তেমন বিচলিত করেনি। মিছিলের নগরী কলকাতায় সেরকম একটা ধিক্কার মিছিলও সংগঠিত হয়নি। সাংবাদিক বা বুদ্ধিজীবীদের অসি মসি হয়ে ঝলসে উঠেনি। বেতার ও দূরদর্শন ক্ষণকালের জন্যও দায়িত্ববোধে জ্বলে উঠেনি। হায়! আমার দেশ। হায়! আমার দেশের মানুষ।

—পরমেশ আচার্য

পরিচয়ে প্রকাশিত রচনার নির্বাচিত বিষয়সূচী

সরোজ হাজরা

॥ ষষ্ঠ কিস্তি ॥

॥ জানুয়ারী ১৯৮১—ডিসেম্বর ১৯৯০ ॥

এবারের বিষয়সূচী ইংরেজী বর্ষ হিসাবে দশ বৎসরের কিস্তি হিসাবে প্রকাশিত হ'ল।

বিষয়সূচীর প্রথম সারিতে লেখকের নাম বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজানো। দ্বিতীয় সারিতে বিষয় এবং তার অধীন আখ্যা শিরোনাম এবং তৃতীয় সারিতে পরিচয়ের প্রকাশ কাল। এই ধারার কিছুটা ব্যতিক্রম ঘটেছে, কবি, সাহিত্যিক, ঔপন্যাসিক, শিল্পী, অভিনেতা, গায়ক, নাট্যকার ও জীবনীর ক্ষেত্রে। সেখানে মূল বিষয় বিভাগের বা উপবিভাগের অধীন বর্ণানুক্রমিকভাবে আলোচিত ব্যক্তির নাম সাজানো হয়েছে এবং তাকেই বিষয়রূপে গণ্য করা হয়েছে।

বিষয়সূচীতে ব্যবহৃত সংকেত চিহ্নগুলি :

অনু	:	অনুবাদক বা অনুলেখক
পুঃ মুঃ	:	পুনর্মুদ্রণ
আঃ পুঃ	:	আলোচিত পুস্তক
সং	:	সংকলন
সঃ	:	সম্পাদক

লেখক	বিষয় ও আখ্যা শিরোনাম	পরিচয়ের প্রকাশকাল
	॥ সাময়িক পত্র ॥	
	। পরিচয় ইতিহাস ।	
অন্নদাশংকর রায়	পরিচয় প্রসঙ্গে	মে-জুলাই ১৯৮১
অরুণ ঘোষ	তর্ক-বিতর্কে দুই	নভেম্বর
	শতকের পরিচয়	১৯৮১
আশীষ মজুমদার	'পরিচয়ে'র উপন্যাস	নভেম্বর ১৯৮১
কুন্দভূষণ ভাদুড়ী	পরিচয়ের দিনগুলি	মে-জুলাই ১৯৮১

গিরিজাপতি ভট্টাচার্য্য	'পরিচয়ে'র শৈশব	নভেম্বর ১৯৮১
গোপাল হালদার	'পরিচয়ে'র ৪৫ বৎসরে : পুঃ মুঃ	মে-জুলাই ১৯৮১
গোপাল হালদার	'পরিচয়ে' এর রূপান্তরের হেরফের	১৯৮১
পরিচয়	পরিচয়ের প্রথম সংখ্যার ভূমিকা : পুঃ মুঃ	মে-জুলাই ১৯৮১
ভবানী সেন	পরিচয়ের পৃষ্ঠপট : পুঃ মুঃ	মে-জুলাই ১৯৮১
মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়	পরিচয়ের বিশ বছর	নভেম্বর ১৯৮১
মনীন্দ্র রায়	'পরিচয়'-এ আমার পঞ্চাশ বছর	ফেব্রুয়ারী ১৯৮৫
মলয় দাশগুপ্ত	'পরিচয়' এর নাট্য সমালোচনা	নভেম্বর ১৯৮১
শ্যামল কৃষ্ণ ঘোষ	পরিচয়ের আড্ডা	মার্চ, এপ্রিল, ডিসেম্বর ১৯৮১ মার্চ, এপ্রিল, অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বর ১৯৮২। মে, নভেম্বর, ডিসেম্বর ১১৮৩।
শ্যামল কৃষ্ণ ঘোষ	'পরিচয়ে'র প্রথম যুগ	নভেম্বর ১৯৮১
সমরেশ রায় সং	পুস্তক পরিচয় পঞ্জি : ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা থেকে ১২শ বর্ষ ১২শ সংখ্যা পরিচয়ে প্রকাশিত পুস্তক পরিচয় সংকলন	মে-জুলাই, ১৯৮১
সুভাষ মুখোপাধ্যায়	৩৭টি বর্ষ পেরিয়ে	ঐ
সুশোভন সরকার	পরিচয়-৪৫, পুঃ মুঃ।	ঐ
ঐ	পরিচয়ের সুবর্ণজয়ন্তী	ঐ
হিরণকুমার সান্যাল	'পরিচয়' এর কাহিনী, পুঃ মুঃ	ঐ

।খ্রীস্ট ধর্ম।

গোপাল হালদার	যীশুখ্রীষ্ট ও জননী মেরী—২০০০ বর্ষ প্রান্তে।	আগস্ট-অক্টোবর ১৮৮৭

। ইসলাম ধর্ম ।

বাহারউদ্দিন	ইসলামের সমাজতত্ত্ব	আগস্ট-অক্টোবর ১৯৮৩

॥ সমাজতত্ত্ব ॥

। জনরব ।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়	জনরব ও জনমানস	আগস্ট-অক্টোবর ১৯৮৭

॥ বিচ্ছিন্নতাবাদ ও জাতীয় সংহতি ॥

নীহাররঞ্জন রায়	জাতীয় সংহতি ও বিচ্ছিন্নতাবাদ	ফেব্রুয়ারী ১৯৮৮
পথিক বসু	বড় সুন্দর তুমি রহ কিছুকাল স্থির, বিচ্ছিন্নতা।	ফেব্রুয়ারী, মার্চ ১৯৮৯

॥ পরিবেশ-প্রাকৃতিক ॥

সুনীল কুমার মুন্সী	প্রকৃতি ও পরিবেশ।	মে ১৯৮৫

॥ সমাজ ও সংস্কৃতি ॥

আনিসুজ্জমান	মনন ও সৃজন : বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিত।	ফেব্রুয়ারী ১৯৮৫
কবীর চৌধুরী	বাঙালীর আত্মপরিচয় : সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিত	নভেম্বর ১৯৮৭
নীহার রঞ্জন রায়	বাঙালী সমাজ ও সংস্কৃতি : নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের মূল সভাপতির ভাষণ।	সেপ্টেম্বর-নভেম্বর ১৯৮৫

সুশোভন সরকার	মনের শৃঙ্খল ঃ পুঃ পাঃ আঃ পুঃ সুইস, সিসিল ডে (সাঃ) ঃ দি মাইণ্ড ইন্ চেইনস্	জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১৯৮৩
হিমাচল চক্রবর্তী	সংস্কৃতির বিশ্বরূপ ঃ পুঃ পাঃ। আঃ পুঃ গোপাল হালদারের "সংস্কৃতির বিশ্বরূপ"।	এপ্রিল-মে ১৯৮৭
	॥ লোক সংস্কৃতি ॥	
বেলা দত্তগুপ্ত	লোক সংস্কৃতির তত্ত্ব সম্বন্ধে পথিকৃৎ গ্রন্থ ঃ পুঃ পাঃ আঃ পুঃ তুষার চট্টোপাধ্যায়ের লোক-সংস্কৃতির তত্ত্বরূপ ও স্বরূপ সন্ধান।	এপ্রিল-মে ১৯৮৭
	॥ রাষ্ট্রনীতি ॥	
সুশোভন সরকার	তত্ত্ব ও কল্পনা, পুঃ প আঃ পুম্যানহিম কার্লঃ ইডিওলজি এ্যাণ্ড ইউটোপিয়া	জানুয়ারী ফেব্রুয়ারী ১৯৮৩
ঐ	শক্তির ব্যাখ্যা পুঃ প আঃ পু রাসেল, বার্ট্রাণ্ডঃ পাওয়ার অ্যা নিউ সোসাল এ্যানালিসিস	ঐ
	॥ রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদ ॥	
	। উদার নীতিবাদ ।	
ঐ	ইউরোপীয় উদারনীতিবাদ	ঐ
	॥ গণতন্ত্র ॥	
ঐ	পার্লামেণ্টের শাসন পুঃ পাঃ আঃ পুঃ লাস্কি, এইচ ঃ পার্লা-মেণ্টারী গভর্ণমেণ্ট ইন ইংল্যাণ্ড	ঐ ঐ
	॥ ফ্যাসিবাদ ॥	
ঐ	ফ্যাসিস্ সো	ঐ
ঐ	ফ্যাসিজিমের শেষ অঙ্ক	ঐ

॥ মার্কসবাদ ॥

কুনাল চট্টোপাধ্যায়	মার্কস্, এঙ্গেলস ও কৃষক	ফেব্রুয়ারী-মার্চ ১৯৮১
জিতেন্দ্রনাথ প্রামাণিক	মার্কস-এর 'এইটিনথ ব্রুমেয়ার'	ফেব্রুয়ারী-মাচ; ১৯৮১
প্রমিলা মেহেতা	মার্কসীয় পদ্ধতি	ঐ
রণবীর সমাদ্দার	রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্কসীয় চিন্তা একশত বছর আগে এবং পরে	ঐ
সুনীল মিত্র	তরুণ মার্কসের গবেষণা	এপ্রিল, ১৯৮২
শুশোভন সরকার	মস্কো ও মার্কসবাদ, পুঃ পাঃ আঃ পুঃ হেকাব, জুলিয়স এফ মস্কো ডায়ালগস্ ও অন্যান্য।	জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১৯৮৩
ঐ	মার্কসবাদ সম্পর্কে ৩টি বই, পুঃ পাঃ আঃ পুঃ মিডলটন, জনঃ দ্য নেসেসিটি অব কম্যুনিজম। ডব, মরিস ঃঅন কম্যুনিজম্। লেনিন ঃ দি টিচিং অব কার্ল মার্কস।	ঐ
সৌরীন ভট্টাচার্য	মার্কস্, স্রাফা, স্টিউয়্যান	ফেব্রুয়ারী-মার্চ, ১৯৮৪
হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	ধর্ম ও মার্কস চিন্তা প্রসঙ্গে	জুলাই-সেপ্টেম্বর, ১৯৮৪

॥ মার্কস রচনা-পঞ্জি ॥

ম্যাকলেনান ডেভিড (সং)	কালানুক্রমিক জীবন ও রচনা-পঞ্জি	ফেব্রুয়ারী-মার্চ, ১৯৮৪
সিদ্ধার্থ রায়	মার্কস-এর 'নতুন' লেখা	ঐ
ঐ সংকলক	মার্কসের নতুন লেখাঃ রচনা পঞ্জি সংযোজন	জুন -জুলাই ১৯৮৪

সংযোজন মার্কস সংখ্যা

॥ গ্রামসি ॥

কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়	আন্তোনিও গ্রামসি এবং আমরা	নভেম্বর, ১৯৯০
গ্রামশি আন্তোনিও	মানুষ কী ? অনু সত্যজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়	ডিসেম্বর ১৯৯০
প্রমীলা মেহেতা	গ্রামচি ও মার্কসবাদ : কয়েকটি বই	জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৮২
রাম বসু	বাংলায় গ্রামশিচ চর্চা, পুঃ পঃ আঃপুঃ অজিত রায়ঃ আন্তোনিও গ্রামসি : জীবন : তত্ত্ব	ফেব্রুয়ারী, ১৯৯০

॥ বিশ্ব শ্রমিক আন্দোলন ॥

গৌতম চট্টোপাধ্যায় (সং)	মে দিবস, ১৯৮৬ : শতবর্ষ আগের শহিদদের জবানবন্দী।	এপ্রিল, ১৯৮৬
জেনে জ'	মে দিবসের ভাষণ : অনু : দেবাশীষ সেন	ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৭
সুধীর ভট্টাচার্য	শ্রমিকের রক্ত, অশ্রু ও ঘাম : পুঃ পঃ আঃ পুঃ শুভাশীষ গুপ্ত : বিশ্ব শ্রমিক আন্দোলনের শ্রম সময় কমানোর সংগ্রাম ও মে দিবসের শতবর্ষের ইতিহাস।	জুন, ১৯৮৭

॥ আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলন ॥

উজ্জ্বল রায়	শ্রমিক দুনিয়ার ঊষা : পুঃ পঃ আঃ পুঃ অমলেন্দু সেনগুপ্ত : প্যারী কমিউন।	মার্চ, ১৯৮১
জ্যোতি প্রকাশ চট্টোপাধ্যায়	ত্যাগ, বীরত্ব আর ক্রান্তির ইতিহাস, পুঃ পঃ। আঃ পুঃ তুলসীরাম : 'এ হিস্ট্রী অব দি কম্যুনিস্ট মুভমেন্ট ইন ইরান'।	জুন-জুলাই ১৯৮৪
সুনীল মুন্সী	পল লাফার্গ আর মানার্ক।	জানুয়ারী, ১৯৮৪

সুশোভন সরকার	কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিকঃ পুঃ পাঃ আঃ পুঃ বর্কেনাও, এফ ঃ 'দি কম্যুনিষ্ট ইন্‌টারন্যাশনাল	জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৩

॥ সমাজতন্ত্রবাদ ও সাম্যবাদ ॥

সুশোভন সরকার	সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব ও প্রমান ঃ পুঃ পাঃ। আঃ পুঃ জিদ আঁদ্রে রিভুর দে পি ইউ আর এস এস স্টাচি, জনঃ থিওরি এ্যান্ড প্র্যাকটিশ অব সোশ্যালিজম।	জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১৯৮৩
সুশোভন সরকার	সোশিয়ালিজমের মূল সূত্র	ঐ

॥ সমাজতন্ত্রবাদ ও সাম্যবাদ দেব বিদেশে ॥

। রাশিয়া ।

অরিন্দম সেন	পেরোস্ত্রৈকা পরিপ্রেক্ষিত, সীমাবদ্ধতা ও সম্ভাবনা।	আগষ্ট-অক্টোবর, ১৯৮৮
কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়	লেনিনের সাংবাদিক জীবন	মার্চ, ১৯৮৬
গোপাল হালদার	পেরোস্ত্রাইকা-দ্বিতীয় সোশ্যালিষ্ট বিপ্লব?	আগষ্ট-অক্টোবর ১৯৮৮
বাসব সরকার	পেরোস্ত্রাইকা, গ্লাসনস্ত এবং এবং তারপর।	আগষ্ট-অক্টোবর ১৯৯০
রঞ্জিৎ দাসগুপ্ত	সোভিয়েত দেশে সমাজতান্ত্রিক নবায়নের প্রতিশ্রুতি ও সমস্যা।	ডিসেম্বর, ১৯৮৮
রণধীর দাসগুপ্ত	পেরোস্ত্রাইকা ও গ্লাসনস্ত।	আগষ্ট-অক্টোবর, ১৯৮৮
সুশোভন সরকার	সাম্যবাদের সংকট	জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৩

॥ চীন ॥

বাসব সরকার	পটভূমি চীন ঃ সমাজতন্ত্র গণতন্ত্র	আগষ্ট-অক্টোবর ১৯৮৯

॥ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও শান্তি আন্দোলন ॥

। বিপর্যয়-প্রাকৃতিক ।

॥ শিক্ষা—ভারতবর্ষ ॥

॥ ভাষা শিক্ষা ॥

॥ ইংরেজি ॥

সাধন দাশগুপ্ত	ঐ	ঐ
সুভাষ মুখোপাধ্যায়	ঐক্যের ভাষা, ভাষার ঐক্য (স্বাধীনতায় প্রকাশিত প্রবন্ধের পুনর্মুদ্রণ)	ঐ
হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	প্রাথমিক শিক্ষা ও ইংরেজি	ঐ

॥ উচ্চ শিক্ষা ॥

নীহাররঞ্জন রায়	বিশ্ববিদ্যালয়ের সংকট। যাদব-পুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উপলক্ষ্যে পঠিত ভাষণ।	আগস্ট-অক্টোবর ১৯৮৫

। কৃষিশিক্ষা ।

বসন্তকুমার সামন্ত	উত্তরপাড়া হিতকরী সভা ও বঙ্গের প্রথম কৃষি বিদ্যালয়।	জানুয়ারী ১৯৮৮

॥ সামাজিক রীতিনীতি ॥

। সামাজিক আচার-ব্যবহার । বিবাহ ও পরিবার ।

বাস্তা সরেন	সাঁওতালদের বিবাহবিচ্ছেদ প্রসঙ্গ।	ডিসেম্বর ১৯৮৩
শেখ বকের আলি	ইতিহাসের আলোকে শরিয়তী বিধান।	এপ্রিল ১৯৮৮

। মেলা ও উৎসব ।

কানাই কুণ্ডু	ছত্রিশগড়ের মেলা ও উৎসব।	মে ১৯৮৪

। লোককথা, ছড়া ।

বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়	হেটো ছড়ায় সামাজিক ও ঐতিহাসিক তত্ত্ব।	ডিসেম্বর ১৯৮৬
মানিক চক্রবর্তী	আন্তর্জাতিক লোককবিতার আধুনিক রূপঃ পুঃ পাঃ আঃ পুঃ রসুল গমজানভের কবিতা অনু পিনাকীনন্দন চৌধুরী।	ফেব্রুয়ারী ১৯৮৫

সুজিত চৌধুরী	কিংবদন্তীর পুনর্বিচার : সাবিত্রী সত্যবান।	জানুয়ারী ১৯৮৬
সুধীর কুমার করণ	রুশ দেশের লোককথা প্রসঙ্গ	আগস্ট-অক্টোবর ১৯৮৯

॥ নৃতত্ত্ব ও নৃতত্ত্ববিদ ॥

নীহার ভট্টাচার্য	বিজ্ঞান ও শিল্পের মিলন	জানুয়ারী ১৯৮৭
পবিত্র কুমার সরকার	জিপসিদের কথা ও কলি	জানুয়ারী ১৯৮৯

॥ ভারতের জাতি ও উপজাতি সমস্যা ॥

অজেয়া সরকার	পাঞ্জাব সমস্যা	আগস্ট-অক্টোবর ১৯৮৪
বাস্তা সরেন	কোলহান প্রশ্ন ও কোল উপজাতি	ঐ
ঐ	বিহার রাজ্যে আদিবাসীদের সমাজ-সংস্কৃতি।	মার্চ ১৯৮৫
রণজিৎ সিংহ	পার্বত্য চট্টগ্রাম : পুঃ পাঃ আঃ পুঃ সিদ্ধার্থ চাকমার পাঁচ বৎসর চট্টগ্রাম।	ফেব্রুয়ারী ১৯৮৮
সুজিত চৌধুরী	পাঞ্জাব, জাতীয় পুর্ত্তি ও জাতীয় সংহতি।	আগস্ট, ১৯৮৫
সুজিত চৌধুরী	আসাম : প্রসঙ্গ জাতি সমস্যা	আগস্ট-অক্টোবর ১৯৮৪
সুনির্মল দত্ত চৌধুরী	কিরাত জনের কথা	নভেম্বর, ১৯৮৮
ঐ	কেন উপজাতি	ডিসেম্বর, ১৯৮৯
সুরজিৎ সিংহ	উপজাতি ও ভারত সভ্যতা	আগস্ট-অক্টোবর ১৯৮১
ফেই সিয়াও তুং	চীনের সংখ্যালঘু জনসমাজ-গুলির সামাজিক রূপান্তর। অনুঃ প্রতিমা মজুমদার।	নভেম্বর ১৯৮৩

॥ ভাষাতত্ত্ব ॥

। ভারতীয় ভাষা ও ভাষা সমস্যা ।

সুশোভন সরকার	ভারতের ভাষা সমস্যা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা।	জানুয়ারী-মার্চ ১৯৮৩

। সাওতালি ভাষা ।

বাক্তা সোরেন	সাঁওতালি ভাষায় লিপি ও অলচিকির সমস্যা।	জানুয়ারী ১৯৮৪
ঐ	সাঁওতালি ভাষা ও বিকাশের সমস্যা।	আগস্ট-অক্টোবর ১৯৮৩

। বাংলাভাষা ও ভাষা সমস্যা ।

হুমায়ুন আজাদ	বাংলা ভাষার শত্রুগণ।	মে-জুন ১৯৮২

। বাংলা ভাষা—শব্দশিল্প ।

বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত	শব্দ বিপর্যাস চর্চা।	মে-জুন ১৯৮৬
সুভাষ ভট্টাচার্য্য	বাংলায় থিসরাস চর্চা। পুঃ পাঃ আঃ পুঃ অশোক মুখোপাধ্যায়ের সমার্থ শব্দকোষ।	এপ্রিল-মে, ১৯৮৭
সুভাষ ভট্টাচার্য্য	বিদেশী নামে উচ্চারণ ও বাংলা প্রতিবর্ণীকরণ।	সেপ্টেম্বর-নভেম্বর, ১৯৮৫

। বাংলা ভাষা-অনুবাদ চর্চা ।

বিষ্ণু বসু	বাংলায় অনুবাদ চেষ্টা : দু-চার কথা।	মে-জুন, ১৯৮২

। বাংলা ভাষা-গ্রন্থমালা ও গ্রন্থপঞ্জী ।

অভ্র ঘোষ	বাংলা ভাষায় মনন চর্চা : কয়েকটি গ্রন্থমালা, গ্রন্থ ও সাময়িক পত্র।	মে-জুন, ১৯৮২

। পোড়ামাটির কাজ ।

হিতেশ রঞ্জন সান্যাল	পোড়ামাটির মূর্তিশিল্প। বাংলার স্থাপত্য শিল্পের উদ্ভব ষোড়শ ও সপ্তদশ শতক।	আগস্ট-অক্টোবর, ১৯৮১
ঐ	মন্দির ও শিল্প : পুঃ পাঃ আঃ পুঃ চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্তের 'বিষ্ণুপুরের মন্দির টেরাকোটা'	এপ্রিল, ১৯৮১

। মৃৎশিল্প ।

অশোক ভট্টাচার্য্য	বাংলা মৃৎশিল্পের ত্রিধারা।	নভেম্বর, ১৯৮৮
সুধীর চক্রবর্ত্তী	আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিত : কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পী।	আগস্ট-অক্টোবর, ১৯৮১

। কারুশিল্প ।

অশোক ভট্টাচার্য্য	লোকশিল্প ও লোকশিল্পী : পুঃ পাঃ আঃ পুঃ বিনয় ঘোষ : ট্রাডিশনাল আর্টস অ্যান্ড বিনয় ভট্টাচার্য্য : কালচারাল অশিলেসন।	অক্টোবর, ১৯৮২

। চিত্রকলা ও চিত্রশিল্পী ।

মৃণাল ঘোষ	গণেশ পাইনের ছবি : নন্দনের ভিত্তি।	জানুয়ারী, ১৯৮৯

। গোপাল ঘোষ ।

ঐ	নিসর্গের রূপকার গোপাল ঘোষ।	,, ১৯৮৪

। দেবব্রত মুখোপাধ্যায় ।

দেবেশ রায়	শিল্পী দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের সম্বর্ধনা।	ঐ

। নন্দলাল বসু ।

অমিতাভ গুপ্ত	প্রবাহের দিকে : পুঃ পঃ আঃ পুঃ পঞ্চানন মণ্ডলের ভারত শিল্পী নন্দলাল ।	জুন-জুলাই, ১৯৮৪
মৃণাল ঘোষ	নন্দলাল বসুর উত্তরাধিকার : এই সময়ের ছবি ।	মে, ১৯৮৫

। পরিতোষ সেন ।

মৃণাল ঘোষ	পরিতোষ সেনের ছবি : অতীত থেকে সাম্প্রতিক ।	ফেব্রুয়ারী ১৯৮৫

। বরেন বসু ।

ঐ	রূপদী ও প্রতিবাদী চেতনায় টানাপোড়েন : বরেন বসুর ছবির একক প্রদর্শনী ।	এপ্রিল, ১৯৮৬

। বিনোদ বিহারী মুখোপাধ্যায় ।

ঐ	বিনোদ বিহারী মুখোপাধ্যায়ের শিল্প ও নন্দন চিন্তা : পুঃ পঃ আঃ পুঃ বিনোদ বিহারী মুখোপাধ্যায় : চিত্রকথা ।	জুন-জুলাই ১৯৮৪

। যামিনী রায় ।

অরুণ সেন	জন্য শতবর্ষে যামিনী রায় : পুঃ পঃ আঃ পুঃ বিমল ধর ও দি আর্ট অফ্ যামিনী রায় ।	এপ্রিল-মে ১৯৮৭
সমীর ঘোষ	যামিনী রায় : আধুনিক সংশয় ?	জুলাই সেপ্টেম্বর ১৯৮২

। যুধাজিৎ সেনগুপ্ত ।

প্রদীপ পাল	প্রকৃতি থেকে বসন্ত : জীবনের উল্লাস : যুধাজিৎ সেনগুপ্তের একক প্রদর্শনী ।	এপ্রিল, ১৯৮৬

শুভ বসু	নিসর্গের কবিতা : যুধাজিৎ সেনগুপ্তের ছবি। ।রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য।	মে, ১৯৮৫
পূর্ণেন্দু পত্রী	তিন স্তম্ভ ও বাংলার শিল্পের স্থাপত্য : পূঃ পাঃ আঃ পুঃ শোভন সোম : "তিন শিল্পী" রবীন্দ্রনাথ, নন্দলাল ও রাম কিঙ্কর। ।রাজেশ্বর সিং ও সোমেন।	এপ্রিল-মে ১৯৮৭
মৃণাল ঘোষ	দু'জন শিল্পী : আত্ম পরিচয়ের বিভিন্ন নিরিখ। ।সুনীল দাস।	জানুয়ারী ১৯৮৭
মানিক চক্রবর্তী	শিল্পী সুনীল দাসের সঙ্গে কথাবার্তা।	জানুয়ারী ১৯৮৬

শাইলকের বাণিজ্য বিস্তার

শাহ্‌যাদ ফিরদাউস

(দ্বিতীয় পর্ব)

নয়

রাতের খাওয়া-দাওয়ার আগে পর্যন্ত পরপর লোক এসেছে। খাওয়ার পরেও দু একজন এসেছে। সিকান্দার মানসিক ভাবে একদিকে যেমন উত্তেজিত, আনন্দিত, অন্যদিকে আব্বার ঝাঁঝাল কথার পর থেকে খানিকটা বিচলিত। কাজটা কি সত্যিই এতোটা খারাপ হয়েছে ? সত্যিই কি সে তার অস্তিত্বের এতো বড় সর্বনাশ ঘটিয়ে ফেলেছে ? বিশ্বাস হয় না। আব্বা বোধহয় একটু বেশি ভাবছেন, বেশি রকমের আশংকা করছেন। সন্ধ্যার পর থেকে বহুবার, অন্য কথাবার্তার ফাঁকে ফাঁকে নিজের মনের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হচ্ছে। এ এমন এক সমস্যা যা অন্য কাউকে বোঝানো যাবে না। অন্য কারো কাছে প্রকাশ করেও লাভ নেই। কেউ কোনো সুপরামর্শ দিতে পারবে না। এখন আর পরামর্শে কিই বা আসে যায়। যা হবার তা হয়ে গেছে। ওর মানসিক অবস্থা আস্তে আস্তে এমন বিশ্রী অবস্থায় পৌঁছায় যে ভালোভাবে মনের আনন্দ প্রকাশ করতেও আশংকা জাগছে। এক ধরনের ভয়ের অনুভূতি তার সমস্ত সত্তাকে ঘিরে ধরেছে। এই পরিস্থিতিতে ঠিক কিভাবে নিজের মনের শান্তি ফিরিয়ে আনা যায় ? সে ব্রিফকেসটা চৌকির নিচ থেকে টেনে বের করে। ঘর প্রায় অন্ধকার। এই অঞ্চলে বিদ্যুৎ এসেছে বহু বছর। টাকার অভাবে বাড়িতে কানেকশান নেয়া যায়নি। একটা টিমটিমে বাতি জ্বলছে বাইরের বারান্দায়। তার ক্ষীণ আলো একপাশ থেকে কিছুটা ঘরের ভেতর এসে পড়েছে। সে ব্রিফকেসটা ক্ষীণ আলোর কাছে নিয়ে খোলে। কড়কড়ে নতুন টাকার বাণ্ডিলে হাত বুলায়। সত্যিই ধীরে ধীরে আশংকা কেটে যায়। টাকা মানে সম্পদ, নিরাপত্তা, সমৃদ্ধি, সুখ, আনন্দ। বেশ কিছুক্ষণ টাকার বাণ্ডিলে হাত বুলোবার পর আবার আগের প্রশান্তি ফিরে পায়, ধীরে ধীরে তার আত্মপ্রত্যয় বাড়ে। আস্তে আস্তে বাবার কথার যৌক্তিকতা অযৌক্তিক মনে হয়। অবান্তর ভীতি, দুর্বলের আশংকা, প্রাচীন ধারার একজন

মানুষের আধুনিক জীবনের প্রতি অর্থহীন সন্দেহ ছাড়া আর কিছু নয়। যতোই সে নিজের আস্থা ফিরে পায় ততোই তার বাবার ওপর রাগ হয়। নিজে তো কিছু করলেন না অন্যকেও কিছু করতে দেবেন না। এমন মানুষ সংসারে থাকলে সে সংসারের উন্নতি করা যায়? যাক, যা খুশি ভাবুন যা ইচ্ছে বলুন। আমি আমার কাজ করে যাবো। সিকান্দার এবার নিজের ব্যক্তিত্ব পুরোপুরি ফিরে পেয়ে জোর গলায় হাঁক ডাক করতে থাকে। এখন তার হাঁক ডাকের বিশেষ দরকার নেই তবু করছে। তার অর্থ, আব্বার কথায় সে যে কর্ণপাত করেনি এটা তাঁকে বুঝিয়ে দেয়া। তাঁকে যে পুরোপুরি অবজ্ঞা করা হচ্ছে এটা তারই প্রকাশ।

রাতে আব্বা ভাত খেলেন না। শরীর খারাপ বলে এড়িয়ে গেলেন। এড়িয়ে গেলেন? সিকান্দার একবার ভাবে, বাবাকে একটু সাধাসাধি করবে। অনেকদিন পর বাড়িতে মাংস হল, উনি মুরগি ভালবাসেন, অথচ অভিমান করে ছুঁয়েও দেখছেন না। ব্যাপারটা খুব খারাপ দেখাচ্ছে। একবার বলতে গিয়েও মুখে আটকে গেল। না, এখন কথা বলায় সমস্যা আছে। একটা কিছু সূত্র ধরে হয়তো উনি পাঁচ কথা শুনিয়ে দেবেন। তাছাড়া বিকেলের অতো সব ঝাঁঝাল কথার পর আর ডাকাডাকি করতে ইচ্ছে করে না। এখন যা খুশি করুন। দুদিন বাদে রাগ কমে যাবে। রাগ কমলে, আসল ঘটনাটা বুঝলে আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠবেন। সেই ভালো, এখন আর এসব ঝঞ্ঝাট ভালো লাগছে না। মা কিংবা সুরাইয়া বিকেলের কথাবার্তা শোনেনি। পিতাপুত্রের সেই উত্তেজিত আলোচনা শোনেনি বলে তারা আব্বাকে সাধাসাধি করেনি। বয়স্ক মানুষ, খেতে না চাইলে জোর করে খাওয়ানো ঠিক নয়। সুতরাং আব্বার খাওয়া হল না। আব্বার খাওয়া হয়নি বলে সিকান্দারও ভালো করে খেতে পারল না। কোথায় যেন বাধো বাধো লাগে। নাহ্! এই অশান্তি থেকে মুক্তির উপায় অন্য চিন্তা করা।

আন্তোনিওর শোয়ার ব্যবস্থা করে সে বাইরে যায়। উঠোনে পায়চারি করতে থাকে। তার সাথে ছেলে মেয়েরাও আসে। ওরাও আজ উত্তেজিত। নতুন সৌভাগ্যের ছোঁয়ায় ওরা যেন টগবগ করে ফুটছে। সবার গায়ে নতুন জামা। নতুন জামার গন্ধে আর আনন্দে কারো চোখে ঘুম নেই। তিনজনেই বাবার সাথে ঘুরছে। অকারণে বকবক করছে। সিকান্দার তাদের কথা

শুনছে। তারও ভালো লাগছে। সন্তানদের মুখের হাসি তার মুখেও ঝলকে উঠছে।

ঘরের কাজ শেষ ক'রে সুরাইয়া নিঃশব্দে এসে দাঁড়ায়। সেই বিকেল থেকে এতো রাত অব্দি সে স্বামীর সাথে ভালো করে দুটো কথা বলার সুযোগ পায়নি। এতো লোক, এতো কাজ, সে সব সামাল দেবে না স্বামীকে কাছে ডাকবে? তারও তো নানান প্রশ্ন জেগেছে, নানান স্বপ্ন জেগেছে, ভবিষ্যতের নানা রঙের ছবি তারও চোখে ভাসছে। ভবিষ্যতের ছবি, স্বপ্নের ছবি যদি স্বামীর সাথে ভাগ করে দেখাই না হল তো সেসব ছবি আর বাস্তব হয়ে উঠবে কি ভাবে?

সুরাইয়াকে দেখে সিকান্দার পায়চারি বন্ধ করে। কি ভেবে আবার হাঁটতে হাঁটতে উঠোনের কোণে পুকুর পাড়ের দিকে এগিয়ে যায়। ওরা সবাই তাকে অনুসরণ করে। পুকুর পাড়ে বেশ একটা চাতাল মতোন আছে। সময় সুযোগ পেলে এখানে শাক সবজির চাষ করে। গত বছর সুযোগ পায়নি। এবার তাই মাটি শক্ত হয়ে গেছে। ওরা মাঝে মাঝে রাতে এখানে বসে। খুব গরম পড়লে পুকুর পাড়ের ঠান্ডা হাওয়ায় শরীর জুড়িয়ে যায়। এছাড়া দুজনের মনের কথা জমে গেলে এখানে এসে হালকা হয়। বারান্দার একপাশে বাবা-মা থাকেন। ছেলেমেয়েরাও বড় হচ্ছে। তারা বড় হয়ে উঠলেও এখনো এক সাথে ঘুমোয়। মনের কথা বলার আড়াল নেই আজকাল। অনেকদিন পর আবার সিকান্দারকে পুকুর পাড়ের দিকে এগিয়ে যেতে দেখে সুরাইয়া মনে মনে খুশি হয়। যদিও বাচ্চারা সাথে আছে, সব কথা বলাও যাবে না, তবু ভালো লাগে।

ওরা সবাই মাটিতে বসল। ছেলে যীশু বাবার সবচেয়ে কাছে ছিল। সিকান্দার তাকে কোলে তুলে নেয়। মেয়ে দুটো বাবার পাশ ঘেঁসে থাকে। সুরাইয়া একটু পেছনে, সিকান্দারের ডান দিকে বসে।

—কি যীশু, প্যান্ট জামা পছন্দ হয়েছে তো?

—খুব ভালো আব্বু, দারুন লাগছে। কাল স্কুলের সব্বাইকে দেখাবো। ওরা না, আমার ছেঁড়া জামা দেখে আওয়াজ দিতো। কাল সব্বাইকে দেখিয়ে দেবো!

—তা একটু দেখাতে হবেই। একটু দেখাদেখি না হলে চলে!

—হ্যাঁ, দেখিয়ে দেখিয়ে পরবো। রোজ একটা নতুন। রোজ নতুন

আমা আর কার আছে ? বল আব্বু ?

—তাই তো। টুনি কিছু বলে না কেন ? কিরে টুনি ? জামাপ্যান্ট ভালো হয়েছে তো ?

বড় মেয়ে টুনি কম কথা বলে। তার আনন্দ চাপা। সে চাপা-আনন্দে বাবার একটা হাত মুঠোর ভেতর নিয়ে চাপা কণ্ঠে জবাব দেয়—এতোগুলো এনেছো কেন ? শুধু শুধু টাকা নষ্ট।

—সে কিরে ? এখন থেকেই গিন্নিবান্নিদের মতোন কথা শুরু করেছিস। তুই তো দেখছি আমার মাকেও হার মানিয়ে দিবি।

—জানো আব্বু। আপা তখন থেকেই বলছে, এতোগুলোন আনার কি দরকার, পরে তো ছোট হয়ে যাবে। শুধু শুধু একগাদা টাকা গেল।

ছোট মেয়ে মিনি বলল। মিনি চটপটে। কথায় কাজে সমান দক্ষ। টুনি যেমন হিসেবি মিনি তেমনি খরুচে। একটাকা হাত খরচা দিলে দু'-মিনিটে শেষ করে এসে বলবে আরো টাকা দাও। তার চাহিদা প্রচুর। একটু সৌখিন, সাজগোজ ভালোবাসে। পড়াশোনাতেও ভালো। টুনি লেখা-পড়ায় মাঝারি, কিন্তু বুদ্ধিতে পাকা। অনেকটা বয়স্ক মেয়েদের মতো ওর কথাবার্তা, চালচলন। যীশু এখনো শিশু। তার ভালোমন্দ বোধ তৈরি হয়নি। ব্যক্তিত্ব গঠনের একেবারে প্রাথমিক স্তরে তার জীবন চলছে। তবে যেটুকু বোঝা যায়, ওর স্বভাব চরিত্র খানিকটা আম্মার মতো। দুজনের মেজাজ মর্জিতেও মিল আছে। একবার গোঁ ধরলে আর রক্ষা নেই। বশে আনা সমস্যা। সিকান্দার মিনির কথায় হাসতে হাসতে বলল—ঠিক আছে, টুনির যখন এতো জামা-কাপড় ভালো লাগছে না ওর গুলো বরঞ্চ তুই নিয়ে নে। তোর গুলো তো রইলই। কি বলিস ?

—পরের জিনিস পরবো কেন ? ওর কাপড় ওর যাকে ইচ্ছে দিয়ে দিক, আব্বু, আমি একটা ফ্রক দেখে রেখেছি। ওইটে কিন্তু আমায় কিনে দিতে হবে।

—কোথায় ?

—বাজারে, নরেন ঘোষের দোকানে। স্কুলে যাওয়ার পথে রোজই দেখি। রোজ দেখি। ওরা ফ্রকটা বাইরে ঝুলিয়ে রাখে। যা দেখতে না, আর তেমনি ডিজাইন। একদম নতুন ধরনের। ওটা

কিন্তু আমি কিনবোই কিনবো।

—আচ্ছা, ঠিক আছে কাল কিনে নিস।

—কাল।

মিনি ছুটে এসে সিকান্দারকে জড়িয়ে ধরে। সে ভেবেছে, এতো জামা-কাপড় কেনার পর হয়তো আব্বু বলবে, পরে কিনে দেবো, নয়তো অন্য কোনো অজুহাত দেখাবে। কিন্তু সে এক কথায় রাজি হওয়ায় মিনি আর আনন্দ চেপে রাখতে পারে না। মিনি আব্বুকে জড়িয়ে ধরেছে দেখে যীশুও জড়িয়ে ধরে। এখন আব্বুকে মিনির খপ্পরে ছেড়ে দেয়া বিপজ্জনক। যীশুর নিজেরও অনেক পরিকল্পনা আছে। আগে যা চেয়েছে কিছুই পায়নি। এখন মনে হচ্ছে আব্বুর হাতে টাকা আছে, এখন চাইলে দেবে। আগে যা চেয়েছে সে-গুলো তো নিতেই হবে, নতুন নতুন আরো নানান জিনিস মাথায় ঘুর ঘুর করছে সে গুলোও কিনতে হবে। সে আব্বুকে জড়িয়ে ধরে কানে কানে ফিস-ফিস করে বলল—আব্বু, আমায় একটা এয়ারগান কিনে দেবে, পাখি মারবো। দেবে তো ? দিতে হবে কিন্তু···দেবে তো ? বলো দেবে ?

—আচ্ছা দেবো।

—কি বললি ?

পাশ থেকে মিনি শোনার চেষ্টা করেও শুনতে না পেরে জিগ্যেস করে। তোকে বলবো ক্যানো ? যীশু মিনির কথার জবাব দিয়েই আব্বুকে সাবধান করে—আব্বু, বলবে না কিন্তু, একদম না।

—জানি জানি এয়ারগান। তাইতো ?

মিনির কথায় অবাক হয়ে যীশু তার দিকে তাকায়। কি করে বুঝল! তার কান্ড দেখে সবাই হেসে ওঠে। সিকান্দার হাসতে হাসতে সুরাইয়াকে জিগ্যেস করে—কি, শাড়ি কেমন হয়েছে বললে না তো ? সুরাইয়া কিছু না বলে গোপনে সিকান্দারের উরুতে চিমটি কাটে।

—জানো আব্বু, মা খুব বকাবকি করেছে।

—কাকে ?

—তোমাকে।

—কেন ?

—তুমি এতোগুলোন দামি দামি শাড়ি কিনে টাকার শ্রাদ্ধ করে দিয়েছ। মা এসব বলছিল আর খুব বকছিল।

মিনির কথায় সিকান্দার মজা পেয়ে আবার জিগ্যেস করে—একই সাথে বলছিল আর বকছিল ? ভারি অন্যায় ! এক সাথে বকা আর বলা চলবে না, কি বল বীশু ?

—তাইতো ।

সিকান্দারের প্রশ্নে এবং বীশুর জবাবে আবার সবাই হেসে ওঠে । মিনি বুঝলো সে একটু ভুল করে ফেলেছে । সে আবার আব্দুকে জড়িয়ে ধরে তার পিঠে পরপর চড় মারতে থাকে । তাকে মারতে দেখে বীশু মিনিকে ধাক্কা মেরে সরাতে চেষ্টা করে । 'এই, আব্দুকে মারবি না বলে দিলাম ! নিজে ভুল করবে আর ভুল ধরিয়ে দিলে মারবে, সর্ !' সিকান্দার হাসতে হাসতে দু-জনকে শান্ত করে সুরাইয়ার দিকে ফেরে ।

—কি কথা বলছো না কেন ?

—কোথায় পেলে ?

—কি ?

—কি বলছি ঠিকই বুঝেছ ।

—আলাউদ্দিনের আশ্চর্য প্রদীপে হাত ঘসে !

—ইয়ারকি না, সত্যি, কি ভাবে পেলে ?

—আব্বাকে সত্যি কথা বলে যা ঝাড়টা খেলাম, শুধু মারতে বাকি রেখেছেন । এবার তোমায় বলে সত্যি সত্যি মার না খাই !

—বাজে কথা বলতে হবে না । সত্যি কি করে পেলে ?

—তবে আগে বল রাগ করবে না ?

—তোমার কোনো কাজে আমি বাধা দিয়েছি ?

—না, সেকথা না, এটা একটু অন্য রকমের ব্যাপার বলেই ভয় লাগছে ।

—তুমি যা করবে তাতেই আমার মত আছে । আমি তো জানি, তুমি খারাপ কিছু করতে পারো না ।

—সমস্য তো সেখানেই, কাজটা ভালো না খারাপ তা নিজেই বুঝতে পারছি না ।

—আগে শুনি তো ।

—আমার অতীত বিক্রি করে দিয়েছি ।

—অতীত কি আব্দু ? বীশু প্রশ্ন করে । বীশুর প্রশ্নের জবাব

দিতে সিকান্দার একটু ভেবে নেয়। ঠিক কি ভাবে এই শিশুকে অতীতের বিষয়টা বোঝানো যায়? অথচ না বোঝালে ও ছাড়বে না। যা কৌতূহলী ছেলে, বার বার একই প্রশ্নে উত্যক্ত করে তুলবে। সে সহজ করে বোঝাবার চেষ্টা করে।

—যীশু, তুমি দুপুরে ভাত খেয়েছ?

—হ্যাঁ।

—আবার রাতেও খেয়েছ, তাই তো?

—হ্যাঁ।

—এখন কি আর দুপুর আছে?

—না।

—বেশ। রাতের খাবার সময় আছে না পেরিয়ে গেছে?

—পেরিয়ে গেছে।

—তবে এবার বুঝে নাও। যে সময় পেরিয়ে যায় তার নাম অতীত।

—তবে তো দুপুর অতীত, তাই না?

—ঠিক ধরেছ। দুপুর অতীত। রাতের যে সময়টায় ভাত খেয়েছে, সেটাও অতীত।

—তার মানে কাল যে তুমি কলকাতায় গেছিলে সেই কালও অতীত?

—ঠিক। গতকাল অতীতকাল। ঠিক ধরেছ। এবার আগের কথাটা ভালো ক'রে মনে রাখো, যে সময় পেরিয়ে যায় সেটাই অতীত। গতকাল, গত পরশু, গত মাস, গত বছর সবই অতীত। গত মানেই অতীত। ঠিক বুঝলে তো?

—বুঝেছি। আমরা যে ছোট মামার বিয়েতে মামাবাড়ি গেছিলাম, সেটাও অতীত।

—চমৎকার। ঠিক বুঝে গেছে। এই তো বুদ্ধিমান ছেলে।

—আব্বু, তুমি তোমার মামা বাড়ি যাওয়া বিক্রি করে দিয়েছ?

—তা···হ্যাঁ, তা বলতে পারো।

—আমি কিন্তু আমার অতীত বিক্রি করবো না।

—বেশ তো, তোমার অতীত তোমারই থাকবে। বিক্রি করতে হবে না।

—আব্বু, তুমি তবে তোমার স্কুলে যাওয়া বিক্রি ক'রে দিয়েছ ?

—হ্যাঁ, তা বলা যায়···

—আব্বু, তুমি তোমার আব্বুর কোলে বসা বিক্রি করে দিয়েছ ?

—যীশু, আমার সোনামণি, আমি তাও বিক্রি করেছি।

—আব্বু, তুমি তোমার মায়ের দুধু খাওয়া বিক্রি করে দিয়েছ ?

—যীশু....যীশু....আমার সোনামানিক, আমি তাও বিক্রি করেছি।

—আব্বু, তুমি খুব বাজে, খুব বাজে, খুব বাজে। আমি তোমার সাথে আর কথা বলবো না।

যীশু সিকান্দারের কোল থেকে নেমে মায়ের পাশে গিয়ে বসল। সিকান্দার কয়েক মুহূর্ত কোনো কথা বলতে পারে না। মিনি টুনি চুপচাপ বসে আছে। তারা বিষয়টা ভালো ভাবে না বুঝলেও কিছু কিছু বুঝতে পেরেছে ; তাদের কাছেও ব্যাপারটা ভালো লাগেনি। সুরাইয়া দোটানায় পড়ে। এক-দিকে স্বামীর প্রতি অগাধ বিশ্বাস অন্য দিকে যীশুর সহজ সরল সিদ্ধান্তকে অস্বীকার করাও অসম্ভব। সত্যিই কি কাজটা ভালো হল ?

আকাশে হালকা মেঘের আচ্ছরণ ছিল। এখন মেঘ কেটে পরিষ্কার আকাশ দেখা যায়। হালকা জোছনার আলো গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে ওদের মুখের ওপরে এসে পড়ে। ওরা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ। এখন যেন কারো কিছু বলার নেই। অতীত বিক্রির প্রসঙ্গটা যে ভাল নয়, ভালো হয়নি এটা সবাই যেন বুঝতে পেরেছে। সিকান্দার স্ত্রীর চোখের ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে পুকুরের জলের দিকে তাকায়। জলের ওপর মরা জোছনার আলো এসে কেমন এক বিষন্নতার সৃষ্টি করেছে। সিকান্দার অনেকক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে কিছু ভাবে। তারপর বিষন্নকণ্ঠে জিগ্যেস করে—

—তুমি রাগ করেছ ?

—তোমার সব কাজে আমার সায় আছে। থাকবে।

সুরাইয়ার জবাব পেয়েও সিকান্দার যেন আশ্বস্ত হতে পারে না। সে আবার প্রশ্ন করে—তোমার কি মনে হয়, কাজটা কি খারাপ হল ?

—তোমার সব কাজেই আমার সায় আছে।

সুরাইয়া জোর দিয়ে বললেও নিতান্ত জোর করেই কথাটা যে বলা হল

এটা বুঝতে সিকান্দারের অসুবিধে হয় না। সেও জোর করে স্বাভাবিক হতে চায়। কিন্তু এই প্রসঙ্গ থেকে অন্য প্রসঙ্গে যেতে চাইলেও পারে না। মনে হয়, ব্যাপারটা ভালো করে বোঝানো উচিৎ। সে তাই ব্যাখ্যা করার ভঙ্গিতে আবার শুরু করে—অতীত, যার কোনো ব্যবহারিক গুণ নেই, যা কোনো কাজেই লাগে না, সেই অতীত বেচে কতো টাকা পেয়েছি জানো সুরাইয়া? সুরাইয়া কোনো কথা না বলে স্বামীর দিকে মুখ ফেরায়। সিকান্দার আবার আরম্ভ করে—তোমার আমার জীবন স্বচ্ছন্দে কেটে যাবে। টুনি-মিনির লেখাপড়া বল, বিয়ে-শাদি বল, কোনো চিন্তা নেই। যীশুর ভবিষ্যৎ বল, আপাতত সে ব্যাপারেও চিন্তা নেই। সব ভালো ভাবে মিটে যাবে। এমন সুযোগ কেউ ছাড়ে? এমনিতে সারা জীবন কি পেয়েছি? তোমার একটা শাড়ি কিনতে প্রাণ বেরিয়ে গেছে। ছেলে মেয়েদের সামান্য জামা কাপড় আর স্কুলের খরচা ঠিক মতো দিতে পারিনি। এই কী জীবন? হাতে-গাঁটে যা ছিল, সব বেচতে বেচতে শেষ করে দিয়েছি। মায়ের সামান্য গয়না গাটি তাও গেছে। এবার ওই জমিটায় হাত পড়তো। তারপর? তারপর তো ভিটেটুকু বেচে দিয়ে রাস্তায় নেমে যেতে হতো। তার চেয়ে এই ভালো নয়? সুযোগ যখন পেয়েছি, কামিয়ে নিলাম। আরো সুযোগ আছে। তুমি চাইলে তোমার অতীত, তোমার ভবিষ্যৎ সব বেচে দিতে পারি। এতো টাকা পাবে, মানে এতো বিশাল অংকের টাকা যা তুমি সারা জীবনে কল্পনাও করতে পারোনি। এই অবাস্তব জিনিসের বাস্তব মূল্য যে এতো বেশি তা আমারও জানা ছিল না। সুরাইয়া?

—বল।

—তুমি তোমার অতীত বেচে দেবে?

—তুমি যা বলবে তাই করবো।

—তুমি পাশে থাকলে সাহস পাই, মনকে বোকাতে পারি—যা করেছি এক সাথে মিলে করেছি, যা পেয়েছি এক সাথে পেয়েছি, যদি কিছু হারাবার থাকে দুজনের সমান সমান যেন হারায়। কি বল?

—তুমি যা বল তাই হবে।

—আমি ভাবছি—ভবিষ্যৎ বিক্রি করলে ওরা বোধ করি বেশি টাকা দেবে। যীশুর ভবিষ্যৎ বেচে দেবো। ছেলের ভবিষ্যৎ বিক্রি করেই ছেলের ভবিষ্যৎটা পাকা পোক্ত করবো। দিনকাল খারাপ।

দু'দিন বাদে গেলে আর তেমন কিছু মিলবে না। যা করার দু এক দিনের ভেতর করতে হবে। সবাই জেনে গেলে এসব মালের দাম আলু পেঁয়াজের দামের চেয়েও কমে যাবে। তুমি যদি বল, যীশুর ভবিষ্যৎ কালই বেচে দিতে পারি। মোটা টাকা হাতে নিয়ে তারপর ওর ভবিষ্যৎ গড়ার কাজে মন দিতে পারবে।

যীশু আবার কৌতূহলী হয়ে ওঠে। আগের প্রতিজ্ঞা ভুলে জিগ্যেস করে —ভবিষ্যৎ কি, আব্বু?

—খুব সোজা। তুমি যে রাতে ভাত খেয়েছ তা অতীত। কাল সকালে যে আবার খাবে সেটাই ভবিষ্যৎ। যে সময় পেরিয়ে গেছে তার নাম অতীত। যে সময় এখনো পেরোয়নি, সামনে আছে, তার নাম ভবিষ্যৎ।

—তার মানে, আমি এয়ার গান দিয়ে পাখি মারবো তা ভবিষ্যৎ?

—হ্যাঁ, ঠিক ধরেছ।

—তার মানে, আমি স্কুলে যাবো তা ভবিষ্যৎ ?

—ঠিক তাই।

—তার মানে, আমি যে নতুন জামা গায়ে দিয়ে মামা বাড়ি যাবো, তা ভবিষ্যৎ ?

—নিশ্চয়।

—আমি যে বড় হবো তাও ভবিষ্যৎ ?

—ঠিক।

—না! না! না! আমি আমার বড় হওয়া বেচবো না! আমার ভবিষ্যৎ বেচবো না, বেচবো না, বেচবো না!

যীশু মায়ের পাশ ছেড়ে বীভৎস চিৎকার করতে করতে পুকুরপাড় ধরে উন্মাদের মতো ছুটতে থাকে। ওকে ঝোপঝাড়ের দিকে এতো রাতে ছুটে যেতে দেখে সুরাইয়া উঠেই তার পেছনে দৌড়ায়। সিকান্দার হতভম্ব হয়ে কয়েক পলক ওদের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর সেও ওদের পিছু নেয়। ওদের পেছনে ছুটতে ছুটতে সে চিৎকার করে—যীশু! যীশু! যীশু!

বাবা জোর করে এখনই তার ভবিষ্যৎ বিক্রি করে দেবে ভেবে সে আরো জোরে ছোটে। আরো জোরে চিৎকার করে—ভবিষ্যৎ বেচবো না! যীশু! ভবিষ্যৎ বেচবো না! যীশু! যীশু! যীশু! ভবিষ্যৎ বেচবো না, বেচবো

না, বেচবো না।

দশ

এতো রাতে এমন ভয়ংকর চিৎকারে আশ-পাশের অনেকের ঘুম ভেঙে যায়। তারা বাইরে এসে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করে। কারো হাতে টর্চ লাইট, কারো হাতে ল্যাম্প, কেউ বা আলোবাতির ঝামেলায় না গিয়ে খালি হাতেই ছুটে আসে।

আন্তোনিও এক হাত জামার তলায়, কোমরের কাছে রেখে অন্য হাতে জোরালো টর্চের আলো ফেলে ছুটে আসে। সে সিকান্দারদের কাছে এসে ঘুমজড়িত কণ্ঠে জিগ্যেস করে—এনি প্রবলেম, স্যার?

—নো প্রবলেম, গো অ্যান্ড টেক রেস্ট!

—ওকে স্যার।

আন্তোনিওকে প্রায় ধমক দিয়ে সিকান্দার যীশুর হাত ধরে বাড়ি ফেরে। যীশু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে আর তখনো বিড় বিড় করে বলছে—বড় হবার ভবিষ্যৎ কিছুতেই বেচবো না—কিছুতেই না!

ভেতরের উঠোনে ঢুকতেই মা আলো নিয়ে এগিয়ে আসেন, উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করেন—কি হল? দাদিকে দেখে যীশু বাবার হাত ছেড়ে তাঁর কাছে দৌড়ে যায়। মা তাঁকে একহাতে জড়িয়ে ধরে আবার জিগ্যেস করলেন—কি হল?

সিকান্দার সংকোচ বোধ করে। বারান্দায় মশারি টানানো। আব্বা মশারির ভেতরে উঠে বসে সিকান্দারের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন। তার মানে আব্বার ঘুম ভেঙে গেছে। তার মানে উনি যীশুর চিৎকার শুনেছেন! এবার যেন দ্বিতীয় অপরাধের বোঝা সিকান্দারের ঘাড়ে চাপল। সে তাড়াতাড়ি আব্বার চোখের সামনে থেকে দ্রুত পায়ে বারান্দার অন্যপাশে সরে যায়। যেতে যেতে স্বাভাবিক গলায় বলার চেষ্টা করে—কিছু না, হঠাৎ মনে হয় ভয়টয় পেয়েছে। নিজের কণ্ঠস্বর নিজের কাছেই বেমানান লাগে। মায়ের কথার জবাবে যা বলল, তার কোনো মানে দাঁড়ায় না। নিজের ওপর রাগ ধরে যায়। সে আর কোনো কথা না বলে অন্যদিকের বারান্দায় পাতা মশারির তলায় ঢুকে পড়ে। তার দেখাদেখি মিনিও ঢোকে। টুনি ঢুকবে কি না ভাবতে ভাবতে ঢোকে না। সে এখন বড় হচ্ছে। তার সম্ভ্রমবোধ

বাড়ছে। আজই প্রথম সে বাবা-মা'র বিছানা ছেড়ে দাদির বিছানায় শুতে যায়।

বাইরে জলের শব্দ। সুরাইয়া হাত পা ধুয়ে ঘরে ওঠে। আলো নেভায়। আবার সবাই যে যার মতো শুয়ে পড়েছে। ব্যাপারটা তেমন কিছু নয়, বাইরের কাউকে বিশেষ কিছু বোঝাতে হয়নি এই যা বাঁচোয়া। এই গাঁ-গেরামের লোকগুলো এমন যে কিছু বুঝবে না জানবে না একটা কিছু অজুহাত পেলেই হল, সব হুড়মুড় করে ছুটে আসবে। বিরক্তিকর! এই জন্যেই ভদ্দর লোকেরা শহরে থাকে। শহরে কেউ কারো সাতে পাঁচে নেই। মরলে নিজের ঘরে মরে পড়ে থাক্, মরে পচে যা। বাঁচলে নিজের ঘরে বাঁচ, বাঁচতে বাঁচতে ফুলে ফেঁপে ফেটে যা, কেউ বেড়ার ফুটো দিয়ে উঁকি মারার নেই। নাহ্! এর চেয়ে শহরই ভালো। দেখি, একটু গোছগাছ করে শহরেই চলে যাবো। সমস্যা হচ্ছে আব্বাকে নিয়ে। উনি কিছুতেই শহরে যেতে রাজি হবেন না এটা নিশ্চয় করে বলা যায়। বিশেষ করে আজ বিকেলের সেই কথা কাটাকাটির পরে তো আর প্রশ্নই ওঠে না। কি যে করি! এসব পুরোনো ধারার প্রাচীন লোকদের নিয়ে বিষম ঝামেলা, সাথে নিয়ে চলাও যায় না, ছেড়ে যাওয়াও চলে না। অশান্তি আর কাকে বলে!

সুরাইয়া বিছানায় আসেনি দেখে সিকান্দার মশারির বাইরে তাকায়। অন্ধকারের ভেতর গাঢ় অন্ধকারে তৈরি একটা নারীমূর্তির মতো সে বসে আছে। কি ব্যাপার? রাগ টাগ করল নাকি? সিকান্দার মশারি উঁচু করে তাকায়। ওকে তাকাতে দেখে সুরাইয়া ধীরে ধীরে মশারির ভেতর ঢোকে। নিঃশব্দে শুয়ে পড়ে। এখন মধ্যরাত। চারিদিকে শুনশান নিস্তব্ধতা। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। গ্রামের এই নিস্তব্ধতা ভয়াবহ মনে হয়। বিশেষত একা একা যদি কেউ জেগে থাকে তার কাছে। পাশে ঘুমন্ত মিনির মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে সে হঠাৎ হাতটা সরিয়ে সুরাইয়ার মুখে রাখে। সুরাইয়া যেমন চুপচাপ শুয়েছিল তেমনি শুয়ে থাকে। সিকান্দার তাকে কাছে টেনে আনে। অনেকদিন ওকে কাছে টানা হয়নি। অভাবে অনটনে দুশ্চিন্তায় মনটা এতোই বিপর্যস্ত ছিল যে এসব আর মনেও আসেনি। আজ বিকেলে ফিরে সুরাইয়ার সেই হাসিমাখা মুখটা দেখে মনে হয়, আজ ওকে কাছে নেবো। কতোদিন ওকে পাইনি। আজ পেতে হবে। এখন দুশ্চিন্তা নেই, ভোর ভোর বেরিয়ে

যাওয়ার তাড়া নেই। আজ পরিপূর্ণ অবসর, এখন শুধুই বিশ্রাম। বিশ্রাম আর বিশ্রম্ভালাপ। সেই বিকেলের পর যতো বার সুরাইয়াকে দেখেছে ততো বার কামনা বেড়েছে, ভেতরে ভেতরে উত্তেজনা বেড়েছে। রাতে যখন পুকুর পাড়ে দুজন পাশাপাশি বসেছিল, তখন ইচ্ছেটা আরো প্রবল হয়। কিন্তু তারপর বাঁশুর চিৎকারে সব যেন ওলট পালট হয়ে গেল। এখন আবার ধীরে ধীরে সেই উত্তেজনার বোধটা একটু একটু করে ফিরে আসছে। অথচ সুরাইয়া শীতল। কিন্তু সুরাইয়ার তো শীতল থাকার কথা নয়। যতোবার ওকে কাছে নিয়েছে ততোবার, ঠিক তার আগের মুহূর্তে ওর শরীর গরম হয়ে ওঠে। প্রথম দিন তো সিকান্দার রীতিমতো ভয় পেয়ে গেছিল। জ্বর-টর নয় তো। জিগ্যেস করলে প্রথমে কিছু বলেনি লজ্জায়। তারপর বহুকষ্টে বোঝা গেল, জ্বর নয়। শরীর স্বাভাবিক আছে। এর পর আস্তে আস্তে লজ্জা কমে, পরস্পরের শরীর-মন কাছাকাছি হয়। পরস্পরকে ঘনিষ্ঠ ভাবে জানার সুযোগ পায়। তখন সিকান্দার জানল, প্রতিবার ঘনিষ্ঠ হওয়ার আগে চরম উত্তেজনায় ওর শরীর ওরকম গরম হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয়, ঘনিষ্ঠ হলে, এসব ক্ষেত্রে সাধারণভাবে পুরুষের ভূমিকা যেমন প্রধান, মূলত পুরুষই সক্রিয় নারীরা নিষ্ক্রিয় থাকে, অন্তত পক্ষে পুরুষের তুলনায় কম সক্রিয়—সুরাইয়া তেমন নয়। তার ভূমিকাও প্রবল, সক্রিয়, সমান সমান। সে কোনো অর্থেই শীতল রমণী নয়। তাহলে এখন অমন চুপচাপ, শান্ত, ঠান্ডা, শীতল কেন? সিকান্দার তাকে আরো কাছে টেনে আনে। তার মুখের ওপর থেকে সরিয়ে পিঠে হাত বুলায়, পিঠ থেকে বুকে। বুকের ব্লাউজ খুলে আস্তে আস্তে, অতি কোমল ভাবে স্তনের ডগায় আঙুলের খেলা করে। সুরাইয়ার এই এক আশ্চর্য সম্পদ। নারীর প্রধান সম্পদ সন্দেহ নেই। তিন তিনটে বাচ্চা হবার পরেও ওর স্তন শিথিল নয়, কদাকার মাংসপিন্ডে পরিণত হয়নি। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হল, স্তনের মুখ দুটো এখনো বেরিয়ে আসেনি। বেশির ভাগ মেয়েদের বাচ্চা হওয়ার পর যেমন স্তনবৃন্ত শিথিল হতে হতে কালচে হতে হতে বিশ্রী আকার নেয়, কুৎসিত দেখায়, ওর তেমন নয়। বিয়ের আগেও যেমন ছিল, এখনো প্রায় তেমনি আছে। সিকান্দার ওর স্তনের ডগায় আলতো করে টোকা মারে। পর পর। সুরাইয়াকে উত্তেজিত করার সবচেয়ে বড় কৌশল এটাই। কয়েকটা টোকার পর সে সিকান্দারের বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বেই পড়বে। কিন্তু আজ সে একেবারে চুপ। শান্ত চ

শীতল। কেন? সিকান্দার তাকে আরো কাছে টেনে এনে বুকের ওপরে ওঠায়। ধীরে ধীরে শাড়িটা খুলে ফেলে। সায়া ব্লাউজ খোলে। সম্পূর্ণ নগ্ন করে তাকে বুকে রেখে তার পিঠে, পিঠের নিচের উরুতে আস্তে আস্তে হাত বুলায়। সুরাইয়া তথাপি শান্ত। অচঞ্চল। সিকান্দার এবার তাকে বুকের ওপর থেকে নামিয়ে আবার তার বুকে হাত রাখে। হাত সরিয়ে আস্তে আস্তে পেটের ওপরে রাখে, একটু একটু করে আঙুলের খেলা করে, তারপর আরো ধীরে, আরো কোমল স্পর্শে তার নাভিমূলে হাত দেয়। হাতটা সচল, সচল তার সমগ্র আঙুল, সে নিম্ন-নাভিমূলের ঘন চুলের ভেতর আঙুলের খেলা করে, ক্রমশ দ্রুত, ক্রমশ জোরে, ক্রমান্বয়ে শক্তি প্রয়োগ করে, ক্রমশ তার শক্তি প্রয়োগের স্পৃহা বাড়ে, আরো কঠিন উগ্র হয়ে উঠতে ইচ্ছে হয়। সে এক ঝটকায় আবার সুরাইয়াকে টেনে বুকের ওপরে তোলে। আশ্চর্য! সুরাইয়া এখনো শীতল। সিকান্দার অনেকক্ষণ তাকে বুকের ওপরে রেখে তার বুকের শীতল স্পন্দন অনুভব করে। তারপর আস্তে আস্তে তাকে বুকের ওপর থেকে নামিয়ে পাশ ফিরে শোয়। সুরাইয়া, আমি অতীত বিক্রি করেছি, বর্তমান তো এখনো করিনি, তবু তুমি কেন এতোটা শীতল!

এগারো

আরো বহুক্ষণ এপাশ ওপাশ করে সিকান্দার বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে। আজ আর ঘুম আসবে না। সে আব্বার বিছানার দিকে তাকায়। ঘুমিয়ে আছেন। বেচারা! রাগ করে রাতের খাওয়া খেলেন না। বয়স্ক মানুষ, অ্যাসিডের ঝামেলা আছে। সকালে বমিটমি না হয়। কী যে সমস্যায় পড়া গেল! সে ভেতরের উঠোন থেকে নিঃশব্দে বাইরের উঠোনে এল। কে? কে একজন মাথা নিচু করে পায়চারি করছে। মনে হয় খুব চিন্তাগ্রস্ত। ও হ্যাঁ, আন্তোনিও। তাহলে ওরও ঘুম নেই? কি ব্যাপার? সিকান্দার নিঃশব্দে ওর পেছন পেছন খানিকটা এগিয়ে যায়। লোকটাকে সারাদিন ধরে একটা যন্ত্রমানব মনে হয়েছে। ওর সবই যথাযথ, সঠিক। কোনো চিন্তা নেই-ভাবনা নেই যেন সদা প্রস্তুত, সব সময় কাজের জন্যে তৈরি। এই ধরনের 'ইয়েসম্যান' রোবট গোছের মানুষের সাথে বেশিক্ষণ থাকলে বিরক্তি

আসে। রাগ হয়। অথচ এদের সরানো যায় না। সরানো যায় না কারণ এরা কাজের, দরকারি। হাতের কাছে এরা না থাকলে কোনো কাজ সুষ্ঠু ভাবে করা সম্ভব নয়। হ্যাঁ, মানুষটাকে এখন ঠিক মানুষ মনে হচ্ছে। একটা মানুষ মাথা নিচু করে কিছু ভাবছে। তার অর্থ তার ভাবনা আছে। যার ভাবনা আছে, ভাবনার ভারে যে ভারাক্রান্ত সেই তো মানুষ।

—আন্তোনিও।

—স্যার ?

আন্তোনিও চমকে পেছন ফিরে ওর কাছে এগিয়ে আসে। একটু যেন লজ্জিত। নাও হতে পারে, হয়তো দেখার ভুল—আন্তোনিও।

—স্যার ?

—ঘুম আসছে না ?

—নতুন জায়গা তো, ঘুম আসতে দেরি হয়।

—তা ছাড়াও আমার বাড়িতে কমফোর্ট নেই। ঠিক আপনাদের রাখার মতো ব্যবস্থা করে উঠতে পারিনি…

—নো প্রবলেম স্যার। ওসব নিয়ে ভাববেন না। আমরা যে কোনো পরিবেশে মানিয়ে নিতে অভ্যস্ত।

আবার সেই 'ইয়েসম্যান' আন্তোনিও। সিকান্দার মনে মনে বিরক্ত হয়। একটু যে মন খুলে কথা বলবো সে উপায় নেই। ইয়েসম্যানদের সঙ্গে কি আর প্রাণের কথা চলে ? জানোয়ার! সিকান্দার ওকে পাশ কাটিয়ে একা একা পুকুর পাড়ের দিকে এগিয়ে যায়। এখন আর জোছনার আলো নেই। আবার পুরোপুরি অন্ধকারও নয়। হয়তো আকাশে মেঘ জমেছে। জোছনার আলো, ক্ষীণ আলো মেঘের আড়ালে চাপা আছে। সিকান্দারকে ওদিকে এগিয়ে যেতে দেখে আন্তোনিও তার পিছু নেয়।

—স্যার ?

—বলুন।

—আমার কাছে ঘুমের ওষুধ আছে, দেবো ?

—আপনি খান না কেন ?

—খুব দরকার না হলে খাই না।

—আমিও খুব দরকার না হলে খাই না।

—আমার মনে হয়, আপনার দরকার আছে।

—আমার মনে হয়, আপনারও দরকার আছে।

—স্যার, আমি আপনার সহকারি, আপনার ভালোমন্দের দেখভাল করা আমার কর্তব্য।

—আপনি আমার সহকারি, আপনার ভালোমন্দের দেখভাল করা আমার কর্তব্য।

—স্যার, আমি বলতে চাইছি, কাল আপনার অনেক কাজ…

—আমি বলতে চাইছি কাল আপনারও অনেক কাজ।

—স্যার…

—আন্তোনিও।

—স্যার ?

—আমি নির্বোধ নই।

—আমিও নির্বোধ নই, স্যার।

—আমি তা জানি, কিন্তু আপনি জানেন না যে আমি নির্বোধ নই মূর্খ নই উজবুক নই মাথামোটা ভাঁড় নই।

—আমি তা জানি স্যার।

—কি ভাবে ?

আন্তোনিও এবার মাথা নিচু করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। সিকান্দার তাকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ভেতরে ভেতরে অকারণে রেগে যায়। সে প্রায় ধমকের সুরে জিগ্যেস করে—বলুন কিভাবে ?

—স্যার, একজন নির্বোধ একজন নির্বোধকে চিনতে পারে না কিন্তু একজন বুদ্ধিমান একজন বুদ্ধিমানকে চিনতে পারে।

—কিন্তু একজন হৃদয়হীন একজন হৃদয়বানকে চিনতে পারে না।

—স্যার…

—বলুন।

—পৃথিবীতে এমন কেউ নেই যে হৃদয়হীন। হৃদয় খোয়া যেতে পারে, বিক্রি হয়ে যেতে পারে মহাজনের ঘরে বন্ধকীতে আটকে যেতে পারে কিন্তু সম্পূর্ণ হৃদয়হীন কেউ থাকতে পারে না। হৃদয় না থাকলেও হৃদয়ের তন্ত্রীগুলো কাজ করে, কাজ করেই চলে।

—নপুংসকের যৌন উত্তেজনার মতো।

—ঠিক তাই স্যার। তবুও তা উত্তেজনা, নপুংসকের যৌনতার আকাঙ্ক্ষার নাম যৌনতার আকাঙ্ক্ষাই, তার অন্য কোন নাম হতে পারে না।

—কিন্তু সে আকাঙ্ক্ষা অর্থহীন, অপ্রয়োজনীয়, আকাঙ্ক্ষার অপচয়।

—তবু তা আকাঙ্ক্ষা, তার চেয়ে এক বিন্দু কম নয়।

—তবু তা অর্থহীন, অদরকারি, সে আকাঙ্ক্ষা সেই নপুংসককে বিপথে চালিত ক'রে তাকে কেবল সর্বনাশের দিকেই ঠেলে দিতে পারে।

—তবু তা আকাঙ্ক্ষা, সর্বনাশের আকাঙ্ক্ষা আকাঙ্ক্ষাই বটে।

—আপনি কি বোঝাতে চান ?

—আপনি নির্বোধ নন, স্যার।

—আমি এখন নির্বোধ হতে চাই, আমাকে বুঝিয়ে বলুন।

—স্যার, কোনো বুদ্ধিমান ইচ্ছে করলেও নির্বোধ হতে পারে না।

—আন্তোনিও!

—স্যার ?

—কেন আমি আমার অতীত বিক্রি করেছি ?

—অর্থনৈতিক স্বাধীনতার জন্যে।

—না, ধ্বংসের স্বাধীনতার জন্যে!

—হয়তো ধ্বংসের স্বাধীনতা আর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা একদিন সমার্থক হয়ে যেতে পারে।

—আন্তোনিও!

—স্যার ?

—আপনি কেন আপনার হৃদয় বন্ধক রেখেছেন ?

—অর্থনৈতিক স্বাধীনতার জন্যে।

—ধ্বংসের স্বাধীনতার জন্যে!

—হয়তো তাই।

—কেন আপনি তা করলেন ? কেন আপনি আপনার হৃদয় বন্ধক দিলেন ?

—কেন আপনি আপনার অতীত বিক্রি করলেন ?

—আমার কোনো উপায় ছিল না। বেঁচে থাকার জন্যেই আমাকে আমার অতীত বেচে দিতে হল।

—আমারও কোনো উপায় ছিল না। বেঁচে থাকার জন্যেই আমাকে আমার হৃদয় বন্ধক দিতে হল।

—আপনার উন্নত দেশ, আপনার উন্নত ভাষা, আপনার উচ্চ শিক্ষা, আপনার যোগ্যতা, হৃদয় বাঁচিয়ে রেখেও আপনাকে বাঁচতে দিল না?

—না স্যার। আমার শিক্ষা আমার যোগ্যতা আমার উন্নত দেশ আমার উন্নত ভাষা কিছুই আমাকে হৃদয় বাঁচিয়ে রেখে বাঁচতে দিল না।

—কোথায় আপনার দেশ?

—পৃথিবীর সর্বত্র আমার দেশ।

—কোন্ ভাষা আপনার মাতৃভাষা?

—পৃথিবীর সমস্ত ভাষাই আমার মাতৃভাষা।

—পৃথিবীর সমস্ত পিতাই আপনার পিতা?

এবার আন্তোনিও চুপ করে গেল। তাকে নিশ্চুপ দেখে সিকান্দার আবার চড়া স্বরে প্রশ্ন করে—পৃথিবীর সমস্ত পিতাই আপনার পিতা?

—আমার পিতার নাম শাইলক অ্যান্ড সিকোফ্যান্ট্স্।

—চমৎকার! যে পুত্র তার পিতার কাছে হৃদয় বন্ধক রাখে অথবা যে পিতা তার পুত্রের হৃদয় বন্ধক রাখে তারা দুজনেই জারজ। আন্তোনিও! আপনি আপনার জারজ পিতার জারজ পুত্র!

—অবশ্যই! এখন পৃথিবীতে আর পিতার পুত্রের জায়গা নেই, সবাই জারজ। পরিচিত পিতার পরিচয় আড়াল করতে সকলকেই শাইলকের কাছে ছুটে আসতে হবে। শাইলক সকলের পিতা, সকলের ত্রাণকর্তা সকলের একমাত্র ভরসা।

—কিন্তু কেন?

—আর কোনো উপায় নেই তাই।

—কেন উপায় থাকবে না?

—উপায় রাখা হবে না তাই থাকবে না।

—তা হলে এটা সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃত?

—অবশ্যই।

—তা হলে সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃত ভাবে মানুষের পিতৃপরিচয় লুপ্ত করে এক জারজ সভ্যতা নির্মাণের চেষ্টা চলছে?

—চেষ্টা নয়, প্রক্রিয়া নয়, ইতোমধ্যেই সে জারজ সভ্যতা নির্মাণের কাজ শেষ করা হয়ে গেছে।

—তা হলে মানুষের মুক্তির আর কোনো আশা নেই?

—স্যার?

—বলুন।

—আশা-আকাঙ্ক্ষা কামনা বাসনা স্বপ্ন সবই বিক্রয় যোগ্য পণ্য। এর সব কিছুই বেচা কেনা শুরু হয়ে গেছে।

—কিন্তু কেন?

—কারণ মানুষের হাতে বিক্রি করার মতো আর কিছু অবশিষ্ট নেই।

—কিন্তু কেন?

—স্যার?

—বলুন।

—আপনাকে একটা ছোট্ট রিপোর্ট শোনাবো?

—শোনান।

—১৯৬৫ সালে পৃথিবীর সমস্ত রোজগার, অর্থ, মূলধন, সম্পদ, যাই বলুন তার শতকরা ২'৩ ভাগ ছিল পৃথিবীর দরিদ্রতম বিশ ভাগ লোকের হাতে। তার ওপরের বিশ ভাগ লোকের হাতে ছিল ২'৯ ভাগ। তার ওপরের বিশ ভাগের হাতে ৪'২ ভাগ। তার ওপরের বিশ ভাগের হাতে ২১'২ ভাগ। আর সবচেয়ে ধনী বিশ ভাগ লোকের হাতে ছিল ৬৯'৫ ভাগ। মনে রাখবেন, মাত্র শত করা কুড়ি ভাগ লোকের দখলে পৃথিবীর সমস্ত সম্পদের ৬৯'৫ ভাগ ছিল। তারপর ১৯৭০ এর রিপোর্ট অনুযায়ী দরিদ্রতম কুড়ি ভাগ মানুষের হাতে রইল, ২'২, তার ওপরের কুড়ি ভাগের কাছে ২'৮, তার ওপরের কুড়ি ভাগের হাতে ৩'৯ তার ওপরের কুড়ি ভাগের হাতে ২১'৩ এবং সবচেয়ে ধনীদের হাতে ৭০'৪, লক্ষ করুন, সবচেয়ে ধনী কুড়ি ভাগ লোকের সম্পদ একটু একটু করে বাড়ছে।

নচের ধাপ গুলোর সম্পদ একটু একটু করে কমছে। এরপর ১৯৮০ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী সর্বনিম্ন জনতার হাতে ১'৭, তার ওপরের দলের হাতে ২'২, তার ওপরের দলে ৩'৫, তার ওপরের দলে ১৮'৩ এবং সর্বোচ্চ ধনীদের সম্পদ বেড়ে হল ৭৫'৪ ভাগ। এবার সর্বশেষ তথ্যটা জানাই—দরিদ্রতমদের ভাগের সম্পদ নেমে দাঁড়াল, ২'৩ থেকে ১'৪, তার ওপরে ২'৯ থেকে ১'৮ তার ওপরে ৪.২ থেকে ২'১ তার ওপরে ২১'২ থেকে ১১'৩ আর সবচেয়ে ধনী কুড়ি ভাগ লোকের সম্পত্তি বেড়ে ৬৯'৫ থেকে ৮৩'৪ হল।

—তার মানে গরীব লোকেরা আরো গরীব হয়ে যাচ্ছে, নিঃস্ব দুস্থরা আরো নিঃস্ব?

—ঠিক বলেছেন। এবার একটু ব্যাখ্যা দিই—পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী কুড়ি ভাগ লোক মানে আসলে কিন্তু কুড়ি ভাগ নয়। তিনশ ছাপ্পান্নটা পরিবার। বাকিরা এদের পোষ্য অনুগৃহীত স্তাবক—সিকোফ্যান্ট্‌স্‌। পৃথিবীর মাত্র তিনশ ছাপ্পান্নটা পরিবার গোটা পৃথিবীর সমস্ত সম্পদের ৮৩'৪ ভাগ দখলে রেখেছে।

—সত্যিই ভয়াবহ, ভয়ংকর ব্যাপার।

—আরো একটু ব্যাখ্যার দরকার আছে—এই তিনশ ছাপ্পান্নটা পরিবারের ভেতর সবাই কিন্তু সমান ক্ষমতা ধরে না। এদের ভেতর মাত্র পাঁচ সাতটা পরিবারের হাতেই গোটা পৃথিবীর ভালোমন্দের দায় দায়িত্ব তুলে দেয়া হয়েছে।' কিংবা আরো ভালো করে বললে বলা যায়—সাতটা পরিবার—মানে, গ্রেট সেভেন, মানে 'জি-সেভেন'ই সমস্ত পৃথিবীর দণ্ডমুণ্ডের কর্তা।

—বিস্ময়কর। সত্যিই....

—একটু দাঁড়ান। আর বিস্মিত হবার জন্যে আপনার স্টকে সব সময় কিছু 'বিস্ময়' জমা রাখবেন, কারণ পৃথিবীটা বিশাল। শুনুন, শেষ বিস্ময়কর ব্যাপারটা আপনাকে জানিয়ে দিই—এই জি-সেভেনের ভেতর একজনই মাত্র সত্যিকারের অভিভাবক, সত্যিকারের নেতা অথবা চালক, যথার্থ পিতা—অর্থাৎ পরম পিতা—আব্বা। তার নাম—শাইলক। বাকিরা তার দাসানুদাস, কৃপাপ্রার্থী, স্তাবক, সিকোফ্যান্ট্‌স্‌। এই জন্যেই শাইলকের একটা নতুন শাখার নাম

হচ্ছে—শাইলক অ্যান্ড ফনস্। মানে কুকুরের মতো ভক্ত। হচ্ছে, এখনো হয়নি, তবে অল্পদিনের মধ্যেই এই নতুন কোম্পানি বাজারে আসছে। তার পরের কোম্পানিটার নাম হচ্ছে, শাইলক অ্যান্ড স্লেভস্। অর্থাৎ শাইলক এবং তার ক্রীতদাসের দল। তারাই সমগ্র পৃথিবী চালনা করবে। তখন, মানে খুবই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি, অর্থাৎ শাইলক পৃথিবীর সম্রাট হিসেবে অভিষিক্ত হবেন। সত্যি বলতে কি, ইতোমধ্যেই তিনি অভিষিক্ত হয়ে গেছেন। এখন শুধু সরকারি ঘোষণা করলেই ল্যাঠা চুকে যায়। এক কথায় বলা চলে, তিনি হচ্ছেন শাইলক দ্য গ্রেট। আপনারা অদূরে ভবিষ্যতে আর ভগবান খোদা বা বিধাতার ভরসা করবেন না, কিংবা তার কাছে প্রার্থনা জানাবেন না, তখন বলবেন—শাইলক আমায় রক্ষা করো। শাইলক যারে দেয় তারে ছাপ্পড় ফুঁড়ে দেয়। শাইলক মেঘ দে পানি দে, শাইলক মেঘ দে। রাখে শাইলক মারে কে। এমনি সব নতুন প্রবচনে আপনার ভাষা সমৃদ্ধ হবে। অর্থাৎ শাইলক অমনিপ্রেজেন্ট, অমনিসায়েন্ট অমনিপোটেন্ট। তার হাত থেকে কারো নিস্তার নেই।

বারো

তখন আকাশে আর হাল্কা আলোর আভাসটুকুও নেই। আকাশ জুড়ে মেঘের ঘনঘটা, অন্ধকার। চারিপাশে ঘন অন্ধকার। সিকান্দার আর আন্তোনিও দুজন ছায়ামূর্তির মতো পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে। কেউ কোনো কথা বলছে না। সব কথা শেষ। সমস্ত প্রশ্ন শেষ। সমস্ত ব্যাখ্যা শেষ। এখন ছায়ামূর্তির মতো ছায়ার অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া আর কিই বা করার আছে? ঘুম? ঘুম নেই, ঘুম আর আসবে না। বিশ্রামের কাল অতিক্রান্ত। কাজের সময়ও আসেনি। অথবা কর্মের কালও অবসিত। অতিক্রান্ত মানুষের অঙ্গসঞ্চালনের দিন। এখন নিশ্চুপ নির্বাক বিস্মিত দৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকার কাল। সামনে অনন্ত দাসত্বের গ। সেই অন্তহীন দাসত্বের জন্যে এখন প্রস্তুত হতে হবে। পরস্পরের চোখের দিকে তাকিয়ে জীবনের শেষ, সর্বশেষ শক্তিটুকু সঞ্চয় করে নিতে

হবে। কতোটুকু ? পৃথিবীতে, মানুষের চোখের দৃষ্টিতে, তার বিক্রিত হৃদয়ে, অস্তিত্বে আর কতোটুকু শক্তি অবশিষ্ট আছে ? ঠিক ততোটুকু, যতোটুকু থাকলে অনন্তকালের দাসত্বের শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত থাকা যায়। অনন্তকাল দাসের জীবন যাপন করা যায়, অনন্তকাল ধরে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত ক্রোধ রাগ দ্রোহ চেপে রাখা যায়। এখন নপুংসক পুরুষের কাল। এখন নিষ্ফলা নারীদের যুগ। এখন সঙ্গম নয়, শীতল শিশ্নের প্রহর, ঠাণ্ডা যোনির যাম। বড়জোর নিষ্ফল সঙ্গমের লক্ষ্যহীন শ্রমের সময়, বড়জোর নিষ্কারণ বীর্যের অপচয়।

—আন্তোনিও !

—স্যার ?

—তাহলে এখন উপায় কি ?

—উপায় একটাই, নিঃশর্ত আত্মসমর্পন।

—নিঃশর্তে দাসত্বের প্রার্থনা ?

—ঠিক তাই।

—মানুষের ক্রোধ, বিদ্রোহ, বিপ্লব, অভ্যুত্থান…

—সব বিক্রি হয়ে গেছে।

—সব ?

—সব। সমস্ত ক্রোধ অর্থনৈতিক স্বাধীনতার মূল্যে বিক্রি হয়ে গেছে, সমস্ত বিদ্রোহ বিপ্লব অভ্যুত্থান অর্থনৈতিক স্বাধীনতার বিনিময়ে কিনে নেয়া হয়েছে।

—শাইলক অ্যান্ড সিকোফ্যান্ট্‌স্‌…

—ঠিক। শাইলক অ্যান্ড সিকোফ্যান্ট্‌স্‌ পৃথিবীর সমস্ত বিপ্লব বিদ্রোহ আন্দোলন গণঅভ্যুত্থান নগদ ডলার দিয়ে খরিদ করেছে।

—তাহলে এখন ? আমার যা আছে, সব বেচে দিই ?

—অবশ্যই। প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান। আজ, এখনই আমি বস্‌কে বলে দিচ্ছি।

—এখন, এই রাতে ?

—স্যার, ব্যবসায়ীর রাতদিন সমান। আমার বস্‌, অর্থাৎ পরমপিতা সদা জাগ্রত। যখন যেখানে নোটের সম্ভবনা থাকে তিনি তখন সেখানে থাকেন, যখন যে প্রহরে লাভের খবর আসে তিনি তখন

সেই প্রহরেই স্বয়ং খবর শোনেন। তিনি সর্বত্র বিরাজিত—অমনিপ্রেজেন্ট, সর্বজ্ঞ—অমনিসায়েন্ট, তিনি সর্বশক্তিমান—অমনিপোটেন্ট।

—বলুন, আপনার পরম পিতাকে বলুন—আমার অতীত আগেই বিকিয়ে দিয়েছি। এবার বর্তমান ভবিষ্যৎ সত্তা আত্মা স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষা কল্পনা কামনা বাসনা সব বিকিয়ে দেবো। বলুন, নসীব সিকান্দার তার সর্বস্ব, তার সমগ্র অস্তিত্ব বেচে দিতে চায়।

—চমৎকার। আপনি অবশ্যই নির্বোধ নন বরং প্রাজ্ঞ, পরিণামদর্শী, বিচক্ষণ।

—বলছেন ?

—বলছি। অবশ্যই বলছি। এখনো কাগজের দাম মোটামুটি মাঝারি স্তরে আছে। এরপর দ্রুত নেমে যাবে। পৃথিবীতে এতো কর্মহীন উদ্বৃত্ত মানুষের দল প্রতিদিন বাড়ছে যে তাদের শুধু দুটো খেতে দিলেই তারা সমুদ্রে সাঁকো বানাবার পরিশ্রমও সাদরে মেনে নেবে। উদ্বৃত্ত মানুষ মানে উদ্বৃত্ত শ্রম, মানে, উদ্বৃত্ত ডলারের বাণ্ডিল। উদ্বৃত্ত ডলারের বাণ্ডিল মানে এক পর্যায়ে আর কাগজ ছাপিয়ে ডলার বানাবার দরকার পড়বে না। সাদা কাগজের ওপর পরম পিতা শাইলকের স্বাক্ষর ফটোকপি করে বাজারে ছেড়ে দিলেই সেই সাদা কাগজ ডলার হিসেবে বিবেচিত হবে। কারণ, আর কেউ কোনো নোট ছাপাবার অবস্থায় থাকবে না। তাদের সমস্ত ক্ষমতা তার আগেই ছেঁটে দেয়া হবে। তখন ডলার অর্থাৎ পরমপিতার সেই মহান স্বাক্ষর সমগ্র বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে যাবে এবং তখন আপনার ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমানের মূল্য টন টন ডলারের হিসেবে বিক্রি হলেও এক কেজি মোটা চাল কিনতেই হিমশিম খেয়ে যাবেন। সুতরাং যা পারেন এখনই বেচে কিনে আখের গোছান। নইলে শেষের সে দিন বড়ই ভয়ংকর।

—বেশ, সব বেচে দিলাম। আপনি পরমপিতাকে জানান।

—পরমপিতা সর্বজ্ঞ। তিনি আগেই সব জানতেন। তাই আমার ব্রিফকেসের ভেতর আপনার যাবতীয় কাগজপত্র তৈরি

করে দিয়েছেন। আপনি নতুন বাড়ি করবেন, তাও তিনি জানতেন, তার জন্যে যে আপনার অতি দ্রুত বাড়ির নক্সা দরকার তাও তিনি জানতেন। আমার কাছে গোটা পঞ্চাশেক নক্সা পাঠিয়ে দিয়েছেন। আপনার জমি, পরিবেশ এবং পছন্দ অনুযায়ী আপনি বাছাই করতে পারেন। আপনার ছবি আগেই তোলা হয়ে গেছে। তার প্রচুর কপি করা আছে, প্রয়োজনে আরো করা হবে। আপনার সমস্ত সম্পত্তির মানে, অবাস্তব সম্পত্তির দরদামও মোটামুটি ঠিক করা আছে। পরম পিতা জানতেন, আপনার সব কিছু বেচে দেয়া ছাড়া আর কোনো পথ খোলা থাকবে না। মানে খোলা রাখা হবে না।

—আমার সমস্ত সম্পত্তি, আই মিন, অবাস্তব সম্পত্তির দাম কতো ধরা হয়েছে।

—দশ কোটি।

—দশ কোটি ?

—হ্যাঁ, আর একটু বেশি পেতেন। যদি গতকালই ডিলটা কমপ্লিট করতেন। আপনি একদিন দেরি করেছেন, একদিনে অর্ধেক লোকসান করেছেন।

—যাক গে, যা পেলাম, যা পাচ্ছি, তাই ঢের।

—নিশ্চয়। আগামীকাল সিদ্ধান্ত নিলে দর এরও অর্ধেকে নেমে যেত। মানুষ হুড়মুড় করে পরমপিতার অফিসে হামলে পড়ছে। দাম হু হু করে নেমে যাচ্ছে। সুতরাং যা পেয়েছেন, যেটুকু পেয়েছেন তাও কম নয়।

—হ্যাঁ, ভদ্রভাবে টিকে থাকার জন্যে যথেষ্ট।

—নিশ্চয়। টিকে থাকার জন্যে যথেষ্ট। তবে ভদ্রভাবে কি না সেটা বলা মুশকিল।

—কেন। ভদ্রভাবে নয় কেন ?

—আপনার মাল ইতোমধ্যেই বিক্রি হয়ে গেছে। আমার পকেটে মোবাইল ফোন আছে। ফোনে আমাদের নির্দিষ্ট কোড ব্যবহার করার ব্যবস্থা আছে। সেই কোডে আমি ইতোমধ্যে খবর দিয়েছি। ওপাশ থেকে ইতোমধ্যেই খবর এসে গেছে—'ডান'। কাল সকালে

আপনার একাউন্টে দশ কোটি জমা পড়বে। অর্থাৎ আপনার বিক্রি-বাটা শেষ। কাল শুধু আমার কাছে রাখা ফর্মগুলোয় নাম কা ওয়াস্তে একটু সই সাবুদ করে দেবেন তাহলেই ঝামেলা খতম। কিন্তু যে প্রশ্নটা তুললেন, ভদ্রভাবে বাঁচা—না, স্যার, আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি—একজন মানুষ তার অস্তিত্বের সবটুকু বেচে দিয়ে ভদ্রভাবে বাঁচতে পারে না।

—তা হলে ?

—তা হলে ? স্যার, আমি একটু কঠিন শব্দ ব্যবহার করতে পারি ?

—হ্যাঁ, নিশ্চয়।

—কুত্তার বাচ্চার মতো।

—মানে ?

—একজন মানুষ তার সর্বস্ব বেচে দিয়ে কুত্তার বাচ্চার মতো অন্যের দয়ার ওপর বেঁচে থাকে।

তেরো

সিকান্দার। সিকান্দার। মায়ের চিৎকারে সিকান্দারের তন্দ্রার ঘোর ভেঙে যায়। সারারাত ঘুম হয়নি। শেষ রাতে শরীর ক্লান্ত লাগায় আবার বিছানায় ফিরে আসে। বোধহয় ঘণ্টাখানেকও হয়নি তার আগেই মায়ের চিৎকার। এখনো আলো ফোটেনি। ঝাপসা অন্ধকার। কি হল ? সিকান্দার ধড়ফড় করে উঠে বসে। মায়ের বিছানার কাছে ছুটে যায়। মা ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে জড়িত কণ্ঠে বলেন—তোর আব্বা…

আব্বার মুখের দুপাশে ফেনা গড়িয়ে পড়ছে। শরীরটা কেমন যেন অদ্ভুত রংয়ের মনে হয়। নীলচে ? হ্যাঁ নীলচে। সিকান্দার আব্বার বুকে হাত রাখে—ঠাণ্ডা। ততোক্ষণে সুরাইয়া আর টুনি মিনি কাছে এসে কাঁদতে শুরু করেছে। হঠাৎ কি হল ? মুখে গাঁজলা কেন ? অ্যাসিড হলে মুখে গাঁজলা ওঠে ? অতিরিক্ত গ্যাস কিংবা অ্যাসিডে তো স্ট্রোক হয়। হতে পারে বলে শুনেছি। স্ট্রোক হলে কি মুখে গাঁজলা ওঠে ? কে জানে।

সিকান্দার ওদের মুখের দিকে তাকায়। ওরা শোকের প্রথম পর্বের

বিহ্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। কান্না তাই ক্রমশ বাড়ছে। ক্রমশ শব্দ বাড়ছে। চিৎকার বাড়ছে। আশেপাশের বাড়ি থেকে লোকজন ছুটে আসছে। ভিড় ক্রমশ বাড়ছে।

সিকান্দার ভিড়ের ভেতর থেকে উঠে দাঁড়ায়। ধীর পায়ে রান্না-ঘরের পেছনে যায়। রান্না ঘরের পেছনের বেড়ায় কীটনাশকের একটা শিশি আটকানো থাকে। পুকুর পাড়ে সবজির চাষ করলে মধ্যে মধ্যে কীটনাশক ছড়াতে হয়। সেজন্যেই কীটনাশকের দরকার। কীট মরলে ফলন বাড়ে। বেশি ফলনের জন্যে বেশি বেশি কীটনাশকের ব্যবহার চলছে আজকাল। ফলনও বাড়ছে ইদানিং। সব ঠিকঠাক চলছে মানতেই হবে। তবে মাঝে মাঝে কীটনাশকের বিষে পোকা মাকড়ের সাথে আরো অনেক কিছু মরছে। মরছে তার কারণ বিষ শুধু পোকামাকড় নয়, আরো অনেক কিছু মারতে পারে। মারেও। আলো মারে হাওয়া মারে কীটপতঙ্গের চেয়ে বড়সড় প্রাণীও মারে, কখনো কখনো খেতের মালিকও মারে।

সিকান্দার শিশিটার কাছে গিয়ে দেখল, হ্যাঁ, একটু কমে গেছে মনে হয়। এই বছর সবজির চাষ হয়নি। অনেকদিন কীটনাশক ছড়াবার দরকার লাগেনি। আগেরবার ঠিক কতোটা শিশিতে রাখা ছিল পুরো মনে থাকার কথা নয়। তবে একটু একটু ঝাপসা ঝাপসা মনে পড়ছে। না, সত্যিই শিশির বিষ কমে গেছে। হয়তো হাওয়ায়, অনেকদিন পড়ে থাকলে এমনিতেই বোধ হয় একটু একটু করে উড়ে যায়। তাই কি? বিষ কি হাওয়ায় ওড়ে?

সিকান্দার ফিরে এসে আব্বার মুখের দুপাশ ভালো করে মুছে দেয়। এখন আর গাঁজলা নেই। কিন্তু শরীরের নীলচে রঙ কিভাবে মুছে ফেলা যায়? যাবে না। মানুষের শরীর থেকে কিছুতেই নীল রঙ সরানো যাবে না।

পড়শিরা এসে গেছে। কাছাকাছি আত্মীয়স্বজন যারা আছে তারাও খবর পেয়ে এসেছে। এখন আর শোকের কাল দীর্ঘ করে লাভ নেই। তাড়াতাড়ি সৎকারের প্রয়োজন। সিকান্দার চারপাশে তাকায়। আত্মীয়দের মধ্যে যারা বয়স্ক তারা এগিয়ে আসে। যারা উদ্যোগী তরুণ তারা এর মধ্যেই প্রাথমিক আয়োজনে লেগে পড়েছে। বাড়ির উঠোনের একপাশে কাপড় দিয়ে ঘিরে মৃতের শেষ স্নানের আয়োজন চলছে। এরপর কাফনের কাপড় পরিয়ে দাফন করা হবে।

একটা জীবন—আধুনিক জীবনের পক্ষে বেমানান, ব্যর্থ, অসহিষ্ণু, রাগি এবং অকারণে প্রত্যয়ী একটা মানুষের জীবন তার সমস্ত অস্তিত্ব নিয়ে অতীতের গর্ভে, অন্ধকারে, কবরে নির্বাসিত হবে।

আন্তোনিও নিঃশব্দে সিকান্দারের পাশে এসে দাঁড়ায়। সিকান্দার তার দিকে তাকায়। আন্তোনিও তাকে একপাশে সরিয়ে নিয়ে চাপাকণ্ঠে বলে—স্যার, কোনো সমস্যা হলে বলবেন।

—কি সমস্যা?

—মানে যে কোনো সমস্যা। আমি আপনার সহকারি। যে কোনো সমস্যায় আমি আপনার সাহায্যের জন্য তৈরি।

—যেমন?

—স্যার আপনি নির্বোধ নন।

—পরিষ্কার কথা বলুন।

—যদি ডেথ সার্টিফিকেট পেতে কোনো সমস্যা হয়…

—কেন সমস্যা হবে?

—না, মানে, যদি কোনো সমস্যা হয়, তাহলে আমি আপনার পাশে আছি।

—কেন সমস্যা হবে?

—লাশের শরীরের রং নীল।

সিকান্দার গভীর দৃষ্টিতে আন্তোনিওর দিকে তাকায়। তারপর অন্য দিকে ফিরে মাথা ঝাঁকায়। তাহলে কারো কারো দৃষ্টিতে ঠিকই ধরা পড়ে গেছে। সিকান্দার আন্তোনিওর মতো একই রকম চাপাকণ্ঠে বলে—খুব তাড়াতাড়ি সৎকারের ব্যবস্থা করতে হবে। আপনি যা দেখেছেন তা ঠিক নয়। তার কারণ আর কেউ তা এখনো দেখেনি।

—ও কে স্যার। আর কেউ যখন দেখেনি তখন আমিও দেখিনি। তাড়াতাড়ি সৎকারের ব্যাপারে আমি কিভাবে সাহায্য করতে পারি?

—ছেলেদের সাথে হাত লাগান।

—ও কে স্যার।

আন্তোনিও উদ্যোগী তরুণদের দলে ভিড়ে অনেকের কাজ একাই এক হাতে সামলে নেয়। তার কাজের ধরণ সুশৃঙ্খল যথাযথ নিখুঁত এবং বিজ্ঞান-ভিত্তিক। সুতরাং অল্প সময়ের মধ্যে কবর খোঁড়ার কাজসহ অন্যান্য

আনুষঙ্গিক ঝামেলা শেষ হল। এবার জানাজা হবে। কাছাকাছি যারা আত্মীয়স্বজন ছিল তারা আগেই এসে গেছে। একটু দূরে যারা আছে তাদেরও খবর পাঠানো হয়েছে। যারা এখনো পৌঁছাতে পারেনি তাদের বাদ রেখে জানাজার নামাজ পড়া হয়। তারপর মৃতদেহ কবরে দেয়ার পালা। মৃতদেহ বয়ে নেয়ার জন্যে একটা ভাঙা চৌকি যোগাড় করা হল। চৌকির সামনের দিকের একপাশ সিকান্দার তুলে ধরে। পেছন থেকে অন্য দুজন। আন্তোনিও সিকান্দারের পাশে এসে কাঁধ লাগায়। এই মুহূর্তে আন্তোনিওকে সিকান্দারের ভালো লাগে। ঠিক আপন ভাইয়ের মতো মনে হয়। না, মানুষটা পুরোপুরি রোবট নয়, হয়তো হৃদয়হীন কিন্তু যেখানে হৃদয় ছিল সেখানকার সব তন্ত্রী হয়তো এখনো শুকিয়ে যায়নি।

লাশ কবরস্থ করা গেল। যারা সাথে এসেছিল একজন একজন করে তারা ফিরে যায়। দুএকজন আত্মীয়বন্ধু সিকান্দারকে সান্ত্বনা দিতে এসে বোঝে, তার সান্ত্বনার খুব একটা প্রয়োজন নেই। সে যথেষ্ট শক্ত আছে। লাশ কবরে দেয়ার পরে নিকটাত্মীয়দের চরম শোকের একটা পালা আসে। এই শেষ। আর কখনো তাদের প্রিয় মানুষটিকে দেখতে পাবেনা। চিরকালের মতো মাটির তলায় মানুষটি বিলীন হয়ে গেল। সব শেষ, এখন শুধুই তার স্মৃতি, এখন তার অস্তিত্বের সবটুকু স্মৃতির ধুলোর আস্তরণে লীন হয়ে গেল। এই বোধ মানুষকে শোকবিহ্বল করে। মানুষ তখন বেদনায়, শোকে ভেঙে পড়ে। সেই সময়ে যারা কাছে থাকে তাদের দায়িত্ব হল শোকার্ত মানুষটিকে সামলে রাখা। এক্ষেত্রে সিকান্দার যথেষ্ট দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছে। তাকে দেখে মনে হয়, সে যেন কোনো প্রতিবেশীর মৃত্যুতে তার আত্মীয়দের সঙ্গ দিতে এসেছে, তার বেশি কিছু নয়। যারা তখনো তার পাশে ছিল তারাও একে একে ফিরে যায়। সিকান্দার বাড়ির পশ্চিম প্রান্তের সেই মাঠের কাছে এসে দাঁড়ায়। নতুন ধানের গাছে মাঠ গাঢ় সবুজ হয়ে আছে। দূরে, অনেক দূরে নদীর ওপারে গ্রাম। গ্রামটাকে কালচে সবুজ মনে হয়। এখানে গতকাল আব্বা দাঁড়িয়ে ছিলেন। তখন ছিল সূর্যাস্তের কাল। আব্বা কি অস্তমিত সূর্যের ভেতরে তাঁর আসন্ন মৃত্যুকে দেখেছিলেন? আসন্ন মৃত্যুকে দেখা যায়? অনুভব করা যায়? হয়তো যায়। হয়তো মৃত্যুই তাকে আসন্ন অস্তিত্বের দিকে সবলে টেনে নেয়। সে মৃত্যুর হাতের টান এড়াতে পারে না। পালাতে পারে না।

কিন্তু স্বেচ্ছায় ? কেন মানুষ স্বেচ্ছায় মরে ? এ জীবন মধুর। যতোই বেদনা থাক, যতোই দুঃখ থাক, যতোই দারিদ্র থাক জীবন এক আশ্চর্য সম্পদ। তাকে কেউ স্বেচ্ছায় হারাতে চায় ? হারাতে পারে ? পারে। কেন পারে ? তাহলে কি জীবনের মতো মৃত্যুও মধুর ? মৃত্যুও কি জীবনের মতোই এক আশ্চর্য সম্পদ ? এক অন্তহীন আনন্দের উৎস ? তাহলে আর জীবনের জন্যে এতো শ্রম, এতো ঘাম এতো যন্ত্রণার কি প্রয়োজন ? কেন মানুষ জীবনের জন্যে এতোটা প্রাণপাত করে ? অর্থ-হীন। সবই দুর্বোধ্য, অর্থহীন, জটিল। হয়তো সবই অবান্তর। এই জীবন অবান্তর। মৃত্যু অবান্তর। এই জীবন মৃত্যুর মতো জটিল মুহূর্ত-গুলো অবান্তর।

—স্যার ?

—বলুন।

—আমি কি অন্য প্রসঙ্গে একটু আলোচনা করতে পারি ?

—কারণ ?

—শোক দীর্ঘায়িত না করাই ভালো।

—কে বলল আমি শোকার্ত ?

—তাহলে আপনি শোকার্ত নন ?

—কে বলল আমি শোকার্ত নই ?

—স্যার ?

—বলুন।

—আমি আপনার সম্পর্কে একটা মন্তব্য করতে পারি ?

—পারেন।

—আপনি একজন বিস্ময়কর মানুষ।

—আপনি তার চেয়েও বিস্ময়কর।

—আমি যতোটা বিস্ময়কর হয়তো তার চেয়ে ঢের বেশি বিভ্রান্ত।

—আমিও যতোটা বিস্ময়কর তার চেয়ে বেশি বিভ্রান্ত।

—আপনি বিভ্রান্ত হলেও ঋজু, আপনার বিভ্রান্তি সহজে বোঝা যায় না।

—আপনিও তাই।

—স্যার, কোনোভাবেই আমি আপনার সমকক্ষ নই।

—অবশ্যই। কোনোভাবেই আমি আপনার সমকক্ষ নই।

—স্যার ?

—বলুন।

—আপনি একজন অসামান্য শব্দরসিক।

—আপনিও তাই। হয়তো আমরা দুজনেই বিস্ময়কর মানুষ। দুজনেই বিভ্রান্ত, বিভ্রান্তি কাটাতে বারবার অর্থহীন শব্দের আশ্রয়ে নিজেদের আড়াল করি। হয়তো আমরা দুজনেই জীবনের ভারে ক্লান্ত, বিধ্বস্ত, অসহায়। হয়তো আমরা দুজনেই সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত। আন্তোনিও।

—স্যার ?

—হয়তো আমরা দুজনেই মৃত্যুর শোকে শোকার্ত। কার মৃত্যুর শোকে নিশ্চয় আপনি তা জানেন ?

—নিশ্চয় জানি।

—কার ?

—নিজের নিজের মৃত্যুর শোকে আমরা শোকার্ত।

—চমৎকার, আন্তোনিও, চমৎকার।

—কোনটা স্যার, আমরা না আমাদের মৃত্যুর শোক ?

—শোকের প্রসঙ্গ থেকে সরে যাওয়া।

—সত্যিই কি শোক থেকে আমরা সরতে পেরেছি ?

—অন্তত চেষ্টা করেছি।

—তাহলে এবার অন্য প্রসঙ্গে একটু আলোচনা হোক ?

—হোক।

—আপনার অ্যাকাউন্টে আরো এক লক্ষ টাকা কমিশান হিসেবে জমা পড়েছে।

—কিসের কমিশান ?

—আপনি একজনকে বসের কাছে পাঠিয়েছেন। তিনি তাঁর নিজের, তাঁর স্ত্রীর, তাঁর দুই সন্তানের অতীত ভবিষ্যৎ বর্তমান সত্তা আত্মা স্বপ্ন কল্পনা বাসনা সব কিছু বিক্রি করে দিয়েছেন।

—আমি তো কাউকে পাঠাইনি। কি নাম তার ?

—মলয় মুখোপাধ্যায়।

—আশ্চর্য। ও জানল কি ভাবে? আমি তো ওকে শুধু প্রসঙ্গটা বলেছিলাম, ওকে তো আপনাদের ঠিকানা দিইনি।

—তিনি নিজের গুণেই ঠিকানা যোগাড় করেছিলেন।

—যেমন?

—আপনার ব্রিফকেসের ভেতর টাকার সঙ্গে আমাদের কাগজ পত্রও ছিল। উনি এক পলকের মধ্যেই ঠিকানা দেখে পরে টুকে নিয়েছেন এবং গতকাল আপনি ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের অফিসে যোগাযোগ করেছেন।

—চমৎকার।

—কোন্‌টা স্যার? আপনার কমিশান নাকি আপনার বন্ধুর যাবতীয় অবাস্তব সম্পত্তি হস্তান্তর?

—ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া।

—স্যার, ঘাস যদি খুব লম্বা হয় তাহলে ঘোড়া ডিঙিয়ে খাওয়া অসম্ভব নয়।

—চমৎকার।

—কোন্‌টা স্যার? ঘাস, ঘোড়া নাকি ডিঙিয়ে খাওয়ার সার্থকতা?

—আপনাদের দক্ষতা।

—নিশ্চয় আমরা দক্ষ লোক। এ বিষয়ে কখনো কোনো সন্দেহ করবেন না।

—আপনি এতো কিছু জানালেন কি ভাবে?

—আমরা দক্ষ লোক, স্যার, আমাদের যে জানতেই হয়।

—মূর্খ।

—কে স্যার, নিশ্চয় আমরা নই?

—অবশ্যই নন। আমার বন্ধু। সে মাত্র দশ লক্ষ টাকার বিনিময়ে তার পরিবারের সর্বস্ব বেচে দিল। অথচ আমাকে একবার জিগ্যেসও করল না।

—শুধু তাই নয়, তিনি আপনার প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ চেপে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আমার বস্‌ ভালো করে চেপে ধরতেই তিনি আপনার প্রসঙ্গ বলতে, মানে সবিস্তারে বলতে বাধ্য হয়েছেন। তবে তিনি বার বার আপনাকে বিষয়টা না জানাতে অনুরোধ করেছেন।

—এবং আপনারা তার বারবার অনুরোধ সত্ত্বেও তার সঙ্গে বিশ্বাস-ঘাতকতা করলেন। চমৎকার!

—কোন্‌টা স্যার, আপনার বন্ধুর অনুরোধ না আমাদের বিশ্বাস ঘাতকতা?

—দুটোই! কারণ দুটোই বিশ্বাস ঘাতকতা।

—নিশ্চয়। পেশাগত দিক থেকে আমরা উভয়পক্ষই সমান সৎ। মানে, আপনার বন্ধু এবং আমাদের শাইলক অ্যান্ড সিকোফ্যান্ট্‌স্‌, আমাদের উভয়ের পেশা ব্যবসা অর্থাৎ বিশ্বাস ঘাতকতা। সেক্ষেত্রে, অর্থাৎ পেশাগত দিক থেকে আপনার বন্ধু এবং আমাদের কোম্পানি উভয়েই সততার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখেছে, একথা আপনাকে মানতেই হবে।

—নিশ্চয়। আপনারা উভয়েই সৎ-বিশ্বাসঘাতক।

—ধন্যবাদ স্যার। আপনার যথার্থ মূল্যায়নের জন্যে আপনাকে অবশ্যই ধন্যবাদ দিতে হবে।

—যাই হোক, আমার সৎ-বিশ্বাসঘাতক বন্ধু একদিক থেকে রক্ষা পেয়েছে, তার রান্না ঘরের পেছনে ঝোলানো পেস্টিসাইড নেই এবং তার বাবা জীবিত নন।

—তার পুত্র এখনো জীবিত, স্যার।

—তার মানে? আপনি কি বলতে চান?

—আপনি নির্বোধ নন, স্যার।

—তার অর্থ...

—আমাদের পরম পিতার রাজত্বে কোনো পিতা কিংবা কোনো পুত্র নিরাপদ নয়।

—তার অর্থ...

—তার অর্থ সমস্ত অতীত কিংবা সমস্ত ভবিষ্যৎ সংকুচিত করে, ধ্বংস করে, আমাদের পরম পিতা শুধু মাত্র একটি অস্থির বর্তমান তৈরি করতে চান। যে বর্তমান, যে ভয়ংকর অস্থির বর্তমান কেবল তাঁরই অঙ্গুলি হেলনে ওঠ্‌ বস করবে।

—আন্তোনিও।

—স্যার?

—সমস্ত অতীত ধ্বংস করে সমস্ত ভবিষ্যৎ ধ্বংস করে শুধুমাত্র এক ডলারের বর্তমান দিয়ে আপনার পরম পিতা কি করবেন ?

—ওঠ্ বস করাবেন।

—আর ?

—ডান বাম করাবেন।

—আর ?

—আর সমস্ত অস্থির বর্তমানটাকে নিংড়ে চুষে ছিবড়ে করে ফেলবেন!

—আর ?

—আর শতকরা ৮৩·৪ ভাগকে ১০০ ভাগে উন্নীত করবেন।

—আর ?

—আর এ বিশ্বের সমস্ত সম্পদের সবটুকু নিজের ভাগে এনে ভাগহীন দুর্ভাগা মানুষদের ইচ্ছে মতো ওঠ্ বস করাবেন।

—তারপর ?

—তারপর, ইচ্ছে মতো অনুবোমা পরমানু বোমার নির্ভেজাল পরীক্ষা চালাবেন। এবং প্রতিটি পরীক্ষার কেন্দ্র হবে কোটি কোটি অসহায়, দুস্থ অভুক্ত মানুষের ঘন বসতি পূর্ণ শহর বন্দর কিংবা লোকালয়।

—তারপর ?

—তারপর, এই ভাবে, অতিদ্রুত আমাদের পরমপিতা পৃথিবীকে ভারমুক্ত করবেন।

—চমৎকার।

—কোন্‌টা স্যার, আমাদের পরমপিতা নাকি ভারমুক্ত পৃথিবী ?

—পৃথিবীকে ভারমুক্ত করার পরিকল্পনা।

চোদ্দ

সিকান্দার কবরখানা থেকে বাড়ি ফিরে দেখে পুকুর পাড়ের চাতালে লরির পর লরি এসে ইট ফেলছে, বালি ফেলছে, পাথর কুচি ফেলছে তার মানে বাড়ির কাজ শুরু হবে। মতিন করিৎকর্মা লোক। এক রাতের ভেতর প্রায় শ' দুয়েক লোক যোগাড় করে ফেলেছে। তারা অধিকাংশ রাজ-মিস্ত্রির যোগানদার কিংবা অন্য ধরনের ছোটখাটো কাজে লাগবে। সিকান্দার

একবার ভাবে, আজ এসব ঝামেলা বন্ধ করে দেবো। পরে ভাবে, কাজের ভেতরে থাকলে দুশ্চিন্তা কমে যাবে, মনের অস্থিরতা দূর হবে। এই ভালো, কাজ চলুক। ব্যস্ততা ভিড় এতো লোকের কথাবার্তার শব্দে নিজেকে ভুলিয়ে রাখা সহজ হবে। সুতরাং সিকান্দারের পকেটের টাকার বান্ডিল মতিনের পকেটে যেতে থাকে এবং মতিনের পকেট থেকে জড় হওয়া লোকেদের পকেটে। হাঁক ডাক চিৎকার চেঁচামেচি এমন শুরু হয় যে রীতিমতো বাজার বলে ভুল করা যেতে পারে। একটু আগে কবর খোঁড়ার কাজে যারা প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল এবার তারা নতুন বাড়ির ভিত গড়তে নতুন গর্ত খোঁড়া শুরু করে। বাড়ির প্লানের সমস্যা নেই। আন্তোনিও জায়গা দেখে, জায়গা মেপে, সবচেয়ে সুবিধেজনক এবং সবচেয়ে দৃষ্টি নন্দন একটা প্ল্যান মিস্ত্রির হাতে ধরিয়ে দেয়। মিস্ত্রি তার কাজ শুরু করে। অস্বাভাবিক দ্রুত বেগে বাড়ি উঠতে থাকে।

প্রথমে আব্বার মৃত্যু তারপর বাড়ি বানাবার হৈচৈ এমন ভাবে শুরু হয় যে কেউ কোনো ব্যাপারে বিশেষ নজর দেয়ার সময় পায় না। শোক-দুঃখের ব্যাপার ভুলে যার যার সামর্থ্য মতো বাড়ির কাজে সাহায্য করতে হয়। বাড়িতে এতো লোক জমে গেলে বাড়ির মেয়েদের ঝামেলা বেড়ে যায়। এটা দাও ওটা দাও তো আছেই সেই সাথে এটা নেই সেটা নেই। অথচ বাড়িতে বলতে গেলে কিছুই নেই। তাই বার বার দোকানে পাঠানো, বাজারে পাঠানো বার বার সিদ্ধান্ত পাল্টানো, নতুন সিদ্ধান্ত করা। এক কথায় সে এক বিদঘুটে কান্ড শুরু হয়। ওর ফাঁকে কেউ কিছু খেয়াল করেনি। করার সুযোগও ছিল না। হঠাৎ যীশুর খোঁজ পড়তে জানা গেল, যীশু নেই। যীশু নেই মানে? সকাল বেলায় দাদুর লাশের পাশে বসে ফুঁপিয়ে কাঁদল, দাদুর লাশের সাথে সাথে কবরের কাছে গেল, তারপর হঠাৎ কোথায় হাওয়া? কাছে পিঠে আছে। দেখ, ভালো করে দেখ, চারিদিকে ছোট। যে যার কাজ ফেলে যীশুর খোঁজে বেরিয়ে পড়ে। আন্তোনিওর গাড়িতে লোক পাঠিয়ে কাছে দূরে যে সব আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি আছে সর্বত্র খোঁজ নেয়া হল। কোথাও যীশু নেই। অনেকের সন্দেহ হতে, পুকুরে এক দেড়শ লোক নাযিয়ে পুকুর তছনছ করে ফেলল। কোথাও তাকে আর পাওয়া গেল না; কিন্তু যাবে কোথায়? কিছু একটা ভেবে কিংবা মনের দুঃখে বাস রাস্তায় গিয়ে কোন বাসে উঠে পড়েনি তো? সুতরাং আবার চারপাশে লোক পাঠানো হল।

আন্তোনিওর গাড়ি প্রায় সারাদিন পইপই করে আশপাশের বিস্তৃত এলাকা চষে ফেলল, থানায় খবর গেল, কাছেপিঠের হাসপাতালে খবর নেয়া হল কিন্তু কোথাও তার সন্ধান পাওয়া গেল না। জলজ্যান্ত ছেলেটা এতো লোকের চোখের সামনে দিয়ে কোথায় হারিয়ে গেল? কোথায় যেতে পারে? কতো দূরে যেতে পারে?

সন্ধ্যার পর সবাই ক্লান্ত হয়ে সিকান্দারের সামনে জড় হয়। আন্তোনিও ক্লান্ত দেহে গাড়ির বনেটে বসে আছে। তার মাথা মাটির দিকে। তাকে গভীর চিন্তাগ্রস্ত মনে হয়। অন্যেরা, তারা সংখ্যায় এতো যে বসার জায়গা নেই, সিকান্দারের চার পাশে জড় হয়েছে। সিকান্দার কি করবে বুঝতে না পেরে ওদের ব্যর্থ সন্ধানের বিস্তৃত বর্ণনা পরপর শুনে যায়। কিন্তু সে আর কতোক্ষণ? এক সময় রাত হয়, রাত বাড়ে। যে যার বাড়ি ফেরে। এখন বাড়ির লোকেরা ছাড়া আর কেউ নেই। এখন কি ভাবে নিজের মুখোমুখি হবে? কি ভাবে স্ত্রীর মুখোমুখি হবে, কি ভাবে মায়ের? মা সেই সকাল থেকে যে বিছানা নিয়েছেন আর ওঠেননি। কেউ কিছু জিগ্যেস করলেও কিছু বলছেন না। কারো কথাও শুনছেন না। এই আর এক বিপদ। এখন মাকে বাঁচানোই তো দায়। এদিকে সুরাইয়া এতো স্বাভাবিক, এতো স্বাভাবিক ভাবে সব কিছু তদারকি করছে যে সে আর এক ভীতিপ্রদ ব্যাপার। সিকান্দার কয়েকবার তার কাছে কিছু একটা জিগ্যেস করতে গিয়েও অমন অস্বাভাবিক রকমের স্বাভাবিক মূর্তি দেখে আর সাহস করেনি।

এই যদি অবস্থা হয়, তাহলে কিভাবে কাকে কে সামাল দেবে? মেয়ে দুটো এতো বাচ্চা যে তাদের নিজেদের শোকতাপ সামলে নিয়ে অন্যকে সামলে দেয়ার বয়েস হয়নি। তারা দুজন বিচ্ছিন্ন ভাবে এদিক সেদিক ঘুরছে, কখনো বাবার কাছে, কখনো মায়ের পাশে কখনো দাদির বিছানার পাশে। তারা যে কি করবে কি করা উচিত এসব তারা নিজেরাও জানে না। গোটা পরিবার বিধ্বস্ত। সংসার বিপর্যস্ত। এখন সিকান্দার কি করবে? কি করতে পারে? কি তার করা উচিত?

অনেকক্ষণ আগে লোকজন চলে গেছে। বাইরের বারান্দায় সিকান্দার একা বসেছিল। বাইরের উঠোনে গাড়ির দরোজা খুলে আন্তোনিও বসে আছে। এখানে অন্ধকার। দুজনে দুজনের কাছাকাছি থাকা সত্ত্বেও কেউ কারো সাথে কথা বলেনি। কি বলবে? এখন আন্তোনিওর সাথে আর কি

কথা বলার আছে ? সে তার সাধ্যমতো ঘুরেছে। সারাদিন আশপাশ চষে ফেলেছে। তার কলকাতার অফিসে ফোনে কথা বলেছে। তাদেরকেও খোঁজ-খবর করতে বলেছে। এছাড়া আর সে কি করতে পারে ? সে জাদুকর নয়, হারিয়ে যাওয়া যীশুকে হঠাৎ হাওয়া থেকে বের করে আনতে পারেনা।

সিকান্দার বাইরের বারান্দা ছেড়ে ভেতরের বারান্দায় গেল। মেয়ে দুটো কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়েছে। মা ঘুমিয়ে আছেন না জেগে আছেন তা বোঝা যায় না। সেই সকাল থেকে একইভাবে শুয়ে আছেন। মাঝে মাঝে দীর্ঘ নিশ্বাসের শব্দ না হলে ভাবতে হতো মারা গেছেন।

সিকান্দার ওপাশের বারান্দায় গেল। সেদিকে একা সুরাইয়া বসে আছে। ঘরের ভেতরে একটা টিমটিমে আলো জ্বলছে। সে আলোর সামান্যতম বিন্দুও এদিকে আসছে না। অন্ধকারে নিশ্চল মূর্তির মতো সুরাইয়া শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। সিকান্দার তার পাশে বসে জড়ানো গলায় ডাকে—সুরাইয়া। সুরাইয়া মুখ ফেরায়। কিছুক্ষণ সিকান্দারের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। অন্ধকারে কেউ কারো মুখের রেখা পড়তে পারে না। সিকান্দার আবার ডাকে—সুরাইয়া।

—বল।

সুরাইয়ার কণ্ঠস্বর আশ্চর্য রকমের স্বাভাবিক। এমন অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে তার এমন স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরে সিকান্দার চমকে যায়। ওর কি হল ? এতো স্বাভাবিক কেন ? কোনো তাপ উত্তাপ নেই কেন ? সে নিজের বিস্ময়ের ঘোর কাটাতে অকারণে আবার ডাকে—সুরাইয়া।

—বল।

—এখন কি করি ? কোথায় যাই ? কোথায় যীশুকে পাই।

—তাকে আর কোনোদিন পাওয়া যাবে না।

—কেন, কেন ? কি হয়েছে ?

—সে চলে গেছে।

—কোথায় ? তুমি কিভাবে জানলে ? কোথায় গেছে ? সুরাইয়া, সে কোথায় ?

—জানিনে।

—তুমি যে বললে চলে গেছে, কোথায় চলে গেছে, কার সাথে গেছে, বল, আমায় বল, আমার কাছে লুকিয়ে রেখ না, বল, বল, দোহাই, বল।

—জানিনে।

—সুরাইয়া। সত্যি কথা বল, দোহাই।

—সকালে উঠেই বিড়বিড় করছিল—আমার বড় হওয়া বেচবো না, কিছুতেই আমার ভবিষ্যৎ বেচবো না, চলে যাবো পালিয়ে যাবো··· ভবিষ্যৎ বেচবো না।

—কোথায় যেতে পারে বলতো? মনে হয় ভয় পেয়ে গেছিল।

—ভয় তো পাওয়ারই কথা। ও ভয় পেয়ে গেছিল। আব্বা ভয় পেয়ে গেছিলেন। ওরা ভয় পেয়ে যে যার মতো চলে গেল। শুধু তুমিই ভয় পাওনি।

—সুরাইয়া, আমি কি সত্যিই কোনো অন্যায় করেছি? সত্যি কথা বল।

—জানিনে।

—না, না, সুরাইয়া সত্যি বল, ওরা কেন ভয় পায়? ওদের কিসের ভয়? আমি তো আছিই। দায়িত্ব আমার। যা কিছু করেছি, সবটাই আমার দায়িত্বে করেছি। তবু ওরা কেন ভয় পায়?

—জানিনে।

—সুরাইয়া, আমি কি সত্যিই কোনো অন্যায় করেছি?

—আমি সত্যিই জানিনে।

—আমি কার জন্যে এসব করেছি? ওদের জন্যেই তো করেছি। ব্যাঙ্কে টাকা জমা আছে। কতো টাকা ভাবতে পারো? এগারো কোটি। এগারো কোটি টাকা দিয়ে পুরো অঞ্চল কিনে ফেলা যায়। এতো টাকা থাকতেও আমি নিঃস্ব হয়ে গেলাম। কি হবে এ টাকা, কার ভোগে লাগবে, কে খাবে?

—ব্যাঙ্ক খাবে। ব্যাঙ্কের ভোগে লাগবে।

—সুরাইয়া ওভাবে কথা বল না। যা বলার সোজাসুজি বল, বল, আমি কি অন্যায় করেছি?

—জানিনে। আমি শুধু জানি, কোথাও একটা গোলমাল হয়ে গেছে, বড় গোলমাল, খুব মারাত্মক রকমের একটা কিছু।

—আমিও জানিনে। যে জীবন হাতে ছিল সেটা কোনো জীবন নয়। পশুপাখির জীবনের চেয়েও খারাপ, পশুপাখির জীবনের চেয়েও

নোংরা, দিন আনা দিন খাওয়া কোনো মানুষের জীবন হতে পারে না।

—এখন যে জীবনটা হাতে এল সেটাও কি মানুষের জীবন ?

—জানিনে।

—কেন জানো না ? তুমি না জানলে কে জানবে ? জানার দায়িত্ব তোমার।

—আমার ? শুধু আমার ?

—তোমার। শুধু তোমার।

—কেন, শুধু আমার কেন ? আমি কি নিজের জন্যেই এতোসব করলাম ? শুধু আমার জন্যেই ? বল, আমি কি শুধুই আমার...

—তুমি শুধুই তোমার।

—কি বলতে চাও ?

—যার জীবন তার।

—একথা তুমি বলতে পারলে ?

—পারলাম।

—কি করে পারলে ?

—পারলাম এই জন্যে—তুমি নিজের জীবনের বোঝা অন্যের ওপরে চাপিয়ে দিয়েছ।

—কিন্তু অন্যের জীবনের দায় আমার ওপর এসে পড়লে ?

—সেটা দায়, বোঝা নয়, যদি কেউ দায়িত্বকে বোঝা মনে করে তবে তার দায়িত্ব ছেড়ে দেয়া উচিত।

—সুরাইয়া। কি বলছ তুমি ?

—যা সত্যি তাই বলছি।

—যা সত্যি তাই। তোমাদের জন্যে প্রাণপাত করেও একথা শুনতে হল। হায়...

—হায় শাইলক বল।

—সুরাইয়া, তুমি কি শাইলককে জানো ?

—আমি তোমাদের সব কথা শুনেছি।

—আমাদের সব কথা শুনে বুঝতে পেরেছ ?

—আমি কম লেখাপড়া জানতে পারি, নির্বোধ নই।

—না, তুমি নির্বোধ নও, আব্বা নির্বোধ ছিলেন না, যীশু নির্বোধ ছিল না, আন্তোনিও নির্বোধ নয়, শাইলক নির্বোধ নয়, শুধু আমিই নির্বোধ।

—ঠিক তাই।

—কেন আমি নির্বোধ, কিভাবে আমি নির্বোধ?

—নিজের জীবনের ভার যে টাকার বাণ্ডিলের ওপর চাপিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চায় সে নির্বোধ। সবচেয়ে বড় নির্বোধ।

—হায় সুরাইয়া, তোমার কাছেও একথা শুনতে হল।

—তুমি এমন কথা আরো শুনবে, আরো কিছু দেখবে কিন্তু কিছুই বুঝবে না। নির্বোধ অনেক কিছু শোনে অনেক কিছু দেখে কিন্তু কিছুই বোঝে না।

—আমায় বোঝাও, বুঝিয়ে দাও।

—নির্বোধকে বোঝালেও বোঝে না।

—সুরাইয়া। হায় সুরাইয়া।

—সব খোয়াবার পর হায় হায় করা ছাড়া নির্বোধের আর কিছুই করার থাকে না। যাও, চিৎকার করো, যতো জোরে পারো এখন হায় হায় করো। হায় হায় করতে করতে তোমার অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ ভেঙে দাও। ভেঙে খান খান করে দাও।

—সুরাইয়া, আমি পাগল হয়ে যেতে চাই, মরে যেতে চাই।

—মরার আগে তোমার বাবার মৃত্যুর হিসেব মিটিয়ে যাও। তোমার ছেলের মৃত্যুর হিসেব মিটিয়ে যাও।

—ছেলের মৃত্যু! কি বলছ তুমি?

—যে ছেলে আর কোনোদিন ফিরে আসবেনা সে মৃত। তার মৃত্যুর জন্যে তুমিই দায়ী। তুমি! আমার ছেলের মৃত্যুর হিসেব দাও।

—সুরাইয়া।

—দূর হও। মরে যাও। মরে যাও।

—আমি···আমি···

—তুমি মৃত। তোমার বাবার সাথে তোমারও জানাজা হয়ে গেছে। যাও কবরে যাও।

সিকান্দার বারান্দা থেকে ঝাঁপ দিয়ে উঠোনে নামে। ছুটে যেতে গিয়ে

নিজের পায়ে জড়িয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। তারপর কোনোক্রমে উঠে দাঁড়ায়। বিড় বিড় করতে করতে বলে—মরবো। মরে যাবো—সেই ভালো। পেছন থেকে সুরাইয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে চিৎকার করে—মরার আগে আমার ছেলের মৃত্যুর হিসেব মিটিয়ে যাও।

—সুরাইয়া, আমি কোথায় তোমার ছেলেকে পাবো? আমার নিজের মৃত্যু দিয়ে তোমার ছেলের মৃত্যুর ঋণ শোধ ক'রে দেবো।

—তার আগে তোমার বাবার মৃত্যুর ঋণ শোধ করে যাও।

—আমার নিজের মৃত্যু দিয়ে বাবার মৃত্যুর ঋণ শোধ করে যাবো।

—নির্বোধ। উন্মাদ। চোর। একটা মৃত্যু দিয়ে তুমি দুই দুটো মৃত্যুর ঋণ শোধ করবে? তোমার টাকার বাণ্ডিল দিয়ে আরো একটা 'তুমি' বানাও। তারপর দুজনে মরো। দুজনে মরেই দুটো মৃত্যুর ঋণ শোধ দাও।

—সুরাইয়া।

—নির্বোধ কখনো মরে না। যুগ যুগ ধরে নির্বোধ বেঁচে থাকে। নিজে বেঁচে অন্যকে মারে। তোমার মরণ নেই। বাঁচো। বেঁচে থাকো। মরণের অধিক জীবন নিয়ে খাবি খাও।

—আমায় বল, বলে দাও, আমায় দিশা দাও···বল আমি কি করবো?

—টাকার বাণ্ডিলে হাত বুলাও।

—বাণ্ডিল পুড়িয়ে দাও।

—পারবে না। আর পারবে না। একবার নরম হাতের ছোঁয়া পেলে সে বাণ্ডিল আর কখনো পোড়ে না। সে শুধু পোড়ায়, জ্বালায়, জ্বালিয়ে সবকিছু ছারখার ক'রে দেয়।

—কেন? কেন? কেন?

—লোভ। লোভ। লোভ।

—কিসের লোভ?

—তোমার সর্বগ্রাসী অর্থনৈতিক স্বাধীনতার লোভ।

পনেরো

সিকান্দার টলতে টলতে উঠোন ছেড়ে পেছনের জংলা পথ ধরে কবর খানার দিকে এগিয়ে গেল। কোনো উদ্দেশ্য নেই, কোনো কাজ নেই, এই যাওয়ার

অর্থ নিজেকে সচল রাখা। সে যে এখনো মৃত নয় জীবিত এ শুধু তারই প্রমাণ। কিন্তু এই প্রমাণে আর কার প্রয়োজন? তার নিজের? সে অন্ধকারে গাঁয়ের ঝোপ ঝাড় পেরিয়ে, লতাপাতা মাড়িয়ে শেয়ালের মতো নিঃশব্দে কবরের কাছে গেল। যতোই নিঃশব্দে হেঁটে যাক তবু তার পায়ের আওয়াজ পেয়ে কারা যেন কবরের কাছ থেকে দৌড়ে পালায়। কারা? কবরের কাছে এতো রাতে কারা? শেয়াল। কবরের মাটি খুঁড়ে লাশ তুলে নিতে চায়। কিন্তু মাটির তলায় বাঁশের পাটাতন শক্ত করে পুঁতে দেয়া আছে। তার নিচের গর্তের ভেতরে লাশ। শেয়াল মাটি খুঁড়তে পারলেও পাটাতন আলগা করতে পারবে না। হয়তো পারবে না। তবু চেষ্টা করে যেতে হবে। জীবন এমনি কঠিন, খাবারের যোগান দেয়া এতোই জটিল যে চেষ্টা চালিয়েই যেতে হবে। বার বার ব্যর্থ হলেও চেষ্টার ত্রুটি রাখলে চলবে না। যদি একটু একটু করে পাটাতন সরিয়ে ফেলা যায়। যদি মজুদ খাবারের ভাঁড়ার লুট করা যায়। লুট! লুট করা অন্যায় নাকি ন্যায়? যার ঘরে সঞ্চিত খাবার আছে তার আরো খাবার মজুদ করা নিশ্চয় অন্যায়। কিন্তু যার ঘরে শুধুই সঞ্চিত আছে নগ্ন দুহাত, শুধুই নগ্ন দুহাত, খাবারের কণা মাত্র ঘরে নেই, তার পক্ষে লুট করা অন্যায় না কি ন্যায়? শেয়াল, হায় শেয়াল! তোমার যাবতীয় ধূর্ততা নিয়েও তুমি অন্নের সংস্থান করতে পারো না। কেন তুমি তবে পরম পিতা শাইলকের দ্বারস্থ হবে না? কেন তুমি তোমার শেয়াল জীবনের অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ বিক্রি করবে না? তবু তো শেয়াল তার অতীত বিক্রি করে না! তবুতো শেয়াল তার আত্মা কারো কাছে বন্ধক রাখে না। মানুষ শেয়ালের চেয়ে বড় না কি শেয়াল মানুষের চেয়ে বড়? কে কার চেয়ে বড়? হায় ধূর্ত শেয়াল, তুমি পরম পিতা শাইলকের দরবারে কোনো-দিন যাবে না। কোনোদিন তাকে তুমি চিনবে না। কোনোদিন সত্তা-আত্মা আর আকাঙ্ক্ষা তুমি কারো কাছে বিকিয়ে দেবে না। প্রতিদিন খাবারের সন্ধানে বনে বনে ঘুরবে। যেদিন পাবে সেদিন খাবে যেদিন পাবে না সেদিন খাবে না। দিন আনা দিন খাওয়া হায়রে দরিদ্র শেয়াল, অর্থনৈতিক স্বাধী-নতাহীন হে শ্বাপদ, তোমার জীবন জীবনের মতো কষ্টকর, হয়তো জটিল, হয়তো নির্মম। তবু তুমি অর্থনৈতিক স্বাধীনতাহীন নিরঙ্কুশ স্বাধীন। তোমাকে তোমার পুত্রের মৃত্যুর দায় কাঁধে নিয়ে ঘুরতে হয় না। তোমাকে তোমার পিতার মৃত্যুর দায় কাঁধে নিয়ে অন্ধকারে, ঘোর অন্ধকারে পশুর

মতো জীবনের খোঁজে ঘুরতে হবে না। সিকান্দার কবরের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। হঠাৎ কবরের ভেতর থেকে উঠে এল যীশু। যীশুর শরীর ইতোমধ্যে পূর্ণবয়স্ক মানুষের মতো পরিণত হয়েছে। সে ভারি গলায় জিগ্যেস করল—কি চাই ?

তাই তো, কি চাই ? আমি এখন কার কাছে কি চাই ? আমি এখানে কেন এসেছি ? জীবনের খোঁজে বেরিয়ে আমি মৃতের রাজ্যে কেন এলাম ? কবরের কাছে আমার কি কাজ ? এখানে কি জীবন আছে ? নাকি আমি মৃত্যুর খোঁজে বেরিয়ে এসেছি ? তাহলে কি জীবন খুঁজতে খুঁজতে আমি ভুল ক'রে মৃত্যুর খোঁজ করছি ? আমার কি চাই ? জীবন না মৃত্যু ? যীশু আবার জিগ্যেস করে—কি চাই ?

—যীশু, আমি তোমার আব্বু, আমি তোমাকে দেখতে এসেছি।

—মৃতের সাথে জীবিতের কোনো সম্পর্ক নেই।

—যীশু, আমি তোমার ভবিষ্যৎ বিকিয়ে দিইনি। ঘরে চল। ঘরে চল যীশু, তোমার মা তোমার জন্যে অস্থির।

—মৃতের সাথে জীবিতের কোনো সম্পর্ক নেই।

—যীশু, আমার যীশু, আমি তোমার সত্তা, আত্মা, অতীত ভবিষ্যৎ কিছুই বিক্রি করিনি। তোমার জীবন তোমারই আছে। ঘরে চল।

—আমার জীবন আমি ঘরে ফেলে এসেছি। এখন আমার কোনো জীবন নেই। আমার আর জীবনের দরকার নেই।

—তোমার মা অস্থির, হয়তো পাগল হয়ে যাবে। ঘরে চল।

—তোমার স্ত্রী পাগল হলে তার দায়িত্ব তোমার। আমার কোনো মা নেই।

—যীশু আমার যীশু, তুমি কি বলছ তুমি নিজেই জানো না। ঘরে চল।

—আমি যা বলছি তা আমার ভালো ভাবে জানা আছে। তুমি কি বলছ তা তুমি জানো না। জীবিতের সাথে মৃতের কোনো সম্পর্ক নেই। তোমার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।

—যীশু। তুমি কি ভাবে এতো তাড়াতাড়ি এতো বড় হয়ে গেলে ?

—আমি আমার বড় হওয়ার ক্ষমতা কারো কাছে বিক্রি করিনি তাই এতো বড় হয়ে গেছি।

—এতো তাড়াতাড়ি ?

—কতো তাড়াতাড়ি ?

—মাত্র এক দিনে, মাত্র একটা দিনের ভেতরে তুমি এতো বড় হয়ে গেছ ?

—মাত্র একটা দিন কখনো কখনো একটা বছরের সমান। কখনো কখনো একটা শতাব্দীর সমান।

—একটা শতাব্দী মানে, একশ বছরের সমান!

—হ্যাঁ, আজ একটা দিনের মধ্যেই একশ বছর পেরিয়ে গেছে!

—তা হলে আমি বৃদ্ধ ?

—তুমি বৃদ্ধ।

—আমি জীবিত ?

—না।

—তবে ?

—তুমি জীবিত নও। তুমি মৃত নও।

—তবে আমি কি ? আমার অবস্থান কোথায় ?

—শাইলকের সাম্রাজ্যে।

—সে কোথায় ?

—জীবিত নয় মৃত নয় এমন সব মানুষের পৃথিবীতে ?

—সে পৃথিবী কোথায় ?

—তোমার পায়ের তলায়।

—আমি তবে পায়ের তলাকার সেই পৃথিবীকে লাথি মেরে আবার বেঁচে উঠতে পারি ?

—না।

—যীশু, আমার যীশু! বল কেন নয় ?

—শাইলকের সাম্রাজ্যে কোনো মানুষ জীবিত নয় মৃতও নয়, বিক্রিত। কোনো বিক্রিত মানুষ বাঁচতেও পারে না মরতেও পারে না।

—তা হলে আমি জীবিত নই মৃতও নই···

—বিক্রিত!

সিকান্দার গভীরভাবে যীশুর দিকে তাকাল। অন্ধকারে খুব তীক্ষ্ন দৃষ্টিতেও মানুষের চোখের ভাষা পড়া মুশকিল। সিকান্দার তার দিকে

তাকিয়ে চরম বিস্ময়ে লক্ষ করে, যীশুর জায়গাতে যীশু নয়, আব্বা।

—আব্বা।

—বল।

—আপনি আমার ওপর রাগ ক'রে আত্মহত্যা করেছেন। আমার অপরাধ আমি স্বীকার করছি। আমায় মাফ্ করে দিন।

—তোমার অপরাধের ক্ষমা নেই।

—কেন আব্বা, কেন?

—কোনো বিকৃত মানুষের ক্ষমা প্রার্থনার অধিকার থাকে না।

—আব্বা! আমি কি করবো, কোথায় যাবো?

—তোমার আর কিছুই করার নেই। তোমার আর কোথাও যাওয়ার নেই।

—তবে?

—তোমার আছে শুধু কাল হরণের কাল।

—আব্বা!

—বল।

—এই কাল হরণের কাল দিয়ে আমি কি করবো?

—কাল হরণ করবে!

—তারপর?

—কাল হরণ করবে।

—কিন্তু তারপর?

—তারপরও কাল হরণ করবে।

—কতো কাল?

—অনন্ত কাল।

—কেন? কেন? কেন?

—কারণ তোমার অতীত নেই ভবিষ্যৎ নেই বর্তমান নেই স্বপ্ন নেই বাসনা নেই কল্পনা নেই সত্তা নেই আত্মা নেই অস্তিত্ব নেই। তোমার আছে শুধু কাল, নিষ্ফলা কাল!

—আব্বা!

—বল।

—আমি এই নিষ্ফলা কালকে অতিক্রম করে যেতে পারি না?

—না।

—কেন ?

—কল্পনা ছাড়া কালকে অতিক্রম করা যায় না।

সিকান্দার আত্মার কাছে আর একটু এগিয়ে যেতে চায়। তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে স্পর্শ করতে চায়। তাঁর বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বলতে চায়—আত্মা, আমার কাল হরণের কালকে আমি ভেঙে ফেলতে চাই। আমাকে সাহস দিন। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হল, সে এগিয়ে যেতেই দেখে, আত্মা নয়, আত্মার জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে সিকান্দার, সে নিজে।

—সিকান্দার।

—বল।

—তুমি আমি ?

—না।

—তুমি কে ?

—তোমার বিক্রিত আত্মা।

—হায়।

—হায় শাইলক বল।

—সিকান্দার। তুমি আমার আত্মা। আমাকে রক্ষা করার দায়িত্ব তোমার। তুমি আমায় রক্ষা করো। আমায় মুক্ত করো।

—তুমি আমায় রক্ষা করতে পারোনি। আমি মুক্ত ছিলাম, তুমি আমায় বিক্রি করে দিয়েছ। কোনো বিক্রিত আত্মা কাউকে মুক্ত করতে পারে না। কাউকে রক্ষা করতে পারে না।

—তবে অন্তত আমায় দিশা দাও। পথ বাতলে দাও।

—কোনো বিক্রিত আত্মা কোনো পথের সন্ধান দিতে পারে না।

—সিকান্দার। আমার সিকান্দার।

—আমি তোমার সিকান্দার নই, শাইলকের সিকান্দার।

—হায় সিকান্দার।

—বল।

—সবাই আমায় পরিত্যাগ করেছে। আমি কি জন্যে বেঁচে আছি ?

—তুমি বেঁচে নেই।

—আমি কি জন্যে মরেছি ?

—তুমি মরোনি।

—আমি কি জন্যে না মরে না বেঁচে টিকে আছি ?

—অর্থনৈতিক স্বাধীনতার জন্যে।

—এই অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আমাকে কি দেবে ?

—ডলার।

—ডলার আমাকে কি দেবে ?

—না মরে না বেঁচে টিকে থাকার স্বাধীনতা।

প্রথম সিকান্দার আর কিছু বলার আগেই দ্বিতীয় সিকান্দার হাঁটতে শুরু করে। প্রথম সিকান্দার চিৎকার করে তাকে ডাকতে থাকে—সিকান্দার! সিকান্দার! সে আর ফেরে না। এগিয়ে যায়। প্রথম সিকান্দার তখন তার পেছনে হাঁটা শুরু করে। দ্বিতীয় সিকান্দার সামনে প্রথম সিকান্দার পেছনে। দ্বিতীয় সিকান্দার একই গতিতে হাঁটছে অথচ প্রথম সিকান্দার প্রায় ছুটছে তবু তাকে ধরা যায় না। এবার প্রথম সিকান্দার সত্যিই ছুটতে শুরু করে তবু তাকে ধরা গেল না। দ্বিতীয় সিকান্দার একই গতিতে হাঁটছে এবং প্রথম সিকান্দার প্রাণপণে ছুটছে তবুও দুজনের ব্যবধান কমেনা। কমেনা বরং ক্রমান্বয়ে সেই ব্যবধান বাড়তে থাকে। ব্যবধান বাড়তে বাড়তে এতোটাই বাড়ে যে দ্বিতীয় সিকান্দারকে প্রায় দেখাই যাচ্ছে না, সে এতোটা দূরে এগিয়ে গেছে। প্রথম সিকান্দার তখন তার শরীরের সর্বশেষ শক্তিটুকু একত্র করে ছুটছে, ছুটছে আর চিৎকার করতে করতে তাকে ডাকছে, সিকান্দার তবু আর ফেরে না। ক্রমশ সে দূরে, বহুদূরে অদৃশ্য হয়ে গেল। প্রথম সিকান্দার তবু ছুটছে, যে পথে দ্বিতীয় সিকান্দার চলে গেছে সেই পথ ধরে প্রাণপণে ছুটছে।

সিকান্দার জেগে না ঘুমিয়ে, দাঁড়িয়ে আছে না বসে আছে, জীবিত না মৃত এই বোধ তার এখনো পুরোপুরি ফিরে আসেনি। আন্ধার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজের মনে ভাবতে ভাবতে কখন সে যে বসে পড়েছিল, কখন যে বসে বসে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল এসব তার কিছুই খেয়াল নেই। সে ভাবছে, এখনো ভাবছে—সে দ্বিতীয় সিকান্দারের পেছনেই ছুটছে।

তার তন্দ্রার ঘোর এখনো কাটেনি। এখনো সে উঠে দাঁড়াতে পারেনি, বসে বসে হঠাৎ সে হামাগুড়ি দিয়ে ছুটতে চেষ্টা করে। সামনে ছিল একটা পুরনো কবর। পুরনো কাঁচা কবর মানে এক-মানুষ সমান লম্বা গর্ত।

সিকান্দার সেই গর্তের সামনে পেছনে হামাগুড়ি দিয়ে ছুটতে চেষ্টা করে। গর্তের ভেতরে হামা দিয়ে ছোটা সম্ভব নয়, ফলে গর্তের চার পাশে বার বার ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসে। সে ভাবছে সে ছুটছে অথচ সে কবরের গর্তের চারপাশে ধাক্কা খেয়ে বার বার ফিরে আসছে। পুরনো কবরের গর্তগুলো বেশি গভীর থাকে না। চার পাশের মাটি ভেঙে এসে ধীরে ধীরে গর্তটাকে বুজিয়ে দেয়। তবু দীর্ঘকাল গর্ত গর্তই থাকে। সিকান্দার প্রথম গর্ত থেকে উঠে আবার এগোতে থাকে। তার মানে, সে ভাবছে, সে ছুটছে। সে ছুটতে ছুটতে অর্থাৎ হামা দিতে দিতে খানিকটা এগিয়ে যায়। কাঁটা লতায় এবং ছোট খাটো আগাছার ডালের খোঁচায় তার শরীরের অনেক জায়গা ছড়ে গেছে, সেখান থেকে হাল্কা ধারায় রক্তও পড়ছে, তবু তার কিছুই খেয়াল নেই। সে ভাবছে সে ছুটছে অথচ সে হামা দিতে দিতে এক কবরের গর্ত থেকে অন্য কবরের গর্তে পড়ছে। দ্বিতীয় কবরের গর্ত থেকে ছুটতে ছুটতে মানে হামা দিতে দিতে আবার তৃতীয় কবরের গর্তে পড়ছে। আবার কবরের চারপাশে ধাক্কা খেতে খেতে অবিরাম 'সিকান্দার, সিকান্দার' বলে চিৎকার করতে করতে সে এগিয়ে চলেছে। এগিয়ে চলেছে, মানে কবরের গর্ত থেকে কবরের গর্তে। সে ডাকছে কাকে? নিজেকে। সিকান্দার কাকে ডাকছে? সিকান্দারকে! সিকান্দার কোথায় ছুটে চলেছে? কবরের গর্ত থেকে কবরের গর্তে! সিকান্দার! সিকান্দার! সামনে যে অজস্র সার দেয়া কবরের গর্ত ছাড়া আর কোনো পথ নেই। সিকান্দার। হামা দিয়ে ছোটা যায় না! সিকান্দার! ঘুমের ঘোর না ভাঙলে জেগে ওঠা যায় না। সিকান্দার! জীবিত অথবা মৃতের পার্থক্য বুঝতে না পারলে জীবন অথবা মৃত্যু কোনো দিকে এগিয়ে যাওয়া যায় না।

সিকান্দার তার ছোটার কাজ এখনো চালিয়ে যাচ্ছে। সে পুরো কবরখানা হামা দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে পড়তে পড়তে পড়তে উঠতে উঠতে একসময় আবার আব্বার কবরের কাছে ফিরে আসে। সদ্য-কবরের ওপরে ঢাল করা মাটি থাকে। সেই উঁচু মাটিতে বাধা পেয়ে সে থমকে যায়। থমকে গিয়েই সে আবার সেখানে সিকান্দারকে ফিরে পায়। সিকান্দার সিকান্দার থেকে ক্রমশ শাইলকে রূপান্তরিত হয়। শাইলক না সিকান্দার? সিকান্দার না শাইলক? শাইলক!

—পিতা! পরম পিতা! ত্রাণকর্তা!

—বল পুত্র।

—আমার সিকান্দারকে ফিরিয়ে দাও।

—সে আর ফিরবে না।

—সে কোথায় গেছে?

—দূরে

—কোথায়, কতো দূরে? আমায় সেখানে পৌঁছে দাও।

—প্রথম সিকান্দারের সঙ্গে দ্বিতীয় সিকান্দারের আর কখনো দেখা হবে না।

—কেন পিতা, পরমপিতা শাইলক, ত্রাণকর্তা শাইলক। কেন আমার দ্বিতীয় সত্তার সাথে আর দেখা হবে না?

—প্রথম সত্তা দ্বিতীয় সত্তাকে হত্যা করেছে।

—সিকান্দারের প্রথম সত্তা তার দ্বিতীয় সত্তাকে হত্যা করেছে?

—ঠিক তাই।

—পিতা। সিকান্দার এ পর্যন্ত কতোগুলো হত্যা করেছে?

—পুত্র। সে এ পর্যন্ত যতো হত্যা করেছে তার ভেতর সবচেয়ে সার্থক হল দ্বিতীয় সত্তার হত্যা।

—কেন পিতা?

—সত্তাকে হত্যা করা সবচেয়ে কঠিন।

—আমি তবে সার্থক খুনি?

—নিশ্চয়।

—পিতা। এখন আমার কি কাজ?

—হত্যা করা।

—কাকে?

—তৃতীয় সত্তাকে।

—আমার তৃতীয় সত্তা কোথায়?

—তোমার অভ্যন্তরে।

—আমার অভ্যন্তরে? কিভাবে তাকে চিনবো?

—যখন তুমি হত্যাকে হত্যা বলে অনুভব করবে তখনই বুঝবে তোমার তৃতীয় সত্তা সেখানে উপস্থিত।

—তাকে কিভাবে হত্যা করবো?

—ডলার দিয়ে।

—ডলার দিয়ে ?

—ডলারের পাহাড় দিয়ে তাকে পিষে দাও। একমাত্র ডলারের পাহাড় ছাড়া আর কিছুতেই তুমি তাকে হত্যা করতে পারবে না।

—আমি কোথায় ডলারের পাহাড় পাবো ?

—কমিশানে।

—কিসের কমিশানে ?

—আমার কমিশানে।

—তার মানে, আরো আরো আত্মা বিক্রয় ?

—আরো আরো আত্ম-বিক্রয়।

—সারা দেশের লোকের সত্তা-আত্মা-স্বপ্ন-কল্পনা অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ…

—ঠিক ধরেছ।

—প্রভু। ত্রাণ কর্তা। পরম পিতা। এভাবেই, অর্থাৎ একমাত্র দালালির মাধ্যমেই আমি আমার তৃতীয় সত্তাকে হত্যা করতে পারি, তাই তো ?

—ঠিক তাই।

—পিতা। আমি নিজেকে বিক্রি করেছি এবার সারা দেশের লোক বেচে না দেয়া পর্যন্ত আমার স্বস্তি নেই, তাই তো ?

—ঠিক তাই।

সতেরো

—স্যার ?

—কে ?

—আমি আন্তোনিও।

—কে আন্তোনিও ?

—আপনার সহকারি।

—আন্তোনিও, আমি এখন কোথায় ?

—কবরখানায়।

—আমি এখানে কি করছি ?

—খাবি খাচ্ছেন।

—তা হলে আমার মৃত্যু খুব কাছেই ?

—না, স্যার।

—তবে ?

—বহুদূরে।

—তবে ?

—আপনাকে আরো বহুকাল খাবি খেতে হবে।

—আস্তোনিও !

—স্যার ?

—আমাকে মেরে ফেলুন।

—না, স্যার।

—কেন ?

—তাতে পরমপিতার লোকসান।

—তাকে যা দেয়ার তা তো দিয়েই দিয়েছি, তার আবার লোকসান কিসের ?

—তাকে যা দিয়েছেন তা অবাস্তব সম্পত্তি। অবাস্তব সম্পদ থেকে বাস্তবটুকু সম্পূর্ণ নিংড়ে বের ক'রে নেয়ার পরই আপনাকে হত্যা করা হবে। তখন আপনার ইচ্ছে না থাকলেও মরতে হবে।

—আমার অবাস্তব সম্পদ থেকে কিভাবে বাস্তবটুকু আলাদা করবেন ?

—আপনি জানেন নিশ্চয়, ইংরেজরা আপনার দেশ থেকে তুলো নিয়ে নিজের দেশের যন্ত্র দিয়ে কাপড় বানাতো, আর সেই কাপড় আপনাদের দেশের লোকেরাই চড়া দামে কিনতে বাধ্য হতো ?

—হ্যাঁ, জানি।

—ব্যাপারটা সেরকম। তুলো থেকে যে কাপড় হয়, হতে পারে, এটা লোকেরা আগে জানতো না। তারপর যখন জানল, সে বিদ্যেটা যখন ভালোভাবে রপ্ত হল তারপর এল কাপড় বানাবার যন্ত্র। যন্ত্র আরো আধুনিক, আরো কম পরিশ্রমে বেশি উৎপাদনের ব্যবস্থা হল। মুনাফার পরিমাণও বেড়ে গেল। এটাও ঠিক তেমনি একটা ব্যাপার।

—কি রকম ?

—অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ—এসব অবাস্তব সম্পদেরও একটা বাস্তব ভিত্তি আছে। কোনো বাস্তব ভিত্তি ছাড়া কোনো অবাস্তব সৃষ্টি হতে পারে না। আমাদের কাজ হল, অবাস্তব সম্পদ থেকে বাস্তবটুকু শুষে নিয়ে মাল তৈরি করা। তারপর সেই মাল অর্থাৎ আপনার মাল একটু কায়দা করে আপনার কাছেই হাজার গুণ বেশি দামে বেচে দেয়া।

—কিন্তু সেটা অতীত ভবিষ্যতের বেলায় খাটবে ?

—খাটবে, স্যার। খেটে গেছে।

—কি রকম ?

—অতীত কি ইতিহাস নয় ?

—নিশ্চয়।

—ইতিহাস কি নানা ভাবে নানা ঢংয়ে আপনার কাছে পণ্য হিসেবে বিক্রি করা হচ্ছে না ?

—তা বলতে পারেন।

—তাহলে এটাও বলতে পারি—বর্তমান ভবিষ্যৎ স্বপ্ন কল্পনা সত্তা আত্মা সবই পণ্য, সবই বিক্রয় যোগ্য পণ্য। টাকা দিয়ে আপনার কাছ থেকে কেনা যেতে পারে আবার একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নতুন লেবেল দিয়ে আপনার কাছেই বেচে দেয়া যায়।

—কিন্তু আপনাদের এই লেবেল মারার ব্যাপারে তো আমার কিছুই করার নেই। আমাকে বাঁচিয়ে রেখে লাভ কি ?

—আপনাকে আরো কাঁচা মালের সন্ধান দিতে হবে।

—মানে, সেই দালালি ?

—ঠিক ধরেছেন, স্যার।

—কিন্তু আপনাদের অফিসে তো লোকেরা তাদের ভূত-ভবিষ্যৎ বেচার জন্যে হামলে পড়েছে। আমাকে আর দরকার কেন ?

—আমরা গোটা দেশের সমস্ত মানুষের স্বপ্ন কিনে নিতে চাই।

—প্রত্যেকটা মানুষের ?

—প্রত্যেকটা মানুষের।

—সে তো অনেক লোকের কাজ। একা আমি আর কতো জনকে ভেড়াতে পারি ?

—আপনি যতো জনকে পারবেন অতোটুকুই আপনার কাজ। আমাদের চিন্তার কিছু নেই। ইতোমধ্যেই আমরা আপনার মতো হাজার হাজার দালাল তৈরি করে ফেলেছি।

—তবু আমাকে দরকার?

—তবু আপনাকে দরকার। কারণ প্রত্যেকটা মানুষ, আপনার দেশের প্রতিটি মানুষের স্বপ্ন কল্পনা সত্তা আত্মা দ্রোহ না কেনা পর্যন্ত আমরা থামবো না।

—তারপর?

—তারপর আমরা সেই সব অসার মানুষের মাথায় ধুলি দিয়ে নতুন নগরী বানাবো।

—ঠিক তখন আমাকেও হত্যা করা হবে?

—অবশ্যই। তবে প্রয়োজন দেখা দিলে তার আগেও করা হতে পারে।

—যেমন?

—যেমন, আপনার তৃতীয় সত্তার মৃত্যু যদি না হয়, যদি আপনার ভেতরে তখনো চেতনা থাকে, যদি হত্যাকে হত্যা বলে মনে হয়, যদি আপনার অভ্যন্তরে বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ প্রতিরোধের অস্তিত্ব থাকে—তাহলে আপনাকে খতম করা হবে।

—আন্তোনিও!

—স্যার?

—আমার আর মুক্তি নেই?

—শাইলকের রাজত্বে কোনো মানুষ মুক্ত নয়। সবাই ক্রীতদাস, গোলাম, পণ্য!

—আন্তোনিও!

—স্যার?

—কেন আমি জন্ম নিলাম?

—শাইলকের দাসত্ব করার জন্যে!

সিকান্দার ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হতে থাকে। চিন্তা-চেতনা আবার যথাযথ কাজ শুরু করে। সে আস্তে আস্তে বাড়ির পথে এগিয়ে যায়। এখনো অন্ধকার। গাঢ় অন্ধকার। রাত কতোটা গভীর কেউ জানে না। মধ্যরাত

না কি শেষ রাত নাকি অনিঃশেষ এই রাত বলা মুশকিল। সিকান্দার হাঁটতে হাঁটতে বারান্দার কাছে এসে দেখে, সুরাইয়া একই ভাবে ছায়ামূর্তির মতো বসে আছে। তার দৃষ্টি অন্ধকারে। ওপাশের বারান্দায় তখনো মা তেমনি ভাবে শুয়ে আছেন। তার পাশে মেয়ে দুটি আগের মতোই ঘুমে অচেতন। এমন নিস্তব্ধ রাতে, নিস্তব্ধ বাড়িতে, নিস্তব্ধ লোকালয়ে হয়তো সবাই ঘুমে অচেতন। হয়তো সবাই নয়, দুর্ভাগা কেউ কেউ এখনো পথে পথে ঘোরে।

সিকান্দার ভেতরের উঠোন থেকে বাইরের উঠোনে এল। পুকুর পাড়ে ইট বালি আর পাথর কুচির স্তূপ। বাড়ি হবে। কার বাড়ি? কারা বসবাস করবে? ইটের বাড়িতে কতো সুখ? কতো সুখ সুখের জীবনে? সিকান্দার হাঁটতে হাঁটতে আবার এগিয়ে যায়। এবার কবরখানার পথে নয় বাইরের পথের দিকে।

কিছুটা এগিয়ে যাওয়ার পর পেছন থেকে আন্তোনিওর কণ্ঠ শোনা যায় —

—স্যার?

—বলুন।

—আপনি কোথায় চলেছেন?

—জানি না।

—আপনার কোথাও যাওয়া চলবে না।

—মানে?

—আপনার সমস্ত পথ রুদ্ধ।

—মানে?

—এইমাত্র পরম পিতার নির্দেশ এসেছে—তাঁর অনুমতি ছাড়া আপনি বাড়ির বাইরে পা রাখতে পারবেনা না।

—তার মানে আমি নজরবন্দি?

—গৃহবন্দি।

—কিন্তু তাতে আপনাদের কি লাভ?

—আপনি এখন পরম পিতার···

—সন্তান?

—না।

—তবে?

—সম্পদ।

—তাই আমার গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত, তাই আমার জীবন-মৃত্যু নিয়ন্ত্রিত? তাই আমার…

—তাই আপনার সমগ্র অস্তিত্ব নিয়ন্ত্রিত।

—যদি আমি বিদ্রোহ করি?

—আপনার বিদ্রোহ ক্রোধ অভিমান ক্ষোভ যন্ত্রণা বিপ্লব সবই বিক্রি হয়ে গেছে

—যদি আমি তারপরও বিদ্রোহ করি?

আন্তোনিও তার কোমর থেকে ঝকঝকে অত্যাধুনিক পিস্তল বের করে ট্রিগারে আঙুল রেখে সিকান্দারের দিকে তাক করল।

—খুন করবেন তাই তো? তবে তাই করুন। আমি তো তাই চাই!

—না, একেবারেই না।

—তবে?

—আহত করবো।

—যদি আমি আত্মহত্যা করি?

—কোনো দালাল কখনো আত্মহত্যা করতে পারে না।

—তবে এখন আমি কি করি?

—খাবি খান! আর…

—আর…

—কমিশান।

—এখন কোনটা খাওয়া বেশি লাভের, খাবি না কমিশান?

—কমিশান!

সমাপ্ত

জন্তুতাই কথা বলে এখন

অনির্বাণ দত্ত

থামিয়েছ খেলা বলে, থামেনি তো খেলা আমাদের ;
ধর্ষণচিহ্ন নিয়ে—আজো এই মর্গেই বাস
ছড়ানো-ছিটনো চর্বি আর কিছু পুতিময় রক্তধোয়া জল—
থেঁতলানো মাংসে কনুই-এর, কাচ নিয়ে খেলা চলে কারো ?

তবু খেলা, তবু খেলি—দোমড়ানো মজুরের মতো,
কারখানা বন্ধ যার, মেঘে-মেঘে অন্ধকার শুধু,
এখনো দেয়ালে আছে সত্তরের বুলেটের দাগ ;
ভোল পাল্টে, গল্প বলে কত গিরগিটি ঃ
কাটা-বুট, উর্দির কথা, রঙ-করা আপেলের ছবি—
দামী ফ্রেমে তুলে দ্যায় জন্মান্ধের হাতে।

সেই অন্ধ—গোলাম, সে-ও দুর্গের দ্বারে ডাকে আজ।
দোজখ-নরক থেকে মানব-গহন থেকে
খুঁড়ে-খুঁড়ে, খোঁজে সেই নাভিজন্ম, অমৃত-পালক···
বিচ্ছুরণের আগে, যে হীরক-খণ্ড থাকে ভালো।

ডিসেম্বর চোদ্দ আটাশব্বই

রূপা দাশগুপ্ত

বর্ষকাল শেষ হলে সকলের দেখাশোনা হয়
পাখিটির নেই কোন তাড়া
সানাই সানাই পথ এপথে ওপথে
ঘুরে ঘুরে
তার চোখ রঙীন বিভোর
আর তত ঝুপ্‌ করে নেমে আসে রাত্রি খুনসুটি

একহাতে আড়কাঠি আকাশ ত্রিকোণ
অন্যহাত হা হা হিম
এভাবে স্বপ্ন দেখা স্বপ্ন ভাঙনের মত খেলা
মজাদার ঘুম
এই নিয়ে কেটে যায় লেফাফা বদল

নববর্ষে দস্তানা থাকে না কারো হাতে
পাখিটির বালাই নেই নাঙ্গা বুক ঢাকা বা আঢাকা
রোদ্দুরে মানুষ আর মানুষে রোদ্দুর মিশে যায়
পাখি দেখে উড়ো খই
পাখি বলে, উড়ো খই, বন্ধু বলো
এইমাত্র, তারপর শূন্যতার যোজন বিস্তার।'

উৎস মুখরতা

অজিত বসু

একা, সে ছিল নিজেই নিজের অপরিচিত।

তারপর পরিচয়ের কাল। বহু অপরিচিতের লতায় পাতায় নিবিড় জড়িয়ে যাওয়া। বাস্তবের আগুনে ভেতরে ভেতরে কখন লাল-গনগনে। সুপ্ত ধ্বংস গভীরে ছড়ায় কাটা রেখায় রেখায়।

তারপর চূর্ণ—বিদীর্ণ বক্ষ পঞ্জরের থেকে উৎক্ষিপ্ত ধুলো। প্রাথমিক অনুভব বিচ্ছিন্ন শূন্যতা—ক্রমে শূন্য ঐশ্বর্যের অজস্র পুষ্পময় গন্ধমাল্যে অভিষেক।
নিঃস্ব একার বুকের ভিতরে বিশ্ব থেকে অনন্তবিস্তারী উন্মোচন।
আনন্দ—টলটল পূর্ণমায়া, গভীরতা, গাম্ভীর্য, স্বর্নব্যঞ্জনা।

...বহীনতা—অথচ পূর্ণাবয়ব ব্যাপ্তি—তার দুরন্ত তেজ, রংবাহার,

...র—ততদূর পর্যন্ত স্পন্দন।...

ককবরক

সুব্রত রুদ্র

ককবরক কি দুটি পাখি ফুং ফাং ?
মাঝখানে আঁস্তাকুড়, চলতে আর বলতে ?

ককবরক একটি মাতৃভাষা কাতরতা, যদি আমি স্পর্শ করতে পারতাম

যদি আমি সত্যি সত্যি ত্রিপুরার গ্রামে পাহাড়ে ছুটে বেড়াতাম
যদি আমি কাছে গিয়ে বোঝাতে পারতাম ছেলেমেয়েদের

দ্রাবিড়গ্রাম

নাসের হোসেন

দ্রাবিড়, আজ তোমায় হাত ধরে হেঁটে যাই
গুঁড়ো গুঁড়ো কৃষ্ণচূড়া ঝরে পড়েছে পথে পথে
পৃথিবীর উলঙ্গ শিশুরা তার মধ্যে খেলা করে
দ্রাবিড়, এসো আবির ছড়িয়ে যাই পথে পথে
ঘোড়ার লাগামছাড়া হ্রেষা আর ক্ষিপ্ত খুর দিগন্তময়
কুয়াশার নীলাভ আস্তরণ ছেয়ে উঠছে গান অবগাহন
দ্রাবিড়, বালির সমুদ্রে জেগে উঠি, ছুটি, ছুটতে ছুটতে
নেমে পড়ি খাদে, খাদের মধ্যে আবিষ্কার করি
বহুযুগ আগের কোনো নরকংকাল যার পায়ে
নূপুর বাঁধা ছিল, অন্ধকারে জ্বলে ওঠে আলো
বিন্দু বিন্দু, যেন সমস্ত মহাকাশ নেমে এসেছে বিমুগ্ধ
শহরে, যেন গ্রাম আজ হঠাৎই কেমন শহর হয়ে গেছে
আর তার চিরসবুজ পাতাগুলি কেঁপে কেঁপে মেলে দিচ্ছে
লাজুক পতাকা, প্রবল গতির মতো কেবল উঠে যায়
একটি কিম্ভূত অম্বরর, ঝড় থামলে দেখা যায়
পড়ে আছে খণ্ড খণ্ড দেহাকৃতি শুধু

শীত

অমিতাভ বসু

শীতাক্রান্ত সুমেরুর তুষার জঠরে যেই
সূর্যের স্বপ্নের ভ্রূণেরা ঘুমোয় ;
আমি যাবো, সেই ঘুম ভাঙিয়ে দেবো—
চুমোয় চুমোয়।
কোলে কোরে এনে দেবো দক্ষিণ সাগরতীরে—
আমার এ শহরের বুকে—
সূর্যের চারাগাছ স্বপ্নের সে লতাটি
এখানে বাড়ুক—
এ ধুলোয় ধন্য হোক সুখে ॥

শাকিল শেখ
অমিতাভ চৌধুরী

এই ঘাসের কথাই ভাবো। গ্রীষ্মে পুড়তে পুড়তে
গেরুয়া রঙের তার জীবনের শেষ বিন্দুটিকে লুকিয়ে রেখে
সে এখন অপেক্ষা করছে বৃষ্টিতে ভিজবে বলে।

একজন পাঠিকা আহ্লাদী হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলো
পায়ে মাড়ানো শিশু ঘাসের কথা
আজকাল আর পড়ি না আপনার কবিতায়—
আমি তাকে বলেছি এমন বাসা বদল করে তৃণ।

বৃষ্টিতে ভিজবে বলে অপেক্ষা করেছিলো আর যারা,
গোল পৃথিবী
খণ্ড একটি মেঘ
২০ ফিট বাই ৪০ ফিট
ন্যাড়া ছাদ,

বাউন্ডারে একটি হাওয়া অনেক দিন থমকে আছে
সেই ছাদের উত্তর পূবের কোণে
আর বিধবার শাড়ির আঁচলের রঙের ধোঁয়া
শিউলির গন্ধ ছিলো আগের শরতে ;

ছাদটা এখন একেলা ভিজবে বৃষ্টিতে, কেউ নেই সাথে।

চক্র হাটে রজনীগন্ধা বিক্রী করছে দু-একটি ছেলে
পার্কস্ট্রীটের মোড়ে ;
খৃষ্টানদের কবরস্থান থেকে কুড়িয়ে এনেছে,
তাই শস্তায় বিক্রি করছে এমন,
মিথ্যে অপবাদ দিয়ে কানে কানে বলেছিলো
যে মেয়েটি, কি নাম তার ?
সেই প্রথম প্রকাশ্যে চুমু খেয়েছিলো চৌরঙ্গির রেস্তোরাঁয়
অন্য মেয়েটির নামও মনে নেই এখন।
আর বৃষ্টির কাছে গোপন কথা গচ্ছিত রেখেছিলো যারা
মুখপুড়ি নদী
সার্কিট হাউসের দেওয়ালে
টিনের ছাদের ঘরে
যৌন কর্মী,

নদীর ঘাটে বেশী রাতে গাঁজা খেতো সাধুরা,
তাদের কথাও লেখেন না এখন আর—
সাকিনের পাল্টে গেছে সাকিন, আমি বলেছি

আর দেখছি, হারিয়ে যাওয়া ছাদের কার্ণিশে
শ্যাওলা জমেছে,
দু-একটি শিশু ঘাস তার বুকে।

এই আয়োজন

প্রবালকুমার বসু

দেখা হবে বলে হারিয়ে ফেলেছি রুমাল। এ আমার অমলিন স্বীকারোক্তি নয়। অন্তর্লীন প্রত্যাশার ব্যক্তিগত অভিব্যক্তি। আকাঙ্ক্ষা তীব্র হলেই মাঝরাতে জ্যোৎস্না রুমাল হয়ে যায়। যখন জ্যোৎস্নার কথা তুললে, বেড়ালের কথাও ভাবো। আর বেড়ালের কথা মানেই তো রাণুদির এক একটা দিন।

এর কোনো কথাই রুমাল জানে না। মুখ ঝাপসা হয়ে আসে তবু সম্পর্ক টিকে থাকে রুমালের মত। কেউ কেউ জিজ্ঞেস করে—কিছু হারিয়েছে? ওদের কী করে বোঝাই, স্রেফ দেখা হবে বলে এই আয়োজন।

অন্য বাঁক

মন্দার মুখোপাধ্যায়

আটহাত থেকে মন সরে যাচ্ছে—
কয়েকশ বর্গফুট
আজ গিলছে আমাকে
এক একটা স্কোয়ার ফুটে
বাঁধা পড়ছে আমার বয়স
আমার মর্যাদা
আমার চাল-ডালের ভাঁড়ার—
শব্দ নয়। সংখ্যার পর সংখ্যা
একক থেকে লক্ষ পর্যন্ত
আমাকে জাপটে ধরছে—
বেলকুঁড়ির মালা জড়িয়ে কাছে এসে
মিনতি করছে—আমাকে নাও
মুখ নীচু করে বলছে
আমার একটা নাম বর্গফুট
আর একটা নাম তো মাটি—
তোমার নাভি মুড়ি দেহ ছাই হলে।

সখ্যতা

তাঁর স্টুডিওতে সেহ দেখে মনে হত
পিতা মুগ্ধ ঈশ্বরী সুষমায়
বিয়ের পরে
এ শুধু কামনা ধৈর্যহীন
মেয়ে বড় হতে
স্ক্রিন জুড়ে
স্লিমজিম মোহের চাহনি
নির্জনে প্রেম কাছে এলে
চোখ বুজে আসা—
গলায় নেমে মনে হল
পিঠজুড়ে চিতার নিঃশ্বাস
আর কাদা মোড়া নাভি
ছুঁড়ে ফেলা জলে।

শ্রাবণ পূর্ণিমা

রেণুকা পাত্র

নির্ভুল স্নান সেরে স্ব-জাত স্বপ্নেরা
পায়ে পায়ে উঠে এলে
আমি তার হাতে মিলনের রাখি বাঁধি—

ছায়াঘন অন্ধকারে
শান্ত মাটির প্রদীপ
অথবা সে আজ পাড়াগাঁয়ে
আমার শৈশব
বনজ্যোৎস্নার সেই ভরাট সম্পদ্
স্মৃতিময় গুঞ্জরণে আমার জন্মভূমি
শ্রাবণের পূর্ণিমার আগে একবার
আলোকিত হলে

আমি মিলনের কথা বলি
নত হই—
মাটির নিবিড় সুষমায়।

পাগলাটা

বিশ্বজিৎ রায়

ছেড়ে দিয়েছিস? ধরেছিলি নাকি? কবে?
যে পুড়েছে সে-ই আবার আগুন ছোঁবে।

আগুনেই জ্বালা, আগুনেই পোড়া
আগুনেই মুক্তি—
বিহ্বল আমি আগুনের টানে
ফিরবার শক্তি
হারাবার আগে, মৃত্যু জেনেও
নিয়তিরে রেখে তুচ্ছে—
পুড়ে সব ছাই পাগলাটা তাই
কি যেন কি খুঁজছে।

ছেড়ে দিয়েছিস? ধরেছিলি নাকি? কবে?
ছাই ঘেঁটে ফেরা পাগলটা তাই ভাবে।

স্বাধীনতা পঞ্চাশ

উপাসক কর্মকার

আমার পুরানো টেবিল তোমাকে ছাড়তে পারিনি
আমার পুরানো কলম নিয়তি মেনেই নীরব
তবু লিখে রাখে কিছু স্তব প্রচলিত গাথা
কিছু সংগ্রাম নিরন্ন মানুষের মতো
বাটাঘ্রাণ্ড শরীরে আশঙ্কা জেগে রয় দিনান্তের শেষে

খড়কুটো পোড়াজীবন যাপন নিষ্ফল প্রাণ ধারনের সাথে
জৈবিক জোয়ার অক্রম মহিমান্বিত রাতে
শব্দ পতনের মতো নিশ্চুপ জন্ম নেয়
একটি ফুটপাত বালক
আমি সেই প্রাণ, নামহীন গোত্রহীন
প্রতিদিন শেলেটে নিয়মকরে লেখে :
আঃ জীবন তুমি এখন স্বাধীনতা পঞ্চাশ

আবদার

সিদ্ধার্থ সিংহ

উনিশ শো চুরানব্বইয়ের আগে আমেরিকায় ফুটবল নিয়ে তেমন
তেমন কোনও মাতামাতি ছিল না
ফুটবল বলতে ওরা বুঝতো—সেই বাক্স
অবসরের সময় প্রাক্তন যেটা তুলে দিয়ে যান নতুন
রাষ্ট্রপিতার হাতে
যাতে থাকে সে দেশের পরমাণু সংক্রান্ত যাবতীয় খুঁটিনাটি
দরকার পড়লে যাতে উনি নিজেই সেটা চালান করতে পারেন
সেই বাক্সটা আমায় দিন—
আমি দেখতেও চাই না কোন বোতামের কী কেরামতি
জানতেও চাই না সব কটা বোতাম টিপে দিলে
পৃথিবী ঠিক কতখানি মিহি ধুলো হবে
অনুমানও করতে চাই না সেই সব রোমাঞ্চকর দৃশ্য

আমি শুধু ওই বাক্সটা, ওই বাক্সটাই চাই
ওটা পেলে আমি আর যার হাতেই দিই না কেন,
কথা দিলাম
কখনও কোনও মাতব্বরের হাতে তুলে দেবো না।

জল ও আগুনের মানুষ

সুমিত্রা দত্ত চৌধুরী

আগুন এসে স্পর্শ করেছে জল, জল জেগে ওঠে।
ঘূর্ণিতে ঘূর্ণিতে জাগে, গূঢ় সংকেতে জাগে
মৃত্যু থেকে উঠি আমি হিম ওষ্ঠ থেকে উঠি
মৃত পাখিদের ডানায় ঢাকা যে ধূসর করতল
সহসা জেগে উঠে, স্পর্শ করে এক নিমেষেই দুঃখময় জন
কে সেই বাদামী শরীর সবুজ নক্ষত্র কিরণ
হরিণীর মত ফেরে, কে সেই! আমি ছুটে ছুটে যাই
বন বনান্তরে......

আগুন এসে স্পর্শ করেছে জল, জল জেগে ওঠে
নদীর গভীর থেকে উঠে আসে ছোট ছোট আগুনের ঢেউ
জন্ম-মৃত্যুর রহস্য এসে কথা বলে যায় কানে কানে
এই যে আগুন যা ছুঁয়ে আছে অদৃশ্য নাভিমূল
এই যে জল শান্তি ও পতনের সমূহ কারণ
জন্ম জন্মান্তর ধরে আমি তাকে ধারণ করে আছি প্রেমিকার মতন।

পরিচয়
জীবনানন্দ
১০০

"সবারে করি আহ্বান"

১৯৯৮ সালে ৪ঠা আগষ্ট পূর্ব আকাশে বর্ষাস্নাত রক্তিম সূর্য্যের সোনালী রোদঝরা ঝলমল প্রত্যুষে কামারহাটি পৌরাঞ্চলের আপামর মানুষজন হৃদয়ের ভালবাসার ডালি নিয়ে অভিষেক জানিয়েছে পৌরসভার শততম বর্ষের প্রথম দিনটিকে।

শতবর্ষ আগে যে পদচারণা শুরু তার শততম জন্মদিনটিকে বরণের জন্য চাই সকলের আন্তরিকতার স্পর্শ। সারা বৎসরব্যাপী নানা রঙে, বর্ণে ভরে উঠুক অভিষেকের ডালি।

আসুন, সকলের ভালবাসার পাত্রখানি ভরিয়ে তুলি বিনম্র, ভাবগম্ভীর কর্মসূচীর মালা গেঁথে।

সকলের উষ্ণ শুভেচ্ছা হোক পৌরসভার পাথেয়।

শততম বর্ষের উৎসব প্রাঙ্গনে রইল সবার আমন্ত্রণ।।

প্রবীর মিত্র
উপ-পৌরপ্রধান

গোবিন্দ গাঙ্গুলী
পৌরপ্রধান

কামারহাটি পৌরসভা

পানিহাটি পৌরসভা শতবর্ষ (১৯৯৯-২০০০ সন) উদ্বোধন অনুষ্ঠান গত ১লা এপ্রিল '৯৯ পৌরসভার কার্য্যালয়ে প্রাণনাথ বন্দোপাধ্যায়ের (প্রতিষ্ঠাতা পৌরপ্রধান, পানিহাটি পৌরসভা) আবক্ষমূর্তির আবরণ উন্মোচনের মাধ্যমে সূচনা করা হয়েছে। ঐ দিন লোকসংস্কৃতি ভবনে বিশিষ্ট শিল্পীদের নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। ১৯৯৯-২০০০ সারা বৎসর ধরে শতবর্ষ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানের কর্মকাণ্ড চলবে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, নাট্যউৎসব, ক্রীড়া প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে। ফলাফলের প্রাইজ বিতরণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শতবর্ষ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান শেষ হবে।

ক্রীড়া অনুরাগী, সংস্কৃতি প্রেমী মানুষ ও বালক বালিকাদের অনুরোধ করা যাচ্ছে—পৌরসভার এই কর্মকাণ্ডে তারা যেন অবশ্যই অংশগ্রহণ করেন। শতবর্ষে পৌরসভার মাধ্যমে প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে "শতবর্ষ পার্ক" নামে পার্ক তৈরী করা হবে। জল নিষ্কাসনের ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করবার জন্য পৌরসভা যথেষ্ট সোচ্চার হয়েছে।

শতবর্ষে সকল শ্রেণীর মানুষকে পৌরসভার তরফ থেকে
আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

পানিহাটী পৌর প্রতিষ্ঠান

মনোরঞ্জন সরকার
পৌরপ্রধান

নাগরিক পরিষেবা অক্ষুণ্ণ রাখতে বকেয়া কর অবিলম্বে মিটিয়ে দিন

জলই জীবন—এর অপচয় রোধে সক্রিয় সহযোগিতা করুন

আবর্জনা নির্দিষ্ট স্থানে সঠিক সময়ে ফেলুন

কলকাতা আমার—আপনার। এর ঐতিহ্য বজায় রাখার দায়িত্ব আমাদের সবারই

কলিকাতা পৌরসংস্থা

শত্রু যখন সাম্প্রদায়িকতা
প্রতিবাদ না করাই তখন অপরাধ
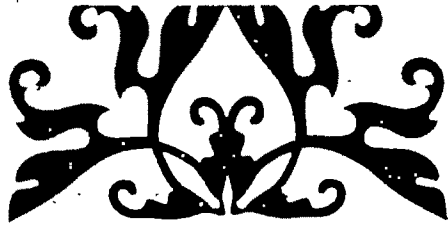
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই.সি.এ-১১৭৬/৯৯

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থে গড়ে তুলুন দূষণমুক্ত পৃথিবী ঃ

বিভিন্ন ধরনের পরিবেশ দূষণ বর্তমান যুগে আমাদের সামনে কঠিন সমস্যার সৃষ্টি করেছে। এই পরিস্থিতি কিন্তু একদিনে তৈরী হয়নি। প্রাকৃতিক নিয়মগুলিকে অগ্রাহ্য করে মানুষ আধুনিক জীবনের ক্রমবর্ধমান ও জটিল চাহিদার সামাল দিতে নানাভাবে প্রকৃতির কাজে হস্তক্ষেপ করছে। উন্নততর জীবনযাত্রার প্রয়োজনে মাটি, জল, অরণ্য ও খনিজ সম্পদকে অবাধে মানুষ ব্যবহার করেছে অতিব্যবহারের ফলে যে ক্ষতি তা পূরণের ব্যবস্থা না করেই। ফলশ্রুতি হিসাবে এই গ্রহে আমাদের অস্তিত্ব আজ বিপন্ন।

অবাধ বৃক্ষচ্ছেদন, কলকারখানার বর্জ্য পদার্থ ঢেলে নদীর নির্মল স্রোতকে রুদ্ধ করা, যানবাহন ও কারখানা থেকে নিঃসৃত বিষাক্ত গ্যাস এবং ধোঁয়া ও কর্কশ উচ্চস্বরের শব্দ আমাদের পরিবেশ দূষণের শিকার করে তুলেছে।

কিন্তু আমরা কি সম্ভাব্য এই বিপদ সম্বন্ধে অবহিত?

যদি এই অবস্থা চলতে থাকে তাহলে অচিরেই পৃথিবী থেকে অরণ্য লুপ্ত হয়ে যাবে, খরা এবং বন্যার কবলে পড়বে পৃথিবী, প্রাণী ও উদ্ভিদজগতের অসংখ্য প্রজাতি চিরদিনের মত বিলুপ্ত হবে, আমাদের এই সুন্দর গ্রহের বাতাস হয়ে পড়বে নিঃশ্বাস নেবার অযোগ্য এবং এ সমস্তই ঘটছে আমাদের অপরিনামদর্শিতা লোভ ও প্রাকৃতিক সম্পদের ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদার জন্য।

উন্নয়নমূলক কাজকর্ম আমাদের চালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু তা করতে হবে প্রাকৃতিক ভারসাম্যের হানি না ঘটিয়ে, নিষেধমূলক আইনের যথাযথ প্রয়োগ এবং আধুনিক প্রযুক্তি বিদ্যার সাহায্যে আমরা এই বিপদের মোকাবিলা করতে পারি।

পরিবেশ সংরক্ষণের কাজে ব্রতী হতে হবে আমাদের সকলকেই, প্রস্তুত হতে হবে দূষণমুক্ত পৃথিবী গড়ার উদ্দেশ্যে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের জন্য।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই. সি. এ.-১১৭৬/৯৯

পরিচয়

১৯৫৬ সালে সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন (কেন্দ্রীয়)
আইনের ৮ ধারার অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি

১। প্রকাশের স্থান—৩০/৬ ঝাউতলা রোড, কলকাতা-১৭

২। প্রকাশের সময় ব্যবধান—মাসিক

৩। মুদ্রক—রঞ্জন ধর, ভারতীয়, ৩০/৬ ঝাউতলা রোড, কলকাতা-১৭

৪। প্রকাশক— ঐ ঐ

৫। সম্পাদক অমিতাভ দাশগুপ্ত, ভারতীয়, ৮৯ মাহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭

৬। পরিচয় সমিতির সদস্যদের নাম ও ঠিকানা :—

১। গোপাল হালদার, (মৃত) ফ্ল্যাট-১৯ ব্লক এইচ, সি, আই, টি বিল্ডিংস ক্রিস্টোফার রোড, কলকাতা-১৪। ২। সুনীল কুমার বসু (মৃত) ৭৩ এল, মনোহর পুকুর রোড কলকাতা-২৯। ৩। অশোক মুখোপাধ্যায় ৭, ওল্ড বালিগঞ্জ রোড, কলকাতা-১৯। ৪। হিরণ কুমার সান্যাল, (মৃত) ১২৪, রাজা সুবোধ চন্দ্র মল্লিক রোড, কলকাতা-৮৭। ৫। সাধনচন্দ্র গুপ্ত, ২৩, সার্কাস এভিনিউ কলকাতা-১৭। ৬। স্নেহাংশুকান্ত আচার্য (মৃত) ২৭, বেকার রোড, কলকাতা-২৭। ৭। সুপ্রিয়া আচার্য, ২৭, বেকার রোড, কলকাতা-২৭। ৯। সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, ১/৩, ফার্ণ রোড, কলকাতা-১৯। ১০। শীতাংশু মৈত্র, (মৃত) ১/১/১ নীলমণি দত্ত লেন, কলকাতা-১২। ১১। বিনয় ঘোষ (মৃত) ৪৭/৩, যাদবপুর সেন্ট্রাল রোড, কলকাতা-৩২। ১২। সত্যজিৎ রায়, (মৃত) ফ্ল্যাট ৮,১/১ বিশপ লেফ্রয় রোড, কলকাতা-২০। ১৩। নীরেন্দ্রনাথ রায় (মৃত), ৪৮৭ এ, বালিগঞ্জ প্লেস, কলকাতা-১৯। ১৪। হরিদাস নন্দী, ১৮/১/১১ গলফ ক্লাব রোড, কলিকাতা-৩৩। ১৫। ধ্রুব মিত্র, ২২ বি, সাদার্ণ এভিনিউ, কলকাতা-২৯। ১৬। শান্তিময় রায়, 'কুসুমিকা' ৫২ গরফা মেন রোড, কলকাতা-৩২। ১৭। শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ, (মৃত) পূর্বপল্লী, শান্তিনিকেতন, বীরভূম। ১৮। স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য (মৃত), ৯/১, কর্নফিল্ড রোড, কলকাতা-১৯। ১৯। নিবেদিতা দাশ (মৃত) ৫৩বি, গরচা রোড, কলকাতা-১৯। ২০। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (মৃত), ৩ সি পঞ্চাননতলা রোড, কলকাতা-১৯। ২১। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (মৃত), ৩, শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রীট, কলকাতা-২০। ২২। শান্ত বসু ১৩/১এ, বলরাম ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা-৪। ২৩। বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৭২, ডঃ শরৎ ব্যানার্জি রোড, কলকাতা-২৯। ২৪। ধীরেন্দ্র রায়; (মৃত) ১০৬, নীলরতন মুখার্জি রোড, হাওড়া। ২৫। বিমলচন্দ্র মিত্র, ৬৩ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৩। ২৬। দ্বিজেন্দ্র নন্দী, (মৃত) ১৩ ডি, ফিরোজ শাহ, রোড, নয়াদিল্লী। ২৭। সলিল

কুমার গঙ্গোপাধ্যায় ৫০, রামতনু বসু লেন, কলকাতা-৬। ২৮। সুনীল সেন, (মৃত) ২৪, রসা রোড সাউথ (থার্ড লেন), কলকাতা-৩৩। ২৯। দিলীপ বসু (মৃত) ২০০ এল, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, কলকাতা-২৬। ৩০। সুনীল মুন্সী, ১/৩, গরচা ফার্স্ট লেন, কলকাতা-১৯। ৩১। গৌতম চট্টোপাধ্যায় ২, পাম প্লেস, কলকাতা-১৯। ৩২। হিমাদ্রিশেখর বসু, ৯এ, বালিগঞ্জ স্টেশন রোড, কলকাতা-১৯। ৩৩। শিপ্রা সরকার, ২৩৯।এ, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা-৪০। ৩৪। অচিন্ত্য ঘোষ, হিন্দুস্থান জেনারেল ইনসিওরেন্স সোসাইটি লিমিটেড, ডি, বি, সি, রোড, জলপাইগুড়ি। ৩৫। চিন্মোহন সেহানবীশ (মৃত) ১৯, ডঃ শরৎ ব্যানার্জি রোড, কলকাতা-২৯। ৩৬। রনজিৎ মুখার্জি, পি, ২৬, গ্রেহামস লেন, কলকাতা-৪০। ৩৭। সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, লেক গার্ডেনস, কলকাতা। ৩৮। অমল দাশগুপ্ত (মৃত) ৮৬, আশুতোষ মুখার্জি রোড, কলকাতা-২৫। ৩৯। প্রদ্যোৎ গুহ, (মৃত) ১/এ, মহীশুর রোড, কলকাতা-২৬। ৪০। অচিন্ত্য সেনগুপ্ত ৪৩, রাধামাধব সাহা লেন, কলকাতা-৭। ৪১। শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫৫ বি, হিন্দুস্থান পার্ক, কলকাতা-২৯। ৪২। দীপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (মৃত) ৬১২/১, ব্লক-ও নিউ আলিপুর কলকাতা-৫৩। ৪৩। গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০৮, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা-১২। ৪৪। নির্মাল্য বাগচী (মৃত) ফ্ল্যাট-বি-সি-৩, পিকনিক পার্ক, পিকনিক গার্ডেন রোড, কলকাতা-৬। ৪৫। তরুণ সান্যাল, ৩১/২, হরিতকি বাগান লেন, কলকাতা-৬। ৪৬। বিদ্যা মুন্সী, ১/৩, গরচা ফার্স্ট লেন কলকাতা-১৯। ৪৭। বেদুইন চক্রবর্তী (মৃত) ফ্ল্যাট ২, ১৬, রাজা রামকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলকাতা-৬। ৪৮। অমিয় দাশগুপ্ত, (মৃত) ২, যদুনাথ সেন লেন, কলকাতা-১২। ৪৯। সুরেন রায়চৌধুরী (মৃত), ২০৮, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা-১২।

আমি, রঞ্জন ধর, এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে উপরে প্রদত্ত তথ্য আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুসারে সত্য।

রঞ্জন ধর
৩১-৩-৯৯

পরিচয়

ফেব্রুয়ারী-এপ্রিল ১৯৯৯
মাঘ-চৈত্র ১৪০৫
৭-৯ সংখ্যা ৬৮ বর্ষ

প্রবন্ধ

সংস্কৃতি সংবাদ

বিয়োগপঞ্জী

প্রচ্ছদ : দীপ্ত দাশগুপ্ত

সম্পাদক

অমিতাভ দাশগুপ্ত

যুগ্ম সম্পাদক

বাসব সরকার বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য

প্রধান কর্মাধ্যক্ষ

রঞ্জন ধর

কর্মাধ্যক্ষ

পার্থপ্রতিম কুণ্ডু

সম্পাদকমণ্ডলী

ধনঞ্জয় দাশ কার্তিক লাহিড়ী পরমেশ আচার্য

শুভ বসু অমিয় ধর

উপদেশক মণ্ডলী

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অরুণ মিত্র মণীন্দ্র রায়

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় গোলাম কুদ্দুস

সম্পাদনা দপ্তর : ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭

রঞ্জন ধর কর্তৃক বাণীরূপা প্রেস, ৯-এ মনোমোহন বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ব্যবস্থাপনা দপ্তর ৩০/৬, ঝাউতলা রোড, কলকাতা-১৭ থেকে প্রকাশিত।

সম্পাদকীয়

জীবনানন্দ ১০০ এবং পরিচয়।

ভাবলেই রোমাঞ্চ জাগে। কেমন সম্পর্ক ছিল পরিচয়ের সঙ্গে জীবনানন্দর? জীবনানন্দ কি চোখে পরিচয়-কে দেখতেন তা জানার উপায় নেই আর। এ তাবৎ প্রকাশিত তাঁর রচনায় পরিচয় সম্পর্কে কোনো উক্তি বা মন্তব্য আমাদের চোখে পড়ে নি। অথচ তাঁর বহু বিতর্কিত কবিতা ক্যাম্পে প্রকাশিত হয় ১৯৩১-এর পরিচয়ের তৃতীয় সংখ্যায়, এ-ছাড়া আরও কবিতা।

কিন্তু আমরা কি ভাবে তাঁকে দেখেছি বা দেখছি তার কিছু পরিচয় রাখা হচ্ছে জীবনানন্দ ১০০-তে। অনেক জীবনানন্দর মধ্যে পরিচয়ের জীবনানন্দ অনন্য হয়ে উঠবে এই কারণে। অন্তত সেটাই আমাদের বিশ্বাস।

সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে
কার্তিক লাহিড়ী

জীবনানন্দ দাশ

—রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত

'সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি।'

—জীবনানন্দ দাশ

'প্রথম শ্রেণীর কবি নির্বাসিত হয়ে রয়েছেন কেন?'

—জীবনানন্দ দাশ

জীবনানন্দ দাশের দুইটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়া এই সন্দর্ভ আরম্ভ করিলাম। পদ্যে গদ্যে জীবনানন্দের অবিস্মরণীয় উক্তির অন্ত নাই। আমি কেন তাঁহার এই দুইটি কথা বাছিয়া লইলাম, তাহা বলি। ৬৫।৬৬ বৎসর পূর্বে যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজির ছাত্র ছিলাম তখন মনে হয় নাই ইংরাজ কবির সংখ্যা মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছে। তখন ইংলণ্ডের ছোট কবিকেও অকবি বলিয়া মনে হয় নাই। কিন্তু আজ বৃদ্ধ বয়সে দেখিতেছি ইংরাজি বাংলা দুই ভাষাতেই কবির সংখ্যা যেন বড় ক্লান্তিকর হইয়া উঠিয়াছে। তবে গত শতাব্দীতেও কেহ কেহ বলিতেন যে কাব্য সংসারে অকবির ভিড় জমিয়াছে। এই প্রসঙ্গে ইংরাজ কবি Thomas Hood এর চারিটি লাইন স্মরণ করিতে পারি:

'The noisy day is deafened by a crowd
Of undistinguished birds, a twittering race;
But only lark and nightingale forlorn,
Fill up the silences of night and morn.'

আমি অবশ্যই স্বীকার করি কাব্য-পাঠক হিসাবে আমি কেবল lark এবং nightingale লইয়া বসিয়া থাকি নাই। আমি অনেক সাধারণ কবির কবিতা আগ্রহ সহকারে পড়িয়া থাকি। কারণ, সাধারণ কবিও কবি। কিন্তু আজ যেন কবির সংখ্যা দেখিয়া বড় দিশাহারা বোধ করি। জীবনানন্দ বাঁচিয়া থাকিলে বলিতেন 'কেউ কেউ কবি নয়, সকলেই কবি'। কাব্যের এই মহারণ্যের অন্ধকারে বুঝিতে পারিনা কোনটি মহীরূহ আর কোনটি এরণ্ড। ব্যক্তিগতভাবে আমি এই জন্য সমস্যায় পড়ি নাই। আমি প্রায় কিছুই বড় পড়িনা।

এখানে কোন কিছুর উৎকর্ষ অপকর্ষ লইয়া অবশ্যই একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে। জীবনানন্দের উক্তিটি অনুসরণ করিয়া বলিতে পারি সকলেই অধ্যাপক নন, কেউ কেউ অধ্যাপক। কিন্তু আমি আমার সকল অধ্যাপকের ক্লাশেই বসিয়াছি এবং তাঁহাদের কথা মন দিয়া শুনিয়াছি। এই ভদ্র আচরণের জন্য পুরস্কারও পাইয়াছি। আমি যখন অধ্যাপক হইলাম তখন ভাবিতাম আমার ক্লাশে কোন ছাত্র আসিবেনা। আমি পড়াইতে পারিতামনা, কিন্তু আমার ক্লাশ কোনদিন একেবারে ছাত্রশূন্য হয় নাই। তাই বলি, পাঠক হিসাবে বেশী বাদ-বিচার করিলে কাব্য-সংসার অচল হইয়া পড়িতে পারে। একথাও ঠিক যে জীবনানন্দের কালে মাত্র কেউ কেউ কবি ছিলেন না, অনেকেই কবি ছিলেন; ইহাতে জীবনানন্দের বড় ক্ষতি হয় নাই। এবং এই বিষয়ে জীবনানন্দের কোন নালিশ ছিল বলিয়া মনে হয় নাই।

কবির যে দুইটি উক্তির বক্তব্য লইয়া আলোচনা করিতেছি তাহার প্রথমটির সহিত দ্বিতীয়টির বড় সম্পর্ক আছে বলিয়া মনে হয়না। জীবনানন্দ যে তাঁহার জীবদ্দশায় খ্যাতি লাভ করেন নাই তাহার কারণ ইহা নহে যে তিনি কবির ভিড়ে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছেন। 'প্রথম শ্রেণীর কবি নির্বাসিত হয়ে রয়েছেন কেন ?' এই প্রশ্নের উত্তর ইহা নহে যে দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর কবি তাঁহাকে অপাংক্তেয় করিয়া তুলিয়াছে। জীবনানন্দের এই প্রশ্নের উত্তর তিনি নিজেই দিয়াছেন: 'বিদেশে বুর্জোয়া শ্রেণীদের ভিতরেও এমন অজস্র খাঁটি রসবোদ্ধা আছে যার হীন ভগ্নাংশও আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত সমাজে নেই'। আমার মনে হয় জীবনানন্দের জীবদ্দশায় তাঁহার কাব্যের রস বা সারবত্তা উপলব্ধি করিতে পারে এমন পাঠক বড় বেশী ছিলনা। যদি বল রবীন্দ্রনাথকে বাঙ্গালী পাঠক চিনিল, জীবনানন্দকে কেন চিনিল না। আমি বলি রবীন্দ্রনাথকেও আমরা প্রথমে চিনি নাই। রবীন্দ্র কাব্যের সমালোচনার ইতিহাস বহুলাংশে রবীন্দ্র-দূষণের ইতিহাস।

কেহ কেহ বলিবেন, সমসাময়িক এক শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসু যখন জীবনানন্দের কাব্যের এত প্রশংসা করিলেন তখন আর কি করিয়া বলা যায় যে জীবনানন্দ তাঁহার কালে অবজ্ঞাত ছিলেন। ইহা সত্য যে জীবনানন্দ সম্বন্ধে বুদ্ধদেব বসুর উৎসাহের অন্ত ছিল না। 'ধূসর পান্ডুলিপি' এবং 'বনলতা সেন' জীবনানন্দের এই দুইখানি কাব্যগ্রন্থ বুদ্ধদেববাবু তাঁহার কবিতা পত্রিকায় রিভিউ করিয়াছিলেন। প্রথম গ্রন্থখানির রিভিউতে

তিনি লিখিয়াছেন, 'জীবনানন্দ দাশকে আমি আধুনিক যুগের একজন কবি বলে মনে করি'। 'বনলতা সেন' সম্বন্ধেও বুদ্ধদেব বাবু প্রশংসায় মুখর। কিন্তু তবু বলি বসুর এই প্রশ্রয়ে জীবনানন্দের বড় লাভ হয় নাই। ইহার কারণ বোধহয় এই যে জীবনানন্দ সম্বন্ধে বুদ্ধদেব বাবুর কয়েকটি কথা ভ্রমাত্মক, যেমন, 'বাংলা কাব্যের প্রধান ঐতিহ্য থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন।' কথাটি সত্য নহে। জীবনানন্দ কবি হিসাবে কোন অর্থেই 'ছিন্নমূল' নহেন। পৃথিবীর কোন কবিই তাঁহার সাহিত্যের ট্রেডিশন হইতে বিচ্ছিন্ন নহেন। কোন কবি যখন নূতন ভাব এবং নূতন ভাষার সৃষ্টি করেন তখনও তিনি তাঁহার সাহিত্যের পূর্ব-ইতিহাস একেবারে বর্জন করেননা। এই প্রসঙ্গ উঠিলেই আমরা যাহারা সামান্য ইংরাজি জানি, সাধারণত T. S. Eliot-এর 'Tradition and the Individual Talent' প্রবন্ধটি হইতে এই কথা কয়টি উদ্ধৃত করি: 'No poet, no artist of any age, has his complete meaning alone. His significance, his appreciation is the appreciation of his relation to the dead poets and artists. You cannot value him alone; you must set him, for contrast and comparison, among the dead.' কিন্তু ঐতিহ্যের সঙ্গে আমাদের কাব্যের সম্পর্ক বুঝাইতে হইলে Eliot এর শরণাপন্ন হইবার প্রয়োজন নাই। আমাদের অনেক কবি এই কথাটি সুন্দরভাবে বুঝাইয়াছেন। আমাদের সমালোচকরাও এই তত্ত্ব নানা প্রসঙ্গে উপস্থিত করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন: 'মানুষের সহিত মানুষের, অতীতের সহিত বর্তমানের, দূরের সহিত নিকটের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ যোগসাধন সাহিত্য ব্যতীত আর কিছুর দ্বারাই সম্ভবপর নহে।' আর আমরা যে কবির কথা লিখিতে বসিয়াছি তিনিও বলিয়াছেন: 'বাংলা সাহিত্যও রবীন্দ্রনাথের ভিত্তি ভেঙে ফেলে কোনো সম্পূর্ণ অভিনব জায়গায় গিয়ে দাঁড়াবে, সাহিত্যের ইতিহাস এরকম অজ্ঞাতকুলশীল জিনিস নয়।'

জীবনানন্দ দাশ সম্বন্ধে বুদ্ধদেব বসুর আর একটি ভ্রমাত্মক কথা এই যে জীবনানন্দ মুখের ভাষায় কাব্য রচনার পথে সংস্কৃত ভাষাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়াছেন। 'বাংলা কাব্যের ভবিষ্যৎ' শিরোনামায় প্রগতি পত্রিকায় যে ডায়লগ ছাপা হইয়াছিল তাহাতে অনিলের কথাকেই আমরা বুদ্ধদেবের কথা বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। অনিল এই ডায়ালগে বলিতেছেন:

'দ্যাখো, এতদিনে আমাদের এ-কথাটা উপলব্ধি করা উচিত যে সংস্কৃত আর বাঙলা এক ভাষা নয়। সংস্কৃতের সঙ্গে বাঙলার নাড়ির বাঁধন বহুকাল ছিঁড়ে গেছে।···সংস্কৃতের দুয়ারে এই কাঙালপনা করে আর কতকাল আমরা মাতৃভাষাকে ছোট করে রাখবো?' বাংলা ভাষা অবশ্যই বাংলা ভাষা, ইহা ইহা অন্য কোন ভাষা নহে। কিন্তু এই ভাষার সঙ্গে সংস্কৃতের নাড়ির যোগ নাই এমন কথা বলতে পারিনা। মাইকেল বাংলাভাষাকে বলিয়াছেন যে ইহা সুন্দরী জননীর সুন্দরতর দুহিতা। সংস্কৃতের সঙ্গে বাংলার এই মা ও কন্যার সম্পর্ক আমরা ভুলিতে পারিনা। বাংলা কাব্যের ঝংকার বহুলাংশে সংস্কৃতের ঝংকার। একই কবি যেমন মুখের ভাষায় সুললিত পদ রচনা করেন, তিনিই দেখি আবার তাঁহার কবিতায় সংস্কৃত শব্দের ঝংকারের সৃষ্টি করেন। একটি উদাহরণ দিতে পারি। অক্ষয়কুমার বড়াল তাঁহার প্রদীপ কাব্যগ্রন্থে সন্নিবিষ্ট 'শ্রাবণে' কবিতায় লিখিলেন:

তীরে-নারিকেল-মূলে থল্ থল্ করে জল,
ডাহুক ডাহুকী কূলে ডাকে;
সারি দিয়া মরালীরা ভাসিছে তুলিয়া গ্রীবা,
লুকাইছে কভু দাম ঝাঁকে।

আবার এই কবিই তাঁহার 'বঙ্গভূমি' কবিতায় লিখিলেন:

অশোকে কিংশুকে গেছে ছাইয়া প্রান্তর,
পিক কণ্ঠ-কলতান উঠে দিকে দিকে;
চ্যুত-মুকুলের গন্ধে মরুত মন্থর,
এস হৃৎ-পদ্মাসনে, সর্ব্বার্থ-সাধিকে।

মিলটনের ল্যাটিনমুখী ইংরাজি আমাদের পীড়িত করেনা। উহা আমাদের আকৃষ্ট করে। মাইকেলের

বিশদ বস্ত্র বিশদ উত্তরী
ধুতুরার মালা যেন ধূর্জ্জটীর গলে।

মাইকেলের এই দুই চরণ পড়িয়া আমরা বলিনা যে ইহা বাংলা নহে। বিদ্যাসাগরের রচনাকে আমরা টুলো-পণ্ডিতের লেখা বলিয়া তুচ্ছ করিনা। জীবনানন্দ দাশও সংস্কৃত শব্দের ধ্বনি মাধুর্য্য বুঝিতেন। 'বেলা অবেলা কালবেলা' গ্রন্থের প্রথম কবিতাটির প্রথম দুই লাইন এই উক্তির যাথার্থ্য প্রমাণ করিবে:

হে পাবক, অনন্ত নক্ষত্রবীথি তুমি, অন্ধকারে
তোমার পবিত্র অগ্নি জ্বলে।

কিন্তু বুদ্ধদেব বসুর জীবনানন্দের কাব্য সম্বন্ধে যে মন্তব্য একান্তভাবে অগ্রাহ্য তাহা ছাপা হয় 'কবিতা' পত্রিকায় ১৯৪৬ সালে। 'শনিবারের চিঠিতে' সজনীকান্ত দাশ জীবনানন্দ দাশকে যে ভাষায় আক্রমণ করিতেন তাহা আমাকে এত পীড়িত করে নাই যত করিয়াছে বুদ্ধদেব বাবুর নিম্নলিখিত উক্তি : 'কিন্তু পাছে কেউ বলে তিনি এস্কেপিস্ট, কুখ্যাত আইভরি টাওয়ারের নির্লজ্জ অধিবাসী, সেইজন্য ইতিহাসের চেতনাকে তাঁর সাম্প্রতিক রচনার বিষয়ীভূত করে তিনি এইটেই প্রমাণ করবার প্রাণান্তকর চেষ্টা করছেন যে তিনি 'পেছিয়ে' পড়েন নি। করুণ দৃশ্য এবং শোচনীয়। এর ফলে তাঁর প্রতিশ্রুত ভক্তের চক্ষেও তাঁর কবিতার সম্মুখীন হওয়া সহজ আর নেই। দুর্বোধ্য বলে আপত্তি নয়; নিঃস্বর বলে আপত্তি, নিস্বাদ বলে। হয়তো ওরই মধ্যে তাঁর পরিণতির সম্ভাবনা প্রচ্ছন্ন, কিন্তু প্রচ্ছন্নই। তা যে পরিস্ফুট হতে পারছে না তার কারণই এই যে হুজুগের হুংকারে তিনি আত্মপ্রত্যয় হারিয়েছেন। মনের অচেতনে তাঁর এই কথাই কাজ করছে যে আমি যদি এখনো মাকড়শার জাল, ঘাস আর শিশিরের কথা লিখি, তবে আর কি তার পাঠক জুটবে?'

এই মন্তব্যের প্রতিবাদ বড় চোখে পড়ে নাই। বরং ইহার প্রতিধ্বনি কানে আসিয়াছে। ঐ 'কবিতা' পত্রিকাটিতে জীবনানন্দের 'সাতটি তারার তিমির' কাব্যগ্রন্থের একটি সমালোচনা বাহির হইয়াছিল। বুদ্ধদেবের কথাই এই সমালোচক অনুসরণ করিয়া লিখিয়াছেন : 'জীবনানন্দ মনন-মুখাপেক্ষী হয়েছেন, কোনো আত্মদর্শনের জটিলতায় জড়িয়েছেন। এই দর্শনাশ্রয়ের ফলেই মনে হয়, তাঁর ভাষণে বক্রতা এবং সেই সঙ্গে প্রসাদের অভাব এসেছে। আবেগের সঙ্গে মননের প্রকৃত সমন্বয় ঘটাতে পারলে কথাই ছিলনা! কিন্তু স্পষ্টতই সে সঙ্গম কাহিনী এখানে শোকান্তিকা। অনেক ক্ষেত্রেই এই গ্রন্থের কবিতা রূপ নিয়েছে নিছক দার্শনিকতায় এবং সে দর্শনও অবোধ্য। বুদ্ধদেব বসুর মতে জীবনানন্দর আত্মস্খলনের কারণ তাঁর সাম্প্রতিক তৎকাল্যপ্রবণতা।' শব্দটি লেখকের সৃষ্টি। সমালোচনাটি এক অনাসৃষ্টি। তবে মনে হয়না বুদ্ধদেববাবু বা তাঁহার সহচরদের মন্তব্য খণ্ডনের কোন প্রয়োজনীয়তা আছে। বুদ্ধদেব বাবু জীবনানন্দের মৃত্যুর

পরেই লিখিয়াছিলেন 'মননরূপী শয়তান অথবা দেবতার পরামর্শে লেখা কবিতার' কথা, কবির অন্তরে যে দার্শনিকের অবস্থান তাহাকে কোন বাঙ্গালী পাঠক শয়তান বলিবেন না। বৈষ্ণব কাব্য পড়া, রবীন্দ্রনাথ পড়া বাঙ্গালী পাঠক কবিকে একজন দ্রষ্টা বলিয়া চিহ্নিত করিবে। এই 'কবিতা' পত্রিকারই জীবনানন্দের কণ্ঠে বরমাল্য দিয়াছিলেন। আবার এই পত্রিকাতেই তাঁহার সম্বন্ধে বলা হইল যে তিনি আত্মপ্রত্যয় হারাইয়াছেন।

বুদ্ধদেবের দৃষ্টিতে জীবনানন্দের কাব্য লইয়া এই প্রবন্ধ আরম্ভ করিলাম এই জন্য যে বুদ্ধদেব বাবুই জীবনানন্দকে একালের এক প্রধান বাঙালী কবি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কবি সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের নিন্দা বাক্যও এইজন্যই আমাদের আলোচনার বিষয়। কবির প্রশংসায়ও বুদ্ধদেব বাবু এমন কয়েকটি কথা বলিয়াছেন যাহা আমাদের ভ্রান্ত করিতে পারে। তিনি বলিয়াছেন জীবনানন্দ প্রকৃতির কবি এবং প্রকৃত কবি। প্রকৃতি যে কোন কবির প্রেরণার উৎস। জীবনানন্দকে আবার জীবনের কবিও বলা হয়। মরণের কবি কে? বুদ্ধদেব বাবু জীবনানন্দ সম্বন্ধে আর একটি কথা—তিনি নির্জনতার কবি। ওয়ার্ডসওয়ার্থও Bliss of Solitude এর কথা বলিয়াছেন। তিনি আবার মিলটন সম্বন্ধে বলিয়াছেন, Thy soul was like a star that dwells apart কবি মাত্রই নির্জনতামুখি, এই কারণে তাঁহাকে নির্জনতার কবি বলিতে পারিনা।

এই প্রসঙ্গটি করিয়া ভাবিতেছি এখন কোন পথে যাইব। কিভাবে বা কি ভাষায় কবিকে পাঠকের কাছে উপস্থিত করিব। প্রায় ষাট বছর অধ্যাপনা করিয়াছি এবং অধ্যাপনার বিষয়ও ছিল ইংরাজি এবং বাংলা সাহিত্য। কিন্তু একটি কবিতার রসগ্রহণ করিয়া সেই রস ক্লাশে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। মনে হয়না পাঁচকথা বলিয়া আপন কথা এড়াইয়াছি। যে সকল অধ্যাপক বিদ্যার রস লইয়া ব্যস্ত থাকেন আমি বোধহয় তাঁহাদের দলে। তবে আমার বেশ কয়েকজন অধ্যাপকের অধ্যাপনায় বিদ্যার রস এবং কাব্যের রস একাকার হইয়া এক অখণ্ড রসের সৃষ্টি করিত। আজ এই সকল অধ্যাপকের কথা ভুলিয়া যাইতেছি। সেইজন্য দুই একজনের নাম উল্লেখ করিতেছি। ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অবশ্যই প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। আর একজন হইলেন রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ। স্কটিশ চার্চ কলেজে বীরেন্দ্র বিনোদ রায়, সুশীল চন্দ্র দত্ত, আর্থার ময়াট আমাদের যেন ক্লাশে আবিষ্ট করিয়া

রাখতেন। বাংলা সাহিত্যের এক অসামান্য অধ্যাপক ছিলেন সুধীর কুমার দাশগুপ্ত। বঙ্গবাসী কলেজের বাংলার অধ্যাপক শ্যামাপদ চক্রবর্তী তাঁহার ছাত্রদের যেন মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিতেন। কিন্তু ইঁহাদের অনুসরণ করিয়া অধ্যাপক হিসাবে খ্যাতি অর্জনের কথা কখনও ভাবি নাই।

জীবনানন্দ দাশ সম্বন্ধে ত্রিশ এবং চল্লিশের দশকে যে তেমন কিছু জানিতাম না তাহার কারণ বলি। কোন অধ্যাপকের মুখে তাঁহার কথা শুনি নাই এবং এই সময়ের শেষের দিক হইতে ত্রিশ বছর আমার কর্মস্থল ছিল দিল্লি। অথচ বরিশালবাসী হিসাবে আমি জীবনানন্দের সান্নিধ্য লাভ করিতে পারিতাম। আমি তাঁহাকে দেখি নাই। তাঁহার কাব্য আলোচনা করিবার একটি সুযোগ অবশ্য পাইয়াছিলাম। ১৯৩৮ সালে হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকার Sunday Magazine এর সম্পাদক ছিলেন অমল হোম। পিতৃবন্ধু হিসাবে তিনি আমাকে স্নেহ করিতেন। একদিন আমাকে তিনি ডাকিলেন এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন আমি তাঁহার পত্রিকায় বাংলা বই রিভিউ করিতে পারি কিনা। আমি তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট বিভাগের ইংরাজির টিউটার। ইংরাজি বা বাংলায় কিছু লিখিবার অভ্যাস বড় হয় নাই। তবুও অমল হোম মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম কি বই আমাকে দিয়া রিভিউ করাইবার কথা তিনি ভাবিয়াছেন। তিনি একখণ্ড 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' আমার হাতে দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন আমি কাব্যগ্রন্থ-খানির একটি সমালোচনা লিখিয়া দিতে পারি কিনা। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত হয়। আমি গ্রন্থখানির নাম শুনিয়াছি, চোখে দেখি নাই। যাহা হউক, এই কাব্যগ্রন্থখানির পাতা উল্টাইয়া বুঝিলাম যে ইহা রিভিউ করিবার যোগ্যতা আমার নাই। আমি এই ব্যাপারে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন এই গ্রন্থের বুদ্ধদেব বসু লিখিত সমালোচনা আমি পড়িয়াছি কিনা। আমি যে তাহা পড়ি নাই একথা শুনিয়া তিনি কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলেন। আমি অবশ্যই লজ্জাবোধ করিলাম। কিন্তু আরও লজ্জার বিষয় এই যে ইহার পর আমি জীবনানন্দ দাশ সম্বন্ধে কোনও উৎসাহ বোধ করিলাম না। ইহার কারণ বোধহয় এই যে সমসাময়িক বাংলা কাব্য সম্বন্ধে আমার কোনও আগ্রহ ছিলনা। ১৯৫৫ সালে অর্থাৎ কবির মৃত্যুর এক বৎসর পরে তাঁহার 'আবার আসিব ফিরে' সনেটটি দেশ পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। আমি তখন ইংলন্ডে। সাগরময়

ঘোষ প্রেরিত 'দেশ' পত্রিকার এই সংখ্যায় কবিতাটি পড়িয়া আমার চোখে জল আসিল। মাইকেলের 'বঙ্গভূমির প্রতি', অক্ষয় বড়ালের 'বঙ্গভূমি', দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'বঙ্গ আমার জননী আমার' এমনকি রবীন্দ্রনাথের 'আমার সোনার বাংলা' কবিতাগুলি পড়িয়া কখনও এমন ভাব হয় নাই। সেইদিন হইতেই আমি জীবনানন্দের এক ভক্ত পাঠক হইয়া উঠিলাম। 'আবার আসিব ফিরে' সনেটটি ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত 'রূপসী বাংলা' কাব্যগ্রন্থে ষোল নম্বর কবিতা। এই কবিতাটির রচয়িতা যে এক শ্রেষ্ঠ কবি ইহা অনুমান করিতে পারিলাম, ইহার পর 'ঝরা পালক' হইতে আরম্ভ করিয়া জীবনানন্দের শ্রেষ্ঠ কবিতা যত্ন করিয়া পড়িলাম। এবং পড়িয়া মনে হইল যে এই এক নূতন কাব্য-জগৎ। ইহার ভাব নূতন, ভাষা নূতন এবং ছন্দ পয়ার ভিত্তিক হইয়াও নূতন। কিন্তু জীবনানন্দের এই নবত্ব তাঁহাকে বাংলা কাব্যের ঐতিহ্য হইতে বিচ্ছিন্ন করে নাই।

দিল্লিতে যখন বাংলার অধ্যাপক ছিলাম তখন জীবনানন্দের এক মার্কিন পাঠকের সঙ্গে দেখা হইল, তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন দিল্লির রামযশ কলেজ কোথায়? তিনি কেন উক্ত কলেজের খোঁজ করিতেছেন জিজ্ঞাসা করিতে তিনি বলিলেন যে তিনি শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে জীবনানন্দ সম্বন্ধে গবেষণা করিতেছেন, জীবনানন্দের জীবনের পরিবেশ জানিবার জন্য তিনি বরিশালে কয়েক বৎসর কাটাইয়াছেন। ১৯৩০ সালে জীবনানন্দ রামযশ কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক ছিলেন বলিয়া তিনি ঐ কলেজ দেখিতে চাহিতেছেন। আমি বলিলাম জীবনানন্দ যখন রামযশ কলেজে অধ্যাপনা করিতেন তখন সেই কলেজ ছিল আনন্দ পর্বতে এবং এখন সেই কলেজ দরিয়াগঞ্জে স্থানান্তরিত হইয়াছে। তিনি তখন আনন্দ পর্বত দেখিতে চাহিলেন। গবেষক হিসাবে তাঁহার অনুসন্ধিৎসা দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইলাম। আমি তাঁহাকে আনন্দ পর্বতের পথ বুঝাইয়া দিলাম। ইহার পরেও কয়েকবার ওই ভদ্রলোকের সাথে দেখা হইয়াছে, ইঁহার নাম Clint Seely। তাঁহার রচিত জীবনানন্দ সম্বন্ধে বৃহৎ গ্রন্থ 'A Poet Apart' ১৯৯০ সালে আমেরিকায় প্রকাশিত হয়। Clint Seely জীবনানন্দ দাশের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অশোকানন্দ দাশের সঙ্গেও দেখা করেন। অশোকানন্দ দাশ মহাশয় যখন জীবনানন্দের সমস্ত পাণ্ডুলিপি জাতীয় গ্রন্থাগারকে প্রদান করেন তখন আমি ওঁর সঙ্গে দুই একবার দেখা করিয়াছি। আমি অবশ্য

Clint Seely-র 'A Poet Apart' গ্রন্থখানিকে একখানি সুলিখিত জীবনী ও সমালোচনা গ্রন্থ বলিয়া মনে করি।

তবে জীবনানন্দের জীবন ও রচনা সম্বন্ধে গবেষণা ও আলোচনা গত পঁচিশ বৎসরে পশ্চিমবঙ্গে এবং বাংলাদেশে অনেক হইয়াছে। জীবনানন্দের অসংখ্য অপ্রকাশিত কবিতা আবিষ্কৃত এবং সংগৃহীত হইয়াছে। কবির উপন্যাস ও ছোটগল্পও এখন সহজলভ্য। এই গবেষণার মূল্য সমধিক। বিশেষ করিয়া তিনখানি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করিতে পারি। দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত জীবনানন্দ দাশের কাব্য সংগ্রহ ১৯৯৩ সালের জানুয়ারী মাসে প্রকাশিত হয়। ৭৮৫ পৃষ্ঠার এই বৃহৎ গ্রন্থ আমাদের এক অমূল্য সম্পদ। জীবনানন্দের সাতখানি কাব্যগ্রন্থ ছাড়া এই সংগ্রহে ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত নানা সাময়িক পত্রে ও সঙ্কলন গ্রন্থে প্রকাশিত সব কবিতা এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে।

২৭৫ পৃষ্ঠার এই সামগ্রীর সঙ্গে আমার পরিচয় বড় ছিলনা। ইহা ছাড়া বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের খসড়া পাঠান্তর ও আনুষঙ্গিক কবিতার অংশে কিছু মূল্যবান বস্তু উপস্থিত করিয়াছেন। এই গ্রন্থের পরিশিষ্ট অংশে জীবনানন্দের কিছু গদ্য রচনাও স্থান পাইয়াছে। দ্বিতীয় গ্রন্থ দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যয়ের 'জীবনানন্দ দাশ: বিকাশ প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত' ১৯৮৬ সালের মে মাসে বাহির হয়। ১৯৯৭ সালে এই গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ জীবনানন্দের আলোচনায় অপরিহার্য্য। কবির সমসাময়িক খ্যাতি ও অখ্যাতি সম্বন্ধে সকল তথ্য দেবীপ্রসাদ বাবু সংগ্রহ করিয়াছেন। কবে কোন পত্রিকায় বা গ্রন্থে বা চিঠিতে জীবনানন্দ সম্বন্ধে কে কি বলিয়াছেন তাহা গ্রন্থকার সযত্নে উপস্থিত করিয়াছেন। জীবনানন্দের কিছু মূল্যবান ইংরাজি ও বাংলা প্রবন্ধ এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। এই বইখানি পড়িয়া আমার মনে হইয়াছে যে জীবনানন্দের জীবন, রচনা সম্বন্ধে জানিবার আর কিছু বাকি রহিলনা। তৃতীয় গ্রন্থখানি হইল বাংলাদেশের অধ্যাপক আবদুল মান্নান সৈয়দ সংকলিত ও সম্পাদিত 'প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতা সমগ্র: 'জীবনানন্দ দাশ'। এই সংগ্রহ গ্রন্থে জীবনানন্দের অগ্রন্থিত কবিতা ছাড়া বহু অপ্রকাশিত কবিতা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। দেড়শত পৃষ্ঠার সম্পাদকীয় আলোচনায় আবদুল মান্নান সৈয়দ বহু মূল্যবান তথ্য উপস্থিত করিয়াছেন। এই তিনখানি গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমি যাহা জানিয়াছি তাহা

পূর্বে জানিতাম না। কিন্তু এত জানিয়াও আমি জীবনানন্দ সম্বন্ধে কি লিখিব বুঝিতেছিনা। জীবনানন্দ সম্বন্ধে কয়েকখানি সমালোচনা গ্রন্থও পড়িয়াছি। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যেমন আমার ধারণা যে তিনি যত বড় কবি তাহার ঠিক তত বড় সমালোচক আজও দেখিনা। জীবনানন্দ সম্বন্ধেও আমার ঐ একই কথা। এই প্রসঙ্গে জীবনানন্দের একটি উক্তি মনে পড়িতেছে : 'পাণ্ডিত্য দিয়ে কবিতার সমালোচনা বেশী চলে না'। কথাটির যথার্থ আমি আমার ষাট বৎসরের অধ্যাপনার অভিজ্ঞতায় বুঝিয়াছি। আমরা ব্যাখ্যা করিতে মুখর হই কিন্তু ব্যাখ্যা হয়না। একটি কবিতার সার সম্বন্ধে নানা কথা বলি কিন্তু সার কথাটি বলিতে পারিনা। দেশী-বিদেশী বহু কবির লাইন উদ্ধৃত করি, বহু সমালোচকের উক্তি উপস্থিত করি, তবু যেন কিছু বলা হয়না। এই প্রসঙ্গে আমার একজন অধ্যাপকের কথা স্মরণ করি। তিনি Tennyson পড়াইতেন। Tennyson সম্বন্ধে কিছুই বলিতেন না। তাঁহার কাব্যের সাধারণ লক্ষণ সম্বন্ধেও তিনি একেবারে নীরব। কিন্তু কবিতাটি তিনি বড় সুন্দর আবৃত্তি করিয়া পড়িতেন। তাঁহার আবৃত্তি শুনিয়া আমরা কবিতাটির রস গ্রহণ করিতাম। তাহার পর তিনি মাত্র দুই একটি কথা কবিতাটি সম্বন্ধে বলিতেন। তাঁহার কথা-গুলি আমার মনে নাই। কিন্তু তাঁহার আবৃত্তি যেন আজও আমার কানে বাজিতেছে। একটি কবিতার সারবস্তু সম্বন্ধে একটি মজার গল্প বলিতে পারি। আমাদের এক অধ্যাপক কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ক্লাশে প্রায় সর্বক্ষণ নীরব থাকিতেন। কখনও কখনও দুই একটি কথা বলিতেন যাহা আমাদের চমৎকৃত করিত। তিনি সেই সময়ে বি.এ. পরীক্ষার পরীক্ষক ছিলেন। একটি ছাত্র Give the substence of the following poem এই প্রশ্নের উত্তরে মূল কবিতাটি নকল করিয়া দিয়াছিলেন।, কিরণচন্দ্র তাহাকে এই প্রশ্নে পাঁচিশের মধ্যে পাঁচিশ দিলেন। ইংরাজির প্রধান পরীক্ষক এই জন্য কিরণচন্দ্রকে পত্র দিলেন যে তিনি যেন পরীক্ষার্থীকে পাঁচিশের মধ্যে শূন্য দিয়া তাহাকে একখানি পত্র দেন। এই চিঠির উত্তরে কিরণচন্দ্র প্রধান পরীক্ষককে লিখিলেন The substance of a poem is the poem itself. If you reduce my award by even one mark you will get a solicitor's letter. কিরণচন্দ্র সাত বৎসর Oxford-এ গ্রীক পড়িয়া ব্যারিষ্টার হইয়া দেশে ফিরিয়াছিলেন। আইন জানিতেন। ছাত্রটি অবশ্য

কাব্য সম্বন্ধে এই গভীর তত্ত্বটি জানিতেন না। তবে কিরণচন্দ্রের বক্তব্যটিকে আমরা একেবারে অগ্রাহ্য করিতে পারিনা। তখন প্রশ্ন হইল, কবিতার substance যদি হইতে না পারে তাহা হইলে তাহার ব্যাখ্যা হইতে পারে কিনা। আমি মনে করি ব্যাখ্যা অবশ্যই হইতে পারে এবং সেই ব্যাখ্যা কবিতাটির রস কোথায় ইহার ভাবের ও ভাষায় বৈশিষ্ট্য কোথায় তাহা বুঝাইয়া দিতে পারে। প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের ক্লাশে আমরা Shakespeare-এর নাটকের রস গ্রহণ করিতে পারিতাম। রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ Browning এর কবিতায় রস কোথায় তাহা বুঝাইতে পারিতেন।

তবে একথাও ঠিক যে অধ্যাপক গুণবান না হইলেও ছাত্র কবিতার রসের আস্বাদ কিছুটা গ্রহণ করিতে পারেন। এই বিষয়েও একটি কাহিনী উপস্থিত করিতে পারি। পঁচিশ বৎসর পূর্বে কানাডার এক বিশ্ববিদ্যালয়ের Comparative Literature বিভাগের অধ্যাপনা করিতে হইয়াছিল। একটি course এর বিষয় ছিল 'আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য'। কোন ছাত্র-ছাত্রী অবশ্য কোন ভারতীয় ভাষা জানিতেননা। এই Course-এ জীবনানন্দের দশটি কবিতা আমাকে পড়াইতে হইয়াছিল। আমি কবিতা-গুলি Roman হরফে লিখিয়া তাহার mimeograph ক্লাশে বিতরণ করিতাম। তাহার পর আমার অক্ষম ইংরাজিতে মুখে মুখে কবিতাগুলির ইংরাজি অনুবাদ ক্লাশে উপস্থিত করিতাম। একটি কবিতা অবশ্য ছাত্র-ছাত্রীদের হৃদয় স্পর্শ করিল। 'মহাপৃথিবী' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'ঘাস' কবিতাটির লোকনাথ ভট্টাচার্যকৃত ফরাসী অনুবাদ আমার কাছে ছিল। আমি উহার xerox copy ক্লাশে বিলি করিয়াছিলাম। কবিতাটি পড়িয়া একটি ছাত্রী উঠিয়া বলিল: 'Sir, this poem is profounder than Whitman's 'Grass.' কবিতাটির এই ফরাসী অনুবাদ অনেকের হাতে পৌঁছাইল। Comparative Literature Department এর প্রধান E. D. Blodgett আমাকে ফোন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে আমি তাঁহাকে একটু বাংলা শিখাইতে পারি কিনা। তাঁহার এই প্রস্তাবের কারণ জিজ্ঞাসা করিতে তিনি বলিলেন যে জীবনানন্দের 'ঘাস' কবিতাটির ফরাসী অনুবাদ পড়িয়া তিনি এত মুগ্ধ হইয়াছেন যে তিনি এই কবির কাব্য মূলে পড়িতে আগ্রহী। Blodgett সাহেব কবি এবং তাঁহার কবিতা 'Oxford Book of Canadian Verse' গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। জীবনানন্দের দুই

একটি কবিতার Blodgett কৃত অনুবাদ Canada-র একটি পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। Canada বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন আর এক কবি অধ্যাপক ছিলেন Dr. Ferrate। গ্রীকের অধ্যাপক এই ভদ্রলোক জন্মসূত্রে Spaniard। তিনি একদিন আমার ঘরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে এই কবি নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন কিনা। ঘাস কবিতাটিকে তিনি একটি magnificent কবিতা বলিলেন।

জীবনানন্দের কাব্য সম্বন্ধে ক্লাশেও এক বিশেষ উৎসাহের সৃষ্টি হইয়াছিল। ছাত্র-ছাত্রীরা কানাডার অধিবাসী হইলেও তাহাদের কারও মাতৃভাষা ফরাসী, কাহারও জার্মান, কাহারও ইটালীয়ান এবং কাহারও স্প্যানীশ। একজন ছাত্র ছিলেন Egyptian। তাহার মাতৃভাষা ইংরাজি। তাহারা সকলে 'ঘাস' কবিতাটির নিজ নিজ ভাষায় অনুবাদ করিয়া আমার Farewell meeting-এ আমাকে উপহার দিলেন। ইহাতে আমার যেমন আনন্দ হইল তেমন দুঃখ হইল। আনন্দ হইল ইহা ভাবিয়া যে জীবনানন্দ সম্বন্ধে এত দেশের এত মানুষ এমন উৎসাহী। দুঃখ হইল ইহা ভাবিয়া যে একজন যোগ্যতর অধ্যাপক এই কবি সম্বন্ধে আরও কত বেশী উৎসাহের সৃষ্টি করিতে পারিতেন। জীবনানন্দ সম্বন্ধে আমার এই অভিজ্ঞতার কথা দেশে ফিরিয়া কবি এবং সমালোচক এবং অধুনালুপ্ত সাহিত্য-পত্রিকা উত্তরসূরির সম্পাদক অরুণ ভট্টাচার্যকে বলিয়াছিলাম এবং তাঁহাকে আমার ছাত্রদের 'ঘাস' কবিতার অনুবাদ গুলিও দিয়াছিলাম। তিনি কাহিনীটি তাঁহার এক প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন। অনুবাদগুলি অরুণের স্ত্রীর কাছে থাকিতে পারে।

আমি জীবনানন্দের এক অনুগত পাঠক। কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে শুনিবার মত কোন কথা বোধহয় বলিতে পারি না। আমাকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে কবি হিসাবে জীবনানন্দের শ্রেষ্ঠত্ব কোথায় তাহা হইলে আমি বলিব যে তিনি এক নতুন কাব্যজগতের স্রষ্ঠা। এখন প্রশ্ন হইল এই যে নূতন কাব্য জগৎ বলিতে কি বুঝিব? কাব্যের নবত্ব কোথায় এবং যাহাই নূতন তাহাই সুন্দর এই কথা কি করিয়া বুঝাইব? কাব্যের ইতিহাসে ইওরোপে ancient এবং modern বলিয়া দুই শ্রেণীর কাব্য চিহ্নিত হইয়াছে। যাহা প্রাচীন তাহা classical এবং যাহা আধুনিক তাহা classical সাহিত্য হইতে ভিন্ন। Alexandria-তে আধুনিক কবিদের Greek ভাষায় বলা হইত Neoteroid. ইহাদের কাব্য উৎকর্ষ হোমারের কাব্যের সঙ্গে তুলনীয় হইতে পারে

না। খ্রীষ্টপূর্ব একশত শতাব্দীতে এই Neoteroi-দের ল্যাটিনে বলা হইত। Poetae novi। Ancient এবং Modern-এর এই বিভেদই পরবর্তীকালে classical এবং romantic এই বিচ্ছেদে পরিণত হয়।

ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে বাল্মীকি আদি কবি। ইংরাজিতে তাঁহাকে ancient বলিতে পারি। তাহার পর গুপ্ত যুগের কালিদাস অবশ্যই এক নূতন কবি। ইনি একজন classical poet হইলেও বাল্মীকির সঙ্গে তুলনায় তাঁহার কাব্যের নবত্ব স্বীকার করিতে হয়। রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই এক নূতনতর কবি। সাহিত্যের এই তিন যুগের সঙ্গে একটি তত্ত্বের সম্পর্ক থাকিলেও এই তিন কবি তিন কালের কবি। কালিদাসের কাব্যে যাহা পাই তাহা বাল্মিকীতে নাই। আবার রবীন্দ্রনাথে যাহা পাই তাহা কালিদাসে পাই না। এখন প্রশ্ন হইল এই যে এক নূতন কবি প্রাচীন কবি হইতে শ্রেষ্ঠ এমন সিদ্ধান্ত সমীচীন হইবে কিনা। রবীন্দ্রনাথ কালিদাস সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

তাঁহার কালের স্বাদগন্ধ
আমি তো পাই মৃদুমন্দ
আমার কালের কণামাত্র
পাননি মহাকবি।

রবীন্দ্রনাথ বোধহয় লঘুচালেই এই কথাটি বলিয়াছিলেন। কিন্তু কথাটি অর্থপূর্ণ। একালের কবি একালের কথা বলিবেন। সেকালের কবির মুখে সেকথা শুনিবনা? ইংরাজ কবি Grey তাঁহার একটি কবিতায় 'Progress of Poesy'র কথা বলিয়াছেন।১ এই progress শব্দটির অর্থ movement বা গতি বলিয়া ধরিতে হইবে। কাব্য কালে কালে উন্নত হইতেছে এমন কথা বলিতে পারি না। আবার প্রাচীন কাব্য শ্রেষ্ঠ কাব্য, পরবর্তীকালের কাব্য নিকৃষ্ট। এমন কথাও বলিতে পারি না। আমার এক অধ্যাপক প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যের এক বিশিষ্ট পণ্ডিত ছিলেন। তিনি একদিন ক্লাশে বলিলেন: Tragedy perished with the Greeks, not even Shakespeare could revive it. আমরা তখন একথা বিশ্বাস করি নাই। তখন আমরা প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের ক্লাশে Shakespeare পড়িতেছি। এই গ্রীক পণ্ডিতের নাম ছিল কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। আমি যখন ১৯৩৮ সালে কলিকাতা

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াইতাম, একদিন Staff Room-এ Homer এর Iliod হইতে এক দীর্ঘ অংশ স্মরণ হইতে আবৃত্তি করিলেন। আমি এই স্মরণশক্তি ভাবিয়া বিস্মিত হইলাম এবং জিজ্ঞাসা করিলাম তিনি এই রকম দীর্ঘ একটি অংশ কি করিয়া আবৃত্তি করিলেন। এই প্রশ্নের উত্তর আমার আজও মনে আছে। তিনি বলিলেন: young man, you read all kinds of rubbish। I read only Homer কিন্তু সাহিত্য সম্বন্ধে সেই মনোভাব আমি সেদিন যথার্থ বলিয়া মনে করি নাই: সাহিত্য সংসারে অনেক শ্রেষ্ঠ কবি উপস্থিত। Homer পড়িব এবং Virgil, Dante, Goethe এবং রবীন্দ্রনাথকে উপেক্ষা করিব এমন এক মনোভাব আমার এই অধ্যাপক আমার মধ্যে সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। কিন্তু কোন এক সাহিত্য কুলীন এবং অন্য সাহিত্য অন্ত্যজ এই মনোভাব একান্ত বিরল এমন কথা বলিতে পারি না। প্রায় একশত বৎসর পূর্বে যখন Oxford বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু অধ্যাপক ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্যে Honours Course-এর প্রবর্তন করিতে উদ্যোগী হইলেন তখন গ্রীক, ল্যাটিনের অধ্যাপকগণ ইংরাজিকে মহিলাদের ভাষা বলিয়া তুচ্ছ করিলেন। এই ইতিহাস Stephen Potter-এর The Muse in Chain গ্রন্থে বিধৃত। দীনেশচন্দ্র সেন বলিতেন, তিনি যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম. এ. ডিগ্রি প্রবর্তনের প্রস্তাব করিলেন তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের অনেকে ঐ ভাষা বাজারের ভাষা বলিয়া উপেক্ষা করিলেন। আমার বাল্যকালে প্রাচীনেরা মাইকেলের পরে বাংলা ভাষায় আর কোনও কবির আবির্ভাব হইতে পারে বিশ্বাস করিতেন না। ইহার পর আবার অনেকে বলিতেন রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেহ কবিতা লিখিতে পারেন না। সুখের বিষয় এই সাহিত্যে এখন আর কোন এই ব্রাহ্মণের প্রতাপ নাই।

তবে জীবনানন্দ তাঁহার সাহিত্য জীবনের প্রথম দিকে নূতন কবি বলিয়া উপেক্ষিত হন নাই। শনিবারের চিঠিতে সজনীকান্ত দাস তাঁহাকে আক্রমণ করিতেন। কিন্তু সেই আক্রমণকে আমরা সমালোচনা বলিতে পারি না। রবীন্দ্রনাথ জীবনানন্দের কবিতা পড়িয়া তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন 'তোমার কবিত্ব শক্তি আছে'। আমি অনুমান করি এই কথাটি, রবীন্দ্রনাথ জীবনানন্দের প্রথম কাব্যগ্রন্থ ঝরা পালক (১৯২৭) পড়িয়াই লিখিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথ জীবনানন্দের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ ধূসর পাণ্ডুলিপি (১৯৩৬) পড়িয়া

কবিকে লিখিয়াছিলেন : 'তোমার কবিতাগুলি পড়ে খুশি হয়েছি। তোমার লেখায় রস আছে, স্বকীয়তা আছে এবং তাকিয়ে দেখার আনন্দ আছে।' এই ক্ষুদ্র চিঠিখানি পড়িয়া মনে হইয়াছে যে তিনি জীবনানন্দ সম্বন্ধে অল্পকথায় সকল কথাই বলিয়াছেন। এই কথা কয়টিকে আমরা জীবনানন্দ সমালোচনায় ব্রহ্মসূত্র বলিয়া মনে করিতে পারি। অনেক দীর্ঘ প্রশংসাসূচক সমালোচনা এই সূত্র কয়টির বিস্তৃতি ব্যাখ্যা। ইহার কিছু পূর্বে রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেব বসুকে লিখিত একখানি পত্রে বলিলেন : 'জীবনানন্দ দাশের চিত্ররূপময় কবিতাটি আমাকে আনন্দ দিয়েছে।' ইহাও লক্ষ্য করিতে হয় যে ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের কাব্য পরিচয় সংকলন গ্রন্থে জীবনানন্দের 'মৃত্যুর আগে' কবিতাটি স্থান পাইয়াছে। তাহা হইলে দেখিলাম সেকালের শেষ কবি সেকালের এক নবীন কবিকে সর্বান্তকরণে গ্রহণ করিলেন।

সেকালের বিশিষ্ট পত্র-পত্রিকায় জীবনানন্দের কবিতা ছাপা হইত। বুদ্ধদেব ছাড়া সেকালের বিশিষ্ট নবীন কবি অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত 'নীলিমা' কবিতাটি পড়িয়া লিখিলেন বাংলা কবিতায় জীবনানন্দ নতুন স্বাদ নিয়ে এসেছে, নতুন দ্যোতনা। নতুন মনন, নতুন চৈতন্য।' তবে মনে হয় সেকালের বঙ্গদেশে যাঁহারা elder poets ছিলেন অর্থাৎ কালিদাস রায়, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বলিলেন জীবনানন্দের 'বোধ' কবিতাটি 'আমাদের মত বহু পাঠকের কাছে একেবারে অবোধ্য'। এই মন্তব্য অবশ্যই গভীর বিচারের বিষয়। কারণ, যতীন্দ্রনাথ সুকবি এবং সজ্জন। আমার মনে হয়, 'বোধ' কবিতাটি তখন কোন কোন পাঠকের কাছে দুর্বোধ্য বলিয়া মনে হইয়াছে ইহার কারণ এই যে ইহা আমাদের নতুন কাব্যে এক নতুন ভাষায় এক নূতন ভাবের প্রকাশ। এই নূতনত্ব গ্রহণ করিতে আমাদের সময় লাগিয়াছে।

এখন প্রশ্ন হইল এই যে আমরা যে জীবনানন্দকে এক নূতন কাব্য জগতের স্রষ্টা বলিয়াছি সেই জগতের নূতনত্ব কোথায়? আর যাহা নূতন তাহা যদি আমরা না বুঝি তাহা হইলে এই নূতনত্বের মূল্য কোথায়? 'বোধ' কবিতাটি আমি পড়িয়াছি। অবশ্য যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত যখন পড়িয়াছিলেন তখন পড়ি নাই। অনেক পরে পড়িয়াছি। এই কবিতাটি আমার কাছে দুর্বোধ্য বলিয়া মনে হয় নাই। 'স্বপ্ন নয়, শান্তি নয় কোন এক বোধ কাজ করে মাথার ভিতরে'। এই অবস্থা কবির নিজের মনের অবস্থা, না তিনি এই

অবস্থাটি কল্পনা করিতেছেন, তাহা অবশ্য আমি বলিতে পারি না।

তবে ইহার মধ্যে কবির ব্যক্তিগত অনুভূতি না থাকিলে এই কবিতা এমন সার্থক হইত না। 'বোধ' শব্দের অর্থ কি? মনস্তত্ত্ববিদ্যায় আমার অধিকার নাই বলিয়া ইহা বিশ্লেষণ করিয়া পাঠককে বুঝাই, এমন সাধ্য আমার নাই। বাংলা ভাষায় 'বোধ' শব্দ এবং অনুভব শব্দ সমার্থক। চেতনা বলিতেও একই বস্তু বুঝায়। এখন প্রশ্ন হইল এই যে এই কবিতার 'বোধ' বলিতে কবি কি বুঝাইতে চাহিতেছেন? হৃদয়ের মাঝে এক বোধ জন্ম লয়' এবং কবি এই 'বোধ' এড়াইতে পারেন না। ইহা আনন্দের বোধ নহে। তাহা হইলে ইহা কিসের বোধ? এই প্রশ্নের উত্তর-কবিই দিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, 'শূন্য মনে হয়। শূন্য মনে-হয়'। ইহা শূন্যতার বোধ। কিছু না পাইবার বোধ। কিছু না হইবার বোধ। ইহার কোন স্বাদ নাই, ইহাতে প্রাণের আহ্লাদ নাই, ইহার কোন গন্ধ নাই। অথচ ইহা মাথার মধ্যে কাজ করিতেছে। এই বোধ যেন এক বোধশূন্যতা, ভাবের অভাব। সকল ভাবের-উৎস মানুষের হৃদয়। সেই হৃদয়কে কবি ডাকিয়া বলিতেছেন: 'সে কেন জলের মত ঘুরে ঘুরে একা কথা কয়?' সেই কথা একাকিত্বের কথা। তাহার মধ্যে কোন স্বাদ-আহ্লাদ নাই। এই বোধ মনুষ্য জীবনে বিরল নহে। এখন প্রশ্ন হইল যে এই বোধ লইয়া কাব্য হইতে পারে কিনা?

এই বোধ যে কাব্য সৃষ্টি করিতে পারে তাহার প্রমাণ এই কবিতাটি। কবি পৃথিবীর পথ ছাড়িয়া নক্ষত্রের পথে চলিতে চাহেন না; তিনি মানুষের মুখই দেখিতে চাহিতেছেন। কিন্তু সেই মুখ কোথায়? তিনি দেখিতেছেন:

নষ্ট শসা-পচা চালকুমড়ার ছাঁচে,
যে-সব হৃদয়ে ফলিয়াছে
—সেই সব।

এই কবিতাটি পড়িয়া যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত লিখিয়াছেন 'কবিতাটি মোটেই Sincere নয়—'বোধ' কবিতা যে 'most like জীবনানন্দ হয়েও আমাদের মত বহু পাঠকের কাছে একেবারে অবোধ্য একথা সত্য'। আমি কবি যতীন্দ্র-নাথের মন্তব্যগুলি যত্ন করিয়া পড়িয়াছি। আমার মনে হইয়াছে তাহার মতে কবিতাটি দুর্বোধ্য নহে, ইহা ভাবে ভাষায় অপাংক্তেয়। তিনি লিখিয়াছেন, 'কুব্জ গলগণ্ড নষ্ট শসা-পচা চালকুমড়ার' আড়ম্বরের মধ্যে ভাষার শ্বাসরোধ হ'য়ে এসেছে।' গলগণ্ড নষ্ট শসা কথাটির মধ্যে ভাষার শ্বাসরোধ

হইয়াছে এমন কথা আমার মনে হয় নাই। বরং মনে হইয়াছে এই ভাষা কবির ভাবকে অথবা বলিতে পারি বোধটিকে সার্থকভাবে প্রকাশ করিয়াছে। হ্যামলেট মনুষ্য-জীবনের অর্থহীনতা উপলব্ধি করিয়া যদি তাহাকে Quintessence of dust না বলিয়া a rotten pear বলিতেন তাহা হইলে আমি Shakespeare-কে অকবি বলিতাম না। জীবনানন্দ তাঁহার একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছেন: 'এমন কি অনিশ্চয়তা ও অবিশ্বাসও—বিশেষ কবির হাতে শিল্পের সিদ্ধি লাভ করতে পারে বলে।' Coleridge তাঁহার একটি কবিতায় বলিয়াছেন যে তাঁহার মনের মনমরা ভাব প্রকাশ করিবার তিনি কোন ভাষা পাইতেছেন না:

A grief without a pang, void, dark and dear
A stifled, drowsy, unimpassioned grief,
Which finds no natural outlet, no reliet,
In word, or sigh, or tear—
O Lady ! in this wan and heartless mood."

জীবনানন্দ সেই ভাষা খুঁজিয়া পাইয়াছেন; আমি অনুমান করি যতীন্দ্রনাথ কবিতাটিকে দুর্বোধ্য আখ্যা দিয়া বলিতে চাহিতেছেন যে ইহার মধ্যে কাব্য-প্রেরণার অভাব রহিয়াছে। এমনও হইতে পারে যে তিনি জীবনানন্দের দুর্বোধ্যতার কথা লিখিতে যাইয়া Byron এর একটি উক্তি স্মরণ করিয়াছেন:

yet still obscurity's a welcome guest.
If inspiration should her aid refuse.

জীবনানন্দের গভীর প্রেরণার সার্থক প্রকাশ এই নষ্ট শসা কথাটির মধ্যে পাইলাম। ইংরাজ কবি তাঁহার অন্তরের বেদনাকে বুঝাইতে যাইয়া বলিয়াছেন, 'A drowsy numbness pains my sense'। তাঁহার মনে হইয়াছে তিনি যেন বিষ পান করিয়াছেন। কিন্তু ইহার পরক্ষণেই আকাশে নাইটিঙ্গেল পাখীকে উড়িতে দেখিয়া তাঁহার পুনর্জন্মের অনুভূতি হইল। এই কবিতায় জীবনানন্দের পুনর্জন্মের অনুভূতি হইল না। বরং মনে হইল প্রকৃতির মধ্যে পচ ধরিয়াছে। এই ভাবের সার্থক প্রকাশ এই কবিতাটিতে।

'ধূসর পাণ্ডুলিপি' কাব্যগ্রন্থের আরও কয়েকটি কবিতায় এই ধূসর মনোভাবের প্রকাশ দেখিতে পাই।

এখানে নাহিকো কাজ—উৎসাহের ব্যথা নাই উদ্যমের নাহিকো ভাবনা ;
এখানে ফুরায়ে গেছে মাথায় অনেক উত্তেজনা।
অলস মাছির শব্দে ভরে থাকে সকালের বিষণ্ণ সময়।
পৃথিবীরে মায়াবীর নদীর পারের দেশ বলে মনে হয়।'

... ...

এখানে চকিত হতে হবে নাকো—ত্রস্ত হয়ে পড়িবার নাহিকো সময় ;
উদ্যমের ব্যথা নাই এইখানে নাই আর উৎসাহের ভয়।
এইখানে কাজ এসে জমে নাকো হাতে,
মাথায় চিন্তার ব্যথা হয় না জমাতে।
এখানে সৌন্দর্য এসে ধরিবে না হাত আর—
রাখিবেনা চোখ আর নয়নের 'পর ;
ভালোবাসা আসিবে না—
জীবন্ত কৃমির কাজ এখানে ফুরায়ে গেছে মাথার ভিতর।

কিন্তু এই ধূসর ভাবই 'ধূসর পাণ্ডুলিপির' একমাত্র ভাব নহে। জীবনানন্দ দাশ জীবন-বিমুখ কবি নহেন। তিনি একান্তভাবে জীবনমুখী কবি। এই জীবনের ইতিহাস কবি উপলব্ধি করিয়াছেন। তাঁহার জীবনবোধে অতীত বর্তমানের সঙ্গে একাকার হইয়া এক ভবিষ্যতের দিকে চলিয়াছে। এই গ্রন্থে 'জীবন' নামেই একটি কবিতা রহিয়াছে। সেই কবিতার প্রথম স্তবক এরূপ।

চারিদিকে বেজে ওঠে অন্ধকার সমুদ্রের স্বর,—
নতুন রাত্রির সাথে পৃথিবীর বিবাহের গান।
ফসল উঠিছে ফ'লে,—রসে রসে ভরেছে শিকড় ;
লক্ষ-নক্ষত্রের সাথে কথা কয় পৃথিবীর প্রাণ।
সে কোন প্রথম ভোরে পৃথিবীতে ছিল যে সন্তান
অঙ্কুরের মতো আজ জেগেছে সে জীবনের বেগে।
আমার দেহের গন্ধে তাই তার শরীরের ঘ্রাণ,—
সিন্ধুর ফেনার গন্ধ আমার শরীরে আছে লেগে।
পৃথিবী রয়েছে জেগে চক্ষু মেলে,—তার সাথে সে-ও আছে জেগে।

জীবনানন্দের কবিতা বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে পড়িতে হয়। দেখিতে

হইবে তাঁহার প্রত্যেকটি কথা যেন আমাদের কানে বাজিয়া ওঠে এবং তাহা আমাদের কানের ভিতর দিয়া আমাদের মর্মে প্রবেশ করে। এই স্তবকে আমি 'নতুন রাত্রি' কথাটি বুঝিয়া লইতে চাহিতেছি। আমরা নতুন প্রভাতের কথা শুনিয়াছি। নজরুল ইসলাম রাঙা প্রভাতের কথা বলিয়াছেন। কিন্তু এই নতুন রাত্রির কথা বোধহয় এই প্রথম শুনিলাম। ১৯১৮ সালে জার্মান দার্শনিক Oswald Spengler তাঁহার 'Decline of the West' গ্রন্থে লিখিলেন পাশ্চাত্য সভ্যতার রাত্রি ঘনাইয়া আসিতেছে। বিনয়কুমার সরকার এই গ্রন্থখানি পড়িয়া দেখিলেন : If winter comes can spring be far behind', অর্থাৎ বিনয় কুমার বলিতে চাহিলেন এই রাত্রির পর দিন আসিবে।

এই 'জীবন' কবিতাটি আমরা বিশেষ করিয়া পড়িতে পারি, কারণ কবিতাটির নাম 'জীবন'। অনুমান করিতে পারি জীবন সম্বন্ধে কবির বিচিত্র অনুভূতি এই কবিতায় প্রকাশ পাইয়াছে। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' কাব্য-গ্রন্থে সতেরটি কবিতার মধ্যে এইটি দীর্ঘতম। কবিতাটিতে ৩৪টি স্তবক এবং প্রত্যেকটি স্তবকে ৯টি লাইন। মোট ৩০৬ লাইনের কবিতা। কবির সাতটি কাব্যগ্রন্থে সন্নিবিষ্ট প্রায় আড়াইশত কবিতার মধ্যে এটি দীর্ঘতম কবিতা। এই কবিতাটির সকল ভাব, সকল কথা বুঝিতে পারিলে জীবনা-নন্দের কাব্যের মূল সুরটি হয়তো ধরিতে পারিব। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' গ্রন্থের প্রথম কবিতায় জীবনানন্দ বলিয়াছেন 'জীবন অগাধ'। এই জীবন কবিতায় তিনি শুনিতেছেন 'সমুদ্রের স্বর'। সমুদ্রও অগাধ। আকাশও যেন সীমাহীন। গ্রন্থের প্রথম কবিতায় তিনি লিখিয়াছেন : 'আকাশ ছড়ায়ে আছে নীল হয়ে আকাশে 'আকাশে'। তবে 'জীবন' কবিতাটিতে জীবনের জয়ের কথা শুনিব এমন বলিতে পারিনা। ইংরাজ কবি তাঁহার একটি দীর্ঘ কবিতার নাম দিয়াছিলেন 'The Triumph for Life'। জীবনানন্দের কবিতাটির নাম শুধু 'জীবন'। কিন্তু কবিতাটিতে একটা পূর্ণতার আভাস পাইতেছি। 'রসে রসে ভরিছে শিকড়'। খালি ইহাই নহে কবিতাটিতে যেন এই পৃথিবী মহাকালের সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে। অনুমান করিতে পারি যদিও কবি দর্শনের কোন তত্ত্ব অনুসারে একটি লাইন লিখেন নাই, তিনি এক ভূমার আভাস দিতেছেন। কবি যে 'নতুন রাত্রি' কথা দিয়া কবিতা আরম্ভ করিয়াছেন সেই রাত্রি ঠিক অমানিশা নহে। অন্তত পক্ষে সেই রাত্রি

প্রাণচঞ্চল। পৃথিবীর প্রথম প্রভাতের সন্তান 'অঙ্কুরের মত আজ জেগেছে সে জীবনের বেগে'। আদিমকাল যেন একালের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। এই প্রাণকে সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়া গ্রহণ করা যায়। 'আমার দেহের গন্ধে পাই তার শরীরের ঘ্রাণ। সিন্ধুর ফেনার গন্ধ আমার শরীরে আছে লেগে'। দেহ এবং মনের এই অন্বয় জীবনানন্দের কবিতার একটি বৈশিষ্ট্য। দেখিতেছি এই রাত্রির যেন অনন্ত মাহাত্ম্য। নক্ষত্র খচিত নৈশ আকাশ সমুদ্রের সঙ্গে মিশিয়াছে। আকাশ, মাটি, জল যেন একাকার হইয়া একটি নারীর মধ্যে মূর্ত হইয়া উঠিতেছে। পৃথিবীর নদী, মাঠ, বন এই রাত্রির মধ্যে যেন এক নূতন জীবন লাভ করিয়াছে। রাত্রির সঙ্গে পৃথিবীর পরিণয়; 'সমুদ্রের কলস্বর সেই পরিণয় সঙ্গী। এখানে দেখিতেছি কবির কল্পনা এক নূতন মিথের সৃষ্টি করিতেছে। একটি স্তবকের মধ্যে যেন একটি কাহিনীর সৃষ্টি হইয়াছে। কবির জীবন কথা যেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কথা হইয়া উঠিতেছে।

কিন্তু এই পূর্ণতার ভাবের মধ্যে আবার দেখি ক্ষয়ের কথাও আসিয়া পড়িতেছে। 'যে পাতা সবুজ ছিল তবুও হলুদ হতে হয়।' এবং বোধহয় এই ক্ষয়ের দুঃখ এড়াইতে কবি একজন 'তুমি' সৃষ্টি করিতেছেন। এই 'তুমি' পরে একটি কবিতায় 'বনলতা সেন' হইয়াছে। কিন্তু এই 'তুমি, বা 'সে' চিরকালের 'তুমি' বা 'সে' নয়। যে স্নিগ্ধ সান্নিধ্য মানুষকে শান্তি দিতে পারে তাহা বড় দুর্লভ। 'তবুও দুজন কই ব'সে থাকে হাতে হাত ধ'রে; / তবুও' দুজন কই কে কাহারে রাখে কোলে করে!' এই বিরহের ভাবকে আমরা রোমান্টিক ভাব বলিয়া থাকি। কিন্তু এই ভাবটি জীবনানন্দ এক নতুন ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন, এবং ভাষা যখন নূতন ভাবও নিশ্চয় নূতন। 'শরীর রয়েছে, তবু মরে গেছে আমাদের মন / হেমন্ত আসেনি মাঠে,—হলুদ পাতার ভরে হৃদয়ের বন!' দেখিতেছি পূর্ণতার ভাবের পরেই অপূর্ণতার ভাব আসিতেছে। এই ভাবই সত্য। জীবনানন্দের নূতন কাব্যের এইখানেই নূতনত্ব। তিনি বিচিত্র ভাবের কবি। সেই বৈচিত্র্যের মধ্যে তিনি কোন ঐক্য আনিবার চেষ্টা করেন না। এই কবিতায় একস্থানে তিনি বলিতেছেন: 'আমাদের রক্তের ভিতর বরফের মত শীত,—আগুনের মত তবু জ্বর।'

আবার পরের স্তবকেই তিনি লিখিলেন:

নতুন বীজের গন্ধে ভরে দেয় আমাদের মন

এই শক্তি,—একদিন হয়তো বা ফলিবে ফসল।
এরি জোরে একদিন হয়তো বা হৃদয়ের বন
আহ্লাদে ফেলিবে ভরে অলক্ষিত আকাশের তল।

পাঠক বলিবেন এইরূপ বিরুদ্ধ ভাবের প্রকাশে কাব্যের অখণ্ডতা ক্ষুন্ন হয়। কিন্তু আমি বলি ভাবের সত্যই কাব্যের সত্য। কবি কয়েকটি কথায় তাঁহার আশা-নিরাশায় স্বরূপটি বুঝাইয়া দিয়াছেন ;

'যে আলো নিভিয়া গেছে তাহার ধোঁয়ার মত প্রাণ আছে জেগে।'

এবং ভস্মের মধ্যেই যে নূতন জীবনের প্রতিশ্রুতি রহিয়াছে সে কথা জীবনানন্দ এই কবিতায় এবং অন্য অনেক কবিতায় প্রকাশ করিয়াছেন :

নক্ষত্র জেনেছে কবে ওই অর্থ শৃঙ্খলার ভাষা।
বীণার তারের মত উঠিতেছে বাজিয়া আকাশে
তাদের গতির ছন্দ,—অবিরত শক্তির পিপাসা
তাহাদের—তবু সব তৃপ্ত হয়ে পূর্ণ হয়ে আসে।
আমাদের কাজ চলে ইশারায়—আভাসে—আভাসে।
আরম্ভ হয় না কিছু,—সমস্তের তবু শেষ হয়,—
কীট যে-ব্যর্থতা জানে পৃথিবীর ধুলো মাটি দাগে
তারো বড় ব্যর্থতার সাথে রোজ হয় পরিচয়।
যা হয়েছে শেষ হয়,—শেষ হয় কোনোদিন যা হবার নয়।

জীবনানন্দের কবিতার যেকোন অংশ সমস্ত কবিতাটির অর্থ প্রকাশ করে। আবার ইহাও বলিতে পারি জীবনানন্দের যেকোন কবিতার ভাব তাঁহার সকল কবিতায় ভাবের মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে। অথচ কোন কবিতাই কোন কবিতার প্রতিধ্বনি নহে। এখন এই স্তবকটির অর্থ খুঁজিবার চেষ্টা করিতে পারি। এই কবির কিছু সমালোচনায় দেখিয়াছি সমালোচক ফরাসী কবিদের বা ইংরাজ কবি ব্লেক বা ইয়েটসের লাইন উদ্ধৃত করিয়া কবির কথা বুঝাইয়াছেন। সমালোচনার এই রীতি অবশ্যই অগ্রাহ্য করিতে পারিনা। ইংরাজি সাহিত্যে বা বিশ্বসাহিত্যে আমার বড় প্রবেশ নাই বলিয়া আমি জীবনানন্দকে জীবনানন্দ দিয়াই বুঝিতে চেষ্টা করি। তিনি কাব্য সম্বন্ধে কিছু মূল্যবান কথা তাঁহার কয়েকটি প্রবন্ধে উপস্থিত করিয়াছেন। এই প্রবন্ধগুলি 'কবিতার কথা' নামক গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট। এই গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধটি 'কবিতার কথা' জীবনানন্দের কাব্যের এক উত্তম ভূমিকা। এই

প্রবন্ধে তিনি কাব্যের উপাদান বলিতে তিনটি বস্তুর উল্লেখ করিয়াছেন—কল্পনা, চিন্তা এবং অভিজ্ঞতা। একটি কবিতার সারবত্তা এই তিনের সংমিশ্রণ বা সমন্বয়ের সৃষ্টি, কল্পনা অবশ্য কাব্যের প্রধান উপজীব্য। ইংরাজিতে আমরা ইহাকে imagination বলি। কিন্তু কবি বলিতেছেন এই imagination-ই কাব্যের একমাত্র উপাদান নহে। তিনি চিন্তার কথাও বলিয়াছেন। চিন্তাকে ইংরাজিতে আমরা reason বলি। কল্পনার আবেশে কবি যাহা দেখেন তাহা তিনি চিন্তার সাহায্যে গুছাইয়া লন। দর্শনের মধ্যেও এই কল্পনা এবং চিন্তা দুই-ই ক্রিয়াশীল। Russell তাঁহার 'Mysticism and Logic' প্রবন্ধে বলিয়াছেন কল্পনা বা imagination or intuition creative আর চিন্তা বা reason constructive। কবির মনে যাহা ঝলসিয়া উঠিবে তাহাকে চিন্তার সাহায্যে অর্থপূর্ণ করিয়া তুলিতে হইবে। এই কল্পনা ও চিন্তা ছাড়া জীবনানন্দ একটি তৃতীয় বস্তুর কথা বলিয়াছেন। সেই বস্তুটি অভিজ্ঞতা, ইংরাজিতে যাহাকে experience বলিতে পারি। এখন প্রশ্ন এই যে কাব্য সৃষ্টিতে এই অভিজ্ঞতার স্থান কোথায়? কাব্য অভিজ্ঞতা বা অনুভূতির প্রকাশ। জীবনানন্দ যেন বলিতে চাহিতেছেন যে কবির অনুভূতি কল্পনা ও চিন্তার সৃষ্টি। কল্পনা যখন চিন্তার মেরুদণ্ডে আশ্রয় পায় তখনই সার্থক অনুভূতির সৃষ্টি হয়। কল্পনা ও চিন্তা একত্র হইয়া অনুভূতির গভীরতা এবং প্রসার সম্পন্ন করে। কবি প্রতিভার বা মনীষার এই তিনটি উপাদান, কল্পনা, চিন্তা ও অভিজ্ঞতা লইয়াই কবির inspiration বা প্রেরণা। সংস্কৃত অলঙ্কারের কতকগুলি মূল তত্ত্ব লইয়া জীবনানন্দের এই কথাগুলি বুঝান যাইতে পারে। আমি সেই চেষ্টা করিতেছিনা। আমি জীবনানন্দকেই এ বিষয়ে আমার আচার্য রূপে গ্রহণ করিতে পারি। কাব্য সম্বন্ধে তাঁহার কথাগুলি আমি মন্ত্র বলিয়া ধরিতে পারি। তিনি এই প্রবন্ধে লিখিয়াছেন 'কাব্যে কল্পনার ভিতর—চিন্তা—ও অভিজ্ঞতার সারবত্তা থাকবে'। জীবনানন্দের poetics এর এইটিই মূল কথা। এখন জিজ্ঞাসা করতে পারি যে এই তিনটি বস্তুর সমন্বয়ে যে কাব্য জগতের সৃষ্টি হয় তাহার স্বরূপ কি? এই প্রশ্নের উত্তরে জীবনানন্দ এই প্রবন্ধেই দিয়াছেন: 'পৃথিবীর সমস্ত জল ছেড়ে দিয়ে যদি এক নতুন জলের কল্পনা করা যায়, কিংবা পৃথিবীর সমস্ত দীপ ছেড়ে দিয়ে এক নতুন প্রদীপের কল্পনা করা যায়—তা হলে পৃথিবীর এই দিন, রাত্রি,

মানুষ ও তার আকাঙ্খা এবং সৃষ্টির সমস্ত ধুলো, সমস্ত কঙ্কাল ও সমস্ত নক্ষত্রকে ছেড়ে দিয়ে এক নতুন ব্যবহারের কল্পনা করা যেতে পারে যা কাব্য ; —অথচ জীবনের সঙ্গে যার গোপনীয় সুড়ঙ্গ লালিত সম্পূর্ণ সম্বন্ধ'। ষাট বৎসরেরও অধিককাল আগে ইংরাজি সাহিত্যের ছাত্র ছিলাম। কবিতার প্রকৃতি সম্বন্ধে Wordsworth-এর কিছু প্রবন্ধ এবং Coleridge-এর বৃহৎ গ্রন্থ 'Biographia Literaria' পড়িয়াছিলাম। কাব্য সম্বন্ধে তাঁহাদের কোন কথা যেন এমন কাব্যময় হইয়া ওঠে নাই। অথচ তাঁহারাও তাঁহাদের ভাষায়, জীবনানন্দের কথাই বলিয়াছেন।

'জীবন' নামক কবিতা হইতে যে স্তবকটি উদ্ধৃত করিয়াছি এখন তাহা জীবনানন্দের কাব্যতত্ত্ব নিরিখে বুঝিবার চেষ্টা করিতে পারি। এই স্তবকে কোন বস্তু কল্পনাপ্রসূত ? জীবনানন্দের কল্পনায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বস্তু যেন পরস্পর সম্পৃক্ত। আকাশ, চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র, পৃথিবী, পাহাড়, পর্ব্বত, সমুদ্র, নদ-নদী, বৃক্ষ, লতাগুল্ম, সমস্ত প্রাণিজগত, এই ভুবনে মানুষের ভাবনা, চিন্তা, আশা, নিরাশা, আনন্দ, নিরানন্দ, সব কিছুই যেন একত্র হইয়া আছে। ইহার অর্থ যেন ইহাদের কাছে স্পষ্ট 'নক্ষত্র জেনেছে কবে অই অর্থ শৃঙ্খলার ভাষা।' এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে একটি অর্থ শৃঙ্খলা অবশ্যই আছে। সেই অর্থ যেন গ্রীক দার্শনিক কথিত music of the spheres-এ পরিণত হইয়াছে। 'বীণার তারের মত উঠিতেছে বাজিয়া আকাশে' জীবনের যে অর্থ রহিয়াছে তাহা কান পাতিয়া শুনিতে হইবে। আকাশে প্রতি তারার মধ্যে সেই অর্থ বাজিয়া উঠিতেছে। এই স্তবকের দ্বিতীয় কথা শক্তির পিপাসা—lust for life। নক্ষত্রের গান অবশ্যই আছে। কিন্তু এই শক্তির পিপাসাকে কিভাবে মিটাইব ? কবির কথা এই পিপাসা আমাদের অস্থির করেনা। বরং ইহা তৃপ্ত হইয়া আমাদের এক পূর্ণতার আশ্বাস দেয়। কিন্তু কবি এখানে আমাদের উপনিষদের পূর্ণতার বাণী শুনাইলেন না। 'আমাদের কাল চলে ইশারায় আভাসে আভাসে।' কোন পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী হইয়া আমরা কোন মুক্তি লাভ করিনা। আমাদের ক্ষুদ্র ব্যর্থতা যেন এক বড় ব্যর্থতার সংবাদ পাইয়া শান্ত হয়। মানুষ এক প্রভাতের ইশারায় কোন এক অনুমেয় উষ্ণ অনুরাগে পথ চলিতে থাকে। এই গতির মধ্যে আমরা যাহা আরম্ভ করিয়াছি তাহা শেষ হইয়া যায় এবং যাহা কোনদিন ভাবি নাই তাহা আসিয়া পরে। অর্থাৎ মানুষের

জীবনে একটা অনিশ্চয়তা থাকিয়াই যায়, কিন্তু এই অনিশ্চয়তার মধ্যে সৌন্দর্য্য কোথায়, আনন্দ কোথায়? সৌন্দর্য্য ইহার মধ্যেই খুঁজিতে হইবে, আনন্দ ইহার মধ্যেই পাইতে হইবে। বঙ্গদেশের শাক্তসাধক শ্মশানের ভস্মে মাতৃমূর্তি কল্পনা করেন। জীবনকে দেখিতে হইলে, মৃত্যুকেও দেখিতে হইবে। তবু বলি, জীবনানন্দ মৃত্যুর কবি নন, Waste land-এর কবি নন। তাঁহার কাব্যকে মৃত্যু বা অন্ধকারের কাব্য বলিতে পারিনা। তিনি বলিয়াছেন 'কবিতা সৃষ্টি করে কবির বিবেক সান্ত্বনা পায়, তার কল্পনা-মনীষা শান্তি বোধ করে, পাঠকের imagination তৃপ্তি পায়।' কবি বলিলেন না যে পাঠক তৃপ্তি পায়। তিনি বলিলেন 'পাঠকের imagination তৃপ্তি পায়'। কবির জগৎ এক নতুন জগৎ। কবির পক্ষে সেই জগৎ এক সুন্দর জগৎ। এই জগৎ এক waste land নহে। এখানে আমরা ইংরাজ কবির 'Waste land' কবিতাটির সম্বন্ধে জীবনানন্দের উক্তিটি স্মরণ করিতে পারি: 'আধুনিকদের একটা বিশিষ্ট পক্ষ, এবং অল্পাধিকভাবে সকলেই মনে করল সমগ্র পৃথিবীর বর্তমান যুগের 'ওয়েস্ট ল্যান্ড'-এর সুর এলিয়ট-এর মতো কে আর ব্যক্ত করতে পেরেছে? কিন্তু কাব্যকে যদি 'ওয়েস্ট ল্যান্ড'-এর যুগের প্রতিবিম্ব হিসেবে গ্রহণ করতে হয় এই শুধু, এর চেয়ে বেশি কিছু নয়—তাহলে এলিয়ট-এর কাব্য সেরকম বিম্বন বটে—সর্বসংস্কার মুক্ত হয়ে। বিশেষ সময় চিহ্নের ছাপ তার উপর এমন জাজ্বল্যমান যে তা আজ না হোক, কাল অন্তত ফিকে হয়ে যাবে।' Waste land-এ ফসল নাই। জীবনানন্দের কাব্যে মানবজীবন এক পতিত জমি এমন কথা কেহ বলিবেনা। তাঁহার কথা:

> জীবন, আমার চোখে মুখ তুমি দেখেছ তোমার—
> একটি পাতার মতো অন্ধকারে পাতা-ঝরা গাছে—
> একটি বোঁটার মতো যে ফুল ঝরিয়া গেছে তার—
> একাকী তারার মতো, সব তারা আকাশের কাছে
> যখন মুছিয়া গেছে—পৃথিবীতে আলো আসিয়াছে—
> যে ভালোবেসেছে, তার হৃদয়ের ব্যথার মতন—
> কাল যাহা থাকিবেনা—আজই যাহা স্মৃতি হয়ে আছে—
> দিন-রাত্রি—আমাদের পৃথিবীর জীবন তেমন।
> সন্ধ্যার মেঘের মতো মুহূর্তের রঙ লয়ে মুহূর্তে নূতন।

আমি পাঠককে এই স্তবকের শেষ লাইনটি লক্ষ্য করিতে বলিতেছি।

'সন্ধ্যার মেঘের মতো মুহূর্তের রঙ লয়ে মুহূর্তে নূতন'।

এই সন্ধ্যা অন্ধকার সন্ধ্যা নহে। এই সন্ধ্যার মেঘের রঙ এক নূতন রঙ। তাই বলিতেছি জীবনানন্দ অন্ধকারের কবি নহেন। কথাটি এইজন্য বলিতেছি যে আমাদের এক শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-পণ্ডিত লিখিয়াছেন যে 'রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি যেখানে পড়ে, সেখানে আলোর সৌন্দর্য্য, জীবনানন্দের দৃষ্টিরতি অন্ধকারে কুৎসিতে'। এই সমালোচকের কথা হইল এই যে জীবনানন্দ রবীন্দ্রনাথের কাব্যকে এড়াইয়া এক নূতন কাব্যের সৃষ্টি করিতে যাইয়া এক অন্ধকারের কবি হইয়া উঠিয়াছেন। এই রকম ভাব লইয়া জীবনানন্দ একটি কবিতাও লিখেন নাই। রবীন্দ্রনাথের কাব্য সম্বন্ধে জীবনানন্দের অভিমত এইখানে স্মরণ করিতে পারি। তিনি লিখিয়াছেন 'বৈষ্ণব যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত আমাদের কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ।' 'কবিতা লিখিতে যাইয়া আমি আবার রবীন্দ্রনাথের মত না হইয়া যাই' এই ভয় তাহার নাই। তবে তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে 'আধুনিকদের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অমিল' থাকিতেই পারে, এবং ইহার পর আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে 'দৃষ্টিভঙ্গির এই ব্যতিরেকী গতির জন্যে আধুনিক বাংলা কবিতা চিন্তা ও ভাবনা শুরু করেছে।' কিন্তু পৃথকত্ব প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য জীবনানন্দ একটি লাইনও লিখেন নাই।

জীবনানন্দ অন্ধকারের কবি নয়, মৃত্যুর কবি নয়, নিরাশার কবি নয়। তাহা হইলে তিনি কিসের কবি? তাঁহার কাব্যের মূল সুরটি কোথায়? আমি মনে করি কোন কবির রচনায় মূল সুর অনুসন্ধান করিবার চেষ্টা অর্থহীন। মহৎ কবির কাব্যে নানা সুর বিচিত্র সুরে। সেই বহুত্বকে একত্রে পরিণত করিতে যাইয়া আমরা এই মহাসঙ্গীতের সৌন্দর্য্যকে হারাইব। সেক্সপীয়র সম্বন্ধে জীবনানন্দ যাহা বলিয়াছেন, জীবনানন্দ সম্বন্ধেও আমরা তাহা বলিতে পারি।

'মানব চরিত্র ও মানুষের প্রদেশ সম্বন্ধে নানারকম অর্থ ও প্রভূত সত্যের ইঙ্গিত পাওয়া গেল কাব্যের সমুদ্র জীবনের গভীরে গভীরে মুক্তার মত, কিম্বা কাব্যের আকাশের ওপারে আকাশে স্বাদিত, অনাস্বাদিত নক্ষত্রের মত সব খুঁজে পাওয়া গেল যেন।' এককালে ইংরাজি সাহিত্যের ছাত্র হিসাবে শেক্সপিয়র সম্বন্ধে নানা সমালোচনা গ্রন্থ ও প্রবন্ধ পড়িতে হইয়াছিল। ইংরাজ কবির

কাব্য সম্বন্ধে এমন একটি সুন্দর, গভীর, উজ্জ্বল উক্তি পড়িয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। এখন প্রশ্ন হল এই যে জীবনানন্দের কাব্য রবীন্দ্র কাব্যের প্রতিধ্বনি নহে, সেই কাব্য জগৎ এক অভিনব জগৎ। এই কথার সার্থকতা কোথায়? অর্থাৎ জীবনানন্দের কাব্যের অভিনবত্ব কোথায়? এই প্রশ্নের উত্তরে আমার প্রথম কথা এই যে প্রকৃতির কবি বলিতে আমরা যাহা বুঝি জীবনানন্দ সেই অর্থে প্রকৃতির কবি নহেন। জীবনানন্দ প্রকৃতি-দর্শক নহেন, তিনি প্রকৃতির স্রষ্ঠা। সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে তিনি যেন নির্মাণ করিয়া লইতেছেন। এই কথা রোমান্টিক কবিদের সম্বন্ধেও বলা হইয়া থাকে। ইংরাজ কবির নাইটিঙ্গেল সাধারণ মানুষের নাইটিঙ্গেল নহে। সেই নাইটিঙ্গেল কবির সৃষ্ট নাইটিঙ্গেল। কিন্তু জীবনানন্দের প্রকৃতি এক বিশেষ অর্থে তাঁহার সৃষ্ট প্রকৃতি। এই প্রকৃতির গতি, বর্ণ, শব্দ, গন্ধ জীবনানন্দের কাব্যে এক অখণ্ড অভিনব বস্তু হইয়া উঠিয়াছে এবং মানুষের অবস্থা, অনুভূতি, চিন্তার সঙ্গে এই প্রকৃতির সম্পর্ক যেমন নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে তেমন বোধহয় অন্য কোন কাব্যে ঠিক দেখি নাই। রবীন্দ্রনাথও বলিয়াছেন যে জীবনকে আকাশের প্রতি তারা ডাকিতেছে। রবীন্দ্রনাথেও মানুষের ভাব ও প্রকৃতির ভাব একাকার হইয়া গিয়াছে। জীবনানন্দে যাহা নূতন তাহা হইল এই যে তাঁহার কাব্যে প্রকৃতির বিভিন্ন বস্তু যেন বিশেষভাবে তাহাদের অস্তিত্ব প্রকাশ করিতেছে এবং সেই প্রকাশের মধ্যে মানুষের ভাব-জীবনও স্ফূর্ত হইয়া উঠিতেছে। জীবনানন্দের জীবন-দর্শন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড-দর্শন। জীবনানন্দ তাঁহার একটি প্রবন্ধে 'বিশুদ্ধ জগৎ-সৃষ্টির' কথা বলিয়াছেন। এই জগৎ-সৃষ্টিকেই তিনি কবিজীবন বলিয়াছেন। জীবনানন্দের কবিতা পড়িয়া আমাদের যে আনন্দ তাহা এই জগতের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হইবার আনন্দ। জীবনানন্দ এই বিষয়ে লিখিয়াছেন। 'সৎ কবিতার স্পর্শে এসে আমার নিহিত অভিজ্ঞতায় একটা আশ্চর্য্য পুনরুত্থান ঘটলো এরকম ভাবে।' এই আনন্দের উৎস কোথায়? জীবনানন্দ এই প্রশ্নের উত্তর তিনটি কথায় দিয়াছেন: 'সঙ্গতি সাধনের স্বস্তি-লাভ' (এই কথাটি জীবনানন্দ অন্য ভাষায় বলিয়াছেন 'নীহারিকা যেমন নক্ষত্রের আকার গ্রহণ করিতে থাকে, তেমনিই বস্তুসঙ্গতিই প্রসব হতে থাকে হৃদয়ের ভিতরে।' এই কল্পনাতেই জীবনানন্দের কাব্যের সঙ্গী; তিনি যেন সব কিছুকেই সবকিছুর সঙ্গে মিলাইয়া দিতেছেন। কাব্য সাধনা এই সঙ্গতির সাধনা। 'ধূসর

পান্ডুলিপি'র একটি কবিতায় পড়ি :

অন্ধকার—নিস্সাড়তার
　　মাঝখানে
　　তুমি আনো প্রাণে
　　সমুদ্রের ভাষা,
　　রুধিরে পিপাসা,
　　যেতেছ জাগায়ে,
ছেঁড়া দেহে—ব্যথিত মনের ঘারে
　　ঝরিতেছে জলের মতন—
রাতের বাতাস তুমি—বাতাসের সিন্ধু—ঢেউ,
　　তোমার মতন কেউ
　　নাই আর।

এই সঙ্গীতির বিশ্বে কিছুই 'অসঙ্গত বা অবাঞ্ছনীয়' থাকিতে পারে না, মনে হয় ইহা বুঝিয়াই জীবনানন্দ লিখিয়াছেন 'এমন কি অনিশ্চয়তা ও অবিশ্বাস-ও—বিশেষ কবির হাতে শিল্পের সিদ্ধিলাভ করতে পারে।' জীবনানন্দের কতকগুলি কবিতা পড়িয়া মনে হইয়াছে যে তিনি বাঙ্গালীর শাক্তধর্মের ভীষণ মাতৃমূর্তি কল্পনায় এক নূতন ব্যক্তিগত শাক্তধর্ম গড়িয়া তুলিয়াছেন। 'ধূসর পান্ডুলিপি'র 'অনেক আকাশ' কবিতায় তিনি লিখিয়াছেন :

এখানে দেখেছি আমি জাগিয়াছ হে, তুমি ক্ষমতা,
সুন্দর মুখের চেয়ে তুমি আরো ভীষণ, সুন্দর।
ঝড়ের হাওয়ার চেয়ে আরো শক্তি, আরো ভীষণতা।
আমারে দিয়েছে ভয়। এইখানে পাহাড়ের 'পর
তুমি এসে বসিয়াছ—এইখানে অশান্ত সাগর
তোমারে এনেছে ডেকে হে ক্ষমতা, তোমার বেদনা
পাহাড়ের বনে বনে তুলিতেছে উত্তরের ঝড়
আকাশের চোখে-মুখে তুলিতেছে বিদ্যুতের ফণা.
তোমার স্ফুলিঙ্গ আমি, ওগো শক্তি—উল্লাসের মতন যন্ত্রণা।

এই 'অনেক আকাশ' কবিতাটিতে একটি পাখির কথা শুনিলাম। এই পাখি 'সন্ধ্যার আঁধার দিয়ে দিন তার ফেলেছে সে মুছে অবহেলে'। অর্থাৎ আমরা যেমন সূর্যালোকের সন্ধানী তেমন আবার 'সন্ধ্যার আঁধারের'

সন্ধানীও হইতে পারি। এই কবিতার শেষ স্তবকে পড়ি :

সমুদ্রের অন্ধকারে গহ্বরের ঘুম থেকে উঠে
দেখিবে জীবন তার খুলে গেছে পাখির ডিমের মত ফুটে।

এইখানে 'পাখির ডিমের মত ফুটে' উপমাটি এক ভাবগম্ভীর পরিবেশের মধ্যে একটু বিসদৃশ ঠেকিতে পারে। কিন্তু ইহাও জীবনানন্দের সঙ্গতি তত্ত্বের এক উদাহরণ। আকাশের নক্ষত্রের সঙ্গে পাখির ডিমের সঙ্গতি দেখাইতে হইবে। আবার ইহাও সত্য যে হঠাৎ এক নূতন জীবনের উৎসরণের কথা পাখির ডিম ফুটিবার উপমা দিয়া যেমন স্পষ্ট করা যাইবে তেমন অন্যভাবে স্পষ্ট করা যাইবে না।

এখন জীবনানন্দের দ্বিতীয় অভিনবত্বের কথা বলিতে পারি। তাঁহার প্রকৃতি তাঁহার এক নূতন সৃষ্টি। তাঁহার মানব জীবনও যেন এক নূতন সৃষ্টি। তাঁহার একটি প্রবন্ধে তিনি 'সময় ব্রহ্মে' শুদ্ধ-স্বরূপের কথা বলিয়াছেন। বাংলা সাহিত্যের যিনি যথার্থ পণ্ডিত তিনি বলিতে পারিবেন এই 'সময় ব্রহ্ম' কথাটি জীবনানন্দের পূর্বে আর কেহ ব্যবহার করিয়াছেন কিনা। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে 'মানব ব্রহ্ম' কথাটি পাইয়াছি। কথাটি গভীর অর্থপূর্ণ। কিন্তু 'সময় ব্রহ্ম' বস্তুটি কি? জীবনানন্দ প্রথম বয়সে তাঁহার পিতা সত্যানন্দ দাশ এবং প্রধান শিক্ষক জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কাছে গীতা উপনিষদের অনেক কথা শুনিয়াছেন। এক মেধাবী মানুষ হিসাবে তিনি সেই সব কথার অর্থও বুঝিয়াছেন। কিন্তু গীতা ও উপনিষদের কথা সাজাইয়া তিনি কবিতা রচনা করেন নাই। তবু দেখি তাঁহার জীবন দর্শনে বোধহয় তাঁহার অজ্ঞাতে বেদান্তের ভাব প্রবেশ করিয়াছে। এইখানে তিনি যেন রবীন্দ্রনাথের কাছাকাছি আসিয়া যান। তিনি একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে, একালের কবির পক্ষে 'সেই মহাকবিকে এড়িয়ে যাওয়া দুঃসাধ্য' জীবনানন্দ রবীন্দ্রনাথকে এড়াইয়া যাইবার কোন চেষ্টাই করেন নাই। কিন্তু তাঁহার কাব্যকে রবীন্দ্র অনুসারী কাব্য কোনক্রমেই বলিতে পারি না। তবু দেখি জীবনানন্দ তাঁহার জীবন দর্শনে রবীন্দ্রনাথ হইতে বড় অভিন্ন নন। জীবনানন্দ তাঁর একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছেন। 'সময়ের প্রসূতীর পটভূমিকায় জীবনের সম্ভাবনাকে বিচার করে মানুষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আস্থালাভ করতে চেষ্টা করেছি'।

কবি হিসাবে জীবনানন্দের জীবন দর্শন এই উক্তির মধ্যেই খুঁজিয়া

লইতে হইবে। অবশ্য ঐরূপ কথা তিনি অন্য কয়েকটি প্রবন্ধেও বলিয়াছেন। 'কেন লিখি' প্রবন্ধে তিনি বলিয়াছেন, 'আমার সৃষ্টি পন্থাও সূর্য্য ও তপতীকে আশ্রয় করে ঃ হয়তো তপতীকেই অবলম্বন করেছি বেশী'। তপতী সূর্য্য-পত্নী ছায়া। জীবনানন্দ তাহা হইলে বলিলেন তাঁহার কবিতা রৌদ্র নহে, ইহা ছায়া। তবে আবার একথাও বলিয়াছেন যে তিনি তপতীকে অবলম্বন করিয়া সূর্য্যাশ্রয়ী হইবার আশা রাখেন। এই কথা গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। মনে হয় আঁধারের গায়ে গায়েই তিনি আলোক দেখিতে চাহিতেছেন। এই প্রসঙ্গে আমি জীবনানন্দের 'সময়-ব্রহ্ম' কথাটি বুঝিবার চেষ্টা করিতে পারি। বেদান্তে ব্রহ্ম এক, একমাদ্বিতীয়ম্। সময় বলিতে আমরা একাল বুঝিনা, সেকাল বুঝিনা। সময় বলিতে বুঝি সর্বকাল। এই সর্ব-কালের বা মহাকালের প্রকৃতি কিরূপ? ইহা কি আলোময় না ছায়াময় বা অন্ধকারময়। ইহার উত্তরে বলিতে হয় মহাকালে দুইয়েরই অবস্থান এবং এই মহাকালই মহাবিশ্বলোক। 'পূর্বাশা' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে জীবনানন্দ লিখিয়াছেন যে কবির মন 'ইতিহাস চেতনায় সুগঠিত হওয়া চাই'। ইহার পর তিনি লিখিলেন 'মহাবিশ্বলোকের ইশারার থেকে উৎসারিত সময়ের চেতনা আমার কাব্যে একটি সংগতি সাধক অপরিহার্য্য সত্যের মত'। ইংরাজিতে যাহাকে আমরা truth of poetry বলি তাহা কবির এই সময় চেতনার, সত্য। এই সময়চেতনা কবির বিশ্ব চেতনা হইতে অভিন্ন। জীবনানন্দের কাব্যে যদি আমরা বিচিত্র চেতনার প্রকাশ দেখিয়া থাকি তাহা হইলে আমরা তাহাকে সময়চেতনাই বলিব। এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে আমরা বিশেষ করিয়া দুটি বস্তু লক্ষ্য করি' Time এবং Space, সময় এবং স্থান। যাহা কিছু ঘটে তাহা কোন সময়ে এবং কোন স্থানে ঘটিয়া থাকে। জীবনের সততা এই স্থান-কালের সত্যতা। যে কাব্যকে আমরা কালজয়ী বলি তাহাও এই স্থান এবং কালের বস্তু। দার্শনিকেরা ইহাকে Bergson এর Creatic evolution দিয়া বুঝাইবেন। অথবা ইহার মধ্যে Bergson-এর elan vital দেখিবেন। আমি এই দার্শনিক আলোচনায় প্রবেশ করিতে চাহি না। এই দার্শনিক জ্ঞান আমার নাই। কিন্তু জীবনানন্দের কবিতায় আমি জীবনের বিচিত্র গতির যে প্রকাশ দেখিতে পাই তাহাকে আমি কবির সময় চেতনা বলিতে চাহিতেছি। যে কোন কবির কাব্যেই এই সময় চেতনা দেখিতে পাইব। জীবনানন্দ যে বিশেষ

করিয়া তাঁহার কাব্যে এই সময়চেতনার কথা বলিতেছেন তাহার কারণ এই যে তাঁহার কবিতায় বিচিত্র ভাবের বিচিত্র ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি 'বাঁশ পাতা', 'মরা ঘাস', 'আকাশের তারা' একত্রে দেখিয়াছেন। যে মুহূর্তে তিনি ইহা দেখিয়াছেন সেই মুহূর্ত তাঁহার কাছে সত্য। 'সৃষ্টির আহ্বানে' তিনি ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। সেই সৃষ্টির আহ্বান সময় সিন্ধুর মত। ইহাতে উৎসবের কথা নাই. ব্যর্থতার গান নাই শুধু আছে তাঁহার এক নিবিড় অনুভূতি। এই নিবিড় অনুভূতির সত্যই কাব্যের সত্য। কবির কথায় বলিতে পারি, 'সময়ের সমুদ্রের জলে গানের অনেক সুর', 'অনেক চলার পথ নক্ষত্রের তলে'।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যের সঙ্গে ইহার ভিন্নতা এই যে ইহার কবি বলিতেছেন না যে 'তাই তোমার আনন্দ আমার পরে'। জীবনানন্দের প্রথম কয়েকখানি কাব্য-গ্রন্থে আমরা যে বিচিত্র অনুভূতির পরিচয় পাই তাহাকে একত্র করিয়া একটি বিশিষ্ট দর্শন গড়িয়া তুলিতে পারি না। এক বিশাল আর্ট গ্যালারিতে আমরা কত ছবি দেখি, দেখিয়া মুগ্ধ হই, কিন্তু সকল ছবি যেন এক অখণ্ড জীবনের ছবি আমাদের সামনে তুলিয়া ধরে না। প্রত্যেকটি ছবি-ই সত্য, কিন্তু সব ছবি একত্র হইয়া এক মহাসত্যের সৃষ্টি করে না। জীবনানন্দের কবিতাগুলি পড়িয়া মনে হইবে তিনি তাঁহার ভাব-জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্তগুলিতে যেন স্বপ্ন আর বাস্তব একাকার হইয়া এক রহস্যালোকের সৃষ্টি করিতেছে। কিন্তু এই রহস্যালোককে অসত্য বলিয়া মনে হইবে না। তিনি এক দূরসাগরের পার দেখিতে পান। সেই পারের পাখিরা কোথা হইতে আসিল?

কোন এক মেরুর পাহাড়ে
এই সব পাখি ছিল;
ব্লিজার্ডের তাড়া খেয়ে দলে দলে সমুদ্রের 'পর
নেমেছিল তারা তারপর—
মানুষ যেমন তার মৃত্যুর অজ্ঞানে নেমে পড়ে।

'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র শেষ কবিতাটিতে এই স্বপ্নময় অনুভূতিকে ধ্যানের অনুভূতি বলা হইয়াছে।

উজ্জ্বল আলোর দিন নিভে যায়,

মানুষেরও আয়ু শেষ হয়।
পৃথিবীর পুরানো সে পথ
মুছে ফেলে রেখা তার—
কিন্তু এই স্বপ্নের জগৎ
চিরদিন রয়।
সময়ের হাত এসে মুছে ফেলে আর সব—
নক্ষত্রের আয়ু শেষ হয়।

কল্পনা বা imagination-এর সত্য যখন অনুভূতির বিষয় হইয়া ওঠে কবি তাহাকে জীবনের সত্য বলিয়াই গ্রহণ করেন। এই কল্পনায় তিনি শিশিরের সুর শুনিতে পান, রৌদ্রের আঘ্রাণ পান এবং কখনও কখনও প্রাকৃতিক বস্তু দিয়া তিনি একটি myth-এর সৃষ্টি করেন। সেই myth-এর মধ্যে আবার দেবতার আবির্ভাব। 'বনলতা সেন' কাব্য গ্রন্থের 'ঘাস' কবিতাটি এই myth সৃষ্টির একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত। একটি হরিণ কাঁচা বাতাবির মত সুঘ্রাণ, সবুজ ঘাস 'দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে নিচ্ছে', এই দৃশ্য দেখিয়া কবি বলিলেন :

আমারও ইচ্ছা করে এই ঘাসের ঘ্রাণ হরিৎ মদের মতো
গেলাসে গেলাসে পান করি,
এই ঘাসের শরীর ছানি—চোখে চোখ ঘষি,
ঘাসের পাখনায় আমার পালক,
ঘাসের ভিতরে ঘাস হয়ে জন্মাই কোনো এক নিবিড় ঘাস-মাতার
শরীরের সুস্বাদ অন্ধকার থেকে নেমে।

ইংরাজ কবি West Windকে ডাকিয়া বলিলেন, 'Be thou me', তিনি প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হইতে চাহিলেন। ভাবটি অবশ্যই কাব্যময়। কিন্তু বঙ্গীয় কবি কোনোএক নিবিড় ঘাস-মাতার শরীরের সুস্বাদ অন্ধকার হইতে জন্মলাভ করিতে চাহিতেছেন। এখানে কবি যেন নিজের মত করিয়া এক প্রকৃতি সৃষ্টি করিতেছেন। এই কাব্যগ্রন্থের 'হায় চিল' কবিতাটিও জীবনানন্দের কল্পনার চিল। আবার দেখি, পেঁচার ধূসর পাখা উড়ে যায় নক্ষত্রের পানে, জলামাঠ ছেড়ে দিয়ে চাঁদের আহ্বানে। বুনো হাঁসটিও কল্পনার হাঁস :

…পৃথিবীর সব ধ্বনি সব রঙ মুছে গেলে পর
উড়ুক উড়ুক তারা হৃদয়ের শব্দহীন জ্যোৎস্নার ভিতর।

এই কল্পনা সময়ের বাহিরের বস্তু নহে। 'বনলতা সেন'ও এই কল্পনার সৃষ্টি। সেই কল্পনা যেন অতীত বর্তমানের সঙ্গে মিশিয়া একাকার হইয়াছে।

সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন
সন্ধ্যা আসে ; ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল ;
পৃথিবীর সব রঙ নিভে গেলে পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন
তখন গল্পের তরে জোনাকির রঙে ঝিলমিল ;
সব পাখি ঘরে আসে—সব নদী ফুরায় এ-জীবনের সব লেন দেন ;
থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।

আমি এই কয়েকটি লাইনে জীবনানন্দের অন্তরের কথা শুনিতে পাই। এই কবির নানা কবিতায় যে একটি 'তুমির' অশরীরী উপস্থিতি দেখিতে পাই এই বনলতা সেন সেই 'তুমি'। ইনি গ্যাটে কথিত সর্বকালের এবং সকলের মনের নারী। ইনি কালিদাসের মেঘদূতের প্রণয়িনী 'আবার ইনিই রবীন্দ্রনাথের উর্বশী সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বন্ধন যে প্রেম এই নারীই তাহার উৎস। ইহাকে রহস্যময় বলিতে পার। এমনকি স্বপ্নও বলিতে পার। কিন্তু মানুষের জীবনে ইহার ক্ষণিক উপস্থিতি যেন মানুষেরই ইতিহাসের এক অমোঘ বিধান।

আমরা যাহারা জীবনানন্দের কাব্যকে দুর্বোধ্য মনে করি বা কতকগুলি ভাবের শিথিল বিন্যাস বলিয়া তুচ্ছ করি, আমাদের জীবনানন্দের কাব্যলোকে প্রবেশ ঘটে নাই। আমিও যে জীবনানন্দের কাব্যলোকে প্রবেশ লাভ করিয়াছি তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু অতল অসীম সাগরের পাড়ে দাঁড়াইয়া মাথার উপরে নক্ষত্রখচিত নৈশ গগনের দিকে তাকাইয়া যখন মনে হয় যে এই অপরূপ দৃশ্যকে যেন মনপ্রাণ দিয়া আপনার করিয়া লইতে পারিতেছি না। তখন বলি না যে এ দৃশ্য দুর্বোধ্য। বরং ইহার অনন্ত মহিমা উপলব্ধি করিয়া সেই মহিমাকে আমাদের হৃদয়ের ধন হিসাবে গ্রহণ করিবার চেষ্টা করি। জীবনানন্দের কাব্য সম্বন্ধে বড় কম সমালোচনা পুস্তক বাহির হয় নাই। প্রবন্ধ সংখ্যাও অগণিত। আমি সাহিত্য-পণ্ডিত নয় বলিয়া এই সকল গ্রন্থ, প্রবন্ধ পড়িয়া বড় লাভবান হই নাই। জীবনানন্দের জীবৎকালে প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধ অবশ্য আমার হৃদয় স্পর্শ করিয়াছে। সম্প্রতি প্রকাশিত

দুইটি প্রবন্ধ পড়িয়া অবশ্য আমার মনে হইয়াছে যে এই দুইটি জীবনানন্দকে আবিষ্কারের পথে বিশেষ সহায়। 'জীবন মৃত্যুর শব্দ শুনি' এই সার্থক শিরোনামায় লিখিত প্রবন্ধটি ভাষা ও ভাবে অনন্য। শঙ্খ ঘোষ তাঁহার প্রবন্ধটি আরম্ভ করিয়াছেন, এই 'ইতিহাস যান' কবিতাটির শেষ ছয়টি শব্দ উদ্ধৃত করিয়া। এই ছয়টি শব্দ যেন জীবনানন্দের জীবন বীক্ষার সার কথা, 'এরপর আমাদের অন্তর্দীপ্ত হবার সময়'। 'ইতিহাস যান' কবিতাটি ১৯৬১ সালে প্রকাশিত জীবনানন্দের 'বেলা অবেলা কাল বেলা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট কবিতাগুলি ১৯৩৪—১৯৫০, এই ষোল বছরের মধ্যে রচিত। এই অন্তর্দীপ্তির কথা জীবনানন্দ বহু কবিতায় বলিয়াছেন। তাঁহার কাব্য সাধনাকে বলিতে পারি অন্তর্দীপ্তির সাধনা, প্রার্থনার সুরে জীবনানন্দ কবিতা লিখিতেন না। তবে ১৯৪৪ সালে প্রকাশিত তাঁহার 'মহা পৃথিবী' কাব্যগ্রন্থের একটি কবিতার নাম 'প্রার্থনা' এবং এই কবিতার প্রথম লাইন—'আমাদের প্রভু বীক্ষণ দাও'। এই অন্তর্দীপ্তিকেই তাঁহার একটি প্রবন্ধে 'কল্পনা আভা' বলিয়াছেন, এই প্রবন্ধেই তিনি আবার 'কল্পনার আলো ও আবেগ'-র কথা বলিয়াছেন। এই দীপ্তি কবির কথায় 'বিকেলের সাদা রৌদ্রের মত'। শঙ্খ ঘোষের প্রবন্ধের বক্তব্য মনে হয় এই যে জীবনানন্দের কাছে জীবনও যেমন সত্য মৃত্যুও তেমন সত্য।

শিশির কুমার দাশের 'কবিতার ভাষা : জীবনানন্দ' প্রবন্ধটির সার কথা এই : 'জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠত্বের অবিসংবাদিত প্রধান কারণই তাঁর স্বতন্ত্র ভাষার সৃষ্টি'। শঙ্খ ঘোষ যাহাকে জীবন-মৃত্যু বোধের কবি বলিয়াছেন সেই কবি তাঁহার এক স্বতন্ত্র নিজস্ব বাংলা ভাষায় তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। এই স্বতন্ত্র ভাষাটি বুঝিনা বলিয়া আমরা জীবনানন্দকে দুর্বোধ্য কবি বলিয়া থাকি। এই ভাষায় স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও ইহা বাংলা ভাষা। ইহার প্রত্যেকটি শব্দ পরিচিত বাংলা শব্দ। ইহার ব্যাকরণ বাংলা ভাষার চিরাচরিত ব্যাকরণ। ইহার ছন্দ বাংলা কবিতার ছন্দ। তবে এই কবির প্রতিভা এমন অনন্য; ইঁহার জীবন-দৃষ্টি এত গভীর, ইঁহার ভাবনা, কল্পনা এবং চিন্তা এত অসাধারণ; ইঁহার অনুভূতি এত নিবিড় যে আমরা ইঁহার কথা যেন বুঝিয়া উঠিতে পারি না। আমি বলি জীবনানন্দের ভাষ্য জীবনানন্দ। তাঁহার সকল কথা শুনিতে হইবে, সেই কথাগুলির ধ্বনি গ্রহণ করিতে হইবে. যে প্রণিধান লইয়া আমরা উপনিষদ পড়ি বা বেদান্ত-ভাষ্য পড়ি সেই প্রণিধান

লইয়া তাঁহার কবিতাগুলি পড়িতে হইবে। এইখানে আমাদের বাধা এই যে প্রকৃতিকে আমরা দূর হইতে দেখি। একটি বৃক্ষকে আমরা স্পর্শ করিতে পারি। তাহার সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে পারি, কিন্তু আমরা সেই বৃক্ষের সঙ্গে একাত্ম হইতে পারি না।

দ্বিতীয় কথা এই আমরা প্রকৃতির বিভিন্ন বস্তুকে পরিচ্ছিন্ন ভাবে দেখিয়া থাকি। আকাশ, চন্দ্র, সূর্য, তারা, মেঘ, নদ, নদী, সমুদ্র, পাহাড়, পর্বত, জীব, জন্তু, নানা জাতির প্রাণি লইয়া যে এক বিশাল সমাজ তাহা আমরা উপলব্ধি করিতে পারি না। এই বিরাট বিচিত্র প্রকৃতির সব কিছু যে পরস্পর সম্পৃক্ত তাহাও আমরা বুঝিতে পারি না। জীবনানন্দ যে কবির কল্পনা, প্রতিভা, চিন্তা ও অভিজ্ঞতার কথা বলিয়াছেন তাহা তাঁহাকে যেন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে মিশাইয়া দিয়াছে। তিনি বলিতে পারেন 'আমার শরীরের ভিতর অনাদি সৃষ্টির গুঞ্জরণ'। এই কবির কাছে পিপুল গাছ আর পিতৃপিতামহের চেউ একাকার হইয়াছে। প্রকৃতির সঙ্গে এই একাত্মবোধের জন্যই তিনি রৌদ্রের গন্ধ আঘ্রাণ করেন। শিশিরের সুর শুনিতে পান। প্রকৃতি তাঁহার সঙ্গে নানা কণ্ঠে নানা কথা বলেন। তিনিও প্রকৃতিকে তাঁহার বিচিত্র কথা শুনাইয়া থাকেন। জগতের শ্রেষ্ঠ প্রকৃতির কবিগণ তাঁহাদের কাব্য প্রকৃতিকে ঠিক এইভাবে উপস্থিত করেন নাই। কবি হিসাবে জীবনানন্দের এই খানেই অনন্যতা।

রয়েছি সবুজ মাঠে—ঘাসে—
আকাশ ছড়ায়ে আছে নীল হয়ে আকাশে আকাশে'।

ইংরাজ কবির 'Make me thy lyre even as the forest is' প্রকৃতির কাছে একটি আবেদন। এখানে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতার কথা নাই। কিন্তু জীবনানন্দ বলেন:

যে নক্ষত্র মরে যায়, তাহার বুকের শীত
লাগিতেছে আমার শরীরে—

প্রকৃতির সঙ্গে এই একাত্ম ভাব ঠিক এইভাবে কোন কবিতায় প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া জানিনা। জীবনানন্দ যখন বলেন: 'নিরবধি কাল নীলাকাশ হয়ে মিশে গেছে আমার শরীরে'। প্রকৃতির সঙ্গে বিচিত্র অন্বয়বোধ আমি ইংরাজি রোমান্টিক কাব্যে পাইয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। ইংরাজ কবি যখন বলেন: In our mind alone doth nature live' তখন যেন এক

দার্শনিক তত্ত্বের কথা শুনি, জীবনানন্দের প্রকৃতির সঙ্গে মিশাইয়া যাইবার কথা শুনি না। প্রকৃতির সঙ্গে কবির এই সম্পর্কটি না বুঝিলে আমরা জীবনানন্দের কথা বুঝিতে পারিব না। এই প্রকৃতির সঙ্গে আবার ইতিহাসকে অর্থাৎ মহাকালকে একত্র করিয়া দেখিতে হইবে। মহাকালকে জীবনানন্দ সময়ব্রহ্ম বলিয়াছেন। তাহার কারণ এই যে জীবন ও মৃত্যু উভয়ই সময়ের সৃষ্টি। ব্রহ্মবাদী রবীন্দ্রনাথও জীবন ও মৃত্যুকে একই সত্যের দুই দিক হিসাবে দেখিয়াছেন। তবে আমি জীবনানন্দের এই দৃষ্টিকে বৈদান্তিক দৃষ্টি বলিব না। ইহাকে যদি বেদান্ত বলিতে হয় তাহা হইলে আমি বলিব ইহা জীবনানন্দের নিজস্ব বেদান্ত। ইহা তিনি বেদান্ত-চর্চার পথে লাভ করেন নাই। তবে এই কথা হয়তো বলা যাইতে পারে যে, ভারতবর্ষ অদ্বৈতের দেশ। যে কোন পথেই হউক এই অদ্বৈত ভারতীয় মনে প্রবেশ করিবে।

জীবনানন্দের ভাব যখন আমাদের ভাব হইয়া উঠিবে তখন তাহার কাব্যের ধ্বনি আমাদের কানে ঝংকৃত হইবে। তখন তাহার লাইনগুলি আমরা সকল শিক্ষিত বাঙ্গালীর মুখেই শুনিব। এখন অবশ্য 'আবার আসিব ফিরে' সনেটটি এবং 'বনলতা সেন' কবিতাটির আবৃত্তি শুনিতে পাই। কিন্তু জীবনানন্দের সকল কবিতার অর্থ এবং তাহার সঙ্গীত আমাদের কে বুঝাইয়া দিবে? ইহা বুঝাইতে হইলে খালি শব্দের অর্থ বুঝাইলে হইবে না, ভাবের অর্থ বুঝিতে হইবে। কিন্তু সেই ভাব মহৎ ভাব হইলেও তাহা আমাদের অনেকের কাছে অভাবনীয় বলিয়া মনে হইবে। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। 'বেলা অবেলা-কাল বেলা' গ্রন্থে 'সময়ের তীরে' বলিয়া একটি কবিতা আছে। এই কবিতার একটি লাইন শুনিতে বড় মধুর, ইহার অর্থ বুঝিতে পারিলে ইহা আরও মধুর হইয়া উঠিবে। লাইনটি এই: 'নিঃসীম শূন্যে শূন্যের সংঘর্ষে স্বতন্ত্র্যসারা নীলিমার মতো'। শূন্যের সঙ্গে শূন্যের সংঘর্ষ কি করিয়া হইতে পারে? উপনিষদের কথা এই যে পূর্ণ হইতে পূর্ণ উঠাইয়া লইলে পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে। কিন্তু শূন্যের সঙ্গে শূন্যের সংঘর্ষ এই কথাটির অর্থ কি? ভারতীয় দর্শনে দ্বৈতবাদীরা বলিয়া থাকেন যে শংকরের অদ্বৈতবাদ বৌদ্ধদের শূন্যবাদ হইতে অভিন্ন। শংকরাচার্য্যের 'নির্বাণ দশক' পড়িলে মনে হইবে পরম ব্রহ্মের আগাও নাই মাথাও নাই। অথচ তিনি সৎ, অর্থাৎ তিনি আছেন। এখানে কবিতাটি পড়িয়া বুঝিতেছি

যে কবি যে নীলিমার কথা বলিতেছেন তাহা শূন্যের গহ্বর হইতে উৎসারিত। এই নীলিমাই সৃষ্টির মরালীকে বহন করে চলেছে মধু বাতাসে, নক্ষত্রে, লোক থেকে সূর্য্যলোকান্তরে। এই নীলিমাকেই কবি আবার দেখিতেছেন বেতস তন্বী সূর্য্যশিখার অন্তর্গত কোন পবিত্রতা, শান্তি, শক্তি, শুভ্রতারূপে। কিন্তু কবির দুঃখ এই মানুষের সৃষ্ট কোন রাষ্ট্র বা নগর নাই যাহা এই নীলিমাকে সৃষ্টি করিতে পারে। এই নীলিমা সময় ব্রহ্মের অন্তর্গত। মানুষের দুর্ভাগ্য এই যে সে ইহাকে লাভ করিতে পারে না। তাহা হইলে সময় ব্রহ্ম কোন নিরাকার, নিরালম্ব, নিরুপাধি বস্তু নহে। ইহা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সকল সুন্দর বস্তুর সমাহার। ইহার উৎপত্তি শূন্যের সঙ্গে শূন্যের সংঘর্ষে, এই জন্য যে ইহার অন্য কোন ইতিহাস নাই। কবি দার্শনিকের ভাষায় কোন সৃষ্টি-তত্ত্ব উপস্থিত করিতেছেন না। তিনি তাঁহার কল্পনার আবেগে যাহা উপলব্ধি করিতেছেন তাহাই বলিতেছেন। তিনি শুনিতেছেন 'আগুনের মহান পরিধি গান করে উঠছে'। আমরা বুঝিতে পারি শূন্যের সঙ্গে শূন্যের সংঘর্ষেই এই আগুনের সৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন :

অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো
সেই তো তোমার আলো।

দুই কবি-ই যেন একই কথা বলিতেছেন। দুই কবির মধ্যে প্রভেদ এই যে রবীন্দ্রনাথের কাছে 'আলো ভুবন ভরা' আর জীবনানন্দের কথা এই যে মানুষ এই আলো এখনও অর্জন করিতে পারে নাই। মানুষের সচেতনা এখনও এক দূরতর দ্বীপ। 'আজকে অস্পষ্ট সব? ভাল করে কথা ভাবা এখনও কঠিন'। কবির ভয় এই যে 'সৃষ্টির মনের কথা মনে হয় দ্বেষ'। 'এ-যুগে কোথাও কোনো আলো—কোনো কান্তিময় আলো চোখের সুমুখে নেই যাত্রিকের'।

এমনকি মানুষের যেন এক গভীর অন্ধকার বোধ নাই। এক মহৎ আঁধার হইতেই, অর্থাৎ শূন্য হইতেই নীলিমার সৃষ্টি। জীবনানন্দের সকল কথা শুনিয়া তাঁহার সকল ভাব বুঝিয়া লইতে হইবে। প্রত্যেকটি কবিতার সঙ্গে প্রত্যেকটি কবিতার এক নিবিড় সম্পর্ক বুঝিয়া লইতে হইবে। প্রত্যেকটি মেটাফরের সঙ্গে প্রত্যেকটি মেটাফরের সঙ্গতি দেখিতে হইবে। কবির প্রত্যেক ভাব-মুহূর্তের সঙ্গে প্রত্যেক ভাব-মুহূর্তের নাড়ীর সম্পর্ক লক্ষ্য করিতে হইবে। সময়ের সঙ্গে সময়ের যোগে যে অনন্ত-

কালের সৃষ্টি হয় তাহাও উপলব্ধি করিতে হইবে। তিমিরের সঙ্গে আলোকের যে অদৃশ্য সম্পর্ক রহিয়াছে তাহাও বুঝিতে হইবে। 'সাতটি তারার তিমির' কাব্যগ্রন্থের শেষ কথা 'অফুরন্ত রৌদ্রের তিমির'। জীবনানন্দের কোন একটি কথা বা একটি ভাব তাহার সার কথা এবং সার ভাব এমন মনে করিলে আসল জীবনানন্দকে আমরা চিনিতে পারিব না। কবি অনেক অধর্মের কথা বলিয়াছেন, দেশের মানুষের, মানুষের মালিন্য দেখিয়া বিষন্ন হইয়াছেন, কিন্তু তবু বলি জীবনানন্দ নিরাশার কবি নন। কোন অর্থেই ব্যর্থতার কবি নন। জীবনানন্দ এক মহৎ আশার কবি। এত বড় আশার কবি, বিশ্বাসের কবি একালে আর একজন দেখিনা।

যে কবি লিখিয়াছেন :

হয়তো বা অন্ধকারই সৃষ্টির অন্তিমতম কথা।
হয়তো-বা রক্তেরই পিপাসা ঠিক, স্বাভাবিক—
মানুষও রক্তাক্ত হতে চায় ;—
হয়তো-বা বিপ্লবের মানে শুধু অপরিচিত অন্ধ সমাজের
নিজেকে নবীন বলে—অগ্রগামী (অন্ধ) উত্তেজের
ব্যাপ্তি ব'লে প্রচারিত করার ভিতর ;
হয়তো-বা শুভ পৃথিবীর কয়েকটি ভালো ভাবে লালিত জাতির
কয়েকটি মানুষের ভালো থাকা—সুখে থাকা—
রিরংসারক্তিম হয়ে থাকা,
হয়তো-বা বিজ্ঞানের, অগ্রসর, অগ্রগতির মানে এই শুধু, এই!

কিন্তু এই কবিই তো আবার বলিয়াছেন :

তবুও শ্মশান থেকে দেখেছি চকিত রৌদ্রে কেমন
জেগেছে শালি ধান ;
ইতিহাস-ধুলো-বিষ উৎসারিত ক'রে নব নবতর
মানুষের প্রাণ
প্রতিটি মৃত্যুর স্তর ভেদ ক'রে এক তিল বেশি
চেতনার আভা নিয়ে তবু
খাঁচার পাখির কাছে কী নীলাভ আকাশ নির্দেশী!

হয়তো এখনো তাই ;—তবু
রাত্রি শেষ হলে রোজ পতঙ্গ-পালক-পাতা
শিশির-নিসৃত শুভ্র ভোরে
আমরা এসেছি আজ অনেক হিংসার খেলা অবসান ক'রে :
অনেক যেষের ক্লান্তি মৃত্যু দেখে গেছি।

জীবনানন্দ অনেক সময় তাঁহার গভীর ভাবের কথা সাধারণ ভাষায় উপস্থিত করেন। 'বনলতা সেন' কাব্য গ্রন্থের অন্তর্গত 'সুচেতনা' নামক কবিতায় তিনি লিখিয়াছেন :

পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন ;
মানুষ তবুও ঋণী পৃথিবীরই কাছে।

এবং এই কবিতার আর একটি কথাকে এক মহৎ আশাবাদীর মহৎ উচ্চারণ বলিয়া গ্রহণ করিব।

এ-পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে ;
সে অনেক শতাব্দীর মণীষীর কাজ ;

এখন এই কবিতার শেষ কথাটি শুনিতে পারি। কথাটি যেন এক শ্রেষ্ঠ প্রাচীন গ্রন্থের মন্ত্রের মত আমাদের কানে বাজিয়া ওঠে : 'শাশ্বত রাত্রির বুকে সকলি অনন্ত সূর্যোদয়।' 'বেলা অবেলা' কাব্য গ্রন্থখানিকে কবির শেষ কাব্যগ্রন্থ বলিয়া ধরিতে পারি। এই গ্রন্থের শেষ শেষ তিন লাইন একবার উদ্ধৃত করিয়াছি। জীবনানন্দকে মানুষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এক মহৎ আশার কবি হিসাবে বুঝিয়া লইবার জন্য এই তিনটি লাইন উদ্ধৃত করিতেছি :

ইতিহাস খুঁড়লেই রাশি রাশি দুঃখের খনি
ভেদ ক'রে শোনা যায় শুশ্রূষার মতো শত-শত
শত জল ঝর্নার ধ্বনি।

আর একটি কথা বলিয়া এই প্রসঙ্গটি শেষ করিতে চাহিতেছি। 'মহা-পৃথিবী' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'আট বছর আগের একদিন' কবিতাটিকে কেহ কেহ ভুল বুঝিয়াছেন। এই কবিতায় কবি একস্থানে লিখিয়াছেন : 'এক বিপন্ন বিস্ময় আমাদের ক্লান্ত করে'। কিন্তু এই কথা কবির নিজের হৃদয়ের কথা নহে। লাস কাটা ঘরে শায়িত আত্মঘাতী মানুষটিকে দেখিয়া কবি

ভাবিতেছেন যে এই ক্লান্তি বোধের জন্যই লোকটি আত্মহত্যা করিয়াছে। জীবন সম্বন্ধে কবির হৃদয়ের কথা এই কবিতাতেই স্মরণীয় ভাষায় উচ্চারিত হয়েছে :

তবুও তো পেঁচা জাগে ;
গলিত স্থবির ব্যাঙ আরো দুই মুহূর্তের ভিক্ষা মাগে
আরেকটি প্রভাতের ইশারায়—অনুমেয় উষ্ণ অনুরাগে।

জীবনানন্দের একটি কথা তাঁহার সকল কথার সার বলিয়া ধরিয়া লইলে আমরা তাঁহার হৃদয়ের পূর্ণ সংবাদ পাইব না। মহাকবির মূল কথা যেমন তাঁহার মহাকাব্যের মধ্যে ছড়াইয়া থাকে ; জীবনানন্দের জীবন সম্বন্ধে মূল কথা তাঁহার সমগ্র কাব্যে ছড়াইয়া আছে। এই কাব্য আমাদের একালের এক ভাগবত। ইহাকে যত্ন করিয়া পড়িতে হইবে। ইহার সকল কথা সকল কথার সঙ্গে মিলাইয়া তাঁহার কথা বুঝিয়া লইতে হইবে। কোন কথা দুর্বোধ্য বলিয়া বর্জন করা চলিবে না। আমাদের বোধশক্তি জাগ্রত হইলে জীবনানন্দের কোন কথা দুর্বোধ্য মনে হইবে না।

জীবনানন্দ তাঁহার একটি কবিতায় লিখিয়াছেন 'আমার শরীরের ভিতর অনাদি সৃষ্টির গুঞ্জরণ'। এই বিচিত্র গুঞ্জরণের সকল ধ্বনির কথা এই প্রবন্ধে লিখিতে পারিলাম না। যিনি তাহা পারিবেন, তাঁহার রচনাটি পড়িবার জন্য বসিয়া আছি। এই প্রবন্ধের শেষে জীবনানন্দের যে কবিতাগুলি প্রায় নিত্যই পড়ি, যে কবিতাগুলির ভাব ও সুর থাকিয়া থাকিয়া আমার কানে বাজিয়া ওঠে সেই কবিতাগুলি সম্বন্ধে দুই-একটি কথা বলিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করি। 'রূপসী বাংলা' কাব্যগ্রন্থখানি জীবনানন্দের জীবৎকালে প্রকাশিত হয় নাই। কেন তিনি ইহা প্রকাশ করেন নাই তাহা বলিতে পারি না। 'রূপসী বাংলা' কবি ভ্রাতা অশোকানন্দ দাশ ১৯৫৭ সালে প্রকাশ করেন। এই সংকলনের অন্তর্গত সনেটগুলি সম্পর্কে কবির একটি বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ উক্তি এই গ্রন্থের ভূমিকায় অশোকানন্দ উদ্ধৃত করিয়াছেন। উক্তিটি এই : 'এরা প্রত্যেকে আলাদা-আলাদা স্বতন্ত্র সত্তার মতো নয় কেউ, অপর পক্ষে সার্বিক বোধে এক শরীরী ; গ্রাম বাংলার আলুলায়িত প্রতিবেশ-প্রসূতির মতো ব্যষ্টিগত হয়েও পরিপূরকের মতো পরস্পর নির্ভর।' ইংরাজি ভাষায় অনেক সনেট সংগ্রহকে Sonnet sequence বলা হয়। 'রূপসী বাংলার' সনেট-গুলিকে ঠিক Sonnet sequence বলিতে পারিনা, এই ষাটটি কবিতা লইয়া

একটি কাব্য। সেই কাব্য কবির অন্তরের লিরিক। এক ইংরাজ কবি তাঁহার একটি কবিতায় লিখিয়াছেন যে তিনি যে স্থানে কোনদিন বাস করিয়াছেন সেই স্থান 'is forever England'। জীবনানন্দ সেই রকম এক শাশ্বত বঙ্গদেশের কথা এই সনেটগুলিতে উপস্থিত করিয়াছেন। বঙ্গদেশ সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় কবিতার অন্ত নাই। এই কবিতাগুলিকে আমরা দেশাত্মবোধক কবিতা বলিয়া থাকি। 'রূপসী বাংলা' ঠিক সেই শ্রেণীর কবিতা এমন কথা বলিতে পারি না। 'বঙ্গ আমার জননী আমার' কবিতাটি অবশ্যই দেশ প্রেমের কবিতা। অক্ষয়চন্দ্র বড়ালের 'বঙ্গভূমি' কবিতাটিকেও আমরা স্বদেশ-প্রেমের কবিতা বলিয়া চিহ্নিত করিতে পারি। কিন্তু বঙ্গদেশের বিচিত্র রূপ, ইহার নানা বর্ণ, নানা শব্দ, নানা গন্ধ এই সকল কবিতায় যেন ফুটিয়া ওঠে নাই। রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশ সম্বন্ধে রচিত একটি কবিতায় লিখিয়াছেন 'ওগো মা, তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে'। জীবনানন্দ এই বাংলাদেশকে 'রূপসী বাংলার' 'নয়ন ভরিয়া দেখিতেছেন। এই গ্রন্থে কবির হৃদয়ের বাংলাদেশ যেন এক রূপকথার বাংলাদেশ হইয়া উঠিয়াছে। এই বাংলাদেশ চিত্রকরের পটে আঁকা বাংলাদেশ নহে। ইহার বিচিত্র গতির ছন্দ কবির মনে সতত ধ্বনিত হইতেছে। ইহার ইতিহাস যেন ইহার সারা অঙ্গে ছড়াইয়া আছে। কবি যে বাংলার মুখ দেখিয়া পৃথিবীর রূপ আর খুঁজিতে চাহেন না সেই বাংলার মুখ, পুরাকালে কত মানুষ দেখিয়াছে, কত মানুষের সুখ দুঃখ, আশা নিরাশা, হাসি কান্না বাংলার প্রকৃতির সঙ্গে মিশিয়া আছে। বাংলার ইতিহাস ইহার অতীত বর্তমানের সঙ্গে একাকার হইয়া ইহাকে যেন মহিমান্বিত করিয়া রাখিয়াছে। আমি মনে করি বঙ্গদেশ সম্বন্ধে অন্য কোন কবির কবিতায় এই ভাবটি নাই। রূপসী বাংলার প্রথম সনেটটিতে কবি লিখিলেন : 'পুরাণ-কথার গন্ধ লেগে আছে যেন তার নরম শরীরে।' বঙ্গদেশ কেবল একটি সুন্দর দেশ নহে ; ইহা বহুকালের সুখ-দুঃখ ভরা এক সুন্দর কাহিনী। এই ভাবটি সনেটে সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে :

·· বেহুলাও একদিন গাঙুড়ের জলে ভেলা নিয়ে—
কৃষ্ণা দ্বাদশীর জ্যোৎস্না যখন মরিয়া গেছে নদীর চড়ায়—
সোনালি ধানের পাশে অসংখ্য অশ্বত্থ বট দেখেছিল, হায়,
শ্যামার নরম গান শুনেছিল,—একদিন অমরায় গিয়ে
ছিন্ন খঞ্জনার মতো যখন সে নেচেছিল ইন্দ্রের সভায়

বাংলার নদী মাঠ ভাঁটফুল ঘুঙুরের মতো তার
কেঁদেছিল পায়।

কবির এই কল্পনা-প্রবণতার আবেশে তাঁহার দেখা সকল বস্তুই যেন একটি মিথের আকার ধারণ করে। কবির যে কোন কথাই যেন একটি নিবিড় কাহিনী হইয়া ওঠে। কখনও কখনও একটি মেটাফরের মধ্যে এক কাহিনী নিহিত। আবার কখনও কখনও এই মেটাফর বিস্তৃত হইয়া একটি গল্প উপস্থিত করে। এই কাহিনীগুলির সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া কেহ কেহ ইহাদের মধ্যে অর্থহীন ভাবালুতা দেখিয়াছেন। ভাবের অর্থ না বুঝিলে তাহার মর্য্যাদা বুঝিতে পারি না। সৃষ্টির সবকিছু কিভাবে যে জীবনানান্দর কাব্যে একাকার হইয়া নানা ভাবের সৃষ্টি করে তাহা বুঝিয়া লইতে হইবে। হৃদয়ের বেদনার কথা যে কিভাবে 'সান্ত্বনার নিভৃত নরম কথা' হইয়া যায় তাহা আমরা সাধারণ মানুষ বুঝিতে পারি না। কবি নিজেকেও বাংলাদেশের প্রকৃতির একটি অঙ্গ বলিয়া কল্পনা করিতে পারেন। তিনি যে প্রকৃতির সব রাগ, সব সুর আত্মস্থ করিতে পারেন তাহার কারণ তিনি প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হইয়া গিয়াছেন :

> ঘাসের বুকের থেকে কবে আমি পেয়েছি যে আমার শরীর—
> সবুজ ঘাসের থেকে ; তাই রোদ ভালো লাগে—তাই নীলাকাশ
> মৃদু ভিজে সকরুণ মনে হয় ;—পথে পথে তাই এই ঘাস
> জলের মতন স্নিগ্ধ মনে হয় ; —মউমাছিদের যেন নীড়
> এই ঘাস ;…

আমার দোষ এই যেহেতু আমি পণ্ডিত সমালোচক নহি, সেই হেতু আমি সমালোচনাকে পূজা বলিয়া মনে করি। যে কবি আমার হৃদয় স্পর্শ করে না তাঁহার সম্বন্ধে আমি লিখি না। জীবনানন্দের কোন কবিতায় আমি অর্থ-হীন ভাবালুতা দেখি নাই, কেবল সুন্দর নিবিড় ভাব লক্ষ্য করিয়াছি। তবে এই ভাব জীবনানন্দের কাব্যে এমন এক অভিনবত্ব লাভ করিয়াছে যে তাহা কখনও কখনও ভাবের অভাব বলিয়া মনে হয়। আমি আবার বলি জীবনানন্দের কাব্য আমাদের বিশেষ যত্ন করিয়া পড়িতে হইবে। কারণ, এই কাব্য সত্যই পৃথিবীর কাব্যের ইতিহাসে, ভাবে ও ভাষায় এক অভিনব কাব্য।

কিন্তু তবু বলি বাংলা কাব্য হইতে জীবনানন্দ বিচ্ছিন্ন নহে। তিনি আমাদের কাব্য-সংসার হইতে ভিন্ন হইয়া এক নূতন সংসার পাতিবার কথা ভাবেন নাই। এক মার্কিন সমালোচক জীবনানন্দ সম্বন্ধে তাঁহার গ্রন্থখানির নাম দিয়াছেন A Poet Apart অর্থাৎ তিনি বলিতে চাহিতেছেন যে জীবনানন্দ এক ভিন্ন জাতের, ভিন্ন স্বাদের কবি। কিন্তু শ্রেষ্ঠ প্রতিভা তাঁহার সাহিত্যের প্রতিভা হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না। এক কালে মাইকেলকেও আমরা বাংলা সাহিত্যের ট্র্যাডিশান হইতে বিচ্ছিন্ন বলিয়া ভাবিতাম। আমার মনে হয় এই মার্কিন সমালোচক Milton সম্বন্ধে Wordsworth এর সুপরিচিত উক্তিটি স্মরণ করিয়া তাঁহার বইখানির নামকরণ করিয়াছেন। Wordsworth Milton সম্বন্ধে বলিয়াছেন Thy Soul was like a star that dwells apart. Milton কিন্তু Spencer এবং Shakespear এর বংশের কবি। তাঁহার অভিনবত্ব তাঁহাকে ইংরাজি সাহিত্যে ট্র্যাডিশান হইতে বিচ্ছিন্ন করে নাই। জীবনানন্দও তাঁহার ভাবের ও ভাষার অভিনবত্ব সত্ত্বেও এক শ্রেষ্ঠ বাঙালী কবি।

'রূপসী বাংলা'র একটি কবিতায় জীবনানন্দ লিখিয়াছেন :

আবার আসিব ফিরে ধান সিড়িটির তীরে—এই বাংলায়
হয়তো মানুষ নয়—হয়তো বা শঙ্খচিল শালিখের বেশে ;
হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে
কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব এ কাঁঠাল-ছায়ায় ;
হয়তো বা হাঁস হ'ব—কিশোরীর—ঘুঙুর রহিবে লাল পায়,
সারাদিন কেটে যাবে কলমীর গন্ধ ভরা জলে ভেসে ভেসে ;
আবার আসিব আমি বাংলার নদী মাঠ ক্ষেত ভালোবেসে
জলঙ্গীর ঢেউয়ে ভেজা বাংলার এ সবুজ করুণ ডাঙায় ;

এই লাইনগুলি আজ বাঙালীর মুখে মুখে, এবং জীবনানন্দের জন্ম-শতবার্ষিকীতে আজ দুই বাংলার মানুষ কত উৎসাহ ও আগ্রহ লইয়া তাঁহার জীবন ও রচনার আলোচনা করিতেছে। এমন উৎসাহ বোধহয় রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকীতেও দেখি নাই। তাঁহার কারণ বোধহয় এই যে বাঙালীর বড় দুঃখ যে তাহারা জীবনানন্দকে তাঁহার জীবৎকালে তেমন চিনিতে পারে

নাই। জীবনানন্দ সম্বন্ধে সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের গ্রন্থখানি বোধহয় প্রথম গ্রন্থ। সেই গ্রন্থ পড়িয়া মনে হইয়াছে যে কবি তাঁহার কর্ম্ম-জীবনে সুখের মুখ দেখেন নাই। কবিবন্ধু নীহাররঞ্জন রায়ের কাছে এই সম্বন্ধে আরো অনেক কথা শুনিয়াছি; কিন্তু জীবনানন্দের শান্ত, স্নিগ্ধ, সরল ব্যক্তিত্বের কথাও শুনিয়াছি; মনে হয়, তাঁহার এই ধৈর্য্য তাঁহার জীবন সাধনার ও কাব্য সাধনার একটি প্রকাশ; জীবনানন্দের কথা মনে হইলে তাঁহার যে কথা কয়টি আমার কানে বাজে সেই কয়টি দিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করি :—

'রাঙা মেঘ সাঁতরায়ে অন্ধকারে আসিতেছে নীড়ে
দেখিবে ধবল বক'।

শতবর্ষে কবি জীবনানন্দ দাশ

মণীন্দ্র রায়

দেখতে দেখতে কবি জীবনানন্দ দাশের শতবর্ষ এসে গেল। কবির জীবদ্দশাতেও খানিকটা বোঝা গিয়েছিল তিনি বড় কবি। যতই দিন যাচ্ছে সেটা ততই উজ্জ্বল ও উজ্জ্বলতর হয়ে উঠছে। এখন যে কথা জোর গলায় বলা চলে। তিনি আধুনিক কবিদের মধ্যে সবচেয়ে বড়।

কবি জীবনানন্দ দাশের কাছে আমার কিছু ক্ষমাপ্রার্থনার ব্যাপার আছে। তাঁর কাব্যবিচারে আমার কিছু ভ্রান্তি ঘটেছিল। দোষটা শুধু আমার একার নয়, সেকালে যারা বামপন্থী ছিলেন তাদেরও এ ভুল হয়েছিল। এই ভুলের জন্য বামপন্থীরাই শুধু দায়ী ছিল তা নয়, কবিরও অবদান কিছু কম ছিল না।

কবির প্রথম সাড়া জাগানো বই কাব্যগুণে যতই শ্রেষ্ঠ হোক, বক্তব্যের দিক থেকে ছিল অবক্ষয়ের প্রতীক। তিরিশের মাঝামাঝি আমাদের সামাজিক অবস্থা ছিল অবক্ষয়মুক্ত। যখন দুটি মনোভাব ছিল কবিদের মধ্যে। এক রবীন্দ্র প্রভাব এড়ানো, আর দুই—নিজস্ব একটি বাক্‌ভঙ্গী তৈরী করা। সেদিক থেকে জীবনানন্দ দাশ সার্থক হয়েছিলেন তা স্বীকার করতেই হবে। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' আমাদের সাহিত্যে এক অবিস্মরণীয় অবদান।

এই বইটি বের হওয়ার পর কবিতার সম্পাদক বুদ্ধদেব বসু দুটি প্রবন্ধ লেখেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও তাঁর বইকে বলেছিলেন 'গ্রীষ্ম কান্তার ময়'। অথচ খুঁটিয়ে দেখলে এর মধ্যে ত্রুটিও কম ছিল না। সমর সেন যাকে বলেছিলেন "image hunting"।

ধরুন এইসব লাইন—'সিংহের হুঙ্কারে উৎক্ষিপ্ত একপাল জেব্রার মত সাঁই সাঁই ছুটে গেল হাওয়া' কিংবা 'চিনে বাদামের মত বিশুষ্ক বাতাসে' কিংবা 'উটের গ্রীবার মত কোন এক নিস্তব্ধতা' ইত্যাদি। এগুলোর মধ্যে কিছু কষ্টকল্পনাও আছে আবার কিছু সাহসও আছে। কিন্তু সব মিলিয়ে একটা অবক্ষয়ের চিত্র—মৃত্যু, শুষ্কতা, রোগা শালিকের বুকের ইচ্ছার মত-অথচ আবার অন্য দিকে এই বইটিতেই পাই আমরা বাংলায় প্রথম কিছু ভাল সুররিয়্যালিস্টিক কবিতা।

(২)

আসলে আমাদের বামপন্থীদের অসুবিধা হয়েছিল কবি বিষ্ণু দে-কে বড় করে দেখানোর চেষ্টায়। সোভিয়েট বিপ্লবের পর বামপন্থী আশা আকাঙ্ক্ষায় প্রচণ্ড একটা জোয়ার এসেছিল। যেমন সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য্য এসেছিলেন।

কিন্তু আন্তর্জাতিকতার উপরের আবরণটা বাদ দিলে, জাতীয় স্তরে যুদ্ধ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ জীবনানন্দের কবিতায় প্রবলভাবে প্রভাব ফেলেছিল। সে সময় ইংরেজদের 'ডিনায়েল পলিসি'তে 'বাংলার লক্ষগ্রাম তৈলহীন সুকেশী আঁধারে, অন্নহীন দুর্ভিক্ষের আড়ালে ছুটেছি আঁধারে', দেশভাঙা দাঙ্গা, উদ্বাস্তু সমাগম, কবির 'সাতটি তারার তিমির' বইতে সবই আছে।

দলবদ্ধ এই অবহেলায় জীবনানন্দের মত সংবেদনশীল কবির মনে আঘাত হেনেছিল।

জীবনানন্দ দাশ একটু একসেনট্রিক মানুষ ছিলেন সেটা ঠিক। ফলে আমাদের বামপন্থী কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় যখন জীবনানন্দ দাশের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন তখন কবি মাথার বালিশের তলা থেকে একটা রিভলভার বের করে সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে দেখে হাতে নাচাচ্ছিলেন। সেই দেখে সুভাষ মুখোপাধ্যায় বেশীক্ষণ থাকা নিরাপদ মনে করেন নি।

আমি, মণীন্দ্র রায়ও, দু'বার গিয়েছিলাম। প্রথমদিন আমি খাটের উপর বাণ্ডিল করা খাতা দেখে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—'এগুলো কি ম্যাট্রিকের?' তিনি সতেজে জবাব দিলেন—'না, বি. এ-র। অনার্সের খাতা।' আমি বললাম—'আপনার বনলতা সেন কবিতাটি খুব ভাল। পো-এর কবিতা 'টু হেলেন'-এর উপর ভিত্তি করে আপনি প্রায় নতুন একটা কবিতা লিখেছেন। এটা সত্যিই অপূর্ব।' উনি বললেন—'এটা অনেকেই বলে।'' তারপর অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ভাবে জীবনানন্দ দাশের মৃত্যু ঘটে।

জীবনানন্দ দাশের মৃত্যুর পর জলপাইগুড়ি থেকে প্রকাশিত একটি পত্রিকায় বলা হয়েছিল আমি মণীন্দ্র রায় নাকি একটি বিরূপ মন্তব্য করে প্রবন্ধ লিখেছিলাম। কিন্তু জীবনানন্দ দাশ বেঁচে থাকাকালীন বলেছিলেন যে—'মণীন্দ্র রায়ের কবিতা আমি পড়েছি। তিনি অত্যন্ত ভাল লেখেন।' এইসব চিঠিগুলো 'ময়ূখ' নামে পত্রিকায় বেরিয়েছিল। এই চিঠিগুলো পড়ে

জীবনানন্দ দাশের মহানুভবতায় আমি তখন লজ্জিত হয়ে গিয়েছিলাম।

(৩)

জীবনানন্দের আগে মধুসূদন দত্ত এবং রবীন্দ্রনাথ বড় কবি ছিলেন এবং মহাকবি ছিলেন। কিন্তু সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে না পেরে মধুসূদন মিল্টনে আটকে গিয়েছিলেন। অতুলচন্দ্র গুপ্ত বিষ্ণু দের কবিতাকে "বিশুদ্ধ ইয়ার্কি" বলেছিলেন। এলিয়ট লিখেছিলেন waste land-এর কবিতা। আর বিষ্ণু দেরা কাব্যের waste hand রচনা করেছিলেন।

(৪)

কবিরা দু'জাতের হন। আবেগের কবি আর বুদ্ধির কবি। সাধারণ ভাবে বলা যায় জীবনানন্দ ছিলেন বুদ্ধির কবি।

বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ এবং অমিয় চক্রবর্তী মহাশয়রা খুব পড়ুয়া কবি ছিলেন। কিন্তু তাঁদের পড়াশোনা সাহিত্য এবং দর্শন সম্বন্ধে বিশেষভাবে আবদ্ধ ছিল। জীবনানন্দ সেখানে ছাড়িয়ে গেছেন। সেখানে তিনি বিজ্ঞান সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন। না হলে এ সব কথা লেখা যায় না :—

তিনি নিজেও বলেছেন কবিতা রসেরই ব্যাপার। বুদ্ধি মিশ্রিত রস। "আকাশের ওপারে আকাশ" কিংবা "শাশ্বত রাত্রির বুকে সকলি অনন্ত সূর্যোদয়।"

আন্তর্জাতিক দিক থেকে তিনি ইয়েট্স্, এড্গার এলেন পো, এলিয়ট বোদলেয়ার, হাইজেন বার্গ, আইনস্টাইন সকল কবি ও বিজ্ঞানীদের সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতেন। এসব কবি ও বিজ্ঞানীদের কথা তিনি বিশেষভাবে জানতেন তাই তাঁকে বাঙালীরা বিশেষ আন্তর্জাতিক মানের কবি বলে মনে করতেন।

(৫)

সকলেই জানেন Tragic sense of life ছাড়া বড় কবি হওয়া যায় না। মধুসূদন যে ক'টি লিরিক কবিতা লিখেছিলেন সেগুলো সব হাহাকারে ভর্তি।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা যেমন 'তবু মনে রেখো,' 'পুরাতন প্রেম, ম্লান হয়ে যায় যদি' বা 'পৃথিবীর প্রতি' ইত্যাদি কবিতা জীবনধর্মী। জীবনানন্দের মতে

'একবার যখন দেহের থেকে বেরিয়ে যাব,
আর কি ফিরে আসব না
আবার যেন ফিরে আসি
একটি হিম কমলালেবুর মাংস হয়ে
কোনো প্রিয়জনের শিয়রে।

এ কথা বলার ধৃষ্টতা আমার নেই যে আর কোনো ত্রিশের বাঙালী কবি বোদলেয়ার পড়েন নি। কিন্তু তার ছাপ নিজেদের লেখার মধ্যে খুঁজে পাওয়া কঠিন। বুদ্ধদেব বসু বোদলেয়ার অনুবাদ করেছিলেন। তাঁর লেখায় কিছু বহিরঙ্গ ছাপ আছে কিন্তু অন্তরঙ্গ কোন শাঁস নেই। জীবনানন্দের লেখায় 'নষ্ট শশা', 'গলগন্ড পুঁজ' এসব পাওয়া যায়। পাওয়া যায় 'শত শত শূকরীর প্রসবযন্ত্রণা।' পাওয়া যায় 'রক্ত, ক্লেদ বসা থেকে উড়ে যায় মশা, আকন্দ ধুঁদুল।

(উদ্ধৃতির অংশগুলো স্মৃতি থেকে দেওয়া। অনেক ভুলও হতে পারে।) পাঠক জীবনানন্দ দাশ পড়লে অনেকে নিজেই পাবেন।

জাতীয় স্তরে বিশেষ করে পশ্চিম বাংলায় যুদ্ধ, দাঙ্গা এবং উদ্বাস্তু সমাগম ও তাদের নাজেহাল হওয়া সবই তাঁর কবিতায় রয়েছে। যারা এটা না মানতে বদ্ধপরিকর তাদের বোঝাবার ক্ষমতা আমার নেই। এ যুগের শিক্ষিত পাঠক সকলের নিজের নিজের মত আছে। সে মতের বিরুদ্ধে কোনো মতই তাঁরা গ্রহণ করেন না।

কবি বিষ্ণু দে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য এবং আরও অনেকে কমিউনিষ্ট পার্টির কাছে সমর্থন পেয়েছেন। কিন্তু জীবনানন্দ দাশ তা পাননি, অথবা তা তিনি চানওনি।

এত কথা বলার পরেও একটা ব্যাপার থেকেই যায় সেটা হ'ল ব্যক্তিগত জবাবদিহি। জীবনানন্দ দাশ বড় কবি, মানে বিষ্ণু দে-কে ছোট করা নয়। এই লেখকের পক্ষপাত বরং বিষ্ণু দের প্রতিই বেশী,- অর্থাৎ বুদ্ধিবাদের দিকে।

বিষ্ণু দে এবং জীবনানন্দ দাশ পরস্পর প্রতিস্পর্ধী কবি ছিলেন। অর্থাৎ শুধু এইটুকুই, পাল্লাটা একটু ঝুঁকেছিল জীবনানন্দ দাশের দিকে। কেন সেটি হল এই নিবন্ধটি পড়লেই বোঝা যাবে। অর্থাৎ জীবনানন্দ দাশের 'tragic sense of life' এবং যুগটা যে বিজ্ঞানের সেই সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা।

পরিশেষে জানাই লেখাটি খাপছাড়া হ'ল। আমি নিরুপায়, শরীর প্রতিকূল। স্মৃতি আমার সঙ্গে প্রতারণা করে, তাই যেসব উদ্ধৃতি এখানে দেওয়া হয়েছে হয়ত তাতে অনেক ভুল থাকতে পারে। তাই নিবেদন, পাঠক আমাকে যেন দয়া করে মার্জনা করেন। এবার থামি।

প্রতীক্ষার শব্দ : জীবনানন্দ

অমিতাভ দাশগুপ্ত

যাকে বলে পুরনো আর নতুন ডিকশন-এর মোজেইক, তা আমি জীবনানন্দ দাশের কবিতাতেই প্রথম পাই। মধ্যানুপ্রাস বা অন্তর্মিল ব্যবহারে তাঁর আসক্তি ছিল আমৃত্যু। ঝোঁক ছিল সাতবাসি শব্দের সঙ্গে একদিকে গ্রাম্য, হাটুরে, অন্যদিকে, ইংরিজি শব্দের ঢালাও ব্যবহারে। একটি ছোট কবিতাতেও নির্বিচারে 'হাঁটিতেছি', 'মুখোমুখি বসিবার' ইত্যাদির সঙ্গে 'অনেক ঘুরেছি' 'দিয়েছিল' ক্রিয়াপদ মিশিয়েছেন। সাধুভাষা ও কথ্যভাষার এহেন ঢালাও মিশেলে তাঁর কবিতা কখনও শ্রুতিসুখকর হলেও ভাষাকে আধুনিক ও ছিমছাম করে তোলার ব্যাপারে কোনও ম্যানডেট মানতে চাননি। একটি দীর্ঘ পংক্তির পর একটি দু-শব্দ বিশিষ্ট পংক্তি। তারপর জীবনানন্দের একান্ত নিজস্ব প্রথার একটি ইলিপ্‌টিক্যাল দাঁড়ির ব্যবহার—এটা কিন্তু রীতিমত স্কুলিং করার ব্যাপার। বাংলা কবিতায় এর কোনও নজির নেই, আছে স্রেফ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দুটি উপন্যাস—কপালকুণ্ডলায় ও আনন্দমঠ-এ। কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত একটি আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "সাহিত্যে প্রোগ্রেশনের কথাই লোকে ভাবে, রিগ্রেশনের কথা অকল্পনীয়।" জীবনানন্দ অবশ্য এই কনসেপ্ট্‌-এর কোনও তোয়াক্কা করেন নি। একটির পর একটি চমৎকার উপমার শিকল গেঁথে গেঁথে পুরনো মোহময় নগরগুলির নাম ও ইতিহাসের রোমান্টিক গল্প মিশিয়ে সুদূর স্বপ্নালোকিত যুগের 'মাথাঘষা আর আতরের খুশবু' চারপাশে ছড়িয়ে মুহূর্তে তিনি আমাদের চেতনাকে তুক্‌ করে নেন। স্নায়ুযুদ্ধের তুমুল ঝড়ে একেবারে খতম করে দেন মেধার সজাগ আস্ফালন। সে অর্থে এক হাজার বছরের ইতিহাসে এক-মাত্র জীবনানন্দই হতে পারতেন বাংলা কবিতার প্রথম ও শেষ ডাইওনিসিয় কবি। কেন হন নি সে-প্রসঙ্গে কিছুক্ষণ পরে আসছি।

অন্যেরা করেন না, কিন্তু জীবনানন্দ অকপটে স্বীকার করেছিলেন যে, তিনি আর পাঁচজনের চাইতে আলাদা আত্মপরিচয় রাখতে চান। আমরা অবশ্য জানি, এই আলাদা আত্মপরিচয়ই একজনকে পদ্যলেখক নয়, কবি করে তোলে। বাংলা সাহিত্যে হাজার হাজার পদ্য লিখিয়েদের ভীড়ে কবি বড়-

জোর জনা পনেরো, জীবনানন্দ নিঃসন্দেহে এই কয়েকজনের একজন। একটু করে রোগা মেঘ ছড়াতে ছড়াতে যেমন শেষমেশ একটা গোটা পাহাড় ঢেকে ফেলে, তেমনই তাঁর কবিতা আমাদের আক্রমণ করে, আবেগে ও অনুভূতিতে তীক্ষ্ম কীলকের প্রথায় ঢুকে যায়। এ-সম্মোহন মহিমার কোনও তুলনা নেই।

অধিকাংশ কবিতা লেখকেরই রচনায় সবকিছু খুঁজে পাওয়া যায়, স্রেফ একটি জিনিস—'কবিতা' ছাড়া। আর, জীবনানন্দের লেখায় এই উপাদানটির যোগান এতবেশি যে অন্যান্য ব্যাপারে সঙ্গতি—অসঙ্গতি, সাবেক—আধুনিক —এসব নিয়ে কোনও প্রশ্ন তোলার অবকাশই পাওয়া যায় না। মাত্রাবৃত্ত ছন্দকে প্রশ্রয় না দিয়ে এমনকি বহু প্রচলিত স্বরবৃত্তকেও ঠোনা মেরে তিনি পয়ার, বা যেটা আগে অক্ষরবৃত্ত ও ছন্দ বলে প্রচলিত ছিল, শুধু সে ছন্দে যাবতীয় কবিতা লিখে যান। অর্থাৎ ছন্দের ক্ষেত্রে যা তাঁর কাছে সহজে ও অনায়াসে আসে তার বাইরে গিয়ে কসরতের ঘাম ঝরানোর আদৌ বাসনা ছিল না তাঁর। তিনি মনে করতেন, অভ্যাসের বাইরে গিয়ে অন্য ছন্দের দিকে মন দিতে গেলে মনের কথাগুলোই গুলিয়ে যায়। বরং, ঘোড়া নয়, আরোহীর দিকেই ছিল তাঁর বরাবরের নজর।

কিন্তু কবিতার যে দ্বিতীয় ভুবন জীবনানন্দ গড়ে তোলেন, তার চেহারা, মর্জি, রং আর পাঁচজনের চাইতে একেবারেই আলাদা। কালিদাস থেকে রবীন্দ্রনাথ তথাকথিত ঋতুরাজ বসন্তকে নিয়ে যে আদিখ্যেতা করেছেন, তা তাঁকে রীতিমত ক্লান্ত করেছিল। তাই তাঁর কবিতার প্রিয় ঋতু বসন্ত নয়, 'বিয়োবার দেরি নেই আর' যে ঋতুর, সেই ম্লান হেমন্ত। দোয়েল বা শালিখ বিবর্ণ ইচ্ছার মত মাঝে মাঝে তাঁকে টানে বটে, কিন্তু কোকিল বা মেঘ দেখে পেখম ছড়িয়ে নাচতে থাকা ময়ূর আদৌ নয়। বরং কর্কশনিনাদী প্যাঁচা তাঁকে কালের দ্যোতনা ও মাত্রা এনে দেয়। বাতাসে দুলে ওঠা ধানের বন্যা নয়, ধানকাটা মাঠের শষ্যশেষ-প্রান্তরের মাইল মাইল ঊদাসীনতা তাঁকে সহ-যানে নিয়ে যায়। তাঁর পাঠকদের-ও। তাঁর প্রকাশ-রীতির শিথিলতা, একই শব্দের পুনরাবৃত্তি—সব কিছু অতিতুচ্ছ হয়ে যায়। তাত্ত্বিকদের সব শেখানো কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে আমরা তাঁর কবিতার সামনে নতজানু হয়ে বসি। দিনরাত শিশিরপতনের শব্দ শুনতে শুনতে দেখি, একসময় প্রক্ষালন হয়ে গেছে।

২

জীবনানন্দের কবিতার বাগধর্ম বা বলার চালের মধ্যে আমরা একধরনের সাঙ্গীতিক কাউন্টার পয়েন্ট রিদম্ পেয়ে যাই। তাঁর প্রায় সব কবিতার গঠন ছন্দযতির বদলে অর্থযতি-ভিত্তিক। তাঁর কবিতার নিভৃত গঠন ও গুন্ঠনে গদ্যের যে রূপগুণ চোখে পড়ে, তাঁর উচ্চারণ ধর্মের আর্কিটাইপ শুধু সাধু রীতির ক্রিয়াপদ-সর্বনাম বা দু-চারটে কবিতাসিদ্ধি-ঘটিত শব্দ ও শব্দভিত্তিক প্রয়োগের ফলেই ব্যর্থ হতে পারে না। ১৯৮২-র এপ্রিল সংখ্যার পরিচয় পত্রিকায় জীবনানন্দের কবিতার গদ্যভাষা নিয়ে একটি নিবন্ধ লিখেছিলেন ধীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত। তিনি জীবনান্দের সমগ্র কাব্যেপরিধির মধ্যে এমন একটি স্বরের সন্ধান পেয়েছিলেন, যার ভাষাগত ভিত্তি ঠিক সাধুরীতিরও নয় চলিত রীতিরও নয়, কিন্তু তা একাধিক উপভাষা-পালিত কোনও 'আত্মজৈবনিক বাক' বা উচ্চারণসাধ্য ভাষায় খানিকটা আসে। বস্তুত সে-তথ্য তাঁর কবিতার অন্তঃশরীরেই লীন হয়ে আছে। সেই নিস্সিত ভাষাভঙ্গি, যা আসে না, অথচ যা আসতে চায়, সেই নিঃশ্বাসের মত, পায়ে পায়ে শুকনো পাতা গুঁড়িয়ে যাওয়ার মত। জীবনানন্দের বহুখ্যাত :

"বলি আমি এই হৃদয়েরে
সে কেন জলের মত ঘুরে ঘুরে একা কথা কয়।।"

—এই পংক্তি দুটি উদ্ধার করে শ্রী রক্ষিত মন্তব্য করেছেন, "জলের মত ঘুরে ঘুরে" একলা এই আত্মকথনের ভঙ্গিমাটি বরিশালের জলাজঙ্গল থেকে বহুদূর বাংলাদেশের কঙ্কাবতী শঙ্খমালা চন্দ্রমালা মানিকমালার, মনসামঙ্গলের, আম জাম কাঁঠালের, শ্যামা আর খঞ্জনার, শত শতাব্দীর ক্ষেত-মাঠ-প্রান্তরের বিকেলবেলার হেমন্ত-কুয়াশার, রাত্রির, নক্ষত্র ও নক্ষত্রের অতীত নিস্তব্ধতার, স্বপ্নের, রোম লন্ডন ন্যুইয়র্ক, এশিরিয়া—বেবিলন গৌড়বাংলা দিল্লী বিদিশা উজ্জয়িনীর, একরাশ তারা-আর-মনুমেন্ট ভরা কলকাতার, মৃত্যু আর বাণিজ্যের বেলোয়ারি দিনগুলির, সিন্ধুশব্দ বায়ু রৌদ্রশব্দ রক্তশব্দ মৃত্যুশব্দবাহী ইতিহাসযানের এবং তাবৎ হননশেষে, শুশ্রূষার, খননের শত জলঝর্ণার ধ্বনিতে যে-বিচিত্র আরহময় স্বরমণ্ডল রচনা করে তা বাংলা কবিতার একই সঙ্গে ব্যক্তিগত ও বস্তুগত বীক্ষণের ডায়ালেকটিকে এক সর্বাঙ্গীন বিধুর বাগভঙ্গি গড়ে তোলে।"

আসলে এই বাগভঙ্গিই তো কবির ব্যক্তিত্ব ও সৃষ্টির দায়, যা বিচ্ছুরিত

হতে থাকে তাঁরই কল্পনাপ্রতিভা বা ইমাজিনেশন থেকে। জীবনানন্দ কি নিজেই সেই 'সংস্কারমুক্ত শুদ্ধ তর্কের ইঙ্গিত' শুনতে চান নি, যা ইতিহাস চেতনায় সুগঠিত এবং যা কবিতা লেখার সময় নিষ্কর্ষই। টেম্পরারি সাসপেনশন্ অব ডিজবিলিফ' নয়? তিনি তো নির্দ্ধিধভাবে বলেছেন, "কবির পক্ষে সমাজকে বোঝা দরকার। কবিতার অস্থি-র ভিতরে থাকবে ইতিহাস চেতনা ও মর্মে থাকবে পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞান।" যে-বানভপন্থী মার্কসবাদীরা একসময় জীবনানন্দের কবিতাকে বেলের খোলায় তালগোল পাকানো অসমৃদ্ধ সংলাপ বলে আক্রমণ করেছিলেন, তাঁদের অসীম হঠকারিতার জবাব কেবল জীবনানন্দের রচনা থেকে ওপরের উদ্ধৃতিটুকু তুলেই দেওয়া যেতে পারে।

'মহাপৃথিবী' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'বিভিন্ন কোরাস' কবিতাটিতে জীবনানন্দ লিখেছিলেন :

"সারাদিন ধানের বা কাস্তের শব্দ শোনা যায়।
ধীর পদবিক্ষেপে কৃষকেরা হাঁটে।
তাদের ছায়ার মত শরীরের ফুঁয়ে
শতাব্দীর ঘোর কাটে কাটে।"

এই পর্যায়েই 'অভিভূত চাষা' ('আবহমান'), যে একটি 'পাখির মত ডিনামাইটের পরে বসে' চাষবাসের কাজে লিপ্ত থাকে। এই 'আমিষ তিমিরে' অজ্ঞতা থেকে হঠাৎ হঠাৎ 'পৃথিবীর মহত্তর অভিজ্ঞতা' নষ্ট-ও করে ফেলে, সোনার ফসল ডুবে যায় পরাবাস্তবের মারমুখী বন্যায়, সে-ও কিন্তু শেষপর্যন্ত 'ধীর পদবিক্ষোভে' রাবীন্দ্রিক রোমান্টিকতার ঘোর কাটিয়ে 'মানুষের বেদনা ও সংবেদনাময়' ইতিহাসের সত্যের অংশ হয়ে যায়। 'দেখেছি যা হল, হবে, মানুষের যা হবার নয়', তাকেই সম্ভব করে তোলার যাত্রার ধ্বনি আমি বার-বার জীবনানন্দে শুনতে পেয়ে যাই। আর এখানেই তিনি একদিকে এলিয়ট বা সুধীন্দ্রনাথ দত্তের দর্শনের নেতি ও অন্যদিকে বিষ্ণু দে-র সবার্থে ইতিবাচকতার দুই মেরুর 'ফাইন্যালিটি' থেকে নিজেকে সরিয়ে কষ্টকর জটিল উন্মেষের মধ্য দিয়ে গড়ে তোলেন তাঁর চেতনার ধ্বনি প্রতিক্রিয়া :

"মৃত্তিকার ঐ দিক আকাশের মুখোমুখি যেন সাদামেঘের প্রতিভা ;
এই দিকে ঋণ, রক্ত, লোকসান, ইতর, ঘাতক ;
কিছু নেই—তবুও অপেক্ষাতুর ;
হৃদয়স্পন্দন আছে—তাই অহরহ

বিপদের দিকে অগ্রসর ;
পাতালের মত দেশ পিছে ফেলে রেখে
কিছু চায় ;
কী যে চায়।"

('নাবিকী,' সাতটি তারার তিমির)

আগেই বলেছি, কোনও সরলীকরণে একই সঙ্গে এই জটিল সময়ের ও মহাসময়ের কাব্যরূপকার জীবনানন্দকে বন্দী করা যাবে না। তিনি জানেন ব্যক্তিমানুষ মরণশীল। কিন্তু মানবপ্রজাতির শেষ যাত্রা নেই। তিনি বিশ্বাস করেন যে কালের ও সভ্যতার সঙ্গে ইতিহাসের ক্ষয় হয় না। যদিও তিনি জানেন—সে অনেক শতাব্দীর, মনীষার কাজ। আর, সব পতনের পর অভীপ্সার হাত ধরে উঠতে গিয়ে আমাদের হাতে কবি জীবনানন্দের করস্পর্শ হয়ে যায়।

৩

কবি জীবনানন্দ : সময়ের একক

বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়

কবিতাটার শিরোনাম : 'হঠাৎ তোমার সাথে'। কবি : জীবনানন্দ দাশ। শেষ স্তবকের প্রতিটি পঙক্তির সোপান বেয়ে অন্তিমে এসে বিমূঢ় আমি—শতাব্দীর শেষপ্রহরের এক সামান্য পাঠক যার মনের গভীরে বিচিত্র তরঙ্গ তাড়না—প্রশ্ন করি নিজেকেই ঘুরে ফিরে—একি কবির কবিতা না কি সময়ের জটিল মানসাঙ্ক ?

হে সময়, একদিন তোমার গহন ব্যবহারে
যা হয়েছে মুছে গেছে, পুনরায় তাকে
ফিরিয়ে দেবার কোন দাবি নিয়ে যদি
নারীর পায়ের চিহ্নে চলে গিয়ে তোমার সে অন্তিম অবধি
তোমাকে বিরক্ত করে কেউ
সব মৃত ক্লান্ত ব্যস্ত নক্ষত্রের চেয়েও অধিক
অধীরতা ক্ষমতায় ব্রহ্মাণ্ড শিল্পের শেষ দিক
এই মহিলার মতো নারীচোখে যদি কেউ খুঁজে ফেরে, তবে
সেই অর্থ আমাদের এই মুহূর্তের মতো হবে।

কবিতা লেখার ছলে কেউ কি লিখে গেলেন সময়ের সূত্র ? নিষঙ্গ থেকে নিষ্কাশিত অব্যর্থ একটি শায়ক সময়ের বিজ্ঞানকে স্পর্শ করল কি সুনিশ্চিত ভাবে ? শায়ক-এর উপমান স্মরণে এল স্টিফেন হকিং-এর দুনিয়া কাঁপানো বই 'A Brief History of Time'-এর "The Arrow of Time" পরিচ্ছেদের একটি অংশ স্মরণে আসায়। বিজ্ঞানীর কর্ম কবির প্রিয়কৃত্য নয়, তবু 'কবিতা' ইতিহাস-দর্শন-বিজ্ঞান সব কিছু নিয়ে যেন এক পরম কাণ্ড যা আপেক্ষিকতাবাদ এবং কোয়াণ্টাম মেকানিক্স্-এর সহাবস্থান ঘটাতে পারে নির্বিকারভাবে। শুধু তাই নয় কবিতা সেই বিস্ময়কর কর্মফল যার ব্যাপ্তিতে ক্ষুব্ধ ইতিহাস, দুরূহ দর্শন ও সাম্প্রতিকতম বিজ্ঞান মিশে থাকতে পারে নিগূঢ় তাৎপর্যে। জীবনানন্দের একটি প্রবন্ধে কিয়েকের্গার্দ-এর নামোচ্চারণ শুনেছি আর সদ্য উধৃত কবিতাংশে যা পেলাম তা প্রতিক্রিয়ার সূত্রে মনে এনে দিল হকিং-কথিত তিনটে সময়ের কথা : (১) '...the thermo-

dynamic arrow of time, the direction of time in which disorder or entropy increases', (২) 'the psychological arrow of time. This is the direction in which we feel time passes, the direction in which we remember the past but not future', (৩) 'Finally, there is cosmological arrow of time. This is the direction of time in which the universe is expanding rather than contracting.' সময় নিয়ে বিজ্ঞানের এই কূটতর্কে জীবনানন্দের আগ্রহ নচিকেতা-শোভন ছিল বলে জানি না। 'Big Bang' বা 'Black holes' তত্ত্ব হয়ত না জেনেই জীবনানন্দ লিখতে পেরেছেন এমন সব পঙক্তি ঃ

ইতিহাস ঢের দিন প্রমাণ করেছে
মানুষের নিরন্তর প্রয়াণের মানে
হয়তো-বা অন্ধকার সময়ের থেকে
বিশৃঙ্খল সমাজের পানে
চলে যাওয়া, গোলক ধাঁধার
ভুলের ভিতর থেকে আরো বেশি ভুলে ;
জীবনের কালোরাঙা মানে কি ফুরুবে
শুধু এই সময়ের সাগর ফুরুলে।

এই সব গভীর মনন-জাত পঙক্তি কাগজে কালির আঁচড়ে ফুটে ওঠার আগে মহাকাশের নক্ষত্র নিয়ে সুব্রহ্মণ্যন চন্দ্রশেখরের 'চন্দ্রশেখর লিমিট' বিশ্বের বিজ্ঞানী মহলে দারুণ বিতর্ক সৃষ্টি করে দিয়েছিল। কিন্তু বিজ্ঞানের তর্ক-তাপিত বিশ্বকেকবির অনুভব অবলীলায় স্পর্শ করে। নিউটন, প্ল্যাঙ্ক বা আইনস্টাইন অথবা চন্দ্রশেখরকে না জানলেও কবি তাঁর অনুভবে একধরনের মাধ্যাকর্ষণতত্ত্ব, কোয়ান্টামতত্ত্ব বা আপেক্ষিকতাবাদকে সময়ের সমীকরণে স্থিত করে নিতে পারেন। কবিতা আসলে এমন একটা অন্য ব্যাপার এবং এমন এক সত্য যার ওপর দেশ-কাল সরলভাবে তাৎক্ষণিক প্রভাব ফেলতে পারে না। টিলিয়ার্ডের ভাষায় কবিতা মাত্রই তির্যক। তবে মনে হয় জীবনানন্দের মত এতটা পারেন নি কেউ সময়ে থেকেও সময়কে বার বার প্রশ্ন করতে। কিন্তু সময়ভাবনায় কবিরা যে নানা ভাবে বিচলিত তা প্রমাণিত হয়েছে বহুবার এবং আপাতত সময় নিয়ে জীবনানন্দের ভাব ও ভাবনার গভীরতা ও ব্যাপ্তির

স্বরূপ চিনে নেওয়া যাক তাঁর সমকালীনদের কথা মাথায় রেখে এবং শুরু করা যাক রবীন্দ্রনাথ থেকে। রবীন্দ্রনাথ থেকে যাত্রা শুরু করে আমরা জীবনানন্দে ফিরে আসব এবং অন্য সকলকে স্মরণ করব তাঁকে জানার জন্যেই।

১৩০৪-এর ১৫ই বৈশাখ জোড়াসাঁকো-তে বসে লেখা 'কল্পনা' কাব্যের বিখ্যাত "দুঃসময়" কবিতার সর্বশেষ স্তবকটি, জানি, অনেকেরই কণ্ঠস্থ। তবু স্মরণ করছি প্রয়োজনের খাতিরে, অর্থাৎ আলোচনার Context-এ :

ওরে ভয় নাই, নাই স্নেহ-মোহবন্ধন,
ওরে আশা নাই, আশা শুধু মিছে ছলনা।
ওরে ভাষা নাই, নাই বৃথা বসে ক্রন্দন,
ওরে গৃহ নাই, নাই ফুলশেজ-রচনা।
আছে শুধু পাখা, আছে মহা নভ-অঙ্গন
উষা-দিশাহারা, নিবিড়-তিমির-আঁকা,
ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা।

আপনার সীমারেখাঙ্কিত ছোটো সময় থেকে বেরিয়ে আসার অভিপ্রায়ে লিরিক কবির আবেগোচ্ছ্বাসিত এই উচ্চারণ অবশ্যই বাঙলাকাব্যের কবিদের নতুন সময় পিপাসার স্বরূপ-নির্দেশক। এই কবিতাংশের 'সময়' রুদ্ধ প্রকোষ্ঠ থেকে ভবিষ্যতের দিকে সম্প্রসারিত। হকিং হয়ত এই 'সময়'-কেই বলেছিলেন 'Psychological arrow of time.'' এই 'সময়'ই সমকালের বিরাট সময়ের সংঘর্ষে জন্ম দিয়েছিল ১৩২২-এ শ্রীনগরে বসে লেখা 'বলাকা'র মত কবিতা। বর্তমান থেকে ভবিষ্যতে উত্তীর্ণ-হওয়ার বাসনা-জাত এই কাব্যিক সময় প্রকৃত সময় বা real time না-ও হতে পারে। ভূত-বর্তমান-ভবিষ্যতের কার্য-কারণ যোগসূত্রে যে time তা-ও কি Absolute হতে পারে? প্রত্যেকেরই নিজস্ব স্থানাঙ্কে সময়ের স্বরূপও ভিন্ন ভিন্ন, হকিং জানিয়েছেন সেকথা। এই রকম একটা নিজস্ব সময়ের অনুভব থেকে আলমোড়ায় বসবাসকালে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন :

কথা কও, কথা কও।
কোনো কথা কভু হারাও নি তুমি,
সব তুমি তুলে লও,

কথা কও, কথা কও।

একটু ছাড় দিয়ে স্তবকটির (৩য়) শেষ ছ'টি পঙক্তি শোনা যাক :

'যাহাদের কথা ভুলেছে সবাই
তুমি তাহাদের কিছু ভোল নাই
বিস্মৃত যত নীরব কাহিনী
স্তম্ভিত হয়ে রও—
ভাষা দাও তারে, হে মুনি অতীত,
কথা কও, কথা কও।'

ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান 'সময়' চিহ্নায়ক তিনটি শব্দ এই সরলরৈখিক ইতিহাস রচনা করে মাত্র। 'রিলেটিভিটি বা কোয়াণ্টাম' তত্ত্বে এই সময়ের কথার অনেক আগে থেকেই বড়ো কবিরা এই 'সময়'কে তাঁদের মত করে কাব্যিক আশ্রয় দিয়েছেন। আপাত দৃষ্টিতে বহমান যে-কাল, তার গভীর গোপন পথে এমন একটা অন্য সময়স্রোত বয়ে চলেছে যার স্বরূপ আমাদের আজকের উদ্বেগ-পীড়িত ব্যক্তিচৈতন্য অন্যভাবে উপলব্ধি করে নেয়। ত্রিকালের অবিশ্লেষ্য সম্পর্কে গড়ে ওঠা ইতিহাসের বিশ্বম্ভর রূপ যা হেগেলের দর্শনে দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় ধরা পড়েছিল তার মর্মে অঙ্কুশাঘাত করেছিলেন নীট্‌শে এই বলে যে, ইতিহাস-মনস্কতার অতিরেক মানুষকে অতিশীলিত এবং ক্ষয়িষ্ণু ক'রে শেষ পর্যন্ত সৃজনে অক্ষম 'Congenital grayheadednesss'-এর রোগীতে পরিণত করে। আজকের সময়ে আমাদের ব্যক্তিসত্তা প্রতি দণ্ডে প্রতি পলে খণ্ডিত হয়ে বিবর্ণ ও বিশীর্ণ। নীট্‌শে-উত্তর কালে এলিয়ট যথার্থই বিবৃত করেছেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের সময়পীড়িত ব্যক্তিমানুষকে এইভাবে :

Shape without form, shade without colour,
Paralysed force, gesture without motion

("The Hollow Men" : 1925)

ইতিহাসের মহাপ্রতাপ স্বীকার করেই এলিয়ট কালপ্রবাহকে দেখেছিলেন বর্তমানের বিন্দুতে স্থিত অতীত ও ভবিষ্যতের সমাহার রূপে :

Time past and time future
What might have been and what has been

Point to one end, which is always present.

(Four Quartets : "Burnt Norton" অংশে)

এলিয়ট দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের সমর্থক নন, তথাপি 'অতীতের অভ্যন্তরস্থ বর্তমান' জাতীয় Oxymoron অলঙ্কারের আশ্রয়ে সাহিত্যিকের 'সময়চেতনা' ব্যাখ্যা করেন যখন, তখন বর্তমানের গভীর তলশায়ী অতীতের গ্রাহ্য মূল্যকেও স্বীকৃতি দিয়ে ফেলেন। অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎকে একসূত্রে গাঁথার নিশ্চয়তায় এলিয়টের বিশ্বাস দীর্ঘকালীন; যদিও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের 'Four Quartets-এ তা স্পষ্টোচ্চারিত। "Prufrock and other observations"-এ (১৯১৭), "Gerontion"-এ, "The Waste Land" (১৯২২)-এ, "The Hollow Men" (১৯২৫)-এ এক কথায় সেরা এলিয়টে সময় বা কালের একনায়কত্বই চোখে পড়ে অদ্ভুতভাবে। এরিক অয়েরবাখ জার্মান শব্দ 'Historismus' ভেঙে একটি শব্দ তৈরি করেছিলেন : 'Historicism'. অয়েরবাখের সিদ্ধান্ত হল, প্রত্যেক সভ্যতা এবং প্রত্যেক কালপর্বের নিজস্ব একটা নান্দনিক শুদ্ধি ও চরমতা আছে। বিভিন্ন কালের গুণগত মাত্রার স্বাতন্ত্র্যই সেই কালের নন্দনের বিশ্বকে ভিন্নত্ব দেয়; ধারাবাহিকতা বলে কিছু নেই। এলিয়ট কি মানতে রাজি হতেন অয়েরবাখের তত্ত্ব? তাঁর আস্থা তো Resurrection-এ, Eternal Recurrence-এ। যদি কবিতা-রমণীর সঙ্গে বিজ্ঞান-পুরুষের বৈধমিলনের পক্ষে টলস্টয়ের রায় স্বীকার করে নেওয়া যায় এবং সেই সঙ্গে 'সময়' নিয়ে এলিয়টের উচ্চারণগুলো মিলিয়ে নেওয়া যায় তাহ'লে রবীন্দ্র-পরবর্তী বিশিষ্ট বাঙালি কবিদের সঙ্গে জীবনানন্দকে বসিয়ে তাঁর 'সময়'-চেতনা অবলম্বনে গণিতবিশ্বে প্রবেশ করাও হয়ত যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত আমাদের কবিদের ইতিহাস-ভাবনাকে যদি বা দ্বিঘাত সমীকরণে আনাও যায়, যদিও বেশিটাই সরল রৈখিক এবং একমাত্রিক, আমরা মনে করি, উত্তরকালীনেরা সময়কে ও ইতিহাসকে বুঝেছিলেন ছুটে যাওয়া দুপ্রান্তের Parabola হিসেবে। ইতিহাসকে রমণীদেহের সঙ্গে তুলনা করে তার Cunning Passages এবং Contrived Corridor-এর কথা বলেছিলেন এলিয়ট-ভাষ্যকারেরা। এই মুহূর্তে আমাদের আলোচনা এলিয়ট-কে নিয়ে নয়, তবু তিনি এসে যান যথাসময়ে যখন জীবনানন্দের 'হঠাৎ তোমার সাথে' কবিতার এই পঙক্তিগুলো পড়ি :

তুমি তাকে থামায়েছ—সৃষ্টির অস্তিত্ব হিতাহিত

ভুলে আজ কলকাতার শীতরাতে কবের অতীত
বহমান সময়কে অন্ধকারে চোখঠার দিয়ে
নারীর শরীর নিয়ে রয়েছ দাঁড়িয়ে।
তোমার উরুর চাপে সময় পায়ের নীচে প'ড়ে
থেমে গেছে বলে মৃত তারিখকে আবিষ্কার ক'রে
ভালোবাসা বেঁচে উঠে, আহা, এক মুহূর্তের শেষে
তবুও কি মরে যাবে পুনরায় সময়ের গতি ভালোবেসে

অতীত তো সুজাতার শিশু ; নারি, মনীষীহৃদয়
সে শিশুকে বাঁচাবার জন্য ব্যস্ত নয়।

এই সব পঙক্তি পড়তে গেলেই গাণিতিক পছন্দ করেন $ax+by+c=0$ সমীকরণটিকে নয় ; $y^2=4ax$ সমীকরণটি। রবীন্দ্র-পরবর্তীদের চেতনায় সময়ের এই দৈগন্তিক ছুট আমরা বেশি করে লক্ষ্য করি—Present-এর বিন্দুকে স্পর্শ ক'রে Past-কে স্বীকৃতি দেওয়া এবং সেখান থেকে Future-এর দিকে এগিয়ে যাওয়ার মধ্যে। কিছুতেই খুঁজে পাই না ইতিহাসের সরল-রৈখিকতা বা বৃত্তসদৃশতা। এখানে স্মরণীয় হতে পারে 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ'-এই রবীন্দ্রিক তত্ত্বের পাশে এলিয়টের Cocktail Party'-র Psychiatrist-এর এই উক্তিটি :

To pretend that they and we are the same
Is a useful and convenient social convention
which must sometimes be broken. We must also remember
That at every meeting we are meeting a stranger.

প্রতিটি সাক্ষাৎ মুহূর্তে পরিচিত জনকে নবীন বলে মনে হওয়া আপাত দৃষ্টিতে অযথার্থ মনে হলেও হেরাক্লিটাসের মুখেই এই সত্য উচ্চারিত হয়েছিল : এক স্রোতস্বিনীতে দ্বিতীয়বার অবগাহন বা পদার্পণ অসম্ভব। অনেক অনেক পরে রবীন্দ্রনাথের প্রায়-সমবয়সী অঁরি বের্গস (১৮৫৯-১৯৪১) জীবনের গতিময় সত্যকে বুঝিয়েছিলেন গ্রীষ্মের উপমান ব্যবহার ক'রে। তাঁর বিখ্যাত Vital force তত্ত্ব (Elan Vital) বোঝাতে গিয়ে বের্গস লক্ষ্য করেছিলেন 'বস্তু'র 'inert matter' এবং 'explosive force'-এর দ্বান্দ্বিকতা। বের্গস 'সংযোজন'-এর চেয়ে 'বিভাজন' এবং 'বিয়োজন' তত্ত্বের

উপরেই জোরটা দিলেন। জীবন, তাঁর কাছে, অজস্র ঢেউ-এর মত ; যার পরিধি তটে প্রতিহত হয়ে তৈরি করে ঘূর্ণি। চৈতন্যময় মানুষের জীবনকে যান্ত্রিকভাবে দেখতে চান নি বের্গসঁ। বের্গসঁর দর্শন দুনিয়ায় চাঞ্চল্য এনেছিল এমন একটা সময়ে যখন এলিয়টের প্রিয় দার্শনিক জর্জ সান্তায়ানা সমাজ থেকে সরে নিভৃতের সন্ধান করেছিলেন এবং বলেছিলেন সমাজ থেকে সরে গেলে তবেই মানুষ তার নিজের কাল এবং সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকে পার হয়ে সত্যে দাঁড়াতে পারে। সমকাল থেকে দূরে দাঁড়াতে চান নি কবি-নাট্যকার এলিয়ট। তাঁর দর্শন যেহেতু জীবনমুখী শিল্পীর, তা-ই কাকতাড়ুয়া সদৃশ মানুষের নাটকীয় বিক্রম চোখে দেখেও এলিয়ট পোড়ো জমি-র ফাঁপা মানুষের বাঁচার পথটাই খুঁজেছিল, যদিও মার্কসীয় পন্থায় নয়। যিনি প্রুফ্রক-এর দ্বিধাগ্রস্ত রূপের মধ্যে একালের জীবনটাকেই বিম্বিত হতে দেখেছিলেন তিনি 'দ্য ওয়েস্টল্যান্ডে' আহ্বান জানিয়েছেন Red rock তথা গির্জার কাছে আশ্রয় নিতে। Ash Wednesday এই এলিয়টেরই লেখা। খণ্ডিত জীবনটাকে মেনে নিয়ে হয়ত এলিয়ট জীবনের সত্যসিদ্ধান্তের আশায় টমাস বেকেটের কাছে আশ্রয় নিতেন। অন্যত্র আনন্দের শান্তিময় ক্রোড়ে নিশ্চিন্ত বিশ্রাম ; অথচ মৃত্যু সেখানে 'সময়' সীমার নির্ধারক। আমাদের চমকে দিয়ে 'দ্য ওয়েস্ট ল্যান্ডে' এলিয়ট স্মরণ করেছিলেন বৃহদারণ্যক উপনিষদ এবং 'ফোর কোয়ার্টেট্স্'-এ কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণার্জুন সংবাদ। একাল থেকে সেকালে, স্বদেশ থেকে বিদেশে এই সাবলীল বিচরণ ক্ষমতাতেই 'The Family Reunion'-এর নাট্যকার তাঁর সৃষ্টচরিত্র Agatha-কে দিয়ে বলিয়ে নেন : 'I mean painful, because everything is irrevocable,/Because the future can only be built/upon the real past.' শেষ দুটি পঙক্তি কারুর সংলাপ হিসেবে নয়, অন্তর্গত পরম সত্য হিসেবে এসেছিল 'দ্য ওয়েস্টল্যান্ড'-এ। এই সেই দীর্ঘ কবিতা যেখানে সমকালের আঘাত নিয়েই নানা বিভঙ্গে ছুটে চলেছে 'সময়,' অতীত থেকে বর্তমানের মধ্য দিয়ে ভবিষ্যতের দিকে। এই কালচিহ্ন অস্বীকার করার উপায় নেই শিল্পীর, যদি ও প্রত্যেকের পছন্দের মধ্যে বিভিন্নতাও সত্য। হাঙ্গেরীয় মার্কসিস্ট লুকাচ (Georg Lukacs) ঠিকই বলেছিলেন, লেখকের জীবন 'is part of the life of his time ; on matter whether he is conscious of this, approves of it or disapproves. He is part of a larger social and histori-

cal whole' (The Meaning of Contemporary Realism. P 54). এই সত্য মানি বলেই দুস্নেহ লাগেনি এই রকম একটা ব্যাপার যে রবীন্দ্রনাথের মত সমাহিত ব্যক্তিত্ব 'মানসী প্রতিমা' গড়ার আনন্দের দিনেই বিদ্রুপে শাণিত করেন অক্ষর-প্রতিমা-কে ঃ

অন্নপায়ী বঙ্গবাসী
স্তন্যপায়ী জীব
জন-দশেকে জটলা করি
তক্তপোশে ব'সে।
... ...

দাস্যসুখে হাস্যমুখে
বিনীত জোড়-কর,
প্রভুর পদে সোহাগ-মদে
দোদুল কলেবর'।
('দুরন্ত আশা' ঃ ১৮৮৮)

'দেশের উন্নতি', 'বঙ্গবীর', 'ধর্মপ্রচার', 'নববঙ্গদম্পতির প্রেমালাপ' এবং কয়েক বছর পর লেখা 'হিং টিং ছট' সমকালের সময়ে স্থাপিত জীবনে বিরক্ত কবিরই রচনা। 'সোনার তরী' ও 'চিত্রা'র কবিতায় বহির্বিশ্ব থেকে অন্তর্বিশ্বের দিকে চলল কবির অভিসার। 'সময়' নামক নিরঙ্কুশ ও নিরঞ্জন মাত্রায় এই সব কবিতাকে যে আনা যায় না তা নয়। তবু সময়ের প্রেক্ষণেও এই সব কবিতার অমরত্বলাভের সম্ভাবনা বেশি; কারণ, বিভিন্ন সময়ের নন্দনতত্ত্ব কবিতাগুলিকে অনাহত রাখবে বলে মনে হয়। অতীত ইতিহাস স্বরূপে হাজির হল 'কথা' কাব্যে, এরপর। এই কাব্যের প্রথম সংস্করণের 'বিজ্ঞাপনে' কবি লিখছেন ঃ

> এই গ্রন্থে যে-সকল বৌদ্ধ কথা বর্ণিত হইয়াছে তাহা রাজেন্দ্রলাল মিত্র-সংকলিত নেপালী বৌদ্ধ সাহিত্য সম্বন্ধীয় ইংরাজি গ্রন্থ হইতে গৃহীত। রাজপুত কাহিনীগুলি টডের রাজস্থান ও শিখ বিবরণগুলি দুই-একটি ইংরাজি শিখ ইতিহাস হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে। ভক্তমাল হইতে বৈষ্ণব গল্পগুলি প্রাপ্ত হইয়াছি ঃ মূলের সহিত এই

কবিতাগুলির কিছু কিছু প্রভেদ লক্ষিত হইবে—আশা করি সেই পরিবর্তনের জন্য সাহিত্য নীতি-বিধান মতে দণ্ডনীয় গণ্য হইবে না।

না-হওয়াই তো উচিত, কারণ—সাধারণের সম্পদকে আপনার করে নিতে না পারলে তাঁকে আর যাই বলি কবি বলতে পারি না। Universe-এর Macro level-এ সকলেই এই মহামিছিলের আশমাত্র, অথচ সাহিত্যে আমরা সন্ধান করি Micro Universe-কে। একালে তো এককের Micro Universe আরও ভাঙছে। সময়ের দণ্ডে পলে এককের অণুমাত্রও যেন এক একটা মহাকাব্য রচনার বিষয় হয়ে উঠেছে। সময়ের ভগ্নাংশে কবিতা এমন কি উপন্যাসও তার জায়গা করে নেয়। শ্রীযুক্ত অশীন দাশগুপ্ত তাঁর 'ইতিহাস ও সাহিত্য' বই-এ ফ্লব্যার-এর এমা-র জীবন-বিশ্বের সময় নিয়ে বলছেন; যে-'ছোট সময়ে'র মধ্যে আমাদের পরিবেশ বদলে যায়, মানুষের জীবনে বিপর্যয় আসে কী মোক্ষলাভ হয় এমা সে সময়টাও টের পায় নি। এই উপন্যাসে এমন একটা জীবন আছে যার চার দিকে ঘেরাটোপ না থাকায় তা ঐকান্তিক নয়। এই সূত্রেই তিনি বললেন, 'সময় সচেতনতা ও পরিবর্তনের ব্যাখ্যা ইতিহাসের উপজীব্য, সাহিত্য অন্য এক অনন্ত জীবনের আভাস আনতে সক্ষম, ইতিহাস সেই জীবনে অবান্তর।' পরে বলেছেন, 'ইতিহাসের ছাত্র সাধারণত ছোট সময় থেকে স'রে থাকেন। ব্যক্তিগত সময় শুধুমাত্র সাহিত্যের'। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবি-জীবনে দুটো সময়েরই কারবার করেছেন। যেমন 'নৈবেদ্য'র সময় মূলতঃ Macro এবং তা অতীতের। 'খেয়া'র সময় ছোটো। গীতাখ্য কাব্যত্রয়ে মূলতঃ 'inert matter' ও 'explosive force'-এর সেই দ্বন্দ্ব নেই যে-দ্বন্দ্ব 'বলাকা'কে দিয়েছে বিশিষ্টতা। বিশ্বজুড়ে যুদ্ধ আর কবি আপন বিশ্ব রচনা করতে চাইছেন শুভবোধ উদ্দীপিত হয়ে। এই দ্বন্দ্ব জন্ম দিল 'ঝড়ের খেয়া'র মত সময়ের নিরিখে তাৎপর্যপূর্ণ কবিতা। ব্যাখ্যাপ্রবণতা 'নদী'কে নষ্ট করে দিল কিন্তু 'ছবি' বা 'শাজাহান' ছোটসময়কে স্বীকার করে কবিতার রসে উপভোগ্য হয়ে উঠল। 'পূরবী'তে রবীন্দ্রনাথ হকিং-কথিত Cosmological arrow of time-কে ধরলেন কোনো কোনো কবিতায়। কিন্তু স্থান ও কাল আবার ধরা দিল সেই বিখ্যাত কবিতায়, শিরোনাম যার 'আফ্রিকা'; ছায়াবৃতা আফ্রিকার কথা বলতে গিয়ে কবি ইতিহাসের Subjectification ঘটালেন। 'প্রান্তিক'-এ পেলাম Archaic History-কে নয়, Residual History-কে।—'পশ্চাতের নিত্য সহচর, অকৃতার্থ হে

অতীত,/অতৃপ্ত তৃষ্ণায় যত ছায়ামূর্তি প্রেতভূমি হতে / নিয়েছে আমার সঙ্গ' অথবা, 'দেখেছি অবমানিত ভগ্নশেষ/দর্পোদ্ধত প্রতাপের অন্তর্হিত বিজয় নিশান/বজ্রাঘাতে স্তব্ধ যেন অট্টহাসি'। দর্পোদ্ধত অত্যাচারীদের যারা Residue তাদের উদ্দেশে এমন তীব্র ধিক্কার রবীন্দ্র-কণ্ঠে শোনা যায় নি আগে কখনো। 'Inert matter' ও 'Explosive force'-এর দ্বন্দ্ব যেন Zenith স্পর্শ করল এইবার : 'মহাকাল সিংহাসনে-সমাসীন বিচারক শক্তি দাও, শক্তি দাও মোরে,/কণ্ঠে মোর আনো বজ্রবাণী ; শিশুঘাতী নারীঘাতী/কুৎসিত বীভৎসাপরে ধিক্কার হানিতে পারি যেন'। সমসময়কে এভাবে স্পর্শ করতে পারেন নি রবীন্দ্রানুজ কবি বুদ্ধদেব বসু বা অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীও। অমিয়চন্দ্রের কবিতায় ইতিহাসের বড়ো সময় যেমন আছে, 'Cosmological arrow of time'. 'পর্তুগীজ আঙ্গোলা', 'আফ্রিকা স্বাক্ষর', 'ওক্লাহোমা', 'কাইবুর্গের পথে', 'ইস্টারিভার', 'সান্টা মারিয়া দ্বীপে' ইত্যাদি বেশ কিছু কবিতয়ে অমিয়চন্দ্র ইতিহাস ও ভূগোলের সময়কে অনেক বেশি স্থিতিস্থাপকতা দিয়েছেন। তবু কিন্তু ভালো লাগে 'বৃষ্টি', 'পিঁপড়ে' ও চেতন স্যাকরা'র মত কবিতা যেখানে Subjectification-এর ব্যাপারটাই মুখ্য। এই কারণেই বুদ্ধদেবের 'বন্দীর বন্দনা,, 'কঙ্কাবতী' ভালো লাগে। 'বিশেষ মানুষের ছোট সময় ছেড়েও সাহিত্যিক একজন মানুষের ব্যক্তিগত সময়ে নেমে আসতে পারে' (অশীন দাশগুপ্ত) বলেই এই সব কবিতা আমাদের মনটাকে টানে। তবে 'ব্যক্তিগত সময়'-এর জটিলতা কিন্তু প্রায়-অবিশ্বাস্য। হয়ত এই কারণেই সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, জীবনানন্দ দাশ জটিল হয়ে ওঠেন নজরুল ও সুকান্ত'র তুলনায়। নজরুলের 'সর্বহারা', 'ফরিয়াদ', 'কান্ডারী হুঁশিয়ার' যত উদ্দীপকই হোক, ওসব কবিতার ওপর নির্দিষ্ট সময় ও অঞ্চলের শিলমোহর লাগানো কঠিন ভাবে। তুলনায় 'দোলনচাঁপা', 'চৈতী হাওয়া' সূক্ষ্মজালের ঝাকনির ভিতর দিয়ে স্রষ্টাকে পার করে দেয় অনায়াসে।* আন্তনিও গ্রামসি-র কথাটা মনে রাখি ঠিকই যে 'homo faber cannot be separated from homo sapiens' অথবা বুদ্ধিজীবীরও কিছু করার মত কাজ আছে ; কিন্তু

* সুকান্ত-র 'প্রিয়তমাসু' ঐ কারণেই ছাড়িয়ে যায় 'দেশলাই কাঠি, 'সিঁড়ি'; 'সিগারেট', 'চট্টগ্রাম : ১৯৪৩', 'মধ্যবিত্ত : ১৯৪২', 'কৃষকের গান'-এর মতো বড়ো সময়ের কবিতাকে।

আমরা কবিকে 'বড়ো সময়'-এর সরল রেখায় পেতে চাই না, চাই তাকে সেই সময়ের cunning passages এবং contrived corridor-এ যে সময় কবির একান্ত আপন ! দু'সময়ের দ্বন্দ্বে কবির নিজের দেওয়া ব্যাখ্যা এবং কাব্যসাধনার মধ্যে ফারাক ঘটে যায় কখনো বা। যে-সুধীন্দ্রনাথ লেখেন 'অর্কেস্ট্রা'র মত রবীন্দ্র-প্রভাবিত কাব্য, সেই তিনিই 'কাব্যের মুক্তি' প্রবন্ধে লেখেন "কাব্যের পথে উল্লঙ্ঘন চলে না ; সেখানকার প্রত্যেকটি খাত পদব্রজে তরণীয় প্রত্যেকটি ধূলিকণা শিরোধার্য, প্রত্যেক কন্টক রক্তপিপাসু ; সেখানে পলায়নের উপায় নেই, বিরতির পরিণাম মৃত্যু, বিমুখমাত্রেই অনুগামীর চরণাহত।' সুধীন্দ্রনাথ পরিগ্রহণের নন্দনতত্ত্বে বিশ্বাসী। অতীতকে অন্তরে লালন করেছিলেন তিনি। স্মৃতির সম্বল তাঁর কাছে মহামূল্য। তাই লিখতে পারেন : 'স্মৃতিপিপীলিকা তাই পুঞ্জিত করে/আমার রন্ধ্রে মৃত মাধুরীর কণা : /সে ভুলে ভুলুক্ কোটি মন্বন্তরে/আমি ভুলিব না, আমি কভু ভুলিব না।' 'অর্কেস্ট্রার পর 'ক্রন্দসী'তেই বড়ো ইতিহাস বুঝিবা ব্যক্তিসময়কে ঝাঁকুনি দেয়। এই কাব্যের একটি প্রসিদ্ধ কবিতায় তিনি লেখেন, 'তাই অসহ্য লাগে ও-আত্মরতি / অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে' ? (উটপাখী)। 'সংবর্ত' থেকে 'কাল' বা 'সময়' কবিকে জড়িয়ে ধরেছে বলেই 'যযাতি' কবিতায় তিনি লেখেন 'হিংস্র অরি/বন্দরে বন্দরে, অবিশ্বাস্য অনুচর অবহেলা/চরমে নিশ্চিত জেনেই, বেরিয়েছিল তারা'। ১৯৫০'র 'যযাতি' কবির সম সময়-চেতনার সৃষ্টি, নামটুকুই কেবল গূঢ়ার্থে' অতীতের সঙ্গে আশ্লিষ্ট যেন। তত্ত্বহিসেবে একদা বলেছিলেন সুধীন্দ্রনাথ : 'কবির কর্তব্য তার প্রতিদিনেও বিশৃঙ্খল অভিজ্ঞতার একটা পরম উপলব্ধির মাল্যরচনা'। এবার এই তত্ত্বের প্রয়োগ ঘটালেন 'Heap of broken images'-এর মাধ্যমে : 'মাতাল\ নৌকা', 'অজানার অভিসারে', 'প্রাচীর', 'পরিখা', 'গুপ্তচর', 'গাঁটঠগাঁঠ বিলাতী বস্ত্রের ভার', 'রাশি রাশি মার্কিনী গমের ভাবনা'...ইত্যাদি। বিষ্ণু দে অতীতকে নিয়ে আসেন অনায়াসে স্বাচ্ছন্দ্যে। অতীতের বহু পুরাতনকে বেঁধে দেন তার পরবর্তীর সঙ্গে এবং বহু পুরাতন অনতিপুরাতন সব এসে মিছিল করে বর্তমানের সঙ্গে। ফলতঃ সক্রেটিসের প্রেরণা ডিয়োটিমা, ওয়ার্ডস্বার্থের বোন ডরথি যেমন আসে যথাক্রমে গ্রীস ও ইংলন্ড থেকে, তেমনি কবিতার পংক্তিতে এদের পাশেই জায়গা করে নেয় লিলি রমা অলকা। বিষ্ণু দে তাঁর পাঠকদের হাঁটিয়ে নিয়ে যান 'হাইকোর্ট-পাড়ায়' 'লায়ন্'স্ রেঞ্জে', 'রেড রোডে', 'চৌরঙ্গিতে' হাওড়ায়,

খিদিরপুরে এবং 'মাণিকতলা খাল'-এর পার দিয়ে। তাঁর ব্যক্তিসময়কে বিষ্ণু দে বড়ো সময়ের সঙ্গে মিলিয়ে দেন 'টাইরেসিয়াস-এর মধ্যস্থতায়। তাঁর 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ' এই কাব্যনামেই তো ধরা,পড়ে Time past, Time present এবং Time future-কে মিলিয়ে দেওয়ার অভিপ্রায়। এলিয়েটে বিষ্ণু দে'র অনুরাগ অকারণ ছিল না। অথবা, বলা যায় তাঁর বুদ্ধির পরিচর্যা করেছিল এলিয়টের কবিতাই। অনেকখানি জায়গা বা সময় জুড়ে বিষ্ণুদে-র ব্যক্তিগত সময়। কিন্তু সময়কে অন্য কেউ কি Philosophise করতে পেরেছেন জীবনানন্দের মত ?

জীবনানন্দের যে-কবিতার কথা উল্লেখ করে এই রচনা শুরু করেছিলাম সেটি অগ্রন্থিত। ১৩৯০-এর মাঘ সংখ্যার 'প্রতিক্ষণে' প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর গ্রন্থিত এবং অগ্রন্থিত এমন অনেক কবিতা আছে যেখানে সময় এসেছে নানা চেহারায়। কখনো সময় এসেছে ইতিহাস থেকে, কখনো বিশেষ ঋতুকে অবলম্বন করে, কখনো দিন-রাতের হিসেবে।

অধ্যাপক শঙ্খ ঘোষ তাঁর সম্পাদিত 'এই সময় ও জীবনানন্দ' গ্রন্থে 'সময়ের সমগ্রতা' শিরোনামে একটা প্রবন্ধে লিখেছেন—'সময়' : এই একটি শব্দ কেবলই ঘুরে ঘুরে আসে জীবনানন্দের লেখায়, তাঁর গদ্যে অথবা কবিতায়। কিন্তু এ 'সময় কোন্ সময় ?' শঙ্খবাবু ব্যক্তিকাল, মানবকাল এবং বিশ্বকাল এই তিনটে শব্দ ব্যবহার করে একসময় জানালেন 'এক ঢেউয়ের জল অন্য ঢেউয়ের মধ্যে গড়িয়ে যায় যেভাবে, অচিহ্নিত মিশে যায় ওতপ্রোত, জীবনানন্দের কবিতায় সমস্ত কালই তেমনি জড়িয়ে যায় ভিতরে ভিতরে' (পৃষ্ঠা : ৭)। ছোট্ট পরিসরে জীবনানন্দের 'সময়'কে শঙ্খবাবু যেভাবে ধরেছেন আমাদের মূল কথাটা হয়ত তার বাইরে যেতে পারবে না, তবু যখন পড়ি এই রকম সব পঙক্তি (আগেও একবার যদিও উল্লেখ করেছি)

ইতিহাস ঢের দিন প্রমাণ করেছে
মানুষের নিরন্তর প্রয়াণের মানে
হয়তো-বা অন্ধকার সময় থেকে
বিশৃঙ্খল সমাজের পানে
চলে যাওয়া ; গোলকধাঁধার
ভুলের ভিতর থেকে আরো বেশি ভুলে ;

জীবনের কালোরঙা মানে কি ফুরুবে
শুধু এই সময়ের সাগর ফুরুলে।

তখন হকিং-এর সহযাত্রী হয়ে 'Cosmological arrow of time' কথাটা বুঝতে ইচ্ছে করে। এই কথাটার হকিং-প্রদত্ত ব্যাখ্যা হল 'the direction of time in which universe is expanding rather than contracting.' ঐ তত্ত্ব না জানলে জীবনানন্দের কবিতা বুঝবেন না কেউ, এমন বলা হচ্ছে না। তবে এসব জানলে হঠাৎ করে মনে হয়; যে কবির ক্ষেত্র সকলকে জড়িয়ে সকলকে ছাড়িয়ে যায় জীবনানন্দ সেই কবি। 'সময়' সম্পর্কে বিজ্ঞান এবং দর্শনের সিদ্ধান্ত ওঁর কি শুধুই উপলব্ধির পথে এসেছিল? এই সংশয়ের কারণ 'সময়' সম্পর্কে জটিলতত্ত্বের অনায়াস উচ্চারণ। কবির কাছে কে-ই বা প্রতিপাদন প্রত্যাশা করে? কবির বাণী কবির উপলব্ধির সত্যের সারাৎসারের বাঙ্ময় রূপ মাত্র। সেখানেই কবির জয়। 'ঝরাপালক' থেকেই জীবনানন্দ আর পাঁচজনের মত সময়ের নিত্য সহচর। সমসময় না চাইলে জীবনানন্দ লিখতেন না :

এ ভারতভূমি নহেকো তোমার, নহেকো আমার একা,
হেথায় পড়েছে হিন্দুর ছাপ—মুসলমানের রেখা;
হিন্দু মনীষা জেগেছে এখানে আদিম উষার ক্ষণে,
ইন্দ্রদ্যুম্নে উজ্জয়িনীতে মথুরা বৃন্দাবনে।

("হিন্দু-মুসলমান")

এই ধরনের উচ্চারণে জীবনানন্দের কণ্ঠে নজরুলের প্রভাব দুর্লক্ষ্য নয়। নজরুলের মত উচ্চকণ্ঠে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির বিরুদ্ধে কবির নিজস্ব ভুবনে অতটা সরব হয়েছেন কি অন্য কেউ? বুদ্ধিজীবীর কাজের তাগিদে কাজী তাঁর কালে যে সব কবিতা লিখেছেন এদেশের ইতিহাসে তার প্রাসঙ্গিকতা ফুরিয়ে যায় নি আজও। কাজী 'দোলন চাঁপা'র মত কবিতায় নিজের অন্তর্বিশ্বকে নিবিড় আলিঙ্গন করেছিলেন যেমন, তেমনি বড়োবিশ্ব বা ইতিহাসের cunning passage গুলোতে ঘুরে বেড়িয়েছেন শাসকের বেত্রদণ্ড হাতে। বিরাট সম্ভাবনার অচির সমাপ্তি না ঘটলে হয়ত সংক্ষুব্ধতর সময়কে আরও ঘনিষ্ঠ সংঘর্ষের পথে ব্যাপকতর সময়ের কাছে নিয়ে যেতেন তিনি। খানিকটা কাছাকাছি সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত সম্পর্কেও। সময়ের এই বড়ো মাপটাকে জীবনানন্দ বরাবরই স্বীকার করেছেন। তবু জীবনানন্দ কাব হয়েও প্রাজ্ঞ

দার্শনিক এবং পরাক্রান্ত বিজ্ঞানীর মত সময়কে ইচ্ছেমত ব্যবহার করেছেন অদ্বিতীয় ব্যক্তি হিসেবে। যদি discourse of time বলে কোনো কথা বলা যায় তা একমাত্র জীবনানন্দেরই ছিল। তাঁকে 'সময়' নামক চিহ্নায়ক-এর ব্যবহার প্রায়-সর্বত্র করতে দেখা গেছে বলেই আলোচনা শুরু করা যেতে পারে প্রায় শেষ থেকেই।—

সময়ের কাছে এসে সাক্ষ্য দিয়ে চলে যেতে হয়
কী কাজ করেছি আর কী কথা ভেবেছি। ("সময়ের কাছে")

'সাতটি তারার তিমির' থেকে নেওয়া এই পঙক্তি দুটি যেন মানবজীবনে সময়ের ভূমিকা নিয়ে তাত্ত্বিক উচ্চারণ। এই একটি কাব্যেই পরিমাপ্য সময় থেকে অপরিমেয় সময়ে এবং সেখান থেকে সময়তত্ত্বে প্রসারিত হয়েছে জীবনানন্দের ভাবনা। 'সময়ের কাছে'-এর মতই আর একটি কবিতার শিরোনাম 'সময়ের তীরে'। শেষোক্ত কবিতা 'বেলা অবেলা কালবেলা' কাব্যের অন্তর্গত। এই কাব্যেরই আর একটি কবিতার নাম 'সময়ের সেতুপথে' যার শেষ পঙক্তিতে সময় হয়েছে উপমান : 'অমের সুসময়ের মতো রয়েছে হৃদয়ে'। 'সূর্যনক্ষত্রনারী' কবিতার এই কবি-বচন : 'বিজ্ঞানের ক্লান্ত নক্ষত্রেরা / নিভে যায়' কি চন্দ্রশেখরের সেই তত্ত্ব যা তাঁর শিক্ষক এডিংটন মানেন নি, মানেন নি আইনস্টাইনও। আইনস্টাইনের বক্তব্য, হকিং-এর ভাষায়, Stars would not shrink to zero size.' হকিং তাঁর প্রাগুক্ত বই-এর একটি অধ্যায়ে ('Black holes ain't so Black') লিখেছেন, 'The existence of radiation from black holes seems to imply that gravitational collapse is not as final and irreversible as we once thought (P.N 119) 'গাঢ় অন্ধকার থেকে আমরা এই পৃথিবীর আজকের মুহূর্তে এসেছি' ('অন্ধকার থেকে') 'ডানে বাঁয়ে ওপরে নীচে সময়ের / জ্বলন্ত তিমিরের ভিতর তোমাকে পেয়েছি' ('সময়ের') অনুভবী চিত্তে বিজ্ঞানের এ এক বিস্ময়কর অনুশীলন। 'সাতটি তারার তিমিরে' পেয়েছি সময়-তত্ত্বকে কবিতার পঙক্তিতে ব্যঞ্জনাগর্ভ করে তোলার বারংবার প্রয়াস। ভাঙা কাঁচের টুকরো ফেরে না অখণ্ড একটি আধার নির্মিতিতে ; কিন্তু অজস্র অণুপরমাণুর আপেক্ষিক সম্পর্কে গঠিত বিশ্বসত্যের মত উজ্জ্বল এই ধরনের ব্যঞ্জনাময় উচ্চারণ : 'হে সাগর সময়ের', 'সে-সময় মুছে ফেলে দিয়ে / কী এক গভীর সুসময়', 'সময়ের

সাগরের নিরঞ্জন ফাঁকি,' 'এরকম অনেক হেমন্ত ফুরায়েছে / সময়ের কুয়াশায়' —ইত্যাদি।

এলিয়ট-কথিত 'historical sense' যা কিনা 'sense of the timeless as well as of the temporal and of the timeless and of the temporal together.' জীবনানন্দের কবিতায় প্রকট হয়েছে 'বনলতা সেন' কাব্য থেকেই। কবি জীবনানন্দের কাব্যে অন্য এক কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্য খুঁজে পেয়েছেন 'পরিস্রুত ইতিহাস রস বা ইতিহাস চেতনা'। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র "মাঠের গল্প" কবিতার একটি অংশের শিরোনাম "পঁচিশ বছর পরে"। 'বনলতা সেন'-এর একটি কবিতার নাম "কুড়ি বছর পরে"। কুড়ি বা পঁচিশ অঙ্গুলিমেয় সংখ্যা। কিন্তু শেষোক্ত কাব্যের নাম কবিতায় 'হাজার বছর' এল সীমাহীনতার ব্যঞ্জনা নিয়ে। বিম্বিসার, অশোক, বিদর্ভনগর, শ্রাবস্তীর কারুকার্য একালের সীমায় এল ভিন্নতর সময়চেতনা নিয়ে। রবীন্দ্রনাথের "অনন্তপ্রেম"-এ সংখ্যার উল্লেখ ছিল না; ছিল 'জনমে জনমে', 'যুগে যুগে', 'অনাদিকালের হৃদয় উৎস', 'কোটিপ্রেমিকের মাঝে' প্রভৃতি সময়-প্রসূত ব্যঞ্জনাময় কিছু কথা। সময়কে past, present এবং future-এ প্রসারিত করে দিয়ে আবার present-এর স্থির বিন্দুতে টেনে রেখেছিলেন এলিয়ট। জীবনানন্দ নিজের সম্পর্কে বললেন :

> মহাবিশ্বলোকের ইশারার থেকে উৎসারিত সময়চেতনা আমার কাব্যে একটি সঙ্গতিসাধক অপরিহার্য সত্যের মতো; কবিতা লিখবার পথে কিছুদূর অগ্রসর হয়েই এ আমি বুঝেছি, গ্রহণ করেছি।...লিরিক কবিও ত্রিভুবনচারী, কিন্তু তার বেলায় প্রকৃতি, সমাজ ও সময় অনুধ্যান কেউ কাউকে প্রায় নির্বিশেষে ছাড়িয়ে মুখ্য হয়ে ওঠে না; অন্তত মানবসমাজের ঘনঘটায় প্রকৃতি ও সময়ভাবনা দূর দুর্নিরীক্ষ্য হয়ে মিলিয়ে যাবার মতো নয়।

বিশ্ববিজ্ঞানে 'সময়'কে একটি 'মাত্রা' হিসেবে গণ্য করায় বস্তুর ভগ্নাংশ, আলোকতরঙ্গ, দর্শক, স্থান, আপেক্ষিকতা কথাগুলোও নিউটনীয় মাধ্যাকর্ষণ-তত্ত্বের অনেকদূরে প্লাঙ্ক ও আইনস্টাইনের তত্ত্বকে বসিয়ে দিল নতুন অর্থ-তাৎপর্যে। প্রত্যেকেরই একটি নিজস্ব স্থানাঙ্ক এবং পৃথক সময়-ধারণা আছে, যেমন আছে স্বতন্ত্র নান্দনিক বোধ। যদি বস্তুসত্যের আপেক্ষিকতার সঙ্গে একালের Reader Response-নির্ভর নন্দনতত্ত্বকে মিলিয়ে পড়া যায় তাহলে

রবীন্দ্রনাথের সরলরৈখিক বা 'দৈব' সময়ে আবিষ্ট থাকলে চলে না পাঠকের। সময়েরও একটা নন্দনতত্ত্ব গড়ে ওঠে যেমন হয়েছে জীবনানন্দের পূর্বোদ্ধৃত পঙক্তিগুলি এবং আরও অন্যত্র। সময়ের নন্দনে বড়োসময় ও ছোটসময়ের সংঘর্ষে যে বর্ণময় কবিতার আলোক কণা বিচ্ছুরিত হয় তা সুকান্ত'র 'প্রিয়তমাসু' কবিতার এই সব পঙক্তিতে চমৎকার পেয়েছি : 'পরের জন্যে যুদ্ধ করেছি অনেক, / এবার যুদ্ধ তোমার আর আমার জন্যে। / প্রশ্ন করো যদি এত যুদ্ধ ক'রে পেলাম কি ? উত্তর তার—/তিউনিসিয়ায় পেয়েছি জয়, / ইতালীতে জনগণের বন্ধুত্ব, / ফ্রান্সে পেয়েছি মুক্তির মন্ত্র ; / আর নিষ্কণ্টক বার্মায় পেলাম ঘরে ফেরার তাগাদা। / আমি যেন সেই বাতিওয়ালা, / যে সন্ধ্যায় রাজপথে-পথে বাতি জ্বালিয়ে ফেরে / অথচ নিজের ঘরে নেই যার বাতি-জ্বালার সামর্থ্য, / নিজের ঘরেই জমে থাকে দুঃসহ অন্ধকার।' বড়ো সময়ের সঙ্গে ছোট সময়ের দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের এ এক অসাধারণ প্রকাশ। সামাজিক ও রাজনৈতিক সংকটলগ্নে রবীন্দ্রনাথ বড়ো সময় এবং ছোটসময় দুই-এর মধ্যেই নিজেকে রেখেছিলেন সজাগ প্রহরী এবং কদর্যতার উদ্দেশে ধিক্কার দিয়েও বলেছিলেন—মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ। নিজের বিশ্বাসের স্থির জগৎ থাকা সত্ত্বেও এলিয়ট তিনবার উচ্চারণ করেছিলেন 'This is the way the world ends' এবং শেষে বললেন 'Not with a bang, but whimper.' কিন্তু এলিয়ট যতটা Objective হতে পেরেছিলেন জীবনানন্দের পক্ষে ততটা সম্ভব ছিল না। কবিতায় এলিয়ট যতটা Prosaic, গদ্যে জীবনানন্দ তার চেয়েও বেশি Poetic. তাই ভূগোলের এশিরিয়ায়-মিশরে-বিদিশায় তাঁর রূপসীদের মরে যেতে দেখে জীবনানন্দ গভীর দীর্ঘশ্বাস সহ উচ্চারণ করেছেন 'হায়' শব্দটি, যার ধ্বনন ক্রিয়া (Resonance) অসামান্য। একসময় ইতিহাসের সময়-চিহ্ন ও ভূগোলের স্থানাঙ্ক ছাড়িয়ে জীবনানন্দ তাঁর আপন ঐতিহ্যের সন্ধানী হলেন ঘাস-মাতার শরীরের সুস্বাদ অন্ধকারে। সময়ের আবিলতা থেকে মুক্তি নিয়ে ঘাস-মাতার সুধা-সুনিবিড় সংসর্গ কামনার মধ্যেও কিন্তু সমসময়ের এবং ছোট সময়-এর কঠিন পীড়নের প্রচ্ছন্ন আভাস আছে। ব্যথাহত কবিসত্তা শান্তির আশায় উৎসে প্রত্যাবর্তন-প্রত্যাশী। কিন্তু উৎসে কি ফেরা যায় কখনও ? নক্ষত্র থেকে বেরিয়ে আসা আলো কি কখনও ফিরে যায় নক্ষত্রে ? তেমনি আমাদের ভঙ্গুর ঐতিহাসিক জীবন ও নয় কি ? বোধ হয় সেই কারণেই ইতিহাস ছাড়িয়ে অন্য এক

অনৈতিহাসিক কালের দিকে অভিযান চালিয়েছেন বলেই জীবনানন্দ ভাবতে পেরেছিলেন temporol ও timeless-এর গড়া ঐতিহ্য বা tradition-এর কথা। কবি যে-সময়ে বাস করেছেন এবং যে-সময়ে বাস করেন নি, যে-ঐতিহ্যে তিনি আছেন এবং যে-ঐতিহ্যে ছিলেন না, সকলের কাছেই অধমর্ণ। হয়ত সেই কারণেই সময়ের 'কুহক', 'ছায়া' ও 'কুবাতাসে' আর সকলের সঙ্গে একত্রে বাস করেছেন যে-রবীন্দ্রনাথ, তাঁর উদ্দেশে একথা বলতে দ্বিধাহীন জীবনানন্দ : "স্থির প্রেমিকের মতো অবয়ব দিতে / সেই ক্লীব বিভূতিকে ডেকে গেলে নিরাময় অদিতির ক্রোড়ে। / অনন্ত আকাশরোধে ভরে গেলে কালের দ্বিস্ফুট মরুভূমি।' সুন্দর ও অসুন্দরের সংঘর্ষে বিপর্যস্ত আজকের প্রচণ্ড ইতিহাসে 'ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা'; তবুও কি কোমল আবেগে হাত রাখি না শিশির-ধোয়া ভোরবেলাকার ফুলে, কান পেতে শুনি না 'বিমর্ষ সুন্দরী'র মত বসন্তের কোকিলের একক তান অথবা দুপুরের নিসঙ্গ চিলের ডাককে টেনে নিই না মনের গভীরে ? এই সব ভালোলাগাগুলো আগেও ছিল, এখনও আছে এবং থাকবেও বহুকাল, হয়ত বা সভ্যতার 'শেষ জাফরান রৌদ্রালোকিত দিনটি পর্যন্ত'। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় হত্যমান মানুষেরা, অতীতের দুর্বিনীত চেঙ্গিস-কালাপাহাড়েরা, একালের হিটলার-মুসোলিনীরা অর্থাৎ বড়ো ইতিহাসের তথাকথিত বড়ো মাপের মানুষেরা কোনো দিনই ঐতিহ্য গড়ে নি। রবীন্দ্রনাথ একই সময়ের মাপে নামী এবং অনামী দুদল মানুষকে দেখেছিলেন। এক দল চলে বীরদর্পে, সঙ্গে তাদের পণ্যবাহী সেনা আর একদল '...কাজ করে / দেশে দেশান্তরে, / অঙ্গবঙ্গ কলিঙ্গের সমুদ্র নদীর ঘাটে ঘাটে, / পাঞ্জাবে বোম্বাই গুজরাটে।' প্রথম দল ক্ষমতায় বলবত্তর হলেও 'জ্যোতিষ্কলোকের পথে রেখামাত্র চিহ্ন রাখিবে না'। ১৯৪১'র ১৩ ফেব্রুয়ারি-র এই রবীন্দ্রনাথ যেন 'বড়ো সময়' সম্পর্কে অসামান্য ভবিষ্যৎ বাণী উচ্চারণ করে গেলেন। জীবনানন্দের 'সাতটি তারার তিমির'-এ গোটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মহাসময় দারুণ ভাবে উপস্থিত। সদ্যঃপাতী বিক্ষিপ্ত ঘটনার সময়চিহ্ন অঙ্গে নিয়ে এক বহু পঙক্তি, যদিও অবমর্ষণই সেই সব ঘটনার নিশ্চিত পরিণাম। দর্শক-কবি তটে দাঁড়িয়ে প্রদর্শকের মত জানালেন : (ক) 'নদীর চেয়ে ও বেশি উনিশশো তেতাল্লিশ, চুয়াল্লিশ উৎক্রান্ত / পুরুষের হাল' ('বিভিন্ন কোরাস'। কবিতার নামে কি এলিয়টের প্রভাব চোখে পড়ছে ? এই নামে 'মহাপৃথিবী'তেও একটা কবিতা আছে) (খ) 'আমাদের শস্য তবু অবিকল পরের জিনিস' (কুহু), (গ)

'ব্যক্তির দাবিতে তাই সাম্রাজ্য কেবলই ভেঙে গিয়ে / তারই পিপাসায় / গড়ে ওঠে···পঙ্গপালের মতো মানুষেরা চরে, ক'রে পড়ে' ("জনান্তিকে")। 'সাতটি তারার তিমির' (রচনাকাল ১৩৩৫-৫০)-এর আগে "শহর", "শব", "আট বছর আগের একদিন" সহ বেশ কিছু স্মরণীয় কবিতা 'মহাপৃথিবী' নামে সংকলিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে ১৯৪৪-এ। এই কাব্যের কবিতাগুলোর রচনা-কাল ১৩৩৬ থেকে ১৩৪৫-৩৮'এর মধ্যে। লক্ষ্য করা যায় 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' 'মহাপৃথিবী' এবং 'সাতটি তারার তিমির'-এর কবিতাগুলো তিনটে পৃথক বই-এ গ্রন্থিত হলেও কবিতাগুলোর রচনাকাল আলাদা আলাদা জানা যায় না এবং সেই কারণে ভাবনার ধারাবাহিকতাকেও না। 'রূপসী বাংলা'র প্রকাশ তো তাঁর মৃত্যুর পরে এবং পরে আমরা জেনেছি গ্রন্থিত কবিতাকে সংখ্যার দিক থেকে ছাপিয়ে গেছে অগ্রন্থিত কবিতা। তাই ঠিক কবে থেকে অর্থাৎ কোন বিশেষ কাল থেকে জীবনানন্দ 'সময়' নামক একটা মাত্রাকে প্রাধান্য দিতে লাগলেন প্রায় বিশুদ্ধ দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিকের মত তা বলা মুশকিল। এক্ষেত্রে আমাদের (পাঠকদের) কালজ্ঞানকে আপাতত অন্ধ ও বধির করে রাখতে হচ্ছে। "বিভিন্ন কোরাস" নামে 'সাতটি তারার তিমির' কাব্যের একটি কবিতার কথা বলেছি। ঐ নামেই 'মহাপৃথিবী'তে একটা কবিতা আছে যার মধ্যে সময়ের প্রভাব প্রকট ঃ

> সময় কীটের মতো কুরে খায় আমাদের দেশ।
> আমাদের সন্তানেরা একদিন জ্যেষ্ঠ হয়ে যাবে ;
> স্বতসিদ্ধতায় গিয়ে জীবনের ভিতরে দাঁড়াবে ;
> এ-রকম ভাবনার কিছু অবশেষ
> তাদের হৃদয়ে আছে হয়তো বা"

সমসময়ের এই কীট-দংশন সত্য হতে পারে ; কিন্তু এই রকম tension-ই শেষ কথা নয়। 'বনলতা সেন'-এর কবিকে মায়াবী সময় টেনে নিয়ে যায় ক্লান্ত বিপন্ন বিস্ময়াতুর কবির নিজস্ব Archaic জগতে, অন্য সময়ে, যে সময়ে ছিল মধুকর ডিঙা-বেহুলা-শঙ্খমালা-চন্দ্রমালা-মাণিকমালা-কঙ্কাবতী-ধনপতি-শ্রীমন্ত-বল্লালেরা। কল্পনা ভেলায় চেপে অনাদি সময়ে এই আমাদের যাত্রা Voyage within থেকে Voyage without-এর দিকে। Voyager-কবির অলস সময় ধারা বেয়ে মন তাঁর ছুটে যায় বেবিলনের রাণী, পারস্যগালিচা, লাল তরমুজ মদ, ভূমধ্যসাগর, ম্যানিলা, হাওয়াই কি টাহিটির দ্বীপে অর্থাৎ

যে-স্থানে, যে-কালে, যে-ঐতিহ্য কবি কোনো দিনই ছিলেন না। সমসময়ের একককে ধ'রে রেখে বিশ্বপরিক্রমায় যান এলিয়ট : What is the city over the mountain/cracks and reforms and bursts in the violet air/Falling towers/Gerusalem Athens Alexandria/Vienna London/Unreal. Time টা এখানে Historical কিন্তু Space Unreal. জীবনানন্দ লিখছেন অনুরূপ কথা যদিও পরোক্ষ অভিজ্ঞতার এবং তা শুধু সেই কবিকেই মানায় যাঁর সংবেদনশীল মন স্বভাবতই আন্তর্জাতিক বলে Space-এর স্থানাঙ্কে বন্ধ নয়। জীবনানন্দ লেখেন 'পশ্চিমে প্রেতের মত ইউরোপ; / পূব থেকে প্রেতায়িত এশিয়ার মাথা/আফ্রিকার দেবতাত্মা জন্তুর মত ঘনঘটাচ্ছন্নতা' ("রাত্রির কোরাস")। আন্তর্জাতিক-সময়ের আর্তি থেকে আদৌ বিযুক্ত নন জীবনানন্দ। শূন্যের বিন্দুতে তথা উৎসে প্রত্যাশী কবির অভিভাব-বৃত্ত বেঁকে হয়ে যায় Ellipse. প্রচণ্ড চাপে তাও বোধ হয় ছিলা ছেঁড়া ধনুকের মত হয়ে যায় সময়েরই প্রচণ্ড প্রহারে ; বাংলাদেশের ছেচল্লিশ-সাত চল্লিশের ঘটনায়। প্রায় সাতাত্তরে যীশুর জন্মদিনে (২৫.১২.৩৭) বৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথের প্রজ্ঞা-দৃঢ় কণ্ঠস্বর উত্তেজনায় কেঁপে উঠেছিল : 'মহাকাল সিংহাসনে-/সমাসীন বিচারক, শক্তি দাও মোরে।' তবু তো রবীন্দ্রনাথ দেখেন নি তখনও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কিয়দংশ, যা কি না তাঁর পরে দেখার' দুর্ভাগ্য হয়েছিল, অথবা ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষ, '৪৬-এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, '৪৭-এর দেশবিভাজন। সময়ের নির্মম প্রহারে তিনি ব্যক্তিগত শ্রেয়ের বোধকে সতর্ক ভঙ্গিতে আলোকবর্তিকার মত তুলে ধরে বলেছিলেন, 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ।' জীবনানন্দ মন্বন্তর ও দাঙ্গা দেখেছিলেন। তাই তাঁর সময়ের আর্তি বা tensionও বেশি এবং তিনি লিখে ফেলেন, 'কেউ নেই। কিছু নেই। সূর্য নিভে গেছে' এবং যাত্রিকের চোখের সামনে থেকে নিভে 'কান্তিময় আলো'। এখনও 'জ্ঞান নেই পৃথিবীতে' এবং 'জ্ঞানের বিহনে প্রেম নেই'। তবু রবীন্দ্রনাথের মত তাঁরও মনে মানুষের ওপর বিশ্বাস রাখার একটা জায়গা ছিল এবং সেই বিশ্বাস থেকে তিনি লেখেন, 'চারি দিকে নীল নরকে প্রবেশ করার চাবি/অসীম স্বর্গ—খুলে দিয়ে লক্ষকোটি নরককীটের দাবি / জাগিয়ে তবু সে-কীট ধ্বংস করার মতো হয়ে / ইতিহাসের গভীরতর শক্তি ও প্রেম রেখেছে কিছু হয়তো হৃদয়ে, ("অনন্যা")। বিশ্বাস রাখা এবং বিশ্বাস টাল খাওয়া দুইই ছিল বলে জীবনানন্দ কাব্য-নাম দেন 'সাতটি

তারার তিমির' ; 'সাতটি তারার আলো' নয়। বিজ্ঞানকে অনুভূতিতে জারিয়ে নিতেই পারেন কবি। সময় ও কালকে ব্যক্তিত্বের স্পর্শে আপন করে নেওয়া তাঁর কর্তব্যই বলা চলে। তবে বিজ্ঞানের সময় এবং কাল প্রসিদ্ধ ও প্রকটভাবে কবিতায় অকাম্য। প্রচণ্ড বিরোধ যখন মানুষের ইতিহাস-বিশ্বের বড়ো সময়ের সঙ্গে কবির সুস্থতা পিয়াসী ছোট সময়ের, তখন কাব্য নামেই Oxy-moron অলঙ্কার—'সাতটি তারার তিমির'। কবি দেখেছেন 'সময়ের কুয়াশা'য় হেমন্ত ফুরিয়ে গেছে এবং এপারের মাঠের ফসল 'পরিচ্ছন্নভাবে চ'লে গেছে' সমুদ্রের পারের বন্দরে। এপারের মানুষ কষ্ট পায় ঋণ-রক্ত-লোকসানে, ওপারেও নেই প্রত্যাশা পূরণের প্রতিশ্রুতি। সাতটি তারার তিমিরের মত অন্য এক কথাও ভাবতে পারেন জীবনানন্দ—'অনন্ত রৌদ্রের অন্ধকার'। বড়ো ইতিহাসের মানবসম্বন্ধকে প্রতারিত করে গেছে ছোট ছোট ইতিহাসের 'মানুষ' নামক আর এক প্রজাতি যারা পোশাক পরে নিতান্তই লজ্জাবশতঃ। মানবতার এই বিপর্যয়কে কিছুটা শ্লেষ ভরে ফুটিয়ে তোলেন জীবানন্দ এবং হাত রাখেন প্রতারিত গরিষ্ঠের দিকে অদ্ভুত মমতায়।—'যেন কেউ দেখেছিলো খণ্ডাকাশ যতবার পরিপূর্ণ—নীলিমা হয়েছে,/যতবার রাত্রির আকাশ ঘিরে স্মরণীয় নক্ষত্র এসেছে,/আর তাহাদের মতো নরনারী যতবার/তেমন জীবন চেয়েছিলো,/যত নীলকণ্ঠ পাখি উড়ে গেছে রৌদ্রের আকাশে,/নদীর ও নগরীর মানুষের প্রতিশ্রুতির পথে যত/নিরুপম সূর্যালোক জ্ব'লে গেছে তার/ঋণ শোধ করে দিতে গিয়ে এই অনন্ত রৌদ্রের অন্ধকার।/মানবের অভিজ্ঞতা এ-রকম।' একালের সব মানুষ 'বিকেলের পরে এক তিমির রাত্রির/সমুদ্রের যাত্রীর মতন…'। 'মকর-সংক্রান্তির রাতে' নামক কবিতার শিরোনামের নীচেই জীবনানন্দ লিখে দেন 'আবহমান ইতিহাসচেতনা একটি পাখির মতো যেন'—বন্ধনীর মধ্যে। এই একটিমাত্র কবিতাতে জীবনানন্দ কতবার যে 'সময়' শব্দটা ব্যবহার করলেন : 'সে সময়', 'গভীর সুসময়', 'এখন সময়', ইত্যাদি। পরের কবিতা 'উত্তর প্রবেশ'-এ আছে 'পুরোনো সময়' কথাটা। 'দীপ্তি' নামাঙ্কিত কবিতায় আছে এই রকম সব পঙক্তি : 'যত স্রোত ব'য়ে যায় / সমরের / সময়ের মতন নদীরা জলসিঁড়ি, নীপার, ওডার, রাইন্, রেবা, কাবেরীর / তুমি তত ব'য়ে যাও,/ আমি তত ব'য়ে চলি,/ তবু কেহই কারু নয়।' অদ্ভুতভাবে এই কবিতায় এসে গেছে বুদ্ধ-র কথা, সুজাতার কথা, এপিক্টেক্রেসের কথা। বন্ধুর পথে তরঙ্গায়িত ইতিহাস-প্রবাহ হাহাকারের

ফেনপুঞ্জে বিদীর্ণ হয়ে যায় যখন স্বদেশের ঘটমান বর্তমান জানায় ১৯৪৬-এর চরম অবাঞ্ছিত দাঙ্গায় ইয়াসিন-হানিফ-মহম্মদ-মকবুল-করিম-আজিজ-গগন-বিপিন-শশী সবাই চলে গেছে সংকীর্ণ বুদ্ধির চোরাবালির গর্ভে ; পৃথিবীতে ফসল না ফলিয়ে শোধ করে গেছে রক্তের ঋণ। সৌভাগ্য যে নজরুল তখন বাক্‌শক্তি-রহিত। তবু এই সংহার যজ্ঞে বহমান ইতিহাস থেকে কিছু সমিধ সংগ্রহ করা হয়েছিল বোঝা যায়। কিন্তু এমন দুঃস্বপ্ন তো কেউ দেখে নি যে, 'হৃদয় বিহীনভাবে আজ / মৈত্রেয়ী ভূমার চেয়ে অন্ন-লোভাতুর'। একালে মৈত্রেয়ী আর বলবে না 'যেনাহং নামৃতাস্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্।' মৈত্রেয়ী-র ব্যক্তিসময়ের ওপর থাবা বসিয়েছে অন্নলোভাতুর বিকারগ্রস্ত বড়ো সময়। আমারই চেতনার রঙে পান্না হয়েছে সবুজ, চুণি হয়েছে রাঙা, গোলাপ হয়েছে সুন্দর এ সব কথার আগে, অনেক অনেক আগে, মৈত্রেয়ীর চাওয়া ছিল অমৃতত্ব। সেদিনের মৈত্রেয়ী যা চায় নি আজকের মৈত্রেয়ীর সেটাই একমাত্র চাওয়া।

মহাসময় ও মহাবিশ্বে আমাদের ভূমিকা কতটা 'অকিঞ্চিৎকর', বিজ্ঞানের প্রসাদে আজকে আমরা তা বুঝেছি। 'আমরা আসবো বলেই বিশ্বসৃষ্টি হয় নি। মহাবিশ্বসৃষ্টির বহু কোটি বছর পর পৃথিবী নামের এই ছোট্ট গ্রহে বিজ্ঞানের নিয়মকানুন মেনে নিয়েই আদি জীবের বংশধর হিসেবে ক্রম-বিকাশ, বিবর্তন ও বিবর্ধনের ধারায় আমাদেরও এই বিশ্বের অসংখ্য প্রজাতির জীবের মতো এই পৃথিবীর বাসিন্দা হওয়া সম্ভব হয়েছে'।[১] এই পরম সত্য জানা হলে অমৃতত্ব অকল্পনীয় ভাববিলাস মাত্র। বৈজ্ঞানিক যা বলেছিলেন তটস্থের ভঙ্গিতে সেই সত্যটাই ঘোষণা করলেন জীবনানন্দ তাঁর মত করে : 'গাঢ় অন্ধকার থেকে আমরা এ পৃথিবীর আজকের মুহূর্তে এসেছি' ("অন্ধকার থেকে") এবং অমৃতের জন্য নয় ভালো লাগায় ভরা একটা সার্থক জীবনের আশায় দুঃখে-সুখে অভিজ্ঞ মানুষের হয়ে জীবনানন্দ বললেন : "ইতিহাস সঞ্চারিত হে বিভিন্ন জাতি, মন, মানবজীবন,/ এই পৃথিবীর সুখ যত বেশি চেনা যায়—চলা যায় সময়ের পথে, / তত বেশি উত্তরণ সত্য নয়—জানি ; তবু জ্ঞানের বিবর্ণলোকী আলো/অধিক নির্মল হয়ে নটীর প্রেমের চেয়ে ভালো/সফল মানব-প্রেমে উৎসারিত হয় যদি, তবে নব

১. দ্র. অধ্যাপক রথীন্দ্রনারায়ণ বসু-র লেখা 'স্টিফেন হকিং-এর মহাবিশ্ব-ভাবনা'। নন্দন : ১৯৯৪ জানুয়ারি।

নদী নব নীড়: নগরী নীলিমা সৃষ্টি হবে। / আমরা চলেছি সেই উজ্জ্বল সূর্যের অনুভবে (ঐ)। কবি জীবনানন্দ জানতেন না যা কিনা বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং বলেছেন —ভালোবাসা বিশ্বাস নীতিবোধ ইত্যাদি ভিন্ন ধরনের পদার্থবিদ্যার অন্তর্গত।[২]

"সময়ের তীরে" কবিতায় বেশ কিছু স্মরণীয় পঙক্তিতে 'সময়' এবং বিশেষ করে সূর্যের বারংবার উল্লেখ সচকিত হয়ে উঠি আমরা—'নিসংকোচ রৌদ্রের ভিতরে', 'সূর্যজলস্ফুলিঙ্গের', 'সূর্যলোকান্তরে' প্রভৃতি শব্দবন্ধের পর পাই বিশিষ্ট এই সব শেষের স্তবক :

> ডানে বাঁয়ে ওপরে নীচে সময়ের
> অনন্ত তিমিরের ভিতর তোমাকে পেয়েছি।
> শুনেছি বিরাট শ্বেতপক্ষীসূর্যের
> ডানার উড্ডীন কলরোল;
> আগুনের মহান পরিধি গান করে উঠছে।

'অনন্ত তিমির', 'শ্বেতপক্ষীসূর্য', 'আগুনের মহান পরিধি' অন্ততঃ তিনটি Thermal imagery পাওয়া গেল এই ছোট্ট একটি স্তবকে এবং এই সব imagery কোনো না কোনোভাবে হকিং-কথিত 'thermodynamic arrow of time'-এর কথা মনে করিয়ে দেয়, কারণ জীবনানন্দের কবিতায় সময়ের অঙ্কের সঙ্গে উষ্ণতার চিত্রকল্প এসে গেছে এবং শীতলতার বৈপরীত্যে; যেমন 'চারিদিকে রৌদ্রের ভিতর রয়ে গেছে নির্মল জলের অনুভূতি; /জল আকাশ ও আগুনের থেকে এই সব রাত্রির জন্ম হয়।' Thermodynamics-এর দ্বিতীয় সূত্র বলছে 'Conversion of heat into work essentially requires a hot body cold body simultaneously.' এই তত্ত্ব প্রমাণে সক্ষম এই ধরনের দৃষ্টান্ত অজস্র তুলে নিয়ে আসা যায় জীবনানন্দের কাব্যসংগ্রহ থেকে। সব চেয়ে বিস্মিত হয়েছি ভেবে এবং নিজেকেই প্রশ্ন করেছি এই কথা ভেবে যে, একটা কবিতায় কতবার 'সময়' শব্দের ব্যবহার সম্ভব সচেতন না হয়ে। তাই মনে মনে সিদ্ধান্তে এসেছি যে, কবি এই মাত্রাটিকে কাব্যিক-দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিক তিনদিন থেকেই ধরেছেন এবং হয়ত তার ফলে দু'একক্ষেত্রে কবিতা মার খেয়েছে। এসে গেছে

২. দ্র· অধ্যাপক রথীন্দ্রনারায়ণ বসু-র লেখা স্টিফেন হকিং-এর মহাবিশ্ব-ভাবনা'। নন্দন : ১৯৯৪ জানুয়ারি।

ভুলে যাওয়া সহজ, এমন অনেক পঙক্তি। তবে তা থেকে গড়ে উঠেছে সময়ের নতুন বাচন। কিন্তু কবিতাকে মেরে কাব্যপাঠক কি চান সময়ের ভাষ্য? "পৃথিবী আজ" নামের কবিতাটাতে পাচ্ছি 'সময় পাপচক্র' 'সময় এখন চার দিকেতে ঘনান্ধকার দেখে', 'অন্তত আজ রাত্রি একা অল্প সময়ের ভিতরে শুভ অনুধ্যায়ী সময়দেবীর মতো', 'দেশ-সময়ের মানুষ মনের' এই রকম অনেক কথা। এইভাবে বারবার 'সময়ে'র ব্যবহার এবং নিরাবেগ ব্যবহার এমন সমস্যাভাবে তিনি করেছেন যা বিজ্ঞানী বা দার্শনিকের কাছেই কেবল প্রত্যাশিত; কবির কাছে নয়। মাঝে মাঝে যেন জীবনানন্দ তাঁর ব্যক্তিসময়ে বাস করেও কৌশলে বেরিয়ে এলেন, বড়ো সময় থেকে তো বটেই এবং রচনা করলেন discourse of time. এই discourse রচনায় জীবনানন্দ যে বিজ্ঞানকে বাদ দেন'নি এবং আমাদের এই নিবন্ধে বিজ্ঞান-প্রসঙ্গ যে আরোপিত ভণিতা নয় তা তাঁর একটি গদ্য নিবন্ধে নিবিষ্ট হলেই বোঝা যায়। 'কবিতার আত্মা ও শরীর প্রবন্ধটার কথা বলছি। রচনাকাল: ১৩৫৪। জীবনানন্দ লিখেছেন: 'বিজ্ঞানের প্রকর্ষের দিনে আজকের কবি বিজ্ঞানের সত্যকে অস্বীকার করে কবিতা সৃষ্টি করবার কোনো আবেদন অনুভব করছেন না;—কবি যদি প্রকৃতিকে ভালোবাসেন কিংবা পৃথিবীর নরনারীকে, যদি মানব-জীবনকে ভালোবাসেন তিনি, কিংবা জীবনের পরে মৃত্যুর রহস্যলোককে, যদি তিনি অতীত বা আধুনিক মানুষ সমাজের অভাব ও অবিচার যে অবিজ্ঞানী অবিদ্যার থেকে সঞ্চিত একথা উপলব্ধি করে বিমর্ষতা বোধ করেন, কিংবা এ অভাব ঘোচাবার জন্যে আগামী দিনের সৎ সমাজের প্রবর্তনায় নিজের প্রজ্ঞা-দৃষ্টিকে নিয়োজিত করে আশা-ভরসায় কবিতায় উৎসারিত হয়ে উঠতে চান—সবই তিনি পারেন—বিজ্ঞান কোথাও তাঁকে বাধা দেবে না।' কিছু পরেই আবার পাচ্ছি 'কোয়ান্টাম থিওরি, সময়-দেশের আপেক্ষিকতা, দেশকালের সীমা প্রসৃতি, বিচূর্ণ পরমাণুর আশ্চর্য উত্তেজ, ধনতান্ত্রিক সুনিয়ম ও সুকৃতির উপর সৎসমাজের প্রতিষ্ঠা এই বৈজ্ঞানিক প্রবর্তনার পক্ষেই মানুষের হৃদয়ের পরিবর্তনের সম্ভাব্যতা—কোনো আদর্শ আবেগের পক্ষে নয়; আমাদের পরবর্তী যুগ এসে এসব খতিয়ে দেখবে আর একবার'। এই সব মন্তব্য কি আশা করা যায় 'নির্জনতম কবি'র কাছ থেকে? অদ্ভুত এক আঁধার ঘিরেছে আজ আমাদের। রবীন্দ্র-বলয় থেকে বের হয়ে কতদূরে কতটা তাৎপর্যপূর্ণ সময় সরণিতে অগ্রসর হতে পেরেছি আমরা? নিশ্চিত-

ভাবে যিনি পেরেছিলেন তিনিও কি কোয়ান্টাম-তত্ত্ব, সময়-দেশের আপেক্ষিকতা অতটা গাঢ় ও গভীরভাবে ধরতে পেরেছিলেন আপন জ্ঞান-বিশ্বে এবং প্রজ্ঞাকে জারিয়ে নিতে পেরেছিলেন রসের সঙ্গে ? হয়ত পেরেছিলেন, নইলে এমন গম্ভীর রসস্নাত এবং জ্ঞানালোকিত কাব্য-পঙক্তি রচনা সম্ভব হত না তাঁর পক্ষে :

মৃত সব অরণ্যেরা ;
আমার এ-জীবনের মৃত অরণ্যেরা বুঝি বলে :
কেন যাও পৃথিবীর রৌদ্র কোলাহলে
নিখিল বিষের ভোক্তা নীলকণ্ঠ আকাশের নীচে
কেন চ'লে যেতে চাও মিছে ;
কোথাও পাবেনা কিছু ;
মৃত্যুই অনন্ত শান্তি হয়ে
অন্তহীন অন্ধকারে আছে
লীন সব অরণ্যের কাছে।
আমি তবু বলি :
এখন যে কটা দিন বেঁচে আছি সূর্যে-সূর্যে চলি,
দেখা যাক পৃথিবীর ঘাস
সৃষ্টির বিষের বিন্দু আর
নিষ্পেষিত মনুষ্যতার
আঁধারের থেকে আনে কী ক'রে যে মহা-নীলাকাশ
ভাবা যাক—ভাবা যাক—
ইতিহাস খুঁড়লেই রাশি-রাশি দুঃখের খনি
ভেদ করে শোনা যায় শুশ্রূষার মতো শত-শত
শত জলঝর্ণার ধ্বনি। ("হে হৃদয়")

এ যেন কবির এবং একান্ত কবিরই উচ্চারণ যা 'thermodynamic arrow' বা 'cosmological arrow of time' দিয়ে বোঝা যাবে না, হয়ত যাবে না 'Psychological arrow of time' দিয়েও যার সংজ্ঞা হকিং-এর ভাষায়—'This is the direction in which we feel time passes, the direction in which we remember the past not the future.'

জীবনানন্দ : বিচ্ছিন্নতা থেকে ঐক্যের দিকে

রাম বসু

একদিন জীবনানন্দ আক্ষেপ করে বলেছিলেন, সাহিত্যের বড় বাজারে তাঁর খদ্দের খুবই অল্প। সামান্য কয়েকজন সহমর্মীদের নিয়ে তিনি নিজের মতো থাকেন। তিনি ধরেই নিয়েছিলেন তাঁকে এই ভাবেই থাকতে হবে। আজ যদি জীবনানন্দ তাঁর শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে দেশজোড়া এত আয়োজন, বক্তৃতা, সেমিনার, পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থের প্রকাশ ও আলোচনা দেখতেন বা শুনতেন, তাহলে কি বলতেন তিনি? তিনি তাঁদেরও কি কৃমি কীট না ঘেঁটে দুটিকয়েক কবিতা লিখতে বলতেন?

এই অভিমান সে দিন হয়তো ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু আজ হয়তো তৃপ্ত হতেন এই ভেবে বাংলা সাহিত্যের পাঠক তাঁকে অবহেলা তো করেই নি, বরং সশ্রদ্ধভাবে, হয়তো বা কিঞ্চিৎ উগ্র আতিশয্যে সে দিনের লিটিল ট্রাডিশন আজ হয়েছে গ্রেট ট্রাডিশন। তাঁকে স্মরণ করছে।

যেহেতু অগ্রজ কবিকে প্রণাম জানাতে গিয়ে নিজের মুখোমুখি আসতেই হয়, তাই আমাকেও ভাবতে হয় কোন্ অর্থে আমার কাছে জীবনানন্দ প্রথমত মূল্যবান ও স্মরণীয়। আতস কাঁচে বিচ্ছুরিত কবিতার বর্ণমালা থেকে আমি শুধু একটিমাত্র দিক বেছে নিতে চাই। সে হল তাঁর নির্জনতা। বুদ্ধদেব বসু তাঁকে বলতেন 'নির্জনতম কবি'। আমি অন্য একটা প্রবন্ধে বলেছি, নির্জনতম নন; নিঃসঙ্গতম কবি।

এখন প্রশ্ন হল : কেন এই নিঃসঙ্গতা?

মনে হয় নিঃসঙ্গতা তাঁর চারিত্রিক গঠন। চারিত্রিক টাইপ-ই হল অন্তর্মুখীন বা ইনট্রোভার্ট ও রিসেপটিভ।

এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য শর্তাধীন বা কনডিশান্ড হয়ে উঠেছে তাঁর বাঁচার বাস্তবতায়।

দ্বিতীয় কারণ হল তিনি পারিবারিক সূত্রে ব্রাহ্ম। বরিশাল শহর যত ঐতিহ্যবানই হোক না কেন, স্বাধীনতা সংগ্রামে তার যত ঐতিহ্যই থাক, সে প্রথাগত বা ট্রাডিশনাল সমাজের বাইরে নয়। প্রথাসিদ্ধ সমাজে আচার আচরণ রীতি নীতি প্রথা সংস্কার ইত্যাদি এক ধরনের বদ্ধ মানসিকতা

আনে। জীবনের উত্তাল সমুদ্রে, সংকটে আবর্তে এই বিশ্বাস ও প্রথা তার নোঙর। হিন্দু ও ব্রাহ্ম একই সমাজে একই জমিদারিতে পাশাপাশি থেকেছে, ঘনিষ্টতা হয়েছে। কিন্তু আত্মীয়তা হয় নি তখন, এই শতকের প্রথম দিকে। তার নিখুঁত বিবরণ পাওয়া যাবে শরৎচন্দ্রে।

'ব্রাহ্ম সমাজের সার্থকতা' শীর্ষক ভাষণে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন "বর্তমান কালের সংঘর্ষে ব্রাহ্ম সমাজে ভারতবর্ষ আপনার সত্যরূপ প্রকাশের জন্য প্রস্তুত হয়েছে। চিরকালের ভারতবর্ষকে ব্রাহ্ম সমাজ নবীন কালের বিশ্বপৃথিবীর সভায় আহ্বান করেছে। বিশ্ব-পৃথিবীর পক্ষে এখনও এই ভারতবর্ষকে প্রয়োজন আছে। বিশ্বমানবের উত্তরোত্তর উদ্ভিদ্যমান সমস্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে বর্তমান যুগে ভারতবর্ষের সাধনাই সকল সমস্যার, সকল জটিলতার, যথার্থ সমাধান করে দেবে—এই একটা আশা ও আকাঙ্ক্ষা বিশ্বমানবের বিচিত্র কণ্ঠে ফুটে উঠেছে।"

(শান্তিনিকেতন, ২য় খণ্ড, পৃ ২১৮, ব্রাহ্ম সমাজের সার্থকতা।)

কিন্তু সত্যিই কি তখন হতে পেরেছিল? ব্রাহ্ম সমাজ তখনও 'লিটিল ট্রাডিশন'। কলকাতা এখনো যেমন অর্ধ-গ্রাম্য তখন ছিল আরও গ্রাম্য। এলিট ধর্মী ব্রাহ্ম সমাজ হিন্দুত্বের অন্তর্ঘাতী দাপট থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে নি। যে বৌদ্ধ ধর্মকে ভারতের লোকায়ত জীবন আত্মার প্রদীপ বলে বরণ করেছিল কালক্রমে দেখা গেল বৌদ্ধ ধর্মের জন্মভূমি থেকেই সেই বৌদ্ধ-বাদ মুছে গেল।

তবু তো ঠাকুর বাড়ি টিঁকে ছিল।

ঠাকুর বাড়ি টিঁকে ছিল। সে ঠাকুর বাড়ি প্রায় একটা 'অলৌকিক পরিবার' বলেই ছিল। তার ছিল কুল-কৌলিন্য, বিত্ত ও প্রতিভা। এই 'অলৌকিক পরিবার'-এ ততোধিক অলৌকিক ভাবে এসেছিল প্রতিভার জ্যোতিষ্ক মণ্ডল। তাই ঠাকুর বাড়ি শুধু একটা প্রতিষ্ঠান নয়, ঠাকুরবাড়ি সমাজে গতিময় শক্তির উৎস। সেখানে বরিশাল শহরের অতি উচ্চ শিক্ষিত ইংরেজী সাহিত্যে সুপণ্ডিত জীবনানন্দ সৌর মণ্ডলের বাইরের একটি উজ্জ্বল পতঙ্গ মাত্র। রবীন্দ্রনাথকে নিজের পরিচয় দিতে জীবনানন্দ, ফাল্গুন, ১৩৪৩ সালের এক চিঠিতে লিখেছেন, "আমি একজন বাঙালী যুবক; মাঝে মাঝে কবিতা লিখি। অনেকবার দেখেছি আপনাকে; তারপর ভিড়ের ভিতর হারিয়ে গেছি। আমার নিজের জীবনের

তুচ্ছতা ও আপনার বিরাট প্রদীপ্তি সব সময়েই মাঝখানে কেমন একটা ব্যবধান রেখে গেছে—আমি তা' লঙ্ঘন করতে পারি নি। আজ যদি St. Paul কিম্বা খৃষ্ট অথবা গৌতম বুদ্ধ পৃথিবীতে ফিরে আসেন আবার, তা হলে ভিড়ে চাপা প'ড়ে তাঁদের সঙ্গে দেখা করে আসব হয়তো; কিন্তু তারপর তাঁরা আমাকে ভিড়ের মানুষ বলে বুঝে নেবেন ;

(জীবনানন্দ দাশ, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, পৃ ৯৭-৯৮)

রবীন্দ্রনাথ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-কে যত কাছের মানুষ বলে মনে করতেন, জীবনানন্দকে তা করতে পারেন নি ঃ সেই সময়ের ধার্মিক অনুষঙ্গ মনে রেখে বলা যায় এই দূরত্ববোধ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। আবার, জীবনানন্দ নিতান্তই পরিশীলিত পরিবারের প্রতিভাবান মধ্যবিত্ত। জগৎ সংসারে তাঁর পুঁজি বা ক্যাপিটাল হল প্রতিভা।

তাই দেখা যাচ্ছে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছাড়াও জীবনানন্দকে নির্জন করে রেখেছে তাঁর কৈশোর ও যৌবনের বিকাশকাল। "এমনি করেই বাল্য কৈশোর কেটেছে রূপময়ী বরিশালের কোলে মায়ের মমতার আশ্বাসে, আশ্রয়ের অন্তরালে, বাবার জ্ঞানযোগী প্রগাঢ় ব্যক্তিত্বের সৌর তেজের উত্তাপে, 'ভাবতে শেখা'র উন্মেষে। আর বাকিটুকু ভরাট করেছিল বই আর বই, বাগানের ভাণ্ডারে বিচিত্র রঙে রসে মন ভরিয়ে দিয়ে অপার অজস্র ফুল আর ফল।

(দাশ পরিবার ও জীবনানন্দ, সুচরিতা দাশ, দেশ, ২৬ ডিসেম্বর ১৯৯৮, পৃ ৩৮)

এবং এই থেকেই তাঁর আশ্রয়স্থল অনিবার্যভাবে হয়ে উঠলো নিসর্গ। আমি নিসর্গ শব্দটা ব্যবহার করছি। প্রকৃতি নয়।

॥ ২ ॥

এখন জীবনানন্দের এই নির্জনতা ও নিসর্গ সর্বস্বতাকে চারিত্রিক টাইপ, ব্রাহ্ম পরিবার, 'মধ্যবিত্তের প্রতিভা পুঁজি বা এই সবগুলো নিয়ে এবং আরও কিছু, যথা সমাজ বিকাশের ধারা ; ইত্যাদি নিয়ে যে বোধ গড়ে উঠলো, তাকে কি বিচ্ছিন্নতা, অনন্বয়, আত্মচ্যুতি বা এ্যালিয়েনেশন বলা যায় ? এই সঙ্গে প্রশ্ন ওঠে আধুনিকতা কি? আধুনিকতার মডেল কি সার্বিক বা ইউনিভারসালিস্টিক ? না কি সে কি বিশেষ, এক এক দেশে এক এক তার রূপ ? এটা সামগ্রিক ভাবে বাংলার নতুন সাংস্কৃতির চরিত্রগত সমস্যা।

ইংরেজী সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্বকে মেনে নিয়েই কখনো তার ছায়ায় কখনো তার বিপ্রতীপে আত্মআবিষ্কার করতে চেয়েছে।

আত্মচ্যুতি, অনন্বয় বা এ্যালিয়েনেশন-এর অর্থ ও তাৎপর্য গভীর ও ব্যাপক। সাধারণভাবে মার্কসীয় চিন্তায় এ্যালিয়েশন বলতে বোঝায় মানুষ প্রকৃতি থেকে, বিচ্ছিন্ন হচ্ছে। সে বিচ্ছিন্ন হচ্ছে সমাজ থেকে, তার কাজ থেকে এবং সে বিচ্ছিন্ন হচ্ছে তার স্পিসিসহুড বা মানবসত্তা থেকে। সামগ্রিক ফলমানুষ পরিণত হচ্ছে চেতনারহিত জড়পিণ্ডে। এরিক ফ্রম এই ভাবপ্রতিমা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, "Alienation (or estrangement) means for **Marx** that man does not experience himself as the acting agent in his grasp of the world, but that world (nature ; others and he himself) remain alien to him. They stand above and against him as objects ; even though they may be objects of his own creation. Alienation is essentially experiencing the world and oneself passively, receptively as the Subject seperated from rhe Object."

(Marx's Concept of Man, Erich Fromm, P-44)

সমাজ দেশ এবং নিজের থেকে নিজের বিচ্ছেদ ঘটে গেছে ইংরেজ আসার পর থেকেই। যে মধ্যবিত্ত সমাজ এল তারা ইয়োরোপের শিরদাঁড়া খাড়া করা মধ্যবিত্ত নয়। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কথায় তারা 'স্পুরিয়াস মিডল ক্লাস'। বিচ্ছিন্নতা তাই নিয়তি-নির্দিষ্ট। উনিশ শতকের ছিন্নমূল অস্তিত্বের কথা শোনা যায় তত্ত্বোধিনী পত্রিকায়। "শিক্ষিত সম্প্রদায় স্ত্রীকে একটি প্রধান সুখের কারণ মনে করে। কিন্তু তাহারা মনে মনে স্ত্রীর যে কল্পনা করিয়া রাখে তাহা রক্ত মাংসে জড়িত বাঙালী স্ত্রীতে এক্ষণে পাওয়া অসম্ভব। যতদিন মানুষ সুখের দেখা পায় না কিন্তু পাইব বলিয়া প্রাণে এক বিন্দুও আশা থাকে ততদিন বড় দুঃখেও মানুষ দুঃখী নয়, কিন্তু যখন সুখ পাইয়াও মানুষ সুখী হয় না সুখের জিনিষ পাইয়াও সাধ মেটে না তখনই মানুষ প্রকৃত দুঃখী। বিবাহের পর অনেক কৃতবিদ্য যুবকের মুখে শুনিতে পাই "সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু আগুনে পুড়িয়া গেল, অমিয় সাগরে সেনান করিতে সকলি গরল ভেল।" পরিবারস্থ স্ত্রী সম্প্রদায় কেহই ইহাদিগকে সুখ দিতে পারে না। স্ত্রী, মা, ভগিনী কেহই ইহাদের পছন্দমত

হইতেছে না।" (তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, সংবাদ পত্রে বাংলার সমাজ চিত্র, ১৮৪৫-১৯০৫), দ্বিতীয় খণ্ড, পত্র ৩৪৮, সম্পাদিত ও সংকলিত—বিনয় ঘোষ) এই অপ্রাপ্তির কথা আরও তীক্ষ্ণভাবে বলা আছে সংবাদ প্রভাকর-এ প্রকাশিত 'কশ্চিৎ ইয়ং বেঙ্গলস্য' নামে লিখিত এক পত্রে। প্রসঙ্গত, আমি এই পত্রখানি উদ্ধৃত করেছিলাম শ্রদ্ধেয় ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত 'মানব মন' পত্রিকায়। ডাঃ গাঙ্গুলীই প্রথম ব্যক্তি যিনি বাংলা দেশে এ্যালিয়েনেশন নিয়ে প্রথম আলোচনা ও সেমিনার করেন যেখানে সাহিত্যশাখায় বিষ্ণু দে সভাপতিত্ব করেন এবং আমি বাংলা সাহিত্যে বিচ্ছিন্নতা বিষয়ে প্রবন্ধ পড়ি। সেই প্রবন্ধে এই উদ্ধৃতিটি ব্যবহার করা হয়েছে।'

যা হোক, বিচ্ছিন্নতার আর্তনাদ শোনা যায় নেহরুর কণ্ঠে। "I have become a queer mixture of the East and the West, out of place everywhere, at home nowhere. Perhaps my thoughts and approach to life are more akin to what we called the Western than Eastern, but India Clings to me...."

(Towards Freedom : An Autobiography p-341)

তা হলে দেখা যাচ্ছে জীবনানন্দ শুধুমাত্র চারিত্রিক "মুদ্রা দোষ"—এ বিচ্ছিন্ন হন নি, সমাজ বাস্তবতা এবং তার ঐতিহাসিক গতি তাঁকে বিচ্ছিন্ন হতে বাধ্য করেছে এরিক ক্রম কথিত (nature, others and he himself remain alien to him) তা কতদূর সত্য প্রকাশিত হয় 'বোধ' কবিতায়। যে প্রেমের জন্য তাঁর করুণ আর্তি 'একটি মুহূর্ত যদি আমার অনন্ত হয় মহিলার জ্যোতিষ্ক জগতে' সেই কবিই বলছেন :

ভালবেসে দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে,
অবহেলা ক'রে আমি দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে
ঘৃণা করে দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে···

'মেয়েমানুষের' মত অতি গ্রাম্য শব্দের এইভাবে ব্যবহার করার মধ্যে নিজের প্রতি ঘৃণা ধিক্কার ও আত্ম করুণাই প্রকাশিত হয়। তিনি ভালবাসছেন কিন্তু তা ঘৃণায় জড়িত। তৃপ্তি নেই কিছুতেই। এই হল বহু খণ্ডিত

১. প্রবন্ধটি আমার কাছে নেই। যদি কোন সহৃদয় পাঠক অনুগ্রহ করে প্রবন্ধটির জেরক্স কপি আমাকে দেন তবে তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ থাকবো

ব্যক্তিত্ব বা স্প্লিট পারসনালিটি।' নিজের ভেতর চলছে নিজের মুখোমুখি আসা, নিজের সঙ্গে দ্বন্দ্ব, আলো আঁধারের দ্বন্দ্ব, ভারসাম্যহীনতা। দ্বন্দ্ব বিধ্বস্ত ইয়োরোপ একভাবে এসেছিল এলিয়ট-এর ওয়েস্টল্যান্ডে। আমরা এলাম অন্যভাবে। এটা যতটা না বেশি বাস্তব, আর চেয়ে অনেক বেশি সত্য হল আরোপিত চৈতন্য যা চেতনার বিপর্যয়।

কিন্তু কথাসাহিত্য এই ভয়াবহ অভিজ্ঞতার হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পেরেছিল। পারে নি বাংলা কবিতা। কারণ সম্ভবত বাংলা কবিতার পঞ্চ পান্ডবের মধ্যে চারজনই বিদেশী সংস্কৃতিতে চোস্ত। আমরা কলোনীয় আওতায় লড়াই করলাম কলোনীয় কালচারের বিরুদ্ধে। বুঝলাম না সংস্কৃতিও উপনিবেশের একটা স্তম্ভ। ভিক্ষাপাত্র হাতে করে রবীন্দ্রনাথকে বিস্পষ্ট প্রণাম জানিয়ে পৃথিবীর দোরে দোরে ঘোরার মধ্যে চেতনার মুক্তি নেই।

॥ ৩ ॥

কিন্তু আত্মচ্যুতিতে শান্তি নেই। কবির ধর্মই হল আত্মনির্মাণ; নিজেকে নতুন ভাবে আবিষ্কার করা আর আত্মআবিষ্কারের কাহিনী শোনান। "Animals construct only in accordance with the standards of every species to which they belong, while man know how to apply the appropriate standard to the object. Thus man constructs also in accordance with laws of beauty" (E.P.M. Marx's concept of Man, Fromm P. 102). তাই 'ল'জ অব বিউটি' লাগামছাড়া সৌন্দর্য নয়, তার আগে ও পরে আরও কিছু আছে।

মানুষ পৃথিবীর রূপ রস বর্ণ গন্ধ শব্দ বেছে নিতে পারে ইন্দ্রিয়ের দয়ায়। সৌন্দর্যের আইন তাই মার্কসীয় অভিধায় অন্যভাবে কাজ করে। এটা সচেতন প্রক্রিয়া, কি করে প্রয়োগ করতে হবে, এই জ্ঞানই মানুষকে পশু জগত থেকে আলাদা করে রাখছে।

কবিস্বভাবের নিজস্ব রীতিতে জীবনানন্দ আত্মচ্যুতি থেকে আত্মবিস্তার ও নিজেকে যুক্ত করার অপরিহার্যতা অনুভব করেছিলেন। মহা পৃথিবীতে এই প্রয়াস ছিল স্বপ্ন পাওয়া নিসর্গলিপ্সা। তিনি শারীরিকভাবে তীব্র

আবেগ যুক্ত হতে চেয়েছেন বাংলার মাটিতে হাওয়ায় শিশিরে। তীক্ষ্ণ অনুভূতি দিয়ে শুনেছিলেন শিশিরের শব্দ। ইন্দ্রিয় দিয়ে শরীরের সর্বস্বতায় নিসর্গকে শুষে নিতে চেয়েছেন। ঘাসের ভিতর দিয়ে ঘাস মাতার শরীরে কিংবা হাওয়ার রাতে মৌসুমী সমুদ্রের মতো নিজেকে মেলে দিয়ে যুক্ত হবার চেতনা কাজ করেছে। প্রসঙ্গত উটের গ্রীবার মতো অন্ধকারকে কেউ বলেছেন বিশ্বসাহিত্যে তুলনারহিত। মনে হয় অবনীন্দ্রনাথের যাত্রা শেষ বা জার্নিস এন্ড ছবিটি মনে রাখলে তা আর হবে না।

'পরিচয়'-এর সঙ্গে জীবনানন্দের সম্পর্ক মধুর হবার পক্ষে প্রতিবন্ধকতা নিশ্চয়ই ছিল। এবং সে প্রতিবন্ধকতা সহজে কাটানো যেত না। দৃষ্টি ভঙ্গির মৌলিক ব্যবধান অনতিক্রম্য।

সমগ্র বিতর্কটা গিয়ে দাঁড়ালো কবিতা কি দেশ হিতৈষীয়ানা ও সম্পাদকীয় প্রবন্ধ? অথচ শুধু বিবৃতি যে মহৎ কবিতা হয় এবং হয়েছে, যথা হুইটম্যান, ব্রেশট এমন কি রবীন্দ্রনাথেও, তা কেউ পরিষ্কার করে বললেন না। বললেন না, রাজনীতির অর্থ কি?

যা হোক, নিতান্ত নিসর্গ প্রীতি, বিচিত্রও শারীরিকভাবে পৃথিবীর রূপ বদল দেখতে দেখতে যে কবি ধূসর মুগ্ধতার মোহে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে, করতেন আবিষ্ট কণ্ঠে বিচিত্র উচ্চারণ, আঁকতেন ছবি, তৈরি করতেন উপমা, সাতটি তারার তিমির-এ এসে সেই কবির গোত্র বদল হয়ে গেল। এবং তখন তিনি 'পরিচয়' থেকে অনেক দূরে।

'সাতটি তারার তিমির' জীবনানন্দের জন্মান্তর। এখন তিনি রূপ মুগ্ধ কবি নন আর। বিচ্ছিন্নতা থেকে মুক্তির জন্য স্বপ্নের ভুবন তৈরি করা এখন আর যথেষ্ট নয়। এবার তিনি সমগ্র বিশ্বলোককে অঙ্গীকার করে জীবনের রূপবদলের দায় দায়িত্ব নিলেন। এই দায়িত্ব গ্রহণ হল তিমির বিনাশী মানবলোক নির্মাণের সোপানে, যে সোপান হয়তো নক্ষত্রের কাছাকাছি এসে ভেঙে পড়েছে ড্রেনের ধারে। সাতটি তারার তিমির শুধু মাত্র জীবনানন্দের কাছে নয়, সমগ্র বাংলা কবিতার হিরণ্যপাহাড়। বিচ্ছিন্ন কবি এইভাবে এগিয়ে যান লৌকিক বাস্তব বা এম্পীরিক্যাল জীবনের কাছে যদিও সময় কাল ইতিহাস সম্পর্কে তত্ত্বগত আলোচনা মাত্রাত্মক ভাবে সাবজেকটিভ। আগের পর্যায়ে কবি শুধু চালিত। কিন্তু সাতটি তারার তিমির-এ কবি দায়িত্ববান

চালক। এই দ্বন্দ্বময় প্রক্রিয়ার মধ্যে, মনে হয়, কবি খুঁজে পেলেন বিচ্ছিন্নতা থেকে ঐক্যের পথ।

এবং এই জন্য যা প্রয়োজন এবং যা কবিতার কাজ, তা হল আত্মিক বিশৃঙ্খলার ওপর মানবিক অনুশাসনে রূপময় জগৎ নির্মাণ এবং তার জন্য নিরন্তর প্রয়াস। জীবনানন্দ এই পর্যায়ে সেই দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। এবং খুঁজেছেন কল্লোলীয় উত্তরাধিকার থেকে মুক্তির পথ। অ-বিচ্ছিন্ন কবিত্ব হল মানবতার দ্বৈত সম্পর্ককে ফুটিয়ে তোলা, কালের ক্যানভাসে যেন অভিজ্ঞতা হয়ে ওঠে প্রজ্ঞা। জীবনানন্দ, আমার বিশ্বাস, জীবনের রূপান্তরের দায়িত্ব গ্রহণ করে বিচ্ছিন্নতা থেকে এগিয়ে গেলেন ঐক্যের দিকে।

এই প্রসঙ্গে মনে আসে হেগেলের স্মরণীয় উক্তি : "....as long as he (কবি) expresses only these few subjective sentences, he can not be called a poet, but as soon as he knows how to approprite the world for himself and to express it, he is a poet. Then he is in exhaustible, and can be ever new, while his purcly subjective nature has exhausted itself soon and ceases to have anything to say." (Marx's concept of Man, Erich Fromm, P. 08)

জীবনানন্দ দাশের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ : একটি সমীক্ষা

কার্তিক লাহিড়ী

জীবনানন্দ দাশের 'গ্রাম ও শহরের গল্প' প্রকাশ, তার স্ত্রী শচী এবং সোমেন কে নিয়ে এক ভালোবাসার গল্প। সোমেন শচীকে একসময় ভালোবেসেছিল, কিন্তু প্রকাশের সঙ্গে শচীর বিয়ে হয়ে যায়। এক ত্রিকোণ প্রেমের কাহিনীর মত, কারণ সোমেন তো প্রকাশ ও শচীর প্রথম যৌবনের বন্ধু, অথচ গল্পের নাম অন্য এক মাত্রা উন্মোচন করতে চায়—গ্রাম শহরের এক অন্তর্লীন বিরোধ, এই বিরোধের টানাপোড়েন বুনে ফেলে গল্পের জমি হৃদয় খুঁড়ে।

শচী ও প্রকাশের দাম্পত্য জীবন অ-সুখের নয়, প্রকাশের কাছে "শচী প্রায়ই ভালো মানুষ", আর "স্ত্রী মর্জিমত পদে পদে সে ঢের চলে দেখেছে; তাতে ঢের প্রয়াস লাগে বটে; কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাতেই জীবনের শান্তি থাকে"; অন্যদিকে শচী স্বামীর প্রেমে ও আশ্রয়ে নিরাপদ মনে করে নিজেকে, "পৃথিবীতে এই একমাত্র পুরুষ যার সঙ্গে আমার চলে; প্রকাশবাবু আমার প্রয়োজন মত নিজেকে যে রকম অনবরত artistically পরিবর্তিত করতে পারেন—আর কেউ তা পারে না।"

স্বামী-স্ত্রীর উক্তির মধ্যে তাদের সম্পর্ক যে খুব স্বাচ্ছন্দ্যের—এমন কথা জোর দিয়ে বলা চলে না। দুজনে যেন একটা অলিখিত চুক্তি করে নিয়েছে নিজেদের মধ্যে, কারণ প্রকাশের প্রাণ-চাঞ্চল্য তার হিল্লি-দিল্লী বেড়ানোর বহির্মুখী মনের সঙ্গে শচীর বাংলার দুর্মর আকর্ষণের অন্তবৃত্তির এতটুকু মিল নেই। তবু প্রকাশের অস্থিরতা কিছু মন্থর হয় শচীর ইচ্ছায়, যেমন শচীর স্থৈর্যের ভিতে চিড় ধরে প্রকাশের তাড়ায়। এইভাবে স্থিতাবস্থায় বজায় থাকে, তবু তলে তলে এক আবর্ত কুটিল হয়ে ওঠে।

শচীর আগ্রহেই প্রকাশ শেষে বদলি হয়ে আসে কলকাতায়। শচী কলকাতাকে ভালোবাসে "শুধু বাংলার জিনিষ বলে", এর চেয়েও সে "বাংলার পাড়াগাঁগুলোকে হয়ত আরও বেশি ভালোবাসে।" সামান্য ভালোবাসা নয়, তীক্ষ্ণ তীব্র ভালোবাসা নীরবে বিক্ষুব্ধ হলেও রক্তাক্ত হয়ে ওঠে সোমেনের অতর্কিত উপস্থিতিতে।

নিশ্চুপ সোমেন, আর ঐ নৈঃশব্দ্য কোলাহল মুখর কলকাতা স্তব্ধ হবার পর শচীর একান্তে "হঠাৎ পাড়া গাঁ-র কুয়াশা, ধানের ক্ষেত, পালং শাক, কফি, বিট গাজর, শিউলি, বেঁটে খেজুর গাছ, শুঁয়ো পোকা, প্রজাপতি, কাঁচ পোকা, জোনাকি—আট দশবছর আগেকার কত কি" ভাসিয়ে তোলে। স্মৃতি—পিঁপড়ের কুট কুট কামড়ে শচী "চামচ-কাঁটা রেখে দিচ্ছে। হাত দিয়ে খাবার একটা প্রবল স্পৃহা প্রায়ই তাকে পেয়ে বসে। সমস্ত কিছুর ভিতরেই কাসুন্দি ঢেলে দিচ্ছে…"। শহরে থেকে শৌখিন কাঁটা-চামচের জীবন ছেড়ে চলে যেতে চাইছে হাত দিয়ে মেখে খাওয়ার গেঁয়ো জীবনে—মনে মনে তবু, তাই রক্তহীন জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে, যেখানে প্রকাশের অংশ নেই কোথাও কখনো।

অথচ সোমেনকে তির্যকভাবে কিছু কথা শোনালে সোমেনের প্রশ্নের সামনে "পুরনো ধূসর অন্তরবৃত্তিকে ছাড়িয়ে কোনো মানুষ-ই কি উঠতে পারে?" শচী অসহায় বোধ করে, তখন সোমেনের তুলনায় প্রকাশকেই শিরোপা দেয়। আর সোমেন যখন যাট টাকার মাইনের জন্য প্রকাশের কৃপাপ্রার্থী হয়, তখন সে নিজেকে তিরস্কার করে একদিন সোমেনের সামনে নত হয়েছিল বলে। তবু "এরপর সোমেনের অনেক কথা মনে পড়ে যায়—তার উজ্জ্বলতা, প্রখরতা, জীবনের দুঃসাধ্য গহ্বরে ঢুকবার স্পৃহা, ঢুকবার শক্তি—অনেক কথা—আট দশ বছর আগের—বারো চোদ্দ বছর আগের—"

শাহরিক জীবনে অভ্যস্ত হতে হতেও শচীর জীবনে গ্রাম বাংলার টান অন্তঃশীলার মত বয়ে যায়, কখনো কখনো সেই ইচ্ছা দুর্মর হয়ে সব বেড়া ভেঙে দিতে চায়, তবু পারে না সে। অন্য দিকে নৈরাশ্য ও নিষ্ক্রিয়তায় মগ্ন সোমেন জীবনযুদ্ধে জেতার ফিকিরের সুড়ঙ্গে কাছিমের মত না ঘুরে ফিরে জীবনকে ঝাপটে ধরতে চায়, ফলে তার আপ্রাণ চেষ্টা হয় আবেগ অনুভূতিকে আবিলতার বর্জ্য থেকে রক্ষা করার। এই প্রয়াসে তাই সোমেনের জীবন অর্থহীন হয়ে পড়ে না, যদিও তার স্ত্রী নেই, ঘর নেই, তবু একটা কিছু থাকে যা তাকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে। হয়ত ঐ একটা কিছু হচ্ছে তার পূর্বজীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত আবহমান বাংলার পাড়াগাঁ ও প্রকৃতি। এজন্য সে নির্দ্বিধায় শচীকে এক মোহনার কথা মনে করিয়ে দেয়। সোমেন জানে, শচী এখন শাহরিক জীবনে অভ্যস্ত এবং আরও জানে "আমরা আর সেখানেই নেই—কি হবে সে সব দিয়ে?"

এ জেনেও জ্ঞানপাপীর মত সোমেন আলোড়িত, সমূহ বিচলিত হয় তার ফেলে আসা জীবনের মোহে। বোধহয় সোমেনের এই অকপট আবেগে-ই শেষমেষ নড়ে ওঠে শচী। সোমেনের মোহ জন্মায়, আর মোহ তো এক তাৎক্ষণিক ভাবালুতা। পাড়াগাঁয়ে যাবার প্রবল আগ্রহ হয়ত পর্যটকের উৎসাহের অতিরিক্ত অন্য কিছু হয় না। অথচ সোমেন এজন্যে নিজেকে বদলে নিতে পারে স্থায়ীভাবে, শচীর এ ক্ষমতা নেই, "আমি নিজেকে রূপান্তরিত করতে পারি—অত্যন্ত স্থায়ীভাবে ; তুমি ট্রিপের ফূর্তির জন্য শুধু।" সোমেনের মৃদু তিরস্কার শচীকে ভাসিয়ে নেয়, একদা এক মোহনার ধারে যে আবেগের জন্ম হয়, সোফার উপর শায়িত শচীর আজ সেই ব্যাকুলতা জেগে ওঠে। শহরে বাস করেও শচীর গ্রামের প্রতি টান রবীন্দ্রনাথের সেই গ্রাম্য-বালিকাটির ("বধূ" কবিতা). কথা মনে করিয়ে দিতে পারে, যদিও দুই বধূর সমস্যা এক নয়। বালিকা বধূ সহজ সরলতায় ফিরে যেতে চেয়েছিল তার আদিভূমিতে শাহরিক নিষ্কারুণ্যে পিষ্ট হয়ে, শচীও ফিরে যেতে চায়। আবাল্য কেটেছে তার পাড়াগাঁ-য়, এখন উৎক্ষিপ্ত হয়ে এসে পড়ে শহরের ব্যস্ততায়। শিক্ষায় আত্মসচেতনতায় বা প্রকাশের প্ররোচনায় সে নিজেকে বদলে ফেলেছে অনেকখানি, তাই সে বালিকা বধূর মত বলে না, "হেথায় বৃথা কাঁদা, / দেয়ালে পেয়ে বাধা / কাঁদন ফিরে আসে আপন কাছে ॥" তবু আবেগের জন্ম হয়েছিল একদিন, তা এখন স্মৃতি, এবং স্মৃতি সততই সুখের। আর এই স্মৃতি শচীকে বিহ্বল করে দেয়, হয়ত স্মৃতিকাতরও। সোমেনও স্মৃতিতে আক্রান্ত, আর স্মৃতি কশাঘাতে নিজেকে বদলে ফেলতে চায়। জীবনানন্দ স্মৃতি রোমন্থন ও উদ্ভাসন দক্ষ কথাশিল্পীর মত গল্পের সারা শরীরে চারিয়ে দেন :

ক. বাতিও অনেক নিভে গেছে—রাস্তার ওপর অন্ধকার এই বেলা খানিকটা জমে এসেছে, নক্ষত্রগুলোর মানে আছে এখন, কোথাও নদীর জলে এই তারাগুলোর ছবি : * * * পাড়াগাঁর রাত এসব নিস্তব্ধ হয়ে যায় যে সুপুরির কুঁড়ি ঝরবার শব্দ অব্দি শোনা যায়, আমের মুকুলও আওয়াজ করে ঝরে—টুপটাপ টুপটাপ টুপটাপ—

খ. এইভাবে শচী : শীতের রাত—শীতের গভীর রাত—বাংলার শীতের গভীর রাত, প্রকাশ তাকে নিয়ে যেন কোনো বাংলার মাঠে আমনের ক্ষেতের পাশে টুপুর টাপুর শিশিরের ভিতর কোনো মধুমতী কর্ণফুলী

আড়িয়াল খাঁ নদীর কিনারে প্রোথিত করে রাখে—হা ভগবান, প্রোথিত করে রাখে যেন।

গ. মনে পড়ে একদিন এক মোহনার নদীর পাড়ে ভাঁটস্যাওড়া জিউলি ময়নাকাঁটা আলোকলতার জঙ্গলে তোমাকে ছেড়ে দিয়েছিলাম; বাড়ি তোমাদের আধকোশ দূরে সেখান থেকে; তুমি ঘাড় নেড়ে বলেছিলে, "খুব পারব চিনে যেতে—কতবার গিয়েছি।"—কিন্তু একবারও যাও নি; আম কাঁঠাল বাঁশের জঙ্গলে হারিয়ে গেলে। তারপর তোমাকে একটা পাংলা সর-পুঁটির মত কানকোতে বেঁধে একটা বাচ্ছা রুইয়ের মত নদীতে ভেসে এলাম আমি। সেই নদী—জলের গন্ধ—রাত—অন্ধকার—নক্ষত্র—ভিজেবালির চর—তোমার ঠাণ্ডা শরীরে কতদিন আমার হৃদয়কে শাসন করেছে—

স্মৃতি রোমন্থনের প্রধান কবি জীবনানন্দ 'গ্রাম ও শহরের গল্প' স্মৃতি ও প্রকৃতির রূপলাবণ্যে সিক্ত করে কথাসাহিত্যে এক নতুন মাত্রা যুক্ত করেন গদ্যের বাক্য বিন্যাস অন্বয়ের দুরান্বয়ের মধ্যে। 'রূপসী বাংলা'-র মতই গল্পটির ছত্রে ছত্রে বাংলার নদ নদী গাছ গাছালি পাড়াগাঁর জন্য অসীম মমতা আবহমানতায় অশেষ আস্থা থেকে গ্রাম ও শহরের সমস্যা দীর্ণ করে গৃহ-কাতরতায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শচী হয়ত কোনোদিনই তার স্মৃতিধৃত গ্রাম বাংলা ফিরে পাবে না, সোমেনের বদলে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি হয়ত তাৎক্ষণিক আবেগের প্রকাশ, হয়ত সেই আবেগের চূড়া ছুঁয়ে তারপরই শহর জীবনের অতলে মগ্ন হয়ে গ্রাম বাংলাকে ভুলে যাবে, কিন্তু পাঠকটি কি ভুলতে পারে সেই অনুভব "ভাবতে গেলেও ব্যথা—ভাবতে গেলেও ব্যথা"? পাঠকের উপলব্ধি 'রূপসী বাংলা'-র রূপকারের মতই—

তোমার যেখানে সাধ চলে যাও—আমি এই বাংলার পারে রয়ে যাবো,···

একটা অজানা ব্যথায় পাঠকের মন ভরে যায় তবু গল্পটি পড়ে। তবে কি পাঠক মাত্র এক অজানা ব্যথায় ভারাক্রান্ত হওয়ার জন্য গল্পটি পড়বেন? অন্যদিকে তাঁর কবিতার সঙ্গে মিলিয়ে পড়লে একটা মজা পাওয়া যায়। নিশ্চিতভাবে, কিন্তু তাতে পাঠকের দৃষ্টি থেকে গল্পের অনেক খাঁজখোঁজ হারিয়ে যেতে পারে। তাঁর প্রকাশিত প্রথম গল্প "গ্রাম ও শহরের গল্প"-এ 'রূপসী বাংলা'-র আবেগ অনুভবের অস্তিত্ব টের পাওয়া গেলেও শুধু ঐ নিরিখে বিচার করলে গল্পটির মাহাত্ম্য অধরাই থেকে যাবে। তাছাড়া জীবনানন্দ কাব্যিক বাসনা মেটানোর জন্য একের পর এক গল্প উপন্যাস

লেখেন নি, গল্প উপন্যাস ছিল তাঁর আত্মপ্রকাশের আরেক অমোঘ মাধ্যম। 'বনলতা সেন'-এর পর থেকে তাঁর কাব্যে যে ইতিহাস চেতনাও পরিচ্ছন্ন কাল-জ্ঞান তাঁকে এক অমোঘ কবি করে তোলে, সেই চেতনা ও জ্ঞান বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে গল্প-উপন্যাসেও কখনো স্পষ্ট কখনো তির্যকভাবে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। "গ্রাম ও শহরের গল্প"-কে তাই নিছক স্মৃতিকাতরতা, গ্রাম শহরের টানাপোড়েনের গল্প হিসেবে দেখেদিলে গল্পটির অন্যমাত্রা অগোচরে থেকে যাবে পাঠকের:

১. "কিন্তু জীবন কি এই কাসুন্দি নিয়েই শুধু ?

"নতুন কয়েকটা রেকর্ড বাজানো গেল ; স্ফূর্তি পাওয়া গেল বটে, কিন্তু তারপর চলন্ত রেকর্ডের ওপর দুটো আধমরা আরসোলা ছেড়ে দিয়ে সেগুলোকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে স্ফূর্তি, এরপর রেকর্ড বন্ধ করে রাখতে হয়।"

২. "পুরোনো ধূসর অন্তরবৃত্তিকে ছাড়িয়ে কোনো মানুষই কি উঠতে পারে ?"

৩. "শচী বল্লে—আট দশ বছর আগে যাদের প্রায়ই দেখেছি দশ বছর পরে তাদের সাথে যদি প্রায়ই আবার দেখা হয় সে কি grotesque বল তো ?

★ ★ ★

"শচী বল্লে, Grotesque: সেই সবের থেকে দশ বছর পর আমার ও প্রকাশবাবুর জীবনের আধাআধি স্ফূর্তি যখন শেষ হয়ে গেল, যখন আমরা মরলেও পারি, তাতে বিশেষ কোনো খেদ নেই আর···"

গল্পের সংলাপ, পাত্র-পাত্রীর ভাবনা-চিন্তার কোনো কোনো মুহূর্তে বেরিয়ে পড়ে ক্লান্তির অবসাদের এক সূক্ষ্ম তীক্ষ্নতা, যা শেষ মেশ জন্ম দেয় গ্রোটেস্ক-এর নির্মম ইঙ্গিত। গ্রোটেস্ক এর এক মানে যেমন হাস্যকর, তেমনি তার এক মানে হয় অ্যাবসার্ড অর্থাৎ অসম্ভব অযৌক্তিক উদ্ভট। শচী "বাংলার পাড়াগাঁগুলোকে" ভালবাসে, সেখানে যাওয়ার আকুতি তাকে মাঝে মধ্যে বিচলিত করে, কিন্তু সে জানে সেখানে যেতে পারবে না কখনো, নাকি যেতে চাইবে না ? সোমেনও কি ফিরে যাবে সেখানে ? সে জানে "তোমাকে নিয়ে সেই বকফুল বনধুঁধুল কলমিলতা বাঁশবনের ভিতরে গেলে" ফিরে আসতে পারবে না। এটা তার প্রত্যয়ের না আশঙ্কার কথা ? মনে হয় প্রত্যয়ের কথা কারণ সে নিজেকে রূপান্তরিক করে নিতে পারে স্থায়ীভাবে, কিন্তু ঐ

সোমেনই তো বলে, "কলকাতার মেসের জানালার ভিতর থেকে তাকিয়ে যখন দেখি দূরে একটা পাতাশূন্য শিমূলগাছের লাল ফুলগুলো সবে ফুটল তখন যে আক্ষেপ যে গ্রামলোলুপতা আমাকে পেয়ে বসতে পারত নতুন জীবনের প্রয়োজনের কাছে সে সবকে উপহাসাস্পদ করে তোলাই ঠিক মনে করি—

"…যে মধু হারিয়ে গেছে—তা যাদের জন্য তাদের জন্য শুধু, কিন্তু কলকাতার হৃদপিন্ডের থেকেও কলতানি বের করব না শুধু, যে কিছু রস সম্ভব—প্রয়োজনীয় গ্রহণ করা।" এবং শচী যখন তাকে গ্রামে যাওয়ার কথা বলে তখন সে উত্তরে বলে, "অসম্ভব…"

অর্থাৎ এ গল্প শহর থেকে গ্রামে ফেরার গল্প নয়, আবেগ আছে কিন্তু গ্রামের যে মানুষ একবার শহরজীবনের স্বাদ পেয়েছে গ্রামে ফেরা তার পক্ষে মুস্কিলই নয়, অসম্ভব হয়ে পড়ে। জীবনানন্দ স্মৃতিকাতরতাকে দাঁড় করিয়ে দেন অসম্ভব জায়গায়—নির্মম নিষ্কারুণ্যে এক। জীবনানন্দ তো মগ্ন ছিলেন স্বপ্নবোধ অনুভবের অতলতায়—ইতিহাস ও সময় তাঁর কবিতার আলোয় এসে পড়ে পয়ারের প্রবাহমানতা ডিঙিয়ে তার মতই তাঁর গদ্য দুরান্বয়ের এক অভিনব বিন্যাসে বিষয়কে দাঁড় করিয়ে দেয় তেমন তাৎপর্যে যার গভীরত্ব বিস্তার পরিমাপ করা সহজ হয় না সর্বদা, কারণ তা আমাদের বুকে অণুরণণ তোলে, আমরা ভেসে যাই অনন্বয় ও অন্বয়ের অনির্দেশ্য প্লাবনে "সেই সব সুনিবিড় উদ্বোধনে—'আছে আছে আছে' এই বোধির ভিতরে"। "গ্রাম ও শহরের গল্প" তাঁর তেমনই এক গল্প যা চিনিয়ে দেয় তাঁর বিশ্বকে অকপট ভাবে তবু…

★ গ্রাম ও শহরের গল্প—প্রথম প্রকাশিত হয় অনুক্ত কার্ত্তিক-পৌষ ১৩৬২ ॥

রচনাকাল : ১৯৩৬ (?)

প্রসঙ্গ : বেলা অবেলা কালবেলা

পরেশ বসু

একদা তিনি ছিলেন কিঞ্চিৎ উপেক্ষিতই, আক্রান্ত-ও। দুঃখকর অভিজ্ঞতায় নীলকণ্ঠ হয়েও ছিলেন বিতর্কিত। ভ্রান্তিপ্রসূত বিচারে হয়েছিলেন বিপর্যস্ত, ক্লান্ত : আবার ব্যূহচক্রে ছিলেন তিনি নিঃসঙ্গ নায়ক। সকলের মধ্যে থেকেও নিজেরই 'মুদ্রাদোষে' ছিলেন যেন একা; তেমনি স্বতন্ত্র চেতনাবলয়ে বাঁধা পড়েও তিনি ছিলেন অমোঘ প্রভাব-সঞ্চারী, সর্বাতিশায়ী আলোকবিস্তারী; আত্মক্ষরণ ও ইতিহাস-সময়-সমাজসংকটের চৈতন্যদীপিত আমিষাশী তরবার। একই মুদ্রায় নিরাশাকরোজ্জ্বল ও রৌদ্রকরোজ্জ্বল।

একথা ঠিক, শারীরিকভাবে বেঁচে থাকতে জীবনানন্দ যা না-ছিলেন, তার চেয়ে ঢের ঢের বেশি হয়ে, সত্তাময় হয়ে আছেন তিনি এখন। নব-নব আবিষ্কারে, ব্যঞ্জনায় থাকবেনও ততদিন, বাঙালির নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে কবিতার প্রাণ থাকবে যতদিন। থাকবেন তিনি প্রবাদপ্রতিম বনলতা সেন, প্রাণরসভূমি রূপসী বাংলা, অমেয় সংকেতী মহাপৃথিবী বা তিমিরবিনাশী সাতটি তারার তিমিরের জন্যই শুধু নয়, এষণীয় লোক-উপলব্ধির সিদ্ধিতে বেলা অবেলা কালবেলার জন্য-ও। সহজ-অলঙ্কৃত বেলা পেরিয়ে অন্ধকারের শঙ্কিত ছায়া-ঘন অবেলা অবসানে নিষ্ঠুর সময়ের কালবেলায় হৃদয়কে ফালা-ফালা করে তিনি যে গাঢ় স্বরে উচ্চারণ করেন—

> ইতিহাস খুঁড়লেই রাশি রাশি দুঃখের খনি
> ভেদ করে শোনা যায় শুশ্রূষার মতো শত শত
> শত জলঝর্নার ধ্বনি

তার জন্যেও তিনি থাকবেন অবিনাশী সভ্যতার হৃদয়ে।

'বেলা অবেলা কালবেলা' গ্রন্থ হিসেবে বেরোয় জীবনানন্দের মৃত্যুর সাত বছর বাদে, ১৯৬১-তে, রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষ পূর্তির বছরে। প্রকাশকের বক্তব্য অনুযায়ী কবিতাগুলির রচনাকাল ১৯৩৪ থেকে ১৯৫০। কবির মৃত্যুর আগে ও পরে এর সব কবিতাই বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বেরিয়েছিল। "গ্রন্থাকারে প্রকাশ করার জন্যে কবি নিজেই কবিতাগুলি বাছাই করেছিলেন। এই কবিতাগ্রন্থের নামটি কবি-কর্তৃক মনোনীত।"—এ তথ্য জানাতেও ভোলেন নি

কবি-ভ্রাতা অশোকানন্দ দাশ, 'বেলা অবেলা কালবেলা'র প্রথম প্রকাশক। বেশির ভাগ কবিতাই কবি স্বয়ং পরিমার্জনা করে গিয়েছিলেন। গ্রন্থাগত কবিতার সংখ্যা ৩৯।

একদিক থেকে জীবনানন্দের অভিব্যক্তিবাদী কবিস্বভাব ও কাব্যভাবনার ক্রম-পরিণামী মানচিত্র হ'ল 'বেলা অবেলা কালবেলা'। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'রও (রচনাকাল ১৯২৫-১৯২৯) পরবর্তী চারটি বছর পার করে এ সব রচনার সূত্রপাত, আর তার বিস্তার 'বনলতা সেন', 'মহাপৃথিবী' এবং 'সাতটি তারার তিমির' (রচনাকাল ১৯২৮-১৯৪৩) অতিক্রম করে আরো সাতটি বছর। এর মধ্যেই অনুস্যূত হয়ে আছে একান্ত ব্যক্তি-মানুষটি, 'নারি, শুধু তোমাকে ভালোবেসে / বুঝেছি নিখিল বিষ কীরকম মধুর হতে পারে,' 'তোমার নিকট থেকে সর্বদাই বিদায়ের কথা ছিল / সবচেয়ে আগে ; জানি আমি,' আবার 'যে-কোনো প্রেমিক আজ এখন আমার / দেহের প্রতিভূ হয়ে নিজের নারীকে নিয়ে পৃথিবীর পথে / একটি মুহূর্তে যদি আমার অনন্ত হয় মহিলার জ্যোতিষ্কজগতে', 'আলো নেই? নরনারী কলরোল আলোর আবহ / প্রকৃতির? মানুষেরা ; অনাদির ইতিহাসসহ,' কিংবা 'আমাদের মৃত্যু হয়ে গেলে এই অনিমেষ আলোর বলয় / মানবীয় সময়কে হৃদয়ে সফলকাম সত্য হতে ব'লে / জেগে রবে ; জয়, আলো সহিষ্ণুতা স্থিরতার জয়।'

জীবনানন্দের মধ্যে নানা অভিজ্ঞতার ঘাত-প্রতিঘাত, তাঁর মগ্নচৈতন্যের বিচিত্র বিকিরণ, সৃজনশীল সময়-সভ্যতা-ইতিহাসের সারাৎসার এ-সকল রচনাকে বিভিন্ন দিক থেকে আলোকিত-প্রাণিত-সমৃদ্ধ করেছিল। নইলে কেন তিনি 'বনলতা সেন' প্রকাশের দু বছরের মধ্যেই 'মহাপৃথিবী' প্রকাশের তাগিদ অনুভব করেছিলেন? এর পিছনে কি কোনোরকম দায়বদ্ধতা অন্তশ্চারী রূপে সক্রিয় ছিল না? ছিল না কোনো অঙ্গীকার? যে-কবি সামাজিক সত্তা হিসেবে ঘরে-বাইরে ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছেন—প্রেমে, জীবিকার সন্ধানে, নিরাশ্রয়িতায়—তাঁর পক্ষে বর্তমানকে এড়িয়ে যাওয়া কখনো সম্ভব? তাই একই সময়ে বিভিন্ন ভাবতরঙ্গে ভাসমান-মজ্জমান মানুষটির ভাবনা-বোধ-প্রজ্ঞা-আকাঙ্ক্ষা-আর্তি নানাভাবে শব্দে-চিত্রে-উপমায়-চিত্রকল্পে-বাক্যবন্ধে প্রতিফলিত হবেই, যদিও চেতনে-অবচেতনে মানুষটি অভিন্ন। এ জিনিশ আমরা মাইকেলে দেখেছি, রবীন্দ্রনাথেও। বীরাঙ্গনার মাইকেল আর চতুর্দশপদীর মধুসূদন কি এক? অন্তর্বিষাদপূর্ণ আত্মচারী আত্মবিলাপ-বঙ্গভূমির প্রতি-র মধুসূদন

ও মেঘনাদের মাইকেল কি এক? হ্যাঁ, এক, আবার এক নয়। রবীন্দ্রনাথেও পাই আমরা নানা রবীন্দ্রনাথকে, অথচ রবীন্দ্রনাথ সে-ই একই। জীবনানন্দের মধ্যেও সেরকম অনেক জীবনানন্দকেই আবিষ্কার করি এবং নানা জীবনানন্দের মধ্যেই খুঁজে পাই আমরা বিচিত্র টানাপোড়েনে জটিলতর সময়ের জটিলতম গ্রন্থিমোচন, রক্তমোক্ষণ।

'বেলা অবেলা কালবেলা' পুনশ্চ পড়তে পড়তে এরকম নানা কথাই বারবার ঘুরে-ফিরে আসছিল। তীরের ফলার মতো বুকে বিঁধছিল, সত্যিসত্যিই কি জীবনানন্দ সামাজিক অস্থিরতায় এড়িয়ে গিয়েছিলেন নিজের দায়িত্ব? সত্যি-সত্যিই কি নান্দনিক বিবেচনায় এই গ্রন্থের কবিতাগুলো 'ব্যক্তি-উপাদান থেকে সর্বত্র শিল্পরূপে অনূদিত হতে পারে নি'—যা হয়েছিল সাতটি তারার তিমিরে? বরং আমার মনে হয়েছে 'মহাপৃথিবী'তে যার উন্মোচন, 'সাতটি তারার তিমিরে' তার উত্তুঙ্গতা, আর 'বেলা অবেলা কালবেলা'য় তার দীপ্তিময় খরশান পরিণতি বা প্রেক্ষণীয় লোক-উপলব্ধির নিবিড় নির্বাণ। আমার বিবে-চনায়, একালের বাংলা কবিতায় জীবনব্রতী তথা বামপন্থার একটি ধারা নিহিতার্থ গৌরবে এখানেই তৈরি হয়ে গিয়েছিল। প্রস্থানভূমি নির্মিত হয়েছিল অনশ্বর উত্তীর্ণ হবার আর্তিতে, উপযোগী পরিস্থিতি রচনায়, 'সে অনেক মনীষীর কাজ।' জীবনানন্দ সেই গেরিলা যোদ্ধার মতোই যিনি "নিজ উপকরণ নিয়ে প্রতিটি অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে লড়েন" এবং "সেই গেরিলা যোদ্ধাই শেষ পর্যন্ত প্রান্তিক এলাকা থেকে চলে আসেন ইতিহাস কেন্দ্রে। যুগ তখন তাঁর নামেই চিহ্নিত হতে থাকে। তখন ধরা পড়ে তাঁর কমিটমেন্ট, যেমন আমরা আজ দেখছি জীবনানন্দকে।" বলাইবাহুল্য, বাংলা কবিতায় বামপন্থার অন্য দুটি ধারার একদিকে বিষ্ণু দে, অন্যদিকে সুভাষ-সুকান্ত। অর্থাৎ অন্তর্-নিহিত মানবীয় সত্যে জীবনানন্দের কবিতায় যে-বামপন্থার দ্যুতি বিকিরিত হতে দেখি, তা বিষ্ণু দে-তে সমাজ ও ব্যক্তিচৈতন্যের টানাটান অবস্থায় আর সুভাষ মুখোপাধ্যায়ে তা প্রয়োগিক আবেগে নতুন মাত্রা আনে।

অথচ দৃষ্টির খণ্ডতায়, আরোপিত ইজমের চাপে জীবনানন্দকে ফালা-ফালা করতে আমাদের হাত কখনো কেঁপে যায় নি। কলম থেকে ছিটকে বেরিয়েছে কখনো কখনো অসূয়ার বিষমাখা তীর, উদ্দেশ্যমূলক পাইপগানের গুলি। আবার হুজুগের হুল্লোড়ে এমন কিছু কিছু রচনাও ইদানিং বাক্স-প্যাঁটরা থেকে বের করে আনা হচ্ছে, যা ছিল জীবনানন্দের প্রাথমিক খশড়া

মাত্র, দুর্বলতর স্মারক। এতে ধুলোয় ধুলোয় তাঁকে ঢেকে দেবার সুচিক্কণ প্রয়াস নেই তো?

হ্যাঁ, জীবনানন্দকে নিয়ে টানা-হ্যাঁচড়া কম হয়নি। রূঢ় সমালোচনায় একসময় কম ক্ষত-বিক্ষত করা হয়নি তাঁকে। কারো বিবেচনায় তাঁর কবিতায় 'আত্মঘাতী ক্লান্তি'র পরিমণ্ডল নির্মিত। প্রাথমিক অনুরাগ অন্তে যেমন জলানির অমৃতস্বাদ আবার খোয়াড়ির তিক্ততা অনেকে গ্রহণ করতে অপারগ তেমনি যাঁর কাছে জীবনানন্দ ছিলেন "একজন প্রধান কবিকর্মী, আমাদের পরিপূর্ণ অভিনিবেশ তাঁর প্রাপ্য", তিনিই হয়ে পড়লেন বিরূপ। বললেন, "কিন্তু পাছে কেউ বলে তিনি এস্কেপিস্ট, কুখ্যাত আইভরি টাওআরের নির্লজ্জ অধিবাসী, সেই জন্য ইতিহাসের চেতনাকে তাঁর সাম্প্রতিক রচনার বিষয়ীভূত করে তিনি এটাই প্রমাণ করবার প্রাণান্তকর চেষ্টা করেছেন যে তিনি 'পেছিয়ে' পড়েননি। করুণ দৃশ্য, এবং শোচনীয়।" কিংবা "মহাপৃথিবীর শেষের দিকে যে-সব কবিতা আছে, সেগুলি যেন কতকগুলি বাঁধা-ধরা বাক্যের বিচিত্র ও অদ্ভুত সংস্থাপন মাত্র, বাক্যগুলি সুন্দর, কিন্তু সবটা মিলিয়ে কিছু পাওয়া যায় না।…মনে হয় জীবনানন্দ স্বরচিত বৃত্তের মধ্যে বন্দী হয়েছেন, প্রার্থনা করি তিনি তা থেকে বেরিয়ে আসুন, তাঁর কাব্যক্ষেত্রে যৌবনের ফুল ফোটার পরে এবার প্রৌঢ় দিনের পাকা ফসল ফলুক।" এই মানসিকতা সংক্রমিত হয়ে গেল অনেকের মধ্যেই নানা দিক থেকে। কারো কাছে মনে হল "সাতটি তারার তিমিরের অনেক কবিতারই অর্থব্যঞ্জনার সঙ্গে, কিছুটা আত্ম-করুণা নিয়েই বলছি, বার-বার নিজেকে সমন্বিত করার চেষ্টা করলাম, কিন্তু পরিশ্রম প্রতিবারই পণ্ডশ্রম।" অন্যতর দৃষ্টিভঙ্গিজাত হলেও একইভাবে শরবিদ্ধ হলেন কবি। বলা হল, "সাম্প্রতিক কবিতার ক্ষেত্রে জীবনানন্দ দাশ এই অস্বীকৃতির (জীবন ও সমাজের প্রাধান্য) আর একটি আধুনিক মুখোশ মাত্র। আপন অবচেতনার রঙে স্বাধীন বাস্তব জগৎকে, মানুষ এবং তার ভূত-ভবিষ্যৎকে এমন করে রাঙিয়ে দেওয়ার দুর্লক্ষণ আতঙ্কের কথা; অথচ বিস্ময়ের কথা এই যে এমন সমালোচক আছেন যাঁরা এই ছিন্নবিচ্ছিন্ন, চিন্তা-হীন, উদ্ভট অনুভূতিস্রোতকেই আখ্যা দেন 'ঐতিহাসিক বোধ' বলে।" কিংবা "সময়ের কণ্ঠরোধ করে তিনি (জীবনানন্দ) কথা বলেন, শব্দ তাঁর কাছে বস্তুবিরহিত সংকেত মাত্র। বিপরীত ভাব গায়ে গায়ে জুড়ে তিনি তাসের ঘর সাজান, তারপর নিজেই নিয়তি পুরুষ সেজে এক ফুঁয়ে সে ঘর উড়িয়ে

দেন।" এ মনোভাবের সম্প্রসারণে উচ্চারিত হল, "চল্লিশের যুগে যখন তিনি পরিপার্শ্বের প্রভাবে বাস্তব জগতের দিকে চোখ ফেরাতে বাধ্য হলেন, তখন তাঁর পূর্বতন ক্ষমতাকে তিনি নতুন উপলব্ধির মাটিতে পুনর্বসতি দিতে পারেন নি।" কিংবা, "ঐশ্বর্যময় নানা চিত্রকল্পের ব্যবহার সত্ত্বেও জীবনানন্দ দাশের কবিতা এবং তার প্রভাবকে মূলত সমাজবিচ্ছিন্ন ও বাংলা কবিতার পূর্বাপর প্রগতির অসহযোগী বলেই মনে হয়।" কারো কাছে বিবেচিত হল, "ক্লান্ত আত্মার মুক্তি খুঁজেছেন তিনি সমাজ-সংসর্গের বাইরে। কী শব্দ ব্যঞ্জনায়, কী আর্থী লক্ষণায় এবং পরিশেষে সেই সুবিখ্যাত সুনিপুণ জীবনানন্দীয় উপমাগামী চিন্তাপ্রণালীতে এক আচ্ছন্ন করা বিষন্নতার জনক হয়ে রইলেন তিনি।"

সত্যিই কি তাই? তিনি কি পালিয়ে গিয়েছেন বারবার সময়-সমাজ-জীবন থেকে? তিনি কি আত্মহননেরই পথ দেখিয়েছেন আমাদের? ইতিহাসের সম্মুখগামী গতিপথকে কি তিনি উল্টোমুখী করার সংকল্পে ছিলেন দৃঢ়ব্রতী?

যদিও আমরা জানি, বুদ্ধদেব অভিহিত 'নির্জনতম স্বভাবের কবি' নিজের রচনা সম্পর্কে ছিলেন খুঁতখুঁতে; নিরন্তর সংশোধন ও পরিমার্জনা করতেন আপন সৃষ্টিকে, ছিলেন প্রখর সচেতন। আত্ম-উন্মোচনে ছিলেন সতত জাগরূক। তাই, 'কেন লিখি'র উত্তর দিতে গিয়ে, কোন কারুকার্যখচিত মুখোশ না পরেই জানান, "আমার এবং যাদের আমি জীবনের পরিজন মনে করি তাদের অস্বস্তি বিলোপ করে দিতে না পেরে, জ্ঞানময় করবার প্রয়াস পাই এই কথাটি প্রচার করে যে জীবন নিয়েই কবিতা; যদি ভাবা যায় যে কবিতা মানুষের আধুনিক জীবনকে নিরন্তর ভবিষ্যতের শ্রেয়তর সামাজিক জীবনে পরিণত করে চলেছে তা হলে সে ধারণা ঠিক হবে না।

কবিতার ঐতিহ্যের সংস্পর্শে এসে বুঝে নিতে পারা যায় যে, কবিতা মানুষের জীবনের কল্যাণমানসকে অপরোক্ষভাবে চরিতার্থ করবার সুযোগ না দিয়ে বরং জীবনের স্বর্গ ও আঘাটা সবেরই ভয়াবহ স্বাভাবিকতা ও স্বাভাবিক ভীষণতা আমাদের নিকটে পরিস্ফুট করে; আমাদের হৃদয়, ভাবনা ও অভিজ্ঞতার সৎ কি অসৎ পরিণতির পথে কৃষ্ণপক্ষের সূর্যের মতো (ভেবে নেওয়া যাক) উপস্থিত হয়; আমাদের জ্ঞানপিপাসু স্বভাবকে সর্বতোভাবে সব কথা জানিয়ে দেবার চেষ্টা করে; আমাদের ভাবনাকে সর্বমানবীয় পরিসর দেয়;

অভিজ্ঞতার আত্মপ্রসাদের ভিতর আত্মনাশ ও সকলের সর্বনাশ রয়েছে জানিয়ে দিয়ে তাকে মহত্তরভাবে গ্লানিহীন করে দিতে চায়; হৃদয়কে ক্রমশই বিশুদ্ধ করে।" তিনি আরো বলেন, "সৎ কবিতা খোলাখুলিভাবে নয়, কিন্তু নিজের স্বচ্ছন্দ সমগ্রতার উৎকর্ষে শোষিত মানবজীবনের কবিতা, সেই জীবনের বিপ্লবের ও তৎপরবর্তী শ্রেষ্ঠতর সময়ের কবিতা।" জীবনানন্দের বিশ্বাস, "আজকের দুর্দিনে মানুষের নিঃসহায়তার রূপ কী রকম, কী করে তা কাটিয়ে উঠে জীবনের শুভ অর্থবোধ করতে পারা যায়, এ সব বিষয় নিয়ে যে কোনো প্রবীণ, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও তার লিপিময় প্রকাশ মূল্যবান জিনিস।" কবিতায় তিনি কী চেয়েছিলেন? কবির কথায়, "সময় প্রসৃতির পটভূমিকায় জীবনের সম্ভাবনাকে বিচার করে মানুষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আস্থা লাভ করতে চেষ্টা করেছি।" এ সব কথা যখন কবি বলছেন তখন চলছে 'সাতটি তারার তিমিরে'র নির্মাণকাল, ধৃত 'বেলা অবেলা কালবেলা'র কালবৃত্ত।

এই সময়-প্রবাহেই কবি-শিল্পী-সাহিত্যিকদের সামাজিক দায়বদ্ধতা নিয়ে যথেষ্ট প্রাণবন্ত আলোচনা-সমালোচনায় মগ্ন-মুখর ছিল বাংলা সাহিত্যের ভুবন। ধীরে ধীরে দেখা দেয় ভাবনা-বিভাজন; একদিকে তথাকথিত বাম-পন্থার সোচ্চার উপস্থিতি অন্যদিকে বিনম্র অথচ সংকটদীর্ণ হৃদয়ে বিচিত্র-জটিল উচ্চারণ ও নতুনতর বাচনরীতির অন্বেষা, মেধার বিস্তার। শেষোক্ত শিল্পীদের কারো কারো ললাটদেশে যেমন পলায়নবাদিতা-নির্জনতা-আত্মঘাতী ক্লান্তিময়তা-শুদ্ধতার চিহ্ন এঁকে দেওয়া হল, তেমনি অন্যদের চিহ্নিত করার চেষ্টা হল জীবনবাদিতার কবি হিসেবে। অথচ ভুলে যাওয়া হল, জীবন-সমাজ-সময় অত সরলরৈখিক নয়। ভুলে যাওয়া হল, জীবনের পরতে পরতে, বাঁকে বাঁকে, চেতনে-অবচেতনে যে-সকল অভিজ্ঞতা-অনুভূতি-উপলব্ধি সঞ্চিত তাকে যথাসাধ্য অবিকৃত এবং নান্দনিকতায় ফুটিয়ে তোলার মধ্যেও যে জীবনের প্রতিভাস, তা। এই ভ্রান্তির শিকার হন জীবনব্রতী তথা বামপন্থায় বিশ্বস্ত কেউ কেউ। বিস্মৃত হন তাঁরা সাধারণতন্ত্রী ও রাজতন্ত্রী বৈপরীত্যে বালজাকের সাফল্য-ব্যর্থতা, ভুলে যান কেন মায়াকোভস্কির চেয়ে পুশকিন নন্দিত। এ রকম ভ্রান্তিবিলাসেই কখনো কখনো রবীন্দ্রনাথ হন লাঞ্ছিত, জীবনানন্দ ব্রাত্য। তৈরি হয় স্বস্তিশূন্য বেদনাঘন বাতাবরণ, ওঠে ঘরের ভিতর ঘর, জীবনযন্ত্রণায় ফেনিয়ে ওঠা কালকূট হয় অস্বীকৃত।

হ্যাঁ, 'বেলা অবেলা কালবেলা'র নির্মিতি-সময়টা ছিল রুদ্ধশ্বাস। কালো-

পন্থার তুমুল দাপাদাপির বিপরীতে অবশ্য ছিল অনির্বাণ চেতনাশিখার অকম্প্র উজ্জ্বলতা। ১৯৩২। প্রথম আন্তর্জাতিক বুদ্ধিজীবী সম্মেলন ঘটে আমস্টারডামে—ফ্যাশিস্ত বিপদের প্রতিরোধকল্পে। ১৯৩৩। হিটলার হলেন জার্মানির চ্যান্সেলার। সন্ত্রাস সৃষ্টি। নাৎসিদের প্রতিবাদ করে ব্রেখটের স্বেচ্ছা নির্বাসন। এর দু বছরের মাথায় প্যারিসে বুদ্ধিজীবীদের দ্বিতীয় সম্মেলন। ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অফ রাইটার্স ফর দ্য ডিফেন্স অফ কালচার এগেনস্ট ফ্যাসিসিজম গড়ে উঠল। ফ্রান্সের যুক্তফ্রন্ট জোগাল প্রেরণা। ইংলন্ডেও নিউ-রাইটিং মুভমেন্ট। ১৯৩৬। লন্ডনে বসল যেমন ইন্টারন্যাশনাল রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশনের অধিবেশন, গ্রেফতার হওয়ার কিছুদিনের মধ্যে মাত্র ৩৭ বছরে লোরকার মৃত্যু, তেমনি নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘের প্রথম সম্মেলন, 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র প্রকাশ। ১৯৩৮। কলকাতায় বসল নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘের দ্বিতীয় অধিবেশন। ১৯৩৯। ইয়েটসের মৃত্যু। হিটলারের প্রাগ-অভিযান, ফ্রাঙ্কোর মাদ্রিদ অধিকার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা। ১৯৪০। হিটলারকে আশ্রয় করে চ্যাপলিনের 'গ্রেট ডিক্টেটর' চলচ্চিত্রায়ণ। লাহোরে পাকিস্তান প্রস্তাব গ্রহণ। হেমিংওয়ের হুম দ্য বেল টোলস প্রকাশিত। ১৯৪১। রবীন্দ্রনাথ, জেমস জয়েস ও ভার্জিনিয়া উলফের জীবনাবসান। হিটলারের চুক্তিভঙ্গ, সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ, যুদ্ধের মাত্রার পরিবর্তন, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ জনযুদ্ধে রূপান্তরিত, সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি গঠিত। ১৯৪২। ভারত ছাড়ো আন্দোলন ; সোমেন চন্দের শহিদত্ব ; 'বনলতা সেনে'র প্রকাশ। ১৯৪৩। মহামন্বন্তর। দ্রব্যমূল্যের লাগামছাড়া বৃদ্ধি। প্রায় ৩০ লক্ষ মানুষের মৃত্যু। ১৯৪৪। টি. এস. এলিয়ট শেষ করলেন 'ফোর কোয়ার্টেটস'। 'মহাপৃথিবী'র প্রকাশ। ১৯৪৫। নিজেকে গুলিবিদ্ধ করলেন হিটলার। ব্রিটিশ কারাগারে হিমলার আত্মঘাতী। হিরোসিমা-নাগাসাকির ট্রাজেডি। বেলা বার্তকের জীবনাবসান। জর্জ অরওয়েলের অ্যানিমাল ফার্ম প্রকাশিত। ১৯৪৬। নৌবিদ্রোহ। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। ১৯৪৭। দেশভাগ। খণ্ডিত স্বাধীনতা। ১৯৪৮। মহাত্মা গান্ধির শহিদত্ব। 'সাতটি তারার তিমির' প্রকাশিত। ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায় স্লোগান ও রক্তাক্ত বিপ্লবের মহড়ায় কমিউনিস্ট পার্টি। জীবনানন্দের কবিতার অন্তর্সাক্ষ্যে এ সময় অলক্ষিত নয়। বস্তুত, শুভ-অশুভের বিপুল বৈরথে তিনি নিজের মতো করে লক্ষ্য

করেছিলেন সভ্যতার সংকট, তার অগ্রগমন। অবশ্যই তিনি উচ্চকণ্ঠ বামপন্থী কবিদের মত নয়, বরং সময়ের গভীরে ঢুকে নিজস্ব ভঙ্গিতে ছেঁকে নিয়েছিলেন সময়ের সারাৎসার। তাঁর অন্তর্সৌরলোকে সমকালীন দুর্বিনয়, লোভ, যুদ্ধ, হত্যা বিপুল ছায়াবিস্তার ঘটায়।

সত্যি কথা বলতে কি, ক্রান্তদর্শী কবি জানতেন এ-সবের মধ্যে থেকেও তাঁকে সমর্পিত হতে হবে বোধের কাছে, বোধির নিকটে। তাই তিনি "রূঢ় সময়ের অঙ্কুশ-তাড়িত পাঠকের ত্রস্ত পায়ের নীচে এক খণ্ড ছায়াঘন মাটি দিতে চেয়েছিলেন।" জীবনের, সমাজের, সময়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতমভাবে আশ্লিষ্ট করে তুলেছিলেন কবিতাকে, যা মহৎ কবির কাছে ঈপ্সিত, উজ্জ্বল বামপন্থারও অভীপ্সা। গণমুখী ইতিহাস-চেতনা তাই তাঁর কবিতার অন্যতম সম্পদ। লিখলেন,

মানুষেরা এইসব পথে এসে চ'লে গেছে,—ফিরে
ফিরে আসে ;—তাদের পায়ের রেখার পথ
কাটে কারা, হাল ধরে, বীজ বোনে, ধান
সমুজ্জ্বল কী অভিনিবেশে সোনা হয়ে ওঠে—দেখে ;
সমস্ত দিনের আঁচ শেষ হলে সমস্ত রাতের
অগণন নক্ষত্রেরও ঘুমোবার জুড়োবার মতো
কিছু নেই ; হাতুড়ি করাত দাঁত নেহাই তুরপুন্
পিতাদের হাত থেকে ফিরেফিরতির মতো অন্তহীন
সন্ততির সন্ততির হাতে
কাজ ক'রে চ'লে গেছে কত দিন।
অথবা এদের চেয়ে আরেকরকম ছিল কেউ কেউ ;
ছোটো বা মাঝারি মধ্যবিত্তদের ভিড় ;—
সেইখানে বই পড়া হত কিছু—লেখা হত ;
ভয়াবহ অন্ধকারে সরু সলতের
রেড়ির আলোর মতো কী যেন কেমন এতো আশাবাদ ছিল
তাদের চোখে-মুখে মনের নিবেশে বিমনস্কতায় ;
সংসারে সমাজ দেশে প্রত্যন্তেও পরাজিত হলে
ইহাদের মনে হত দীনতা জয়ের চেয়ে বড়ো ;
অথবা বিজয় পরাজয় সব কোনো-এক পলিত চাঁদের

এ-পিঠ ও-পিঠ শুধু ;—সাধনা মৃত্যুর পরে লোকসফলতা
দিয়ে দেবে ; পৃথিবীতে হেরে গেলে কোনো ক্ষোভ নেই।

এই ইতিহাসযানে মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে মানুষের জীবন ও সমাজের, সৃষ্টির ও কর্মের সামগ্রিক অগ্রগতির বিশ্লেষণ। মানবতার সর্বজনীন বোধে দীপ্র এই কবিতায় কল্লোলিত হয়ে চলেছে মানুষের সুখ-দুঃখ, সাধনা-সংগ্রাম অর্থাৎ জীবনের একটা বৃহৎ সত্য, সমাজ-বিজ্ঞানসম্মত দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায়, যা প্রগতির অন্তর্নিহিত চৈতন্য। ইতিহাসের অন্তর্নিহিত সম্পর্ক ও অনিবার্য বিকাশ এখানে পরিস্ফুট প্রখরতম মেধা ও বোধের সঙ্গে গভীরতম বোধি ও দার্শনিক আন্তরিকতা। তাই

এখনো পৃথিবী সূর্যে সুখী হয়ে রৌদ্রে অন্ধকারে
ঘুরে যায়। থামালেই ভালো হত—হয়তো বা ;
তবুও সকলি উৎস গতি যদি, রৌদ্রশুভ্র সিন্ধুর উৎসবে
পাখির প্রমাথী দীপ্তি সাগরের সূর্যের স্পর্শে মানুষের
হৃদয়ে প্রতীক ব'লে ধরা দেয় জ্যোতির পথের থেকে যদি,
তাহলে যে আলো অর্ঘ্য ইতিহাসে আছে, তবু উৎসাহ নিবেশ
যেই জনমানসের অনির্বচনীয় নিঃসঙ্কোচ
এখনো আসেনি তাকে বর্তমান অতীতের দিকচক্রবালে বারবার
নেভাতে জ্বালাতে গিয়ে মনে হয় আজকের চেয়ে আরো দূর
অনাগত উত্তরণলোক ছাড়া মানুষের তরে
সেই প্রীতি, স্বর্গ নেই, গতি আছে ;—তবু
গতির ব্যসন থেকে প্রগতি অনেক স্থিরতর ;
সে অনেক প্রতারণাপ্রতিভার সেতুলোক পার
হল ব'লে স্থির ;—হতে হবে বলে দীন, প্রমাণ, কঠিন ;
তবুও প্রেমিক—তাকে হতে হবে ;—সময় কোথাও
পৃথিবীর মানুষের প্রয়োজন জেনে বিরচিত নয় ; তবু
সে তার বহির্মুখ চেতনার দান সব দিয়ে গেছে ব'লে,
মনে হয় ; এর পর আমাদের অন্তর্দীপ্ত হবার সময়।

তুলনামূলকভাবে কম আলোচিত, অথচ জীবনানন্দের অভিব্যক্তিবাদী-পরিণামী মানস-মানচিত্র 'বেলা অবেলা কালবেলা' নিয়েও, অন্যান্য গ্রন্থের মতো বিতর্ক আবর্তিত, নিন্দিত-নন্দিতও। কেউ কেউ মনে করেন, "বেলা

অবেলা কালবেলা'য় কবি আমাদের জন্য বলিষ্ঠ নৈরাশ্যবাদের একটি মন্ত্র রেখে গিয়েছেন," আবার কেউ অমোঘ সত্যে উজ্জ্বল উচ্চারণ করেন, "জীবনানন্দের পরিণতি রেজিগনেশনে নয়, তাঁর লোক-উপলব্ধির নির্বাণে। যে স্বর্গ তিনি চেয়েছিলেন স্বকালে তা না পেয়ে বিশ্বামিত্রের মত সরোষে কেন দ্বিতীয় স্বর্গ নির্মাণের প্রচেষ্টা করেন নি সে প্রশ্ন অসংগত। কোন অবান্তর আনন্দের অশোভনতা তাঁর চরিত্রে ছিল না।[৮] আমার তো আরো মনে হয়, 'বেলা অবেলা কালবেলা'র মধ্যে জীবনানন্দের সমগ্র সত্তার পরিণামী বিবর্তন অবিনাশী শিল্পসুষমায় শুধু ধৃতই নয়, প্রেমে-প্রজ্ঞায় কবির দায়, সমাজের দায়, ইতিহাসের দায় আত্মস্থ করে এবং মহত্তর মানবসত্যের সন্ধানে ব্যাপৃত থেকেই একে একে মেলে দিয়েছেন অনুভূতি উপলব্ধি সন্ধান-নির্জ্ঞানের পাপড়িগুলি; তৈরি করেছেন ফলিত রাজনীতির বহিরঙ্গাশ্রয়িতা নয়, অমিত সৃজনশীলতার অন্তর্গত বামপন্থা, মর্মগত মানদণ্ড। এবং আরো আরো কিছু বেশি। কেননা তিনি কবি, মহৎ কবিই।

যাইহোক, এবারে রচনাগুলির মর্মমধু চেখে নেওয়া যাক। 'বেলা অবেলা কালবেলা'য় মোট কবিতার সংখ্যা ৩৯; কোন রচনারই পঙ্‌ক্তিবিন্যাস সম-মাত্রিক নয়; ১০টি কবিতা দলবৃত্তে, বাকি সব মিশ্রবৃত্তে নির্মিত।—

১. মাঘসংক্রান্তির রাতে ।। জ্যোতির্ময় প্রেমের উৎসস্বরূপিণী হল নারী। 'নারি, মনে যা ভেবেছো তার প্রতি / লক্ষ্য রেখে অন্ধকার শক্তি অগ্নি সুবর্ণের মতো / দেহ হবে মন হবে—তুমি হবে সে-সবের জ্যোতি।'

২. আমাকে একটি কথা দাও ।। কে কথা দেবেন কবিকে? কী-ই বা দেবেন? তা দিতে পারেন ভালোবাসার নারী, যে আকাশের মতো সহজ মহৎ বিশাল। সেই নারীই 'পাখির সমস্ত পিপসাকে যে / অগ্নির মতো প্রদীপ্ত দেখে অন্তিমশরীরিণী মোমের মতন।'

৩. তোমাকে ।। কখন কীভাবে যে কার বিচ্ছিন্ন হৃদয়ে প্রেমের উদ্ভাসন ঘটিয়ে যায় নারী তা সবসময় ঠাহর করা যায় না। কিন্তু মর্মে মর্মে, রূঢ়তা ও নিষ্ফলতার অধম অন্ধকারে, যে ভয়ংকর করুণ উপলব্ধি ঘটে, তাতে বলতে ইচ্ছা করে, 'নারি, শুধু তোমাকে ভালোবেসে / বুঝেছি নিখিল বিষ কী রকম মধুর হতে পারে।' দলবৃত্ত।

৪. সময়সেতুপথে ।। নারী নিসর্গ ও সময় একত্রে নিবিড় হয়ে আছে। 'পদ্মনারী হারিয়ে গেছে সকল নদীর অমনোনিবেশে, / অমের সুসময়ের

মতো রয়েছে হৃদয়ে।' দলবৃত্ত।

৫. বতিহীন ।। অনাদ্যন্ত কালপ্রবাহে কবিকে বিপর্যস্ত করে সমকালীনতার অধঃপতন। কখনো কখনো মানুষ হয় কলুষে আচ্ছন্ন। 'প্রাচীন কথা নতুন করে এই পৃথিবীর অনন্ত বোনভায়ে / ভাবছে একা একা বসে / যুদ্ধ রক্ত রিরংসা ভয় কলরোলের ফাঁকে ঃ / আমাদের এই আকাশ সাগর আঁধার আলোর আজ / যে দোর কঠিন ; নেই মনে হয় ;—সে দ্বার খুলে দিয়ে / যেতে হবে আবার আলোয় অসার আলোর ব্যসন ছাড়িয়ে।' ছন্দ দলবৃত্ত।

৬. অনেক নদীর জল ।। নারী ও নদী যেন অভিন্ন সত্তার প্রকাশ। কিংবা যেন নারী হয়ে ওঠে নদীর হৃদয়। সময়ের ভয়ানক প্রবাহের মধ্যেও প্রার্থিত প্রেমের শুশ্রূষা, কল্যাণবোধ। 'শান্তি এই আজ; / এইখানে স্মৃতি ;/ এখানে বিস্মৃতি তবু ; প্রেম / ক্রমায়ত আঁধারকে আলোকিত করার প্রমিতি।'

৭. শতাব্দী ।। মানব সমাজের ইতিহাস কি ব্যর্থতার ইতিবৃত্ত ? না, তা নয়। আজ অভিভূতের মতো যদিও বর্তমান শতকে মানুষ নিরন্তর চলেছে তবু চিনে নিতে হবে মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তিকে, তার চৈতন্যকে। ইতিহাসের শিক্ষাই হল নীড় গঠনের সমবায়ের সহিষ্ণুতার। তবু অন্ধকার হানা দেয়। অবশ্য তা প্রাগৈতিহাসিক অন্ধকার নয়, বরং তা আলোর দ্যোতনা, জ্ঞানের প্রেমের আলোকবর্তিকা। সাময়িক ব্যর্থতা, বেদনা সাময়িকই। কেননা, 'সোফোক্লেস ও মহাভারত মানবজাতির এ ব্যর্থতা জেনেছিল ; জানি ; / আজকে আলো গভীরতর হবে কি অন্ধকারে।' অন্ধকার ভেদ করে আলোই হবে গভীরতর। দলবৃত্ত।

৮. সূর্য নক্ষত্র নারী ।। সৃজনের অন্ধকারে যেমন জলের উপস্থিতি তেমনই রয়েছে নারীর অবস্থিতি। কেননা সে জনয়িত্রী। ধ্বংসমত্ত অন্ধকার ভেদ করে বিদ্যুতের মতো সেই নারী স্মৃতি-সত্তা-ভবিষ্যতে বহমান। তাই, 'যে কোনো প্রেমিক আজ এখন আমার / দেহের প্রতিভূ হয়ে নিজের নারীকে নিয়ে পৃথিবীর পথে / একটি মুহূর্তে যদি আমার অনন্ত হয় মহিলার জ্যোতিষ্কজগতে।'

৯. চারিদিকে প্রকৃতির ।। যে পৃথিবী শুভ হতে গিয়ে হেরে গেছে, সেই ব্যর্থতার মানে খুঁজেও কবির কাছে প্রদীপ্ত হয় পৃথিবীর উন্নতির সঙ্গে মানুষের বিবেকের সফলতা, নৈকট্য, সাযুজ্য। সমাজের অগ্রগতিতে,

ভবিষ্যতে, তাঁর প্রত্যয় তাৎপর্য লাভ করে। 'সে চেতনা পিরামিডে পেপিরাসে প্রিন্টিং-প্রেসে ব্যাপ্ত হয়ে / তবুও অধিক আধুনিকতর চরিত্রের বল। / শাদা-শিদে মনে হয় যে-সব ফসল ; / পায়ের চলার পথে দিন আর রাত্রির মতন ;—/ তবুও এদের গতি স্নিগ্ধ নিয়ন্ত্রিত ক'রে বার বার উত্তরসমাজ / ঈষৎ অনন্য সাধারণ।'

১০. মহিলা ॥ দ্রৌপদীর দ্যোতনায় এই কবিতায় প্রেমের আর্তি আনে জীবনানন্দীয় ভুবনে এক ভিন্নতর মাত্রা। যৌক্তিকতার অভাবে যাকে তিনি ভালো করে দেখেন নি, সেখানেও দ্বিতীয় ব্যথায় ডুবে যান, অথচ 'কখনো সম্রাট শনি শেয়াল ও ভাঁড় / সে নারীর রাং দেখে হো হো করে হাসে।' ২নং কবিতায় ১৯৪২-এর অসন্তোষকালে বিশ শতকের সেই নারীর মধ্যে ঘটে মনস্কামের জাগরণ, আসে বিবর্তনের ধারাভাষ্যে দশমহাবিদ্যার আদিরূপ (আর্কেটাইপ), তারপর সেই নারীর ক্লান্ত পায়ের সংকেতে চলা, অবশেষে 'আমাদের সব মুখ স্থূল হয়ে গেলে / গাধার সুদীর্ঘ কান সন্দেহের চোখে দেখে তবু / শকুনের শেয়ালের চেকনাই কান কেটে ফেলে।'

১১. সামান্য মানুষ ॥ স্মৃতি হয়ে যাওয়া একজন সরল সাধারণ মানুষের প্রতি, যে ছিপ হাতে একাগ্রতায় চাপেলি-পায়রাচাঁদা-মৌরলা অধ্যুষিত পুকুরঘাটে মাছ ধরার জন্য বসে থাকত, তার জন্য এখনও গভীর টান অনুভব করেন কবি। সেই সরল মানুষটিই উস্কে দেয় এক ধরনের নস্টালজিয়া, পাশাপাশি জেগে ওঠে বর্তমানের এক নগ্ন রূপ। কেননা, 'আমাদের পাওয়ার ও পার্টি-পলিটিক্স / জ্ঞানবিজ্ঞানে আরেকরকম শ্রীছাঁদ।'

১২. প্রিয়দের প্রাণে ॥ মৃত্যুর অনিবার্যতা সত্ত্বেও প্রিয় মানুষদের ঘিরে কবির প্রীতির প্রসন্নতা এখানে সৌরভ ছড়ায়। জ্ঞানের আলোয় উজ্জ্বল হয়ে ওঠার নিবিড় প্রতীতি ধরা পড়ে। "আশা-নিরাশার থেকে মানুষের সংগ্রামের জন্মজন্মান্তর—/ প্রিয়দের প্রাণে তবু অবিনাশ, তমোনাশ, আভা নিয়ে এসে / স্বাভাবিক মনে হয় ; উর ময় লণ্ডনের আলো ক্রেমলিনে / না থেমে অভিজ্ঞ-ভাবে চ'লে যায় প্রিয়তর দেশে।'

১৩. তার স্থির প্রেমিকের নিকট ॥ বেঁচে থাকার অমেয় অভীপ্সা বিচ্ছুরিত। বৃহত্তর সত্যের সন্ধানে কবি দণ্ডী সত্যাগ্রহেও অনুভব করেন জীবনের করুণ আভাস। এমন কি তাঁর মনে হয় 'কোনো গ্লাসিয়ার-হিম স্তব্ধ কর্মোরেন্ট পাল—/ বুঝিবে আমার কথা জীবনের বিদ্যুৎ-কম্পাশ

অবসানে / তুষার—ধূসর ঘুম খাবে তারা মেরুসমুদ্রের মতো অনন্ত ব্যাদানে।'

১৪. অবরোধ ।। নারী, যে ব্যক্তির মর্মাহত হয়েও সভ্যতা-সমাজের প্রতীক-প্রতিমা, বিশ্বাস করে ঘর বেঁধেছেন, সে সম্পর্কেও তোলেন কবি নির্মোহ প্রশ্ন। সময়-চেতনার অবরোধে আমাদের কথা কি শুধু নষ্টনীড়েরই ইতিহাস? সেজন্যই হয়তো দীর্ঘশ্বাস ঝরে পড়ে, 'মনে পড়ে সেখানে উঠোনে এক দেবদারু গাছ ছিলো। / তারপর সূর্যালোকে ফিরে এসে মনে হয় এইসব দেবদারু নয়।' কারণ নিষ্ঠুর সময়ের কালবেলায় 'পৃথিবীতে দুন্দুভি বেজে ওঠে—বেজে ওঠে; সুর তান লয় / গান আছে পৃথিবীতে জানি, তবু গানের হৃদয় নেই।' কাজে কাজেই 'সেই নারী নেই আর ভুলে তারা শতাব্দীর অন্ধকার ব্যসনে ফুরাবে।'

১৫. পৃথিবীর রৌদ্রে ।। সময়সীমার চৌউরে- মরণের অপরিমেয় দ্যুতি ঠিকরে পড়লেও অনাদি ইতিহাসসহ মানুষের জীবনের তাৎপর্য অনেক ব্যাপক, গভীর, মহত্তর।

১৬. প্রয়াণ পটভূমি ।। বর্তমান সময়ে সান্ত্বনার স্বল্পতা, নৈরাশ্যের প্রচুর্য, ব্যাপক অবসাদম্লানতা থাকলেও সেটাই শেষ কথা নয়। 'তবু, নরনারীর ভিড় / নব নবীন প্রাক্‌সাধনার ;—নিজের মনের সচল পৃথিবীকে / ক্রেমলিনে লণ্ডনে দেখে তবুও তারা আরো নতুন অমল পৃথিবীর' সম্ভাবনা আছে।. দলবৃত্ত।

১৭. সূর্য রাত্রি নক্ষত্র ।। সূর্যের আলোয় আলোকিত হয় জীবন, অনুভূত হয় সৃষ্টির তাগিদ। নিরবধি কাল নীল আকাশ হয়ে মিশে থাকে শরীরে। এবং 'অধিক গভীরভাবে মানবজীবন ভালো হ'লে / অধিক নিবিড়ভাবে প্রকৃতিকে অনুভব / করা যায়। কিছু নয়—অন্তহীন ময়দান অন্ধকার রাত্রি নক্ষত্র ;—/ তারপর কেউ তাকে না চাইতে নবীন করুণ রৌদ্রে ভোর ;—/ অভাবে সমাজ নষ্ট না হলে মানুষ এইসবে / হয়ে যেত এক তিল অধিক বিভোর।'

১৮. জয়জয়ন্তীর সূর্য ।। বিবর্তমুখী মানবিকতায় সমাজ-সভ্যতার হৃদয় ছুঁয়ে যান কবি। চিন্তার সংবেগে শুধু জীবনের উত্তরাধিকারে তাঁর বিশ্বাস উজ্জ্বল। ফলে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত পায় প্রতীকি ব্যঞ্জনা। অন্ধকার লাঞ্ছিত সমাজ ও মানুষের জন্য দরকার আলো, সজ্ঞানতা। পরিশেষে

'অনুভব করা যাবে স্মরণের পথ ধরে চলে : / কাজ করে ভুল হ'লে, রক্ত হ'লে মানুষের অপরাধ ম্যামথের নয় / কত শত রূপান্তর ভেঙে জয়জয়ন্তীর সূর্য পেতে হলে।'

১৯. হেমন্তরাতে।। প্রেম, নীড় আর মৃত্যুর আলো-ছায়া ঘেরা এই ভালোবাসার পৃথিবীতে ইতিহাস-চেতনায় চলিষ্ণু জীবনপ্রেমিকের আমরণ সন্তান সন্ধান চলে নারীর হৃদয়। 'সকল আলোর কাজ বিফল জেনেও তবুও কাজ ক'রে—গানে / গেয়ে লোকসাধারণ ক'রে দিতে পারি যদি আলোকের মানে।'

২০. নারীসবিতা।। নারীই সূর্য, নারীই সমাজ-সভ্যতার ভরসাস্থল, সময়ের আত্ম-আবিষ্ক্রিয়া। তার মধ্যেই দীপ্তি পায় 'বেবিলনে নিনেভে নতুন কলকাতাতে কবে / ক্লান্তি, সাগর, সূর্য জ্বলে অনাথ ইতিহাসের কলরবে।' দলবৃত্ত।

২১. উত্তরসামরিকী।। শতাব্দীর রাক্ষসী বেলায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের যে হিংস্র বিকার দেখা গিয়েছে 'দ্বৈপ-আত্মা-অন্ধকার এক-একটি বিমুখ নেশনে'র সেটাই শেষ কথা নয়; বরং উত্তরসামরিকী ভাবনায় স্মরণীয় কাজ হোক হৃদয়ের কিরণের দাবি, সংকল্পের সুস্থতা, বিজ্ঞানের দিব্য আলোকিত স্বতন্ত্র সজীব গভীরতা। আর আলোকবর্ষের জেগে থাকা নক্ষত্রের, মানব-সমাজের কথা ভেবে আমাদের বহিরাশ্রয়িতা যেন 'মানবস্বভাবস্পর্শে আরো স্নাত—অন্তর্দীপ্ত হয়।'

২২. বিস্ময়।। চতুর্দিকের ভাঙন-অবিশ্বাস-অন্ধকার ন্যুব্জতার মধ্যেও সাধারণ মানুষের কর্মপ্রবাহ এক পরম রমণীয় বিস্ময়। বয়ে যায় যে ক্লান্তি-হীন সময়, তখনও বিস্ময়ে প্রশ্ন জাগে 'আমাদের অমায়িক ক্ষুধা তবে কোথায় দাঁড়ালো।'

২৩. গভীর এরিয়েলে।। নারী ও প্রেমের মধ্যস্থতায়, ইতিহাস পায় নতুন তাৎপর্য, বিচ্ছুরিত হয় অন্ধকারের অন্যতর দ্যোতনা। বাস্তবিকই, এখন এমন এক অন্ধকার যখন ব্যবহৃত পৃথিবীটিকে সন্ততিদের চেয়েও বেশি দৈব আঁধার আকাশবাণীর কাছে ছেড়ে দিয়ে ইতিহাসের গতি স্থির করে যায়। আর, নারীকে ভালবেসে, প্রেমিক হয়েও কবি জানেন শোষণের ভয়ংকর চেহারাটা, জানেন অতীত অনাগতের কাছে তমসুকে বাঁধা রাষ্ট্র সমাজের বর্তমান আদল। তা জানা থাকা সত্ত্বেও বলতে দ্বিধা নেই, 'প্রাণাকাশে বচনাতীত রাত্রি আসে

তবুও তোমার গম্ভীর এরিয়েলে।' দলবৃত্ত।

২৪, ইতিহাসযান॥ কবিতার অস্থি-র ভিতরে যে চেতনা ও মর্মে অন্বিষ্ট কালজ্ঞান তা মর্মরিত এই কবিতায়। সময়-সমাজ-আত্মসংকটের রসায়নে এখানকার 'আমি' কোনো ব্যক্তিগত সত্তা নয়, কবি-মানসে সমাজ ও কালের রূপ যেভাবে ধরা পড়েছে তারই প্রতিভূ সত্তা। ফলে ইতিহাসের মধ্য দিয়ে 'ঢের অভিজ্ঞতা জীবনে জড়িত হয়ে' এবং তা শেষ করে যে-পথটি খোলা থাকে তা হল নিজের মুখোমুখি হয়ে 'অন্তর্দীপ্ত হবার সময়।'

২৫, মৃত্যু স্বপ্ন সংকল্প॥ তামস-বলয়ের বিধ্বস্ততার মধ্যেও জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতমভাবে লিপ্ত থেকে মানুষ-মানুষীর প্রতি প্রত্যয়ের বিচ্ছুরণ। 'নবীন নবীন জনজাতকের কল্লোলের ফেনশীর্ষে ভেসে / আর একবার এসে এখানে দাঁড়াবো। / যা হয়েছে—যা হতেছে—এখন যা শুভ্র সূর্য হবে / সে বিরাট অগ্নিশিল্প কবে এসে আমাদের ক্রোড়ে ক'রে লবে।'

২৬. পৃথিবী সূর্যকে ঘিরে॥ রক্ত-বণিক পৃথিবীই মানবসমাজের পরিণতি নয়। বরং মানুষের, সমাজের, সভ্যতার প্রতি অন্তর্নিহিত গভীর আস্থায়, মমত্বে, কারুণ্যসিক্ত কবি জানেন, বিশ্বাস করেন, 'তবু, অগণন অর্ধসত্যের / উপরে সত্যের মতো প্রতিভাত হ'য়ে নব নবীন ব্যাপ্তির / সর্গে সঞ্চারিত হ'য়ে মানুষ সবার জন্যে শুভ্রতার দিকে / অগ্রসর হতে চায়—অগ্রসর হয়ে যেতে পারে।''

২৭. পটভূমির॥ নারী, প্রেম, আর্তি এ কবিতার শরীর জুড়ে। শরণ নিতে চাইলেও কবি তা পেলেন না। অথচ সময় কোথাও নির্বারিত হয় না। তাই, নারীত্বের আদি রূপ ভেদ করে নারীর ব্যক্তিসত্তা আবিষ্কারের ক্লান্তিহীন প্রয়াস সত্ত্বেও, আপতিত কাল বহন করেও বিষাদ ভর্ৎসনাই জ্বলতে থাকে আর নিরুপায়তায় নম্রকণ্ঠে বলে ওঠেন 'প্রেম নিভিয়ে দিলাম, প্রিয়।' দলবৃত্ত।

২৮. অন্ধকার থেকে॥ জীবনানন্দের প্রিয় প্রতীক-অনুসঙ্গ যে অন্ধকার তা নিছক প্রাগিতিহাসের অন্ধকার বা জীবন-আলোর বিপ্রতীপের অন্ধকার নয়। বরং তা সৃষ্টির সংকেতে, চৈতন্যের প্রতিফলনে দ্যোতনাদীপ্ত। কেননা 'বীজের ভিতর থেকে কী করে অরণ্য জন্ম নেয়' তা 'আমরা জেনেছি সব,— অনুভব করেছি সকলি।' শুধু জানা নয়, তাকে অনুভব করার মধ্য দিয়ে, মর্মে রসায়ন ঘটিয়ে ও সঙ্গে নিয়ে, মানুষের হৃদয়-মন-মনন ও সমাজ-সময়

সভ্যতার সারাৎসার প্রাপ্তি ঘটে। কবির জাগ্রত চৈতন্যে বিকিরিত হয় 'সকল অজ্ঞান কবে জ্ঞান আলো হবে, / সকল লোভের চেয়ে সৎ হবে না কি / সব মানুষের তরে সব মানুষের ভালোবাসা ;' কিংবা, 'ইতিহাস-সঞ্চারিত হে বিভিন্ন জাতি, মন, মানব-জীবন, / এই পৃথিবীর মুখ যত বেশি চেনা যায়— চলা যায় সময়ের পথে, / তত বেশি উত্তরণ সত্য নয়, জানি ; তবু জ্ঞানের বিষন্নলোকী আলো / অধিক নির্মল হলে নটীর প্রেমের চেয়ে ভালো / সফল মানব-প্রেমে উৎসারিত হয়, যদি, তবে / নব নদী নব নীড় নগরী নীলিমা সৃষ্টি হবে। / আমরা চলেছি সেই উজ্জ্বল সৃষ্টির অনুভবে।'

২৯. একটি কবিতা ॥ নারীর প্রেমে রয়েছে মুক্তির বীজ। কবির স্বীকৃতি, 'আমি জ্ঞান আলো গান মহিলাকে ভালোবেসে আজ / সকালের নীলকণ্ঠ পাখি জল সূর্যের মতন।'

৩০. সারাৎসার ॥ মৃত্যুহীন নারীসত্তার মধ্যে সৃষ্টি-রহস্যের কিনারা খুঁজেছেন কবি। অন্বিষ্ট হয়েছে কালচেতনা। 'আকাশের সব নক্ষত্রের মৃত্যু হলে / তারপর একটি নারীর মৃত্যু হয় : অনুভব করে আমি অনুভব করেছি সময়।'

৩১. সময়ের তীরে ॥ বিরামবিহীন সময়ের খণ্ডিত বিপর্যয়ে, চারপাশের নিরাশাধ্বস্ত অবক্ষয়ের মধ্যেও সূর্যলোকান্তরে সৃষ্টির মরালীকে নিয়ে যাওয়ার প্রত্যাশায় কবির উজ্জ্বল উচ্চারণ। অখণ্ড জগৎ জীবন সমাজ ও ভালোবাসার জন্য আর্তি জীবনানন্দের কবিতায় বারবার শ্রুত, এখানে তা পেয়েছে আরো গভীর-ব্যাপক মাত্রা। 'ডানে বাঁয়ে ওপরে নিচে সময়ের জ্বলন্ত তিমিরের ভিতর তোমাকে পেয়েছি। / শুনেছি বিরাট শ্বেতপক্ষীসূর্যের ডানার উড্ডীন কল্লোল ; / আগুনের মহান পরিধি গান ক'রে উঠছে।'

৩২. যত দিন পৃথিবীতে ॥ ভ্রান্তিমান যুগ ও সময়ের গোলকধাঁধায় ভ্রান্ত বর্তমানতায় পীড়িত কবি জানেন 'মানব ক্ষয়িত হয় না জাতির ব্যক্তির ক্ষয়ে।' উত্তরাধিকারে ব্যর্থতা বাসা বাঁধলেও, বণিকী সভ্যতায় মানুষ খণ্ডিত-দীর্ণ হলেও 'মানব' কিন্তু থেকেই যাবে। কাজে কাজেই 'অন্ধকারে সবচেয়ে সে-শরণ ভালো ; / যে প্রেম জ্ঞানের থেকে পেয়েছে গভীর ভাবে আলো।'

৩৩. মহাত্মা গান্ধী ॥ বিচিত্র বাস্তব ও সমস্যাক্লিষ্ট দীর্ণ জীবনে মহাত্মা গান্ধী কবির কাছে হয়ে উঠেছিলেন সফল রাষ্ট্রনেতার পরিবর্তে মানবীয় সমগ্রতার সত্তা, 'আশ্বাসের সোমপর্ণবহনকারী সত্য হিসেবে।'

দার্শনিকতার মানুষ ও সত্যের মীমাংসায় আলোই হল একমাত্র প্রার্থিত, যা সত্য, অন্তর্নিহিত চৈতন্য। 'আমরা আজকে এই বড়ো শতকের / মানুষেরা সে আলোর পরিধির ভিতরে পড়েছি। / আমাদের মৃত্যু হয়ে গেলে এই অনিমেষ আলোর বলয় / মানবীয় সময়কে হৃদয়ে সফলকাম সত্য হতে ব'লে / জেগে রবে ; জয়, আলো সহিষ্ণুতা স্থিরতার জয়।'

৩৪. যদিও দিন ।। প্রেমের আর্তিতে নারী ও কবিতা হয়ে ওঠে কখনো সমার্থক। তাই, 'একথা যদি জলের মতো উৎসারণে তুমি / আমাকে—তাকে—যাকে তুমি ভালোবাসো, তাকে / ব'লে যেতে ;—শুনে নিতাম, মহাপ্রাণের বৃক্ষ থেকে পাখি / শোনে যেমন আকাশ বাতাস রাতের তারকাকে।' দলবৃত্ত।

৩৫. দেশ কাল সন্ততি ।। নিরাশায় নীরব বা অন্তঃবাহী অন্ধকারের অনিবার্যতা সত্ত্বেও অমৃতের অন্বেষায় প্রসারিত প্রশ্ন 'হে সৃষ্টির বনহংসী, কী অমৃত চাও ?'

৩৬. মহাগোধূলি ।। যখন রক্তে নেমে আসে নির্জনে ঘুমের স্বাদ, তখন কূটকীটদষ্ট রাজনৈতিক চালবাজি, বা ঈর্ষা গ্লানি রক্ত ভয় কলরবে কেমন যেন এলিয়ে পড়ার ভাব সঞ্চারিত। সে সময়ে বিবেকের কাছে নীরবে হাত রেখে বলতে সাধ জাগে, 'বুদ্ধের মৃত্যুর পরে যেই তন্বী ভিক্ষুণীকে এই প্রশ্ন আমার হৃদয় / ক'রে চুপ হয়েছিল—আজো সময়ের কাছে তেমনই নীরব।'

৩৭. মানুষ যা চেয়েছিল ।। মানুষ কী চেয়েছিল? কী সে চায়? সেসব ভাবলেই সৃষ্টির বঞ্চনা, ক্ষমা করবার মতো অশোক অনুভূতি কবির মনে জেগে ওঠে। যদিও চারদিকে অন্ধকার নেপথ্য, দিক নিরূপণের ক্ষমতাও লুপ্ত, তবুও নক্ষত্রে ঘাসে রয়েছে রাত্রির স্নিগ্ধতা। এবং 'মানুষ যা চেয়েছিল সেই মহাজিজ্ঞাসার শান্তি দিতে পারে।'

৩৮. আজকে রাতে ।। মৃত ম্যামথ থেকে বর্তমান রাতের ইতিহাসও যখন নিবিড় নিয়মে বন্দি, তখন কূটক্রীড়া এড়িয়ে নয়, স্বীকার করেই প্রসারিত সময়-চৈতন্যে মনে পড়ে সৃষ্টির প্রেরণা-উৎস নারীকে, যার 'ভিতর প্রবীণ গল্প নিহিত হয়ে যায়।' দলবৃত্ত।

৩৯. হে হৃদয় ।। বৈষম্যলাঞ্ছিত, বঞ্চনাক্লিষ্ট, শোষণদীর্ণ নিরুপায় মানুষের প্রতি নিবিড় মমত্বে কবির প্রখর জিজ্ঞাসা উপস্থিত। তাই বলেন, 'এখনো যে কটা দিন বেঁচে আছি সূর্যে সূর্যে চলি, / দেখা যাক পৃথিবীর ঘাস / সৃষ্টির বিষের বিন্দু আর / নিষ্পেষিত মনুষ্যতার / আধারের থেকে

আনে কী ক'রে যে মহানীলাকাশ··· ।'

অর্থাৎ 'অমাময়ী নিশি যদি সৃজনের শেষ কথা হয় / আর তার প্রতিবিম্ব হয় যদি মানব-হৃদয়' তাহলে 'বেলা অবেলা কালবেলা'য় 'শত জলঝর্নার ধ্বনি'তে শোনা যায়—

নারী→প্রেম : সৃষ্টি→ইতিহাস→কাল-জ্ঞান→মানব সমাজ→জীবন অন্বেষা → মানবসমাজ → কালজ্ঞান → ইতিহাস → সৃষ্টি : প্রেম→নারী। অন্যভাবে, ঈষৎ খণ্ডতায় বলা যায়, অন্তশ্চারী জীবনব্রতে বা বামপন্থার অন্তর্নিহিত শক্তির সত্যে, সময়-সমাজ ছেনে, বিষণ্ণতির তিমিরমন্থন করেই সংযোগস্থাপনার আর্তিতে যে-আলোর অন্বেষা দেখালেন জীবনানন্দ তা অনারোপিত অথচ ঘনিষ্ঠতমভাবে জীবনের সঙ্গে লিপ্ত বামপন্থার মর্মচৈতন্যের নির্ভুল নির্দেশ 'বেলা অবেলা কালবেলা'। একার্থে এটি জীবনানন্দের সৃষ্টি-সমগ্রতার উন্মোচন-আরোহণ-উত্তরণের বোধ ও বোধির পরিণামী ভুবন। কার্ল মার্ক্‌স সম্পর্কে ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস যা বলেছিলেন জীবনানন্দ সম্পর্কেও অন্য তাৎপর্যে তা বরণীয় Sein Name wird durch die Jahrhunderte fortleben und so auch sein Werk, যুগে যুগে বেঁচে থাকবে তাঁর নাম, তেমনি তাঁর কাজ-ও।

উপন্যাসিক হওয়ার ইচ্ছা ছিল

সুমিতা চক্রবর্তী

॥ ১ ॥

আজ, জন্মশতবর্ষেও, আমরা নিঃসংশয়ে জানি না ঠিক কতগুলি উপন্যাস লিখেছিলেন জীবনানন্দ। তাঁর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস 'মাল্যবান' (১৯৭৩) আর দ্বিতীয় প্রকাশিত উপন্যাস 'সুতীর্থ' (১৯৭৭)। এই দুটি উপন্যাসের প্রকাশযোগ্য পাণ্ডুলিপি তিনি নিজেই প্রস্তুত করে গিয়েছিলেন—একথা জানিয়েছিলেন তাঁর ভ্রাতা অশোকানন্দ দাশ। তার পর যতগুলি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে 'শিলাদিত্য' পত্রিকায় (কলপাইহাটি, ১৯৮১ সালের জুলাই মাসে প্রথম কিস্তি প্রকাশিত হয়), 'প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন্‌স্' থেকে প্রকাশিত জীবনানন্দ-রচনা সম্ভারে, 'দেশ' ও 'বিভাব' পত্রিকায় জীবনানন্দ শতবর্ষ সংখ্যায় (১৯৯৮)—সেগুলির মধ্যে আছে অপরিমার্জিত এবং অসম্পূর্ণ উপন্যাসও। আরো হয়তো থেকে গেছে অপ্রকাশিত এখনও। সংখ্যায় বারো তেরোটি বা তারও বেশি উপন্যাস লিখেছিলেন জীবনানন্দ। ঔপন্যাসিক রূপে পরিচিতি পাবার পক্ষে একেবারে তুচ্ছ করবার মতো নয়।

এই উপন্যাসসমূহ সামনে রেখে ঔপন্যাসিক জীবনানন্দের মূর্তিটি মনের মধ্যে গড়ে নিতে চেষ্টা করি আমরা।

তিনি কথাসাহিত্যের কলম হাতে তুলে নিয়েছিলেন ১৯৩১ সাল থেকেই। মনে হয়, ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত লিখেছিলেন উপন্যাস। আঠারো বছরের এই কাল-পরিসরকে কথাসাহিত্য রচনার দিক থেকে দুটি পর্বে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম পর্বের বিস্তার ১৯৩১ থেকে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত। দ্বিতীয় পর্বটি এসেছে ১৯৪৮ সালে। উপন্যাস রচিত হয়েছে ১৯৩২ থেকে ১৯৩৪ সালের মধ্যে।

প্রথম পর্বের লেখাগুলির মধ্যে অনেকগুলিই খসড়া কেবল। সংক্ষিপ্ত। অসম্পূর্ণও কিছু। কয়েকটি সম্পূর্ণ। হয়তো সেগুলি সম্পূর্ণ হয়নি। কিন্তু পাঠ করবার পর এক ধরণের সম্পূর্ণতা আছে বলে ভেবে নেওয়া যেতে পারে। অন্তত, লেখক যদি সেগুলিকে সম্পূর্ণ বলে দাবি করেন তাহলে পাঠকের আপত্তি করবার কিছু থাকে না।

দ্বিতীয় পর্বে, ১৯৪৮ সালে চারটি উপন্যাস লিখেছিলেন জীবনানন্দ। চারটিই পরিণত, সুচিন্তিত, বিস্তৃত এবং সম্পূর্ণ। ঔপন্যাসিক জীবনানন্দকে দুটি পর্বেই আমরা বুঝে নেবার চেষ্টা করব। বিশদ আলোচনার জন্য আমরা বেছে নেব দুটি পর্বের প্রধানত দুটি করে উপন্যাস। প্রথম পর্বের 'কল্যাণী' 'কারুবাসনা' 'জীবন প্রণালী'। দ্বিতীয় পর্বের 'সুতীর্থ' ও 'মাল্যবান'।

জীবনানন্দের উপন্যাসবিষয়ক আলোচনায় থেকে যায় আরো একটি প্রশ্ন। কেন তিনি তাঁর উপন্যাসগুলি প্রকাশ করলেন না? রেখে দিলেন পাঠক-চক্ষুর অগোচরে। তাঁর লেখক-স্বভাবের বৈশিষ্ট্যই একটা কারণ হতে পারে। গবেষকদের চেষ্টায় জীবনানন্দের কবিতার পাণ্ডুলিপিরও যে সন্ধান পাওয়া গেছে তাতে লক্ষ করা যায়, একটি কবিতার প্রথম খসড়া থেকে পূর্ণ কবিতাটি হয়ে ওঠা এবং পত্রিকায় তার প্রকাশের মধ্যে বহু সময় অতিবাহিত হয়ে যেত। বিভিন্নভাবে তিনি খসড়া করতেন একটি কবিতার। একই উপাদান নিয়ে একই উপলব্ধিকে কেন্দ্র করে একাধিক কবিতা রচনা করেছেন। সেগুলির বিবিধ মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। অবশেষে একটি কবিতা সম্পূর্ণতা পেয়েছে। একটি কবিতার ক্ষেত্রেই যখন লেগে যাচ্ছে এত সময় তখন একটি উপন্যাসকে 'সম্পূর্ণ' করে তোলার ব্যাপারে আরো অনেক বেশি সময় লাগা স্বাভাবিক। নিজে সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত, তাড়াতাড়ি করে কোনো লেখাই করে উঠতে পারতেন না তিনি। আজকের এই ব্যস্ততার যুগে, অনেক বই লিখে ফেলার নেশার যুগে জীবনানন্দের এই শিল্পবোধ-মগ্ন রূপকারী বিবেকের প্রতিও আমাদের জানাতে হবে সম্মান।

কবি জীবনানন্দ কেবল কবি হতেই চেয়েছিলেন তা নয়। ঔপন্যাসিক হতেও চেয়েছিলেন তিনি। বরিশাল থেকে তাঁর এক অনুরাগী পাঠককে (এই পাঠকের পরিচয় জানা যায়নি) পত্রের উত্তরে তিনি লিখেছিলেন—"আমি সম্ভবত জাত সাহিত্যপ্রেমিক। যে আবহাওয়ায় ছিলাম তাতে উত্তরকালে ভালো সাহিত্যরসিক হয়েই মুক্তিলাভ করা যায় না, নিজের তরফ থেকে কিছু সৃষ্টি করবারও সাধ হয়। ছেলেবেলা থেকেই গল্প উপন্যাস—স্বদেশী বিদেশী নেহাৎ কম পড়িনি। ঔপন্যাসিক হওয়ার ইচ্ছা ছিল, এখনও তা ঘোচেনি।"

(২. ৭. ৪৬-এ বরিশাল থেকে লেখা চিঠি; জীবনানন্দ দাশের পত্রাবলি, আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ. ৫৩-৫৪)।

প্রথম দিকের দ্বিধা কাটিয়ে দ্বিতীয় পর্বে রচিত উপন্যাসগুলি সম্পর্কে

তিনি অন্যরকম ভাবছিলেন। 'পূর্বাশা' সম্পাদক সঞ্জয় ভট্টাচার্য-কে ১৯৪৬ সালে একটি চিঠিতে তিনি কিছু টাকার প্রয়োজনের কথা জানিয়েছিলেন। তারপর লিখেছিলেন—"আপনার এই টাকা আমি কবিতা গল্প অথবা উপন্যাস লিখে শোধ করে দেব। একটি উপন্যাস লিখব ঠিক করেছি।" (জীবনানন্দ পত্রাবলী, সংকলক দীপেনকুমার রায়, ১৯৭৮, পৃ. ৩২)। যে-উপন্যাসগুলি জীবনানন্দ ১৯৪৮ সালে লিখে উঠেছিলেন দ্রুত, অতি অল্প সময়ের মধ্যেই, ১৯৪৬-এর আগেই শুরু হয়েছিল তার ভাবনা। সঞ্জয় ভট্টাচার্য-কে আবার তিনি চিঠি লিখেছিলেন ১৯৫০ সালে—"বেশি ঠেকে পড়েছি, সেজন্য বিরক্ত করতে হল আপনাকে। এখুনি চার পাঁচশো টাকার দরকার; দয়া করে ব্যবস্থা করুন। ...আমার একটা উপন্যাস (আমার নিজের নামে নয়—ছদ্মনামে) পূর্বাশায় ছাপতে পারেন; দরকার বোধ করলে পাঠিয়ে দিতে পারি।" (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৭ বঙ্গাব্দে লেখা; আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত পূর্বোক্ত পত্রাবলি, পৃ. ৬০)। তখন প্রকাশিত হয়ে গেছে 'সাতটি তারার তিমির' (১৯৪৮) সংকলনও। তবু জীবনানন্দ উপন্যাস প্রকাশ করতে চাইছেন 'নিজের নামে' নয়, 'ছদ্মনামে'। কিন্তু সে উপন্যাসও প্রকাশিত হয়নি। পূর্বাশা-সম্পাদক কি দরকার বোধ করেন নি তাঁর উপন্যাস? শেষ পর্যন্ত জীবনানন্দ 'সুতীর্থ' আর 'মাল্যবান' উপন্যাস দুটির প্রেস-কপি প্রস্তুত করেছিলেন। নামকরণও করেছিলেন নিজেই। যদি ১৯৫৪ সালে তাঁর আকস্মিক মৃত্যু না ঘটত তাহলে হয়তো জীবৎকালেই ঔপন্যাসিক ও গল্পকার রূপে পরিচিতি হয়ে যেত তাঁর। তবে সেই কালের পাঠাভ্যাসে তাঁর উপন্যাস তাৎক্ষণিকভাবে কতটা গৃহীত হত বলা শক্ত।

॥ ২ ॥

জীবনানন্দ কোনো সময়েই খুব সরল ধরণের লেখক নন। কবিতার মধ্যেও সংবেদনা ও উপলব্ধির যে গ্রন্থিলতাকে তিনি ধারণ করেছেন তা তাঁর সমকালের অপরাপর কবিদের রচনায় অনুভব করা যাবে না। কবিতায় তবু যে-কোনো বক্তব্যের উপরেই একটি মায়াময় আবরণ আস্তীর্ণ হয়ে যায়। রূঢ়তা আর কর্কশতাকেও ততটা রূঢ় ও কর্কশ বলে মনে হয় না। বোদলেয়র-এর 'ক্লেদজ কুসুম' আর র‍্যাঁবো র 'নরকে এক ঋতু' কবিতা-গ্রন্থে ক্লেদ আর নরক—

দুইই পাঠকের মন হরণ করে নিয়েছে উচ্চারণের অভিনব সৌন্দর্যে। তুলনায় কথাসাহিত্যে ঐতিহ্যবাহিত আদর্শগুলিকে অনেক বেশি কঠোরতায় আর নির্মমতায় আঘাত করা সম্ভব। জীবনানন্দ অবশ্য কবিতাতেও তা অনেক সময়ে করেছেন। উপন্যাসে প্রায় সর্বত্রই তাঁকে অবচেতনের রুদ্ধ দরজা-জানলা-গুলি ফাঁক করে দিতে দেখা যায়। আমাদের সমাজের ভদ্র মধ্যবিত্তের মূল্য-বোধকে বহু দিক থেকে প্রশ্ন করেছেন তিনি, অতীব শাণিত হাতে বিঁধিয়েছেন সূক্ষ্ম ছুরি, যা আমরা ভাবিনা, ভাবতে চাই না—কিন্তু যা আমাদের মনের বিধি-বহির্ভূত কামনাময় ও পিচ্ছিল স্তরগুলির পরতে পরতে গোপনে আছে জড়িয়ে—তা তিনি আলোয় এনে ফেলেছেন বারবার। তাঁর উপন্যাসগুলি লেখার সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশিত হলে নীতিবাদীরা বিচলিত হতেনই।

জীবনানন্দের উপন্যাস পড়তে গেলে অনেক সময়ে এমন মনে হয় যে, খুব বেশি বৈচিত্র্য নেই সেখানে। একই ধরনের চরিত্র, সংলাপ, কাহিনী অথবা কাহিনী-জীর্ণতা, নিসর্গ-বর্ণনা, সময় ও সমাজ-চিত্র বারবার ঘুরে এসেছে তাঁর কথাসাহিত্যে। এই অভিযোগ অস্বীকার করবার কোনো প্রয়োজন নেই আমাদের। ঔপন্যাসিক জীবনানন্দের পক্ষে কোনো সওয়াল করবার কোনো দায় আমরা নেব না। আমরা কেবল, আমাদের চোখে কিভাবে ধরা পড়েছে জীবনানন্দের উপন্যাস—দেখাবার চেষ্টা করব সেটুকুই।

আপাতভাবে পুনরাবৃত্ত কাহিনী ও করণ-কৌশলের বৈচিত্র্যহীনতার কথা মনে রেখেও জীবনানন্দের উপন্যাস কিন্তু পাঠ করা যেতে পারে বহু দিক থেকে। প্রতিটি উপন্যাসেরই আছে একাধিক মাত্রা, একাধিক বীক্ষণ-বিন্দু। এক একটি অবস্থান-কোণ থেকে প্রতিটি উপন্যাসকেই দেখাবে এক এক রকম। দেখে নেওয়া যেতে পারে কতদিক থেকে আমরা পড়তে পারি তাঁর উপন্যাস-সমূহকে।

প্রথমেই মনে হয় দেশ-কালের কথা। যে-কোনো উপন্যাস—যেহেতু প্রধানত মানুষের মনের ও সমাজের বাস্তবের আখ্যানকেই ধারণ করে তাই দেশ ও কালের পরিসর আর বাতাবরণও ঔপন্যাসিককে গ্রহণ করতে হয় আবশ্যিক ভাবেই। চেতনাপ্রবাহ-মূলক উপন্যাসও তার ব্যতিক্রম নয়। জেম্‌স্ জয়েস্‌-এর 'ইউলিসিস' প্রথম মহাযুদ্ধ—উত্তর ইউরোপেই রচিত হওয়া সম্ভব ছিল। অন্য সময়ে অন্য দেশে নয়।

জীবনানন্দের দেশ ভারত। বিশেষভাবে বাংলাকেই তিনি চারণভূমি করেছিলেন। সেই বাংলার একটি কেন্দ্র বরিশাল ও সংলগ্ন অঞ্চল। গ্রাম

বাংলা। অপর কেন্দ্র কলকাতা শহর। গ্রাম ও শহরের মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণ ও বিকর্ষণ ; গ্রামজীবনে নাগরিক জীবন-মানের অনুপ্রবেশ ; আধুনিক সভ্যতায় নাগরিকতার অবিচ্ছেদ্যতা ; গ্রামজীবনে আপ্লুত মানুষের নগরবাস সম্পর্কিত সংকট—এসবই তিনি দেখিয়েছেন। তাঁর উপন্যাসের চরিত্রগুলির মধ্যে এই গ্রাম-শহর সম্পর্কের টেনশন খুবই স্পষ্ট।

সময়ের পরিসীমাও খুবই পরিস্ফুট তাঁর উপন্যাসে। যে দুটি পর্বে তাঁর উপন্যাস রচনাপর্বকে আমরা ভাগ করেছি সময়ের দিক থেকে—ঠিক সেই দুটি সময়-গ্রন্থিই তাঁর উপন্যাসের কাল। এত সমকালীন লেখক, পুরোপুরি সমকাল-নিমগ্ন লেখক হয়েও জীবনানন্দ কালোত্তীর্ণ হয়ে উঠেছেন। সমকাল-চেতনা কখনো চিরকালীন উপলব্ধির ক্ষেত্রে বাধা ঘটায় না।

জীবনানন্দের প্রথম পর্বের উপন্যাসের সময় হল ঠিক ১৯৩০-৩৫ সালের মধ্যবর্তী কাল। দুই বিশ্বযুদ্ধ মধ্যবর্তী পর্ব। যখন টাকার দাম কমে যাচ্ছে। জিনিসের দাম বেড়ে যাচ্ছে। বাড়ছে কালোবাজারি, ফুলে উঠছে অসাধু ব্যবসায়ী। রেশন ও কন্ট্রোলের পদ্ধতি বহু চোরাপথে সমাজে এক অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করে রেখেছে। মুদ্রাস্ফীতি সামাল দিতে গিয়ে জমিদারের অত্যাচার বাড়ছে প্রজার ওপর। মহাজনের পেষণ পাকে পাকে জড়িয়ে ফেলছে গরিব মানুষকে। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাবের সংকট মোচন করতে না পেরে পরম্পরাবাহী নীতিবোধ ত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছে মানুষ। শরীর ঢাকবার প্রয়োজনে শরীরকেই পণ্য করতে বাধ্য হয়েছে নারী এই সময়েই। বাংলার গ্রামগুলির অসহায় ভাঙনের সূত্রপাত এই সময়েই। গ্রামে থাকতে না পেরে মানুষ চলে আসছে শহরে। চিরকালীন বৃত্তি ত্যাগ করে কল-কারখানায় কাজ খুঁজছে। কৃষক যে-কোনো কাজের জন্য হয়ে যাচ্ছে দিনমজুর। এই সময়ের লেখা বাংলা উপন্যাসগুলিতে বারবার ঘুরে আসে জীবিকার দায়ে গ্রাম ত্যাগ করে মানুষের চলে যাওয়ার ঘটনা।

এই দেশ-কালই জীবনানন্দের উপন্যাসের প্রথম পর্বের পট-পরিবেশ। যদিও লক্ষণীয় যে, তাঁর উপন্যাসে খেটে খাওয়া মানুষ—কায়িক শ্রমিক প্রায় কোথও জায়গা পায়নি। ক্রমে নিম্নবিত্ত ও নিঃস্ব হতে থাকা মধ্যবিত্ত বাঙালির অস্তিত্ব-সংকট নিয়েই তিনি ভাবিত। যে মূল্যবোধকে তিনি প্রশ্ন করেছেন তা নিশ্চিত ভাবেই শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মূল্যবোধ। তাঁর উপন্যাসের চরিত্রলিপিতে এই পর্বে আছে গ্রামে বাস করা বড়লোক ও দরিদ্র মধ্যবিত্ত। শহর থেকে

আসা ধনী ব্যক্তিরা মাঝে মাঝে গ্রামে এসে গ্রামের শান্তি বিঘ্নিত ও পরিবেশ বিষাক্ত করে দিয়ে যায়। মনে পড়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুল নাচের ইতিকথা'-র একটি ছত্র। স্থূলরুচি, নীতিবর্জিত ব্যবসায়ী নন্দলালের গ্রামে আসার খবর তিনি দিয়েছিলেন এইভাবে—"মোটরে চড়িয়া কলিকাতা শহর গাওদিয়ার দিকে চলিয়া গেল।" যে-সব জীবিকার মধ্যবিত্ত মানুষের কথা বলেছেন জীবনানন্দ তাদের মধ্যে আছেন স্কুলের শিক্ষক, উকিল, ডাক্তার, কলেজের অধ্যাপক ও করনিক। জমি- জমার মালিকও কেউ কেউ—কিন্তু ক্রমেই তাদের অবস্থা পড়ে যাচ্ছে। বোঝা যায়, জীবনানন্দের গ্রাম কিন্তু ঠিক নিশ্চিন্দিপুর বা গাওদিয়া-র মতো গ্রাম নয়। তা ইংরেজ আমলের মফস্‌সল শহর। সেখানে স্কুল-কলেজ, ডাক্তারখানা, মিশনারিদের সেবাকেন্দ্র আছে। কাছাকাছির মধ্যে আছে কাছারি। ঠিক বরিশালই যেন।

সাধারণত যে-ধরনের পরিবারকে তিনি তাঁর উপন্যাস-কেন্দ্রে স্থাপন করেন সেখানে বৃদ্ধ বা প্রৌঢ় পিতা স্কুলে পড়ান বা অবসর নিয়েছেন। অতীব মৃদুভাষী ও পুরোনো ধরনের আদর্শবাদী। সারাজীবন শ্রম দিয়েছেন, পারিশ্রমিক পেয়েছেন অতি অল্প। তবু তিনিই সংসার টানেন। বড়লোক ও ওপর-পড়া আত্মীয়দের উপদ্রব সহ্য করেন। সাধ্যাতিরিক্ত লৌকিকতা করেন। ধারের ওপর ধার করেন। আর ঈশ্বরে আস্থা রাখেন। তাঁর বাড়িটি নিজেরই। মাটির বা বেড়ার ঘর। খড় বা টিনের চাল। হয়তো একটি ঘরে পাতলা ইটের দেয়াল। একটি ঘরের মেঝেতে সামান্য সিমেন্ট, বাকি ঘরগুলি কাঁচা। আছে খিড়কির পুকুর, পরিষ্কার হয় না। অন্য লোক রাত্রে মাছ চুরি করে নিয়ে যায়। অল্প জমি অনাদরে পড়ে আছে। বাঁশঝাড়।

সংসারে আছেন তাঁর স্ত্রী। জীবনানন্দের উপন্যাসে দুই শ্রেণীর মা আছেন। প্রবীণা ও নবীনা বলা যেতে পারে তাঁদের। এই চরিত্রটি প্রবীণা। সংসারের কাছে তেমন কোনো দাবি নেই। রাঁধার পরে খাওয়া আর খাওয়ার পরে রাঁধার জীবন তিনি মেনে নিয়েছেন। অভিযোগ নেই, কিন্তু নিরানন্দ, নিরুৎসব জীবনের বৈচিত্র্যহীনতার কারণে কিছু শূন্যতাবোধও আছে। পুত্র আর নাতি-নাতনিকে ভালবাসলেও পুত্রবধূর সঙ্গে তাঁর বনিবনা হয় না।

সংসারে আছে এক যুবক—জীবনানন্দের উপন্যাসের নায়ক। সে বি. এ. বা এম. এ. পাশ করেছে। ভালো বই পড়তে ভালবাসে। বিবাহিত, প্রায়ই এক সন্তানের জনক। কিন্তু বেকার। চাকরি নেই তার। গ্রামেই চাকরি নেই।

শহরেও নেই। শহরে টিউশন ছাড়া আর কিছু পায়না সে। শহরে যেতে তার ইচ্ছে করে না। কর্মতৎপর, সংকল্প-দৃঢ় উদ্যোগী পুরুষ সে নয় একেবারেই। পরিবার প্রতিপালনের অক্ষমতার দীনতা তাকে পীড়িত করলেও সে কিন্তু উপার্জনের চেষ্টায় সক্রিয় হতে পারে না। সর্বরকম স্থূলতা তাকে আহত করে বলে সে নিজের আবরণের মধ্যে জীবন কাটাতেই পছন্দ করে। স্ত্রী-সন্তান-বাবা-মা-র প্রত্যাশা সে বোঝে। ভালোও বাসে সকলকে। তার স্বাভাবিক কুণ্ঠা আর অতি-সূক্ষ্ম বোধ ও রুচি আমরা অনুভব করি। কিন্তু তার স্বভাবের উদ্যমহীনতা আর নৈষ্কর্ম্য-প্রবণতা তার প্রতি সম্পূর্ণ সহানুভূতি-সম্পন্ন হতে দেয় না পাঠককে। যে-সময়ের ছবি জীবনানন্দ এঁকেছেন সেই সময়ের পরিব্যাপ্ত বেকার সমস্যার একটা ধারণা করা যাবে এখান থেকে। সদ্-ভাবনার, সূক্ষ্ম-রুচি মানুষের অসহায়তা বোঝা যাবে।

পরিবারে প্রায়ই থাকে অবিবাহিতা বোন, বিধবা বা চিরকুমারী পিসি, একটি শিশু,—কখনো কখনো গৃহ-পরিচারক বা পরিচারিকাও একজন। পাড়া-প্রতিবেশীর আসা-যাওয়া আছে। স্থূল মানসিকতার অবলেপে সংকুচিত ও পীড়িত হতে থাকা নায়ক একদিক থেকে আমাদের সহমর্মিতাও আকর্ষণ করে। আবার করেও না। সংসারে বাঁচতে গেলে অত সূক্ষ্ম-ভঙ্গুর জীবনযাপন করলে চলে না। একটু শক্ত পোক্ত, বাস্তববাদী হতে হয়—এমনই মনে হয় আমাদের।

এই নায়কের পত্নীও আছে পরিবারে। সে লেখাপড়া জানে। বেকার স্বামীর স্ত্রী। স্বামীকে ভালোবাসলেও সে অতৃপ্ত, অসুখী। সে নিজেকে সর্বতোবঞ্চিত মনে করে। আর পাঁচজন সাধারণ মেয়ের মতো তার খাওয়া-পরা-বেড়ানোর সাধ-আহ্লাদ আছে। কিন্তু স্বামীর কাছ থেকে কোনো আর্থিক সহায়তা না পেয়ে ক্রমে সে তিক্ত হয়ে ওঠে। সন্তানকেও যত্ন করে না তাই। শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে তার সম্পর্ক অসংখ্য গ্রন্থিযুক্ত।

পাশাপাশি কলকাতা শহরের ছবিও কিছু কিছু আসে এই পর্বের উপন্যাসে। কলকাতার সিনেমা-থিয়েটার-বইয়ের দোকান-রাজনীতি-মুদ্রা-শাসিত মূল্যবোধের জীবন। তার একটা আকর্ষণ থাকলেও জীবনানন্দের নায়ক এই জীবনে কখনো স্বস্তি পায়নি।

যখন ১৯৪৮-এর উপন্যাসগুলিতে আসি তখন এই দেশ-কালের টেনশন অত্যন্ত তীব্র হয়ে দেখা দেয়। স্বাধীনতা ও দেশ বিভাগ কোনো উপন্যাসে

আসন্ন, কোথাও দেশভাগ হয়ে গেছে। হিন্দু বাঙালি পূর্ববাংলা ছেড়ে পশ্চিমবাংলায় খুঁজছে আস্তানা। অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিহ্ন। পশ্চিমবাংলাতেও চাকরি নেই। বাসস্থান দুর্মূল্য। পূর্ববাংলা বিপজ্জনক। এই পর্বে চারটি ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের উপন্যাস লিখেছেন জীবনানন্দ। 'সুতীর্থ' ও 'মাল্যবান' উপন্যাস-দুটি কলকাতা শহরে কেন্দ্রিত। বিশেষ করে 'সুতীর্থ' উপন্যাসের নায়কের জীবন কলকাতার নাগরিকতার বিভিন্ন পর্যায়ের সঙ্গে ওতপ্রোত জড়িত। নাগরিক জীবনের উপন্যাস। 'জলপাইহাটি' উপন্যাসের নায়ক নিশীথ মফস্‌সল থেকে কলকাতায় আসে। 'বাসমতীর উপাখ্যান'-এ অবশ্য সেই মফস্‌সলের প্রেক্ষাপটই ব্যবহৃত। কিন্তু দেশবিভাগের ছায়া, পায়ের তলার জমি সরে যাওয়ার আশংকা সেখানে প্রতিমুহূর্তে কাঁপছে। অবশ্য, উদ্বাস্তু সমস্যার সার্বিক আয়তন জীবনানন্দ তাঁর উপন্যাসে প্রতিবিম্বিত করতে চাননি। দাঙ্গা-র প্রসঙ্গ মাঝে মধ্যে এলেও সাম্প্রদায়িকতার সমস্যা তুলে ধরাও তাঁর লক্ষ্য ছিল না। তবু জীবনানন্দের উপন্যাসকে দেশকালের ভাবনা থেকে সরিয়ে দেখবার কোনো উপায়ই নেই। কারণ ব্যক্তি-মানুষ আর দেশ-কাল এক নিরবচ্ছিন্ন সম্পর্কে বাঁধা তাঁর লেখায়।

জীবনানন্দের উপন্যাস পঠনের আর একটি দৃষ্টিকোণ হতে পারে আত্মজৈবনিক উপাদানের সন্ধান। এ-প্রসঙ্গে মনে পড়ে জীবনানন্দের নিজেরই একটি উক্তি। 'দ্য বেঙ্গলি নভেল টুডে' নামে একটি প্রবন্ধে (হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড, ৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৫০) তিনি বলেছিলেন যে, এ যুগে জীবনের বিস্তার ও জটিলতার অমেয় বৃদ্ধির ফলে কোনো একজনের অভিজ্ঞতায় কোনো অর্থেই আর সমগ্রতাকে পাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। একজন ঔপন্যাসিকের একার অভিজ্ঞতা জীবনের সামগ্রিকতার পরিমাপের পক্ষে খুবই সংকীর্ণ হয়ে যায়। জীবনানন্দের মতে—আধুনিক উপন্যাসের সার্থকতা খুঁজতে হবে জীবনের বিচিত্র বিস্তারের বোধে নয়, ব্যক্তিহৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশ তীক্ষ্যভাবে বিদ্ধ হবার লক্ষণে। এজন্যই ব্যক্তির আভ্যন্তর মনকে অনুপুঙ্খে দেখবার প্রবণতা আজকের উপন্যাসে। কারণ মনের ভিতরের চেহারা কেবল নিজের ক্ষেত্রেই দেখাতে পারেন ঔপন্যাসিক। তাই আধুনিক উপন্যাস সম্পর্কে তাঁর শেষ বক্তব্য—"It is not the extent of experience that will tend to make a novel great, but the requisite vision and intellect of the novelist even though his experience is somewhat restricted and

material at his command scarcely anything more than diversified autobiography."—এই অভিমত পুরোপুরি না-ও স্বীকার করতে পারি আমরা। কিন্তু জীবনানন্দের উপন্যাসকে 'ডাইভার্সিফায়েড অটোবায়োগ্রাফি' হিসেবে দেখবার কথা নিশ্চয়ই ভাবতে পারি।

ওঁর উপন্যাসের নায়কদের বাস পূর্ববাংলার মফস্‌সলে। কখনো তার নাম 'জলপাইহাটি', কখনো 'বাসমতী'। আসলে বরিশাল। সেখানে স্কুল ও কলেজ আছে। নায়কের পিতা স্কুল-শিক্ষক, জীবনানন্দের পিতা সত্যানন্দ দাশের মতো। তাঁর নায়ক ইংরেজিতে বি. এ. বা এম. এ. পাশ করেছে—জীবনানন্দের মতোই। কিন্তু সে বেকার। বহির্জগতের স্থূলতার সংস্পর্শে সে গুটিয়ে যায়। সমাজের সঙ্গে অর্থ ও ক্ষমতা-লিপ্সার সংঘাতে সে জর্জরিত হয়। সে ভালোবাসে সাহিত্য, নির্জনতা, নিসর্গ-সান্নিধ্য। কিন্তু সে অসামাজিক, নিষ্ক্রিয়। উপার্জন নেই বলে বিমর্ষ। কিন্তু উপার্জনের চেষ্টায় ঝাঁপিয়ে পড়তে অপারগ। জীবনানন্দকে যাঁরা জানতেন—তাঁরা তাঁর মধ্যেই তাঁর নায়ককে খুঁজে পাবেন। এই নায়ক বিবাহিত। একটি সন্তানের জনক। কিন্তু তার স্ত্রী তার উদ্যমহীনতায় অসন্তুষ্ট। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক মসৃণ নয়। এই নায়ক মাঝে মাঝে বহু জোড়জোড় করে স্টিমার ও রেলপথ পার হয়ে কলকাতায় যায়। তার পক্ষে অসহনযোগ্য কুৎসিত পরিবেশে সে মেস-এ থাকে। টিউশন করে, চাকরি খোঁজে। পায় না। ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে অথবা সেখানেই মারা যায়। জীবনানন্দের জীবনের সঙ্গে তাঁর নায়কদের চরিত্র-সাদৃশ্য অবিতর্কিত। বেকার জীবনের অসহায়তার মধ্যেই তিনি ছিলেন ১৯৩০ থেকে ১৯৩৫ পর্যন্ত। নিয়মিত উপার্জন ছিল না অনেক দিন। পরবর্তী পর্বে বরিশাল থেকে কলকাতায় চলে এসে নতুন করে আবার স্থিতিহীনতা ও নিরাপত্তার অভাবের মধ্যে পড়তে হয়েছিল তাঁকে। তখন ১৯৪৬-৪৭-৪৮ সাল। সেই সময়ের অভিজ্ঞতা গভীরভাবে ছাপ ফেলেছে ১৯৪৮-এ লেখা উপন্যাস চারটিতে। বেসরকারি কলেজের পরিচালক সমিতির দাপটের কাছে অসহায়, অত্যন্ত কম বেতন পাওয়া কলেজ-অধ্যাপক এই পর্বে ওঁর নায়ক হয়েছে 'জলপাইহাটি' উপন্যাসে। 'বাসমতীর উপাখ্যান'-এ ব্রাহ্ম-সমাজের বেশ অনুপুঙ্খ ছবি আছে। অস্থির দেশকালের চাপে ব্রাহ্ম-সমাজও ভেঙে পড়ছে সেখানে। বরিশালের ব্রাহ্ম-সমাজে বাল্য-কৈশোর এবং প্রথম কর্মজীবন কাটে জীবনানন্দের। দেশ-বিভাগের মুখে দাঁড়িয়ে বরিশাল ব্রাহ্ম-সমাজও এই ভাবেই

ভেঙেছিল। এসবই জীবনানন্দের অভিজ্ঞতা থেকে উঠে আসা ঘটনাপুঞ্জ।

জীবনানন্দের উপন্যাসের সামগ্রিক থিম বা বিষয়বস্তুর সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়ে দেখি অত্যন্ত সিরিয়স লেখক ছিলেন তিনি। মানুষের জীবনের আদি সংকট, মৌল সংকট-টি কোথায়—তারই সন্ধান করতে চাইছিলেন। তাঁর উপন্যাসের অনুসরণে আমাদের মনে হয়—মানুষের সমাজে ও সভ্যতায়—দুটি মূল সংকট তিনি চিহ্নিত করেছিলেন। তাঁর মতে তার একটি হল টাকা।

মানুষের বেঁচে থাকার ন্যূনতম পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্যও প্রয়োজন হয় অর্থের। কারণ মানুষের সভ্যতায় কাঁচা মাংস খাওয়া চলে না, কাপড় পরতেই হয় এবং থাকবার ঘর চাই। ফলে অর্থ উপার্জন করতেই হবে। কিন্তু কাজটি সহজ নয়। টাকা-উপার্জনের এক রকম মানসিকতা আছে। যদি কোনো ব্যক্তি সেই মানসিকতা একটুও অর্জন করতে না পারে; যদি সে নিজের সামাজিক প্রয়োজনের ন্যূনতম স্তরটিতে আর্থিক দিক থেকে পৌঁছতে সক্ষম না হয় তাহলে তার সমূহ সংকট। জীবনানন্দ নিজে টাকা উপার্জনের প্রক্রিয়াকে করায়ত্ত করতে পারেন নি। অর্জন করতে পারেন নি সেই মানসিকতা। কিন্তু তার প্রয়োজনটা তাঁকে বুঝতে হয়েছিল। না বুঝে উপায় কি? টাকার সমস্যাকে যে-ব্যক্তি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে না তার কঠিন মনোবেদনা তাঁর উপন্যাসে রূপায়িত হয়েছে। তাই তাঁর কবিতায় টাকার আবহ, টাকার জ্যোতি, টাকার তাপ-ঘ্রাণ-স্পর্শ; টাকার ঝংকার—খুব বড় জায়গা অধিকার করে থাকে। 'গ্রাম ও শহরের গল্প' নামক অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য একটি ছোটো গল্পে প্রকাশ নামক এক চরিত্রের কথা আছে যে টাকার পৃথিবীতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার ব্যক্তিত্ব নিয়ে জন্মেছে। জীবনানন্দের ভাষায়—"রূপোর টাকার মতো জীবনের বাজারের পথে প্রকাশ তার সর্বজনপ্রিয় সর্বজয়ী বাজনা বাজিয়ে চলেছে।"

টাকা-শাসিত পৃথিবীর স্থূলতার প্রতি জীবনানন্দ বহু বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেও টাকার আবশ্যিকতার ছবিটিও আছে তাঁর উপন্যাসে। পয়সার অভাবে নায়ক তাঁর স্ত্রীকে দু-আনার জর্দা কিনে দিতে পারে না, খাওয়াতে পারে না চার পয়সা দামের আধ গ্লাস দুধ। যে কন্যাকে সে পৃথিবীতে এনেছে তাকে একটি ফ্রক কিনে দেবার জন্য সে হাত পাতে তার বৃদ্ধ পিতার কাছে। মানুষের সমাজে নিঃস্ব হয়ে থাকার যে দীনতা তা-ও জীবনানন্দ স্বীকার করে নিয়েছেন। মানব-সভ্যতায় মানুষে মানুষে ন্যূনতম সম্পর্কের বন্ধন টাকার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে—এই সর্বজ্ঞাত অথচ ভীষণ সত্যটি তাঁর উপন্যাসে

অনবদ্য যাথার্থ্যে পরিস্ফুট।

দ্বিতীয় যে-সংকটটিকে জীবনানন্দ মানুষের জীবনে ও সমাজে অনপনের বলে চিহ্নিত করেছিলেন তা হল যৌনতা সংক্রান্ত জটিলতা। নর-নারী সম্পর্কের কূটগ্রন্থি। মানুষের যৌনতার ব্যাপারটা পশু পাখির যৌনতার তুলনায় অনেক অনেক বেশি জটিল। সেখানে ইচ্ছা, রুচি, সামাজিক পরিস্থিতির প্রেক্ষিত-গুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দেয়। এই সম্পর্কের সুন্দরতম রূপ হল প্রেম-নিষিক্ত শরীরী সংবেদনার মধুর উপভোগ। কিন্তু ভালোবাসা নেই, শরীর-সম্ভোগ আছে—এমন প্রায়ই দেখা যায়। আবার শরীরী সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব নয়, অথচ আছে প্রেম-বাসনা—এমনও হয়। দুটি ক্ষেত্রেই সংকট সৃষ্টি হতে পারে। সর্বাধিক সংকট তখনই যখন একজনের মনে আছে আকর্ষণ ও ভালোবাসা। কিন্তু অন্যজন উদাসীন, এমন কি বিরাগসম্পন্ন। যেহেতু প্রেম অথবা সুস্থ যৌন সম্পর্কের জন্য দুজন মানুষ চাই-ই—তাই দুজনের মন কিছুটা অন্তত একতানে বেজে ওঠা দরকার। কোনো কোনো সময়ে দুটি মনের একই তলে এসে দাঁড়ানো আবশ্যিক। তেমন না হলেই সমস্যা। আবার মানুষের সমাজ ও সভ্যতা মানুষের যৌনবাসনাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়—তার ফলেও সংকট সৃষ্ট হতে পারে। সমাজ সৃষ্টি করেছে দাম্পত্যবন্ধন। নারী-পুরুষের মধ্যে যদি বিরাগ-সম্পর্ক এসে যায় তাহলে দাম্পত্যের মতো সংকট আর নেই। মানুষের যৌন সম্পর্কের তথা প্রেম সম্পর্কের মধ্যে টাকা ও সামাজিক শ্রেণীগত অবস্থানের ভূমিকা যথেষ্ট জটিলতার সৃষ্টি করে। নর-নারী সম্পর্কের মধ্যে কিছু কিছু বিকারও আছে—ইডিপাস ও ইলেকট্রা কমপ্লেক্স, সমকামিতা ইত্যাদি। নর-নারী সম্পর্ক বিষয়ে মানুষের মনে বিবিধ কুরুচি ও অশ্লীলতার ভাবও জাগে।

আমরা বিস্মিত হয়ে দেখি—যৌন সম্পর্কের এই সব কটি দিকই জীবনানন্দের উপন্যাসে কোথাও না কোথাও পাওয়া যায়। যৌন-বাসনার বিচিত্রতাকে এত গুরুত্বপূর্ণ স্থান বাংলা উপন্যাসে আর কেউ দিয়েছেন বলে জানি না। বুদ্ধদেব বসুর কোনো কোনো উপন্যাসে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিছু ছোটো গল্প ও উপন্যাসে কিছুটা পাওয়া যায় এই সংকটের রূপায়ণ। কিন্তু কেবলই যৌন-বাসনা ও তার সংকটকে কেন্দ্র করে সম্পূর্ণ উপন্যাস প্রণয়ন—যেমন করেছেন জীবনানন্দ তাঁর 'মাল্যবান'-এ—বাংলা সাহিত্যে খুবই বিরল। ধূর্জটিপ্রসাদের অন্তঃশীলা-র কথা মনে পড়তে পারে। কিন্তু অন্তঃশীলা-র

উপস্থাপিত যৌন সংকটবোধ 'মাল্যবান' উপন্যাসের চরিত্রগুলির সমজাতীয় সংকটবোধের তুলনায় অনেক পরিশীলিত হওয়ায় তার অভিঘাতের তীব্রতা অনেক কম।

এখানে একটি কথা বলে নেওয়া যায়। মানব-সমাজের আরো একটি অতীব গ্রন্থিময় সংকট আছে। তা হল মানুষের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করবার অপ্রতিরোধ্য প্রবণতা। যে-কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্র প্রায় সর্বদাই নিজের প্রভাবের পরিধি বিস্তার করতে চায়। রাজতন্ত্রের যুগে সাম্রাজ্য-বিস্তার ছিল তার প্রক্রিয়া, ধনতন্ত্রের যুগে তা অবধারিত ভাবে হয়েছে বাণিজ্য-বিস্তার। শাসকেরা চায় শাসন-ক্ষমতা বিস্তার করতে। প্রায় সব মানুষই নিজের পরিসীমার মধ্যে প্রভুত্ব স্থাপনে আকাঙ্ক্ষী। ফ্রয়েড একদা যৌনতা ব্যাপারটিকেই মানুষের যাবতীয় ক্রিয়া সম্পাদনের মূল উৎস মনে করেছিলেন। পরবর্তী মনোবিদ্‌রা কিন্তু ভেবেছেন—ক্ষমতার প্রতিষ্ঠা-আকাঙ্ক্ষাই মানুষের সর্বসক্রিয়তার মূল প্রণোদনা। স্পষ্টভাবে এই সমস্যাটি জীবনানন্দের উপন্যাসে সাবয়ব হয়ে ওঠেনি। তবে বিত্ত-শক্তিই যে ক্ষমতা-প্রতিষ্ঠার প্রধান হাতিয়ার এই যুগে—তা স্থিরীকৃত হয়ে যায় তাঁর উপন্যাসে। জীবনানন্দের কথাসাহিত্যে আরও অনেক অভিনিবেশযোগ্য দিক আছে। যেমন নিসর্গ-রূপ, নৈঃসঙ্গ্য-বোধ, মৃত্যু-চেতনা, কাব্যময়তা। কিন্তু এই অনুষঙ্গগুলিকে পাওয়া যাবে একাধিক উপন্যাসে মূল প্রসঙ্গের সঙ্গে সঞ্চারী ভাব রূপে। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় বিষয় প্রধানত—দেশকালের টেনশন, নরনারী-সম্পর্কের রহস্যময় গ্রন্থিলতা, টাকা সম্পর্কিত কুটতা আর আত্মজীবনীমূলক প্রেক্ষণের মধ্যেই ঘোরাফেরা করেছে।

জীবনানন্দের দুই পর্বের উপন্যাসগুলি একসঙ্গে দেখলে আরও মনে হয় যে, উপন্যাসের রচনা-শৈলী বিষয়েও তিনি অনেক ভেবেছিলেন। শিল্প-রূপের সর্বাঙ্গীণ পূর্ণতা সম্পর্কে দ্বিধা কাটিয়ে উঠতে না পারাই তাঁর উপন্যাস-গুলি প্রচ্ছন্ন রাখার মূল কারণ—তা অনুমান করেছি আমরা। কাজেই প্রকাশ-ভঙ্গির বিভিন্ন বৈচিত্র্য নিয়ে তিনি পরীক্ষা করবেন—তা খুবই প্রত্যাশিত। কোনো উপন্যাসে তিনি সাধারণ বিবৃতির রীতিই গ্রহণ করেছেন। বিবৃতি-রীতিটি একেবারে বর্জন করেননি তিনি শেষ পর্যন্তও। এ সেই রীতি যেখানে লেখক থাকেন সর্বজ্ঞ কথকের ভূমিকায়। প্রথম পর্বের 'কল্যাণী' আর দ্বিতীয় পর্বের চারটি উপন্যাসই এই রীতিতে লেখা। আবার

কোথাও তিনি উপন্যাসের একটি চরিত্রের দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করে স্বগত-ভাষণের পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। 'প্রেতিনীর রূপকথা', 'জীবনপ্রণালী', 'কারুবাসনা', এই পদ্ধতিতে রচিত। তবে সর্বত্রই জীবনানন্দের উপন্যাসে সংলাপের গুরুত্ব খুব বেশি। উপন্যাস গাঁথা হয়, অগ্রসর হয় সংলাপের সিঁড়ি বেয়ে। শেষও অনেক সময়ে হয় স্বগত সংলাপে। উপন্যাসের ঘটনাগুলি প্রায়ই বর্ণিত হয় না। সংলাপের সাহায্যেই বিবৃত হয় সেগুলি। ফলে অনেক সময়ে মনে হয় কাহিনীর গতি খুবই মন্দীভূত। দ্রুত বর্ণনা একেবারেই নেই। সংলাপের শৈলীও খুবই আশ্চর্য। বাস্তব সংসারে মানুষ যখন কথা বলে তখন তার ভাষা একই সঙ্গে হয় স্বাভাবিক আর কৃত্রিম। স্বাভাবিক ; কারণ বাস্তবে মানুষ ঐ ভাবেই কথা বলে থাকে। আবার কৃত্রিম ; কারণ—প্রায়ই মানুষ তার মনের সত্যি কথাটি ভাষায় প্রকাশ করে না। প্রচ্ছন্ন রাখে। সাজিয়ে কথা বলে, মিথ্যা ভাষণ করে। সামাজিক ও সাংসারিক মানুষের পক্ষে প্রায়শই এই মিথ্যাভাষণই স্বাভাবিক। কিন্তু জীবনানন্দের গল্প-উপন্যাসে সাধারণত দেখা যায় চরিত্রগুলি কেউ সাজিয়ে বা বানিয়ে কথা বলছে না। যা তারা বলতে চায়, মনের ভেতরে যে-কথাটি ঘনিয়ে উঠেছে—সেটাই তারা বলবে। বড় জোর, বাক্যটিকে তারা উপমায়, চিত্রকল্পে রূপ দেবে। কিন্তু গোপন কখনই করবে না। ফলে তাঁর রচিত সংলাপ আমাদের কাছে একটু অদ্ভুত লাগে ; আর, গভীর ভাবে আকর্ষক লাগে।

মানুষের ভাষার আর এক সমস্যা তার অবচেতন-স্বিতলতা। এযুগের ভাষাতত্ত্ববিদেরা বিষয়টি অনুপুঙ্খ লক্ষ্য করেছেন। মানুষ বাক্য গেঁথে ভাবে যে, সে তার মনের কথাই বলল। কিন্তু বক্তারই অবচেতন মনের তল থেকে উঠে এসে তার গোপন ও দমিত আকাঙ্ক্ষাগুলি তার অভিব্যক্ত বাক্যটিকে এমন রূপ দেয় যা ভেঙে দেয় বাক্যে প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্তটিকেই। এমনও পাওয়া যায় জীবনানন্দের সংলাপের ভাষায়।

জীবনানন্দের উপন্যাস অনেক সময়েই দৃশ্যমালা, অনুভূতিমালা এবং কল্পদৃশ্যমালা রূপে পাঠকের সামনে আসে। কল্পদৃশ্যগুলিকে ঠিক অলৌকিক বলা যায় না। তা কোনো-না-কোনো চরিত্রের অনুভূতিতে সত্য, বস্তুজগতের ঘটনা রূপে সত্য না হলেও। এমন নিদর্শন খুব বেশি নেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাস্তবকেই এমনভাবে বর্ণনা করেন জীবনানন্দ যে, বাস্তবেই সঞ্চারিত হয় অ-বাস্তবের মায়া। 'জলপাইহাটি' উপন্যাসে তার দৃষ্টান্ত পাওয়া

যাবে। এ-ছাড়া অন্তর্ভাবন এবং বর্ণনার উপমা, চিত্রকল্পের অ-পূর্বত্ব—যা জীবনানন্দকে চিনিয়ে দেয়—তা-ও আছে অজস্র।

জীবনানন্দ : একটি কবিতা থেকে একটি ছোটোগল্পের কাছের দূরত্ব

বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত

জীবনানন্দ দাশের কবিতা ও ছোটোগল্পের সমান্তর ক্ষেত্রে, কোথাও কোথাও তুলনামূলক মূল্যায়নের তাগিদ আপনিই এসে পড়ে। তাঁর একই সৃষ্টিশীল অভিজ্ঞতায় কবিতা ও কথাসাহিত্যের সমান্তরতার এমন-একটি দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করি, যা কবিতারই মৌলিক বাস্তবের উৎসমূল থেকে অনায়াসে ছোটো-গল্পের স্বয়ংসম্পূর্ণতার বিষয় হয়। বিষয়ের বিন্যাস অনুযায়ী, সেদিক থেকে, প্রথমত একই থিম ঠিক কীভাবে কবিতায়, এবং পরে—ছোটোগল্পের প্রায় সম-মাত্রিক রূপ-রূপান্তরের আলাদা-আলাদা শিল্পসফলতা খোঁজে, তারই একটি বিশ্বস্ত উদাহরণ জীবনানন্দের 'ক্যাম্পে' (প্রথম প্রকাশ : 'পরিচয় ১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা মাঘ ১৩৩৮) কবিতা এবং ঐ কবিতারই কিছুটা সম্পূরক রচনা হিসেবে, তাঁর অক্টোবর ১৯৩১-এর একটি ছোটোগল্প 'মেয়েমানুষদের ঘ্রাণে' (দ্র° জীবনানন্দ সমগ্র ৭ম খণ্ড, প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস ১৯৯২)। এখানে আপাতত একটা তুলনামূলক বিচার-বিশ্লেষণের জন্যই ঐ রচনা দুটি পাঠকের দ্রষ্টব্য ব'লে মনে করি।

পাঠক তো জানেনই 'পরিচয়'-এ জীবনানন্দের 'ক্যাম্পে' কবিতাটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই সজনীকান্ত দাস তাঁর 'শনিবারের চিঠি'-র সংবাদ সাহিত্য-এ একটা কুরুচিকর রঙ্গব্যঙ্গের আসর জমিয়ে ফেলেন। এবং বলতে গেলে, তিনিই প্রথম 'শনিবারের চিঠি'র পাতায়, 'ক্যাম্পে' কবিতাটিকে 'অশ্লীল' ব'লে অভিযুক্ত করেছিলেন। এখানে উল্লেখ থাক, 'ক্যাম্পে' কবিতাটি পরিচয়-এ প্রকাশিত-হওয়ার অন্তত বছর তিন-চারেক আগেই—১৯২৮ সালে সিটি কলেজ থেকে তাঁর পড়ানোর চাকরিটি চ'লে যায়। বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত এবং সুকুমার সেন—সকলেই লিখেছেন 'অশ্লীল' কবিতা লেখার জন্যই জীবনানন্দের

চাকরী যায়। বুদ্ধদেব তো সে-কবিতাটি 'ক্যাম্পে' ব'লে ধার্য করেছেন। কিন্তু সংগত কারণেই, 'ক্যাম্পে' (১৯৩২) কবিতার জন্য জীবনানন্দের আর দ্বিতীয়বার সিটি কলেজ থেকে চাকরি-যাওয়ার সুযোগ হয়নি। সে-'সুযোগ' ১৯২৮ সালে মাত্র একবারই তাঁর হয়েছিলো এবং সে-বিষয়ে অচিন্ত্যকুমার যেমন অনুযোগ বলেছিলেন: 'কবিতার শস্যশীর্ষে স্তনশ্যাম-মুখ কল্পনা'-করার অপরাধেই নাকি তাঁর চাকরি যায়—তো সেই কবিতাটি দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুসন্ধিৎসা অনুযায়ী, 'পিপাসার গান' (প্রগতি, ফাল্গুন ১৩৩৪) হলেও হতে পারে। কলেজ-কর্তৃপক্ষ অবশ্য জীবনানন্দের চাকরি থেকে ছাঁটাই-হওয়ার কারণ হিসেবে, কলেজের হঠাৎই কোনো আর্থনীতিক সংকটের কথা বলেন। ১৯২৮ সালে সিটি কলেজের রামমোহন হস্টেলের ছাত্রদের সরস্বতী পুজোর অনুমতি না-দেওয়ায়, কর্তৃপক্ষ প্রবলতর একটা ছাত্রবিক্ষোভের সম্মুখীন হন। ব্যাপারটা অনেকদূর গড়ায়। বহু ছাত্র সিটি কলেজ থেকে নাম কাটিয়ে চলে যায়। তখন কলেজ গুরুতর আর্থিক সংকটে পড়ে এবং কলেজের প্রায় প্রত্যেক বিভাগ থেকেই অস্থায়ী লেকচারার-টিউটরদের একজন দুজন করে ছাঁটাই হয়ে যায়। কর্তৃপক্ষের তরফে খুবই যুক্তিসংগত এই তথ্য। তবু, কবি যে বেশ কিছু 'অশ্লীল কবিতা'ই লিখে ফেলেছেন, আর সেজন্য কলেজের অধ্যক্ষের কাছে তিনি তিরস্কৃত হয়েছিলেন এবং সহকর্মীদের দ্বারা নিন্দিত, সেসব দুর্ঘটনার গুরুত্ব, ততো লঘু করে দেখা চলে কি? এরপর, সিটি কলেজ থেকে জীবনানন্দের চাকরি-যাওয়ার (১৯২৮) ব্যাপারে ঠিক কোন্ কারণটা জোরালো, ভাবতে গেলে, কলেজের আর্থিক সংকটের কারণটাই কিন্তু বেশ আনুষ্ঠানিক মনে হয়। অন্যপক্ষে, তাঁর কবিতা সম্পর্কে 'অশ্লীলতার' অপবাদও তো প্রধানত 'শনিবারের চিঠি'-রই দৌলতে, ততোদিনে—অন্তত এছলে বছর পাঁচেকের পরিসরে (১৯২৭-১৯৩২)—ধারাবাহিক ও নিয়মিত এক 'চূড়ান্ত দৃষ্টান্তে' ('ক্যাম্পে', পরিচয়, ফেব্রুয়ারী ১৯৩২) পৌঁছে গেছে।

সুতরাং, জীবনানন্দের সিটি কলেজ থেকে চাকরি যাওয়ার আনুষ্ঠানিক কারণটিরও অনেক বেশি এই নেপথ্যের কোনো-এক 'নমনুন্ডের টিটকারি'—যা কতোই অবলীলাক্রমে একজন কবির চাকরি থেকে ছাঁটাইয়ের পূর্বমুহূর্ত-পর্যন্তও, কী ভয়ঙ্কর ইন্ধনই-না জুগিয়েছিল। ১৯২৮ সালের ভিতর প্রকাশিত তাঁর 'পিপাসার গান', 'প্রেম', 'পরস্পর'-এর মতো কবিতা নিয়েও

তাই কম জল ঘোলা হয়নি। অথচ এইসব রচনার কোনো একটি অংশকে—এমনকি তার বিশেষ কোনো একটি শব্দকেও—অশ্লীল ব'লে বিবেচনা করা যে কী কঠিন কাজ। যাহোক, সে-কাজটুকু প্রধানত সজনীকান্ত বেশ অত্যুৎসাহেই অক্ষরে-অক্ষরে পালন ক'রে গেছেন। আর তারই পরিণামে, শেষ অব্দি, জীবনানন্দীয় 'অশ্লীলতার' একটি 'চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত' হিসেবে সজনীকান্ত 'ক্যাম্পে' কবিতাটি উল্লেখ করেন সত্য, কিন্তু তার 'অশ্লীলতা' তিনি প্রমাণ করতে পারেন না। অথচ 'শনিবারের চিঠি'তে সজনীকান্তের পত্রপাঠ-প্রতিক্রিয়ার কলম 'সংবাদ-সাহিত্য'-এ তাঁরই অসূয়াপন্ন মনটাকে প্রকাশ করে ফেলে। বোঝা যায়, কোন উদ্দেশ্য চরিতার্থতার জন্য সেই ১৯২৭-২৮ থেকেই তিনি জীবনানন্দের প্রতি এমন-একটা ব্যক্তিগত আক্রমণাত্মক ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। সজনীকান্ত লিখেছিলেন :

> "'পরিচয়' একটি 'উচ্চ-শ্রেণী'র কালচার-বিলাসীর ত্রৈমাসিক পত্রিকা। রবীন্দ্রনাথ ইহাকে সস্নেহ অভিনন্দন জানাইয়াছেন এবং হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় ইহাতে লিখিয়া থাকেন।
>
> রবীন্দ্রনাথ ও হীরেন্দ্রনাথ প্রমুখ ব্যক্তিরা যে কাগজের সম্পর্কে সম্পর্কিত, তাহাতে কি প্রকার জঘন্য অশ্লীল লেখা বাহির হইতে পারেও হয় তাহার একাধিক 'পরিচয়' দিয়াছেন। 'ক্যাম্পে' তাহার চূড়ান্ত নমুনা। সুতরাং এ শ্রেণীর লেখকদের প্রসার ও প্রতিপত্তি কাহাদের আওতায় বাড়িতেছে, পাঠক- সাধারণ তাহার বিচার করিবেন।"
>
> (—সজনীকান্ত দাস, 'সংবাদ-সাহিত্য', শনিবারের চিঠি, মাঘ ১৩৩৮)

তা, 'বিচার' তো কবেই শেষ হয়ে গেছে ; এখন তার স্মৃতিচারণার প্রহসন। নয়তো, প্রতি মাসে-মাসেই 'শনিবারের চিঠি'র পাতায় সজনীকান্ত যে জীবনানন্দের 'পিপাসার গান', 'প্রেম', 'পরস্পর', 'মাঠের গল্প', 'স্বপ্নের হাতে', 'পাখিরা', 'পুরোহিত', 'নির্জন স্বাক্ষর', ও 'বোধ'-এর মতো কবিতাগুলি নিয়ে একের পর এক নিম্নমানের প্যারডি লিখে গেছেন, আর তাদেরই ধারাবাহিক অশ্লীলতার 'চূড়ান্ত নমুনা' কিনা সেই 'ক্যাম্পে' কবিতাটি। ১৯২৭-১৯৩২-এর ধারাবাহিক জীবনানন্দ-বিদ্বেষের প্রথম বছরেই—অর্থাৎ ১৯২৮-এই, কবি জেনে গেলেন : 'নেই কোন বিশুদ্ধ চাকুরি' ; সুতরাং সেই বছরেরই কোনো-এক সময়ে, তিনি তাঁর সিটি কলেজের চাকরি থেকে সত্যিই একদিন ছাঁটাই হয়ে গেলেন।

॥ দুই ॥

অতঃপর, এই বলতে হয় যে 'ক্যাম্পে' কবিতাটিরই একটি সম্পূরক ও সমমাত্রিক রচনা যে 'মেয়েমানুষদের ঘ্রাণে' এই ছোটোগল্পটি (রচনাকাল : অক্টোবর ১৯৩১), না-জানি, সেই গল্পটি প'ড়েও জীবনানন্দের প্রতি সজনীকান্তের মতো সমালোচকদের আরো-কোন্ গুরুতর দণ্ডবিধান হয়ে-যেতে পারতো—তা কে বলবে! কিন্তু তার সুযোগ ছিলো না বোধকরি এইজন্য যে জীবনানন্দ তাঁর জীবদ্দশায় সেসব সদ্য লেখা লোকচক্ষুর অগোচরেই রেখেছিলেন।

যাহোক, সেই অক্টোবর ১৯৩১-র 'মেয়েমানুষদের ঘ্রাণে' নামক গল্পটি, ঠিক কী অর্থে 'ক্যাম্পে' কবিতাটির সম্পূরক রচনা, তা লক্ষ করা যেতে পারে। প্রথমত বলি : মাঘ ১৩৩৮ (ফেব্রুয়ারি ১৮৩২) 'ক্যাম্পে' কবিতাটির রচনাকাল নয়, 'পরিচয়'-এ তার প্রথম প্রকাশকাল। বিষ্ণু দে-র অনুরোধে, জীবনানন্দ তাঁর এই কবিতাটি পরিচয়-এ প্রকাশের জন্য দেন। ১৯৩১-এর শ্রাবণে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত ত্রৈমাসিক 'পরিচয়' প্রথম প্রকাশিত হয়। তার তৃতীয় সংখ্যায়—অর্থাৎ মাঘে কবিতাটি ছাপা হয়। এমন হতে পারে, জীবনানন্দের এই কবিতাটি ও পূর্বোক্ত গল্পটি তাঁর একই সময়ের রচনা : অক্টোবর ১৯৩১। গল্পটির অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্যে 'ক্যাম্পে' কবিতাটির উৎস-পটভূমির সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে।

বস্তুত গল্পের নামটি যদিও 'জীবনানন্দ সমগ্র'-এর সম্পাদকের দেওয়া, তবু তা সেই গল্প থেকেই নেওয়া কোনো শব্দ বা পদ—যা নামকরণের যাথার্থ্য অবশ্যই প্রতিপন্ন করে। জীবনানন্দ দাশ তাঁর এই গল্পের নায়ককে একজন উচ্চশিক্ষিত বেকার যুবক হিসেবে দেখিয়েছেন। যে ভাগ্যান্বেষণে কলকাতা থেকে আসাম মেলে চেপে একেবারে উত্তর আসামের সেই তিন-সুকিয়া—মাকুমের উদ্দেশে পাড়ি দিয়েছে। উদ্দেশ্য : আসামে কোনো-একটা ব্যবসায়ের সুযোগ যদি জুটে যায়! বিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশকের গোড়ায়, বাংলা ছোটোগল্পের টোপোগ্রাফিতে আপার আসামের নৈসর্গিক আবহ—তাও জীবনানন্দের গদ্যে—তখনো অব্দি একটি অভূতপূর্ব সংযোজন।

তখনকার ই. বি. রেলওয়ের আসাম মেল। শেয়ালদা থেকে ছেড়ে রাণাঘাট ঈশ্বরদি নাটোর সান্তাহার পার্বতীপুর লালমণির হাট হয়ে

শীতলদহ গোলকগঞ্জ দিয়ে সেই প্রাক্-স্বাধীনতাপর্বের তিরিশের দশকের মেল ট্রেন, আসামে ঢুকছে। রেলপথের বিশদ বিবরণ লেখক ইচ্ছে করেই বর্জন করলেও, পথ ও নতুন দেশের ভূপ্রকৃতি বর্ণনা—বাংলা ছোটোগল্পে অবশ্যই একটা নতুন মাত্রাসঞ্চার করেছে।

গল্পের শুরুতেই লেখক আসামের প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে কতো বিচিত্র ধরনের ব্যবসায়ের সুযোগ-সুবিধা যে পাওয়া যেতে পারে সে বিষয়ে বলেছেন। গল্পের নায়ক প্রবোধ উচ্চশিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও কোথাও-কোনো সুবিধা করতে না-পেরে শেষপর্যন্ত এই আসামেই কোনো একটা ব্যবসায়ে লেগে যাবে বলে মনে করে। এখানকার অরণ্য, চায়ের বাগান নিয়ে, বিশেষ ভাবে—কাঠের ও চায়ের ব্যবসায়ের একটা ভালো সম্ভাবনা রয়েছে। তাও তো গল্পে ডিগবয়ের তেলের খনির উল্লেখ সেভাবে নেই, কিন্তু 'সেই ব্যবসায়েরই গন্ধে' শিখ-পাঞ্জাবি, মাড়োয়ারাড়ি, পশ্চিমা মুসলমান এবং অবশ্যই বাঙালিরাও তার আশপাশে এসে ভিড়ে গেছে। চায়ের বাগান লক্ষ করে, বিহার সাঁওতাল পরগণা থেকে কুলি কামিনও এসে গেছে ঢের। ১৯৩১-এই জীবনানন্দ অনুভব করেছেন—আসামের এতোসব প্রাকৃতিক সম্পদ ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের দিকে অসমীয়াদেরই তেমনভাবে মনটা বসেনি। তারা যুগবদ্ধ আলস্যে ও উদাসীনতায়—'ব্যবসায়ের সুবিধা সাহেবদের কাছে ছেড়ে দিয়েছে, মাড়োয়ারাড়িদের, শিখ-পাঞ্জাবিদের হাতে, পশ্চিমে মুসলমানদের হাতে, বাঙালিদের হাতেও—' এইসব শুনেছে প্রবোধ।

আসাম মেল সকালবেলায় তিনসুকিয়ায় এসে পৌঁছেছে। প্রবোধকে খেতে হবে মাকুম। স্টেশনের রেস্টুরেন্ট রীতিমতো কাঠের তৈরি একটা বাড়ি। আসামে ঘন ঘন ভূমিকম্প হয় বলে এখানে বাড়িঘরদোর কাঠের। প্রবোধ দেখছে, 'চা যারা পরিবেশন করছে তাদের বাঙালি মনে হচ্ছে। হয়ত এতদূরে এরাও একটা ব্যবসা ফাঁদতে এসেছে; উন্নতি নিশ্চয় হচ্ছে, জীবনে যে-এবার আমাদের স্থান কোথায় হল না হলে? আজকের যুবক, কালকের যুবক, ছোট মাঝারি বুড়ো সব রকম ইয়ারই রয়েছে এদের মধ্যে। শীতের সকালে চায়ের চাটেই হয়ত জমেছে। কে কোথাকার কোনদিকে কতদূরে কিছুই বুঝতে পারা যায় না। উড়ু উড়ু পায়রার মত ক্রমে ক্রমে চারদিকে খসে পড়ছে।' মাটি থেকে অনেকটা উঁচুতে রেস্টুরেন্টটা, উঁচু আর বড়ো। প্রবোধ ভাবছে : 'একটা নিস্তারের আস্বাদ পাওয়া যায়,

সবাই চলে গেলে বেশ একটা নিস্তব্ধতার।'—লক্ষণীয় বটে, এখানে মাত্র বর্ণনার ভাষা হিসেবেই যে জীবনানন্দ 'নিস্তারের' আর 'নিস্তব্ধতার' মতো শব্দদুটিকে আহ্বান করেন, তা মনে হয় না। বিশেষত 'নিস্তার' শব্দটি তাঁর ছোটোগল্পের একটা প্রতীকী-মোটিফ শব্দ।

তাঁর অন্যান্য গল্পের মতো এই 'মেয়ে মানুষের ঘ্রাণে' গল্পটিতে, জীবনানন্দ অকপটেই প্রবোধ চরিত্রে বেশ আত্মজৈবনিক উপাদানের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। অবশ্য অভিজ্ঞতা তথাকথিত অর্থে আত্মজৈবনিক হয়েও গল্পকে এমন এক জায়গায় নিয়ে যায়, সেখানে অভিজ্ঞতা অনুভূতিরও আর কোনো আত্ম-অনাত্মভেদ ছাড়াই তো একটি সর্বজনীন নিঃসহায়তার ও নিরাশ্রয়তার 'বোধ'; এবং যা হাসতে-হাসতে রগড়ের মতো বললেও, তা-ই অবশেষে জীবনের নিভৃততম 'অশ্রু'। প্রবোধের আসাম অভিযানের প্রাথমিক অভিজ্ঞতা উপলব্ধির ছরেই, যেন সেই 'অশ্রু'কে সে কারুর জীবনের অন্তস্তলে হঠাৎই দেখে ফেলে। তিন বছর হলো কলিকাতা থেকে অমিয়াংশু এই প্রবোধের মতোই নিরুপায় হয়ে একদিন এসেছিলো এখানে বোথার আশ্রয়ে। ভেবেছিলো, যে কোনো একটা কাজে-কর্মে ব্যবসায়ে গতি হয়ে যাবে। কিন্তু তা-আর হলো কোথায়! তবু ডাক আসবার সময় হলেই অমিয়াংশু পোস্ট অফিসের দিকে পা বাড়ায়—যদি চিঠি আসে!

—যাচ্ছি ত চিঠির জন্য—এই তিন বছরের ভেতর কখানা পেয়েছি জান?

প্রবোধ উৎসুক হয়ে তাকাচ্ছে।

—'একখানা মাত্র।'

—'এই তিন বছরের ভিতর?'

—'একেবারে গোনাগাঁটা তিন তিনটে বছর।'

অমিয়াংশু এই তিন বছরে মাত্র একটিই চিঠি পেয়েছিলো। সেই চিঠি তার স্ত্রীর মৃত্যুর খবর নিয়ে এসেছিলো।

—'তুমি বিয়ে করেছিলে অমিয়াংশু?

—'একটা ছেলেও হয়েছিলো।'

—'সেই ছেলেটির কি হল?'

—'সেই-ই ত মাকে মারলে, নিজেও মরলে, অলুক্ষণে মা-খেগো গুখেগো কোথাকার?' বিড়িটা টানতে টানতে অমিয়াংশু একটু মজা বোধ করে হাসছে।

কিন্তু হাসছে কি কাঁদছে মুখের দিকে তাকিয়ে কিছুই ঠিক ঠাওর করতে পারা যাচ্ছে না, এমনই একখানা মুখ।"

('মেয়ে মানুষদের ঘ্রাণে' জীবনানন্দ সদন, ৭ম খণ্ড)।

এমনি একখানা মুখ, যা হাসছে, কি কাঁদছে—তাকিয়ে কিছুই ঠাওর হয় না—প্রবোধ বুঝলো, এই গল্প অমনি-এক 'অশ্রু'র উৎসের দিকে এসে মিশলো।

ছোটোগল্পের ভাবগত একমুখীনতার দিকটি অবশ্য ঐ 'মেয়েমানুষদের ঘ্রাণে' গল্পে, একাধিক কথামুখের বিস্তৃততার ভিতর বুঝি-বা লক্ষ্যভ্রষ্টই হয়ে যায়। সেদিক থেকে প্রথম পর্বের গল্প হিসেবে রচনাটি ততো ত্রুটি-মুক্তও নয়, তবে অন্যবিধ গুরুত্ব আছে।

প্রথম ও প্রধান গুরুত্বটি এর থিমের। এটি এমনই একটি রচনা যে লেখক তাঁর কাব্য অভিজ্ঞতার মৌলিক বাস্তবের সূত্রে, তাঁর সমকালীন একটি ছোটো গল্পের কাঠামোর সেই বাস্তবতার প্রতিফলন ঘটিয়ে দেখতে চান—অপ্রত্যাশিত অন্য এক কথামুখ।

॥ তিন ॥

জানি, জীবনানন্দ দাশ তাঁর অধিকাংশ গল্পেরই নামকরণ থেকে বিরত থেকেছেন। এই 'মেয়ে মানুষদের ঘ্রাণে'-র ক্ষেত্রেও। নামটি গল্পের পাণ্ডু-লিপির কোনো বিশেষ শব্দ বা পদ তুলে এনে—জীবনানন্দ সমগ্র-র সম্পাদক প্রদত্ত এই নামকরণ। কিন্তু নামটা এরকম কেন? 'মেয়ে মানুষদের ঘ্রাণে' বলতে এখানে লেখক কি বোঝাতে চান?

আমাদের নিজেদের ধারণা: নামটি আসামের আর্দ্র ভূ-প্রকৃতির অনুযায়ী প্রকৃতিসম্ভূত। আর আসাম প্রকৃতিও সে অর্থে একশো ভাগই নারীসুলভ জৈব আকর্ষণের কেন্দ্রীয় বিষয়। গল্পটির গঠনশৈলীর বিশেষত্বেই এর প্রকৃতিতে আছে জাদুস্পর্শের মোহিনীমায়া। এই প্রসঙ্গে, তাঁর গল্পে, কাব্য অভিজ্ঞতার মৌলিক বাস্তবই তো সেই জাদুস্পর্শ, যা কিনা অনায়াসেই গভীরতম জীবনবোধের সঙ্গে কাব্য অভিজ্ঞতার প্রায় একটা সরাসরি মিলন-মিশ্রণের রূপ সৃষ্টি করে।

আসলে এই 'মেয়ে মানুষদের ঘ্রাণে' গল্পটির বিষয়বস্তুর একমুখী

পাতিক্রমটি সম্পর্কে, জীবনানন্দ কিন্তু পূর্ণ সচেতন। তাঁর গল্পটির নায়ক একজন উচ্চ-শিক্ষিত বেকার যুবক। বেকার এবং অবিবাহিত প্রবোধ কলকাতায় নানাভাবে চেষ্টা চরিত্র ক'রেও যখন না-চাকরি, না-ব্যবসায়—কিছুই করে উঠতে পারলো না, তখন অবশেষে, আসামে ব্যবসায়ের উদ্দেশেই পাড়ি দিলো। আসামে তার আত্মীয়স্বজন রয়েছে—কেউ চায়ের ব্যবসায়, কেউবা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের ডেপুটি কনজারভেটরের মতো পদস্থ অফিসার। আপাতত তার এক আত্মীয় বোথা, যে নানারকম ব্যবসায়ের ধান্দায় অনেকদিন ধরেই এখানে বেশ জমিয়ে বসেছে এবং কলকাতা থেকেও তারই জ্ঞাতিগোষ্ঠীর কেউ কেউ কোনো একটা হিল্লে হয়ে যাওয়ার আশায় এসে জুটেছে—যেমন অমিয়াংশু বা অমিয়াংশুর মতন বিপান, হরেন। সম্প্রতি বোথার সম্পর্কে ভাগ্নীজামাই এই প্রবোধও এসে ভিড়লো। তিন সদিয়া-ডিব্রুগড়-মার্গেরিটার ব্রাঞ্চ লাইনের মাকুমে। দেখা যাচ্ছে, যারাই আসামে ভাগ্যান্বেষণে একবার এসে পড়েছে, তাদের কোনো-না-কোনো ভাবে একটা গতি হয়ে গেছে। আবার অমিয়াংশুর মতো ভাগ্যবিড়ম্বিত এমন দু-চারজন আছে বৈকি, যারা কিছুই ক'রে উঠতে পারেনি। অথচ ঘরের ছেলে ঘরেও ফিরতে পারেনি আর। যেমন অমিয়াংশুর বৌ সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে মরে গেলো। একটা ছেলে হয়েছিলো—কিন্তু বাঁচলো না। তিন বছর ধরে অমিয়াংশু বোথার কাছে আছে। এ পর্যন্ত সে কলকাতা থেকে একটিই চিঠি পেয়েছে আজ অব্দি। তবু সে চিঠির খোঁজে প্রতিদিনই ডাকঘরে যায়। তো সেই তার সবেধন একটি চিঠি—তার বৌয়ের মৃত্যু সংবাদ বয়ে নিয়ে এসেছিলো! তা, অমিয়াংশুর মতো হতভাগাদের দলেই কি এসে পড়লো প্রবোধ? যাঁরা বোধকরি প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও আর ঘরে ফেরার টান-আকর্ষণ খুঁজে পাবে না হয়তো কোনোদিনই! আসামের প্রকৃতির মায়াবী জাদুস্পর্শে অমিয়াংশুর মতো ব্যক্তিরা একেবারে 'ভেড়া' ব'নে গেছে। এই বন্দীত্ব আর বন্ধনমোচনের বোধহয় আর কোনো উপায় নেই; গল্পটির বিষয়ের একমুখীনতা যে কোথাও সেভাবে ক্ষুণ্ণ হয়েছে তা বলতে পারি না। তবে ঘটনা সন্নিবেশে আসামের বনভূমির সৌন্দর্য ও সম্পদ, যেমন অসংখ্য চা বাগান ও তাদের প্ল্যান্টার্সরা, ডিগবয় অয়েল কোম্পানীর সাহেবদের তেলতেলে, সচ্ছল, ব্যবসায়ীমূলক শোষণ শাসন, তাছাড়া হরেক-রকমবাদর প্রাইভেট ব্যবসাদার পাঞ্জাবি-শিখ-মাড়োয়ারি

এমনকি বাঙালি টিম্বার মার্চেন্টই বা কম কিসে। মোট কথা ১৯৩১-এর পরাধীন, ঔপনিবেশিক ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিলিতি মালবাজার ইত্যাদি-ইত্যাদি একাধারে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, লিমিটেড কোম্পানি ও চায়ের অকশান্ পরিচালনার অনেক আপোষমূলক কলাকৌশল—এই সবই আসামে একটা বৃহত্তর ব্যবসায়-বাণিজ্যের ফাঁদপাতার এবং শ্রেণীবদ্ধ বিচিত্র হোর্ডিং-এর নামগন্ধহীন, দু-চারটা আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের মফস্বলী জংশন প্ল্যাটফর্মের গায়ে, চা প্রস্তুত প্রণালীর ডিটেলস্ বা, কালাজ্বর আর ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক—'রাত না পোহাতেই কুইনিন…' অথবা, গ্রীষ্মের সবচেয়ে শীতল পানীয়' জাতীয় সচিত্র সব বিজ্ঞাপনগুলিই তখন একমাত্র পোস্টাফিস রেলওয়ে প্ল্যাটফর্ম লিটারেচার। দেখি, জীবনানন্দের এই গল্পের নায়ক প্রবোধের মনে হচ্ছে ১৯৩১-এর আসামের এই দু'চোখ ভরা দৃশ্যে-দৃশ্যান্তরে—

'…যেন কোনো ঘুম ঘুমিয়ে রয়েছে। সেও কি আজকের থেকে? পৃথিবীর সমস্ত মোহই চারদিকে যেন মাছি পড়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে; কিন্তু চারদিককার আদুরে বাদুরে বাতাস এখানে, কবেকার একটা কুহককে পৃথিবীর সমস্ত স্থূল জিজ্ঞাসা সন্দেহ অজ্ঞতা ও জ্ঞানের হাত থেকে বাঁচিয়ে চায়ের মাঠ থেকে চায়ের পাহাড়ে, চায়ের পাহাড় থেকে আকাশে, আকাশের থেকে ধানের মাটিতে জঙ্গলে, নদীতে, পাথরে, রোদের তীব্রতার মাখনের মত নরম করে ছড়িয়ে রেখেছে। কোনো এক মেয়ের হাত যেন। কি অলীক মমতাময়ী সে।

ভিজে ভিজে ঘাসে খোঁপা খসে, ছড়িয়ে, মেয়েমানুষদের ঘ্রাণে সমস্ত পৃথিবীটাকে ভরে ফেলে জীবনের সমস্ত উষ্ণতাকে সে যেন স্নিগ্ধ করে ফেলছে।

('মেয়েমানুষদের ঘ্রাণে', জীবনানন্দ সমগ্র ৭ম খণ্ড)

একটা নতুন দিগন্তপ্রদেশে এসে, তাকে ইন্দ্রিয়পর জীবন্ত নিসর্গভাবুকতার স্তরে, প্রায় নোনা মেয়েমানুষদের আঘ্রাণের অনুষঙ্গবহ ক'রে তোলার কূট রহস্যে—অবধারিত ভাবেই আমাদের মনে পড়ার কথা : '…মানুষ যেমন করে ঘ্রাণ পেয়ে আসে তার নোনা মেয়েমানুষের কাছে / হরিণেরা আসিতেছে…'। —তো সেই ইশারাময় অনুষঙ্গসূত্রেই, অতঃপর, এই গল্পের ভিতরে গল্পটির 'ক্যাম্পে' কবিতায় ঢুকে-পড়বার জন্য জীবনানন্দ

নিজেই আমাদের আমন্ত্রণ জানান এই বলে : 'এখানে বনের কাছে ক্যাম্প আমি ফেলিয়াছি…'।

অবশ্য পরিস্থিতি এমনই যে এই 'মেয়েমানুষদের ঘ্রাণে' গল্পটির একটি পূর্বনির্দিষ্ট নেপথ্যালোকে সেই কবিতার 'ক্যাম্পে' আমাদের ঢুকতে হবে এইবার। জীবনানন্দের নায়ক প্রবোধও সে-গল্পের নেপথ্যবিধানে ঢুকে পড়েছিলো একবার। নিরাশ্রয় নায়ক হিসেবেই হয়তো তারও ছিলো এই এক সংগোপন সাধ : 'কোথাও গিয়ে একটু স্থির হয়ে বসতে ইচ্ছা করে।'—আর এইভাবেই, লেখক যেন তাঁর আত্মজৈবনিক অভিজ্ঞতার সূত্রে গড়েন তার এই প্রবোধের মতো একটি সুনির্বাচিত নায়ক চরিত্র। যে-চরিত্র তার একই দেশ-কাল-পরিপ্রেক্ষিতের সংলগ্নতা থেকে একবার 'ক্যাম্পে' কবিতার মতো ন্যারেটিভ ও নাটকীয় এই গল্পের দুইদিকেই যেমন তার প্রবেশ, তেমনি 'মেয়েমানুষদের ঘ্রাণে'-র গল্পেও, আপাতত নাটকীয়তাবর্জিত স্টেটমেণ্ট শুধু; যে-স্টেটমেণ্টে গল্পের ভিতরের গল্পের টোপোগ্রাফি থেকে হরিণ শিকারের আর্কেটাইপ পর্যন্ত হাজার বছরেরও বেশি অন্য-কোনো ক্যাম্প-ইতিহাস প্রায় সেই একই তাৎপর্যে অবিস্মরণীয় আজও। প্রথমে গল্পের স্টেটমেণ্টটাই লক্ষ করা যাক। গল্পের প্রবোধ কী ভাবছে :

> '…গভীর শীতের রাতে শিকারীদের দলে বনের ভিতর একবার ঢুকেছিল সে। ক্যাম্পে সবাই ঘুমিয়ে আছে। বন্দুককে সঙ্গী না করে বনের আশপাশের আস্বাদটাকে যতদূর জমিয়ে নিতে পারা যায়, চাচ্ছিল, ঘুঘু, বনমোরগ বুনোহাঁস, খেঁকশিয়াল, খরগোস ও দু-চারটা হরিণ ও নানারকম পাখির চমক চারদিকে—নক্ষত্র, নিস্তব্ধতা, টপটপ করে শিশির পড়ার শব্দ—শীত, এই সবের ভিতর খড় ঘাস সুতো কুটো আঁশের বিছানার নিবিড় নিরালায় কাকে যেন চমকে দিয়েছে প্রবোধ। দুটো পাখি তাদের মাটিরই উপরকার বাসার থেকে সরু সাদা ডানা টেনে সুবোধকে (প্রবোধকে) দেখছে ; সুবোধেরই (প্রবোধেরই) চমকের অপেক্ষা করছিল, বনের ভিতর আর কোথাও কেমনো ভয় নেই যেন, অস্থিরতার কোনো প্রয়োজন নেই, প্রেমে কোনো বাধা নেই, শান্তির কোনো শেষ নেই—সমস্ত শীতের রাত ভরে পালকে পালক ডুবিয়ে সংসর্গকে বোধ করা—এই এদের। এমন একটা নিশ্চয়তা কি জীবনে পাওয়া যাবে না ? হয়ত ভালবাসাও নয়, গৃহের ভিতর স্থিরতা একটা—

সংসর্গ ও সমবেদনার একটা শান্তি, পৃথিবীর শীতের নিস্তব্ধতার ভিতর নক্ষত্র-নরম বনজঙ্গল, ছায়া, শিশিরের শব্দ, পাখির বাসা, দুটো সাদা ডানার নিরীহ নিবিড় গরমের আরাম, এই সব।'

('মেয়েমানুষদের ঘ্রাণে', জীবনানন্দ সমগ্র ৭ম খণ্ড)

জীবনানন্দের একটি ছোটোগল্পের পটভূমি-পরিবেশ হিসেবে, উত্তর আসামের এই আরণ্যক প্রকৃতি বর্ণনায়—স্বভাবতই কোনো উগ্রতার পরিচয় নেই; বরং অনিঃশেষ শান্তি ও স্নিগ্ধতার সুষমায় সর্বদিক ভরে আছে। তিনসুকিয়া থেকে মাকুমের দিকে যেতে-যেতে, প্রবোধ দেখছে : রেললাইনের দুধারে কেবলি ধানখেত আর চা বাগান। দেখে প্রবোধের মনে হচ্ছে—'ধানের চায়ের পরিষ্কার পরিপূর্ণ ভাঁড়ারের ভিতরেই যেন কোনো ঘুম ঘুমিয়ে রয়েছে।'

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'জীবনানন্দের কাব্যসংগ্রহ'-এ, 'ক্যাম্পে'-র দুটি 'আনুষঙ্গিক কবিতা' ছাপা হয়েছে। কৌতূহলী পাঠক নিশ্চয় লক্ষ করতে ভুলবেন না, গল্পের বর্ণনায় সে-প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পর্কে—লেখক ঠিকই বলেছেন—'চারদিককার জাদুর বাতাস এখানে।' 'ক্যাম্পে'-র আনুষঙ্গিক কবিতায় বরং একই সঙ্গে বর্ণনার ভাষার স্পষ্টতা-প্রত্যক্ষতা আর অপার রহস্যময়তা—দুই-ই মিলে মিশে আছে। ১ নম্বর 'আনুষঙ্গিক কবিতা'র মূল 'ক্যাম্প' কবিতার স্থানকাল-পটভূমির স্পষ্ট উল্লেখলক্ষণীয়।

সে এক শীতের রাতে—জ্যোৎস্নার রাতে
প্রথম যৌবনে আমি কোনো এক শিকারীর সাথে
ক্যাম্পে ছিলাম শুয়ে আসামের জোকাই-জঙ্গলে

ডিব্রুগড়ের কাছাকাছি জোকাই টী এস্টেট, জোকাই ফরেস্ট আছে ব'লে শুনেছি। ২ নম্বর আনুষঙ্গিক কবিতায় 'নাহারের ঘন বন'-এর উল্লেখও পাওয়া যাচ্ছে। আসামের ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের ডেপুটি কনজারভেটর ছিলেন জীবনানন্দের এক কাকা। থাকতেন ডিব্রুগড়ে। এই কাকার কাছে হয়তো তিনি একাধিকবার এসে থাকবেন এবং সম্ভবত তাঁরই আনুকূল্যে জোকাই জঙ্গলে শিকারীদের ক্যাম্পে বনের ভিতর রাত কাটিয়েছেন। পাঠক এই প্রসঙ্গে দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত জীবনানন্দ দাশের

কাব্যসংগ্রহ-এ (১৯৯৩) মূল 'ক্যাম্পে'র 'আনুষঙ্গিক কবিতা'-দুটি (দ্র° ঐ পৃ ৭৮৮-৭৯১) অবশ্যই প'ড়ে দেখবেন।

॥ চার ॥

আমার অন্য একটি লেখায়, প্রায় একই সময়ে রচিত জীবনানন্দের এই গদ্য পদ্যের থিমেটিক মিলের আদি উৎস হিসেবে, আমি হরিণ শিকার বিষয়ক ভুসুকু-র একটি চর্যাগানের (দ্র° চর্যাগীতিকোষ-৬) উল্লেখ করি। থিমের আদি রূপকল্প উপস্থাপনায়, অবশ্য তারও ঢের আগে, আমাদের সময়ের অন্যতম এক প্রধান গল্পকার দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ষাটের দশকের গোড়ায় লিখেছিলেন তাঁর 'চর্যাপদের হরিণী' নামক বিখ্যাত গল্পটি। সেই রচনার অন্তত তিন দশক আগেই তো জীবনানন্দ দাশ লেখেন তাঁর 'ক্যাম্পে' কবিতা এবং মেয়েমানুষদের ঘ্রাণে' ছোটোগল্প। তা, উক্ত গল্প-কবিতার রচনাকাল ১৯৩১; যদিও কবিতাটি ('ক্যাম্পে') প্রথম ছাপা হয়েছিলো ফেব্রুয়ারি ১৮৩২-এর ত্রৈমাসিক 'পরিচয়'-এ।

এখন, দীপেনের গল্পটি পাঠকের ঠিকমতো মনে আছে কিনা জানি না। কিন্তু দীপেন তো লিখেছিলেন:

> 'হরিণ, হরিণীকে খুঁজছে। জীবন শুদ্ধতা খুঁজছে। আমাদের বুবা নায়ক মঞ্জুশ্রীকে খুঁজছে।...
>
> কিন্তু বলা বাহুল্য সে খুঁজে পাবে না। কারণ তাকে পেতে নেই।... কারণ, অপনা মাংসে হরিণা বৈরী। নিজের মাংসটুকুর জন্যই পৃথিবীর সঙ্গে তার তাবৎ শত্রুতা। তাই কেউ নিলয় জানে না। খোঁজে, কারণ খোঁজাই তো পাওয়া। চিরকাল পাবে, কারণ চিরকাল খুঁজবে। অন্বেষার সিম্বল আমার চর্যাপদের হরিণী।'
>
> ('চর্যাপদের হরিণী'—দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)

অন্যদিকে, জীবনানন্দের 'ক্যাম্পে' কবিতা ও 'মেয়েমানুষদের ঘ্রাণে' ছোটোগল্প—দুটি রচনাই তো ১৯৩১-এর। তার মধ্যে জীবনানন্দের ছোটোগল্পটি, তার রচনাকালের ৬১টি বছর পর প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস্-এর দৌলতে, ১৯৯২-এ প্রথম লোকচক্ষুর গোচরে এলো। সেক্ষেত্রে, জীবনানন্দও তো এই বলতে পারতেন: আমার নায়কও কেমন-একটা নিরাশ্রয়তার আতীত থেকেই ভাবছিলো:

'বিয়ে—কোনোদিনও করবে না কি সে? নীড় বাঁধবে না কোনোদিন? কোথাও গিয়ে একটু স্থির হয়ে বসতে ইচ্ছা করে।

('মেয়েমানুষদের ঘ্রাণে', জীবনানন্দ সমগ্র, ৭ম খণ্ড)

দেখা যাচ্ছে, এই 'নীড় বাঁধবার' আকুতি মানুষের খুবই সাবেকি কামনাবাসনার ব্যাপার। অতএব, 'নীড়' শব্দানুষঙ্গে, ব্যক্তিজীবনের স্বরচিত আশ্রয়সন্ধানের আঙ্গিক বিষয়ে—'কোথাও গিয়ে একটু স্থির হয়ে বসতে'-চাওয়ার শান্তিসুষমা, কেমন প্রতীকী-চিত্রকল্পে 'মেয়েলি হাতের স্পর্শ'ত পায়। সেদিক থেকেও—একটি ছোটোগল্পের নামকরণ হিসেবে—'মেয়েমানুষদের ঘ্রাণে'-র ইন্দ্রিয়প্রাধান্যও—প্রতীকী তাৎপর্যে, টোপোগ্রাফিকাল। আসাম ভূপ্রকৃতির নমনীয়তা, তথা জলবায়ুর আর্দ্রতাগুণে, প্রকৃতিতে নারীসুলভ তেলতেলে মুখেরই কমনীয়তার মতন সে দৃশ্যকল্প প্রতিমায়, প্রাণ আরোপিত হয়।

জীবনানন্দের মতো লেখকের প্রকৃতিভাবুকতায়, অতঃপর, তাঁর এই ছোটোগল্পের নায়ক চরিত্রকে তো 'ক্যাম্পে' কবিতার অনুসরণে, 'পুরুষ হরিণ'ই বলতে হয়। যে বলতেই পারে : 'হরিণা হরিণীর নিলয় ণ জানী।' আর সেই 'পুরুষ হরিণেরই' জন্য কিনা—একেকটা 'সোনার হরিণের' সাবেকি বন্দোবস্ত। ঐ 'সোনার হরিণ' কোন্ মায়ামৃগের আদি রূপকল্পে, আজও অনায়াসেই জীবনানন্দীয় 'খাই হরিণীর' সমমাত্রিক হয়ে ওঠে। 'পুরুষ হরিণ'কে সে একই সঙ্গে ফাঁদে ফেলে ও মুক্তির ইশারা জোগায়। দেখি, রবীন্দ্রনাথ ও সে কবেই 'সে-কোন্ বনের হরিণ'কে মনস্থ ক'রে 'গীতিরাগের' মূর্ছনাতে একেবারে মাতিয়ে দিয়েছিলেন। সে-গীতিরাগের 'খুর ণ দীস অং' আর তা-ই ভুসুকুর রহস্যময় রাগনরচর্যা।

একটা ছোটোগল্পের অনুপুঙ্খ বাস্তবতার প্রতীকী সংহতির দিকটি, কীভাবে গল্পের নামকরণ থেকেই শুরু হয়ে যায় ও একটু-একটু করে গড়ে উঠতে থাকে, এবং গল্পে, সমানধর্মা ও পরস্পর বিরুদ্ধ চরিত্রসংস্থানের ডায়লেকটিক্স্ও, সেই গড়নের প্রভাবে একই সঙ্গে হয় বিস্তীর্ণ ও গভীর ও স্বয়ংসম্পূর্ণ; আমার নিজের ধারণা, জীবনানন্দ দাশের উপস্থিত এই 'ক্যাম্পে' কবিতাটি (মূল ও 'আনুষঙ্গিক' দুটিসহ) এবং তারই সম্পূরক এই 'মেয়েমানুষদের ঘ্রাণে' গল্পটি যেন তারই খুব কাজের দৃষ্টান্ত।

কীভাবে, তা আরেকটু বলি।

মূল 'ক্যাম্পে' কবিতাটির অন্তর্লীন বক্তব্য ধ'রে, আমাদেরও হয়তো লক্ষ ক'রে যেতে হয়ঃ

কোথাও হরিণ আজ হতেছে শিকার ;
বনের ভিতরে আজ শিকারীরা আসিয়াছে
আমিও তাদের ঘ্রাণ পাই যেন,···

এখানে 'বক্তব্য' বলতে, শিকারের মূল লক্ষ্যবস্তু, তথা বিষয় কিন্তু সেই চর্যাপদের 'হরিণী'নয়, 'হরিণা'—অর্থাৎ জীবনানন্দ-বর্ণিত 'পুরুষ হরিণও।' আর উপরোক্ত উদ্ধৃতিতে, কবি যখন বলেনঃ 'আমিও তাদের ঘ্রাণ পাই যেন', তখন 'তাদের' বলতে, চর্যাপদের হরিণীদেরই ঘ্রাণ বোঝাচ্ছে। 'পুরুষ হরিণ' তাদেরই জৈব আকর্ষণে এসে পড়ছে। 'ক্যাম্প' কবিতাটির ভাষায়ঃ 'মানুষ যেমন ক'রে ঘ্রাণ পেয়ে আসে তার নোনা মেয়েমানুষের কাছে / হরিণেরা আসিতেছে।'

কবিতাটির এই মূল, কনটেক্সটের সঙ্গে সেই অদ্ভুত নামের ('মেয়ে-মানুষের ঘ্রাণে') ছোটোগল্পটির বিষয়বস্তুর সিমেটিক মিলটাই এখানে লক্ষ্য করার মতো। একটা প্রান্তিক রাজ্যের নদী পাহাড় চা-বাগান অরণ্যানীর স্নিগ্ধ-শ্যামলিম নৈসর্গিক সংমিশ্রণের সে আর্দ্র ভূপ্রকৃতিকে ইন্দ্রিয়সংবেদী 'মেয়েমানুষদের' আঘ্রাণ-পর্যন্ত এক মোহঘন প্রতীকী-চিত্রকল্পের মতোই হাতছানি ও আকর্ষণের তীব্রতা বলেও মনে হয়, তখন এই ভাবিঃ 'যেন কোনো ঘুম ঘুমিয়ে রয়েছে।' অর্থাৎ, দৃশ্যতই ঘুমিয়ে-থাকা প্রকৃতিতে, প্রভাতের মতো উচ্চশিক্ষিত বেকার যুবকের জাগ্রত অনুসন্ধিৎসায়—তীব্র ইন্দ্রিয়বেদী 'মেয়েমানুষদের ঘ্রাণে'-র অনুষঙ্গটিই আপাতত এই ছোটোগল্পের টোপোগ্রাফিও যদি হয়—তো হোক। সচরাচর তেমনি আর হয়ে-ওঠে কোথায়! ছোটোগল্পের প্রকৃতি-ভাবুকতায় টোপোগ্রাফি হিসেবেই আসামের নদ-নদী পাহাড় অরণ্যানী চা-বাগান ঘর-গেরস্থালির আশপাশের কতোই জলা আর বনজঙ্গল সুষমার উপমান যদি কোনো নারীপ্রকৃতি হয়, তবে তো বিশেষভাবে তা দেশকালের আর্থ-সামাজিক চাপেই কোনো জৈবপ্রতীকের আর্কেটাইপও হতে পারে। আর এই তাৎপর্য ও গুরুত্বেই, চর্যাপদের হরিণ-হরিণীর 'নিলয়' সন্ধানের রূপকার্থকেও, যুগনির্বন্ধেই, কমবেশি অর্থগত তারতম্যে—মাত্রান্তরিত হতে হয়। তখন চর্যার 'আপণা মাংসে হরিণা বৈরী'-র প্রবচনাত্মক অর্থসাপেক্ষতাকেই সে-

হরিণ অবশ্যই পুরুষ হরিণ হয়েই পৌঁছয় রবীন্দ্রনাথে। চর্যায় ভুসুকু দেখেছিলেন তাঁর পুরুষ হরিণের এমন-এক 'গতিরাগ'—যার ফলে—'হরিণার খুর ন দীসঅ।' রবীন্দ্রনাথ সে-চর্যাপদের (পুরুষ) হরিণটিকেই মনস্থ করেছিলেন তাঁর মনের বনের হরিণ ব'লে :

সে কোন্ বনের হরিণ ছিল আমার মনে,
কে তারে বাঁধলো অকারণে।
গতিরাগের সে ছিল গান, আলোছায়ার সে ছিল প্রাণ,
আকাশকে সে চমকে দিত বনে।
কে তারে বাঁধলো অকারণে॥

বস্তুত রবীন্দ্রনাথই কিন্তু ভুসুকু-র হরিণের 'খুর দেখতে না পাওয়া'র রহস্যভেদ করেন প্রথম 'গতিরাগ' শব্দটি ব্যবহার ক'রে : সম্ভবত জীবনানন্দ দাশও চর্যাগানের সার্বিক ঐতিহ্য এবং তারও রাবীন্দ্রিক উত্তরাধিকারের নিকটতম প্রতিবাসী। নিশ্চয় রবীন্দ্র-ব্যবহৃত 'বনের হরিণ'-এর 'গতিরাগের …গান' তিনিও ঠিক লক্ষ্য করেছিলেন। এরপর, ভিন্নতর সমাজবন্ধনের মাত্রায়, রবীন্দ্রনাথের 'মায়াবনবিহারিণী হরিণী'ই কি শেষঅব্দি একদা ঔপনিবেশিক পরাধীন ভারতের ট্র্যাজিক চৈতন্যে—'সোনার হরিণ' হয়ে এলো ? অন্তত, জীবনানন্দ দাশের ১৯৩১-৩২ এর সময়-পরিসরের 'ক্যাম্পে' কবিতাটির 'ঘাইহরিণী' তো মায়ামৃগী 'সোনার হরিণ'-এরই স্তরের সমমাত্রিক একটি অবমূল্যায়ন, যেখানে 'ঘাইহরিণী'ও তার অজ্ঞাতসারে, সামাজিক শিকারব্যবস্থার 'টোপ' হিসেবেই ব্যবহৃত। আর সেই ষড়যন্ত্রশীল সমাজ-ব্যবস্থার ফাঁদে প'ড়ে, একের পর এক পুরুষ হরিণ শিকারীর গুলিতে প্রাণ হারায় এবং হরিণীর 'নিলয়ে' পৌঁছনোর স্বপ্ন ও সাধনা তার সবই শেষপর্যন্ত অপূর্ণ থেকে যায়।

হয়তো জীবনানন্দ দাশের সমকালীন একটি গল্প ও কবিতার আদিরূপ-কল্প হিসেবেই মায়ামৃগের আর্কেটাইপ 'মেয়েমানুষদের ঘ্রাণে'-র 'জাদুর বাতাসে'—প্রবোধের মতো এক বেকার যুবককে বৃথাই পথ ভুলিয়ে টেনে আনে স্বপ্নকুহকেরই চূড়ান্ত অনিশ্চয়তায় ; পরিণাম যার 'মৃত্যু'ই। জীবনে স্থিতিস্থাপকতা আর প্রেম-প্রতিষ্ঠার 'মৃত্যু' যেমন, একজন যুবকের যাবতীয় উদ্যমের 'মৃত্যু'ও তেমনি এক ট্র্যাজিক শোচনীয়তা। তার স্বপ্ন ও সাধনায় বিধৃত যে জীবন-অন্বেষা, যুবক তাকে খুঁজতে বেরিয়েও, হয়তো নাকের

বদলে নরক পেলেও পেতে পারে—কিন্তু সে-প্রার্থিত 'জীবন' কে পাবে না। এবং না-পেয়েও, সে তবু ঐ জীবনকেই খুঁজবে। নিরাশ্রয়তার অবসাদে, তিল তিল ক'রে, তার সমস্ত চেষ্টা ও পরিশ্রম কি তবে এইভাবেই নিষ্ফল হতে হতে একদিন শুকিয়ে যাবে সে? শেষে, শুকনো কাঠ-হয়ে—গাছটা তার নিজের চিতায় শুয়েই জ্বলবে একদিন?

॥ পাঁচ ॥

জীবনানন্দ দাশের প্রায় একই সময়ে লেখা 'ক্যাম্পে'-র মতো একটি কবিতা এবং 'মেয়েমানুষদের ঘ্রাণে'-র মতো একটি ছোটোগল্প, খুব সম্ভব, কবিতারই মৌলিক বাস্তব থেকে সে-ছোটোগল্পের প্রতীক ধর্মিতার সঞ্চার ঘটিয়ে নেয়। তাদের থিমেটিক মিলটুকুও সে সৃষ্টির অন্তর্গত একটা নিঃসহায়তা-নিরাশ্রয়তার সুর'—তা অন্তত দু'ভাবে বলা হয়েছে। ছোটো-গল্পের বলার ধরন প্রধানুগত ন্যারেটিভেরই মতো; কিন্তু সাদাসিধা আপাত-সরল ভাষার অন্তর্লীন স্তরে, ব্যক্তিজীবন ও তার বিশুদ্ধ জীবিকা-সন্ধানের উদ্দেশ্যে—'সোনার হরিণের' অর্থাৎ মায়ামৃগী বা মাইহরিণীর প্রতীকটি অতীব মোক্ষম। রবীন্দ্র-চিত্রিত আমাদের 'সোনার হরিণ'-এর অনুষঙ্গটিই কি অবশেষে, জীবনানন্দের কবিতার 'মাই হরিণী'-র চূড়ান্ত ট্রাজিক পরিণতি? রাবীন্দ্রিক 'মায়াবনবিহারিণী হরিণী' বা 'সোনার হরিণের'-ই প্রায় সমার্থক মোটিফ আছে জীবনানন্দীয় 'মাই হরিণী'তে। আর 'মাই হরিণী'-র ডাকে, শিকার ও শিকারীর কোনো নির্বন্ধ ভূমিকা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। অথচ এই 'শিকার' আর্কেটাইপাল; এবং তার বন্ধময়তারই জন্য শিকার-শিকারীর দ্বিমাত্রিক আক্রমণের ও আক্রান্ত-হওয়ার পরিণামই কিন্তু সেই সৃষ্টির ভিতরকার 'নিঃসহায়তা-নিরাশ্রয়তার' সুর। আশ্চর্য, তাঁর 'মেয়েমানুষের ঘ্রাণে'-র গল্পে, সমস্ত শিকারটাই নেপথ্য পটভূমির মতো থেকে গেলো; থেকে, 'এইখানে পড়ে থেকে একা একা'···জীবনানন্দ লেখেন:

> ক্যাম্পের বিছানায় শুয়ে থেকে শুকাতেছে তাদের হৃদয়
> কথা ভেবে—কথা ভেবে—ভেবে।

অতঃপর, ঐ ১৯৩১-এর ছোটোগল্পটির শেষ থেকে—'বনলতা সেন'-পর্যায়ের 'শিকার'-পর্যন্ত ঘুরে এসে, ফের গল্পটিতেই পড়ি:

"হরেন—'কেন, আবার জ্বর এল ?

—'ইড়বিশ ইড়বিশ করছে।'

—'বিছানায় শুয়ে থাক গে।'

—'কে সঙ্গে শোবে ?'

—'কেউ না।' ঠাট্টা ও অভিনয়ের সুরে—'আমার কে আছে হরেন ?'

—'আমি আছি।'

—'তোমার কে আছে ?'

—'তুমি আছ।'

—'বেশ, আর কিছু চাই না, তাহলে একটা বিড়ি জ্বালানো যাক, টিউবটা দাও ত।'

গোটা দুই কুইনিন গলার ভিতর ছুঁড়ে ফেলে কোঁত কোঁত করে গিলতে গিলতে আমরাংশু বাঘের মুখে পাঁঠার মত চোখ দুটো একবার উলটে নিলে…"—এই অনুভাবটিও তো আসলে সেই শিকারবিষয়ক একটি আদি রূপকল্পই—যা ছোটোগল্পটিতে শেষপর্যন্ত থেকে গেছে।

———

'পরিচয়' ও জীবনানন্দ দাশ

বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য

॥ এক ॥

জীবনানন্দ নিজে 'পরিচয়' প্রসঙ্গে তেমন কোনো মন্তব্য করেন নি। বিভিন্ন গবেষকদের দেওয়া হিসেব অনুযায়ী তাঁর জীবিতকালে এই পত্রিকায় জীবনানন্দের খুব বেশি কবিতাও প্রকাশিত হয় নি। এই প্রকাশনাকে তিনি কতটা গুরুত্ব দিয়েছিলেন বলা শক্ত। কারন, তাঁর কাছে একসময় পর্যন্ত কল্লোল, কালিকলম, প্রগতি, কবিতা, নিরুক্ত বা পূর্বাশার মতো পত্রিকা ছিল অনেক গুরুত্বপূর্ণ। 'ময়ূখ' পত্রিকার জীবনানন্দ স্মৃতি সংখ্যায় মুদ্রিত তাঁর ২.৭.৪৬ তারিখে লেখা প্রাসঙ্গিক চিঠিটি এ ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করে। 'কল্লোলে' তাঁর প্রথম কবিতা ছাপা হয় নি, 'কিন্তু কল্লোলেই প্রথম কবিতা ছাপিয়ে ভালো লেগেছিল।…বাংলা সাহিত্যে কল্লোল-আন্দোলনের প্রয়োজন ছিল। সাহিত্য ও জীবনের পুরনো সিঁড়ি দুয়ে মিলে এক হয়ে এক পরিপূর্ণ সমাজসার্থকতার দিকে চলেছে মনে হয়; কল্লোলের সাময়িকতা সেই সিঁড়ির একটা দরকারি বাঁক।' লক্ষণীয়, কল্লোলের সাহিত্যআন্দোলনের 'পরিপূর্ণ সমাজসার্থকতা'র দিকটিকে তিনি স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। কিন্তু কল্লোল ও কালিকলমের দিন যে শেষ হয়ে আসছিল তা বুঝতেও তাঁর কোনো অসুবিধে হয় নি। 'কল্লোল কালিকলম ক্রমেই বিরক্ত হয়ে যাচ্ছিল।'

কাব্য-আন্দোলন এরপর প্রথমে বুদ্ধদেব বসু-র 'প্রগতি' এবং পরে 'কবিতা' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। এ দুটি পত্রিকাতেই কাব্য রচনায় নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ পেয়েছিলেন জীবনানন্দ, 'অতএব সাহস ও সততা দেখবার সুযোগ লাভ করে চরিতার্থ হলাম—বুদ্ধদেববাবুর বিচারশক্তির ও হৃদয়বুদ্ধির; আমার কবিতার জন্য বেশ বড়ো স্থান দিয়েছিলেন তিনি প্রগতি-তে এবং পরে কবিতা-য় প্রথম দিক দিয়ে। তারপরে বনলতা সেন-এর পরবর্তী কাব্যে আমি তাঁর পৃথিবীর অপরিচিত, আমার নিজেরও পৃথিবীর বাইরে চলে গেছি বলে মনে করেন তিনি।'

এরপর জীবনানন্দের আশ্রয় হয় নিরুক্ত এবং পূর্বাশা পত্রিকা। দুটিরই প্রাণপুরুষ সঞ্জয় ভট্টাচার্য। বুদ্ধদেবের মতোই সঞ্জয় ভট্টাচার্যের মতামতকেও জীবনানন্দ মূল্য দিতেন। তবে, যাঁদের সম্পাদনাকে তিনি গুরুত্ব দিতেন অথবা যাঁদের সাহিত্যিক-মতামত সম্পর্কে তিনি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন তাঁদের মূল্যায়নও সমস্ত ক্ষেত্রে তিনি মেনে নিতে রাজি ছিলেন না। সকলের মাঝে থেকেও তিনি এ সমস্ত ক্ষেত্রে যথার্থই 'একাকী'। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ ঝরাপালক প্রকাশিত হয়েছিল প্রবাসী, বঙ্গবাণী, কল্লোল, কালিকলম, প্রগতি প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতা নিয়ে। দ্বিতীয় গ্রন্থ 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' প্রস্তুত হয় মূলত প্রগতি পত্রিকায় ১৩৩৪-১৩৩৬ এই তিনবছরে প্রকাশিত লেখা নিয়ে। এই বইয়ের প্রথম সংস্করণের সতেরোটি কবিতার মধ্যে একটি হল 'ক্যাম্পে।' এই কবিতাটির মাধ্যমেই পরিচয়-এর সঙ্গে জীবনানন্দের প্রথম যোগাযোগ।

পরিচয় পত্রিকার ১৩৩৮-এর মাঘ সংখ্যায় 'ক্যাম্পে', কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল। পত্রিকাটি সম্পর্কে যে তাঁর আগ্রহ জন্মাচ্ছিল তারে প্রমাণ আছে বিষ্ণু দে-কে কয়েক মাস আগে লেখা চিঠিতে। প্রাথমিক অংশটুকু এইরকম, 'পরিচয় কবে বেরুল? কি আছে?' দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, 'পরিচয় পত্রিকায় জীবনানন্দের প্রথম কবিতা ক্যাম্পে বিষ্ণু দে-ই চেয়ে নিয়েছিলেন, এবং চেয়ে নেওয়া লেখা বলে সম্পাদকীয় অনাগ্রহ সত্ত্বেও পরিচয় ১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যায় তা ছাপা হয়েছিল।' কবিতাটিতে তখনকার জীবনানন্দকে চেনার মতো এই ধরনের পংক্তি আছে—

মৃত পশুদের মতো আমাদের মাংস লয়ে
আমরাও পড়ে থাকি,
বিয়োগের-বিয়োগের-মরণের মুখে এসে পড়ে সব
ঐ মৃত মৃগদের মতো—
প্রেমের সাহস সাধ স্বপ্ন লয়ে বেঁচে থেকে ব্যথা পাই, ঘৃণা-মৃত্যু পাই,
পাই না কি?

বস্তুতপক্ষে, এই কবিতাটি দিয়েই জীবনানন্দের বিরূপ-সমালোচনারও সূত্রপাত। একটু ঘুরিয়ে বলা যেতে পারে যে তখন থেকেই তিনি কলকাতার বিদগ্ধ সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে থাকেন। অশোক মিত্র কবিতা-পত্রিকায় জীবনানন্দ স্মৃতি-সংখ্যায় লিখেছিলেন, 'প্রগতি-কল্লোলের উদ্দাম

অধ্যায়ে জীবনানন্দের দিকে তাকাবার মতো অবসর কারো ছিল না। অনেক ব্যক্তিত্বশালী বিচিত্র পুরুষেরা তখন অঙ্গন মুখর করে ছিলেন। বরিশালের নির্জন আকাশ নিয়ে হিজিবিজি কল্পনাকাকলি তাই একপাশে চুপচাপ পড়ে থেকেছে। আরো বছর দশেক বাদে 'কবিতা' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে যে কাব্য আন্দোলন শুরু হ'লো, তারও প্রধান স্রোত থেকে তিনি বাদ পড়ে গেলেন। (আমাদের কবি, কবিতা, পৌষ ১৩৬১)।' তৎকালীন 'পরিচয়' পত্রিকা সম্পর্কেও একথা সত্য, সেখানকার অভিজাত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের কাছে তাঁর আন্তরিকভাবে গৃহীত হবার কথা নয়।

শনিবারের চিঠির বিখ্যাত 'সংবাদ সাহিত্য' শিরোনামে সজনীকান্ত দাস কেবল 'ক্যাম্পে'-কবিতাটিকেই ছিন্নভিন্ন করলেন না, এই জাতীয় 'অশ্লীল' কবিতা ছাপানোর জন্য পরিচয়-এর পৃষ্ঠপোষকদেরও তিরস্কার করলেন, 'পরিচয়' একটি উচ্চশ্রেণীর কালচার বিলাসীর ত্রৈমাসিক পত্রিকা। রবীন্দ্রনাথ ইহাকে সস্নেহ অভিনন্দন জানাইয়াছেন এবং হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় ইহাতে লিখিয়া থাকেন। রবীন্দ্রনাথ ও হীরেন্দ্রনাথ প্রমুখ ব্যক্তিরা যে কাগজের সম্পর্কে সম্পর্কিত, তাহাতে কি প্রকার জঘন্য অশ্লীল লেখা বাহির হইতে পারে ও হয় তাহার একাধিক 'পরিচয়' দিয়াছেন। 'ক্যাম্পে' তাহার চূড়ান্ত নমুনা।' কবিতাটি লেখার জন্য অশ্লীলতার দায়ে তাঁর সিটি কলেজ থেকে চাকরি গিয়েছিল এটা অচিন্ত্যকুমার ও বুদ্ধদেব বসুদের কল্পনা, বাস্তব সত্য নয়। কিন্তু অভিযোগ এতই প্রবল ছিল যে স্বয়ং জীবনানন্দকে আত্মপক্ষ সমর্থনে নামতে হয়েছিল, 'কিন্তু তবুও ক্যাম্পে অশ্লীল নয়। যদি কোনো একমাত্র স্থির নিষ্কম্প সুর এ কবিতাটিতে থেকে থাকে তবে তা জীবনের-মানুষের-কীট-ফড়িঙের সবার জীবনেরই নিঃসহায়তার সুর। সৃষ্টির হাতে আমরা ঢের অসহায়-ক্যাম্পে কবিতাটির ইঙ্গিত এই এইমাত্র।' পরিচয়-এ প্রকাশিত কবিতার সমর্থনে জীবনানন্দকে কলম ধরতে হয়েছিল এই প্রসঙ্গে একথাটা মনে রাখাই জরুরি।

পরিচয় যে ক্রমশ জীবনানন্দকে গুরুত্ব দেওয়া সুরু করেছিল তাঁর প্রমাণ দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ ধূসর পাণ্ডুলিপি-র গিরিজাপতি ভট্টাচার্য-কৃত সমালোচনা (বৈশাখ, ১৩৪৪)। এখানে শনিবারের চিঠি-র ব্যক্তিগত আক্রমণ ছিল না, বরং জীবনানন্দের স্বাতন্ত্র্যটি চিহ্নিত করার প্রচেষ্টা ছিল। গিরিজাপতি 'ক্যাম্পে' কবিতাটির মধ্যেই তাঁর কাব্যপ্রতিভার সন্ধান পেয়েছিলেন। তাঁর

কবিতা সম্পর্কে সমালোচকের সাময়িক সিদ্ধান্ত, 'জীবনানন্দের কবিতার বৈশিষ্ট্য শব্দ স্পর্শ রং রূপ গন্ধের অনুভূতিমুখর বাণী। এগুলি ঠিক সোজাসুজি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতি নয়-তিনি কল্পনার সঞ্জীবনী মন্ত্রে অনুভূতিমুখর। এটুকু সত্যই বড় অভিনব।' 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' পড়ে বুদ্ধদেব বসুর মনে হয়েছিল, 'এ সব কবিতা প'ড়ে পাঠকেরা স্বতঃই উপলব্ধি করবেন যে বাঙলা কাব্যের ক্ষেত্রে এক অপূর্ব শক্তির আবির্ভাব হয়েছে (কবিতা, চৈত্র ১৩৪৩)।' আর গিরিজাপতি পরিচয়-এর পাতায় একই গ্রন্থ সম্পর্কে লিখেছিলেন, 'জীবনানন্দের কাব্যে ভরসার বস্তু আছে, আশা করি আজ যার উন্মেষ দেখা যাচ্ছে ভবিষ্যতে তা ব্যর্থ হবে না।' কেবল বুদ্ধদেব বসুরাই জীবনানন্দকে বাঙালী পাঠকদের চেনান নি।

১৩৪৪-এর কার্তিক সংখ্যায় বেরিয়েছিল 'সমুদ্রচিল' এটি ধূসর পাণ্ডুলিপির পর্যায়ের কবিতা। জীবনানন্দ নিজে তাঁর জীবিতকালে প্রকাশিত কোনো গ্রন্থেই এটিকে স্থান দেন নি। 'সমুদ্র চিলের সাথে আজ এই রৌদ্রের প্রভাতে / কথা বলে দেখিয়াছি আমি,' এই জাতীয় পংক্তি তখন তিনি আর তেমন লিখছিলেন না। এরপর পরিচয়-এ ১৩৪৫-এর চৈত্র সংখ্যায় দেখা যাচ্ছে জীবনানন্দের পরপর তিনটি কবিতা, গোধূলি সন্ধির নৃত্য, সেইসব শেয়ালেরা এবং সপ্তক। প্রায় একবছর বাদে ছাপা হল নাবিক (ফাল্গুন ১৩৪৬)। সবকটি কবিতাই 'সাতটি তারার তিমির' বইয়ে পাওয়া যাবে। এই বইটি থেকেই জীবনানন্দের কবিমানসের দিক-পরিবর্তনের পালা, তিমিরবিলাসী থেকে তাঁর তিমিরবিনাশী হবার দিকে পদক্ষেপ। তাই পরিচয়-এর পাতায় তখন এইসব স্মরণীয় পংক্তি পাওয়া গিয়েছিল।

সেইখানে যূথচারী কয়েকটি নারী
ঘনিষ্ঠ চাঁদের নীচে চোখ আর চুলের সংকেতে
মেধাবিনী—দেশ আর বিদেশের পুরুষেরা
যুদ্ধ আর বাণিজ্যের রক্তে আর উঠিবে না মেতে।

(গোধূলিসন্ধির নৃত্য)

অথবা

তবু তৃপ্তি নেই। আরো দূরে চক্রবাল হৃদয়ে পাবার
প্রয়োজন রয়ে গেছে-যতদিন স্ফটিক-পাখনা মেলে বোলতার ভিড়
উড়ে যায় রাঙা রৌদ্রে; এয়ারোপ্লেনের চেয়ে প্রমিতিতে নিটোল সারস

নীলিমাকে খুলে ফেলে যতদিন, ফুলের বুনুনি থেকে আপনাকে

মানবহৃদয় ;

উজ্জ্বল সময়-ঘড়ি-নাবিক-অনন্ত নীর অগ্রসর হয়। (নাবিক)

১৩৪৭-এর আশ্বিন সংখ্যায় প্যারাডিম এবং অগ্রহায়ণে প্রকাশিত হল রবীন্দ্রনাথ। দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় যে তালিকা দিয়েছেন তাতে দেখা যাবে যে তাঁর জীবিতকালে এই বোধ হয় পরিচয়-এ প্রকাশিত জীবনানন্দের শেষ কবিতা। (দ্রষ্টব্য : জীবনানন্দ দাশের কাব্য সংগ্রহ : কবিতা নাম ও প্রকাশ সূচী)। 'রবীন্দ্রনাথ' কবিতাটির একটু আলাদা উল্লেখের প্রয়োজন আছে। যিনি রবীন্দ্রনাথের থেকে অনেক দূর দিয়ে এতকাল হাঁটছিলেন এখানে তাঁর যেন মহান পূর্বসূরীর কাছে নিজের অসম্পূর্ণতার অকুণ্ঠ স্বীকৃতি—

পতঞ্জলি, প্লেটো, মনু, ওয়িজেন হোমরের মতো
দাঁড়ায়ে রয়েছ তুমি একটি পৃথিবী ভাঙা-গড়া শেষ করে দিয়ে, কবি,
দানবীয় চিত্রদের অন্তরালে আপনার ভাস্বরতা নিয়ে ;
নিকটে দাঁড়ায়ে আছে নিবিড় দানবী।
অথবা ছবির মতো মনে হয় আবার অন্নপানদোষে ম্লান চোখে ;
অল্প আলোকের থেকে পুরাণপুরুষ সব
চলে যায় অনুমের অজের আলোকে।

পরিচয়-এর এই কবিতায় রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কবির এই মুগ্ধতা এবং সম্ভ্রম আকস্মিক নয়। রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণের পরই বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ পত্রিকায় (১৩৪৮) জীবনানন্দ যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন তাতে সমসাময়িক কোন কোন আধুনিক কবির রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করে এলিয়ট-ভজনার প্রতি মৃদু কটাক্ষ আছে। 'রবীন্দ্রনাথ বুর্জোয়া সভ্যতার ভিতর লালিত হলেও তার প্রতীক যে তিনি কখনই নন বরং আমাদের দেশে সেই সভ্যতার প্রধান ও প্রখর সমালোচক যে তিনিই তাঁর জীবন ও পলিটিক্‌স্, তাঁর সমাজসাম্যবাদ ও সাহিত্য দীর্ঘকাল ধরে তা প্রমাণ করে আসছে। ওদিকে পাউন্ড ও এলিয়টও বুর্জোয়া সভ্যতার জীব এবং রবীন্দ্রনাথের চেয়ে কখনোই সেই সভ্যতার তীব্রতর সমালোচক নন, আধ্যাত্মিক সত্যে এলিয়টও গভীর বিশ্বাসী। রবীন্দ্রনাথের উপনিষদের তত্ত্বের মতো রোমান ক্যাথলিক ধর্ম।...জনসাধারণের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ঢের বেশি

সঙ্কুচিত ও উপেক্ষণীয়। তথাপি আমি দেখেছি, বর্তমান বাংলায় কোনো কোনো প্রখ্যাত কবি রবীন্দ্রকাব্যকে মহাসমরের হাতে ছেড়ে দিয়ে এলিয়টকে তাঁদের আচার্য বলে মনে করেন।' উদ্ধৃতিটি দীর্ঘ হল। কিন্তু এই মূল্যবান মন্তব্যটি তখন বা পরেও কেউ কাজে লাগিয়েছেন বলে জানা নেই। এটি তথাকথিত সুররিয়ালিস্ট বা প্রকৃতির কবি জীবনানন্দের লেখা নয়, এটি একজন সমাজ ও কালসচেতন কবিমানসের মন্তব্য। মার্কসবাদীরাও তখন রবীন্দ্রনাথকে এই দৃষ্টিতে বিচার করতে পারেন নি। পরিচয়-এ প্রকাশিত কবিতাটি ছিল এর পূর্বাভাস।

॥ দুই ॥

কোনো পত্রিকায় কয়েকটি কবিতা প্রকাশ এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নয়। কিন্তু পরিচয়-এর পাতায় জীবনানন্দ সম্পর্কিত সমালোচনা অথবা সমর্থন ক্রমশ একটা আলাদা মাত্রা পেয়ে যায়। ইতিমধ্যে পরিচয়-গোষ্ঠির কাছাকাছি তাঁর চলাফেরা কিছুটা সুরু হয়ে গিয়েছিল। ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের পক্ষ থেকে সুভাষ মুখোপাধ্যায়েরা তাঁকে 'কেন লিখি' সংকলনে লেখার জন্য বরিশালে চিঠি পাঠিয়েছিলেন। হিরণকুমার সান্যাল ও সুভাষ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত এই সংকলনে লেখার আমন্ত্রণ পেয়ে তিনি অখুশী হন নি। বিষ্ণু দে-কে চিঠিতে (১৯. ১২. ৪৩) জানিয়েছিলেন, 'সুভাষরা আমাকে কলেজের ঠিকানায় চিঠি দিয়েছিল-সে চিঠিও ঘুরে আজ এসেছে। কেন লিখি-এ সম্পর্কে এত তাড়াতাড়ি আমি কি যে লিখে দেব ভেবে পাচ্ছি না। সুভাষ তিন-চার পৃষ্ঠায় একটা প্রবন্ধ অবিলম্বেই পাঠাতে লিখেছিল, আমি আজকেই খুব তাড়াতাড়ি পৃষ্ঠা তিনেক লিখে দিলাম।' বিষ্ণু দে, হিরণকুমার সান্যাল বা সুভাষ মুখোপাধ্যায়দের সঙ্গে পরিচয়-এর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের কথা অথবা 'কেন লিখি' সংকলনের উদ্যোক্তাদের রাজনৈতিক মতামতও তাঁর অজানা থাকার কথা নয়। তথাপি এঁদের ডাকে সাড়া দিতে তিনি দ্বিধা করেন নি। অবশ্যই তিনি নিজের লেখাই লিখেছিলেন, 'তবুও, কবিতার উপর বাস্তবিক কোনো ভার নেই। কারু নির্দেশ পালন করবার রীতি নেই কবিমানসের ভিতর, কিম্বা তার সৃষ্ট কবিতায় (কেন লিখি)।' অথচ 'কেন লিখি' সংকলনের মুখবন্ধে সম্পাদকেরা লিখেছিলেন, 'এ কথা আজ স্বীকৃত যে

সাহিত্যের ও শিল্পের তাগিদ আসে সমাজ থেকে, মেঘলোক থেকেও নয়, মানুষের অন্তরলোক থেকে নয়।' পরবর্তী রচনা কিন্তু প্রমাণ করেছে যে জীবনানন্দ এই মত একেবারে অস্বীকার করেন নি।

ইতিমধ্যে পরিচয়-এর অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে। ১৯৩১ থেকে ১৯৪৩ এই বারো বছর প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথ দত্ত পরিচয় চালিয়ে এসিছেলেন। ১৯৪৩-এর দ্বিতীয়ার্ধ (শ্রাবণ ১৩৫০) থেকে এর পরিচালনা ভার প্রত্যক্ষভাবে আসে প্রগতি লেখক সংঘের হাতে আর পরোক্ষভাবে এটি হয়ে দাঁড়ায় কমিউনিস্ট পার্টির শিল্প-সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মুখপত্র। যুগ্ম সম্পাদক হলেন হিরণ কুমার সান্যাল ও গোপাল হালদার। জীবনানন্দের উল্লিখিত কবিতা সমূহ অথবা গিরিজাপতির সন্দেহ সমালোচনা সবই প্রকাশিত হয়েছিল সুধীন্দ্রনাথের আমলে। নতুন পর্যায়ে পরিচয়-এর যে দুজন সম্পাদক হয়েছিলেন জীবনানন্দকে তাঁরা কেউই তেমন গুরুত্ব দিতে চান নি। হিরণকুমার সান্যাল 'পরিচয়-এর কুড়ি বছর'-এ কিছুটা হালকাভাবেই লিখেছিলেন, 'জীবনানন্দ দাশের কবিতাও পরিচয়-এ মাঝে মাঝে বেরিয়েছে।' আর গোপাল হালদার তাঁর 'রূপনারানের কূলে'-র দ্বিতীয় খণ্ডে জানিয়েছিলেন,' তখনকার দিনে বরাপলক-এর জীবনানন্দকে কিন্তু আমি গুরুত্ব দিই নি। ধূসর পাণ্ডুলিপি-কে বোধ হয়েছিল উবর নয়।' যেন ডবলু. বি. ইয়েটস্-এর ছায়ায় পথ সন্ধান।' পরিচয়-এর আর এক কর্ণধার হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ও স্বীকার করতে কুণ্ঠা বোধ করেন নি, 'জীবনানন্দের মায়াবী কবিতায় আমার কেমন যেন অস্বস্তি।…এটা আমার এক দুঃখ কবি জীবনানন্দের সঙ্গে কখনো কোনো নিকট সম্পর্ক স্থাপিত হতে না পারার জন্য (তরী থেকে তীর)।'

কিন্তু এই 'নিকট সম্পর্ক' স্থাপিত না হওয়ার দায়িত্ব কিছুটা জীবনানন্দেও বর্তায়। তিনি কোনো সঙ্ঘ বা গোষ্ঠীর সঙ্গেই অন্তরঙ্গতা স্থাপনে আগ্রহী ছিলেন না। তাঁর অত্যন্ত শুভানুধ্যায়ী বুদ্ধদেব বসুও মৃদু অনুযোগ করেছিলেন, 'আমৃত্যু তাঁর কবি জীবনের সঙ্গে যুক্ত থেকেও তাঁর সঙ্গে কোনো ব্যক্তিগত সম্বন্ধ আমি স্থাপন করতে পারি নি, অন্য কেউ পেরেছিলেন বলেও জানি না।…কোনো সাহিত্যিক আলোচনায় মধ্যেও তাঁকে টানতে পারি নি আমরা, কল্লোলের, পরিচয়ের, কবিতার আড্ডা তিনি সযত্নে এড়িয়ে গেছেন।' তাই পরিচয়-এর প্রথম পর্বে মানসিক দূরত্বও বোধ হয় পারস্পরিক অনাগ্র-

হেরই কারণ। রাজনৈতিক দূরেত্ব নয়। হাত বদলের প্রথম পর্যায়ে কোনো দলীয় মতামত পত্রিকার ওপর যে চাপানো হয় নি গোপাল হালদারের এই বক্তব্যই তার প্রমাণ, 'ঐতিহাসিক গতিধারা মনে রেখে বাস্তব-বুদ্ধিতে-স্তর থেকে স্তরান্তরে-কালান্তরের অভিমুখে-এদেশের শিক্ষিত শ্রেণীকে এগিয়ে নিয়ে চলা, কমিউনিজম নয়, প্রগতি-এই তখনকার মত যথেষ্ট-এটাই ছিল পার্টি কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য ও নির্দেশ (পরিচয়-এর রূপান্তরের হেরফের, পরিচয়, শারদীয়, ১৩৮৮)।' আসলে ১৯৪৮-এর আগে কমিউনিস্ট পার্টি পরিচয়-এর সম্পাদনা এবং পরিচালনার ক্ষেত্রে সরাসরি হস্তক্ষেপ করে নি বলাই ভালো। তবে ক্রমশই শিল্পসাহিত্যের বিচারে মার্কসবাদী তত্ত্বের প্রয়োগ নিয়ে তাঁর বিতর্কের সূচনা হয়। প্রগতি লেখক সংঘের বৈঠকগুলি বুদানভ-আরাগঁ-গারোদি-দের সাহিত্যবিচারের সূত্র নিয়ে বিতর্কের আসরে পরিণত হতে থাকে। জার্মানীর দ্বারা আক্রান্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন অথবা নাৎসী অধিকৃত ফরাসী দেশের বামপন্থী লেখকদের যা অবশ্যকর্তব্য ছিল হঠাৎই তা পরাধীন দেশের বাঙালী লেখকদের অবশ্য কর্তব্য বলে বিবেচিত হতে থাকে। জনযুদ্ধের তত্ত্ব সমস্ত সমস্যাকেই আন্তর্জাতিকতার নিরিখে বিচার করতে শেখায়। খুব স্বাভাবিক কারণেই এই সময় থেকেই শিল্প-সাহিত্যের আলোচনার পরিবর্তে রাজনৈতিক মতাদর্শগত আলোচনাই বড়ো হয়ে ওঠে। পরিচয়-ও তার ব্যতিক্রম ছিল না।

শিল্পসাহিত্য বিচারের ক্ষেত্রে মতাদর্শগত বিরোধ প্রগতি শিবিরেও বিরোধের সৃষ্টি করেছিল। এমন কি তারাশঙ্করের মতো অন্তরঙ্গ সহযাত্রীও এই বিরোধের শিকার হয়েছিলেন, বিষ্ণু দে-কেও ক্ষোভের সঙ্গে পরিচয়-এর পরিচালকমণ্ডলী থেকে নাম সরিয়ে নিতে হয়েছিল। এখানে এ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ নেই। তবে এটা মেনে নিতেই হবে যে তখনও পর্যন্ত সমালোচনার ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা বজায় রাখার সযত্ন প্রয়াস ছিল। প্রাক্তন সম্পাদকদের অন্যতম মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় সঠিকভাবেই স্মৃতিচারণায় লিখেছিলেন, 'সাহিত্য তখনও এদেশে বাণিজ্যের পণ্য হয়ে ওঠে নি, সাহিত্য আলোচনায় তাই কঠোর নিরপেক্ষতা, বিষয়মুখিনতা ও সমপোযোগী নিষ্ঠার অবকাশ ছিল অনেকখানি। আর ছিল পার্টির বাইরের লেখকদের প্রতি সূক্ষ্ম সৌজন্যবোধের পরিচয়, তাঁরা যাতে কোনো কারণে ক্ষুণ্ণ না হন, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি (পরিচয়-এর বিশ বছর, কার্তিক, ১৩৮৮)।' কিন্তু

এই 'সূক্ষ্ম সৌজন্যবোধ' রাজনীতির ঝোড়ো হাওয়ায় কিছুদিনের জন্য যেন হঠাৎ-ই হারিয়ে গেল। ১৯৪৮-এর ২৬শে মার্চ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করার পর সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের ওপরও আক্রমণ সুরু হয়। পরিচয়-এর অন্যতম সম্পাদক গোপাল হালদার এবং সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে বিনা বিচারে কারারুদ্ধ করা হয়। পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে যে অতি বামপন্থী নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল তার ফলে সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট থেকেও নিরপেক্ষতা ও উদার মানসিকতা চলে যায়। তৎকালীন সম্পাদক গোপাল হালদার স্মৃতিচারণায় স্বীকারও করেছেন, '১৯৪৮-এর প্রারম্ভ থেকে যা ঘটল তার অনেক কর্মপদ্ধতি ও কর্মকাণ্ড ছিল আমার সম্পূর্ণ প্রকৃতিবিরুদ্ধ, রাজনৈতিক ও সাহিত্যবোধেরও বিনষ্টি সূচক। সংশয় বোধ করেছি বারবার (পরিচয়-এর রূপান্তরের হেরফের, শারদীয় ১৩৮৮)।'

প্রকৃতপক্ষে বিতর্কমূলক সাহিত্য সমালোচনার ধারায় সূত্রপাত কমিউনিস্ট পার্টির বেআইনী যুগে প্রকাশিত 'মার্কসবাদী' সংকলন থেকে। ১৯৪৯-এর অক্টোবর থেকে ১৯৫০-র অক্টোবর পর্যন্ত এর মোট আটটি সংকলন প্রকাশিত হয়েছিল। এর প্রধান সম্পাদক ছিলেন তৎকালীন পলিটব্যুরো সদস্য আত্মগোপনকারী নেতা ভবানী সেন। বুর্জোয়া ভাবাদর্শের বিরুদ্ধে মতাদর্শগত সংগ্রাম সুরু করবার জন্যই যে এই সংকলনের আত্মপ্রকাশ একথা প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয়তেই বলে নেওয়া হয়েছিল। এখানেই রবীন্দ্র গুপ্ত ও বীরেন পাল এই দুই ছদ্মনামে লেখা ভবানী সেনের দুটি প্রবন্ধ 'বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি ধারা' এবং বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্ম-সমালোচনা' আজ ইতিহাস হয়ে গেছে। এটাও আজকে ইতিহাস যে শেষ (অষ্টম) সংকলনের সম্পাদকীয়তে স্বীকারও করে নেওয়া হয়েছিল, 'মার্কসবাদীতে বহু মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বিরোধী লেখা প্রকাশিত হয়েছে, বহু অ-মার্কসীয় লেখা বের হয়েছে।' অথচ মার্কসবাদের-র মাপকাঠিতেই তখন বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ থেকে সুরু করে প্রগতি শিবিরের মহারথীদেরও বিচার করা হচ্ছিল।

পরিচয়-এ জীবনানন্দের সমালোচনাও তাই। তাত্ত্বিক দিক দিয়ে জীবনানন্দ বোধ হয় প্রথম সমালোচিত হলেন ননী ভৌমিকের 'বাংলা সাহিত্যে বাস্তববাদের সমস্যা (পরিচয়, অগ্রহায়ণ ১৩৫৯)' প্রবন্ধে। এই সময় তিনি নিজেই সম্ভবত পরিচয়-এর সম্পাদক। কারণ, সুভাষ

মুখোপাধ্যায়ের স্বল্পস্থায়ী সম্পাদনার পর ১৯৫২ থেকে ননী ভৌমিক দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। এই প্রবন্ধে জীবনানন্দের বিরুদ্ধে বাস্তব জগৎ ও জীবনকে অস্বীকৃতির অভিযোগ আনা হয়,…'সাম্প্রতিক কবিতার ক্ষেত্রে জীবনানন্দ দাশ এই অস্বীকৃতিরই আর একটি মুখোশ মাত্র। আপন অবচেতনার রঙে স্বাধীন বাস্তব জগৎকে, মানুষ এবং তার ভূত ভবিষ্যৎকে এমন করে রাঙিয়ে দেওয়ার দুর্লক্ষণ আতঙ্কের কথা।' বোঝাই যায় যে এটি সমবেত সিদ্ধান্ত, ব্যক্তিগত নয়। প্রায় একই সময়ে দ্বিতীয় বোমাটি ফাটালেন পরিচয়েরই সুভাষ মুখোপাধ্যায়, শান্তিনিকেতনের সাহিত্য মেলায় পঠিত 'পাঁচ বছরের কবিতা' (১৩৫৪-৫৯) শীর্ষক প্রবন্ধে। 'কিন্তু সমস্ত কিছুর মধ্যে থেকেও যিনি কিছুর মধ্যেই নন, সেই তাবাত্তরহীন কবি হলেন জীবনানন্দ দাশ। সমস্ত কিছুই তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেন আর তারপর একের পর এক তাদের মুখগুলো ধূসর কুয়াশায় মুড়িয়ে দেন। নাম, সংখ্যা, আকৃতি তাঁর কাব্যে কথার কথা মাত্র। প্রাকৃত থেকে অপ্রাকৃতে, আকার থেকে নিরাকারে তার যাত্রা। সময়ের কণ্ঠরোধ করে তিনি কথা বলেন, শব্দ তাঁর কাছে বস্তুবিরহিত সংকেত মাত্র।' পাঠকদের জানিয়ে রাখা ভালো যে এর কিছু পরেই সুভাষের হাতে একই অভিযোগে অমিয় চক্রবর্তীও অভিযুক্ত হয়েছিলেন। তাঁর কবিতায় 'মানুষের ভাগ্যের প্রতি এই উদাসীন অবজ্ঞা, এই নিষ্ঠুর নির্লিপ্ততা' কে মেনে নিতে সুভাষ রাজি ছিলেন না। যে বিষ্ণু দে-র প্রশংসা করে সুভাষ লিখেছিলেন, 'দলছাড়া শুধু বিষ্ণু দে, তাঁর মুখ জনতার দিকে ফেরানো,' তাঁর সম্পর্কেও মন্তব্য ছিল 'কিন্তু স্বভাব তাঁর যায় নি। তাঁর কবিতা পড়তে পড়তে মনে হয় যেন তিনি নিজেকেই সহস্র করে দেখছেন।' এই সমালোচনাও কোনো ব্যক্তিগত বিরূপতাপ্রসূত নয়। কবিতায় সুস্থ জীবনবোধের প্রতিফলনের প্রত্যাশা থেকেই এই সমালোচনার জন্ম, 'সেই মহাজীবনকে আসুন মহাকাব্যে বাঁধি। বীরত্বের, স্নিগ্ধতার, প্রেমের, স্বপ্নের কথা বলুন।' এই বক্তব্যে আপত্তি করার কিছু নেই।

বুদ্ধদেব বসু জীবনানন্দের বনলতা সেন কাব্যগ্রন্থের সমালোচনা করেছিলেন কবিতা পত্রিকায় (চৈত্র, ১৩৪৯)। তার সূচনা হয়েছিল এইভাবে, 'আমাদের আধুনিক কবিদের মধ্যে জীবনানন্দ দাশ সবচেয়ে নির্জন, সবচেয়ে স্বতন্ত্র। বাংলা কাব্যের প্রধান ঐতিহ্য থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন, এবং গেলো দশ বছরে যে-সব আন্দোলনের ভাঙা-গড়া আমাদের কাব্যজগতে

চলেছে তাতেও কোনো অংশ তিনি গ্রহণ করেন নি।' এই 'নির্জন' এবং 'বিচ্ছিন্ন' বিশেষণ দুটিকে সুভাষ মুখোপাধ্যায় কাজে লাগান পরিচয়-এর পাতায় বনলতা সেন-এর সমালোচনা প্রসঙ্গে। এর শিরোনাম ছিল 'নির্জনতম কবি' (পরিচয়, শ্রাবণ ১৩৬০)। তাতে এই ধরণের কিছু তীক্ষ্ণ মন্তব্য ছিল, 'মাথা উঁচু করে মানুষের মতো বাঁচবার জন্যে যারা উদ্যত, তাদের তিনি হাত চেপে ধরেন। মিছিলকে তিনি ছত্রভঙ্গ করেন নির্জনতার নিঃসঙ্গ বিচ্ছিন্নতা দিয়ে।' সুভাষের মূল্যায়ণে অনেকেরই আপত্তি থাকতে পারে, কিন্তু স্বয়ং জীবনানন্দেরও তো 'নির্জনতম' বিশেষণটি ভালো লাগে নি। ১৯৫৪-তে শ্রেষ্ঠ কবিতার ভূমিকায় এই সমস্ত বিশেষণ প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, 'প্রায় সবই আংশিকভাবে সত্য, কোনো কোনো কবিতা বা কাব্যের কোনো কোনো অধ্যায় সম্বন্ধে খাটে, সমগ্র কাব্যের ব্যাখ্যা হিসেবে নয়।' গোপালচন্দ্র রায় তাঁর 'জীবনানন্দ' গ্রন্থে জানিয়েছেন যে বড়িষা কলেজে তাঁর সহকর্মী অধ্যাপক নিরঞ্জন চৌধুরীর কাছে জীবনানন্দ একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'নির্জন কবি, নির্জন কবি বলে বলে বুদ্ধদেব বসু আমার সম্বন্ধে একটা লিজেণ্ড খাড়া করেছেন, সেটা আমার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ঠিক নয় (জীবনানন্দের চরিত্রের কয়েকটি দিক)।' সুতরাং সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সমালোচনা একদিক দিয়ে বোধ হয় ঠিকই ছিল, কেননা কেবল নির্জনতাপ্রীতি বা বিচ্ছিন্নতাবোধ কোনো বড়ো কবির লক্ষণ হতে পারে না।

তুলনায় মণীন্দ্র রায়ের সমালোচনায় ঝাঁঝ ছিল বেশি। ১৩৬১ সালের ৫ই কার্তিক দুর্ঘটনায় জীবনানন্দের মৃত্যু হয়। ওই বছরেরই কার্তিক সংখ্যায় পরিচয়ে বিয়োগপঞ্জীতে জীবনানন্দকে স্মরণ করেছিলেন ননী ভৌমিক। কিন্তু ১৩৬২-এর শ্রাবণ সংখ্যায় মণীন্দ্র রায় 'কবি জীবনানন্দ দাশ' শীর্ষক যে প্রবন্ধটি লিখেছিলেন। তাঁর প্রথম অনুচ্ছেদের এক জায়গায় রয়েছে, 'বেঁচে নেই বলে তিনি কিছুটা সদয় ব্যবহার তো পানই উপরন্তু স্মৃতিপূজার হিড়িকে তাঁর বিষয়ে চারদিক থেকে সত্য মিথ্যা এত প্রশস্তিপত্র রচিত হতে থাকে, যার ভেতর থেকে কবির আসল চেহারাটা আবিষ্কার করা অন্ধের হস্তিদর্শনের মতোই পণ্ডশ্রম হয়ে ওঠে।' জীবনানন্দের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ঝরাপালক' মণীন্দ্র রায়ের কাছে সমবয়সী নজরুলের অগ্নিবীণার তুলনায়, অনেক বেশী 'নিরীহ, নিরুত্তাপ এবং নিরুৎসাহজনক' বলে মনে হয়েছিল। তার শেষ সিদ্ধান্ত, জীবনানন্দ 'এক মহৎ সম্ভাবনার খণ্ডিত

সিদ্ধি।' জীবনানন্দ-সমালোচক আবদুল মান্নান সৈয়দের কাছে এই সমালোচনা 'ক্রুদ্ধ, ক্ষুব্ধ, গোঁয়ার ও ঈর্ষাতুর' বলে মনে হয়েছিল। অকাল প্রয়াত জীবনানন্দের স্মৃতির প্রতি অবশ্যই এখানে কিছুটা অসৌজন্যের প্রকাশ ঘটেছে।

বর্তমান নিবন্ধকার তখন কলেজের ছাত্র। তাই কিছুটা কাঁচা হাতে হলেও পরিচয়-এর ১৩৬২ মাঘ সংখ্যায় মণীন্দ্র রায়ের বক্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়ে তিনি লিখেছিলেন, 'আসলে এ ধরণের আলোচনার মূল ত্রুটি বোধ হয় আরও গভীরে। বিচারের মাধ্যমে তত্ত্বে উপনীত না হয়ে নির্দিষ্ট তত্ত্ব সামনে রেখে বিচার করলে দ্বিধাগ্রস্ততার হাত এড়াবার উপায় নেই। বিশুদ্ধ তত্ত্বকে আঁকড়ে ধরে বসে থাকলে সমাজ-জীবনে দ্বৈতাদ্বৈতের নিত্য চলমান সংঘর্ষকে অস্বীকার করা হয়।' মণীন্দ্র রায়ের জীবনানন্দ-প্রতিভাকে 'এক মহৎ সম্ভাবনার খণ্ডিত সিদ্ধি' বলাতেও আপত্তি জানিয়ে এই প্রতিবাদ পত্রে বলা হয়েছিল যে 'সামাজিক ব্যবস্থার এক বিশেষ পরিণতি প্রাপ্তির পূর্বে কোনো মহৎ-প্রতিভার পক্ষেও পূর্ণতা প্রাপ্তি অসম্ভব (এ প্রসঙ্গে শেষজীবনে রবীন্দ্র আক্ষেপ স্মরণীয়)। সেই হিসেবে জীবনানন্দও নিশ্চয়ই অসম্পূর্ণ, কিন্তু তার সীমাবদ্ধ পরিপার্শ্বিককে তিনি নিশ্চয়ই ফাঁকি দেন নি।' অনেকদিন হয়ে গেছে। কিন্তু একেবারে তরুণ বয়সে লেখা এই বক্তব্য এখনও প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়। আমার প্রতিবাদপত্রের পাশাপাশি একই সংখ্যায় মণীন্দ্র রায়ের বক্তব্যও ছাপা হয়েছিল, তাতে নিজের বক্তব্যে অবিচল থেকে তিনি 'জীবনানন্দের ভাববস্তুগত তৎকালীন পশ্চাদমুখিতার জন্যে সমাজমানসকে দায়ী না করে কবির ব্যক্তিমানসকেই দায়ী' করতে চেয়েছিলেন। পরবর্তীকালে অবশ্য মণীন্দ্র রায় তাঁর এই বক্তব্য প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁর অকুণ্ঠ স্বীকৃতিও রয়েছে, 'একেবারেই চিনতে পারিনি তখন জীবনানন্দকে। বস্তুত ঐ লেখা এখন আমি অস্বীকারই করি (আমার কালের কবি ও কবিতা)।' তাঁর এই আত্মসমালোচনা পরিচয়-এর পৃষ্ঠাতে হলেই ভালো হত।

জীবনানন্দের সঙ্গে মার্কসবাদীদের দ্বারা পরিচালিত পরিচয়-এর ঘনিষ্ঠতা না জন্মানোর আর একটি কারণের কথা আমার সম্প্রতি মনে হচ্ছে। প্রথম পর্বে বুদ্ধদেব বসু এবং দ্বিতীয় পর্বে সঞ্জয় ভট্টাচার্য ছিলেন জীবনানন্দের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। এদের মধ্যে বুদ্ধদেব বসু ক্রমশ তাঁর কাছ থেকে সরে

বাসিছলেন। জীবনানন্দের কবিতায় ইতিহাস-চেতনা বা কালচেতনার আবির্ভাব তাঁর পছন্দসই ছিল না। তিনি তাঁকে 'নির্জনতম' বা 'প্রকৃতির কবি' হিসেবেই দেখতে ভালোবাসতেন। তাই ১৩৫৩ সালের আশ্বিন সংখ্যা কবিতা পত্রিকায় তিনি জীবনানন্দের সমালোচনা করে লেখেন, 'ইতিহাসের চেতনাকে তাঁর সাম্প্রতিক রচনার বিষয়ীভূত করে তিনি এইটিই প্রমাণ করবার প্রাণান্তকর চেষ্টা করেছেন যে তিনি 'পেছিয়ে' পড়েন নি। করুণ দৃশ্য এবং শোচনীয়।... হুজুগের হুংকারে তিনি আত্মপ্রত্যয় হারিয়েছেন।' অপর পৃষ্ঠপোষক সঞ্জয় ভট্টাচার্য জীবনানন্দের দ্বিতীয় পর্বের কাব্যধারার সমর্থক, 'নিরুক্ত ও পূর্বাশা-র সম্পাদক সঞ্জয় ভট্টাচার্য মনে করেন যে আমার শেষের দিকের কবিতায় আমার পারিপার্শ্বিক চেতনা প্রৌঢ় পরিণতি লাভ করেছে। পারিপার্শ্বিক অবশ্য সমাজ ও ইতিহাস নিয়ে (ময়ূখ, জীবনানন্দ স্মৃতি সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত)।' এই সঞ্জয় ভট্টাচার্য নিজেকে ট্রটস্কি-পন্থী বলতেন। অথচ পরিচয়-এর পাতায় ১৯৩৭ সাল থেকে ট্রটস্কি-বিরোধিতা সুরু হয়েছিল। ১৯৩৭-এ পরিচয় পত্রিকায় সুশোভন সরকার লিখেছিলেন, 'ট্রটস্কির ব্যাখ্যা নিশ্চয়ই মার্কসবাদের বিকৃতি (সাম্যবাদের সঙ্কট, চৈত্র ১৩৪৪)।' আর ট্রটস্কি নিহত হওয়ার পরও নীরেন্দ্রনাথ রায় লিখেছিলেন, 'ট্রটস্কি কোনো দিনই মার্কসবাদী বা প্রকৃত লেনিনবাদী ছিলেন না (পরিচয়, ভাদ্র ১৩৩৯)।' আবার জীবনানন্দকে দক্ষিণপন্থা এবং অতি বামপন্থা থেকে সরিয়ে আনার জন্য সঞ্জয় ভট্টাচার্যেরা যে তাঁকে পূর্বাশায় টেনে আনতে চেয়েছিলেন তারও একটা প্রমাণ আছে, 'সেই প্রথম আমরা জীবনানন্দ দাশকে বাস্তবীতিভিত্তিক রোমান্টিক জেনে কবিতা লিখতে আমন্ত্রণ জানাই। (পূর্বাশা, শ্রাবণ ১৩৭১)।' অতএব এই পরিস্থিতিতে কট্টর মার্কসবাদী পরিচয় যদি জীবনানন্দের দিকে কিছুটা সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকায় তাহলে অবাক হবার কিছু নেই।

আসলে জীবনানন্দ সম্পর্কে তাঁর সময়ে যে বক্তব্যই পরিচয়-এ প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে শিল্পমূল্যের দিকটি প্রায় সবসময়ই অবহেলিত। ব্যক্তিগত মতামত নয়, তাত্ত্বিক মতামতই তখন সাহিত্য বিচারের মাপকাঠি। জীবনানন্দ নিজে যে ব্যাপারটি ধরতে পারেন নি তা নয়। তাঁর অন্যতম সমালোচক সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের পরিচয়-এ প্রকাশিত বিখ্যাত 'সুন্দর' কবিতাটি পড়ে তাই তিনি অনায়াসে বলতে পারেন, 'সুভাষের মধ্যে আসলে

একজন ডগম্যাটিক, আরেকজন কবি, দুজন মানুষ।' তিনি ঠিকই বুঝতে আরম্ভ করেছিলেন যে ব্যক্তিগতভাবে কবি বা তাঁর কাব্য সম্পর্কে এঁদের কোনো বিরূপতা নেই। তাছাড়া এটাও বোধ হয় তাঁর চোখে পড়েছিল যে শুধু তিনিই নন প্রগতিশিবিরের বিখ্যাত লেখকেরাও একই মাপকাঠিতে সমালোচিত হচ্ছিলেন। তাছাড়া, তিনি নিজেও তো পাল্টাচ্ছিলেন। 'তিমির বিলাসী' থেকে 'তিমির বিনাশী' হয়ে ওঠার আকুলতাও তার মধ্যে দেখা দিয়েছিল। আর সেই সময়ে যারা এই 'তিমির বিনাশের' সাধনায় নিমগ্ন তাঁদের কাছ থেকে কতদিনই বা তিনি দূরে সরে থাকতে পারেন? ১৯৫৩-র ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে গণ আন্দোলনের সমর্থনে স্বাক্ষরকারীদের যে নাম পরিচয়-এ ছাপা হয়েছিল তাতে জীবনানন্দের নামও ছিল। জীবনানন্দ বোধ হয় ক্রমশঃ তাঁর আসল জায়গাটি খুঁজে পাচ্ছিলেন।

তথ্যসূত্র :

১. জীবনানন্দ দাশের কাব্যসংগ্রহ দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, ভূমিকা।
২. জীবনানন্দ দাশ : বিকাশ ও প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত।
৩. জীবনানন্দ : আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত।
৪. জীবনানন্দ : গোপালচন্দ্র রায়।
৫. প্রগতি-সাংস্কৃতিক আন্দোলনে কয়েকটি সাময়িকপত্রের ভূমিকা : সুস্নাত দাশ (বাংলায় সংস্কৃতিতে মার্কসবাদী চেতনার ধারা : সম্পাদনা ধনঞ্জয় দাশ)।
৬. অনুষ্টুপ : জীবনানন্দ বিশেষ সংখ্যা ; দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুমিতা চক্রবর্তী সম্পাদিত।
৭. মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক : ধনঞ্জয় দাশ সম্পাদিত।

———

হিন্দী কাব্য ও বনলতা সেন

মুকুল বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্রের সময় থেকে দীর্ঘকাল হিন্দী কবিতা বাংলা কবিতাকে অনুসরণ করেছিল। তারপর সমতালে হাঁটিতে হাঁটিতে এখন সে নিজের একটি আলোকবৃত্ত রচনা করে নিয়েছে কিন্তু নির্মীয়মান ওই বৃত্তের প্রতিটি প্রয়াসের মধ্যে বাংলা কবিতার সংগে অন্তঃশীল আপেক্ষিক একটি সম্পর্ককে অস্বীকার করেন না হিন্দী কবিরা। জীবনানন্দের নন্দনচেতনা হিন্দীর সাধারণ পাঠককে ঠিকমতো নাড়া দিতে পারেনি, কারণ তাদের ভাষার কবিরা খুব সন্তর্পণে, খুব ভয়ে ভয়ে এই সুন্দরের অন্বেষাকে জরিপ করতে নেমেছিলেন। নিরালা, রাজকমল চৌধুরী অজ্ঞেয় শ্রীরাম শুক্ল বাংলা জানতেন, শুধু এঁরাই নন সে সময় যে হিন্দী কবিরা হিন্দী কবিতার ইতিহাসে নিজের স্বাক্ষর চাইতেন তাঁরা জানতেন বাংলা কবিতার রচনাধর্মীতা না জানলে নিজেদের শুদ্ধ করা যাবেনা। ভারতেন্দু বলেছিলেন—"অপনী সম্পত্তিশালিনী জ্ঞানবৃদ্ধা বড়ী বহন বঙ্গভাষাকে অক্ষয় রত্নভাণ্ডার কী সহায়তা সে হিন্দী ভাষা বড়ী উন্নতি করে।"

হিন্দীকাব্যে বা কথাসাহিত্যে বাংলার প্রভাব কখনো কখনো প্রত্যক্ষ এবং স্পষ্ট আবার কখনো কখনো পরোক্ষে কবিদের চেতনাস্রোতে নতুন স্রোত হয়ে দেখা দেয়—নতুন দ্বীপভূমি হয়ে।

হিন্দী সাহিত্যে জীবনানন্দের প্রভাব স্বতন্ত্র গবেষণা গ্রন্থের আকার নেবে। তাই তার পরবর্তী কবি সমালোচকের দৃষ্টিতে তিনি কিভাবে প্রতিফলিত হয়েছেন সে বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব। হিন্দী কাব্যজগতের দিক্‌পাল রাজকমল চৌধরী বলেছেন১—"পতা নহী কি হিন্দী কে আলোচক মুঝে ইয়ে কহনে কী ইজাজত দেঙ্গে ইয়া নহী, কি ম্যায়নে যব 'ধরমবীর ভারতী' কি 'কনুপ্রিয়া' পড়ি, তব পঢ়নে কী ক্রম যে হী মুঝে বার বার জীবনানন্দ দাস কি 'বনলতা সেন' কি কবিতায়ে ইয়াদ আতিরহি। যদ্যপি বহুকীত সেন ১৯৪২ মে ছপি থী, যব হিন্দী মে প্রয়োগবাদ আগে নহী আয়া থা আর প্রগতিবাদী কবিতা কি দৌর শিথিল হোনে লগ গয়া থা। কিরঘি নয়ে রোমান কি তলাশ করতে নয়ী কবিতা কি ধরমবীর ভারতী, গিরিজা কুমার মাথুরকে সে কবিয়োঁকে লিয়ে ছটে সাতমে দশক মে ভী

'বনলতা সেন' কি কবিতাওঁ মে খাস তরহ্ কী মর্মস্পর্শী তাজগী মজুদ থী। নয়ে রোমান কী তলাস কা হী এক দুসরা রূখ বহী হ্যায়—ইতিহাসবোধ, জিসমে বৈদিক কাল কি কবিতা সে বর্তমান বৈজ্ঞানিক কাল কি কবিতা তক সম্বন্ধতা কে বিষয়োঁ, প্রসঙ্গো অর মিথক সন্দর্ভো কে সাথ ঐতিহাসিক প্রতীকোঁ অর ঘটনাওঁ এবং চরিত্রোঁ কে ভী নয়ী কবিতা মে আধুনিকতম অভিপ্রায় উক্ত করণে সে উদ্দেশ্য লাভ কে লিয়ে উপযোগ যে লিয়া জাতা হ্যায় জো ধরমবীর ভারতী, নরেশ মেহতা, কুমার নারায়ণ, অজ্ঞেয় অর মুক্তিবোধ কি রচনাওঁ মে ভী দেখা জাতা হ্যায়। এহী জীবনানন্দ কি কৃতিবিশেষ 'মহাপৃথিবী' কি কবিতাওঁ কো ভী অনুভাবিত করতা পায়া জাতা হ্যায়, ই সে হম 'সাতটি তারার তিমির' মে ভী ১৯৪৮ তক দেখে হ্যাঁয়। ইসে সদী, কি রচনাত্মক চেতনা কা সম্পর্ক সূত্র কহে তো ক্যায়া কবিতালোচক সহমত হোঙ্গে ইয়া নদী।

(ডক্টর ধরমবীর ভারতীর কন্যুপ্রিয়া পড়তে পড়তে জীবনানন্দকে মনে পড়ে। অজ্ঞেয়, কুমারনারায়ণ, নরেশ মেহতা, আর মুক্তিবোধের বহু কবিতা, 'সাতটি তারার তিমির' আর মহাপৃথিবীকে স্মরণ করিয়ে দেয়।)

১৯৪৩ থেকে ১৯৫৯ পর্যন্ত হিন্দী কাব্যের বিকাশধারার প্রামান্য ঐতিহাসিক দস্তাবেজ 'ভারতীয় জ্ঞানপীঠ প্রকাশন' হিন্দীর দিকদ্রষ্টা কবি 'অজ্ঞেয়র' সম্পাদনায় 'তার সপ্তক' 'দুসরা—সপ্তক' 'তিসরা—সপ্তক' প্রকাশিত করেছিল। 'তিসরা সপ্তকের' সপ্তর্ষিমণ্ডলের অন্যতম এবং অধুনা প্রোথিতযশাকবি কেদার সিংহ তাঁর ভূমিকায় লিখেছেন[২]—ম্যয় বিম্ব নির্মাণ কী প্রক্রিয়া পর জোর ইসলিয়ে দে রহা হুঁ কি আজ কাব্যকে মূল্যাঙ্কণ কা প্রতিমান লগভগ বহীমান লিয়া গয়া হ্যায়, তাৎপর্য বহ্ হ্যায় কি প্রাচীন কাব্যে মে জো স্থান চরিত্র কা থা, আজ কী কবিতা মেঁ বহী স্থান বিম্ব অথবা ইমেজ কা হ্যায়।—আজ যঁহা আকার মন ঠিক গয়া হ্যায় দুহী সে কালিদাস সুর, বোদলেয়র, নিরালা, অডেন, ডায়লন অওর জীবনানন্দ দাস সমান রূপ মে প্রিয় লগতে হ্যাঁয়। জীবনানন্দ দাস কী 'বনলতা সেন' কী ইমেজারী 'এক দৃশ্য গন্ধময় নির্জন কান্তার' (য়েহ বিশেষণ 'বুদ্ধদেব বসু' কা হ্যায়) কি তরহ্ লগতী হ্যায়, জিস কী বিরাটতা কী ছাপ মেরে মন পর বহত্ গহরী হ্যায়। (কালিদাস, সুরদাস, বোদলেয়র, নিরালা, ইডেন, ডায়লন টমস এবং জীবনানন্দ আমাকে সমানভাবে আকৃষ্ট করে। বনলতা সেন-এর

ইয়েজারী এক দৃশ্য গন্ধময় নির্জন প্রান্তর (বুদ্ধদেব বসুর উক্তি) হয়ে আমার মনে গভীর ছাপ ফেলেছে।)

কেদারনাথ সিংহের এই উক্তি নিঃসন্দেহে জীবনানন্দের মহাবিস্তারের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা প্রকাশ। নয়ী কবিতার অন্যতম প্রবর্তক কবি রাম নরেশ পাঠক লেখেন—[৩] "উনকী আধুনিক কহী জানী ভাষা আঞ্চলিক আস্বাদ অওর কথা লেখা শৈলী কী চুস্তে তকনীক সেজদুড়ী দিবা 'ধূমিল। 'ধূমিল পাণ্ডুলিপি (1936) কী কবিতা মেঁ মুক্ত আসঙ্গ (ফ্রী এসোসিয়েশ) কী শৈলী সে প্রভাবিত হ্যায় জিসকে প্রতি হিন্দী কী নঈ কবিতাকে কবি ভী আকৃষ্ট হো হঁয়ী। 'কেদারনাথ সিংহ' আওর 'বিষ্ণুচন্দ্র শর্মা'কী কবিতাওঁ পর-বহ প্রভাব পরিলক্ষিত হ্যায়। (ওঁর আধুনিক ভাষার সাথে আঞ্চলিক ভাষার আস্বাদ আর গল্পের ঢোঙ, টেকনিক আমাকে আকৃষ্ট করে। ধূসর পাণ্ডুলিপির ফ্রি এসোশিয়েশন নয়ী কবিতাকে প্রভাবিত করেছে। কেদারনাথ সিংহ আর বিষ্ণুচন্দ্র শর্মা তার প্রমাণ।)

হিন্দী নবগীতের কবি রাজেন্দ্রপ্রসাদ সিংহ-এর[৪] উক্তিও এ প্রসঙ্গে লক্ষণীয় —"নব স্বচ্ছন্দতাবাদী কবিতা সে জুড়ি 'সূর্যোদয়ী নয়ী কবিতা ধারা'কে অনেক হিন্দী কবি 'অমৃতা ভারতী' 'দেবরাজ', 'শলভ', 'শ্রীপ্রসাদ সিংহ', 'রমা সিং' আদি কবি জীবনানন্দ দাসকে নব রোমানি কাব্যকে ঐতিহাসিক পরিশোধ সে প্রভাবিত হ্যায়। নয়ী কবিতা ধারার অমৃতা ভারতী, দেবরাজ শলভ, শ্রীপ্রসাদ সিং, রমা সিং প্রমুখ কবি জীবনানন্দ দাসের রোম্যান্টিক কাব্যের ঐতিহাসিক পরিবোধ দ্বারা প্রভাবিত।

অধ্যাপক সমীক্ষক এবং কবি ডক্টর রেবতী রমন[৫]—জীবনানন্দের কবিতার সাথে শলভ শ্রীরাম সিংহের সাদৃশ্য দেখাতে গিয়ে কবিতাটির উল্লেখ করেছেন। পূর্ণিমা সমুদ্র কী সরজতি লহরোঁ মে তটান্বেষী জলপোত কা-তরহ / মৎস সেনা কি আক্রমণ কি চিন্তা কিয়ে বিনা তটস্পর্শ কা বিশ্বাস লেকর / নিরন্তর চল রহা হুঁ ম্যায় / ওই তট, ওহ মেরা বিশ্বাস কেন্দ্র সঁপ দিয়া গয়া / আদিবাসী মছোরে দ্বারা এক অনিশ্চয় কে ? / জিসনে প্রশ্ন চিহ্নে কা ব্যূহ রচা দিয়া চারো ওর।

* * *

ওহ মেরা তট গৌরবর্ণা সাবিত্রী / এক রাগিনী / বিশ্বজাগরণকে / সামর্থ সে যুক্ত/……ইস কবিতা কি সাবিত্রী-শ্রাবন্তী অর অথী, পুরাণ, ইতিহাস অর

বর্তমান কে পুরে পরিদৃশ্য কো আত্মসাৎ কিয়ে অখণ্ড সময় কী রাগ ভাবনা ওঁ মে ব্যাপ্ত হো জাতি হ্যায়। কবিকে সারে সংঘর্ষ ; সারি-গীতিবিধি কী মানো ওহী কেন্দ্রীয় ধুরি হো। পুরি সংরচনামে অন্তঃসলিলা কি ভাঁতি কবিকা রাগ সত) সঞ্চিত হ্যায়, এক ভাবনাময় গীত কে প্রসার কি তরহ্ ; প্রসঙ্গ বশ ইয়াদ আতে হ্যায় বঙ্গ ভাষাকে অপ্রতিম কবি জীবনানন্দ দাস কো, উনসে জ্যাদা উনকী 'বনলতা সেন'। বনলতা সেন হো ইয়া 'শলভ' কী 'সাবিত্রী' অপণ্য রাগসম্প্রতা মে প্রেমগীতাত্মক হ্যায়। (শলভ-এর সাবিত্রী আমাদের জীবনানন্দ দাসের বনলতা সেনকে স্মরণ করিয়ে দেয়। শলভ এর কবিতায় প্রেমানুভূতি তাঁর কবিতাকে এক স্বতন্ত্র অস্তিত্ব এনে দিয়েছে। তাঁর প্রেমিকা অজন্তা ইলোরা কোনার্ক আর খাজুরাহোর সৌন্দর্যবোধ সমন্বিত রচনা বহে স্বীকৃত—(আপনে এক এক উভার মে অপ্রতিম / এক এক মুদ্রা মে/অপনে শিল্প অর শৈলী মে অদ্বিতীয় উস হাতোঁ সে পরিচিত হুঁ ম্যায়) এই শলভের বনলতা সেন। প্রেমের ভাষা ও প্রেমের দৃষ্টি তিনি নিয়েছেন জীবনানন্দ থেকে।

হিন্দী কবিদের কাছে জীবনানন্দ অপ্রতিম কবি, তাঁর কাব্যের সঞ্চারী সাঙ্গীতিক অনুষঙ্গে প্রেমকে, স্মৃতিকে প্রেমিকার নাম ও নামাঙ্কিত অনুভবকে তাঁরা নিজেদের ভাষায় সময় সংহতির সঙ্গে যুক্ত করতে চেয়েছেন। তাঁর কবিতায় নির্মাণ ; শব্দ ব্যঞ্জনা এবং বিম্বের ব্যবহার হিন্দী কাব্য জগতে শ্বাসত সময়ের স্রোতে বহমান হয়ে আছে।

শুধু বনলতা সেনই যে তাঁদের কাছে 'দারুচিনি দ্বীপ' ও 'সবুজ ঘাসের প্রত্যয় হয়ে প্রেরণা জুগিয়েছে তা নয়। সেই প্রেক্ষিতে এসেছে রাজকমল চৌধুরীর, 'অলকানন্দা দাসগুপ্ত' 'মীরা চ্যাটার্জী' কুমার বিকলের 'নিরুপমা দত্ত', জ্ঞানেন্দ্র পতির 'অর্চনা পারেখ' প্রমুখ অনেক নারী। রহস্যময় বহু মাত্রিকতা নিয়ে ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যে অনন্য হয়ে। হিন্দী কবিতা জীবনানন্দের নারী মূর্তির আর্কিটাইপে ভরে গেছে। লক্ষ্য করার বিষয় বেশীর ভাগ নামই বাঙালী নাম।

দুসরা সপ্তকের কবি নরেশ মেহতার 'সময় দেবতা' কবিতায় শব্দ চয়ন এবং বিম্বের প্রয়োগ জীবনানন্দকে স্মরণ করিয়ে দেয়। শ্রীকান্ত বর্মার কবিতায় ঐতিহাসিক পরিবোধ, রাজকমলের কবিতায় মৃত্যুবোধক শব্দ ও অনুরুদ্ধ নাগার্জুনের জন্মভূমির প্রতি নস্টালজিয়া ইত্যাদির মোটিফ জীবনানন্দের নান্দনিক সৃজনী শক্তিকে মনে করিয়ে দেয়।

জীবনানন্দের কবিতার নস্টালজিক স্মৃতিচারণা, নারীত্বের ধারণা বা ব্যক্তিত্বের ও সত্তার এবং জীবনের চেতনাকে লীলাধর জগূড়ী শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। সে কথা তিনি কবিতায় স্বীকার করেছেন—এক সমুদ্র কী আওয়াজ শব্দ সী আ রহিহো / এ্যাসা অনুভব, এ্যাসী ভাষা / জিসকা অদৃশ্য, দৃশ্য সে বড়া হো / অর অশ্রুত, শ্রব্য সা খড়া হো / অবসর মন্ত্র শূনেতা হূঁ।

এ্যাসী ভাষা কা রোর অপনে স্বপ্নো মে। (ভয় ভী শক্তি দেতা হ্যায়)।

কারু বাসনার খুকীর বাবার স্নেহ ও বিপন্ন দুশ্চিন্তা জগূড়ীর 'আঁধী মে অওরৎ' কবিতায় প্রতিফলিত যেমন—'হয়তো কোন মেয়েদেরই স্কুলে মাস্টারি করবে কিংবা বিধবাশ্রমে খাবে কিংবা অবলাশ্রমে, হয়তো কোন নারী-কল্যাণ সমিতির সাহায্যের জন্য সরকার হবে কিংবা হিন্দু মিশনের অথবা অথবা পৃথিবীর সমস্ত সাহায্য, সহানুভূতি ও কৃপার অগোচরে জীবনের অন্ধকার সমুদ্রের পরিহাস ও অট্টহাসির ভিতর হাহাকার করে ফিরবে।'

'একদিন বহ এক স্ত্রী হোগী
তুফান কে বাদ
কিসী আহত বৃক্ষ কে
বিলাপ কী তরহ
ধূল সংশয়, উস্মী মে
অর ইতনে সারে মবেঁীকো
ইতনে সারে পত্তে
বাবেলা মচাতে
কুছ উড়তা সা দিখ রহা হোগা
বহত সে ডর ঘের লেঙ্গে
বে ভী জো লগতে থে
চলে গয়ে হোঙ্গে কঁহী দূর
অনিশ্চিত জীবন কী
সুনিশ্চিত উব ডুবে মে। (আঁধী মে অওরৎ)

যুবা কবি 'আত্মশেখর' জীবনানন্দ লক্ষণে সংক্রমিত হয়ে আধুনিক কবিতা লিখছেন। মানব চেতনার পথরেখা সম্পর্কে তিনি সচেতন তার চেয়েও সচেতন তাঁর 'রূপসী কাশ্মীর' প্রসঙ্গে। ঘুরে ফিরে কাশ্মীরের প্রাকৃতিকে ভালবেসে তার লোককথা লোকগাথা লোকাচার ইতিহাস তার দুঃখ কষ্ট

বিপন্নতার সাথে একাত্ম হয়ে লিখেছেন কবিতা। তিনি বলেছেন কামিজের বোতামের মত কবিতা যেন জানলা, তাই দিয়ে প্রকৃতি দেখা যায়।

যেমন—"অভী অভী নিদমে জাগকর
সফেদ চিড়িয়া কী তরহ
আকর বৈঠি ধূপ,
ধীরে ধীরে খুলা রহী হ্যায়
আপনে মুলায়ম পঙ্খ,
অভী অভী সামনে কী পাহাড়ী
পকদন্ডী সে
ভেড় বকরিয়োঁ কে ঝুণ্ড কো লেকর
উম্মীদ কা কোই পড়েরিয়া গুজরা হ্যায়
অভী অভী ঝিঙ্গুরোঁ নে কোঈ
নয়া গীত গানা শুরু কিয়া হ্যায়।
নদী পর ঝুঁক আয়ে পেড় কী শাখোঁ সে
অভী অভী জঙ্গলী চিড়িয়া
উড়কর সারে আকাশ মেঁ-ফ্যাল গয়ী হ্যায়
অভী অভী মুঝে
তুমহারী ইয়াদ আয়ী হ্যায়।
(এক পাহাড়ী যাত্রাকী কুছ কবিতায়েঁ)

কবিতাটি পড়লে একথা স্পষ্ট হয় যে তিনি জীবনানন্দের চিত্রকল্প ব্যবহার করতে চেয়েছেন। ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার-এ* স্বীকার করেছেন জীবনানন্দের মত মাতৃভূমির প্রতি প্রেম, তাঁর চিত্রকল্প, বিম্ব এবং হতাশ জীবনের বিড়ম্বনা জীবনানন্দের মতো হয়তো এত স্বচ্ছ বা সুচিন্তিত নয়, বলা যেতে পারে সম্ভবও নয় তবু চেষ্টার ত্রুটি নেই। অনুকরণ করিনি, স্বতস্ফূর্তভাবে এসেছে।

সাম্প্রতিক উদীয়মান কবিদের মধ্যে স্বামীনাথ পান্ডের কবিতায় জীবনানন্দ ছাপ স্পষ্ট।

নিরালা শান্তিনিকেতনে ছিলেন তাই বাংলার কবিতার সাথে তাঁর আত্মীয়তা গড়ে উঠেছিল, রবীন্দ্রনাথের প্রভাবতো তাঁর কাব্যে স্পষ্ট সে কথা সর্বজনবিদিত। কিন্তু জীবনানন্দের প্রভাবে তিনি স্যুররিয়ালিজম,

আনলেন কাব্যে 'কুকুর মুত্তা', হিন্দী কাব্যে স্যুররিয়ালিজম্ এর সূত্রপাত। তারপর 'মুক্তিবোধ' এবং 'রাজকমল চৌধুরী।'

১৯৪০ এর পর থেকেই বাংলা কবিতা হিন্দীতে অনূদিত হতে থাকে। তবে জীবনানন্দের অনুবাদ শুরু হয় ১৯৫৫'র পর থেকে। বেনারস থেকে 'মরাল' মাসিক, সম্পাদনা ঈশ্বর সিং, বারাণসী,-এ শ্রীকৃষ্ণ তেওয়ারী ১৯৫৬-এ ২টি কবিতার অনুবাদ করেন।[৭]

১৯৬০ এর পরে 'লহর' (মাসিক, সম্পাদনা প্রকাশ জৈন আজমীর) প্রকাশ হোত। 'বাংলা কবিতা বিশেষাংক' ১৯৬৭ শ্রীরাম শুক্ল রাজকমল চৌধুরী এবং কার্তিকনাথ ঠাকুর জীবনানন্দ দাসের তিনটি কবিতার অনুবাদ করেন।[৮]

'ভারতী' (সম্পাদক বীরেন্দ্র কুমার জৈন বম্বে) ১৯৬৬ তে শ্রীপ্রসাদ সিং এর অনুবাদ প্রকাশিত হয়।

'দেবনাগর' (সম্পাদক রমানাথ জিন্দী) ১৯৬৭ শ্রীপ্রয়াগ শুক্ল এর অনুবাদ প্রকাশিত হয়।

সাহিত্য একাডেমী লেখক জীবনী পুস্তকমালায় 'জীবনানন্দ' চিদানন্দ দাশগুপ্তের লেখা শ্রীপ্রয়াগ শুক্লের অনুবাদে প্রকাশিত হয়। ১ম সংস্করণ ১৯৭৭ এবং ২য় ১৯৮১ সময় ব্যক্তিত্ব ও কৃতিত্বের পর মোট ২৯টি কবিতার অনুবাদ পাওয়া যায়। যদিও এই অনুবাদ বেশী মাত্রায় ছন্দময় ও গীতিময় সে কারণেই হিন্দী কবিদের কাছে সমাদৃত।

বেমন বীতে কিতনে কল্পসমচী পৃথ্বি ম্যয়নে চলকর ছনী/বহাঁ মলয় সাগর তক—সিংহল কে সমুদ্র সে রাত রাত ভর / অন্ধকার মে ম্যায় ভটকা হুঁ / থা অশোক ও বিম্বসার কে ধূসর জগতে সংসারো মেঁ /।

একা হুয়া হুঁ—
চারো ওর বিছা জীবনকে
হী সমুদ্র কা ফেন
শান্তি কিসনে দী তো বহথী ;
নাটোর কী বনলতা সেন।

জীবনানন্দের বনলতা সেন প্রেম সৌন্দর্য্যবোধ ইতিহাস সব মিলিয়ে কিন্নর কণ্ঠ দেবদারু গাছের মতো নিঃশব্দ শিশির বিন্দুর মতো পাঠকের এবং চিত্রকরদের চেতনা একাত্ম হয়ে আছে। তার মধ্যে এই অনুবাদ নিশ্চিত রূপে

স্থূলতা আনে। হাজার বছরকে তিনি কল্পরূপে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু তাতে হিন্দী পাঠকের ভুল বোঝার সম্ভাবনা হতে পারে কারণ 'অযূত বর্ষানি কল্পঃ'। কিন্তু কবি হাজার বছর লিখেছিলেন। ১৯৮৫ তে ঋত্বিক (ষান্মাসিক, মজঃফরপুর ; সম্পাদক মুকুল বন্দ্যোপাধ্যায়)-এ উৎপল কুমারের চারটি কবিতা 'সূর্য' তামসী' 'অবরোধ' 'স্বভাব' 'একটি কবিতা' এবং 'অন্বেষণ' (সাং রিপুসূদন প্রসাদ শ্রীবাস্তব, ত্রৈমাসিক) ১৯৯০-এ 'রাত্রির কোরাস' 'আমাদের কথা দাও', 'তারাটির সাথে তারাটির কথা হয়' অনুবাদ করেন। স্বচ্ছন্দ এবং মনোগ্রাহী অনুবাদ।

১৯৯৪ এ 'শাম্ব' (মধ্যপ্রদেশ প্রগতিশীল লেখক সংঘ) 'আধুনিক বাংলা কবিতা' শীর্ষক অনুবাদ প্রকাশ করেন। সংকলন—অনুবাদ—সুবাস কুমার। একটি মাত্র কবিতা 'সমারূঢ়' প্রকাশিত। ১৯৯৭ এ সাহিত্য একাডেমী পুরস্কৃত জীবনানন্দের শ্রেষ্ঠ কবিতার হিন্দী অনুবাদ প্রকাশ করে। অনুবাদক সমীর বরণ নন্দী। প্রকাশক সাহিত্য একাডেমী।

হিন্দীতে অনুবাদ খুব কম হয়েছে বলে সাধারণ পাঠকের জীবনানন্দের সাথে পরিচয় কম। তাদের কাছে জীবনানন্দ একটি দূরতর দ্বীপ—যেখানে শাধুমাত্র বনলতা সেন থাকে। কিন্তু কবিরা চেষ্টা করেছেন জীবনানন্দকে জানতে, তাঁর শব্দ প্রয়োগ, বিম্ব প্রয়োগ সৌন্দর্য চেতনা ইতিহাসবোধ সুররিয়ালিজম এবং নিখিল বিশ্বের প্রতীকাত্মকতা নিজেদের কবিতায় প্রতিফলিত করতে চেয়েছেন। তাঁরা তা স্বীকার করতেও কুণ্ঠিত হননি কখনো। জীবনানন্দের কথাকেই একটু পরিবর্তিত করে বলা যেতে পারে—হিন্দী কাব্যে যা নেই অথবা শীর্ণভাবে 'রয়েছে সেই সব প্রাণও পরিসরের থেকে রশ্মি পেতে হলে বাংলা কাব্য ছাড়া তাঁদের কোন আলোভূমি নেই।'

তথ্যসূত্র ঃ—

(১) সম্প্রেষণ (ত্রৈমাসিক) মার্চ ১৯৬৬ পৃঃ ৩৩ সম্পাদক—চন্দ্রভানু ভরদ্বাজ, রাজস্থান
(২) দূসরা সপ্তক (১৯৫১) সম্পাদক—অজ্ঞেয় পৃঃ ১২৫
(৩) প্রতিষ্ঠান (ত্রৈমাসিক) সেপ্টেম্বর ১৯৬৭ পাটনা সম্পাদক পৃঃ ২১.
(৪) মানব (মাসিক) আগস্ট ১৯৬৯ সম্পাদক—কুমার নাগপুর পৃঃ ৮৮.
(৫) হিন্দী সমকালীন কবিতা—ড০ রেবতী রমণ পৃঃ ১৮২
(৬) ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার ড০ শেখর শঙ্কর মিশ্র।
৭, ৮, ৯ স্মৃতি থেকে ড০ প্রমোদকুমার সিংহ।

অমিতাভ দাশগুপ্ত এবং রবীন্দ্র পুরস্কার

এবারের রবীন্দ্র-পুরস্কার পেলেন পরিচয় সম্পাদক অমিতাভ দাশগুপ্ত তাঁর 'আমার ভাষা আমার নীরবতা' কবিতার বইটির জন্য। পরিচয়-এর সম্পাদকেরা কেউ কোনো পুরস্কার পাচ্ছেন এটা কোনো বিশেষ খবর নয়। কারণ ইতিমধ্যেই এই তালিকা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়েছে। গোপাল হালদার, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, ননী ভৌমিক, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, সুশীল জানা, গোলাম কুদ্দুস, দেবেশ রায় প্রভৃতিরা যে কোনো সময়েই যে কোনো পুরস্কার পেতে পারতেন। পেয়েওছেন। না পেলেও এঁদের কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি ছিল না। অমিতাভ-র নাম এই উজ্জ্বল তালিকায় একটি সংযোজন মাত্র। দীর্ঘকাল ধরে সীমিত ক্ষমতায় পরিচয় যে সুস্থ জীবনবোধ ও শিল্পচর্চার ধারাবাহিকতা বজায় রাখার চেষ্টা করে চলেছে—এই পুরস্কার আমাদের কাছে তারই স্বীকৃতি। পাশাপাশি এটি পঞ্চাশের দশকের একজন প্রতিভাবান কবির সৃষ্টিকর্মেরও আবশ্যিক স্বীকৃতি। তাই আমাদের তৃপ্তি দুদিক থেকেই।

বাংলা কবিতার আলোচনায় অমিতাভ-র গুরুত্ব অনেক সময়ই এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। একজন কবি টিঁকে থাকেন তাঁর নিজস্ব উচ্চারণের জন্য। তাঁর সমসাময়িক এমন কি অনেক অগ্রজ কবিদেরও তুলনায় অমিতাভ তাঁর নিজস্ব উচ্চারণে স্বতন্ত্র হয়ে আছে। কিছুদিন আগে লেখা একটি কবিতায় অমিতাভ তাঁর কবিতার নতুন ভাষার খোঁজ করতে গিয়ে বলেছিল, 'ভেঙে ফেলি চারুকলা। আমার আকাঁড়া শিল্প চাই। / মাখনের মসৃণতা নয়, চাই কর্কশ পাথর।' কিন্তু লিরিকের ট্রাডিশনকে সে একেবারেই বর্জন করে নি, বরং সংহত আবেগকে স্বগত সংলাপের মৃদু কণ্ঠে প্রকাশের প্রবণতাও দেখা গেছে তার মধ্যে—

> বেশি রাত হলে আমি সমুদ্রের পাশে এসে বসি।
> সাগর শিকারী যারা তারা চলে গেলে
> একা একা তার সঙ্গে কিছু ব্যক্তিগত কথা বলি।
> বাদামি বালিতে লেখা ব্যক্তিগত খাম

নীল জল-ও আমাকে পাঠায়,
আমার সামান্য থাকে, বাকি সবই ভেসে চলে যায়

এ কখনোই আকাঁড়া শিল্প নয়, বাহুল্যের মেদ-বর্জিত, ছিপছিপে এবং কবির নিভৃত কন্ঠের অনরূপ উচ্চারণ।

কবিতার বেলাতেও রাজনীতি থেকে দূরে পা রাখার কথা অমিতাভ এখনও ভাবতে পারে না। তাঁর আগের কবিতাগুলিতে রাজনীতির প্রকাশ ছিল অনেক জোরালো, অনেক তীক্ষ্ন। কিন্তু সাম্প্রতিক কবিতায় দেশকাল এবং সময়কে কবি যেন হৃদয়ের সঙ্গে মেলাতে সুরু করেছে। হৃদয়ের গভীরে ডুব দিয়ে জীবনের মূল সত্যটিকে খুঁজে নিতে চাইছে। বয়স বাড়লেই বোধহয় মানুষের মনে হতে থাকে 'আমার সময় খুব কম', এমন কি একথাও মনে হয়, 'অসুখী মানুষ ছাড়া আর কেউ কবিতা লেখে না'। এগুলি সবই যেন নতুন ভাবনা। কিছুটা কবির স্বভাব-বিরোধী। আবার এটাই বোধহয় যথার্থ কবি-স্বভাবের প্রবণতা। যে নিজেকে একদা ক্রমাগত বাইরের দিকে ছড়িয়ে দিয়েছিল এখন তো তাঁর সুতো গোটানোর পালা। এখন বোধহয় সেই সময় যখন নিজের সঙ্গে নিজের কথা বলার পালা সুরু করতে হয়। অন্যকে নয়, নিজেকেই নিজের কৈফিয়ৎ দিতে হয়—

না, কবি সমুদ্র নয়, বৃষ্টি নয়, কিছুই পারে না।
শুধু দ্যাখে, প্রাণপনে দেখে দেখে অন্ধ হয়ে যায়,
শুধু তার অক্ষমতা ইচ্ছাপূরণের স্বপ্ন বুকে
দুঃখরাতে বড়জোর দু-একটা কবিতা নামায়।

এই ধরণের নিভৃত অথচ গভীর উচ্চারণই তো একজন কবির আসল জাত চিনিয়ে দেয়।

বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য

ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত শ্রদ্ধাস্মরণে

বাঙলার সারস্বত মণ্ডলের এই শতকের শেষতম মান্যবর মনীষী ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত লোকান্তরিত হলেন, নিঃশব্দে, হয়ত কিছুটা অস্ফুট বা অশ্রুত রোদনার সঞ্চয়মাত্র নিয়ে (ডিসেম্বর ৩, ১৯৯৮)। দীর্ঘ পঁচানব্বই বছরের এক বহুদর্শী জীবনের ক্লান্তকালীন অভিজ্ঞতা ও সংবেদের সঞ্চয়, আর তাঁর চর্চিত বিদ্যার নিরন্তর বিস্তারের ফলবান খণ্ডগুলিকে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য উন্মুক্ত রেখে গিয়েছেন তিনি, একটির পর একটি গ্রন্থরচনা ও প্রকাশনার মধ্য দিয়ে। বাঙালী বুদ্ধিজীবিদের মধ্যে এমন সচল, নির্ভীক ও অকুণ্ঠ লেখক খুবই বিরল। শিক্ষকতার দীর্ঘ জীবনবৃত্তের বাইরে দেশি ও বিদেশি সাহিত্যের বিস্তৃত অঙ্গনে তাঁর চলিষ্ণুতা ছিল বহুজনের পক্ষেই ঈর্ষণীয়। ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্যের এই দাপুটে অধ্যাপক বার্নাড শ'-র উপর সমালোচনা গ্রন্থ লিখে তাঁর সমালোচক জীবন শুরু করলেও, আমার মনে হয়েছে শেক্সপীয়র অনুধ্যানই ছিল তাঁর জীবনব্যাপী প্যাশন। পঞ্চাশের দশকের ছাত্রজীবনে আমরা পরিচিত ছিলাম "শেক্সপীরিয়ান কমেডি" বইটির সঙ্গেই। কিন্তু তারপর একে একে লিখে চলেছিলেন য়োরোপীয় ভূখণ্ডের মহাকবির ওপর গ্রন্থের পর গ্রন্থ ; তাঁর ঐতিহাসিক নাট্যমালা এবং ট্রাজিডির বিচিত্রতা নিয়ে, লিখেছিলেন শেক্সপীয়রের সনেটমালার ওপর, শেক্সপীয়রের জীবন ও গ্রন্থাদির ওপর 'ম্যানুয়াল'। অন্যদিকে যখন কাব্য-তত্ত্ব নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন তখনও ঘুরে ফিরে এসেছে উদাহরণে, উৎকর্ষের নিদর্শনের উল্লেখে, শেক্সপীয়রের নাম। তাই মনে হয়, শেক্সপীয়রই ছিল তাঁর আজন্ম প্যাশন্। গুরুস্মরণকৃত্যের এই মুহূর্তে ক্ষোভ জাগে এই ভেবে যে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায়, বেতার ও দূরদর্শনের ঢক্কা-নিনাদিত সামান্য ঘোষণায় যে অমনোযোগ ও অজ্ঞ অবহেলা প্রকটিত হল তাঁর প্রতি, একজন প্রকৃতই বড় মাপের সচল মননশীলতার অধিকারী সারস্বতকর্মীর তা সর্বাথেই প্রাপ্য ছিল না। প্রয়াত আচার্যের অনেকানেক ছাত্র আজ বাঙলার সামাজিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক জীবনে আপন আপন কৃতিত্বে সমুজ্জ্বল বিরাজমান ; তাঁদের কেউ যদি স্মৃতিকৃত্যে অগ্রণী হতেন বহুলাংশেই শোভন ও সুন্দর হত কাজটি। তবু তাঁর ছাত্রদের মধ্যে অকৃতী অধম আমি দীনাত্ম হৃদয়ে

স্বীকার করি, 'পরিচয়' পত্রিকার পক্ষে এই শ্রদ্ধাজ্ঞাপন পত্রিকার সুস্থ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যানুগত ও তর্পণকর্মের দায়িত্বলাভে আমি কৃতকৃতার্থ।

এই শতাব্দীর পাঁচের দশকের মাঝামাঝি সময়ে আমি যখন তাঁকে প্রথম দেখি তখন তিনি গম্ভীর সম্ভ্রম উদ্রেককারী আমাদের বিভাগীয় প্রধান। প্রেসিডেন্সী কলেজের আঙিনায় তখনই দীর্ঘ সময় ধরে লালিত, পরিণত আমাদের তৎকালীন গুরুমণ্ডলের অনেকেই—অধ্যাপক সদানন্দ চক্রবর্তী, অমল ভট্টাচার্য, শৈলেন্দ্রনাথ সেন, জ্যোতি ভট্টাচার্য, ভবতোষ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখেরা। একজন ভীরু সদ্য মফস্বল শহর ছেড়ে আসা তরুণের কাছে তখনই কিন্তু মনে হয়েছিল তাঁর গাম্ভীর্যের আবরণের আড়ালে এক দায়বান ছাত্রবৎসল মানবিক ব্যক্তিত্ব, উজ্জ্বল স্বচ্ছল ছাত্রদের সঙ্গে যিনি দীন সকুণ্ঠদের সমস্যাও জানতেন, শুনতেন তাঁদের কথা এবং তাঁদের ব্যক্তিগত মর্যাদাবোধের মূল্য দিতে কখনও, বিভাগীয় প্রধান হিসেবেও, অস্বীকার করেন নি। একদিন তাঁকে প্রবল জ্ঞানী জেনে কলেজে ঢুকেছিলাম, কিন্তু এক পরিপূর্ণ মানবিক সহানুভূতিপ্রবণ মানুষ জেনেই কলেজ থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম। আমাদের কালে ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্কের মধ্যে সবসময়ই থাকত এক শ্রদ্ধার দূরত্ব। সেই দূরত্বের বেড়া হয়ত অতিক্রম করা যায়নি কোনো সময়ই। কিন্তু লক্ষ্য করেছিলাম, শিক্ষক হিসেবে তাঁর জ্ঞানভাষিতার পাশাপাশি ঈষৎ বক্র রঙ্গপ্রিয়তা ও এক অনুষঙ্গী স্বচ্ছল গল্পবয়নের ক্ষমতা। তিনিই শিখিয়েছিলেন, বাঙালী ছাত্রসমাজে অসমান প্রতিতুলনা দেবার নিরর্থক তৎপর ক্ষমতার অপব্যয় সম্পর্কে গোড়া থেকেই সতর্ক হতে, প্রসঙ্গে এনেছিলেন ফলস্টাফের প্রিন্স হেনরী ও আলেকজাণ্ডার দ্য গ্রেটের মধ্যে তুলনা দেবার হাস্যকর দৃষ্টান্তের কথা। আবার তাঁর কাছ থেকেই পেয়েছিলাম অন্যের গুণাবলীর প্রতি উদার শ্রদ্ধাশীলতার শিক্ষা। অনার্স পরীক্ষাক্রমের কোনও কূট বিষয়ে কথা পাড়তে গিয়ে শুনেছি, 'যাও, যাও, নিচে বসে আছেন that encyclopaedic man লাইব্রেরির কিউবিকেলে, ওনাকে গিয়ে ধরো।' স্যর অবশ্যই বলেছিলেন অসাধারণ অধ্যাপক ও শেক্সপীরিয় পাঠক আচার্য তারকনাথ সেনেরই কথা। জ্ঞানভাসিতা, পরিহাস-প্রবণতার পাশাপাশি আমার স্মৃতি[illegible] বিকীর্ণ হয়ে আছে তাঁর এই গুণগ্রাহিতার কথা—শিক্ষকদের বৃত্ত ছাড়ি[illegible] বারবার আবৃত্ত হয়েছে, তাঁর কথাবার্তায়, ছাত্রদের প্রসঙ্গেও। [illegible] বদলে নিতে পারতেন, জানতেন সময়ের সঙ্গে পা ফেলতেও। কত [illegible]

না তিনি তাঁর প্রথম দুটি বই 'দ্য আর্ট অব্ বার্নার্ড শ' এবং 'শেক্সপীরিয়ান কমেডি'র ভিক্টোরিয় ইংরেজির চাল পরবর্তী গদ্যগ্রন্থগুলির সপ্রতিভ ক্ষিপ্র আধুনিক ইংরেজি বাগধারায় পরিবর্তিত করে নিয়েছিলেন, ভাবলে অবাক লাগে। অথচ প্রেসিডেন্সী কলেজ ম্যাগাজিনে ১৯৫৪—৫৭ সালে আমার 'জীবনানন্দ' বিষয়ক দুটি নিবন্ধ প্রকাশিত হবার পর নিজের ঘরে আমাকে ডেকে বলেছিলেন কুট অসরল গদ্যশৃঙ্খলের বাইরে চলে আসার চেষ্টা করতে। মাস্টার মশাই, আজ এই পরবর্ত্তিতে দাঁড়িয়ে, আপনার উদাহরণের সামনে আশ্চর্য হয়েও, অকপটে স্বীকার করি সে কাজে আমি কোনদিনই সফল হতে পারলাম না।

ইংরেজি ভাষায় লেখালেখির ক্ষেত্রে তাঁর রচিত গ্রন্থাদির একটি তালিকা সংযোজিত হল। পাঠক দেখবেন, শেক্সপীয়র ছিল তাঁর আজীবনের অনুসন্ধান ও প্যাশান। কমেডি থেকে ঐতিহাসিক নাট্যমালায়, ট্রাজিডির চরিত্রাবলীর বিশ্লেষণে আবার সনেটের কালছন্দের নর্তনে তাঁকে আবৃত্ত হতে দেখি প্রাণবন্ত স্বচ্ছন্দ অভিব্যক্তিতে। পাশ্চাত্ত্য ও প্রাচ্য কাব্যতত্ত্বের ক্ষেত্রে তিনি রসগ্রাহী বিশ্লেষণের শক্তিতে আমাদের অভিনিবেশ সহজেই আদায় করে নেন। আর একটি প্রসঙ্গ এখানে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র ইংরাজি সাহিত্যের পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে এক সুপণ্ডিত ব্যক্তিত্ব হলেও বাঙলা সাহিত্যের নানা ক্ষেত্রেও তিনি তাঁর মূল্যবান মণীষার স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁর লেখা 'রবীন্দ্রনাথ', 'শরৎচন্দ্র', 'বঙ্কিমচন্দ্র', 'মধুসূদন : কবি ও নাট্যকার' বইগুলির কথা আজ আর কোনোভাবেই বাঙলা সমালোচনা সাহিত্যের বাইরে রাখা যায় না। ধন্যালোকের সটীক সংস্করণ সম্পাদনার মাধ্যমে তিনি সাহিত্যতত্ত্ব আলোচনার ক্ষেত্রেও বাংলায় পথিকৃৎ। ...ানচর্চার এতগুলি মহতী কর্মকাণ্ডের পরেও সুবোধচন্দ্র শেষজীবনে নিজেকে ...ত রেখেছিলেন স্বাধীনতার সংগ্রাম ও বাঙালী জীবনের রাজনৈতিক ... পটপরিবর্তনের নিরীক্ষায়। তাঁর India Wrests Freedom ...ক্রমী, মৌলানা আজাদের প্রথাসিদ্ধ স্বাধীনতা আন্দোলনের ...ের প্রতিবাদ। বিবেকানন্দের উপর লিখতে গিয়ে তিনি ...নেশাঁসের নতুন মূল্যায়ন ও উৎস নির্দেশ করার ... প্রয়াত আচার্যের স্মৃতিচারণায় যা বলতে ...তা ও জ্ঞানের পরিধিতে দাঁড়িয়ে বলেছি।

তাঁর ছাত্রদের মধ্যে অসংখ্য কৃতী বিদ্বজ্জন রয়েছেন ; তাঁরা কেউ এগিয়ে এসে একটি সুষ্ঠু পূর্ণাঙ্গ পর্যালোচনায় তাঁর বিদ্যাকর্মযজ্ঞের বিবরণ দিন, এই প্রত্যাশা নিয়ে শেষ করছি এ নিবেদন। স্যর, "More is thy due than more than all can pay"

আচার্য সুবোধচন্দ্রের রচিত গ্রন্থের একটি তালিকা :

The Art of Bernard Shaw
Shakespearean Comedy (1950)
Shakespeare's Historical Plays
Some Aspects of Shakespearean Tragedy (1972)
The Whirlgig of Time (1961)
A Shakespeare Manual (1977)
Hamlet Once More (1988)
Some Aspects of the Poetry of Tagore
Towards A Theory of the Imagination
An Introduction to Aristotle's Poetics (1971)
India wrests Freedom
Saratchandra. Man & Artist
Vivekananda
Sadananda Chakrabarti, Man & Scholar (1988)
রবীন্দ্রনাথ
শরৎচন্দ্র
বঙ্কিমচন্দ্র
মধুসূদন, কবি ও নাট্যকার
পরশুরামের হাস্যরস
তে হি নো দিবসা :

এগুলি ছাড়াও তাঁর সম্পাদিত সংসদ অভিধান গ্রন্থগুলি অবিস্মরণীয়।

প্রদ্যুম্ন মি

শ্রদ্ধাস্থ স্মরণ : সাগরময় ঘোষ

১৯শে ফেব্রুয়ারি দিনটি ছিল শুক্রবার। যথারীতি অধ্যাপনার কাজ শেষ করে বিকেলে দৈনিক 'কালান্তর' পত্রিকার অফিসে সম্পাদকীয় বৈঠকে যোগ দিতে যাব, এমন সময় জানতে পারলাম 'দেশ' পত্রিকার প্রবাদপ্রতিম সম্পাদক সাগরময় ঘোষ আর আমাদের মধ্যে নেই। মন ভারাক্রান্ত হয়ে গেল, তবু হাজির হলাম বাউতলার কালান্তর দফতরে, সম্পাদকীয় বৈঠকের শেষে, শ্রদ্ধেয় নৃপেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশেষ অনুরোধে পত্রিকার জন্য স্টাফ রিপোর্টার লিখিত সংবাদ-এর সঙ্গে লিখতে হলো বিশেষ 'সংযোজন'। সেদিন আর নাসিং হোমে সাগরময় ঘোষকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে যেতে পারিনি। যেতে পারিনি তাঁর পুত্র বাবুই (আলোকময় ঘোষ)-এর ডাকা ৭ই মার্চের সকালের স্মরণসভাতেও। আজ, 'পরিচয়' পত্রিকার পক্ষ থেকে এবং আমার নিজের তরফ থেকে তাঁকে বিনম্র শ্রদ্ধা ও শেষ নমস্কার জানাই।

কেন 'দেশ' পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে সাগরময় ঘোষকে প্রবাদ-প্রতিম লিখলাম সেই কথাটি আগে বলি। সাগরময় ঘোষ ছিলেন এক ব্যতিক্রমী সম্পাদক। নামত তিনি সম্পাদক ছিলেন ১৯৭৬-এর ১লা মে থেকে ১৯৯৭ এর ১লা নভেম্বর পর্যন্ত। ১৯৯৭-এর নভেম্বরে সম্পাদনার প্রত্যক্ষ কাজ ছেড়ে দিলেও আমৃত্যু ছিলেন সাম্মানিক সম্পাদক অর্থাৎ প্রয়াণ তাঁর বিচ্ছেদ ঘটানোর আগে পর্যন্ত পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তাঁর প্রিয় পত্রিকার সঙ্গে তাঁর আত্মিক যোগের বিচ্ছেদ ঘটাননি। এহো বাহ্য। ১৯৭৬ এর আগে চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি থেকেই কার্যত তিনিই সম্পাদক। এত দীর্ঘকাল কোনও পত্রিকা সম্পাদনার নজির বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ঘাঁটলে খুব বেশি পাওয়া যাবে [illegible]। এখন যা পাক্ষিক, আগে তা ছিল সাপ্তাহিক, হয়তো বা বাংলা ভাষায় [illegible]প্রধান সাহিত্য সাপ্তাহিক। সেই 'দেশ' পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে [illegible] বেশি সময় কাটিয়ে গেলেন সাগরময় ঘোষ। বস্তুত 'দেশ' ও [illegible]ছেন একই মুদ্রার দু'দিক। একদিক ছাড়া অন্য দিকের অস্তিত্বই [illegible]মাদের মতন অজস্র অনুরাগী এবং অতোধিক সংখ্যক বন্ধু [illegible] পৃথিবী।

[illegible]আমিও ছিলাম অংশীদার ; আমার কাছে—আর

অনেকের কাছেই যেমন, তিনি ছিলেন শুধুই সাগরদা। সাগরদারই স্নেহ ও প্রশ্রয়ে এই অধিকার পেয়েছিলাম ভেবে মন কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে। সাগরদার সঙ্গে আলাপ রবীন্দ্রচর্চাবিদ পুলিনবিহারী সেনের মাধ্যমে। ১৯৭৬-এ সাগরদা 'দেশ' এর সম্পাদক হলেন ছাপার অক্ষরে; ঐ বছরই 'দেশ' দফতরে তাঁর ঘরে নিয়ে গিয়েছিলেন আর এক শান্তিনিকেতনের আশ্রমিক কানাইলাল সরকার। আর সেই বছরই কানাইদা ও সাগরদার ইচ্ছে অনুযায়ী প্রথম একটি লেখা লিখেছিলাম দেশ পত্রিকায়। সেটি ছিল হোসেনুর রহমান লিখিত 'হিন্দু-মুসলিম রিলেশনস্ ইন বেঙ্গল' নামক এক সুলিখিত বইয়ের সমালোচনা। সেই থেকে বিগত তেইশ বছর ধরে ইতিহাসচর্চার পেশাদারি কাজের ফাঁকে বাংলায় প্রাবন্ধিক এবং গ্রন্থ সমালোচক হিসেবে যে কথঞ্চিৎ মান্যতা পেয়েছি, আজ সকৃতজ্ঞচিত্তে ও সবিনয়ে স্বীকার করি, তা মূলত কয়েকজনের দৌলতে। এজন্য সাগরদা, কানাইদা, পুলিনদা (পুলিনবিহারী সেন) এবং চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঋণ আমৃত্যু মনে রাখব।

যাক্, ব্যক্তিগত দুর্বলতা এই স্মরণ লেখাতে টেনে আনব না। শুধু দীর্ঘকাল সম্পাদক ছিলেন বলেই যে সাগরদা প্রবাদ-প্রতিম তা কিন্তু নয়। তাঁর জীবিত কালেই সাগরময় ঘোষ স্বয়ং হয়ে উঠেছিলেন একটি প্রতিষ্ঠান। সাগরদার সবচেয়ে বড়ো পরিচয় কী? সম্পাদক? না, বোধহয় এর উত্তর হবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর ছিল অকৃত্রিম ভালোবাসা যা তাঁকে অনন্য করেছে। তাঁর প্রয়াণের পর 'দেশ' পত্রিকার (৬ মার্চ ১৯৯৯) সংখ্যায় 'সম্পাদক বিষয়ে সম্পাদকীয়'তে লেখা হয়েছে "তিনি ছিলেন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আজন্মপ্রেমিক। নিজে অবশ্য বলতেন, প্রেমিক নয়, সেবক।"

প্রেমিক না সেবক কোন শব্দটি আমরা বেছে নেব, সেই তর্ক বরং থাক। তবে যা তর্কাতীত তা হলো তাঁর সময়কার প্রায় সব লেখকেরই তিনি ছিলেন অনুরাগী-বন্ধু, কখনও পৃষ্ঠপোষক, কখনও ভরসাস্থল, কখনও বা মনের আশ্রয়। স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা কথাসাহিত্যের জগতের চার জ্যোতিষ্ক সমরেশ বসু, শংকর, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কিংবা সত্যজিৎ রায় যেন সেই অনুরাগেরই ফসল। তিনি হলেও হতে পারতেন খ্যাতিমান রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী, অন্তত অগ্রজ শান্তিদেব ঘোষের মতোই জনপ্রিয় হতে পারতেন। তাঁর গানের গলা ছিল যেমন সুরেলা, তেমনি ভরাট। অথচ

আশ্চর্য ঔদাসীন্যে সেই দিকেই গেলেন না। একথা একদিন আড্ডার ফাঁকে বলাতে আমাদের প্রয়াত বন্ধু এবং কবি এবং সাগরদারও নিকটাত্মীয় দীপক মজুমদার গেলাসে চুমুক দিতে দিতে বলেছিল, 'অংক কষে সবাই সবকিছু হয় নাকি।' সাগরদা হলেও হতে পারতেন বাংলা ভাষার নামী লেখক কিন্তু সে পথেও না গিয়ে আজীবন কাটিয়ে গেলেন লেখক তৈরির কাজ করে।

যা হলেও হতে পারতেন তা নয় 'যদি'র কথা কিন্তু একটি অসামান্য গুণের কথা তো বলতেই হবে। নিজে সুলেখক, একটি প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য সাপ্তাহিক অর্ধশতক ধরে সম্পাদনা করছেন, অসম্ভব রসবোধ, লেখনি স্বতঃস্ফূর্ত, আড্ডায় ততোধিক প্রাণবান, সাংস্কৃতিক ঘরানায় লালিত, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কাছে যাঁর শিক্ষা তিনি কিন্তু সুদীর্ঘকাল ব্যতিক্রমী সংযমে সম্পাদনার আড়ালে নিজের লেখক সত্তাকে ঢেকে রেখেছিলেন। পত্রিকার পৃষ্ঠায় নিজেকে আড়াল করে রাখা এক ঈর্ষণীয় গুণ। অবশ্য তাঁর কলম থেকে পেয়েছি কিছু অসামান্য বই : সম্পাদকের বৈঠকে, একটি পেরেকের কাহিনী, দণ্ডকারণ্যের বাঘ, হীরের নাকছাবি এবং ঝরাপাতার ঝাঁপি। এ-ছাড়া তাঁর সম্পাদনায় বেরিয়েছে দেশ সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে গল্প, কবিতা এবং প্রবন্ধের সংকলন, দেশ শারদীয় গল্প সংকলন, 'পরম রমণীয়' নামে রম্য রচনার সংগ্রহ, শতবর্ষের শত গল্প নামে গল্প সংগ্রহ।

১৯১২ খ্রিষ্টাব্দের ২২ জুন তৎকালীন পূর্ববঙ্গের (অধুনা বাংলাদেশের অন্তর্গত) কুমিল্লা জেলার চাঁদপুর মহকুমার বাজাপ্তিতে জন্ম। পিতা কালীমোহন ঘোষ ছিলেন একদা জাতীয় বিপ্লবী, মাতা মনোরমা দেবী। কালীমোহন পরে রবীন্দ্রানুরাগী হিসেবে জীবন কাটান, বিশেষত রবীন্দ্রনাথের পল্লীগঠন কর্মে তিনি ছিলেন স্মরণীয় সহকর্মী। ছ'ভাই, এক বোনের মধ্যে জ্যেষ্ঠ শান্তিদেব স্বনামখ্যাত শিল্পী। এক কনিষ্ঠ শুভময় একদা 'মস্কোর চিঠি' লিখে সাড়া ফেলেছিলেন। আর এক কনিষ্ঠ সলিল বোম্বাইয়ের বাঙালি, সাংবাদিকতায় তাঁরও খ্যাতি। বিদ্যালয়শিক্ষা শান্তিনিকেতনে, সেখানে অগ্রজদের মধ্যে ছিলেন সৈয়দ মুজতবা আলি, পুলিনবিহারী সেন, ক্ষেমেন্দ্রমোহন (কঙ্কর) সেন, কানাইলাল সরকার প্রমুখ। সকলের সঙ্গেই তাঁর সম্পর্ক ছোটভাইয়ের। শান্তিনিকেতনের পর কলকাতার সিটি কলেজ থেকে স্নাতক হন। ১৯৩২-এ দেশব্যাপী আইন

অন্যান্য আন্দোলনে অংশ নিয়ে ছ'মাস কারাবাসে ছিলেন এবং জেলেই আলাপ পরবর্তীকালে আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক অশোককুমার সরকারের সঙ্গে। এই বন্ধুত্ব অশোককুমারের হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুকাল পর্যন্ত অটুট ছিল।

মুক্তি পেয়ে সাগরময় ঘোষ উত্তরকালে বাংলার ফজলুল সরকারের প্রকাশন বিভাগে, তারপর বেঙ্গল ইমিউনিটিতে স্টোরকিপার হিসেবে চাকরি করার পর, সাংবাদিক হিসেবে প্রথমে 'নবশক্তি' পত্রিকায় এবং পরে 'যুগান্তর' কাগজে যোগ দেন। যুগান্তরের কাজ ছেড়ে দিয়েই পুরোনো বন্ধু অশোককুমার সরকারেই আহ্বানে ১৯৩৯-এর ১ ডিসেম্বর 'দেশ' সাপ্তাহিক পত্রিকার সহকারী সম্পাদক হিসেবে যোগ দেন। এখানে দু-একটি কথা বললে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। 'দেশ' পত্রিকার প্রথম সম্পাদক ছিলেন সত্যেন্দ্র-নাথ মজুমদার, সুপরিচিত বামপন্থী নেতা। তিনি আনন্দবাজার পত্রিকা সম্পাদনাতেও যুক্ত। দ্বিতীয় সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র সেন, যাঁর আমলে যোগ দেন সাগরদা। পরে অশোককুমার সরকারের আমলে ক্রমে উত্তরণ। বস্তুত ১৯৪২ থেকেই তাঁর হাতেই প্রকৃত ক্ষমতা। তবু এই ক্ষমতার সদ্ব্যবহার কী-ভাবে করতে হয় তার বহুবিধ দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে আছে দেশের পাতায়—বিশেষ বিষয়ে বিশেষ সংখ্যায়। রবীন্দ্রজন্ম উপলক্ষে সাহিত্য সংখ্যা, শারদীয়াতে রবীন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য কবিদের অপ্রকাশিত রচনা বা পত্রাবলী ছাপানো, নতুন লেখক তুলে আনা এমন কতো উদাহরণ দেব।

১৯৪৭-এ বিয়ে ; স্ত্রী আরতি। পুত্র আলোকময়, কন্যা সাবনি। আগে থাকতেন এস, আর দাশ রোডে, দক্ষিণ কলকাতায় ; শেষজীবনে সল্টলেকে। ১৯৬১-তে ইয়োরোপ, ১৯৬৭-তে আমেরিকা, জাপান এবং হংকং এবং ১৯৮৯-এ বাংলাদেশে ভ্রমণ করেছেন। নিজেও 'বাঙাল' সাগরদা খেলাধুলোর ব্যাপারে খুব উৎসাহী ; ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের কট্টর সমর্থক। একদা নিয়মিত মাঠেও যেতেন। ক্রিকেটেরও অনুরাগী। আবার সমঝদার উচ্চাঙ্গ এবং রবীন্দ্র-সঙ্গীতের। ব্যক্তিজীবনে উদার এবং গোঁড়ামিমুক্ত সাগরদা লেখকদের সঙ্গে খোলামনে মিশতেন, আড্ডায় বয়সের পার্থক্য কখনও বোঝা যেত না। আবার লেখা পছন্দ না হলে স্পষ্ট বলে দিতেন। চলচ্চিত্র, মঞ্চ, চিত্রকলার জগতের সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল নিবিড়।

ভালো লাগলে বলতেন ; আবার বকতেনও। মনে পড়ছে পুলিনবিহারী

সেনের প্রয়াণের পরে গৌরদার সঙ্গে আলোচনা ক'রে 'দেশ' পত্রিকায় স্মরণ প্রবন্ধ লিখতে বললেন। ব্যথাতুর মনে সেদিন লিখেছিলাম 'রবীন্দ্রচর্চায় কৌলিন্য'। কানাইদা, ভবতোষ দত্ত, শঙ্খ ঘোষ, সুবিমল লাহিড়ী, শুভেন্দু-শেখর মুখোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, অনাথনাথ দাস প্রমুখ রবীন্দ্রানুরাগী মানুষজনের শুভাশিস পেয়েছিলাম। এই সেদিন জননী করুণাময়ী চৌরিজার মৃত্যুতে সাগরদার নির্দেশে লিখতে হলো, আমার মতো আপাদমস্তক নাস্তিককে, মাদারের উপর স্মরণলেখঃ 'সেইখানে যে চরণ তোমার বাজে।' 'দেশ' পত্রিকার তরফ থেকে বর্তমান ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক মার্ক্সবাদী কিন্তু কাজের জন্য সর্বজনশ্রদ্ধেয় ডঃ হাবিবের এক অন্তরঙ্গ, বড়ো সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম ; সে ব্যাপারে সাগরদার দরাজ হাতে সহযোগিতা ও উৎসাহ ভোলার নয়। একবার বলেছিলেন, রোমিলা থাপারের ইন্টারভিউ যোগাড় করতে পারো। হ্যাঁ, বলেছিলাম। আজ ভাবি, সে কাজ আজ করব কাল করব ক'রে আর কোনও দিন হয়ে ওঠে নি। একবার নীরদ-চন্দ্র চৌধুরীর একটি ইংরিজি বইয়ের কড়া সমালোচনা করায় সাগরদা বললেন, এ লেখা ছাপা হবে না। পরে জানলাম সেবার নীরদবাবু আনন্দ পুরস্কার পেয়েছেন। আমি লেখাটি 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় ছাপালাম। সাগরদা কিন্তু রাগ করেন নি। বস্তুত এক আধুনিকমনস্ক তরুণ মন, উদার ও অসাম্প্রদায়িক, রবীন্দ্রানুসারী ও 'সাহিত্যসেবক' মানুষ চলে গেলেন। আমাদের প্রণাম।

গৌতম নিয়োগী
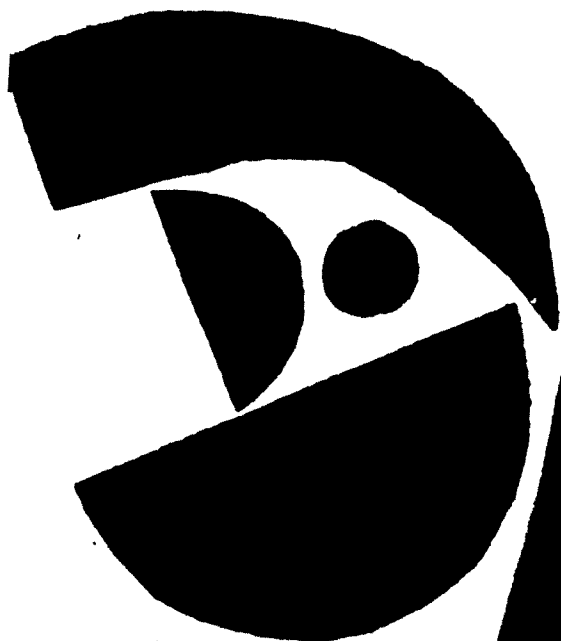
পরিচয়

নীরদ সি চৌধুরী

অশোক মিত্র

শান্তিময় রায়

পরিচয়

মে-জুলাই
বৈশাখ-আষাঢ়, ১৪০৬
১০-১২ সংখ্যা ৬৮ বর্ষ

প্রচ্ছদ : পরিতোষ সেন

সম্পাদনা দপ্তর : ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭

রঞ্জন ধর কর্তৃক বাণীরূপা প্রেস, ৯-এ মনোমোহন বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ব্যবস্থাপনা দপ্তর ৩০/৬, ঝাউতলা রোড, কলকাতা-১৭ থেকে প্রকাশিত।

সন্ধ্যা সিংহ

পার্ল বাকের উপন্যাসের ভারতবর্ষ

নোবেল প্রাইজ অধিকারিনী, দি-গুড আর্থ (The Good Earth) উপন্যাস লেখিকা পার্ল এস বাক, তাঁর লেখা গল্পে উপন্যাসে এশিয়ার কল্পচিত্র বার বার এঁকে এক সুদূর প্রসারী প্রভাবের সৃষ্টি করেছেন। জীবনের প্রারম্ভ হতে বয়োবৃদ্ধির সন্ধিক্ষণ পর্যন্ত এশিয়াবাসীদের মাঝেই কাটিয়েছেন বলে ওদের জীবনধারা দরদী দৃষ্টি নিয়ে ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছিলেন। ওঁর মনে এশিয়ার প্রতি গভীর আগ্রহের সঞ্চার, এই মহাদেশের আন্তর্জাতিগত সম্পর্ক একটি শক্তিময় স্পন্দনশীল উপজীব্য হয়ে উঠেছে তাঁর লেখায়। চীন দেশ ছাড়া এশিয়াস্থিত যে দেশ কটি ওঁর লেখায় ফুটে উঠেছে, তা হল ভারত, জাপান আর কোরিয়া। বিদেশী উপাদানকে কাজে লাগানোর প্রয়াসমাত্র তাঁর বই-এ কোথাও নেই। বরঞ্চ এসব দেশের কৃষি, সংস্কৃতি, জাতীয় ইতিহাস, মানুষের চিন্তা ভাবনা উপলব্ধির তুলি টেনে সেই দেশের চেতনা শক্তির চিত্রাঙ্কন করেছেন—এটি নিঃসন্দেহে পার্ল বাকের বৈশিষ্ট্য।

যে দুটি উপন্যাস পার্ল বাক ভারতকে কেন্দ্রবিন্দু করে লিখেছেন তা হল 'কাম মাই বিলাভেড' (Come My Beloved) প্রকাশিত হয় ১৯৩৫-এ এবং 'ম্যাণ্ডলা' (Mandala) ১৯৭০-এ প্রকাশিত। ভারতের প্রাচীন সভ্যতা ও কর্মময় বৈচিত্র্য তাঁর হৃদয়কে বিশেষভাবে নাড়া দিয়েছিল, যার একাধিক উল্লেখ পাওয়া যায় তাঁর আত্মজীবনী 'মাই সেভারেল ওয়ার্ল্ডস্' (My several Worlds)-এ "ভারতবর্ষ বরাবরই আমার জীবনের প্রেক্ষাপটের অংশ বিশেষ"। তাই ভারত দেশ দেখে তার তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করা তাঁর পক্ষে হর্ষসূচক আহ্বান। শ্রমতী বাক্ দুবার ভারতে এসেছিলেন প্রথমবার ১৯৪৩ এবং দ্বিতীয়বার ১৯৬৩ সালে। এই দুটি উপন্যাসই যথাক্রমে তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ অনুভূতির ফলশ্রুতি। প্রসঙ্গতঃ 'কাম মাই বিলাভেড' বৃটিশ-শাসিত ভারতের ঔপনিবেশিক ইতিহাসের এক সঙ্কটময় সময় তুলে ধরেছে আর 'ম্যাণ্ডলা' আধুনিক ভারতের রূপদান করার চেষ্টা করেছে, যে ভারত স্বাধীন, উন্নতশির, অতীতের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হবার জন্য ব্যগ্র। ফরস্টারের 'এ প্যাসেজ টু ইণ্ডিয়া' (A Passage to India) বই-এর মত বিদেশীর চোখে শুধু ভারতীয় জীবনধারার বিশ্লেষণ নয়, দুটি উপন্যাসেই প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের পারস্পরিক সম্পর্ক ভারতীয় পটভূমিতে যে রূপ নিয়েছে তারই উৎস সন্ধানের অভিপ্রায় ক্রিয়াশীল।

'কাম মাই বিলাভেড' ভারতে এক মার্কিনী মিশনারী পরিবারের চারটি প্রজন্মের কাহিনী। উনবিংশ শতকের শেষ দশক থেকে বিংশ শতকের মধ্যবর্তী কাল ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক আবশ্যিক প্রগতি ও রদবদলকে ঘিরে উপন্যাসটির ব্যাপ্তিকাল। এই সময়কালে ইতিহাস বহু ঘটনার সাক্ষী স্বরূপ হয়ে রয়েছে—ভারতবর্ষে দৃঢ়মূল বৃটিশ শাসনব্যবস্থা, শাসিত ভারতের ওপর সাম্রাজ্যবাদী সুযোগ সুবিধার প্রভাব, ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ক্রমবিকাশ, ভূমিজীবীদের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ, ছাত্র বিক্ষোভ, গান্ধীর

প্রাধান্যের উদ্ভব, বৃটিশ শাসন ব্যবস্থার হস্তান্তর এবং সবশেষে স্বাধীনতা লাভের পর প্রথম কয়েকটি বছর। এ সমস্ত ঘটনাবলী উপন্যাসের গতিময় পরিদৃশ্য পৃষ্ঠপটমাত্র—মূল চরিত্রগুলোকে যেন আলতোভাবে ছুঁয়ে চলে যায়। ঘটনাস্রোত তাদের জীবনে বিশেষ কোন পরিবর্তন সাধন করে না। শুধু এই কারণে লেখিকা পার্ল বাকের আদৎ আগ্রহ মানবিক—রাজনৈতিক নয়। বস্তুত, যে ঘটনাগুলো ঘটতে থাকতো যেমন জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকান্ড, ১৯৩০ সালে প্রিন্স অব ওয়েলস্ এর সম্মানার্থ বম্বের দরবার, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা ইত্যাদি, মাঝেমধ্যে তার রেশ প্রতিধ্বনিত হয়ে কাহিনীকে আরো বাস্তবভিত্তিক করে তুলেছে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ব্যবহারিক সম্পর্কের কাঠামো রচনায় ওই খুঁটিনাটি বিবরণ কাজে লাগিয়েছেন লেখিকা। কিপলিং, ফরস্টার ও এডওয়ার্ড টম্পসন-গোত্রীয় ইংরিজী লেখক, যাঁরা ভারতের আন্তর্জাতিগত বিভেদ বৈষম্যের ছবি এঁকেছেন, পার্লবাকের দৃষ্টিভঙ্গী তাঁদের থেকে কিছুটা একেত্রে স্বতন্ত্র। প্রাক্ স্বাধীন ভারতে শাসক ও শাসিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সৃষ্ট সংঘর্ষ ও সমস্যার প্রতি বিভিন্ন মাত্রায় সংবেদনশীল অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে তাঁরা লিখেছেন। পার্ল বাকের মূল উদ্দেশ্য কিন্তু তা নয়। যদিও বৃটিশ-শাসিত ভারতের প্রেক্ষাপটে লেখা উপন্যাসে ইংরেজ ও ভারতীয় অসম দৃষ্টিকোণ সম্বন্ধে মতামত জারী না করে পারেননি, তবু এই কথাই দৃঢ়ভাবে বোঝাতে চেয়েছেন যে আমেরিকার মানুষ ভারতের মানুষজনের সঙ্গে মেলবন্ধনে অসফল হয়েছে। ভারত-ইংরেজ সংশয় সংঘাত থেকে পৃথক ভারত মার্কিনী সম্পর্কে বৈচিত্র্যের সন্ধানে পার্ল বাক প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সাহিত্য ক্ষেত্রে বিস্তৃত করে এক নতুন ধারার সংযোজনা করেছেন। 'কাম মাই বিলাভেড'-এ যে বিশেষ ধরনের সমস্যা পেশ করেছেন, আর কোন লেখক এ-ধরনের সমস্যায় নিজেকে জড়াতে চাননি কিন্তু মুক্তমনা মানবধর্মী লেখিকা পার্ল বাক সাবলীলভাবে এসকল পরিস্থিতি মোকাবিলা করেছেন।

'কাম মাই বিলাভেড' উপন্যাস হল ঘটনাচক্রে বা ভাগ্যের ফেরে ভারতের সংস্রবে এসে পড়া চার মার্কিনী প্রজন্মের জীবন ও অনুভবের কাহিনী, যার পুরোধা ক্রোড়পতি ডেভিড ম্যাকার্ড (সিনিয়র) ভারত ভ্রমণে এসে এদেশের মানুষের অকল্পনীয় দুঃখ দুর্দশায় এতো বিচলিত হন যে ত্যাগ ও ধর্মভাবে আপ্লুত হয়ে পড়েন। গল্পটিতে দেখি, পুত্র ডেভিড ও পৌত্র টেড্ উভয়েই সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত রুচিমাফিক ভারতের জনগণের কল্যাণ সাধনের সংকল্প নেয়। ডেভিড বাপের অমতে ধর্মশিক্ষক হয়ে ভারতে আসে আর টেড তার বিবেকের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ভারতের গ্রামে কাজ করতে এলো বাপের বিরুদ্ধাচারণ করে। এইভাবে মার্কিনীদের অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রারম্ভিক সূচনা ক্রমে ভারত-মার্কিনী সংঘাতের রূপ নেয়। মার্কিনী চরিত্রগুলোর মধ্যে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব তার কারণ হলো ওদের দ্বিবিধ নীতি—একটি প্রযোজ্য শুধু নিজেদের ওপর অন্যটি আমজনতার ওপর। ধনী শিল্পপতি সিনিয়র ডেভিড ম্যাকার্ডের ইচ্ছা হল ধর্মবিষয়ক অধিবেশনের জন্য ভারতের যুবক দলকে শিখিয়ে পড়িয়ে তৈরী করেন। কিন্তু তার একমাত্র ছেলে শিক্ষানবীশ হয়ে যোগ দিতেই ক্রোধবশে পরিকল্পনা বাতিল করে দিলেন। টেড গ্রামসেবার কাজ বেছে নেওয়ায় জুনিয়র ডেভিড ভারী বিরক্ত হল। মোক্ষম আঘাতটি এলো টেডের কনিষ্ঠা মেয়ে লিভির তরফ থেকে। এই মেয়ে ভারতে জন্মেছে, ভারতীয়দের মতোই বড়ো হয়েছে। সেই লিভি এক ভারতীয় ডাক্তারকে জীবনসঙ্গীরূপে বিয়ে করার অনুমতি চাইলো। লিভির অনুরোধ টেডের জীবনাদর্শের অগ্নিপরীক্ষা হয়ে দাঁড়ালো—ভারতবর্ষ কি তাঁর কাছে একটা বিরাট ত্যাগের দাবী-স্বরূপ?

কিন্তু এ ত্যাগ করার সামর্থ্য তার নেই—দীর্ঘ সময়ের জাতিগত বিদ্বেষের বিষময় বোঝা তার মনকে কঠোর করে দিয়েছে, লিভি ও যতীনের মিলনকে সে হীন চোখে দ্যাখে। টেড ঠিকই বুঝেছিল যে সে আদর্শচ্যুত হল, তার আমেরিকা ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত আধ্যাত্মিক পরাজয়েরই স্বীকৃতি ; সেই সঙ্গে লিভি ও তার প্রণয়ীর মাঝে মহাসাগরের দুস্তর ব্যবধান সৃষ্টি হয়ে গেল।

'মাই সেভারেল ওয়ার্ল্ডস'-এ পার্ল বাক বুঝিয়ে বলেছেন কেন তাঁর উপন্যাসের সমাপ্তি ঐ ভাবে হয়েছে " আমাদের (আমেরিকার মানুষের) জীবনকাল বোধ করি এতো ব্যাপক ও দীর্ঘ নয় যাতে সার্বিক উপলব্ধি হয় যে উদ্দেশ্য যেমনই হোক না কেন, জীবনে কোন কিছু প্রাপ্তির মূল্য সম্পূর্ণ শর্তশূন্য। আমার কাহিনীতে তিনজন খৃষ্টান ধর্ম প্রচারকের চরিত্রে আমি এ কথা প্রমাণ করেছি। যতো মানুষকে আমি জানি তার মধ্যে মিশনারীরা হলেন তাঁদের নিজস্ব ভাবধারায় সবচেয়ে নিষ্ঠাবান, সবচেয়ে সহজ সরল মানুষ। তথাপি কেন টেড্ এতো ত্যাগ্ কৃচ্ছ্রসাধন সত্ত্বেও দুনিয়াকে বদলাতে পারলো না? দুর্ভাগ্য এই যে আন্তরিকতার অভাব ছিল বলে পর্য্যাপ্ত হয়নি এ ত্যাগ, তাই তার বিবেক বিশ্বাসের উচিৎ মূল্য দিতে সে অপারগ হল। নিজের ধর্মমতের সম্যক উপলব্ধি করতে পারেনি বলেই আংশিক দাম মেটাতে চেয়েছে। বারংবার এই একই বিচ্যুতি আমি নিজের দেশেও দেখতে পেয়েছি, শুধু খৃষ্টানদের মধ্যে নয়। কিন্তু ভারতের মানুষজন জানে জীবনাদর্শকে সমগ্রভাবে রূপায়িত করতে কী কঠোর মূল্য মানুষকে দিতে হয়। তারা বোঝে, তাই আমার বই তাদের কাছে প্রহেলিকা নয়।"

ভারত মার্কিন মৈত্রীবন্ধনের নিষ্ফলতা ও তার পরিণাম 'কাম মাই বিলাভেড' এ আলোচ্য বিষয়। উপন্যাসের এই মূল উপাদান ঘিরে রচনার অগ্রগতি। নিষ্ফল সম্পর্কের সুর অকাট্যভাবেই বাজতে থাকে যখন বারে বারে দেখি ম্যাক্ আর্ডসরা বেশকিছু বছর বসবাস করার পর ভারত ছেড়ে চলে যাচ্ছে, যদিচ প্রত্যেক জনেই ভেবেছিল স্থায়ীভাবে বাস করবে। ডেভিড ও টেড উভয়ের ক্ষেত্রেই যৌবনের উষ্ণ প্রাণশক্তি ও ধর্মোচ্ছ্বাস মিইয়ে মধ্য বয়সের শুষ্ক শীতল কর্তব্যবোধে পরিণত হল যা অন্তরাত্মার নিরন্তর দাবী মেটানর ক্ষমতা রাখে না। লিভি নিঃশর্ত ভাবে ভালবাসে ভারতবর্ষকে, তবু তার আশা আকাঙ্খাও অপূর্ণ থেকে যায়। যতীনের সন্তানের মা হতে পারলে হয়ত বা তার বাপ মা যতীনের সঙ্গে তার বিয়ে দেবে এই ধারণায় সে অন্তঃসত্তা হবার ব্যাকুল চেষ্টা করে কিন্তু ভাগ্য বাদ সাধে। নৈরাশ্যে ভরা নিঃসঙ্গতার ভাকে ফিরতে হল স্বজাতীয়দের মাঝে নিজের দেশে, অতীতকে একপাশে ফেলে রেখে। যুবাগোষ্ঠীর মাধ্যমে আশার রশ্মিটুকু জ্বালিয়ে তমসাবৃত প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সম্পর্কের বিশালায়তনে দেখাতে চেয়েছেন পার্ল বাক—হয়ত পরের প্রজন্মে কার্যকরী হবে তবু আশার ইঙ্গিত তো আছে। টেডের সঙ্গে যতীনের কথোপোকথনে এই ইঙ্গিত ধরা পড়ে। "লিভিকে আমি বিয়ে করব না কারণ ভাগ্যলিপি তা নয়, লিভিও জানে সে কথা। কোনদিন লিভি যদি তার স্বজাতি কারুকে বিয়ে করে সন্তান লাভ করে আর আমরা যে ভাবে জীবনটা কাটাতে চেয়েছিলাম সেই সন্তান তাই চায় তাহলে লিভি সর্বান্তঃকরণে সায় দেবে। মানুষের এক প্রজন্মের বিচাবরোধ ও কাল

(সময়) একজোট হয়ে ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রণ করে মহাশয়, এ সেই কাল! আমি এ কথা বিশ্বাস করি"। বিবর্তনের ধারাটি মানবিক সম্পর্কের বৃত্তেও যেমন অন্য ব্যাপারেও তেমনি ক্রমিক। পার্ল বাক এখানে যা লিপিবদ্ধ করেছেন তা হল প্রাচ্য প্রতীচ্যের সমন্বয় বিকাশের একটি স্তর মাত্র এবং সুদূর ভবিষ্যতে পরিবর্তনের সম্ভাবনা আছে, উপন্যাসের শেষাংশে আশীর্বাদ স্পষ্টত অন্তর্নিহিত রয়েছে।

'কাম মাই বিলাভেড' উপন্যাসে সংঘাত শুধু আন্তর্জাতিগত বৈষম্যপ্রসূত নয়। ভারতীয় ও মার্কিনীদের দৃষ্টিভঙ্গী ও জীবনধারার বিপুল ব্যবধান—একটি প্রাচীন প্রতিষ্ঠিত সভ্যতা অন্যটি প্রতিদ্বন্দ্বী স্পন্দনশীল নবীন একটি জাতি। স্বভাবত মার্কিনজাত শুধু কর্মোদ্যম নয়; পাশ্চাত্যের ব্যক্তি স্বার্থবাদ, প্রগতি ও বস্তুবাদের প্রতীক। অপর দিকে ভারতীয়দের সমাজব্যবস্থা মূলত গতানুগতিক যার ফলে গ্রামীণ মানুষগুলোর জীবনে কয়েক প্রজন্ম ধরে কোন পরিবর্তন ঘটেনি। স্বভাবজাত ঔদাসীন্যে ওরা সমাজের অন্যায় অনাচার মেনে নেয়, দুঃসহ দারিদ্র্যও বঞ্চিত জীবন অদৃষ্টের লিখন বলে সহ্য করে। জীবনের দুরবস্থা ও অনটন শোধরাতে পাশ্চাত্যবাসী কিন্তু রুখে দাঁড়াবে। শিক্ষিত গোষ্ঠীর মধ্যে কিছুটা প্রয়াস দেখা যায় জীবনাবস্থায় রদবদল আনার, তবে অদৃষ্টকে লঙ্ঘন করার মনোবল নেই; যেমন নিজের অদৃষ্টকে তৈরী করতে সাহস হল না যতীনের। লিডির চরিত্রে যে বিদ্রোহীভাব ফুটে ওঠে তা পশ্চিমী ভাবধারার ফল। এই দুটি বিপরীতমুখী মানসিক বৃত্তি তুলে ধরার সময় পার্ল বাক সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ নিস্পৃহ থেকেছেন, কারো পক্ষে বা বিপক্ষে যাননি, পাঠকের ওপরেই বিচারের ভার ছেড়ে দিয়েছেন।

এই উপন্যাসে ভারতীয় চরিত্র চিত্রণে আদর্শবাদের ছোঁয়া একটু লেগেছে দরিয়ার স্ত্রী নীলামনির চরিত্রে, তা স্পষ্ট বোঝা যায়। রহস্যময়ী ভারতীয় নারীর প্রতিকী সে—প্রজ্ঞা প্রহেলিকা, তারুণ্য ও প্রবীণতা, সারল্য ও কূটবুদ্ধি, কোমলতা ও ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার সহমিশ্রণে গড়া। নীলমণির মার্কিনী প্রতিরূপের মনে বিহ্বলতা ও বিচিত্র অনুভূতির তালগোল ঘটতে থাকে। সে তথ্যটি পার্ল বাক যদৃচ্ছ কাজে লাগিয়েছেন বিদেশীর উপাদান হিসেবে। নীলামণি পুরোদস্তুর ভারতীয় মেয়েমানুষ, অলিভিয়ার চোখে তাকে অন্য উপগ্রহের বাসিন্দা মনে হয়। দরিয়ার চরিত্র রচনায়ও আদর্শের কিঞ্চিৎ ছোঁয়াচ লেগেছে, যদিও পার্লবাক ওকে রক্তমাংসের মানুষ হিসেবে গড়েছেন। এ চরিত্রটি লেখিকার পছন্দসই নমুনা যার প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই ম্যাণ্ডলা উপন্যাসে জগৎ-এর চরিত্রে। দরিয়া রাজবংশদ্ভূত, বিদেশে শিক্ষিত, তীক্ষ্ণ ধীসম্পন্ন জ্ঞানপিপাসু মানুষ—ভারতের সমস্যা সমাধানে ওর পাশ্চাত্য মাসিকতা কার্যকরী করতে চায়। নেহরুর সঙ্গে সাদৃশ্য পাওয়া যায় কি? প্রেরণার উৎস হয়ত বা পুরাতন ও নবীন ভাবধারার সমন্বয় ঘটেছে দরিয়ার চরিত্রে যার মাধ্যমে লেখিকা ভারতবাসীর দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ যেমন ধর্ম, বিবাহ, রাজনৈতিক স্বাধীনতা, সামাজিক সমানাধিকার ইত্যাদি সমস্যাগুলোর কথা জানিয়ে দেন। স্বল্প প্রাধান্যের ভূমিকায় অন্য ভারতীয় যতীনকে উপন্যাসের কাঠামো বিন্যাসের জন্যই দেখা যায়। বাকী চরিত্রগুলো নামগোত্রহীন একঘেয়ে ব্যক্তিবর্গ যথা স্থূলদেহী চাকরটি, স্নেহবিগলিত পরিচারিকা, কৃতজ্ঞচিত্ত আকাট নির্বোধ গ্রামবাসীগুলো যাদের মনে পশ্চিমী ভাবধারার কোন ছাপই পড়ে না।

ভারতীয় জীবনধারার ওপর ধর্মের ব্যাপক প্রভাবকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে যাওয়া কোন পশ্চিমী ঔপন্যাসিকের পক্ষেই সম্ভব নয় যদি তাঁর বিষয়বস্তু ভারতবর্ষ হয়। হিন্দুধর্মের দর্শনতত্ত্ব ও অতীন্দ্রিয়বাদের আস্তরণ আর তলে তলে ছড়িয়ে পড়া আগাছার মতো কুসংস্কারে ভরা বিচার বিশ্বাস সাধারণ মানুষের মন জুড়ে চেপে বসে আছে। পার্ল বাক তাঁর কাহিনীতে এ মূল্যবান উপাদানের বহুল ব্যবহার করেছেন। "কাম মাই বিলাভেড"-এ লেখিকা পরম আগ্রহে খুঁজে চলেছেন ঈশ্বরকে কিন্তু আধ্যাত্মিক ভাবনার পরিবর্তে ধর্মের বাস্তবমুখীনতার ওপর জোর দিয়েছেন।

প্রাচীন ভারতের জ্ঞানভাণ্ডার হতে যে নির্ভেজাল নির্যাস হিন্দু ধর্মগ্রন্থে সঞ্চিত রয়েছে সেসব অধ্যয়ন করে বেদান্ত দর্শনের অমূল্য রত্নরাজি যা হুইটম্যান, থোরো ও টি এস ইলিয়ট আহরণ করতে পেরেছিলেন পার্ল বাক তাতে আকৃষ্ট হননি। সাধারণ মানুষের অস্থি মজ্জায় মিলে মিশে যে ব্যবহারিক ধর্ম তার জীবন গড়েছে সেই ধর্ম নিয়ে তাঁর উদ্বেগ যদিচ ভালোই জানেন যে দানাগুলো ফেলে খোসার স্তূপ আঁকড়েই ওরা সন্তুষ্ট হয়েছে। গরীব গোষ্ঠীর চাষীদের অসীম ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা, প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও সামাজিক উৎপীড়নের সমুখে চরম ঔদাসিন্যের আত্মসমর্পনের শক্তি — অভাব অনটন দারিদ্র্যকে নৈর্ব্যাক্তিকভাবে মেনে নেওয়া—এসব হল অলঙ্ঘনীয় অদৃষ্টের অপরিহার্য পরিণাম। ডেভিড ম্যাকআর্ড ভারতের অনুন্নত অবস্থার জন্য ধর্মকেই দায়ী করেছে .... "কথাটা এই যে ভারতের মানুষগুলো কদাচার ও কুসংস্কারাবদ্ধ ধর্মের চাপে পিষ্ট হয়ে রয়েছে, যে ক্ষেত্রে আমাদের ধর্ম আমাদের স্বাধীন মানুষ হতে সাহায্য করেছে।" ভারতবর্ষকে সে দিতে চায় "এক নব চেতনা, এক প্রত্যাদিষ্ট প্রেরণা উদ্দীপক ধর্ম যা দেশকে করবে সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী। পার্ল বাক কিন্তু পার্থক্যের সূক্ষ্ম একটি রেখা টেনে বুঝিয়ে দেন মার্কিণী ও ভারতীয় ধর্ম চিন্তায় তফাৎ কোথায়। অন্যের তদারক একেবারে মমত্ববোধহীন হয়েও মার্কিনীরা করতে পারে কেন না জাতিগত ও অর্থগত উচ্চমন্যতা যাদের মনের বাধক তাই অনুকম্পাতে ও ঘৃণার মিশ্রণ থাকে। একদিকে ওদের এই পৃষ্ঠপোষক অনুকম্পা অপরদিকে হিন্দু জীবনের ব্যাপক বিচারবোধ, বৃহত্তর দৃষ্টিকোণ ও ক্ষমাগুণ পেশ করে দেখিয়েছেন ভারতের মানুষের হৃদয়ে স্নেহ মমতা কোন সীমায় আবদ্ধ নয়। বিদেশীর মনে এই স্মৃতিটি চিরজাগরূক হয়ে থাকে, যেমন ঘটেছে টেড ম্যাকআর্ডের ক্ষেত্রে—সবচেয়ে বেশী তার মনে পড়ে —অপরিসীম স্নেহে তাকে অভিষিক্ত করা হয়েছিল। মায়ের অভাব সে অনুভব করেনি, বাপেরও নয়, সদাব্যস্ত যে বাপ প্রায়ই অনুপস্থিত থাকতেন। তাকে স্নেহ করার, আদর করে কোলে তুলে নিতে উন্মুখ অনেক কটি মানুষ তাকে ঘিরে থাকত সেখানে। যখনই সে ভারতের কথা ভাবে এই স্মৃতিটি ফুটে ওঠে প্রথমেই—তাদের বহির্গামী স্নেহ ভালোবাসা যা সে পেয়েছে তার নিজস্ব স্বাতন্ত্রের জন্য নয়, শুধুমাত্র সে শিশু ছিলো বলে আর হয়ত বা মাকে হারিয়ে ছিল বলে।"

হিন্দু ধর্মবিশ্বাসের মঙ্গলদায়ী গুণাবলীর মধ্যে এই স্নেহ ভালবাসার শক্তি অন্যতম, যুগ যুগান্ত ধরে সমাজে ও ধর্মের সংমিশ্রণে একাত্ম হয়ে গেছে। ভারতীয় কৃষ্টি সংস্কৃতির ওপর ধর্মভাবনা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে মানুষের জীবন তথা অস্তিত্বকে রঞ্জিত করছে।

পার্ল বাকের মতে ভারতের মানুষ ধর্মসচেতন জাতি—চীন দেশবাসীদের মতো ধর্ম ব্যাপারে উদাসীন নয়। সেইজন্য চীনদেশের বিষয়বস্তু নিয়ে লেখা উপন্যাসে ধর্মের উল্লেখ নেই, ভারত সম্বন্ধীয় লেখা কাহিনীগুলোতে দেশের মানুষের প্রগাঢ় ধর্মানুভব ছায়াপাত করেছে।

বহুরূপ-সমন্বিতা দেবী-রূপিনী ভারতবর্ষ বিশালতা, বৈচিত্র্য, বর্ণাঢ্যতা ও আকৃতি শোভায় বিস্ময় ও সম্ভ্রমের উদ্রেক করে। 'কাম মাই বিলাভেড' উপন্যাস হৃদয়গ্রাহী বর্ণনায় ভারতের লক্ষদ্যুতিচ্ছটা, আকর্ষক দৃশ্যাবলী, ধ্বনিতরঙ্গ, ভারতের লোকশক্তি, তমসাচ্ছন্ন রহস্য সূক্ষ্ম ধরে রেখেছে। বোম্বাই নগরীর একটি রাস্তার বর্ণনায় লিখেছেন—গরম বাতাসে ধোঁয়া ও কড়া মরিচের গন্ধ, টক গন্ধ, ফুল ও ফলের চাপা গন্ধ মিশে যেন বাষ্প উঠছে। মানুষে মানুষে ভরা রাস্তা, কেউ হেঁটে চলেছে, কেউ দাঁড়িয়ে রয়েছে দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে, ফুটপাতেও মানুষ কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমুচ্ছে। সকলেরই গায়ের রং কালো কিন্তু এক ধরনের কালো নয়। কদাচ বা একটি শিশুর কোমল ত্বক বা একটা কিশোর ছেলের ফর্সা মুখ দেখা গেল। বড়ো বড়ো স্বচ্ছ শান্ত চোখ মেলে সকলে ঘুরে ওদের দ্যাখে, পাঠান বা শিখ হলে তাদের দৃষ্টি শ্যেনের মতো লাগে। হিন্দু মুসলমান মালয়ী পারসীদের মেলানো মেশানো ভীড়ভরো। কোন শ্বেতাঙ্গ মানুষ দেখতে পায়নি। পারসীদের মাথায় ঘোড়ার বালামচী লাগানোর লম্বা টুপি, আফগান, চীনে, জাপানী তিব্বতী এমন কি দাক্ষিণাত্য থেকে নিকষ কালো মানুষ এসে এই ভীড়ে জমেছে। নিজেদের খেয়াল খুশি মতো যে কোন উজ্জ্বল রং-এর পোশাক এদের, পাগড়ী গোলাপী গলার চাদর সবুজ, গাঢ় বেগুনী জোব্বার ওপর টুকটুকে লাল মখমলের সোনালী জরীদার জামা, কমলা রং এর সঙ্গে উজ্জ্বল লাল, নীল, হলুদ ও গোলাপী রং এর ছড়াছড়ি, চটকদার মনলোভা শাড়ী পরে গৃহস্থ রমণীরা এই শহরে চলাফেরা করতে থাকে। গলার হার, কানে ঝুমকো, নাকে ঝকঝকে নাকছাবিতে ওদের শ্যামল মুখগুলো শোভিত, নগ্নবাহু ও পদদ্বয় স্বর্ণবলয় ও পাইজোরের নিক্কণে মুখরিত। মার্কিনীদের দৃষ্টিতে এরা যেন আড়ম্বরভরা শোভাযাত্রার প্রদর্শনী, চোখের সামনে আসে এবং ক্রমশঃ দৃষ্টির বাইরে চলে যায়।"

এই শহরের দৃশ্যটিতে ভারতের হর্ষময় দিকটি দেখতে পাওয়া যায়। পার্লবাক অস্বস্তিকর পরিবেশের ওপরও মন্তব্য করেছেন যথা কোলাহল, বিশৃঙ্খলতা, ধুলোময়লা, রোগব্যাধি যা ভারতে বহু জায়গাতেই দেখা যায়;

"পুণার রাস্তাগুলো .... সর্বদা ভীড়, সারি সারি ঠাসা মানুষ, কালো চেহারা খালি পা, মাথায় সাদা পাগড়ী ভীড়ের ধাক্কায় উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে চলেছে, তাদের পায়ে পায়ে পথের ধুলো উড়ে খোলা দোকানে-বাজারে রাখা জিনিষে ভরে যাচ্ছে। সূর্য অস্ত যাবার পরও ভীড়ে ভরা আঁকা বাঁকা রাস্তার কর্মব্যস্ত জীবনের স্রোত চলতেই লাগল। বলদগাড়ির চাকার তলায় পিষ্ট না হয় গাড়োয়ানরা লোকদের তারস্বরে সতর্ক করে চলে, রোমশ কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলদগুলো ঘাড় ঘেঁসে এগিয়ে যায় কিন্তু চাপা কেউ পড়ে না, ফেরিওয়ালার কান ফাটানো চীৎকার সব কিছু ছাপিয়ে শোনা যাচ্ছিল। দিনটা ছিল সেদিন শুক্রবার যেদিন গাঁ থেকে কুষ্ঠ রোগীরা ভিক্ষে করতে আসে। তারা ঘরে ফিরছিল, ওদের গলিত ক্ষত ও ঠুঁঠোহাত পা খুলে রেখেছিল যাতে সবাই-এর চোখে পড়ে।

এই প্রকারের শহরের ছবিই সব নয়। গ্রামের মানুষের নিদারুণ দারিদ্র্যের বর্ণনাও আছে।

"প্রখর সূর্যতাপে খোলা পারে মেঠো গ্রামগুলো একেবার নিরাভরণ ধু-ধু করছে—ভালো করে বোঝাই যায় না, মনে হয় শুধু যেন মাটির ঢিবি কিন্তু সেখানে হতভাগ্য কঙ্কালসার মানুষগুলো আশেপাশের বুভুক্ষু গরুমোষগুলোর মতোই রুক্ষ শুষ্ক শস্যহীন জমিতে হন্যে হয়ে খাবার খুঁজছে—এমন মর্মভেদী দৃশ্য দেখতে হবে তা কল্পনাও করেনি।"

এই দৃশ্য বর্ণন অতি বিষণ্ণ মলিন বটে কিন্তু মিথ্যা নয় এবং লেখিকার মন্তব্য ইচ্ছাকৃত কৃত্রিম বা আবেগ-প্রণোদিত মনে হয় না। কারণ বিদেশী চরিত্রগুলির চোখ দিয়ে ভারতকে নিরূপণ করা হচ্ছে আর এই মার্কিনীদের পক্ষে চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা যেমন ভয়াবহ তেমনি বিরল।

দ্বিতীয় উপন্যাস 'ম্যাণ্ডালা' পার্ল বাক ভারতীয় পটভূমি ও চরিত্রাবলী বেছে নিয়ে ১৯৬০ সালের সমসাময়িক ঘটনা পরিস্থিতির ছবি তুলে ধরেছেন। 'কাম মাই বিলাভেড'-এ গ্রমীণ ভারতের মধ্য দিয়ে এই বিশাল দেশের জীবন চেতনা অনুভব করার চেষ্টা করেছেনঃ "ভারতকে যদি জানতে চাও গ্রামে গ্রামে গিয়ে দেখ"—একটি চরিত্রের মুখের কথা। ম্যাণ্ডালা বই-এ দেখা যাবে শহরে ভারতবাসীর প্রতিবিম্ব যারা পশ্চিমী মনোবৃত্তির সঙ্গে বিধিবদ্ধ চিন্তা ও কর্মধারার সিঞ্চন করে অধুনা সময়ের একটা পৃথক রীতি চালু করেছে। দুটি সংস্কৃতির সংঘর্ষ এই উপন্যাসের মর্মস্থলে আনায় দেখা গেলো যে মানুষগুলোর জীবনধারা বিপরীতধর্মী তাদের পরস্পরের সম্পর্কের মাঝে অপরিহার্য বিদারণ উপন্যাসের মুখ্য উপজীব্য রূপে অপ্রীতিকর মানবিক সংকটাবস্থার সৃষ্টি করেছে যা ব্যাখ্যা করা চলে না। ম্যাণ্ডালা উপন্যাসে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সংস্কৃতিগত সংঘাত পার্ল বাক আসলে আদর্শবাদ ও রূঢ় বাস্তব উভয়ত দেখাতে চেয়েছেন।

ভারতের এক অতি মনোরম শহর অমরপুরের রাজবংশীয় রাজপুত পরিবারের কাহিনী হল ম্যাণ্ডালা উপন্যাস। উত্তরাধিকার সূত্রে পিতৃপিতামহের কাছ থেকে জগৎ বিশাল ভূখণ্ড ও অনুপম মর্মর প্রাসাদের স্বামীত্ব পেয়েছে। যদিচ ভারত স্বাধীন হবার পর রাজরাজড়াদের উপাধি আর কায়েম রইল না, তবু জগৎ-এর জীবনচর্যায় পুরোনো দিনের জাঁকজমক সুরুচি বজায় ছিল। জগৎ নিজে কিন্তু অতীতের ধ্বংসাবশেষ নয়, আধুনিক ভারতের এক উচ্চ শিক্ষিত, সুষম, অভিজ্ঞ ব্যক্তি। সৎ পথে অর্থাগমের উদ্দেশ্যে জগৎ তার একটি হ্রদপ্রসাদকে পান্থনিবাসে পরিণত করে বিচক্ষণতার পরিচয় দেয়। গল্পটি এই ক্রমিক রূপান্তর ধরে ধাপে ধাপে এগিয়ে চলে যা ভারতব্যাপী পরিবর্তনের ধারা বিশেষত দেশীয় রাজ্যগুলোর যেভাবে অবস্থান্তর ঘটেছে তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করে। দুটি মুখ্য চরিত্র জগৎ ও তার মার্কিনি প্রণয়িনী ব্রুক ওয়েস্টলির মানসিক পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে গল্পের ঘটনা বিস্তার চলে।

কয়েকটি সম্পর্কে জটিলতার ওপর আলোকপাতের প্রয়াস রয়েছে কাহিনীতে—জগৎ এর সঙ্গে তার পরিবারবর্গের সম্পর্ক, ব্রুকের সঙ্গে জগৎ-এর সম্পর্ক। পটভূমিতে দেখা যায় এক ঐতিহাসিক বাস্তব ঘটনা, ভারতের ওপর ১৯৬২ সনে চীনের হামলা যা দেশ তথা দেশবাসীকে একযোগে বিপর্যস্ত করেছে এবং নানা স্তরে সংঘর্ষের ছায়া ফেলেছে।

প্রাচ্য-পাশ্চাত্য প্রতিঘাতের যে বিবরণী পার্ল বাক ম্যাণ্ডালা উপন্যাসে দিয়েছেন তা মূলত বিচ্ছেদাত্মক। মার্কিনীদের বিকল্প হিসেবে ব্রুক এসেছে আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টির উৎস

সন্ধানে এই ভারতবর্ষে। আর ব্যবসায়ী বটে যাকে জগৎ তার হোটেল ব্যবসায়ে নিয়োগ করে। সাধারণ মার্কিনী জনমানসের প্রতিভূ বটে অসগুড, হাসিখুশী, বন্ধুত্বপরায়ণ কর্মদক্ষ পুরুষ, ভারতদেশ ও মানুষজন তার মনে বিস্ময়ের উদ্রেক করে বৈকি। তবু সে পার্থক্যটা মেনে নিতে পারে। উচ্চ-বংশজাত ও সমাজের শিরোমনি মহারাণার জগৎকে সে শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের চোখে দ্যাখে; জগৎ এর রূপবতী কন্যা বীরা তাকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করে, কিন্তু তাদের প্রণয় ঘনীভূত হতে পারে না, হেলাফেলিতে আবদ্ধ থাকে। অসগুড ভালোই বোঝে এদেশে সে 'জড়', হীন ব্যক্তি এবং মনে প্রাণে বোঝে যে আমেরিকায় তার সামান্য সাধারণ গৃহস্থালীতে রাজপুত্রী বীরাও খাপ খাওয়াতে পারবে না। ওদের প্রণয়াকাঙ্ক্ষা তাই অপূর্ণ থেকে যায়। প্রধান চরিত্র জগৎ আর ব্রুকের অদৃষ্টেও একই বিধিলিপি। ভারতের প্রাচীন ও নবীন জীবন দর্শনের স্বচ্ছন্দ সমাবেশ ঘটেছে জগতের চরিত্রে, মার্কিনী সভ্যতার বিশেষ গুণ ক'টি আয়ত্ত করেছে ব্রুক, দুজনেই পরস্পরের যোগ্য মানুষ। শ্বেতাঙ্গ কৃষ্ণাঙ্গ ধরনের জাতিবিভেদ সম্বন্ধে ব্রুক সচেতন নয়, হৃদয়ের এক আলো নিয়ে সে ভারতে এসে জগৎ এর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। হ্রদ পান্থনিবাসে জগৎ-এর অতিথি হিসাবে থাকাকালীন হোটেল পরিচালনার কাজে কর্মে পরিকল্পনায় ব্রুক নানাভাবে জগৎকে সাহায্য করেছে, শুধু তাই নয় মনের দোসর অন্তরঙ্গ সাথী হয়ে ওঠে যা জগৎ-এর স্ত্রী মোতী হতে পারেনি। ক্রমে অন্তরঙ্গতা গাঢ়তর হয়ে প্রেমের পর্যায়ে পৌঁছলে আলো-অনুভূতির দোলায় দুজনে মিলে মহারাণার পুত্র জয়কে খুঁজে বার করার আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও কৃতকার্য হয়নি। পান্থনিবাসে ফিরে আসার পর জগৎকে তার তালুক মুলুকের কাজে ব্যাপৃত হতে হল যেখানে ব্রুক কোনভাবেই দখল নিতে পারে না। ভারতীয় সমাজের চোখে ব্রুকের অমরপুরে উপস্থিতি ও জগৎ-এর সঙ্গে তার অবৈধ প্রণয় অতি গর্হিত ব্যাপার। ব্রুক অনুভব করে জগৎ-এর গোটা জীবনে তার অসংলগ্ন অস্তিত্ব, প্রজাকুলের জন্য জগৎ যে স্বপ্ন রচনা করেছে তার অংশীদার হতেও সে পারে না। ভারাক্রান্ত মনে সে ভারত ছেড়ে নিজের দেশে ফিরে যাওয়া স্থির করে। "আমি এখন বুঝতে পারছি আমি সত্যি এদেশের কেউ নই। দেশটাকে আমি ভালোবাসি, এ ভালোবাসা চিরদিনের কিন্তু এদেশে আমার নিজস্ব ঘর নেই, তাই বসবাস করতে চাইলে ভালোবাসায় ফাটল দেখা যাবে।"

এই বিচ্ছিন্নতাবোধ এতো দৃঢ় যে ভারতের সঙ্গে আন্তরিক সম্বন্ধ স্থাপনে প্রবল আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও ব্রুককে ফিরে যেতে হল। ভারতের সত্তার মধ্যে নিজের সত্তাকে নিঃশেষে মিলিয়ে দেওয়ার ঐকান্তিক আগ্রহও ফলপ্রসূ হল না। যার সঙ্গে তার স্মৃতিচারণের যোগসূত্র আছে তেমন এক পশ্চিমী মানুষকে ব্রুক বেছে নিল। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের একটি মিলনক্ষেত্র তৈরী করার সমগ্র প্রয়াস ভাবনাকে ব্যর্থ করে পার্ল বাক বিচ্ছিন্নতার রেখা টেনে ইতি করেছেন।

আগাগোড়া উপন্যাসটি জুড়ে এই বিচ্ছিন্নতার ধারা ভারতীয়দের মধ্যে কমবেশী চোখে পড়ে। জগৎ-এর সঙ্গে মোতীর মূলতঃ দেহগত, হৃদয়াবেগ বা মননশক্তিগত স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক এ নয়। এদের বিবাহ হয়েছে বাবামায়ের নির্বাচনে, জগৎ প্রচলিত সংস্কার বিধিতে বিশ্বাসী তাই নির্বিবাদে মেনে সে নিয়েছে, কিন্তু পরস্পরের মধ্যে ভাবনাচিন্তার আদানপ্রদানে অভাব আছে বলে তার জীবনে মস্ত এক ফাঁক আছে তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে। মোতী আলো উচ্ছ্বাসহীন রমনী, নিজেকে নিয়েই থাকে, স্বামীর বশ্যতা স্বীকার করেই ক্ষান্ত—

স্বামীকে ভালোবেসে তার আশা আকাঙ্ক্ষার মর্যাদা দিতে জানে না। ওদের দুটি ছেলেমেয়ে বীরা আর জয়কে এক ধরনের বিচ্ছিন্নতাবোধ ঘিরে থাকে। মা-বাবা আর ওদের মধ্যে যেন এক প্রজন্মের বিচ্ছেদ, স্নেহবন্ধন যদি বা কিছু আছে, একে অপরকে জানবার বোঝবার কোন চেষ্টা নেই। এই দুই ভাইবোনের সম্পর্কের প্রতীক হল বাচালতা, স্নেহ মমতা সেখানে একেবারে বর্জনীয়। সব ক'টি চরিত্রই ভায়ানক নিঃসঙ্গ, আশেপাশের মানুষজন থাকে সম্পূর্ণ পৃথক, এইভাবে গৃহ সংসারের আকর্ষণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজেদের থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।

অনিশ্চয়তা, মানসিক উত্তেজনা ও বিদ্রোহের বিষয়বস্তু নিয়ে ম্যাণ্ডালার রচনা-বিন্যাস কিন্তু অন্তঃসলিলা হয়ে বয়ে চলেছে পরম্পরাগত হিন্দু ঐতিহ্য। পার্ল বাক উনিশশো ষাট শতকের ভারতের রাজনৈতিক, আধ্যাত্মিক ও ব্যক্তিগত জীবনের উদ্বেগবহুল বহুমুখী সমস্যার চিত্রাঙ্কণ করতে চেয়েছেন। ১৯৬২ সনে দেশের ওপর চীনের আক্রমণ উপন্যাসের মূল ঘটনা যা সর্বত্র আঘাত হেনেছে। কক্ষচ্যুত উল্কার মতো যুবরাজ জয়ের ভিত্তিহীন জীবন, বিশৃঙ্খলতা ও বাহ্যাড়ম্বরে ঘেরা। জয় মনে করে, যুদ্ধে যোগ দিয়ে দেশের সেবায় নামলে তার জীবন একটা আদর্শ, একটা লক্ষ্য খুঁজে পায়। এই যুদ্ধে প্রাণ হারালো জয়, জগৎ হারালো তার একমাত্র পুত্র। জয়ের মৃত্যুকে পার্ল বাক একটা অর্থহীন মর্মঘাতী আত্মাহুতি রূপে দেখিয়েছেন, তার বেশী কিছু নয়। এই পটভূমির ব্যাপক রূপটি ঘটনা বিন্যাসে আরো বেশী প্রভাবশালী হতে পারত, কিন্তু তা হয়নি।

পাশ্চাত্য শিক্ষা সভ্যতার প্রভাব ভারতের যুবসম্প্রদায়কে এক শূন্যতার মুখে ঠেলে দিয়েছে, ওরা আর মনে প্রাণে ভারতীয় রয়ে যায়নি অথচ, পশ্চিমী সাঙ্গপাঙ্গদের মতো বন্ধনবিহীন মুক্তজীবও হতে পারেনি। যুগযুগান্তব্যাপী সংস্কৃতির গুরুভার ঝেড়ে ফেলার চেষ্টায় ওরা বিভ্রান্ত এবং অসহায় বোধ করছে। গুরুজনের নির্বাচনে নিজের আসন্ন বিবাহের ব্যাপারে বীরা প্রথম থেকেই বিদ্রোহ ও সংঘর্ষের মনোভাব পোষণ করেছে কিন্তু তাকেও মা-বাপের কঠোর শাসন মেনে নিতে হল। পার্ল বাক ভালোভাবে বুঝতে পেরেছেন ভারতে সহর নগরের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের পক্ষেও পরম্পরাগত বাধ্যবাধকতার শৃঙ্খলা এতো মজবুত যে, তাকে রদবদল করা সহজসাধ্য নয় এবং নতুন পরিবর্তনকে কাজে পরিণত করা নিষ্ফল প্রয়াস মাত্র।

ম্যাণ্ডালা উপন্যাসে ভারতের অতীন্দ্রিয়বাদের নিগূঢ় ব্যাপ্তিকে পরীক্ষা ও অধ্যয়ন করে পার্ল বাক বাস্তবতার প্রকৃত সত্তা উপলব্ধি করতে চেয়েছেন। দেখা যায় ব্রুক ওয়েষ্টলি 'সমবেদনা' অনুভবে উদ্বুদ্ধ হয়ে ভারতে আসে। "শেষকালে তার এই বিশ্বাস জন্মাল যে বাস্তবতার আদ্যরূপটি কোন প্রাচীন দেশে, প্রাচীনতম দেশেই দেখতে পাওয়া সম্ভব তাই সে এশিয়ার আদিভূমি ভারতে এসেছিল।" হৃদয় ও মনের দ্বার উন্মুক্ত রেখে ভারতের আকাশে বাতাসে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্পন্দনটুকু ও গভীর অনুভূতি সাগ্রহে গ্রহণ করার জন্য ব্রুক নিজেকে প্রস্তুত করেছে। তার অভিমতে হিন্দু শাস্ত্রগ্রন্থ যে ধ্যানধারণা ও চিন্তায় সমৃদ্ধ তা সেই পুরাকালে যেমন প্রাসঙ্গিক ও ক্রিয়াশীল ছিল আজকের জগতেও তেমনই রয়েছে। সে মর্মে মর্মে বোঝে "ভারতের প্রাণের সমাপ্তি নেই"—এক পর্যায়ের থেকে অন্য পর্যায়ে

রূপান্তর হয় মাত্র। বিস্ময়ের অবধি থাকে না যখন ভাবি এই হল এ যুগের সত্য কেন না বিজ্ঞানের নীতিসূত্রে এ জগতে বিলুপ্তি লয় কিছু নেই আছে শুধু পরিবর্তন। প্রাচীনতম দেশ এই ভারতবর্ষের সংস্কৃতির যে শাশ্বত সত্য ছিল তা চিরনবীন রয়েছে দেখে তার পরম স্বস্তি ও সন্তোষ হয়। বিনোবা ভাবের কথাগুলো তার মনে পড়ে : "রাজনীতি আর ধর্ম দুটোই সেকেলে হয়ে পড়েছে। আমরা বিজ্ঞানের যুগে, অধ্যাত্মিক যুগে এসে পৌঁছেছি"। আক্ষেপের কথা এই যে পার্ল বাক অধ্যাত্মবোধের তাৎপর্যপূর্ণ কোন সিদ্ধান্তের সম্মুখীন হবার প্রস্তুতি আমাদের দিতে পারেননি। ভারতের অভিজ্ঞতা ও আবেগ ব্রুক মোটামুটি মেনে নিয়েছিল, অথচ উপন্যাসের সমাপ্তিতেও মানবজীবন বা ভারত সম্পর্কে তার বোধবুদ্ধির উত্তরণ দেখা গেল না। আখ্যান চিন্তাভাবনা ও ঘটনা বিন্যাসে সামঞ্জস্য না থাকায় আমরা ব্রুকের পূর্বকালীন আশা আকাঙ্ক্ষা ও উত্তরকালীন উপলব্ধির মধ্যে যোগসূত্র খুঁজে মরি। দু একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়—আধ্যাত্ম জগতের ধোঁয়াটে আবরণের আড়ালে আমরা পৌঁছাই যখন আত্মা সম্বন্ধীয় জ্ঞান ও শক্তিধর সেই তিব্বতীলামার সঙ্গে সাক্ষাৎকারে দেখি যে তিনি মহারাণার পুত্র জয়ের মৃত আত্মার সঙ্গে যোগাযোগ করে সেই অশরীরি-অন্য জগতে তার গতিপথ নির্ণয় করতে পারেন। আরো কিছুপরে দেখা গেল ব্রুক আচম্বিতে একটি শিশুকে পেয়ে মনে করে, জয়ের পুনর্জন্ম হয়েছে। এসব ঘটনা বা কাহিনী সম্পূর্ণতঃ বিশ্বাস করা তো চলে না, তাছাড়া মারাবার গুহায় অ্যাডেলার যে নিদারুণ শঙ্কাচ্ছন্ন আধ্যাত্মিক অনুভূতি হয়েছিল তার মতো কল্পনার সঞ্চারও করে না। গল্প সৃষ্টির মধ্যে রসোপলব্ধির মাধ্যমে সূক্ষ্ম ইঙ্গিতে তথ্য বিস্তার করতে পার্ল বাক পারেন নি। মানব জীবনের ঘাত প্রতিঘাতে মানুষের মনে যে অনুভূতি ও হৃদয়াবেগ দানা বাঁধে, মানুষের সম্পর্কের মধ্যে যে জটিলতা মাথা তোলে সেখানে সুনিশ্চিত নিঃশর্ত তত্ত্ব আরোপ করা চলে না—এই ক্ষেত্রে পার্ল বাকের শিল্পী শৈলীর ত্রুটি ঘটেছে। ম্যাণ্ডালা পড়তে ভালো লাগে কিন্তু প্রাচ্য প্রতীচ্যের পারস্পরিক মেলবন্ধন ও বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মানবজীবনের নিবিড় যোগসূত্রের যে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল তা অমীমাংসিত থেকে যায়।

যদি 'কাম মাই বিলাভেড' উপন্যাসে পার্ল বাক দরিদ্র অনুন্নত বহুলাংশে গ্রামীণ ভারতের ছবি তুলে ধরেছেন, তাহলে বলতে হয় ম্যাণ্ডালাতে ছবিটি একেবারে বিপরীত। এখানে প্রকৃতি ও মানুষের সম্ভার-সমৃদ্ধ আড়ম্বর পূর্ণ পরিবেশ, বংশানুক্রমিক ধনৈশ্বর্যে অভ্যস্ত মূল চরিত্রগুলি সমাজের উচ্চতম শ্রেণীর মানুষ। কী নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছেন পার্ল বাক মহারাণার মর্মর প্রাসাদগুলোর যেখানে যুগযুগান্ত ধরে অনুপম রত্ন সম্পদের সমাবেশ হয়েছে এবং প্রাচ্যের উজ্জ্বল ধারাবাহিকতা বজায় থেকেছে। দৃশ্যাবলীর অবর্ণনীয় সৌন্দর্যের উল্লেখ বার বার করেছেন। একটি দৃষ্টান্ত স্বরূপ—বিধাতা পুরুষের অযাচিত দানের এ সৌন্দর্যে রাজস্থান ছাড়া অন্য কোথাও এমন প্রাচুর্য দেখা যায় না। এ সৌন্দর্য মরুপ্রান্তরের, দিনের আলোয় হ্রদটির রং ঝলমলে নীল আর এক্ষণে নানা বর্ণের মিশেল মরীচিকার মধ্যে দিয়ে অস্তগামী সূর্য নির্ভয়ে রক্তিম আলো ছড়িয়ে দিয়ে গেল। হ্রদের জলে শ্বেত শুভ্র প্রাসাদের প্রতিফলন সোনালী রং এর, তার ওপারে গাঢ় সবুজ তীররেখা আরাবল্লী পর্বতের মূলভূমিতে মিশেছে—নিরংকার প্রস্তরময় আরাবল্লী এক গোলাপী আলোয় মণ্ডিত। প্রাসাদোদ্যানে আমগাছগুলো ঠাস কালো বুনটের মতো দেখা যাচ্ছে।

ইদানীন্তন সময়ের ক্ষয়ক্ষতি বঞ্চনা সত্ত্বেও মহারাণার প্রাসাদের অভ্যন্তরে সমস্ত কিছুই কিন্তু বৈভবের পরিচায়ক। মস্ত মসৃণ পালিশ করা টেবিলের ওপর টাঙানো "চেকোশ্লোভাকিয়া থেকে জগৎ-এর পিতামহের কিনে আনা বিশাল অপূর্ব কারুকার্যময় কাঁচের একটি ঝাড় লণ্ঠন থেকে আলোক রশ্মি বিচ্ছুরিত হয়ে থাকা ঘরকে মোহময় করে তুলেছে। গোয়ানিজ খানসামা ও উর্দীপরা দুজন সেবক গৃহস্বামী ও গৃহকর্ত্রীকে আহার পরিবেশন করে বহুমূল্য কাঠের রত্নখচিত ক্ষোদিত পর্দার অন্তরালে অপেক্ষামান থেকে লক্ষ্য রাখে খাদ্য বা পানীয়ের প্রয়োজন টেবিলে আহাররত কারো আছে কিনা। ভারতের রাজারাজড়াদের জীবনচর্যার আক্ষরিক বর্ণনা, যা ছড়াছড়ি এই উপন্যাসে, যা কেমন যেন সামন্ততান্ত্রিক নিপীড়নের কথা পাঠকের মনে টেনে আনে।

ভারতের পটভূমিকার ওপর লেখা দুটি উপন্যাসের মধ্যে ম্যাণ্ডালা পার্ল বাকের সার্থকতার নব উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রতীক। কাম মাই বিলাভেড এ যে ঐক্য ও তারল্যের গ্রন্থিসূত্রে আখ্যানটি বাঁধা হয়েছিল এখানে তা নেই। অনেক কটি উপাদানের মিশ্রণ হয়েছে—নানা সম্প্রদায়ের সমাজভিত্তিক ঐতিহাসিক বর্ণনার আধিক্যে একঘেঁয়েমি ঘটেছে, ধর্মের অতীন্দ্রিয়বাদ, মানব জীবনের আদিম সমস্যার প্রতি প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বিচারবোধ ইত্যাদি মিলে ম্যাণ্ডালার মূলসুরের সামঞ্জস্য নষ্ট করায় বইটির মান খর্ব হয়েছে। পার্ল বাক একনিষ্ঠ হলে এমনটি হত না। তিনশো পৃষ্ঠার অনধিক একটি উপন্যাসে বহুবিধ সমস্যাজড়িত ঘটনা এনে ফেলে লেখিকা কোন প্রশ্ন বা দ্বিধা সংশয়ের সুরাহা করতে পারেননি। চরিত্র চিত্রণও বলিষ্ঠ নয়, বিচ্ছিন্ন সূত্রগুলো মনে হয় ত্বরায় এক জোটে বেঁধে সমাপ্ত করা হয়েছে। ভারতের প্রতি গভীর ব্যাকুলতা মহিলার হৃদয়কে নিশ্চয় মথিত করেছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, সেই অনুভব অভিজ্ঞতাকে উপজীব্য করে সাহিত্যশৈলীতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করার মতো রসকল্পনা ও মনস্বিতার সমাবেশ তাঁর ছিল না।

ভারত সম্পর্কিত উপন্যাস দুটির আলোচনা করে বোঝা যায় যে প্রাচ্য পাশ্চাত্যের ঘাতে প্রতিঘাতে উদ্ভূতসম্পর্কের জটিলতা যেসব সমস্যার সৃষ্টি করেছিল পার্ল বাক সেগুলি স্পষ্টভাবে তুলে ধারার প্রয়াস করেছেন—কোন সংস্কার বা আবেগের বশবর্তী হয়ে নয়, বিচিত্র মানব চরিত্রের প্রতি মমত্ববোধ-সহ সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও বাস্তবানুগ দৃষ্টি নিয়ে। বিস্ময় হয় বৈকি যখন দেখা যায় রুমার গডেন (Rumer Godden) বা মিসেস ফ্লোরা অ্যানী স্টীডের (Mrs. Flora Annie Stede) মতো তিনি ভারতে বাসবাস করেন নি, দুবার মাত্র অল্প সময়ের জন্য এসেছিলেন। রুমার গডেনের উপন্যাস The River-এর গল্পাংশ ত্রিশ শতকের অবিভক্ত বাংলায় বসবাসী ইংরেজদের জীবন ও শস্যশ্যামলা বাংলার বুকে প্রবাহিত পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গার ওপর লেখা। এই ইংরেজ মহিলার শৈশব ও কৈশোর কেটেছে বাংলাদেশে বলেই এমন নিখুঁত সুন্দর উপন্যাস লিখতে পেরেছিলেন—জাঁ রেনেয়ার The River ছবিটি তার জীবন্ত রূপায়ণ। মার্কিনী লেখিকা পার্ল বাকের ভারতে থাকার মেয়াদ স্বল্পকালীন হওয়া সত্ত্বেও ভারতীয় চিন্তাচেতনা ও জীবনেতিহাস আশ্চর্য্যরকম গভীরভাবে অনুধাবণ করেছিলেন। দরদী শিল্পীমনের অধিকারিণী পার্ল বাক স্থান কালের সীমিত অনুভবের গণ্ডীতে আবদ্ধ নন। মানব জগতের বিশাল পটভূমিতে চিরকালীন

মানুষের চিরজটিল মনোলোকে প্রবেশ করে হৃদয়বৃত্তির অন্বেষণ করেছেন। সময়, সমাজ ও সমকালীন জীবনধারায় লেখিকা যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন তা ভাষামাধুর্যের মাধ্যমে, লিপিকুশলতার গুণে, কাহিনীর শিল্পরূপকে পাঠকের বোধের জগতে উন্মোচিত করেছেন। ব্যক্তিসমষ্টির আদান প্রদানের নিঃশব্দ অভিঘাতে জীবনবোধ সৃষ্ট হয় তাব ওপর মানব সম্পর্কের সার্থক অস্তিত্ব। পার্ল বাক তাঁর শিল্পশৈলীর প্রাণসত্ত্বা দিয়ে পাঠকের মনে আনন্দের সঞ্চার করেছেন, সত্যচেতনা জাগ্রত করেছেন, তাই তাঁর সাহিত্যসৃষ্টি সার্থক হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের মীমাংসায়— "সাহিত্যের বিচার করবার সময় দুইটি জিনিস দেখিতে হয়। প্রথম বিশ্বের উপর সাহিত্যকারের হৃদয়ের অধিকার কতখানি; দ্বিতীয় তাহা স্থায়ী আকারে ব্যক্ত হইয়াছে কতটা।" এই মূল্যবোধে বিশ্বের পাঠক পার্ল বাককে গ্রহণ করেছে।

মূল উর্দু রচনা ঃ সাদাত হোসেন মন্টো
ভাষান্তর ঃ প্রবাল দাশগুপ্ত

নাটকের পরবর্তী দৃশ্য

[উর্দু সাহিত্যের পাঠকদের কাছে সাদাত হোসেন মন্টো এতই জনপ্রিয় নাম যে, তাঁর পরিচিতি লেখার প্রয়োজন হয় না। অবিভক্ত ভারতবর্ষেই উর্দু সাহিত্যের আসরে সাদাত হোসেন মন্টো রীতিমতো সন্তা জাগানো নাম। তাঁর জন্ম অমৃতসরে। প্রথম যৌবন কেটেছে আলীগড় ও বোম্বাইতে। দেশ বিভাগের পর তিনি পাকিস্তান চলে যান। যদিও মনের থেকে তিনি কোনদিনই দেশ বিভাগ মেনে নিতে পারেননি। তাঁর রচিত 'টোবা টেক সিং', 'চাচা সাম কি নাম এক মত', ইত্যাদি রচনাতে দেশ বিভাগ সম্পর্কে তাঁর মনোভাব পরিব্যক্ত হয়েছে বারে বার।

পশ্চিমবঙ্গ প্রগতিশীল পাঠকমহলে মন্টো নেহাত অপরিচিত নন। তাঁর বেশ কয়েকটি গল্প বাংলায় অনূদিত হয়েছে। তাই বাঙালী পাঠক তাঁর প্রতিবাদী জীবন বোধের সাথে পরিচিত। যা প্রায় তাঁর সব রচনাতেই উপস্থিত।

মন্টো বহুমুখী প্রতিভা-সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। ছোট গল্প ছাড়াও তাঁর রচিত রম্য রচনা, ফীচার ও প্রহসন উর্দু সাহিত্যের পাঠকদের কাছে বিশেষভাবে সমাদৃত। 'নাটকের পরবর্তী দৃশ্য' রম্য রচনাটি মন্টোর 'পশে মঞ্জর' শীর্ষক রচনার বঙ্গানুবাদ। ১৯৫২ সালে মন্টো গ্রেপ্তার হওয়ার অব্যবহিত পরে রচিত হয়। যতদূর জানি মন্টোর কোন রম্য রচনা বাংলায় অনূদিত হয় নি—অনুবাদক]

"আজকের টাটকা খবর শুনেছেন আপনি?"

"কোরিয়ার?"

"জী নেহী।"

"জুনাগড়ের বেগমের?"

"তাও নয়।"

"খুন দাগাবাজীর কোন নতুন ঘটনার কথা বোলছেন?"

"তাও নয়। সাদাত হোসেন মন্টোর খবর।"

"কেন? টেঁসে গেছে নাকি?"

"জী নেহী। গতকাল গ্রেপ্তার করা হয়েছে।"

"অশ্লীলতার দায়ে?"

"জী হাঁ, পুলিশ ওর খানা-তল্লাসি নিয়েছে।"

"কোকেন অথবা নিষিদ্ধ করার, এই জাতীয় কিছু পাওয়া গিয়েছে?"

"না, খবরে কাগজে লিখেছে ওর বাড়ী থেকে কোন নিষিদ্ধ মাদক দ্রব্য উদ্ধার করা যায় নি।"

"কিন্তু লোকটার চাল চলন তো অসামাজিক।"

"জী, হাঁ অন্তত হুকুমত (সরকার)· তো তাই মনে করে।"

" তাহলে ওর ঘর থেকে কোন নিষিদ্ধ বস্তু বরামদ (উদ্ধার) করা গেল না কেন?"

"দেখুন, এই মাদকদ্রব্যের উদ্ধাব বা পাচারের ব্যাপারটা পুরোপুরি হুকুমতের হাতে।"

"চাইলে বামাল উদ্ধার করে, না চাইলে করে না। সত্যি কথা বলতে কি বরামদের (বামাল উদ্ধারের) ব্যাপারটা হুকুমতের হাতেই থাকে উচিত। হুকুমত এ সবের সুলুক সন্ধান জানে।"

"ওব প্রতি কি অভিযোগ আছে এবার?"

"আপনার কি ধারণা, এইবারে ত মন্টোর ফাঁসীর সাজা নিশ্চয় পাওয়া উচিত"

"তাহলে ভালই হয়, রোজ রোজ ডান্ডা খেতে হয় না।"

"একদম ঠিক বলেছেন মশাই, ঠান্ডা গোস্ত।* এর ব্যাপারে হাইকোর্ট যে ফয়শালা শুনিয়ে ছিল।"

"চেষ্টা করেছিল, সফল হয়নি"

"তাহলেও আরও একটা মোকদ্দমা চলত —ও নিজের জান নেওয়ার চেষ্টার অভিযোগে।"

"আমার ধারণা লোকটা আত্মহত্যা করতেই চায় না, তা না' হলে দমবার পাত্র নয়।"

"তাহলে আপনার ধারণা লোকটা অশ্লীল ক্রিয়া-কর্ম জারি রাখবে।"

"জী হুজরত (হ্যাঁ মশাই) এটা ওর নামে পাঁচ নম্বর মোকদ্দমা। থামার হলে পয়লা মোকদ্দমার পরেই হন্যে হয়ে থেমে যেত আর কোন ভদ্রলোকের পেশা বেছে নিত।"

"উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, সরকারী চাকরী নিতে পারত, ঘি বেচতে পারত, কিংবা মহস্ত। পীর গিল্নিাগের গোলাম আহমদ সাহেবের মত দু'একটা রোগ সারানোর কিরিও আবিষ্কার করে ফেলতে পারত।"

"এ রকম শত শত কাজ আছে কিন্তু অধঃপতিত মানুষের ধর্মই ওই—লিখবে আর লিখবে।"

"এর ফলশ্রুতি কি হতে পারে—ধারণা আছে আপনাব?"

"খারাপ কিছু হবে।"

"পাঞ্জাবে ওর নামে ছ'টা মোকদ্দমা চলছে—সিন্ধু প্রদেশে দশটা। সীমান্ত প্রদেশে চারটে। আর পূর্ব পাকিস্তানে তিনটে। এসবের চোট সহ্য না করতে পেরে ও পাগল হয়ে যাবে।"

"দুবাব পাগল হয়েই গিয়েছিলো।"

"লোকটা বেশ দুরদর্শী আছে তো। রিহারসাল দিচ্ছিল আর কী। যদি সত্যি সত্যি

---

* মন্টোর রচিত একটি ছোট গল্প যা অশ্লীলতার দায়ে পাকিস্তানে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।

পাগল হয়ে যায় তো পাগলখানায় গিয়ে বেশ আরামেই থাকবে।"

"লোকটা পাগল হয়ে গেলে কি করবে?"

"পাগলের হুঁস ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করবে।"

"এটাও কি একটা অপরাধ নয়?"

"জানি না। উকীল বলতে পারবে। সেন্সর-এ ভরা পাকিস্তানে এই জন্য কোন দফা আছে কি নেই জানি না।"

"থাকা উচিত—পাগলের হুস ফিরিয়ে আনাটা দফা ২৯২-এর রোশনিতে (আলোক) তো বেশ বিপজ্জনক কাজ বলে মনে হয়।"

"দফা ২৯২-এর প্রসঙ্গে হাইকোর্ট "ঠান্ডা গোস্ত"-এর অশ্লীলতার ফয়সলা করতে গিয়ে পরিষ্কার ভাবে জানিয়ে দিয়েছে মক্কানাকার নীয়তের (লেখকের উদ্দেশ্যের) সাথে কানুনের কোন ওয়াস্তা (সম্পর্ক) নেই। তাই ভালই হোক বা খারাপ, আইন শুধু দেখবে তার প্রভাব- প্রকশতাটা কোন দিকে।"

"আরে মশাই, এর জন্যই ত বলছি পাগলদের হুসমন্দ (ভাল করা) করার কাজটায উদ্দেশ্য যাই হোক তার প্রভাব প্রকশতার দিকে ভালভাবে নজর দেওয়া উচিত। এই সব ক্রিয়াকর্মের প্রভাব-প্রকশতা সমাজে কোন ভাবেই বাড়তে দেওয়া যায় না।"

"এ সব আসলে কূট-কচালী। এসবের থেকে আমাদের দূরে থাকাই ভাল।"

"ভাল বলেছেন মশাই, ঠিক সময়ে শুধরে দিয়েছেন। এসব কথা ভাবাও হয়ত আজকাল মস্ত একটা অপরাধের পর্যায়ে পরে।"

"কিন্তু মশাই, আমি ভাবছিলাম মন্টো সত্যি সত্যি পাগল হয়ে গেলে ওর বিবি বাচ্চার কি হবে?"

"ওর বিবি বাচ্চা যাকনা জাহান্নমে - তার সাথে কানুনের কি সম্পর্ক?

"ন্যায্য কথা - কিন্তু হুকুমত ওদের সাহায্য করবে না"?

"হ্যাঁ, সরকার। সরকারের কথা আলাদা। আমার মতে ওকে সাহায্য করা উচিত, আর কিছু না হোক খবরের কাগজে ঘোষণা করে দেওয়া উচিত, মন্টো ওর কাজকর্মের ব্যাপারে গভীর ভাবে দেখছে"।

"যতদিন ও ভেবে দেখবে তার মধ্যেই মামলা সাফ হয়ে যাবে"।

"খবরে যা প্রকাশ — এরকমটাই হবে।"

"লানত ভেজো মন্টো আউর উসকি বিবি বাচ্চা পর।"

(অভিশাপ লাগুক মন্টো আর ওর বিবি বাচ্চার উপর।) এখন বলুন তো হাইকোর্টের রায়ের প্রভাব উর্দু সাহিত্যের উপরে কতটা পড়বে"?

- "উর্দুর উপরেও লানত (অভিশাপ) নামুক"।

"না সাহেব, অমনটা বলবেন না, — শুনেছি সাহিত্য নাকি প্রত্যেক জাতির পক্ষেই একটা মস্ত মূলধন"।

"লক্ষ টাকা দানের কথা বোলছেন মশাই। তাহলে সুমান, মীর, হুসেন, শওক, শাদী,

হাফিজ, ইত্যাদিরা দফা ২৯২-এর চোটে সাফ হয়ে যাবে"।

"হওয়া উচিত, — নাহলে এদের টিকে থাকার অর্থ কি"?

"যত বেটা সাহিত্যিক আর কবির দল আছে এখন এদের হুস ফিরে আসবে আর কোন ভদ্রলোকের পেশা বেছে নেবে"।

"লীডার বনে যেতে পারে'।

"স্রেফ মুসলীম লীগের"।

"জী হাঁ, আমার মতে অন্য কোন লীগের নেতা হওয়াটাই অশ্লীলতার পর্যায়ে পড়ে।"

"লীডারি ছাড়াও আরও অনেক ভদ্রলোকের পেশা রয়েছে। যেমন ডাকঘরের বাইরে বসে অন্যের হয়ে সুন্দর করে চিঠি লিখে দিতে পারে । দেওয়ালে ইস্তাহার লিখতে পারে। এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের ক্লার্ক-এর কাজ নিতে পারে। কত নতুন নতুন দেশ আছে সে সব জায়গায় গিয়ে সময় কাটাক"।

"জী হাঁ, এত খালি জায়গা পড়ে আছে"।

"হুকুমত ভাবছে - রাভী নদীর পারে নর্তকী আর বেশ্যাদের জন্য একটা বাসভূমি তৈরি করে দেবে, যাতে শহরের আবর্জনা দূর হয়। সেই সাথে কবি, কাহিনীকার আর সাহিত্যিকদের এদের দলে নিয়ে নেওয়া উচিত"।

"খুব ভাল আইডিয়া।- এসব লোক ওখানে খুশীই থাকবে। কিন্তু এসবের পরিণতি কি হবে"?

"পরিনামের কথা কে ভাবে মশাই, যা হবার হবে। আরে মশাই, লোহাকে কাটে লোহা, — আর অশ্লীলতাকে কাটবে অশ্লীলতা"

"বড়া দিলচশপ সিলসিলা রহেগা"। (ভারী ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হবে)

"কিন্তু এই কমবখত মণ্টো ওদের মুজরা না শুনে ওদের সম্পর্কে লেখা শুরু করবে। কাউকে সুগন্ধ মাখিয়ে, কাউকে সুলতানা সাজিয়ে পেশ করবে"।

"কিছুটা আনন্দ আর কিছুটা অনুসন্ধান কর্ম"।

"জানি না কমবখতটা এই সব অধপতিত লোকেদের তুলে ধরে কি মজা পায় — সারা দুনিয়া ওদের জলীল আর হকীর (খারাপ আর ঘৃণ্য) মনে করে আর ও ব্যাটা ওদের বুকে টেনে নেবে — ওদের পেয়ার করবে"।

"মণ্টোর বোন অজমত ওর সম্পর্কে কিছুটা ঠিক বলেছিল যে রাজ্যের অদ্ভুত ভয় ধরানো আর চমকে দেওয়ার মতো জিনিসেই ওর বড় বেশী রগবত (আকাঙ্ক্ষা)। ও মনে করে যদি অনেক লোক সাদা কাপড় পরে বসে থাকে আর কেউ একজন গায়ে পাঁক লাগিয়ে ওখানে চলে আসে, তাহলে সকলেরই হক্কা বক্কা (ধাঁধা) লেগে যায়। সবাই যখন কাঁদো কাঁদো ওখানে একটা উচ্চ হাসির রোল তুলে দেয় তাহলে সবাই দমবন্ধ করে নিজেদের টুকরো টুকরো মুখে দেখতে পাবে। তার পরেই প্রতিপত্তি দেখাবে কর্তৃত্ব জাহির করবে"।

ওর ভাই মুমতাজ হোসেন মণ্টো বলে যে ও না কি নেকীর (ভাল) সন্ধানে ঘুরে বেরায়। এক আশ্চর্য আলোর কিরণ ওইসব ভাল মানুষদের পেটের থেকে বেরিয়ে আসে

যে সম্পর্কে আপনি কল্পনাই কোরতে পারবেন না। আর এটাই না কি মন্টোর কাজের ইতিবৃত্ত"।

" এ ত ভারী অদ্ভুত ব্যাপার বরং ভারী অশ্লীল ব্যাপার যে ওই সব ভাল মানুষদের পেটের থেকে আলোর কিরণ বেরিয়ে আসে — তাতে অবশ্য বিচারের ফয়শালার হের ফের হয় না"।

"আর পাঁক নিযে ধপধপে সাদা পোবাক পরিহিতদের মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়া, সেটার কি হবে"?

"সেটাত আরও অশ্লীল"।

"এ'ত পাঁক কোথা থেকে নিয়ে আসে"?

"আবর্জনার ডুবুরী, যেখানে গিযে ঠেকে আর কী"।

"আসুন আমরা খোদার কাছে দোয়া করি যাতে ওর এই অভিশপ্ত অস্তিত্বের স্পর্শ থেকে মুক্তি পাই। এতে সম্পর্ক মন্টোরও মুক্তি প্রাপ্তি হবে"।

"হে রব আলামীন (প্রভু, জগতের সৃষ্টিকর্তা), হে রহীম (কৃপাময়) হে করীম (দয়াবান), আমরা তোমার দুই পাপিষ্ঠ বান্দা গড় করে দোযা মাঙ্গছি। তুমি সাদাত হোসেন মন্টোকে, যার পিতার নাম গোলাম হোসেন মন্টো, যিনি অত্যন্ত সংযত ও ধর্মভীরু মানুষ ছিলেন, তাঁর এই অযোগ্য পুত্রটিকে দুনিয়া থেকে তুলে নাও, যে দুনিয়ায ও সুগন্ধ ছেড়ে দুর্গন্ধের দিকে ধেয়ে যায়। আলোয় ও চোখ-খোলে না কিন্তু অন্ধকারে ঠোকর খেতে খেতে চলা ফেরা করে, আপনার প্রতি ওর কোনও আগ্রহ নেই। ও মানুষকে সব সময় নগ্ন দেখে। মিষ্টত্বের প্রতি ওর কোন আকাঙ্ক্ষা নেই, কিন্তু কড়বাহাড়ের (তেতোর) জন্য জান দিয়ে দেয়। ঘরোয়া মেয়েদের দিকে ও চোখ তুলে দেখেও না কিন্তু বেশ্যাদের সাথে ঢলাঢলি করে রাত করে। পরিষ্কার জল ফেলে রেখে নোংরা জলে চান করে। যেখানে কাঁদবার কথা সেখানে হেসে ফেলে আর যেখানে হাসবার কথা সেখানে কেঁদে ফেলে। কোমল শরীরের দালালি করে যে লোকটা নিজের মুখ কালো করল ও তার মুখের কালিমা মুছে সাফ করে আমাদের লোকটার মুখটা দেখায়। ঈশ্বর, ও আপনাকে ভুলে শয়তানের পিছনে ঘুরে বেরায়।

"হে ব্রহ্মাণ্ড-স্রষ্টা প্রভু। এই দুর্ভাগ্য-প্রিয়, বদমায়েশের ধাড়ী মানুষটিকে তোমার দুনিয়া থেকে তুলে নাও, যে দুনিয়ায় ও ওর বদ কারবার আর বদ রীতি-নীতির রমরমা চালু করার চেষ্টায় ব্যস্ত আছে। আদালতের রায়ই সে কথার সাক্ষী দিচ্ছে। কিন্তু সেটা ত পৃথিবীর আদালত। আপনি ওকে এই দুনিয়া থেকে তুলে নিন আর নিজের আশমানী আদালতে ওর বিরুদ্ধে মামলা চালান। ওকে প্রকৃতপক্ষেই কড়া সাজা দিন। কিন্তু খেয়াল রাখবেন প্রভু, লেখনীটা ওর হাতে ভালই চলে। এরকমটা যেন না হয় ওর কোন রচনা আপনারই ভালো লেগে গেল। আমাদের প্রার্থনা শুধু এইটুকু, ওকে এই দুনিয়া থেকে তুলে নিন, রাখতেই হয়তো আমাদের মত করে বানিয়ে রাখুন আর দশটা সাধারণ লোকের মত, যারা একে অপরের দোষ ত্রুটি পর্দা দিয়ে ঢেকে রাখে"।

অশোকচন্দ্র রাহা

অবসরের ইতিনেতি

স্কুল কলেজে বিদ্যালয়ের কিঞ্চিৎ সৌভাগ্য যাঁদের জুটেছে তাঁদের প্রায় সকলেরই কাছে পরিচিত ইংরেজ লেখক চার্লস ল্যাম্-এর একটি রচনা 'দ্য সুপার অ্যানুয়েটেড ম্যান' যার বাংলা করলে দাঁড়ায়—অবসরপ্রাপ্ত এক ব্যক্তি। রচনার প্রসঙ্গটি হাস্যকৌতুকের ঘরানায় লেখা 'ইলিয়া' নামের ছদ্মবেশে লেখকের চাকরী-অন্তে আপন অবসর জীবনের 'নানা রঙের দিন গুলির'ব বর্ণনা। ঐ আপাত মজাদার রচনাটির ভাঁজে ভাঁজে সঞ্চিত আছে হাসিকান্নার মনিমুক্তা। প্রথমাংশের বর্ণনায় 'শুধু দিন যাপনের' কানাগলিতে পথ-অন্বেষণের ব্যর্থ প্রয়াসের বাঙ্ময় অভিব্যক্তি। আর পরবর্তী পর্যায়ে সেই নির্মম নিষ্ফলতার আশ্বিব অপমৃত্যুর অবসানে মুক্তির নীলাকাশে পাখা ছড়ানো বা অন্তহীন নীল সমুদ্রে অবগাহন। ছাত্রাবস্থায় পাঠ্যাংশ হিসাবে লেখাটি পড়ার মধ্যে যেটুকু রসাস্বাদন ঘটে তা নিতান্তই মানচিত্রের পটে পৃথিবী পরিক্রমার মত। বয়স্কদের ক্ষেত্রেও অবশ্য লেখাটিব আসল রস ধরা দেয় শুধুমাত্র কতিপয় বেহিসেবী বেখাপ্পা মানুষের কাছেই। 'কতিপয়' শব্দটি ব্যবহার করছি, কেন না অবসর জীবনটুকু অধিকাংশ মানুষের কাছেই এক অবাঞ্ছিত বোঝার মত। 'জীবন দীপ'-এর শেষ কড়িটি গুনে পাওয়া গেলেও আসল দীপটির পলতে তখন নিভু নিভু করতে থাকে, যতই তেল ঢালো অথবা পলতেটিকে উসকাও সে আব জ্বলে উঠতে চায় না — অশক্ত শরীর ও মনে শুধু অর্থ প্রাচুর্য অথবা নানা অনর্থের এক দুর্বিসহভার - চোখের সামনে শুধু আতঙ্ক —'দারাপুত্র পরিবার তুমি কার কে তোমার'—সে যেন সজ্ঞানে আপন প্রেতাত্মার দর্শন লাভ। অগত্যা ইহকালের পাট চুকিয়ে রুদ্রাক্ষের মালা হাতে পরকালের কড়ি গুনতে গুনতে কোন রকমে 'পার কর আমারে' গৎ গাইতে গাইতে দিনগত পাপক্ষয়।

কিন্তু উপায়ই বা কি? যার শুরু আছে তার শেষ তো থাকবেই। পরীক্ষায় পাশ, নতুন চাকুরী লাভ, উদ্ভিন্ন যৌবনা নববধূ, পরিপাটি বেশবাস, গৃহসজ্জায় পুষ্পস্তবক ইত্যকার ইচ্ছাপূরণগুলি তো আর চিরস্থায়ী হতে পারে না, কাজেই ঐ বয়োবৃদ্ধিজনিত অবসর প্রাপ্তিকে মেনে নিতেই হয়, আর সেটি সহজভাবে গ্রহণ করাতেই জীবনে পূর্ণতার স্বাদ, নচেৎ ব্রাউনিং-এর মত অত বড় জীবনবাদী কবি কেনই বা তাঁর কবিতায় উচ্চারণ করতে যাবেন Grow old along with me/The best is yet to be 'বেসট্' মানে তো সুপারলেটিভ - সর্বোৎকৃষ্ট, অর্থাৎ বার্ধক্য যেন একটি অপবিণত ফলের রস ও গন্ধে ভরপুর এক পরিপক্ক পরিণতি, এবং তা স্বাভাবিক ও কাম্য। আর তাই যদি না হবে তবে তো অকালমৃত্যু—সেটা কি স্বাভাবিক না বাঞ্ছনীয়? আসলে বর্তমানেব প্রাপ্তিটুকুকে আমরা

আঁকড়ে ধরে থাকতে চাই প্রতিক্রিয়াশীল মানসিকতায়। মনে পড়ল আমার এক পরিচিত ভদ্রলোকের কথা। ভদ্রলোক সারা জীবন ব্যাংকের লেজার বই নিয়ে হিমসিম খাওয়ার শেষ পর্বে চাকুরীতে পদোন্নতির ফলে বাবু থেকে সাহেব হয়েছিলেন। অতঃপর যখন বিদায়ী মাল্যদান ও ছাতা লাঠি ইত্যাদি সহকারে শোকসভার পর আবার তাঁকে পাতলুন ও শার্টের পরিবর্তে পুনর্মূষিকের মত ধুতি ও হাফ হাতা শার্ট পরে বাজারে থলিটি হাতে পথে নামতে হল সেদিন যেন তাঁর বিরহ বেদনার অবস্থা—বাজারে সাধারণ মানুষজন—আলুওয়ালা, পটলওয়ালা তাঁকে সাহেব বলে সম্ভাষণ করেনি। সাহেবের এ দুঃখ কত মর্মান্তিক তা অনুধাবন করতে পারি। কেন না এমন অনেক সাহেবের সঙ্গেই মাঝে মাঝে সাক্ষাৎ হয়। তবে বলতে পারি ঐ সাহেবের অন্তর্বেদনায় বোধ করি একমাত্র তাঁর গৃহিণী ব্যতিরেকে অপর কেউ সমবেদনা জানাননি।

অবসরটা অবসরই এবং এ এক দুর্লভ প্রাপ্তি বলে গ্রহণ করাতেই আনন্দ। কবি বায়রণের চিত্রিত 'শিলন' কয়েদখানায় বন্দীর মত শৃঙ্খলিত জীবনে দীর্ঘকাল অভ্যস্ত হওয়ার পর যেদিন মুক্তি আসে সেদিন বুঝি বা সেই মুক্তি নিয়ে আসে দীর্ঘশ্বাস যেমন ঐ বন্দী বলেছিল I regained my freedom with a sigh—তবে জীবনে তার চেয়ে বেশী বঞ্চনা আর কিছু হতে পারে না। অবসর জীবন হাতড়াতে হাতড়াতে ঐ স্যাম্ এর মতই হাবরেদের কপালেও জুটে যায় অপার ঐশ্বর্যের গুপ্তধন, যার নাম আনন্দ। জাগতিক অর্থে তাঁরাই ভাগ্যবিড়ম্বিত হলে কুছ পরোয়া নেই। অবসর জীবনে বাৎসরিক ক্যালেন্ডারে অচিহ্নিত ছুটির যাবতীয় দিনগুলিতে তাড়িয়ে তাড়িয়ে প্রতিটি মুহূর্তকে আকণ্ঠ পান করার মধ্যে না চাইতে জুটে যায় অমৃতপানের পূর্ণ স্বাদ। সাধারণ অর্থে অবসরকে এক মজা বলে মনে করাই বোধহয় সবচেয়ে মনোরম—একটানা ছুটি আর ছুটি, গোল্লা-ছেঁড়া প্রমত্ততা অবসরের খোসমেজাজ, তা সে দাবা-পাশা-তাসের আড্ডাই হোক, বইপড়া বা নাটক করাই হোক। গোল্লায় যাক ওসব—তার বদলে না হয় কোন শিবমন্দির বা গাজন তলায় গোল হয়ে বসে ব্যোম ভোলানাথই হোক। ক্ষতি কি? ছুটির দিনে সবাই তো শিশু, শিশুর আবার জাত কীসের?

লেখক স্যাম্-এর সঙ্গে অবসরের মেজাজে সবটুকু না খোঁজাই ভাল। লেখক শিল্পীদের জাতই আলাদা। তাঁরা 'nothing to do' এর নিরলম্ব চালচুলোহীন শূন্যতার মধ্যে অপূর্ব বস্তু নির্মাণ কমপ্রজ্ঞা বা প্রতিভালব্ধ যে সৃষ্টির শাবকগুলি কোলে নিয়ে মসগুল থাকতে পারেন সেটা তাঁদের শ্রেণীগত প্রিভিলেজ - বৃটিশ পার্লামেন্টে লর্ডশ্রেণীর মত। আমরা যারা ছা-পোষা গেরস্ত, গড্ডালিকা প্রবাহে আহার-নিদ্রা-মৈথুনের অনিবার্য আকর্ষণে গুটি গুটি অগ্রসর হই এবং প্রাতঃকালে দেবদেবীর রংচটা ছবিতে প্রণাম ঠুকে দুর্গা নাম জপতে জপতে চৌকাঠের বাইরে এদিক ওদিক দেখে হাঁচি টিকটিকি বাঁচিয়ে পা ফেলি এবং সারাদিনের 'মা আমায় ঘুরাবি কত'র পরে রাত্রিকালে গৃহিণীরচিত শয্যায় থোড়-বড়ি খাড়া আনন্দে জীবনের চরম চরিতার্থতার সন্ধান পাই অথবা কায়েমীভাবে ভিত গেড়ে বসা উচ্চ

রক্তচাপ ও মিষ্টান্ন না জোটা সত্ত্বেও শোণিতে শর্করার অবাধ্যতা হেতু মাঝে মধ্যে দম ফুরিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ি, তাদের অর্থাৎ সে সর্বসাধারণ শ্রেণীর অবসর প্রাপ্তিই আলোচ্য সমস্যা। একবারও কি আমরা ভেবে দেখেছি অবসর মানে আবিষ্কার, নিজের কাছে নিজেকে খুঁজে পাওয়া? পাওয়ার আরও আছে। কবি ওয়ার্ডওয়ার্থের কথায় কবিতার জন্ম নাকি 'ইমোশান রিকালেকটেড ইন ট্রানকোয়েলিটির' গর্ভে, অর্থাৎ আজ যা চলার পথে এক পলকের একটু দেখাতে কিংবা কোনও ফুলের গন্ধ চমক লেগে ক্ষনিকের জন্য আনমনা করে দিয়ে গেল তা জমা হয়ে রইল নিজেরই অলক্ষ্যে অন্তরের গভীর গোপনে, পরে একদিন কর্মহীন পড়ন্ত বেলার বসন্ত বাতাসে তা আপ্লুত করে দেয় সারা দেহমন - ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের সেই পাহাড়ী কিশোরীটির গানের সুরের মত বা উপত্যাকার পথ বেয়ে যেতে যেতে গুচ্ছ গুচ্ছ ড্যাফোডিল কুসুমের মত। রসবিবর্জিত যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগের আপিসী লেজার বই-এর গোলক ধাঁধায় ল্যাম-এর কাছে যে রবিবার বা অন্য ছুটির দিনগুলো আসতো সেইগুলিই বোধহয় অবসর জীবনে রিকালেকটেড ইন্‌ ট্রানকোয়েলিটি রূপে তিনি ফিরে পেয়েছিলেন তাঁরই সমকালীন কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের মত। যারা সে দিন পাশ দিয়ে চলে গিয়েছিল নীরবে, চোখ তুলে যাদের দেখার অবসর হয়নি অথবা সেদিন ধুলিধুসর, ক্লান্ত, অবসন্ন, মর্যাদাহীন মানুষটির কাছে যারা ধরা দিতে দ্বিধা করেছিল তারা সবাই এসে জড়ো হয়, মানস নেত্রে অবসরের মধুবৃন্দাবনে 'যেন শিথিল' বেশবাসে পাশে এসে দাঁড়িয়ে বলে 'দেখতো মোরে চিনিতে পারো কী না'? এরই নাম 'রিটায়ারমেন্ট'— নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার—কর্মজীবনের শেষে জীবনের শেষ বসন্ত'।

জানি, সমাজ সংসারে বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ব্যক্তির সংখ্যাই অধিক, যাঁরা মনে করেন খেজুরের রসপানটুকু কেবল মাত্র নাবালকত্বের মজা - তাঁদের সারাটা জীবন কেটে যায় রস উবে যাওয়া গুড়টুকু ভাঁড়ে মজুত করতে। অবসরের যে মজাটুকু ধরা ছোঁয়া যায় না তাতে তাঁদের মন ওঠে না। বাড়ি, গাড়ি, ব্যাংকে মজুত টাকা এবং পাটোয়ারী পুত্র ও সদাগরী জামাতা অর্জনের পরেও মাথায় হাত দিয়ে তাঁরা ভাবতে বসেন অতঃপর অবশিষ্ট চিন্তা-শক্তিটুকু কোন শেয়ার বাজারে লগ্নি করা যায়। ভাগ্যবান এই হতভাগ্যদের জন্য বোধ করি ঈশ্বর আজ অবধি নির্দিষ্ট কোনও স্বর্গের ব্যবস্থা করে উঠতে পারেন নি, ঈশ্বরও সেখানে নাচার, স্বর্গও সেখানে ব্যর্থ। তবে একটা রফার ব্যবস্থা বোধহয় পূর্বোক্ত ঐ কবি ব্রউনিং-এর একটি কবিতায় খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। এবং সেই রফার শর্তে বোধহয় কথঞ্চিত সান্ত্বনার আশ্বাস পাওয়া যায়। কবিতাটিতে একটি বৈকল্পিক ব্যবস্থার রূপক খাড়া করা আছে 'রেব এজরা' নামক এক ইহুদি গুরুর উপদেশের মাধ্যমে। ব্যাপারটা অনেকটা এই রকম, এল, আই, সি-র চুক্তি মাফিক প্রিমিয়ার গুনতে গুনতে যখন চুক্তিটা রফায় এসে পৌঁছয় তখনই দেখা যায় দীর্ঘকালের সঞ্চয়ের বোনাসসহ মোটা অঙ্কটি। ব্রাউনিং ঐ খুচরো প্রিমিয়ামগুলো দেওয়ার মধ্যে পটারস হুইল বা কুমোরের চাকে চাপ খাওয়া আলুথালু কাদামাটির সাদৃশ্য দেখতে পেয়েছেন এবং দেখতে পেয়েছেন ধীরে ধীরে

কেমন করে ঐ এবড়ো খেবড়ো মাটির তালগুলো মূর্তি পেয়ে যায় এক সুন্দর মৃৎপাত্রের রূপে। ঠিক তেমনই সারা জীবনের জমে ওঠা ছেঁড়া চটি ও ঘামে ভেজা মলিন জামা কাপড়ের খোলাম কুচিগুলো জমতে জমতে গড়ে ওঠে এক সৌম্য সৌন্দর্য—বার্ধক্যের আঁচড় লেগে। এতসব তত্ত্বকথা বলার দরকার ছিল না, বলা শুধু তাঁদের কথা ভেবেই যাঁরা উপযুক্ত দক্ষিনা না পেলে জীবনের পুঁটুলি বেঁধে শ্রবণেন্দ্রিয়ের ইহকালের পাট চুকিয়ে পবিত্র হরিবোল ধ্বনি শুনতে শুনতে গঙ্গাযাত্রা করতেও অপ্রসন্ন হন।

ঐ অবসরকে বা লাগাম ছাড়া ছুটিকে অর্থান্তরে বার্ধক্যকে তো দ্বিতীয় শৈশব আখ্যা দেওয়াও হয়ে থাকে। তবে তত্ত্বকথা ছেড়ে না হয় একটু খোলাখুলিই বলি— হে অবসর-প্রাপ্ত ভাগ্যাবানের দল, অবধান করুন, সূর্যোদয় না হতেই প্রত্যহ প্রাণের দায়ে দল বেঁধে ফাঁকা মাঠে দৌড় ঝাঁপ করার পর শূন্য কুম্ভ লাফিং ক্লাবে হা হা করে না লাফিয়ে কণ্ঠ মিলুক চাই না মিলুক সমস্বরে গেয়ে উঠুন 'তার হিসাব মিলতে মন মোর নহে রাজী।' আর তার চেয়েও ভাল হয়, গুলি মারুন ঐ হিসাব নিকাশী গানে—নেমে আসুন শিশুর মেলায়, 'অন্তবিহীন গগনতলে' কবতলদুটোকে সামনে এগিয়ে দিয়ে নাচের মুদ্রায় সুর করে বলুন "কেয়াপাতার নৌকো গড়ে সাজিয়ে দেব ফুলে" ঐ মুহূর্তে কি স্বতই মনে হবে না 'আছে দুঃখ আছে মৃত্যু' কিন্তু তারও পারে আছে 'আনন্দ'।

সুজয় ঠাকুর

ঘুম

[মানুষের করণীয় কেবল ব্যক্তিগত জৈবিক প্রয়োজন মেটানোতে সীমায়িত নয়। যা মোট কর্মক্ষম সময়কে অনেকখানি সংক্ষিপ্ত করে রেখেছে তা হল ঘুম। মনে হয় বিজ্ঞানের উন্নতি, এবং সমস্ত লোকের বেলা তার সুবিধাগুলো পাওয়া, যেমন ক্রমে মানুষের অবশ্য করণীয়কে কম সময়ে সম্পন্ন হওয়া দ্বারা অবকাশকে বিস্তৃততর করছে (যে অবকাশ রবীন্দ্রনাথের ভাষাতে বিরাটের সিংহাসন), ঘুমের সময়কেও ক্রমে সেই রকম কমিয়ে একই সুফলের দিকে এগাবে। ঘুম সম্বন্ধে গবেষণা তাই অহেতুক নয় মোটেই।]

প্রবলতর মাত্রা ছাড়াও বর্তমানে অন্তত খানিকটা ঘুম নিশ্চিত প্রয়োজন। বাচ্চারা এবং মানবেতর প্রাণীরা অবধারিতভাবে নিদ্রা যায়। তবে এও চিন্তা করা দারকার যে পূর্ণ বয়স্ক মানুষের পক্ষে কতটা অভ্যাসের দাসত্ব, কতটা অবশ্য প্রয়োজনীয়।

ঘুমের ইচ্ছে এবং ঘুমের প্রয়োজন কম নয়। খাদ্য গ্রহণ যেমন একটা মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে কেবল বিলাস-প্রিয়তা, ঘুমও তেমনি কেবল একটা সীমা অবধি প্রয়োজনীয়, সে সীমা ছাড়িয়ে গেলে বদ-অভ্যাস মাত্র। এরকম বহু ব্যক্তি আছে যারা দিনের পর দিন মাত্র ২-৩ ঘন্টা ঘুমিয়েও স্বাভাবিক কর্মক্ষম জীবন যাপন করতে পারে। বিভিন্ন জৈব প্র[illegible] এবং একটা প্রজাতির ভিন্ন ভিন্ন বয়েসে এবং ভিন্ন ভিন্ন পেশাগত ব্যক্তির বেলা ঘু[illegible] প্রযোজন-মাত্রা আলাদা। এও মনে হয় অনেকটা ব্যক্তির নিজস্ব গঠন, অভ্যাস ও শর্তাধীন প্রতিবর্ত দ্বারা ঘুমের প্রয়োজন নির্ধারিত হয়। বর্ধিত মানসিক বা শারীরিক পরিশ্রম বা চাপের পরে কিংবা অসুস্থতার সময়ে বা গর্ভাবস্থায় ঘুমেব প্রযোজন বৃদ্ধি পায়।

জোর করে ঘুম থেকে বঞ্চিত করলে, মাংসপেশীগুলির শক্তি বা গণনা (অঙ্ক কষা) ক্ষমতা কমেছে বলে মনে হয় না। তবে মনসংযোগ করার ক্ষমতা হ্রাস পায়, তাই কোন গণনাতে বেশী সময়ে লাগে। তবে এও ঠিক যে মানুষের বেলা করা পরীক্ষাগুলোতে হয়ত একটা সীমা ছাড়ানো হয় নি। কারণ দেখা গেছে যে পরীক্ষাগত জন্তুগুলি খুব বেশী নিদ্রা-বঞ্চিত হলে মারা যায়।

সাধারণ ভাবে মনে করা হয় যে বিপাক জনিত জমা হওয়া বর্জ্য পদার্থ ঘুমের বিশ্রামের মধ্যে পরিস্কৃত হয়ে যায়। তবে এ বক্তব্যটি অতি-সরলীকৃত।

এই সংক্রান্ত একটা কথা উল্লেখ করা যাক, যা আমাদের প্রত্যেকের জীবনের অভিজ্ঞতা, কারণ তা ঘুমের তত্ত্বগত জ্ঞান সম্পর্কে ইঙ্গিত করে। কোন বিশেষ জরুরী কারণে যদি নেহাৎ অল্প ঘুমের পরও ঘুম ভেঙে উঠতে হয়, তাহলে প্রকৃত গভীর ভাবে চিন্তা করে শুলে এলার্ম ঘড়ির দরকার হয় না। এই ধরনের বাস্তবতা দেখায় যে ঘুমের মধ্যেও মস্তিষ্কের খানিক অংশ জাগ্রত। অর্থাৎ কিছু কোষ- উত্তেজিত। এদের চৌকিদার-কোষ নাম দেওয়া হয়েছে। কিংবা হয়ত মস্তিষ্কের মধ্যে এক কম্পিউটার (পরিগণক) কার্যরত - ঘুম মানে পুরোপুরি নিস্তেজনা নয়। হয়ত, একঘেয়ে কাজে ঘুম এসে যাওয়া

এবং খুব ভালো লাগা কাজে ঘুম তাড়িয়ে দেওয়া, এ ব্যাপারটাও উপরোল্লিখিত কথাটির সঙ্গে জড়িত।

কয়েকটি বিভিন্ন সংজ্ঞাবহ (Sensory), সঞ্চালক (motor) এবং শারীরবৃত্তীয় (physiological) লক্ষণের যুগপৎ বিদ্যমানতা দিয়ে ঘুমের পরিভাষা নির্মাণ সম্ভব, কিন্তু এগুলির মধ্যে কোনোটির বা কতকগুলির মধ্যে অনুপস্থিত বা জাগরণে উপস্থিত থাকতে পারে। উদাহরণত সমস্ত পেশীর শিথিলতা ঘুমের মধ্যেও থাকে না।

মস্তিষ্কে বিদ্যুৎ লেখা যন্ত্রে করোটির বিভিন্ন অংশে তড়িৎ বাহক শলাকা স্থাপন করে সেই শলাকাগুলিতে সুক্ষ্ম মানের তড়িৎ প্রবাহ পাওয়া যায়। এই প্রবাহগুলিকে দশ লক্ষ গুণ বিবর্ধন করে মস্তিষ্কের ভিতরের নানান অবস্থার সঙ্গে সেগুলি ধরন আলোকিত করা হয়েছে। ঘুমের অবস্থাকে মস্তিষ্কে বিদ্যুৎ লেখার একটি বিশেষ ধরণ দিয়ে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। স্তন্যপায়ী প্রাণীগুলির মস্তিষ্কে বিদ্যুৎ লেখা এবং অন্য শারীরবৃত্তীয় ব্যাপার, নিদ্রাকালীন, মানবঘুমের সঙ্গে মেলে।

ঘুমের সময় বিদ্যুৎ তরঙ্গগুলি বিস্তারে (in amplitude) এবং কম্পন সংখ্যাতে হ্রাস পায়। রক্তচাপ কমে, মস্তিষ্কে রক্তপ্রবাহ কমে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সামান্য বিস্তৃত হয়। শরীরের তাপমান কমে। প্রয় দেখা যায় খাবার পর ঘুম পেতে থাকে। হয়ত পরিপাক ক্রিয়া (digestion) বেশী চলার জন্য মস্তিষ্কের রক্ত প্রবাহ পরিপাক নাড়ি গুলিতে কিছুটা বিক্ষিপ্ত হয়ে কম হয়ে যায় বলে নিদ্রাভাব আসে। তবে আমরা সাধারণত খাবার পর ঘুমোতে যাই, তাই এ ব্যাপারটা হয়ত শর্তাধীন প্রতিবর্ত (conditioned reflex) মাত্র।

ঘুম কিন্তু গুণগত ভাবে সন্তত বা অবিচ্ছিন্ন (Continous) নয়। ঘুমের দু'রকম ধরণ— দ্রুত অক্ষি-সঞ্চালনযুক্ত ঘুম (REM Sleep) এবং অন্য রকম ঘুম (NREM Sleep) এ দু'রকম ঘুম প্রায় ৯০ মিনিট পর পর বদল হয়। মনে হয় ঘুমের ধরণকে একটি অভ্যন্তরীন ঘড়ি নিয়ন্ত্রিত করে। বিভিন্ন ব্যক্তির বেলা ভিন্ন ভিন্ন বহিঃ প্রভাব ঘুমিয়ে পড়ার ও ঘুম ভাঙার সময়কে নির্ধারিত করে বলেও মনে হয়।

এন-আর-ই-এম ঘুম স্বাভাবিক পূর্ণ বয়স্ক মানুষের পূর্ণ নিদ্রাকালের ৭৫ %। বাচ্চাদের বেলা দ্রুত অক্ষি সঞ্চালন ঘুম (আর-ই-এম-ঘুম) বেশী। এই আর-ই-এম ঘুম স্বপ্ন দেখার সঙ্গে জড়িত। বাচ্চারা তাই বেশী স্বপ্ন দেখে। পূর্ণ বয়স্কদের বেলা নিদ্রান্তে আর-ই-এম ঘুম কমই দেখা যায়। বাচ্চাদের ব্যাপা এরকম অবধারিত। নবজাত অবস্থাতে এবং শৈশবে ঘুমের ধারা বহুপর্যায়ী। বার্ধক্যে মানুষ প্রথম বয়েসের বহু পর্যায়ী ঘুমেতে আংশিক প্রত্যাবর্তিত হয়।

বেশীর ভাগ স্বতঃক্রিয় পরিবর্তনীয়গুলি (autonomic variables) আর-ই-এম ঘুমের সময়, এন-আর-ই-এম ঘুমের সময় অপেক্ষা, বেশী পরিবর্তনশীল। হৃদ-স্পন্দন ও শ্বাস-প্রশ্বাস হার দ্রুততর এবং কম সময়ের মধ্যে বেশী কমে ও বাড়ে। রক্তচাপও উচ্চতর, মস্তিষ্কের রক্তপ্রবাহ এবং তাপমান বর্ধিত। আর-ই-এম ঘুমকালীন, পরীক্ষাতে ব্যবহৃত জন্তুর বেলা দেখা গেছে, পৃথককৃত স্নায়ুকোষের কার্যকারিত্ব হার, জাগ্রতাবস্থায় প্রায় সমান বা বেশী। আর-ই-এম ঘুমের বেলাতেও কিন্তু অপ্রাসঙ্গিক (অর্থাৎ তাৎক্ষণিক প্রয়োজনীয় নয় এমন) উদ্দীপকগুলি প্রবিষ্ট হয় না।

এন-আর-ই-এম ঘুমের চারটি আলাদা আলাদা ধাপ আছে, যা মোটামুটি ভাবে কম গভীর থেকে বেশী গভীর ঘুমে ক্রমান্বিত। প্রথম সোপানে কম ভোল্টেজের এবং মিশ্রিত কম কম্পাঙ্কের বিদ্যুৎ তরঙ্গ থাকে। থিটা তরঙ্গ মালার (৪-৭ কম্পাঙ্ক) আধিক্য পরিলক্ষিত হয়। দ্বিতীয় সোপানটিতে অনেকগুলি ১২-১৪ কম্পাঙ্কের নাতি দীর্ঘ অনুক্রম থাকে যে গুলিতে, সেগুলিকে 'নিদ্রামাকু' (Sleep Spiandle) বলা হয় এবং কতকগুলি K-কমপ্লেক্স নামে বিশিষ্ট তরঙ্গ থাকে যা বহিরাগত উদ্দীপনা সৃষ্ট হতে পারে (যেমন শব্দ দ্বারা) আবার স্বতঃস্ফূর্তও হতে পারে। তৃতীয় এবং চতুর্থ সোপানগুলি অপেক্ষাকৃত বেশী ভোল্টেজের (৫০μV) এবং ডেল্টা তরঙ্গ (১ - ২ কম্পাঙ্ক) যুক্ত। চতুর্থ সোপানটি বেশী ডেল্টা তরঙ্গ ক্রিয়া দিনয়ে বিশিষ্ট।

ঘুম-বঞ্চনা এবং মানসিক রোগ শিজোফ্রেনিয়ার লক্ষণ এক রকম। তবে এটা ভুল ধারণা যে দীর্ঘকালীন ঘুম-বঞ্চনা উন্মাদ রোগের জন্মদায়ী। মানুষদের মধ্যে ঘুম-বঞ্চনা কোন প্রভাব পরবর্তী যথেষ্ট ঘুমের পরে আর থাকে না। ঘুম-বঞ্চনার সময় যে লক্ষণগুলি প্রকাশ পায় তা হল (১) একটুতেই বিরক্তি (২) দৃষ্টি ঝাপসা হওয়া (৩) কথা অস্পষ্ট হওয়া (৪) স্মৃতি বিভ্রম (৫) নিজের ব্যক্তি সত্তা সম্পর্কে বিভ্রম। কিন্তু জাগ্রত অবস্থাতেও মস্তিষ্কের দারুণ কর্মরত অংশগুলি কখনো না কখনো বিশ্রাম পায়। যখন একটা অংশ উত্তেজিত তখন আরেকটি নিস্তেজিত।

নীচে বিখ্যাত শারীর বিজ্ঞানী পাভলভের তত্ত্বগুলি দেওযা হচ্ছে এই আশাতে যে নতুন আবিষ্কৃত তথ্যের মধ্যে দিয়ে এগুলি পাঠককে আরো পূর্ণতর তত্ত্বের দিকে অগ্রসর করবে। উত্তেজনা ও নিস্তেজনা, দুই স্নায়ুতন্ত্রের স্বাভাবিক গুণ এবং নিস্তেজনার অর্থ কেবল উত্তেজনা না থাকা নয়। নিস্তেজনা দু রকম - শর্ত-বিহীন (Unconditioned) বহিরাগত এবং শর্তাধীন (Conditioned) যা অভ্যন্তরীণ। যদি পারিপার্শ্বিক হঠাৎ পরিবর্তন হয় তা হলে শর্তাধীন প্রতিবর্ত (Conditioned reflex) সাময়িক ভাবে বন্ধ হয়ে যায়। মস্তিষ্ক কোষগুলির সহ্যশক্তি দেহের অন্য সব কোষ থেকে কম। বহুক্ষণ থাকা উত্তেজনা বা কম সময় থাকা অতি উত্তেজনা কোষগুলির পক্ষে ক্ষতিকারক। যখন কোন জায়গায় উত্তেজনা সঙ্কট মাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়ার উপক্রম করে তখন সেই জায়গার কিনারা থেকে নিস্তেজনার বৃত্ত সমস্ত মস্তিষ্কে ছড়িয়ে পড়ে। এই বিশেষ নিস্তেজনাকে রক্ষাকারী নিস্তেজনা (Protective inhibition) বলা হয়।

পাভলভ বলেন "নিস্তেজনা হল স্থানীয় ঘুম যা নিশ্চিৎ সীমারেখার মধ্যে আবদ্ধ।"

দ্রুত-অক্ষি-সঞ্চালন-ঘুম (আর-ই-এম ঘুম) থেকে জেগে উঠে ৯৯ শতকরা লোক বলে তরা স্বপ্ন দেখছে। যারা বলে কখনো স্বপ্ন দেখে না তারাও স্বপ্নে কথা বলে। ঘুমের প্রথম দিকে আর-ই-এম ঘুমের ৯-১০ মিনিটের বেশী হয় না। আর-ই-এম ঘুম বা স্বপ্ন-দেখা-ঘুম শেষের দিকে বেশীক্ষণ ধরে হয়। ৮ ঘন্টাকাল ঘুমের মধ্যে আমরা প্রায় ৫ বার স্বপ্ন দেখি। সবশুদ্ধ প্রায় 1½ ঘন্টা স্বপ্ন দেখা থেকে বঞ্চিত হলেও মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে। কয়েক রাত স্বপ্ন দেখা থেকে বঞ্চিত মানুষকে পরে যথেচ্ছ ঘুমতে দিলে দেখা যায় সে প্রায় দু'গুণ সময়কাল স্বপ্ন দেখছে।

ঘুম কেন দরকার সে সম্বন্ধে কতগুলো কারণ অনুমান করা হয়েছে। প্রথম হল মস্তিষ্কের কার্য-ক্ষমতার পুনঃপ্রাপ্তি। দ্বিতীয় হল পেশীগুলির কার্য-ক্ষমতার পুনঃপ্রাপ্তি।

তৃতীয় হল বাড় বা পূর্ণতা প্রাপ্তি। চতুর্থ হল কাজের জন্য মস্তিষ্ক থেকে রক্ত প্রবাহের বিক্ষিপ্ত হওয়া। পঞ্চম হল বিপাক-ক্রিয়া (metabolism) -উৎপন্ন বর্জ্য রাসায়নিক পরিস্কৃত হয়ে যাওয়ার প্রয়োজন। (ঘুম-উদ্রেক-কারী রাসায়নিক সেরোটোনিন হয়ত এই কারণে উৎপাদিত হয়।) ষষ্ঠ হল এই অনুমান যে বিবর্তনের এক পর্যায়ে, ঘুম দরকার ছিল, শারীরিক শক্তি সংরক্ষণের জন্য (খাদ্য আহরণ কাজ ছাড়া অন্য সময় ঘুমিয়ে কাটিয়ে) এবং অন্য শিকারজীবী জন্তু থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য। এরই চিহ্ন হিসেবে ঘুম বর্তমান।

মস্তিষ্ক থেকে রক্ত-প্রবাহ কমার জন্যে ঘুম আসে একথা মস্তিষ্ক-টিউমার অধ্যয়ণ করলে ভুল প্রমাণিত হয়। কারণ টিউমার হলে ঘুম বাড়ে, যদিও রক্ত প্রবাহও বাড়ে।

বর্জ্য রাসায়নিক ক্রমে সঞ্চিত হওয়ার জন্য ঘুম আসে, তাও ভুল মনে হয়, কারণ নিদ্রা এবং জাগরণ কোনটাই ক্রমে আসে না, হঠাৎ আসে। তাছাড়া দেহের কোন অংশ জোড়া এরকম যমজদের বেলা দেখা গেছে যে একজন হয় ঘুমিয়ে, অন্যজন জেগে অথচ তাদের রক্ত প্রবাহ-প্রণালী একই, অর্থাৎ বর্জ্য রাসায়নিক বর্জিত করার উপায় একই।

অ্যা- রা - স (Ascending Reticular Activating System - ARAS) তত্ত্ব বলে যে বহিরাগত উত্তেজনা-বহনকারী স্নায়ুগুলি গুরু মস্তিষ্ককে সরাসরি জাগিয়ে তোলে না বরং এই অ্যারাস-তন্ত্র উত্তেজনা গুলিকে মস্তিষ্ক কান্ড থেকে গুরু মস্তিষ্কে ছড়ানো ভাবে চালনা করে।

এই সূত্রে প্রস্তাবিত হয়েছে যে আর-ই-এস ঘুম এবং এন-আর-ই-এস ঘুম সম্পূর্ণ পৃথক ব্যবস্থা। প্রস্তাবিত হয়েছে যে আর-ই-এস ঘুমে মস্তিষ্কেতে প্রোটিন সংশ্লেষ বৃদ্ধি পায় কিংবা মস্তিষ্কের কার্যক্রমের পূর্বব্যবস্থা হয় যাতে জাগ্রতাবস্থার অভিজ্ঞতা সকল দক্ষভাবে আত্তীকৃত হয়।

প্রস্তাবিত হয়েছে যে ঘুম আনয়নকারী অঙ্গ হল মস্তিষ্কের স্নায়ুজাল সংগঠন যা পৃথক স্নায়ু কোষের সমষ্টি নয় বরং স্নায়ুতন্তু গঠিত একটি জালি। স্নায়ুকোষগুলি কেবল দুই অবস্থাতে থাকতে পারে, হয় উত্তেজিত নয়ত নিস্তেজ। জালিকাটি কিন্তু উত্তজনার নানান স্তরে থাকতে পারে। এই জালিকাটি আবিষ্কৃত হওয়ার পর বৈজ্ঞানিকরা উর্ধ্বাধ (vertical) দিশাতেও বিন্যাসের চিন্তা করা আরম্ভ করেন, কারণ স্নায়ুতন্ত্রীয় জালিকাটি শুধু মস্তিষ্কে অবস্থিত নয়।

সাধারণভাবে বলা হয়, মস্তিষ্কের সম্মুখভাগ ঘুমের সঙ্গে পরিষ্কার ভাবে জড়িত। (এই ভাগটি বাক্ শক্তি, তাৎক্ষণিক স্মৃতি ও নমনীয় চিন্তাশক্তির আধার।)

স্নায়ুতন্ত্র বিদ্যার উত্তেজনা শক্তিতত্ত্ব অনুযায়ী সাধারণত শক্তিশালী উদ্দীপকের প্রভাব শক্তিশালী প্রতিক্রিয়া এবং দুর্বল উদ্দীপকের প্রভাব দুর্বল প্রতিক্রিয়া। ঘুমের সময় বা ঘুমের আগের অবস্থাতে এই নিয়ম ভেঙে পড়ে। যে অবস্থাতে শক্তিশালী এবং দুর্বল দুই ধরনের উদ্দীপকেই সমান শক্তির প্রতিক্রিয়া দেয় তাকে সমফল অবস্থা (equalising phase) বলা হয়। সম্ভাব্যতা-বিরোধী অবস্থাতে (inparadoxical phase) দুর্বল উদ্দীপক শক্তিশালী এবং শক্তিশালী উদ্দীপক দুর্বল প্রতিক্রিয়া দেয়। সীমাতিক্রান্ত অবস্থাতে (in ultra parodoxical phase) শক্তিশালী উদ্দীপকে কোন সাড়া পাওয়া যায় না তবে দুর্বল উদ্দীপকে পাওয়া যায়।

অচেতন নিদ্রা (Coma), হিমশয়ন (hibernation)—আদি অন্য অচেতন অবস্থা থেকে ঘুমের পার্থক্য হল ঘুমের বিপরীত-মুখিতা (পূর্বাবস্থায় ফিরে আসা), কাল শাব হওয়া, স্বতঃস্ফূর্তভাবে আসা ।

মস্তিষ্ক কোষগুলির কোন স্থানীয় খাদ্য ভাণ্ডার নেই। থাকলে তাদের দক্ষতা কমে যেত। খাদ্যের এবং অক্সিজেনের জন্য ওরা রক্ত-প্রবাহ মাত্রের উপর নির্ভর যা মস্তিষ্কের মধ্যে বেশী।

আর-ই-এস এবং এন-আর-ই-এস দু'ধরনের ঘুমই স্নায়ুসন্নিধিগুলোর নম্যতা (পরিবর্তন সাপেক্ষতা)র কাজে লাগে।

দুই ধরনের রাসায়নিক ঘুমের সঙ্গে জড়িত হরমোন (গ্রন্থিরস) এবং স্নায়ুসন্নিধিগুলোর প্রেরক পদার্থ (Neurotransmitters)—এর মধ্যে আছে যে হরমোন বৃদ্ধি (growth) উদ্দীপিত করে তা আলো অন্ধকারের পৌনঃপনিকতা মেলাটোনিনে নাম গ্রন্থিরস রক্ত প্রবাহে উন্মুক্ত করে - অন্ধকারে বেশী,আলোতে কম।

কোষ পুনরুজ্জীবনের জন্যে আর-ই-এস ঘুম কার্যকারী বলে মনে হয় না। যে সব কারণে এন-আর-ই-এস ঘুমকে, বিশেষ করে তার চতুর্থ সোপানকে পুনরুজ্জীবন ক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত দেখায় তা হল পরিশ্রমের পর এর আধিক্য এবং মানুষের বেলা অনেকক্ষণ জাগ্রতাবস্থার কাজ করার পর এ ধরনের ঘুমের আধিক্য এবং সর্বাগ্র প্রবণতা।

সুক্ষ্ম বিদ্যুৎ শলাকা দিয়ে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে ঘুমের সময় পেশী সঞ্চালক এবং দৃষ্টি-সম্পর্কিত অনেকগুলি জায়গায় স্নায়ুকোষগুলি থেকে বেশী রকম মোক্ষণ হচ্ছে। এ থেকে মনে হয় জাগ্রতাবস্থার তুলনায় ঘুম হযত মস্তিষ্ক-সক্রিয়তার এক আলাদা ধরণের সংগঠন।

ঘুম বিষয়ক অনেকগুলি তথ্য, প্রকল্প ও সম্ভাব্য তত্ত্ব দেওয়া হল। আশা করি এগুলো পাঠকের জ্ঞানকে কিছুটা বাড়াবে বা অন্তত এ বিষয় আরো বিশদভাবে জানার ইচ্ছে উদ্রেক করবে এবং সে দিকে এগনোর প্রেরণা যোগাবে।

বিমান চট্টোপাধ্যায়

পাপমন্ত্রে যুদ্ধ

ভয় লাঞ্ছনা জঙ্গলের কাছাকাছি পৌঁছতেই আচমকা হুশহাশ উড়তে সুরু করল। উড়ে গেল—স্কন্ধকাটা, হাড়গিলে, ব্রহ্মদত্যিদের এক ঝাঁক—হাওয়া হাওয়া।

যেন সারারাত ভূত-শকুনদের কাড়াকাড়ি চলছিল। যুবযোনি ঠোক্‌রানোর পর ভোররাতে মানুষের পায়ের শব্দে উড়ে পালাল ওরা। গাছপালা ঝোপঝাপ নড়েচড়ে কেঁপেঝুঁপে উঠলো। সাধুবাবা তালি মেরে 'হুশ-যা' কাক তাড়ালো ওদের।

রসিকতার এমন কনসেপ্টে আমার দাঁত ভেট্‌কে হাসি। আর তাতেই পৃথ্বীশ রেগে গেল। পৃথ্বীশ মানে ইস্পাতীর গল্পো লেখে, আবার চাকরিতে সরকারী কড়ারে কালোবাজারী রোখে। ফলে, রাগ ওর কড়ে আঙুলের আংটির মত।

বললো—আশ্চর্য। তুমি হাসছো! এই শীতে কোথাও হাওয়া নেই। অথচ ওই নিশি পাওয়া মন্দিরটাকে ঘিরে গাছগুলোর শুধু নড়াচড়া। বললাম—অতএব বলছো বেশ রহস্যজনক। নয় কি?

আমি ঠাট্টার পলতেটা আর একটু বাড়ালাম।— যাই বলো, মন্দিরটাকে লাস্ট এক সপ্তাহ ধরে ঘাঁটাঘাঁটিতে বেশ থ্রিল পাচ্ছি। পৃথ্বীশ ভ্রু কুঁচকে—তার মানে? —মানে মন্দিরটা কত বছর আগের। ইঁট পাথরের সাইজ। পোড়ো মন্দিরের চারপাশে, বিঘা দুয়েক জুড়ে সাপখোপের গভীর জঙ্গল। অন্ধকার। গুহাবৎ ঘরে তান্ত্রিক সাধু। তিন চার কিলোমিটারের মধ্যে জীবিত মানুষের চিহ্ন মাত্র নেই। আর আশ্চর্য—সাধুকে দিনের আলোয় কেউ কখনও স্পষ্ট দেখেনি। সাধু কি খায়? কেমন করে চলে ওর? এখানে কেউ কখনও পুজো দিতে আসে না? এইসব আর কি।

—আর সঙ্গের কিংবদন্তীগুলো?

হঠাৎ হাঁটা থামিয়ে, আমার কথা কেড়ে পৃথ্বীশ আরও জুড়লো—দুকিলোমিটার দূরে ভবানী পাঠকের টিলা। এককালে টিলা থেকে মন্দির পর্যন্ত সুড়ঙ্গ ছিল। ভবানী পাঠক ডাকাতি করতে যাওয়ার আগে গভীর জঙ্গলের এই মন্দিরে পুজো করে যেত। সাধুর বয়স একশর ওপর ইত্যাদি। বললাম—আমাদের মর্নিং ওয়াকের রুট পালটিয়ে হঠাৎ এদিকে আসাটা বেশ কার্যকরী হয়েছে বলো?

পৃথ্বীশ বিরক্তিতে—এটাকে মর্নিং বলে? বলো, 'ছায়া ছায়া রাত'। কুয়াশা, অন্ধকারে ঘড়ির কাঁটা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। চেষ্টা করেও দুদিন গর্ভগুহার ভেতরে সাধুর মুখ পর্যন্ত দেখতে পেলাম না। দূর থেকে অন্ধকারে শুধু সেল্যুলয়েডে সাধুর নেগেটিভ মুভি। জটাদাড়িওয়ালা কেমন রহস্যময়, সরে ফস্কে যাচ্ছে। আজ দেখতে না পেলে রণে ভঙ্গ দেব। বললাম — ধৈর্য ধরো। এখুনি আলো ফুটবে।

পৃথ্বীশ ব্যাপারটায় প্রথম দিন থেকেই বেশ সিরিয়াস। এবং আমিই ছিলাম খানিকটা

তান্ত্রিকল্যের মুডে। কিন্তু লোকমুখে শুনে গত এক সপ্তাহ হল, আমিও বেশ খানিকটা কৌতূহলে ভুগছি।

ঠিক বুড়ো মানুষের মত ভ্রমণ আমাদের নয়। শেষ রাতের ল্যাজ ধরে ভুটানী নেশায়—পৌষের এই বিকার গ্রস্ত শীতে, কেন যে তিনজনে হুড়মুড় বেড়িয়ে পড়ি—কি খুঁজি-কেন খুঁজি, সত্যিই কি কিছু খুঁজি, নাকি 'খোঁজা' কথাটা না জেনেই খুঁজি—নিজেরাই জানি না। অবশ্য শিবেন্দু ঘোষ ছাড়া।

ঘোষবাবু বলল—মশাই, আপনাদের মত এই পাগুলে লেখকদের পাল্লায় পড়ে বান ফান খেয়ে মরবো এবার।

পৃথ্বীশ বললো—মরবেন কেন? সাধু দেখলে স্ট্রোক-স্ত্রোক হয় নাকি? ঘোষবাবুর মাথা ঠান্ডা। কিন্তু এখন উত্তেজনা গিলে বলল—।

কঙ্করতন্ত্রী এই সাধুটার মারণ উচাটনে এ তাবৎ দু'জন মরেছে। আমরা একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলছি না কি? খালি জঙ্গলেই মর্নিং ওয়াক?

দুর্গাপুর শহরে প্রাতঃ ভ্রমণ করার জন্যে ভাল ভাল রাস্তা নিজেই পায়ের তলায় এগিয়ে আসে। কিন্তু সেটা ছেড়ে আমরা শাল-মহুয়ার জঙ্গলে ছমছমে মন্দিরের রহস্য তালাশে। এর কারণ আনেকগুলো। এবং কিছুদিন ধরেই কারণগুলো দুর্নিবার টানছিল।

সাধু সম্বন্ধে কিংবদন্তীর ফুলকিগুলো বেশী উড়তে থাকে চার কিলোমিটার দূরে। কলাবাগান গ্রামের চৌকাঠে। সাধু নাকি রাতভোর একা থাকে। তবে দূর থেকে মাঝে মাঝে আগুন দেখা যায় সেখানে। গাঁজা ও কারণবারিতে মত্ত সাধু তখন মড়া জাগায়। রাতের অন্ধকারে কারা যেন আসে সেখানে।

কেউ কেউ বলে, স্রেফ ধাপ্পা। ব্যাটা রঘু ডাকাতেরই বংশধর। ওই হচ্ছে গ্যাং লিডার। রাতে ডাকাতির ছক্ কষে। আবার কেউ বলে, ড্রাগের চোরাচালানদার। আবার কারুর শ্রদ্ধা অনেক বেশী—উনি নাকি শিক্ষিত পন্ডিত লোক। ইংরেজ আমলের গোপন কোনো নামকরা স্বদেশী। দেশের বর্তমান রাজনীতিতে বমি পায়। তাই সাধু হয়েই আড়ালে থেকে যেতে চান জীবনভর।

পৃথ্বীশের খুব ইচ্ছে, সাধুর কাপালিক রূপটাই সত্যি হোক। কারণ তক্ষকডাকা মন্দিরের একশ গজের মধ্যে এলেই ওর হ্যালুসিনেশান সুরু হয়ে যায়। কাপালিকের খাঁড়ার ভয়ংকর রক্তপিপাসা, তার কুমারীপূজা ও কুম্ভক সঙ্গম পৃথ্বীশের লেখক সত্তাকে দখল করে জোর। শিবানুচরের ভূত প্রেত-পিশাচরা অ্যান্টাসিড ছাড়াই বলির সব রক্ত চেটেপুটে হজম করে। যা পৃথ্বীশ চোখ বুঁজলে দেখতে পায়।

ঘোষবাবুর ইচ্ছেটা অন্য। বলে, বন্ধ করুন এসব সব্বনেশে ভূতবন্দীর তালাশ। মর্নিং ওয়াক করার আরও জঙ্গল আছে। গড় জঙ্গল থেকে কাঁকসা ফরেস্ট। আর গল্প খোঁজার জন্য মানুষের অভাব নেই। কারণ তন্ত্রক্রিয়া আছে যে, আপনার হেঁটে যাওয়া পায়ের তলার মাটি একটু পেলেই হবে।

—কি হবে?

—ওই মাটিকেই বশীকরণ করলে আপনার আসল শরীরও বশে। কিংবা ওই মাটিকেই খতম করলেই আপনার আসল শরীরও শেষ।

আমি হাসিটা স্বাভাবিকই হাসলাম। কিন্তু ঘোষবাবু বেশ রেগেই—হাসছেন? কি আছে আমাদের যে, এসবের বিরুদ্ধে ওভার স্মার্ট হবো?

পৃথ্বীশ বললো—ওরা অবধূত কিংবা অঘোরপন্থী স্তরে উঠলেই থট-রিডিং করতে পারে। এখন দেখতে হবে, এই সাধু কোন্ স্টেজে আছে।

দূরে, জঙ্গলের ডান কাঁধ ছুঁয়ে, খোলা তলোয়ারের মত ছুটে যাওয়া পিচরাস্তা। তারও ওপারে, ছিনতাইবাজদের ইয়ার দোস্ত হয়ে শাল বহেড়ার আরও গলাগলি মত্ততা। জঙ্গলের চুল টপকে এবার সূর্যের দাঁত বের করা ন্যাকা হাসি। আমরা পায়ে পায়ে অদ্ভুতস্যুর ভূতুড়ে বেড়ার পাশে। বেড়া মানে, পাঁচমিশালী নানা গাছপালার ছয় থেকে বাট ফিট উঁচু আবুঝুটি জটই ঘুরে গেছে চারপাশে। মাঝখানে টালির চালের দুখানা ঘর। ইটের দেওয়াল, পলেস্তারা খসা। একটি ঘরে অন্ধকারে এক কালীমূর্তি। অন্যটার গুহায় সাধু নিজে।

গাছের ওই আবুঝুটি ঘের ছুঁয়ে একটা অর্দ্ধসমাপ্ত পাকা রাস্তা। বোল্ডার ফেলা পর্যন্ত এগিয়েছে। কিন্তু তারপর আর কাজ এগোচ্ছে না একদম। কারণ সামনে রাস্তা আটকে দাঁড়িয়েছে সাধুর ডাকাত কালীর মন্দির। মন্দির ভাঙার আইন নেই। কাজ বন্ধ আছে। কুলি মজুররা নাকি পালিয়ে গেছে।

ঘোষবাবু শুনেছে, সেবায়িত এই সাধুকে সরকার নোটিশ ধরিয়েছিল হাত গোটাতে। মন্দিরের ওপর দিয়ে রাস্তা যাবার প্ল্যান আছে।

সাধু নাকি ত্রিকালদর্শী। একবারই চোখ মেলে তাকিয়েছিল। সরাসরি। সরকারী অফিসারের দিকে। বেশীক্ষণ তাকানো যায় না ওই চোখের দিকে। কি ছিল চাউনিতে? বশীকরণের অব্যর্থ আঁচ? না, মারণ উচাটনের আগের সম্মোহন? ধীর গম্ভীর উচ্চারণে সাধুর উত্তর—মায়ের মন্দির 'মহাকাল আলয়'। ইয়াকে ধ্বংস করা যায় না। যে, তা করইরবেক্, তার পতন অনিবার্য! যাঃ—! চইল যা সব পাপী খ্যাকশেয়াল। এর বেশী একটিও কথা বলেনি সাধু।

তারপর কুলিমজুরদের কাজ বন্ধ চারদিন। তারা রাজী নয় মন্দির চত্বর ছুঁতে। আবার এল সরকারী অফিসার, আমলা, ঠিকাদার। মিটিং জল্পনা—। রাস্তা ঘোরাতে গেলে পুকুর ভরাট, ড্রোজারের খরচ, এক্সট্রা অংশ, সময় ইত্যাদি নিয়ে আরও তিন লাখ টাকা খরচ বাড়বে। অথচ পরিত্যক্ত পোড়ো এই মন্দিরের পাবলিক ইউটিলিটি কিছু নেই।

আমরা তিনজন কুঁজো হয়ে, গাছের ডালের খোঁচা খেয়ে, মন্দিরের নিকানো উঠোনে পা রাখতে না রাখতেই অদৃশ্য কণ্ঠে—ব্যস, আর নয়! জুতো খুলে ওখানকেই থাক।

ফাঁকা গম্বুজে প্রতিধ্বনির মত গম্ভীর আদেশ ভেসে এল। কিন্তু মানুষ কই! কার এই অলৌকিক জলদ গম্ভীর স্বর! সম্ভবত গর্ভগৃহের এই আধো অন্ধকার থেকেই—।

আমি বললাম—পৃথ্বীশ, চলো। সাহস করে ঢুকি ওই পাপহর নিষিদ্ধ মন্ত্ররাজ্যে। তুমি তো তারাপীঠের গুরুর মন্ত্রপূত শিষ্য, বামাচারী স্থিরাচারীদের সব তাপে স্নান করে অনেকটাই প্রত্যয় গুছিয়েছ। তাহলে চলো না?

ঘোষবাবু বললো — সাবধান! না ডাকলে যাবেন না কিন্তু! কারণ কিভাবে ওই মজুরটা মরল, জানেন না?

ঠিকই বলেছে। মজুররা যখন জঙ্গল কাটতে ভয় পাচ্ছে, তখন আবার সরকারী মিটিং।

বামপন্থী প্রশাসনের ধর্মীয় ভূত মানামানি নেই। কাজ না করলে মজুরী পাবে না। ঠিকাদারের ঠিকা যাবে। ভয় দেখানো, ধমক-ধামক কিছুতেই—কাজ হল না। শেষে অনুরোধ, আবেদন। তবুও মজুরদের একটাই কথা—মন্দির ছেড়ে রাস্তা ঘুরিয়ে নিলে, তবে কাজ করবো। সাধুর তন্ত্রবান খেয়ে মরতে রাজী নয় একজনও।

অতঃপর লোভের ফাঁদ পাতল প্রশাসন। প্রথম যে মজুর মন্দির জঙ্গলের পাঁচ ছটাক কেটে আগে সাফ করবে, সে দশগুণ মজুরী পাবে। ফলে, কাজ হল।

রাজী হলো স্বর্ণতৃষায় তৃষ্ণার্ত এক পালোয়ান মুনিশ। কোদালের প্রথম কোপ মেরে, সে যেন প্রবাদের নখ খসালো। ঘন্টাখানেক কাজ করে আকন্দ আর গন্দভেরার আড়ালে হারিয়ে গেল লোকটা। বাইরে বাকি মজুররা বিড়ি টানছে। ঠিক-মালিক, অফিসার খানিকটা স্বস্তির নিশ্বাস ভাসিয়ে পরের কাজের কথায় গেল।

লোকটার সত্যিই সাহস আছে। সাধুর মন্ত্রসিদ্ধ গাছেরা মূক দেখেছে, লোকটার কোদালের কোপে তান্ত্রিকের শক্তি লুঠের ঘোর। কিন্তু ঘন্টা তিনেক হয়ে গেল—কোদালের শব্দ নেই। বাইরের জটলায় ভ্রূকুটি! কোন সাড়াশব্দই পাওয়া যাচ্ছে না আর। আশ্চর্য! ভেতরে ঘুমিয়ে পড়ল নাকি। না অন্য অশুভ কিছু?

আরও আধঘন্টা বাদে লোকজন মন্ত্রে গরাদ ভেঙে ঝোপের ভেতর ঢুকল। উদ্বেগ ও উত্তেজনা। সন্তর গজ এগোতেই—অনুমান সত্যি। পেশল শরীর নিয়ে সটান শুয়ে আছে লোকটা। মুখে তখনও গ্যাজলা ভাঙছে। অভিজ্ঞ সাঁওতাল মজুরের কেউ এক, বুঝে গেল নিশ্চিত—একবারে কাল কেউটের বিষ ওর শরীরের প্রতিটি রক্তকোষে। যার ছোবলে মহাবটও শুকিয়ে যায়। লোকটা অনেক আগেই শেষ।

সাধু বলেছিল—মন্দিরের প্রতিটি গাছই মন্ত্রপূত। অতএব, সাপের গতি তো, মন্ত্রেই নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। মানুষের পায়ের ব্যস্ততায় সাপটা পালোলো এবার। সেই যে কাজ বন্ধ হল, আজ বছর ঘুরতে চললো। রাস্তা এখনও আটকে আছে।

কর্পোরেশানের মিটিঙে বাজেট পাস হচ্ছে নতুন করে। মেয়র বললেন — ব্যইশ বছর সরকার চালালাম। এত প্রবলেম সলভ্ করলাম। আর একটা সাধুকে বাগে আনতে পারছে না? সব হোপ্‌লেস। এবার আমাকেই যা হোক কিছু করতে হবে দেখছি।

কাউনসিলর দত্তবাবু মুচকি হেসে বললেন—কি করবেন? ফোর্স অ্যাপ্লাই? মানে, অপারেশান টেম্পল বার্ড? মেয়র এ কথার কোন উত্তর দিলেন না।

আমরা কিন্তু আজ প্রথম সাধুর দেখা পেলাম। জটা আর দাড়িতে মুখ ঢাকা। শরীর ঢেকে ময়লা রক্তবস্ত্র। গর্ভগৃহ থেকে বেরিয়ে ফুল তুলতে এল। রক্তজবা। শোনা যায়, সাধু পূজোয় বসে মায়ের গায়ে এই রক্তজবা ছুঁড়ে দিলে, তা রক্ত হয়ে ঝরে পড়ে বিগ্রহের শরীর বেয়ে। একটি আঁটোসাঁটো গড়নের শ্যামলা যুবতী, বছর বত্রিশ, উঠোন ঝাড়ু দিচ্ছে। টলটলে মুখ, টানা চোখ। পরণে লাল ছাপা শাড়ী কিন্তু পাতলা গেরুয়া ব্লাউজের নীচে ব্রেসিয়ার দৃশ্যমান।

সাধু বললো—শ্যামা, আজ বিছানার চাদরটা, উড়নি, কৌপিন সব কেঁচো দিইন যাবি।

আগে শুনেছি, এই শ্যামাই তাহলে সাধুর ঘর গেরস্থালির কাজ করে দিয়ে যায় রোজ? এই কদিনের অনেকটা কৌতূহলই মিটলো। হাত তুলে প্রণাম করে বেরিয়ে এলাম। পরে

দিন মর্নিং ওয়াকের রুট বদলে গেল আবার। মন্দিরের কৌতূহল শেষ।

পৃথ্বীশ বললো—এর থেকে তোমার গল্প দাঁড়াবে? বললাম — না। অনিয়ম চাই। অনিয়মের খোঁজ নেই এতে। তবে তোমারটা হয়ত দাঁড়াবে।

মাসতিনেক বাদে, জমির দলিল আনতে রেজিস্ট্রি অফিসে—।

দেখলাম, কয়েকজন ভূমিহীন মুনিশ জমির পাট্টার দলিল হাতে পেয়েছে সেদিন। মিষ্টি বিলিয়েছে কেউ। খাচ্ছে সবাই। আমার এক ঘনিষ্ঠ রিপোর্টার, অঞ্জন ও এক কালো কোট উকিলবাবু ওদের একজনের সঙ্গে নিভৃতে কথা বলছে। বুঝলাম, অঞ্জন রিপোর্ট নিচ্ছে কিছু। ডাকলো। মজা পাওয়া হাসি হেসে বললো—একে চেনেন?

বললাম—না।

পাট্টার দলিল হাতে লোকটার বেশ তৃপ্তি মাখা ভঙ্গী। বক্স বেয়াল্লিশের পুরোনো মেঠো গেরস্থের একটা প্রোফাইল। পাটভাঙ্গা টেরিকটের ফুলপ্যান্ট। হাসি ঝুলছে মুখে।

অঞ্জন বললো—এর নাম গণপতি বায়েন। গণপতির আন্দোলনে গভর্মেন্ট কাৎ হলো আজ। 'কাৎ হলো' কথাটা শুনে, এবার পুরো খালি করে অমায়িক হাসলো লোকটা। হাত তুলে নমস্কার—। পাল্টা আমিও।

কৌতূহল চেপে বললাম—কি আন্দোলন?

অঞ্জন হেসে বললো—রোটি কাপড়া আউর মকান—এর অভিনব আন্দোলন। বোকার দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম আমি। বুঝতে পারছি না। অঞ্জন আবার—চিনতে পরছেন না? বলে, পোয়াটাক হাসি মজায়।

—না-তো।

—সেই 'আঘোর পন্থী' সাধু? ও নিজেই এখন বশীকরণে বশীভূত।

চমকে উঠলাম। কথা হারিয়ে গেল! বিশ্বাস হচ্ছিল না। মসৃণ কামানো গালে লাজুক সরল হাসছে। —সত্যি নাকি। অসম্ভব—।

ঘোর কাটিয়ে বললাম—তাহলে জটা।

বলল—নকল ছিল।

—ক্যাটে ফেলিইন্‌চি।

—আর মারণ উচাটন?

—উসব বিদ্যা আমার কুছুই নাই।

—তবে মজুরটার মৃত্যু?

লোকটার মুখে অপরাধের ঘোরলাগা ছায়া। সঙ্গে বিষণ্ণতার মৃদু ধোঁয়া।

—উয়াকে জঙ্গলেরই সাপে কাটলেক্। আমি তখন ঘুমাই ছিলম। উঠে শুইন্‌লম কি, ওই কান্ড। বিশ্বাস করুন আজ্ঞা, মন-টো কাঁদ্যেছে খুব-ই। লোকেই ভেবে লিলেক্ কি, আমার মন্ত্রে তেজ।

—আর রাতের আগুন?

—উটো? শ্যামা কাঠ চুলায় ফি-রবিবার বেশী রেতে মাংস বানাতো। উয়ার দুই ভাই আগুনটো-কে প্রচার কইরতো।

অঞ্জনই দেখালো—ওই যে শ্যামা। এখন ওর বৈধ বউ। কর্পোরেশান থেকে পাঁচ কাঠা জমি আর ব্যবসা করার দশ হাজার টাকা পেয়েছে পুর্নবাসন খাতে। আসলে মন্দির ভাঙার কাজটা খুব গোপনে হয়েছে।

শ্যামার পরণে নতুন তাঁতের শাড়ী। চেহারায় লাবণ্য এসেছে। যৌবনেও বেশ অহংকারের ছোঁয়া লেগেছে। সিঁথিতে জ্বলজ্বলে দৃপ্ত সূর্যোদয়ের রঙ।

শুধালাম—তাহলে, ওই মন্দিরে তুমি কিভাবে গিয়েছিলে?

মুক্তি পাওয়া অদ্ভুদ সবল হাসি লোকটার। —আমি ইশান্‌কে দলিল-লেখকদের ফরমাস খাটতাম। ইশান্‌কে-ই জানতে পারি দু'বছর আগে কি, মন্দির ভেঙে রাস্তা হবেক্। শুনেই চুপচাপ সেঁধাই পড়ি উখান্-কে। পরথম পরথম ভূত প্রেতীর ডর লাইগতো খুবই। পরে তান্ত্রিকের প্রচার প্যাঁয়ে ডর কেটে গেল।

শুনতে শুনতে আমার বিস্ময় তখন তুঙ্গে। স্থায়ী সিকিউরিটি আর সেক্স পেয়ে লোকটা কি পরিচ্ছন্ন অনাবিল হাসছে। অঞ্জন আমাকে উপভোগ করতে করতে রসিকতা ছুঁড়ল—কি? গপ্পো হবে এতে?

সেদিন রাতেই ছুটলাম পৃথ্বীশের কাছে। পৃথ্বীশ বেদ-উপনিষদ পড়েছে। তন্ত্রমত জানে। অনেক জ্ঞান। কিন্তু সাধু ওরফে গণপতি ও শ্যামার অখ্যান বলার পর ওকে শুধালাম—

বলো এবার, তোমার কলমের হ্যালুসিনেশান্ কোন্ দিকে বাঁক নেবে?

পরিচয়ে প্রকাশিত রচনার নির্বাচিত বিষয় সুচী

সরোজ হাজরা

(ষষ্ঠ কিস্তির অবশিষ্ঠাংশ)

।। জানুয়ারী ১৯৮১ — ডিসেম্বর ১৯৯০ ।।

।।বিদেশী চিত্রকলা ও চিত্রশিল্পী ।।

।পিকাশো, পাবলো ।

অমিতাভদাশগুপ্ত	বিষ্ণু দেকে।	জানুয়ারী-ফেব্রু, ১৯৮২
অরুণ সেন	বাঙালী আবেগে-মননে পিকাশো।	ঐ
আবার্গ, লুই	সেকস্‌পিয়ার, হ্যামলেট ও আমরা।	ঐ
আলবের্তি, রাফায়েল	নীলাভা, অনুঃ সিদ্ধেশ্বর সেন	ঐ
এরেনবুর্গ, ইলিয়া	পিকাসোর স্মৃতি, অনুঃ সিদ্ধার্থ রায়।	ঐ

। পিকাসো, পাবলো ।

এলুয়ার, পল	এলুয়ার থেকে : অনুঃ অরুণ মিত্র	ঐ
ঐ	গের্নিকা : চিত্রনাট্য, অনু : সিদ্ধেশ্বর সেন।	ঐ
এলুয়ার, পল	সুবাতাস	জানুয়ারী-ফেব্রুঃ, ১৯৮২
ককতো জাঁ	কস্তুর ট্রাজেডী	ঐ
কে. জি সুব্রাহ্মণ্যম	পাবলো, পিকাসো ও আধুনিক চিত্রকলা	ঐ
গারদি, রজার	গের্নিকা, স্পেন ও রাজনীতি	ঐ
চিন্তামনি কর	পারি, ১৯৩৮	ঐ
জ্যাঁ, রেমন্ড	এলুয়ার ও পিকাসো, অনু : অমিতাভ দাশগুপ্ত।	ঐ
দিলীপ বসু	লন্ডন, ১৯৫০।	ঐ
দেবেশ রায়	পিকাসো ও কমিউনিস্ট পার্টি।	ঐ
পিকাসো, পাবালো	একদল তরুণ স্পেনীয় শিল্পীকে চিঠি, মে, ১৯৫২	ঐ
ঐ	ছোট চারটি মেয়ে, অনু : শঙ্খ ঘোষ	ঐ
ঐ	জুলাই, ১৯৩৭ এর বিবৃতি।	ঐ
ঐ	নিজের বিষয়।	ঐ
ঐ	লা, দেসির, আত্রানে পাকলা কিউ (নাটক : লেজে পাকড়ানো কামনা) অনু : বিষ্ণু বসু।	ঐ
পূর্ণেন্দু পত্রী	পিকাসোর কবিতা।	ঐ

। পিকাসো, পাবলো।

প্রমীলা মেহেতা	কবিতা, কবি ও পিকাসো।	ঐ
বিদ্যা মুন্সী	লন্ডন, ১৯৪৫।	ঐ

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	আধা কিশমিশ আধা ডুমুর।	ঐ
মীরা মুখোপাধ্যায়	দেখা ও চেনা।	ঐ
যুধাজিৎ সেনগুপ্ত	পিকাসো-শিল্পে বাস্তবতা।	ঐ
রাফায়েল, ম্যাক্স	পিকাসো, অনু: আশীষ মজুমদার।	ঐ
রিচার্ডসন, জন	আর এক ফাউস্ট, অনু: শিবশম্ভু পাল।	ঐ
সিদ্ধার্থ রায়	দুই উপমার দেখা।	ঐ

।রঁদা।

সিদ্ধার্থ রায়	রঁদা, তাঁর সমকাল থেকে আমাদের সমকালে।	এপ্রিল, ১৯৮৩

। ল্যুভর।

দীপ্ত দাশগুপ্ত	ল্যুভর—আমাদের দরজায়।	মার্চ, ১৯৮৯

। সেকোরাস ।

তপন কুমার ঘোষ	কমিউনিষ্ট শিল্পী বাস্তবতার সন্ধানে : সেকোরাস।	ফেব্রুয়ারী- এপ্রিল ১৯৮৪

। চিত্রকলা - ইতিহাস ।

মৃণাল ঘোষ	এই সময়ের ছবি : ছবি ও এই সময়।	মার্চ, ১৯৮৮
ঐ	এই সময়ের ছবি : সংকট ও সফলতা।	এপ্রিল, ১৯৮৩
ঐ	'ক্যালকাটা গ্রুপ' ও 'চল্লিশের শিল্পকলা' পরিপ্রেক্ষিত।	আগষ্ট অক্টোবর, ১৯৮৬
ঐ	প্রতিবাদের প্রতিমা : এই সময়ের ছবি।	ডিসেম্বর, ১৯৮৩
ঐ	বিমূর্ত্ততা ও এই সময়ের ছবি।	সেপ্টেম্বর-নভেঃ, ১৯৮৫
ঐ	লোকায়ত প্রতিমা : এই সময়ের ছবি।	মে, ১৯৮৪
ঐ	শিল্পকলার আশির দশক।	এপ্রিল-জুন, ১৯৯০
ঐ	শিল্পীর স্মৃতিকথায় চল্লিশের শিল্পকলা পু: প: : প্রদোশ দাসগুপ্তের 'স্মৃতিকথা শিল্পকথা'	এপ্রিল- মে, ১৯৮৭
ঐ	সমন্বিত রূপকল্প : এই সময়ের ছবি।	ডিসেম্বর, ১৯৮৭
	প্রতিফলনে ঐক্যবদ্ধ ক্যালকাটা পেইন্টার্স।	ডিসেম্বর, ১৯৮৫
ঐ	সোসাইটি অব্ কন্টেম্পোরারী আর্টিষ্ট।	জানুয়ারী, ১৯৮৬

।। সংগীত ।।

। শাস্ত্রীয় সংগীত ।

অমিয়নাথ স্যানাল	তানসেন - ইতিবৃত্তে ও গল্পে।	আগষ্ট-অক্টোবর, ১৯৮৭
অমিয়নাথ স্যানাল	তানসেন-সম্প্রদায় প্রবর্ত্তক।	জানুয়ারী, ১৯৮৭
সৌমেন গুহ	ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত ও অ-শাস্ত্রীয় আধুনিকস্বরমণ্ডল।	ডিসেম্বর, ১৯৮৯

। লোকসঙ্গীত।

মানিকসরকার	সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশ ও লোকশিল্পী সমাজ।	মার্চ, ১৯৮৬
ঐ	লোক সংস্কৃতির মার্কসীয় চর্চা এবং পি. সি. যোশী।	ডিসেম্বর, ১৯৮৯
রাজ্যেশ্বর মিত্র	পল্লীগীতির স্মৃতি।	আগষ্ট-অক্টোবর, ১৯৮১
শিবরাম পণ্ডা	শ্রমজীবনে সাঁওতালী গান।	ফেব্রুয়ারী, ১৯৯০

।। গণসঙ্গীত আন্দোলন ও গণসঙ্গীত শিল্পী ।।

অনুরাধা রায়	চল্লিশের দশকের গণ সঙ্গীত আন্দোলন ও বাংলার শ্রমিক কৃষক।	সেপ্টেম্বর-নভেঃ, ১৯৮৫

। নিবারণ পণ্ডিত ।

অপূর্ব কর	দুর্মর গানের উজ্জ্বল নিশানঃ পুঃ পঃ আঃপুঃ পঃবঃ রাজ্য সঙ্গীত একাডেমির নিবারণ পণ্ডিতের গান।	এপ্রিল-মে, ১৯৮৭
সাধন দাশগুপ্ত	লোককবি নিবারণ পণ্ডিত ও জনযুদ্ধের গান। পুঃ পঃ	ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৮

। বিনয় রায়।

অভিতাভ দাশগুপ্ত	বিনয় রায়। পুঃ পঃ। আঃ পুঃ পিপলস পাঃ হাউস "বিনয় রায় -এ ট্রিবিউট"	জুন-জুলাই, ১৯৮৪

। হেমাঙ্গ বিশ্বাস ।

জ্যোতি প্রকাশ চট্টোপাধ্যায়	প্রসঙ্গ ঃ হেমাঙ্গ বিশ্বাস।	ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৮
জ্যোতির্ময় নন্দী	হেমাঙ্গ বিশ্বাস ঃ কিছু স্মৃতিকথা।	মার্চ, ১৯৮৮
বীনা মজুমদার	গণশিল্পী হেমাঙ্গ বিশ্বাস।	জানুয়ারী, ১৯৮৮

। গণসংস্কৃতি আন্দোলন ।

চিত্তরঞ্জন ঘোষ	সংস্কৃতি ঃ ইতিহাস ও প্রশ্ন ঃ পুঃ পঃ আঃ পুঃ চিন্মোহন সেহানবীশের ৪৬ নম্বর একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন প্রসঙ্গে।	এপ্রিল-মে, ১৯৮৭
হেমাঙ্গ বিশ্বাস	গণসংস্কৃতি আন্দোলন ঃ অতীত ও বর্তমান।	জানুয়ারী, ১৯৮৮

। প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ।

অরুণ সেন	প্রগতি লেখক সম্মেলন, লক্ষ্ণৌ, ১৯৩৬ স্মৃতিকথা থেকে কিছু নির্বাচিত সংকলন ও অনুবাদ।	মার্চ, ১৯৮৬

চিন্মোহন সেহানবিশ	সাক্ষাৎকার : গ্রাহিকা। সন্ধ্যা দে।	আগষ্ট-অক্টোবর, ১৯৮৭
দেবেশ রায়	প্রগতি লেখক আন্দোলন : সাফল্য ব্যর্থতার কিছু হিসেব।	ঐ
সৌরী ঘটক	প্রগতি লেখক সংঘের সুবর্ণ জয়ন্তী।	এপ্রিল, ১৯৮৬
হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	প্রগতি লেখক সংঘ। স্মৃতি, সত্তা ভবিষ্যত।	আগষ্ট-অক্টোবর, ১৯৮৬
ঐ	প্রগতি লেখক আন্দোলনের প্রারম্ভ : পুঃ মুঃ।	মে-জুলাই, ১৯৮১

।। বিনোদন ।।

অজেয়া সরকার	পাঠক গোষ্ঠী : রাজ্যেশ্বর মিত্রের "বৃহত্তর আর্টের পরিপ্রেক্ষিতে থিয়েটার এবং সিনেমা" প্রবন্ধের সমালোচনা।	নভেম্বর, ১৯৮২
রাজ্যেশ্বর মিত্র	বৃহত্তর আর্টের পরিপ্রেক্ষিতে থিয়েটার ও সিনেমা।	জুলাই-অক্টোবর, ১৯৮২

। চলচ্চিত্র আলোচনা।

অভ্র ঘোষ	'ঘরে বাইরে'র সন্দীপ-রবীন্দ্রনাথ ও সত্যজিৎ।	মার্চ, ১৯৮৫
অমলেন্দু চক্রবর্তী	"আকাশের সন্ধানের" সন্ধান।	মার্চ, ১৯৮১
অরুণ গঙ্গোপাধ্যায়	আধুনিক চলচ্চিত্রে লাতিন আমেরিকা।	ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৫
ঐ	চলচ্চিত্রের সমালোচনা ও সমসাময়িক বাংলা ছবি।	এপ্রিল-জুন, ১৯৯০
ঋত্বিক ঘটক	যাদের কেউ মনে রাখে না (চিত্রনাট্য)।	শারদীয়, ১৯৮৭
কুরোশোয়া, আকিরা	কুরো-শোয়ার সাহিত্য।	মে- ১৯৮৪
জ্যোতি প্রকাশ চট্টোপাধ্যায়	কলকাতা ফিল্ম উৎসবের আলোচনা।	ডিসেম্বর, ১৯৮৯
তপন কুমার ঘোষ	পঞ্চাশ বছরের চলচ্চিত্র চিন্তা : পুঃ পঃ আঃপুঃ ডেভিড উইলসন্ (স): লাইট অ্যান্ড সাউন্ড - এ ফিফটিনথ অ্যানিভারসারি সিলেকসন।	জুন-জুলাই, ১৯৮৪
তপন কুমার ঘোষ	সময়ের কেন্দ্রে শিল্পের অন্বেষণ।	সেপ্টেম্বর-নভেঃ, ১৯৮৫
তপন কুমার ঘোষ	সাহিত্য ও চলচ্চিত্র : শিল্পের অসম উত্তরণ।	
পুণ্যব্রত পত্রী	এখনকার ছবি, আক্রোশ, এ্যালবার্ট পিন্টোগো গুসসা কিউ আতা হ্যায় ও শোধ ছবির আলোচনা।	মার্চ, ১৯৮১

পূর্ণেন্দু পত্রী	'ছোট বকুলপুরের যাত্রী, চিত্রনাট্য প্রসঙ্গে।	ডিসেম্বর, ১৯৮১
প্রবীর বসু	ঘরে বাইরে।	ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৫
মলয় দাশগুপ্ত	খণ্ডহড় : মৃণাল সেন পরিচালিত চলচ্চিত্রের আলোচনা।	ডিসেম্বর, ১৯৮৩
মৃণাল সেন	বাংলা সিনেমার দর্শকও ছিন্নমূল : পুঃ মঃ।	মে-জুলাই, ১৯৮১
রামকুমার মুখোপাধ্যায়	তামস, যে ইতিহাস এখনও ক্রীয়াশীল।	মার্চ, ১৯৮৮
রূপশ্রী সেন	তিন পোষ্য।	এপ্রিল, ১৯৮১
সরিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়	দুই শিশু, দুই ছবি।	মে ১৯৮৩
সিদ্ধার্থ রায়	ব্যাটল অব চিলি।	ডিসেম্বর, ১৯৮১
সোমেশ্বর ভৌমিক	উৎসব বনাম উৎসব।	জুলাই-সেপ্টেম্বর, ১৯৮২
সোমেশ্বর ভৌমিক	দুটি আধুনিক ছবি, ছবির ভাষ্য।	এপ্রিল, ১৯৮২
হিমাচল চক্রবর্তী	মার্কসবাদ ও চলচ্চিত্র	ফেব্রুয়ারী-এপ্রিল, ১৯৮৪

। টেলিভিশন ।

মোহিদুল হক	পড়েছে ধরা টেলিবন্ধনে।	ডিসেম্বর, ১৯৮৫

। থিয়েটার ।

বিদ্যা মুন্সী	যুদ্ধে দেখা থিয়েটার— ইংল্যাণ্ডে।	আগষ্ট-অক্টোবর, ১৯৮১
শম্ভু মিত্র	বাংলার থিয়েটারঃ পুঃমুঃ।	মে-জুলাই, ১৯৮১

। নাটক ও নাট্যাভিনয়।

অমর গঙ্গোপাধ্যায়	পিটার ব্রুকের মহাভারত।	ডিসেম্বর, ১৯৮৯
শুভ বসু	ঐতিহ্যের দিকে — নতুন পথে : কর্ণাম বন : কি ভি করন্থ পরিচালিত।	মার্চ, ১৯৮১
ঐ	নানা মুখোশের ভারতবর্ষ।	জানুয়ারী, ১৯৮৮

। বাংলা নাটক ও নাট্যাভিনয় ।

অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়	সবিনয় নিবেদন।	আগষ্ট-অক্টোবর, ১৯৮৭
প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায়	বামপন্থী আন্দোলনের ইতিহাস, অভিজ্ঞতায় ও স্বপ্নে : অশোক মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশিত "বেলা অবেলার গল্প" — নাট্যাভিনয়।	নভেম্বর, ১৯৮৬
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	প্রাগৈতিহাসিক। নাট্যরূপ দেবকুমার সেনগুপ্ত।	এপ্রিল-জুন, ১৯৮৯
শিবনাথ চট্টোপাধ্যায়	নাথবতী অনাথবৎ : শম্ভু মিত্রের পরিচালিত নাটক।	নভেম্বর, ১৯৮৩
শুভ বসু	জরুরী বিষয়, নতুন প্রযোজনা	জুলাই, ১৯৮৬

	'বহুরূপীর' প্রযোজনায় 'মালিনী'।	
ঐ	দীর্ঘ বিরামের পর : মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'সক্রেটিস' নাটক অভিনয়।	ডিসেম্বর, ১৯৯০
শুভ বসু	রূপকথার পুনর্জন্ম।	জুলাই, ১৯৮৮
	। বাংলা নাটক ও নাট্যকার ।	
	। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ।	
আশোক কুমার বন্দ্যোপাধ্যায	রূপান্তরে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় পুস্তক পরিচয় । আঃ পুঃ সুধীর দত্ত (স) 'অজিতেশ নাট্যসংগ্রহ'।	এপ্রিল-মে, ১৯৮৭
	। গিরিশ ঘোষ ।	
প্রবীর বসু	একদেশদর্শী : পুঃ পঃ আঃ পুঃ উৎপল দত্ত : 'গিরিশ মানস'।	মে, ১৯৮৩
	। দিগিন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ।	
তড়িৎ চৌধুরী	দিগিন্দ্র নাট্যকৃতি।	ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৯
ধনঞ্জয় দাস	দীনবন্ধু পুরস্কারে সম্মানিত দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।	মার্চ, ১৯৮৬
	।। বাংলা নাটক ও নাট্য অভিনেতা ।।	
	। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য ।	
দিগিন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	আমার চোখে মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য : অনু : সুধীর বন্দ্যোপাধ্যায়	আগষ্ট - অক্টোবর, ১৯৮৯
	। শিশির কুমার ভাদুড়ী ।	
চিত্তরঞ্জন ঘোষ	শিশির কুমারের 'সীতা'	জুলাই, ১৯৮৯
জগন্নাথ ঘোষ	নাট্যাচার্য্য শিশির কুমার : পুঃ পঃ আঃ পুঃ দেবকুমার বসু (স) : নাট্যাচার্য শিশির কুমার রচনা সংগ্রহ।	ডিসেম্বর, ১৯৮৯
	। বাংলা নাটক ও নাট্য আন্দোলন ।	
তৃপ্তি মিত্র	তৃপ্তি মিত্রের শেষ সাক্ষাৎকার গ্রহিকা সন্ধ্যা দে	জুলাই, ১৯৮৯
বিষ্ণু বসু	বিপ্লবীর মঞ্চ : পুঃ পঃ আঃ পুঃ রুস্তমভারুচা "রিহার্শলস ইন রেভোলিউশনঃ দ্য পলিটিক্যাল থিয়েটার অফ্ বেঙ্গল"।	জুন-জুলাই, ১৯৮৪
শুভ বসু	এরিনার এপার ওপার।	মার্চ, ১৯৮৭

ঐ	নাটক : আশির দশক।	এপ্রিল-জুন, ১৯৯০
	। দেশ বিদেশের নাট্য আন্দোলন ।	
বিষ্ণু বসু	তৃতীয় বিশ্বের নাট্য আন্দোলনঃ পারস্পরিক সংযোগের নতুন চেষ্টা।	ডিসেম্বর, ১৯৮২
চন্দন সেন	ঢাকা শহরের নাট্যচর্চা : কালের যাত্রার ধ্বনি।	নভেম্বর, ১৯৯০
পার্থপ্রতিম কুণ্ডু	সামাজিক ও অভিজ্ঞতার দলিল : পুঃ পঃ আঃ পুঃ রমেন্দু মজুমদার : বাংলাদেশের 'নাট্যচর্চা'।	এপ্রিল-মে, ১৯৮৭
	।। বাংলা নাটক ও নাট্য অভিনয়ের ইতিহাস ।।	
রামরাম চট্টোপাধ্যায়	অভিনয়ের ইতিহাস : পুস্তক পরিচয়। আঃ পুঃ শঙ্কর ভট্টাচার্য—বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসের উপাদান ও রবীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত 'বাংলা নাট্য নিয়ন্ত্রণের ইতিহাস'।	এপ্রিল, ১৯৮৬
	।। বিদেশী নাটক ও নাট্যকার ।।	
	। ব্রেশট ।	
কার্তিক লাহিড়ী	বাংলায় ব্রেশট। থিয়েটার ওয়ার্কশপ প্রযোজিত : আশোক মুখোপাধ্যায, অনুদিত "সোয়াইক গেল যুদ্ধে" (নির্দেশনা বিভাস চক্রবর্তী) নাটকের অভিনয়।	এপ্রিল, ১৯৮২
	।। নৃত্যকলা ও নৃত্য শিল্পী ।।	
হেমাঙ্গ বিশ্বাস	উদয় শঙ্কর, পুঃ মুঃ	মে-জুলাই, ১৯৮১
	।। সাহিত্য ও সাহিত্য তত্ত্ব।।	
অমরেন্দ্র প্রসাদ মিত্র	মার্কসীয় আর্ট তত্ত্ব ও লেখকের স্বাধীনতা : পুঃ মুঃ	মে-জুলাই, ১৯৮১
অরুণ সেন	শিল্পেরআলো, অন্ধকারের শিল্প।	ফেব্রুয়ারী-এপ্রিল, ১৯৮৪
ঐ	সহজ আশা কঠিন আশা।	জুলাই-সেপ্টেম্বর, ১৯৮২
চিন্মোহন সেহানবিশ	কার জন্য লিখি।	মে-জুন, ১৯৮৮
দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত	সাহিত্যে বাস্তবতা কি সম্ভব?	ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৫
পূর্ণেন্দু পত্রী	শিল্পের বিনিময়ে।	আগষ্ট, অক্টোবর, ১৯৮৪
শুভরঞ্জন দাশগুপ্ত	কবিতার ভাষ্য।	ফেব্রুয়ারী-এপ্রিল, ১৯৮৪
	। বাংলা সাহিত্য ও সাহিত্যিক।	
	। দ্বিজেন্দ্র লাল রায়।	
রূপশ্রী সেন	স্মৃতি বিস্মৃতিতে দ্বিজেন্দ্রলাল : পুস্তক পরিচয়। আঃ পুঃ সুধীর চক্রবর্তীঃ	জুলাই, ১৯৮৯

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় : স্মরণ বিস্মরণ।

। প্রবোধ চন্দ্র সেন ।

দেবদাস জোয়ারদার	প্রবোধ চন্দ্র সেন।	ডিসেম্বর, ১৯৮৬

। সরোজ বন্দোপাধ্যায়।

বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য্য	সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য ভাবনা।	মার্চ,১৯৮৭

। বাংলা কাব্য — আলোচনা ।

অরুণ সেন	চল্লিশের কবিতা : দায় ও মুক্তি।	এপ্রিল, ১৯৮৫
অশ্রুকুমার সিকদার,সং	কবিতা সমালোচনার পরিভাষা	মে-জুন, ১৯৮২
জীবনানন্দ দাস	আশা, নিরাশা ও কবিতা।	এপ্রিল, ১৯৮২
দেবদাস জোয়ারদার	রবীন্দ্রনাথ থেকে সুধীন্দ্রনাথ : কবিতায় গ্রহণ বর্জন।	এপ্রিল, ১৯৮৩
প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায়	জন্ম নিক নতুন সন্দীপ।	আগষ্ট-অক্টোবর, ১৯৮৮
সরোজ আচার্য	কয়েকটি আধুনিক কাব্য : পুঃ মুঃ। সুবর্ণ জয়ন্তী সংকলন।	মে-জুলাই, ১৯৮১

। বাংলা কাব্য ও কবি।

। অমিয় চক্রবর্তী ।

মানিক চক্রবর্তী	প্রসঙ্গ : অমিয় চক্রবর্তী।	জুলাই, ১৯৮৬

। অরুণ কুমার চট্টোপাধ্যায়।

রামদুলাল বসু	খনি অঞ্চলের এক কবি।	ডিসেম্বর, ১৯৮৬

। অরুণ মিত্র ।

সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়	অরুন মিত্রের কবিতা, কবিতার উৎসের দিকে।	ডিসেম্বর, ১৯৮৩

। জসিমুদ্দিন ।

আবদুল কাদির	সোজনবাদিয়ার ঘাট : জশিমুদ্দিন।	মে-জুলাই, ১৯৮১

। জীবনানন্দ দাস ।

দেবদাস জোয়ারদার	পথিক থেকে নাবিক।	এপ্রিল, ১৯৮৫
প্রদ্যুম্ন মিত্র	"কবিতার গাঢ় এনামেল" জীবনানন্দীয় ভাবনা।	নভেম্বর, ১৯৯০
বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত	কবিতার গদ্য ভাবা ও জীবনানন্দ দাস।	এপ্রিল, ১৯৮২

। বিষ্ণু দে।

অরুণ সেন	বিষ্ণু দের অন্বিষ্ট।	এপ্রিল, ১৯৮১
তপন কুমার ঘোষ	বিষ্ণু দে'র চর্চা : পুঃ মুঃ আঃ পুঃ অরুণ সেন : 'বিষ্ণু দে ব্রতযাত্রায়'।	ডিসেম্বর, ১৯৮৫
দেবেশ রায়	বিষ্ণু দে'র অপেক্ষায়।	নভেম্বর, ১৯৮২

বিষ্ণু দে	যে গানে বাঁচি : ইংরাজী বেতার কথিকার অনুবাদ ; অনু : অরুণ সেন।	জুলাই-সেপ্টেম্বর, ১৯৮২
সুতপা ভট্টাচার্য্য	কবির চোখে কবি : বিষ্ণু দে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।	আগষ্ট-অক্টোবর, ১৯৮১
ঐ	রূপ থেকে ভাবে — "ঘোড় সওয়ার"।	নভেম্বর, ১৯৮৬
হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	বিদায় বিষ্ণু দে	নভেম্বর, ১৯৮২,
	। বুদ্ধদেব বসু ।	
অজিত দত্ত	নতুন পাতা : বুদ্ধদেব বসু, পুঃ মুঃ।	মে-জুলাই, ১৯৮১
	। মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় ।	
শুভ বসু	দেশ কাল থেকে নিভৃতি : পুঃ পঃ আঃ পুঃ মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যাযের শ্রেষ্ঠ কবিতা।	মে, ১৯৮৪
	। মনীন্দ্র রায়।	
ঐ	আশা আর আত্মজিজ্ঞাসার আয়ু : পুস্তক পরিচয় আঃ পুঃ মণীন্দ্র রায়ঃ ভাসান।	জানুযারী, ১৯৮৯
	। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ।	
ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়	কাব্য বিরোধিতা ও যতীন্দ্রনাথ।	নভেম্বর, ১৯৮৭
	। শঙ্খ ঘোষ ।	
অরুনকুমার রায়চৌধুরী	"তাঁহাব জীবন চরিতে" পুঃ পঃ- আঃ পুঃ শঙ্খ ঘোষ। উর্বশীর হাসি।	এপ্রিল, ১৯৮২
ঈশিতা চট্টোপাধ্যায়	ঐতিহ্য ও আধুনিকতা : পুঃ পঃ আঃ পুঃ শংখ ঘোয : ঐতিহ্যের বিস্তার।	ডিসেম্বর, ১৯৯০
সিদ্ধার্থ রায়	শংখ ঘোষের কবিতা : 'অগ্নির ভিতবে দাবদাহ'।	আগষ্ট-অক্টোবব, ১৯৮৯
	। সমর সেন ।	
অভীক মজুমদার	সমর সেন : মিলনের মুহূর্ত থেকে বিরহের স্তব্ধতাব।	মে-জুন, ১৯৮৮
আশীষ মজুমদার	সমর সেন : তির্যক ও সরল।	ঐ
	। সিদ্ধেশ্বর সেন ।	
অরুণ সেন	সিদ্ধেশ্বর সেনের কবিতা :	আগষ্ট- অক্টোবর, ১৯৮১

	অজ্ঞাতবাস থেকে যাত্রা।	
	। সুধীন্দ্র নাথ দত্ত ।	
অশীব মজুমদার	সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় নৌকাডুবি।	সেপ্টেম্বর- নভেঃ, ১৯৮৫
প্রেমেন্দ্র মিত্র	অর্কেস্ট্রা : সুধীন্দ্রনাথ দত্ত।	মে-জুলাই, ১৯৮১
সমর সেন	ক্রন্দসী : সুধীন্দ্রনাথ দত্ত।	মে-জুলাই, ১৯৮১
	। সুভাষ মুখোপাধ্যায় ।	
সিদ্ধেশ্বর সেন	"চিরকুট : সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের চিরকুট কাব্যের আলোচনা" পুঃ মুঃ।	মে-জুলাই, ১৯৮১
	। তামিল কাব্য ও কবি ।	
ভীষ্ম সাহনি	গুরুস্থানীয় ভারতী : ভারতের পুনরুজ্জীবনের মহান কবি। অনুঃ জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়।	মার্চ, ১৯৮২
	। বিদেশী কাব্য ও কবি।	
অরুণ সেন	বাংলা কবিতায় আধুনিক অনুবাদ।	জুন, ১৯৮৫
অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়	অনুবাদ কবিতার সূচী।	আগষ্ট, ১৯৮৫
	। আরাগোঁ ।	
বিষ্ণু দে	আরাগোঁ - নেরুদা - এলুয়ার।	নভেম্বর, ১৯৮২
	। এলিয়েট, টি. এস।	
অজিত কুমার মুখোপাধ্যায়	এলিয়টের অবয়ব; দ্য প্রোর্টেট অব এ লেডি।	জুলাই, ১৯৮৯
ঐ	পোড়োজমি ও তার পরিকল্পনা।	আগষ্ট, ১৯৮৫
	। এলুয়ার, পল ।	
অরুণ মিত্র	পল এলুয়ার : পুঃ মুঃ।	মে-জুলাই, ১৯৮১
	। স্ত্রীড, এরিক।	
শুভরঞ্জন দাশগুপ্ত	কবি এরিক স্ত্রীড ও তার কবিতা।	জুন, ১৯৮৫
	। জাভর, প্যাভেল।	
মারিবা নেমকোভা বন্দোপাধ্যায়	প্যাভেল জাভর : বিষণ্ণ প্রভাত।	জুন, ১৯৮৫
	। শেভাচেংকো।	
গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়	বিপ্লবী কবি তারাস শেভাচেংকো।	ডিসেম্বর, ১৯৮৬
	। মধ্য এশিয়া।	
দেবেশ রায়	কবিতার এশিয়া।	জুন, ১৯৮৫
	। তুরস্ক ।	
আশীব মজুমদার	আধুনিক তুরস্কের কবিতা।	জুন, ১৯৮৫
	। প্যালেস্টাইন ।	
অমিতাভ দাশগুপ্ত	জঙ্গলের রাজত্বে ফুলরাও জঙ্গল	ঐ

	হয়ে যায় : প্যালেস্টাইন কবিতা।	
	। চীন।	
দেবেশ রায়	চীনের এখনকার কবিতা।	ঐ
	। যুগোশ্লাভিয়া ।	
মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	ইউগোশ্লাভিয়ার কবি ভাস্ক পোপা।	ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৬
	। স্পেন ।	
প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায়	পাবলো নেরুদা ও স্পেনের অন্যান্য কবিতা।	ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৭
	। হল্যান্ড।	
শচীন্দ্র রায়	হল্যান্ডের কবি এড হুনিক—তাঁর কবিতা।	জুন, ১৯৮৫
	। রাশিয়া।	
সিদ্ধেশ্বর সেন	সেই রুশ কবিত্রয়ীর একজন : রোঝদেস্ত, ভেনস্কি।	ঐ
	। দক্ষিণ আফ্রিকা।	
সিদ্ধার্থ রায়।	দক্ষিণ আফ্রিকার মেয়েদের কবিতা।	ডিসেম্বর, ১৯৮২
	। নিকারাগুয়া ।	
মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	নিকারাগুয়ার কার্দেনাল ও পোলান্ডের হেরবেট।	জুন, ১৯৮৫
	। লাতিন আমেরিকা ।	
সন্দীপ সেনগুপ্ত	লাতিন আমেরিকা : আন্দোলন ও কবি ব্যক্তিত্ব।	ফেব্রুয়ারী, ১৯৯০
	।। গল্প-উপন্যাস ।।	
	। হিন্দী গল্প - উপন্যাস।	
সিদ্ধেশ	যাত্রার শেষে। অনুবাদ : সুবিমল বসাক।	মার্চ, ১৯৯০
	।। হিন্দী গল্প-উপন্যাস ও ঔপন্যাসিক।।	
বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য	প্রেমচাঁদ : দুঃখী হিন্দুস্থানের দরদী লেখক।	আগষ্ট-অক্টোবর, ১৯৮১
	।। বাংলা গল্প ও উপন্যাস ।।	
অজয় চট্টোপাধ্যায়	কুলীন-সাধনা।	ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৮
অজয় দাশগুপ্ত	অন্যরকম।	ডিসেম্বর, ১৯৮৮
অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়	আশ্রয়।	আগষ্ট-অক্টোবর, ১৯৮৭
অনিন্দ্য ভট্টাচার্য	আধি দৈবিক।	এপ্রিল, ১৯৮৮
ঐ	ক্ষত-অক্ষত।	জানুয়ারী, ১৯৮৯
ঐ	খালাস।	জুলাই, ১৯৮৬
অনিল ঘড়াই	নুনা সামাটের গল্প।	নভেম্বর, ১৯৮৯

অনিশ্চয় চক্রবর্তী	নিরুদ্দেশ যাত্রা।	জানুয়ারী, ১৯৯০
অভিজিৎ সেনগুপ্ত	টুংরো ভাইরাস।	ডিসেম্বর, ১৯৮৩
অমর মিত্র	একটি মোকদ্দমার সত্যাসত্য।	আগষ্ট-অক্টোবর,১৯৮৮
ঐ	কুর্শিনামার আগেকার পুরুষ।	মার্চ, ১৯৮২
ঐ	বাদশা ও বসুমতী।	আগষ্ট-অক্টোবর, ১৯৮৯
অমর মিত্র	বিপিন পাত্রের কলকাতা।	এপ্রিল, ১৯৮৬
ঐ	রাণীগঞ্জের বাজার।	এপ্রিল, ১৯৮৮
ঐ	সম্পত্তি ষোলআনা।	আগষ্ট-অক্টোবর, ১৯৯০
অমল আচার্য	বিবক্রিয়া।	আগষ্ট-অক্টোবর ১৯৮৭
অমলেন্দু চক্রবর্তী	কালকেতুর স্বর্গলাভ।	আগষ্ট-অক্টোবর, ১৯৮৩
ঐ	জাতক গাথা।	সেপ্টেম্বর-নভেঃ, ১৯৮৫
ঐ	ধান মাঠ শরীর।	আগষ্ট অক্টোবর, ১৯৮৪
ঐ	সূর্যাস্তে দীর্ঘ ছায়া।	জানুয়ারী, ফেব্রুঃ, ১৯৮১
অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়	পুনর্জন্ম।	নভেম্বর, ১৯৮৮
অমিয়ভূষণ মজুমদার	অগ্নিসিদ্ধি।	জানুয়ারী, ফেব্রুঃ, ১৯৮১
ঐ	ম্যানইটাব।	আগষ্ট-অক্টোবর, ১৯৮১
অলক সোম চৌধুরী	আদিগঙ্গা।	অক্টোবর, ১৯৮২
অশোক কুমার সেনগুপ্ত	ক্ষেত জননী।	ডিসেম্বর, ১৯৮৪
ঐ	ভূমি স্বত্ব।	আগষ্ট-অক্টোবর, ১৯৮৭
ঐ	লোকদীপ প্রকল্প ও চুকাই বাউরি।	ফেব্রুয়ারী ১৯৮৯
অশোক কুমার সেনগুপ্ত	হাল মাহিন্দার।	আগষ্ট-আক্টোবর, ১৯৮৯
অসীম কুমার মুখোপাধ্যায়	দ্বিতীয় পৃথিবী।	মে, ১৯৮৪
ঐ	মাছ।	নভেম্বর, ১৯৮৮
অসীম রায়	কেওড়া পার্টি।	আগষ্ট-অক্টোবর, ১৯৮১
ঐ	কেন বাঁচা।	জানুয়ারী-ফেব্রুঃ,১৯৮১
ঐ	জবান বন্দী।	জুলাই-সেপ্টেম্বর, ১৯৮২
আফসার আমেদ	আদিম।	আগষ্ট-আক্টোবব; ১৯৮১
ঐ	খরা।	জুলাই-সেপ্টেম্বর; ১৯৮২
ঐ	চোরা কোটাল।	আগষ্ট-অক্টোবব, ১৯৮৭
ঐ	জিনুতবেগমের বিবহ মিলন।	জনুয়ারী- ফেব্রুঃ. ১৯৮১
ঐ	নলকুপ	ডিসেম্বর ১৯৮৫
ঐ	পাথর পাথর।	আগষ্ট অক্টোবব, ১৯৯০

ঐ	ভয়।	সেপ্টেম্বর-নভেঃ, ১৯৮৫
ঐ	যৌব রাজ্য।	আগষ্ট-অক্টোবর, ১৯৮৪
ঐ	সমুদ্রের নিলয়।	আগষ্ট-অক্টোবর, ১৯৮৮
ঐ	সুখের নির্মাণ।	এপ্রিল, ১৯৮৫
আফসার আমেদ	হাড়।	আগষ্ট-অক্টোবর, ১৯৮৩
আবুবকর সিদ্দিক	খোঁড়া সমাজ।	জানুয়ারী, ১৯৮৬
আবুল বাসার	নিগ্রহান্তর।	আগষ্ট-অক্টোবর, ১৯৮৭
ইন্দু সাহা	জীবন যখন জাগে।	জানুয়ারী, ১৯৯০
কবিতা সিংহ	ঠাকুরদাদার ঝুলি।	আগষ্ট-অক্টোবর, ১৯৮৮
ঐ	স্বপ্নে বাঘ।	জানুয়ারী-ফেব্রুঃ, ১৯৮১
কমল কুমার মজুমদার	জাসটিস।	আগষ্ট-অক্টোবর, ১৯৮৭
কার্ত্তিক লাহিড়ী	আত্মঘাত কিংবা বিদেশী।	জানুয়ারী-ফেব্রুঃ, ১৯৮১
ঐ	কাঁচা মাংস।	আগষ্ট-অক্টোবর, ১৯৮৯
ঐ	জাগার রাত।	আগষ্ট অক্টোবর, ১৯৮৮
ঐ	তৃতীয় বিশ্ব।	অক্টোবর-নভেঃ, ১৯৮৫
ঐ	নেকড়ের মুখে।	আগষ্ট-অক্টোবর, ১৯৯০
ঐ	মন্থরা।	আগষ্ট-অক্টোবর, ১৯৮৪
ঐ	শেষ পর্যন্ত কেউ নিরপেক্ষ থাকতে পারে না।	জুলাই-সেপ্টেঃ, ১৯৮২
কিন্নর রায়	গট্‌ আপ।	আগষ্ট-অক্টোবর, ১৯৮৯
ঐ	জনগণমন।	আগষ্ট-অক্টোবর, ১৯৯০
ঐ	র‍্যাম্বো অথবা রামচন্দ্র।	আগষ্ট-অক্টোবর, ১৯৮৮
ঐ	শীতল যুদ্ধ।	আগষ্ট-অক্টোবর, ১৯৮৭
কেশব দাশ	অসংযুক্তা	জানুয়ারী-ফেব্রুঃ, ১৯৮১
ঐ	দ্বিতীয় সেতু।	আগষ্ট-অক্টোবর, ১৯৮৩
ঐ	পাতাল টিলা।	আগষ্ট-অক্টোবর, ১৯৮৯
ঐ	পোতাশ্রয়।	আগষ্ট-অক্টোবর, ১৯৮৮
ঐ	বেলিলিয়াস রোডের মোড়।	জুলাই, ১৯৮৫
ঐ	মানুষ হয়ে ওঠা।	আগষ্ট-অক্টোবর, ১৯৯০
গৌতম দে	নগরীয়।	জুলাই, ১৯৮৬
চণ্ডী মণ্ডল	টোপ।	আগষ্ট-অক্টোবর, ১৯৮৯
চিত্তরঞ্জন ঘোষ	আরো।	আগষ্ট-অক্টোবর, ১৯৮৮
ঐ	কুঠার।	আগষ্ট-আক্টোবর, ১৯৮৪
ঐ	দুর্গার দুর্গতি।	আগষ্ট-অক্টোবর, ১৯৮৭
ঐ	দো নববুরী।	শারদীয়, ১৯৮৫

ঐ	ভাত।	আগষ্ট-অক্টোবর, ১৯৮৩
ঐ	মাটি।	জুলাই-সেপ্টেম্বর, ১৯৮২
ঐ	মামা ভাগ্নের গপ্পো।	আগষ্ট-অক্টোবর, ১৯৮৯
ঐ	শোক সংবাদ।	আগষ্ট অক্টোবর, ১৯৮১
চিত্তরঞ্জন সেনগুপ্ত	ঈশ্বরের খোঁজে।	আগষ্ট-অক্টোবর, ১৯৮৯ শারদীয়
ঐ	এবার লড়াই।	আগষ্ট-অক্টোবর, ১৯৯০
ছবি বসু	আস্তানা।	এপ্রিল, ১৯৮১
জাতক রাণা	বিড়াল।	জুলাই, ১৯৯০
জীবেন্দ্র কুমার দত্ত	আশ্রয়।	নভেম্বর, ১৯৮৭
ঐ	সাদা কালো।	জুলাই, ১৯৯০
জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়	গ্রহণের পর।	জুলাস-সেপ্টেম্বর, ১৯৮২
ঐ	বুড়ি চাঁদ।	আগষ্ট-অক্টোবর, ১৯৮৪
ঐ	সম্পর্ক।	আগষ্ট-অক্টোবর, ১৯৮৮
জ্যোৎস্নাময় ঘোষ	ক্লীং।	ঐ
ঐ	চুহাড় চল্লিশ দৌড়।	আগষ্ট-অক্টোবর, ১৯৮৯
ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়	চারণভূমি।	আগষ্ট- অক্টোবর, ১৯৮৮
ঐ	তাতারাসি।	আগষ্ট-অক্টোবর, ১৯৮৪
ঐ	তিন নম্বর ডাম্প।	মার্চ, ১৯৮৪
ঐ	রামপদর অশন ব্যসন।	আগষ্ট-অক্টোবর, ১৯৮৩
ঐ	সরকার পুকুর।	আগষ্ট-অক্টোবর, ১৯৯০
ঐ	হলফনামা।	আগষ্ট-অক্টোবর, ১৯৮৯
তন্ময় মজুমদার	ধুনারীর কম্বুক।	ডিসেম্বর, ১৯৮৯
তৃপ্তিময় গঙ্গোপাধ্যায়	দুঃসময়।	ফেব্রুয়ারী, ১৯৯০
দেবেশ রায়	অন্ত্যেষ্টির রীতি বিধির তৃতীয় পর্যায়।	এপ্রিল, ১৯৮৫
ঐ	যৌবন বেলা।	জানুয়ারী-ফেব্রুঃ, ১৯৮১
পান্না মুস্তাফা	প্রাকৃতিক।	মার্চ, ১৯৮৬
পূর্ণেন্দু পত্রী	আক্রমণ।	জানুয়ারী-ফেব্রুঃ, ১৯৮১
প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়	যুদ্ধ।	জুলাই, ১৯৯০
প্রণব দত্ত	ছিন্ন অলৌকিক।	ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৯
প্রফুল্লকুমার সিংহ	জাতক।	মার্চ, ১৯৮৯
প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায়	অস্তিত্ব শিকারী।	নভেম্বর, ১৯৮৭
ঐ	চক্রব্যূহ।	মার্চ, ১৯৮৫
প্রবীর নন্দী	কাকতাড়ুয়া।	এপ্রিল, ১৯৮২
ঐ	ভাঁটি।	জুলাই, ১৯৮৫

প্রবীর সেনগুপ্ত	শহীদের মা।	ডিসেম্বর, ১৯৯০
প্রভাস সেন।	দোস্ত।	সেপ্টেম্বর-নভেঃ, ১৯৮৫
বরেন গঙ্গোপাধ্যায়	শোক।	আগষ্ট-অক্টোবর, ১৯৮৭
বরুণ গঙ্গোপাধ্যায়	লিপি।	সেপ্টেম্বর-নভেঃ, ১৯৮৫
বিশ্বনাথ বসু	এই প্রেম।	আগষ্ট-আক্টোবর, ১৯৮১
ঐ	খড়।	জানুয়ারী-ফেব্রুঃ, ১৯৮১
বীরেন শাসমল	বর্ণ পরিচয়।	আগষ্ট-অক্টোবর, ১৯৯০
ভগীরথ মিশ্র	পৌষ পরবের কুশীলব।	আগষ্ট-অক্টোবর, ১৯৮৯
ঐ	বিবর্তন।	আগষ্ট-আক্টোবর, ১৯৯০
ঐ	শেঠের ব্যাটা।	আগষ্ট অক্টোবর, ১৯৮৮
মঞ্জু সরকার	প্রিয় দেশবাসী।	জানুয়ারী-ফেব্রুঃ, ১৯৮১
মণীন্দ্র চক্রবর্তী	উপমহাদেশ।	জুলাই, ১৯৮৫
মানিক চক্রবর্তী	ধোঁয়াধোঁয়ির চৌদ্দ দিন।	আগষ্ট-অক্টোবর, ১৯৯০
ঐ	প্রভারক শিশু।	আগষ্ট-অক্টোবর, ১৯৮৩
ঐ	প্রথম বিবাদ।	জুলাই-সেপ্টেম্বর, ১৯৮২
ঐ	বড়দের সঙ্গে যাওয়া।	আগষ্ট-অক্টোবর, ১৯৮৮
ঐ	বিভিন্ন সৎকার।	জানুয়ারী-ফেব্রুঃ, ১৯৮১
ঐ	ভোর বেলায় কাঁচা রক্ত।	ডিসেম্বর, ১৯৮৫
ঐ	মাঠে উপস্থিতি।	সেপ্টেম্বর-নভেঃ, ১৯৮৫
ঐ	মিনুর মা মুক্তিকে খুঁজে পায়না।	আগষ্ট-অক্টোবর, ১৯৮৪
ঐ	রক্ত সংবাদ।	আগষ্ট-অক্টোবর, ১৯৮১
ঐ	সারকন্ত।	ডিসেম্বর, ১৯৮৯
মিহির সেন	শোক ভাষণ।	জানুয়ারী-ফেব্রুঃ, ১৯৮১
যোগজীবন চট্টোপাধ্যায়	সুচাঁদের মৃত্যুও শোভন।	নভেম্বর, ১৯৮২
রঞ্জন ধর	অনুভব।	আগষ্ট-অক্টোবর, ১৯৮৪
ঐ	দায়।	আগষ্ট-অক্টোবর, ১৯৮৮
ঐ	দুস্তর।	সেপ্টেম্বর-নভেঃ, ১৯৮৫
ঐ	প্রত্যয়।	আগষ্ট-অক্টোবর, ১৯৮৯
ঐ	শেষ স্বপ্ন।	আগষ্ট-অক্টোবর, ১৯৮৭
রবীন্দ্র গুহ	মূর্খাপীরিত।	জুলাই, ১৯৮৭
রমানাথ রায়	পেশা খুন করা।	আগষ্ট-অক্টোবর, ১৯৮৭
রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়	শূণ্য পুরাণ।	আগষ্ট-অক্টোবর, ১৯৮৮
রাধাপ্রসাদ ঘোষাল।	একটি টাকা ও সংলগ্ন গল্প।	আগষ্ট-আক্টোবর, ১৯৯০
ঐ	পদ্মপুরাণ।	আগষ্ট-অক্টোবর, ১৯৮৯

ঐ	পৃথীবি।	আগষ্ট-অক্টোবর, ১৯৮৮
ঐ	হলুদ পুরাণ।	এপ্রিল, ১৯৮৬
রামকুমার মুখোপাধ্যায়	গোষ্ঠ।	আগষ্ট-অক্টোবর, ১৯৮১
ঐ	জ্যোতিষী।	সেপ্টেম্বর-নভেঃ, ১৯৮৫
শিবরাম পাত্র	বেরুশ নকনা ধান।	জুলাই, ১৯৮৬
শৈবাল মিত্র	বিভ্রম।	মার্চ, ১৯৮৮
সত্যেন সেন	হাজেরা বেগম	জানুয়ারী-ফেব্রুঃ, ১৯৮১
সমরেশ বসু	খিঁচ কবলা সমাচার।	জুলাই-সেপ্টেম্বর, ১৯৮২ আগষ্ট-অক্টোবর ১৯৮৩ ও ১৯৮৪
সমরেশ বসু	দৈবের হাতে নাই।	আগষ্ট-অক্টোবর, ১৯৮১
ঐ	জ্যান্ত মরার গল্প।	জুলাই-সেপ্টেম্বর, ১৯৮২
সমরেশ রায়	বকুল ফুল।	আগষ্ট-অক্টোবর, ১৯৮৪
সাধন চট্টোপাধ্যায়	একটি চুম্বনের জন্য।	আগষ্ট-অক্টোবর, ১৯৮৭
ঐ	ছিনতাই।	ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৫
ঐ	টিউমার।	আগষ্ট-অক্টোবর, ১৯৮৪
ঐ	মূর্তির মানুষ।	আগষ্ট-অক্টোবর, ১৯৯০
ঐ	র‍্যাড্ক নম্বর।	আগষ্ট-অক্টোবর, ১৯৮৯
সুদর্শন সেন শর্মা	অন্ত্যেষ্টি অন্ত্যেষ্টি।	আগষ্ট-অক্টোবর, ১৯৯০
ঐ	পায়ের তলার মাটি।	মার্চ, ১৯৮৯
সুধাংশু ঘোষ	আঘাত।	আগষ্ট-অক্টোবর, ১৯৮৭
ঐ	ন্যাংটো।	আগষ্ট-অক্টোবর, ১৯৮৯
সুধীর করণ	আবর্ত।	আগষ্ট-অক্টোবর, ১৯৮৭
সুব্রত নারায়ণ চৌধুরী	ক-চ-ত-ট-প।	মার্চ, ১৯৮৮
সুব্রত সেনগুপ্ত	পরগাছা।	আগষ্ট-অক্টোবর, ১৯৯০
সুরজিৎ বসু	তোমার সৃষ্টির পথ।	জুলাই-সেপ্টম্বর, ১৯৮২
সৈকত রায়	অহিরে।	আগষ্ট-অক্টোবর, ১৯৯০
সৈকত রক্ষিত	অস্থানিক।	জুলাই, ১৯৮৫
ঐ	মাড়াই কল।	আগষ্ট-অক্টোবর, ১৯৮৯
ঐ	লক্ষণ সহিস।	সেপ্টেম্বর-নভেঃ, ১৯৮৫
সৌরি ঘটক	ঠাই নেই।	আগষ্ট-অক্টোবর, ১৯৮৭
ঐ	শুধু মরীচিকা।	ডিসেম্বর, ১৯৯০
ঐ	শেষ প্রতিনিধি।	আগষ্ট-অক্টোবর, ১৯৮৮
ঐ	স্বপ্নটুকু বেঁচে থাক।	ডিসেম্বর, ১৯৮৭ ও

		ফেব্রুয়ারী ও এপ্রিল, ১৯৮৮
স্বপ্নময় চক্রবর্তী	ইঁদুর মানুষ নয়।	আগষ্ট-অক্টোবর, ১৯৯০
ঐ	তারের গান।	আগষ্ট-অক্টোবর, ১৯৮৮

।। বাংলা গল্প-উপন্যাস আলোচনা ।।

।। গল্প ।।

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়	গল্পে নবম দশম।	এপ্রিল-জুন, ১৯৯০
বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য্য	দশ বছরের বাংলা উপন্যাস : সময়ের প্রতিচ্ছবি।	এপ্রিল-জুন, ১৯৯০
সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়	সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাসে বাস্তবতার ধারা	আগষ্ট-অক্টোবর, ১৯৮১

।। বাংলা উপন্যাস ও ঔপন্যাসিক ।।

। অন্নদাশংকর রায় ।

চারুচন্দ্র দত্ত	যাঁর যেথা দেশ : অন্নদাশংকর রায়ঃ পুঃ মুঃ।	মে-জুলাই, ১৯৮১
আফসার আমেদ	নিহিত স্বপ্নের খোঁজে : পুঃ পঃ আঃ পুঃ অমলেন্দু চক্রবর্তী : "গ্রহে গ্রহান্তরে"।	এপ্রিল-মে, ১৯৮৭

। অমিয় ভূষণ মজুমদার ।

অজিত কুমার মুখোপাধ্যায়	উপন্যাসের দিগন্ত ও অমিয়ভূষণ।	সেপ্টেম্বর-নভেঃ, ১৯৮৫
ঐ	বঙ্কিম পুরস্কারে সম্মানিত অমিয় ভূষণ মজুমদার।	জুলাই, ১৯৮৬
প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায়	অমিয় ভূষণ : কন্ঠস্বরের স্বরূপ সন্ধানে পুঃ মুঃ, আঃ পুঃ অমিয় ভূষণ মজুমদার : শ্রেষ্ঠ গল্প।	এপ্রিল-মে, ১৯৮৭
রুশতি সেন	উপন্যাসের কিছু আশা।	জুলাই-সেপ্টেম্বর, ১৯৮২

। অসীম রায় ।

কেশব দাস	সময়ের মর্মস্থল ছুঁয়ে : পুঃ পঃ আঃ পুঃ অসীম রায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প।	এপ্রিল-মে, ১৯৮৭
গোপাল হালদার	অতীতের কল্পনা, ভবিষ্যতের স্মৃতি : পুঃ পঃ আঃ পুঃ অসীম রায় " নবাব বাদী"।	মার্চ, ১৯৮১

সত্য গুহ	দিনকাল ও অসীম রায়ের সৃষ্টি।	আগস্ট-অক্টোবর, ১৯৮৬
	। কমল মজুমদার ।	
বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত	কমল কুমার মজুমদার : খেলার বিষয় বিন্যাস ও শৈলী সন্ধান।	এপ্রিল, ১৯৮৫
	। জগদীশ গুপ্ত ।	
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	'লঘুগুরু' পুঃ মুঃ আঃ পুঃ জগদীশ গুপ্ত : লঘুগুরু।	মে-জুলাই, ১৯৮১
রূপশ্রী সেন	দুটি ব্যতিক্রম।	আগস্ট-অক্টোবর, ১৯৮৩
	। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ।	
অব্যয়কুমার দাশগুপ্ত	তারাশংকর : মাটি মানুষ : পুঃ পুঃ আঃ পুঃ তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের "গ্রামের চিঠি"।	এপ্রিল-মে, ১৯৮৭
	। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ।	
অরুণ সেন	ভয়ার্ত সময় ও দীপেন্দ্রনাথ।	সেপ্টেম্বর-নভেঃ, ১৯৮৫
কার্ত্তিক লাহিড়ী	দাঙ্গা, দেশবিভাগ ও "আগামী" দীপেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায় প্রথম উপন্যাস	জানুয়ারী, ১৯৯০
	। ধূর্যটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়।	
গিরিজাপতি ভট্টাচার্য্য	অন্তঃশীলা: ধূর্যটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : পুঃ মুঃ	মে -জুলাই, ১৯৮১
বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য্য	ধূর্যটিপ্রসাদের কথা সাহিত্য : বুদ্ধিজীবীর নির্মোহ আত্ম বিশ্লেষণ : পুঃ পঃ আঃ পুঃ "ধূর্যটি প্রসাদ রচনাবলী"।	এপ্রিল-মে, ১৯৮৭
বিষ্ণু দে	"আবর্ত : ধূর্যটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায় পুঃ মুঃ।	মে-জুলাই, ১৯৮১
	।ননী ভৌমিক।	
ধনঞ্জয় দাস	প্রসঙ্গ : কথাশিল্পী ননী ভৌমিক।	আগস্ট-অক্টোবর, ১৯৮৯
	।প্রফুল্ল রায়।	
অশ্রুকুমার সিকদার	বাস্তবের বিহার ও প্রফুল্ল রায়ের উপন্যাসের বস্তুবত্তা।	আগস্ট-অক্টোবর, ১৯৮৬
	।প্রমথ নাথ মিত্র।	
নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত	প্রমথ নাথ মিত্রের "যোগী"।	জানুয়ারী, ১৯৮৭
	।বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।	
সরোজ কুমার ভৌমিক	আনন্দমঠ : স্থান কাল ও কাহিনী।	ডিসেম্বর, ১৯৮২
	।বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ।	
চিত্তরঞ্জন ঘোষ	পথের পাঁচালী : কাঠামো ও কারিকুরি।	মার্চ, ১৯৮২

দিলীপ কুমার রায়	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ পথের পাঁচালী। পুঃ মুঃ।	মে-জুলাই, ১৯৮১
নীরেন্দ্রনাথ রায়	অপরাজিতঃ পুঃ মুঃ।	মে-জুলাই, ১৯৮১
সুতপা ভট্টাচার্য	উপন্যাসের মুক্তি - "পথের পাঁচালী"।	আগষ্ট-অক্টোবর, ১৯৯০
	।মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।	
অনিশ্চয় চক্রবর্তী	অস্পষ্টতা থেকে মুক্তি।	এপ্রিল-জুন, ১৯৮৯
আফসার আমেদ	প্রকরণের মায়াঃ পদ্মা নদীর মাঝি।	এপ্রিল-জুন, ১৯৮৯
উদয়ন ঘোষ	এখনও মানিক।	এপ্রিল-জুন, ১৯৮৯
কার্তিক লাহিড়ী	প্রসঙ্গ চিহ্ন।	ঐ
কিন্নর রায়	"স্বাধীনতার স্বাদ" আজও প্রাসঙ্গিক।	এপ্রিল-জুন, ১৯৮৯
কৃষ্ণ ধর	যুদ্ধ ও মন্বন্তরের বাংলার সমাজচিত্র।	ঐ
তপোবিজয় ঘোষ	মানিক ও কল্লোল।	এপ্রিল-জুন-জুলাই, ১৯৮৯
তরুণ মুখোপাধ্যায়	লু-সুন ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বিশ্বভাবনা।	মার্চ, ১৯৮৭
তরুন সান্যাল	গ্রামের নাম গাওদিয়া।	এপ্রিল-জুন, ১৯৮৯
দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	মানিক বন্দোপাধ্যায়ঃ স্মৃতি, অনুসঙ্গ, মৃত্যু।	ঐ
দেবেশ রায়	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর্বান্তর।	ঐ
পবিত্র মুখোপাধ্যায়	'জননী'র একটি নিবিষ্ট পাঠ।	ঐ
পার্থপ্রতীম বন্দ্যোপাধ্যায়	চতুষ্কোণঃ একটি পূর্বাভাস একটি মধ্যান্তর।	ঐ
বিজিত কুমার দত্ত	শহরতলী - মানিক বন্দোপাধ্যায়ের পালাবদল।	ঐ
শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়	জননী-পূর্ণ বিবেচনা।	ঐ
শৈবাল মিত্র	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাদা চোখে।	ঐ
সরোজ দত্ত	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ অব্যাহত বা বিঘ্নিত ধারাবাহিকতা।	মার্চ, ১৯৯০
সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়	আলাপনী। হোসেন মিঞা প্রসঙ্গেঃ পুঃ মুঃ	মে-জুলাই, ১৯৮১
সরোজ মোহন মিত্র	দর্পন থেকে চিহ্ন।	এপ্রিল-জুন, ১৯৮৯
	।মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।	
সাধন চট্টোপাধ্যায়	হিংসা বা অহিংসাঃ মানুষের মুক্তি।	এপ্রিল-জুন, ১৯৮৯
সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র	পুতুল নাচের ইতিকথা, দিবারাত্রির কাব্য। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। পুঃ মুঃ	মে-জুলাই, ১৯৮৯
সৌরি ঘটক	হারানের নাতজামাই গল্পে সমাজ চেতনা।	এপ্রিল-জুন, ১৯৮৯
	।শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।	
অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়	শরৎ উপন্যাসের শিল্পরীতি।	জানুয়ারী-ফেব্রুঃ, ১৯৮৮

জীবনময় রায়	তরুণের বিদ্রোহ, স্বদেশ ও সাহিত্য : শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। পুঃ মুঃ।	মে-জুলাই, ১৯৮১
	। সতীনাথ ভাদুরী ।	
গুনময় মান্না	সতীনাথের জাগরী।	জানুয়ারী, ১৯৮৮
শীর্ষেন্দু চক্রবর্তী	ঢোঁড়াই চরিত মানস : সময় চেতনার চারিদিক।	জানুয়ারী, ১৯৮৪
	। সমরেশ বসু ।	
আফসার আমেদ	গ্রহণ বর্জনে সমরেশ বসু : পুঃ পঃ আঃপুঃ পার্থপ্রতীম বন্দ্যোপাধ্যায় : সমরেশ বসু — সময়ের চিহ্ন।	মার্চ, ১৯৯০
চিত্তরঞ্জন ঘোষ	বড নয়, ফাঁকি নয়।	জুলাই, ১৯৮৮
দেবব্রত মুখোপাধ্যায়	প্রসঙ্গ : সমরেশ বসু।	আগষ্ট-অক্টোবর, ১৯৮৮
বিজিত কুমার দত্ত	উপন্যাসের টানাপোড়েনে সমরেশ বসু।	সেপ্টেম্বর-নভেঃ, ১৯৮৫
ঐ	বি: টি. রোডের ধারে একটি ভাবনা	নভেম্বর, ১৯৮৪
ঐ	সমরেশ বসু : জোয়ান কোটাল মরা কোটাল।	জুলাই, ১৯৮৮
	। সাবিত্রী রায় ।	
অরুণা হালদার	সাবিত্রী রায় - রচনায় ও জীবন চর্যায়।	জানুয়ারী, ১৯৮৭
চিত্তরঞ্জন ঘোষ	সাবিত্রী রায়।	ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৬
মৈত্রেয়ী দেবী	কথা সাহিত্যিক সাবিত্রী রায় : একটি সমীক্ষা।	নভেম্বর, ১৯৯০
	।। বাংলাদেশী গল্প-উপন্যাস ও ঔপন্যাসিক ।।	
	। রিজিয়া রহমান ।	
রঞ্জন ধর	দায়বদ্ধ কথা সাহিত্যিক রিজিয়া রহমান।	আগষ্ট-অক্টোবর, ১৯৯০
	। সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ ।	
আফসার আমেদ	সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ : পুনর্বিবেচনা।	মার্চ, ১৯৮৬
	।। বিদেশী উপন্যাস আলোচনা ।।	
নাগিরিন, ইউ বি	প্রতিধ্বনী (রুশ)।	মার্চ, ১৯৯০
বিজিত কুমার দত্ত	অন্ধকার থেকে আলোয় : আফ্রিকার তিনটি উপন্যাস।	অক্টোবর, ১৯৮৪
খুলেয়ো, রামোন বিবেরো	একটি আদিবাসী বালকের মৃত্যু। অনুঃ দীপা চট্টোপাধ্যায়।	মে- ১৯৮৫
মার্কেস, গাব্রিয়েল গার্সিয়া	কর্ণেলকে কেউ কিছু লেখেনা।	নভেম্বর-ডিসেম্বর, ১৯৮৪

	। মার্কস গার্সিয়া ।	
মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	গার্সিয়া মার্কেসের শেষ উপন্যাস।	জুন-জুলাই, ১৯৮৩
মারক্যুজ, গাবিয়েল গার্সিয়া	অন্য আমি : অনু : অনিশ্চয় চক্রবর্তী।	মার্চ, ১৯৮৭
	। মিউশ, চেসোয়াভ ।	
ধীরেন্দ্র কর	চেসোয়াড মিউশের 'ইস্‌সা ভ্যালি' : প্রবাসীর শৈশব।	জুন-জুলাই, ১৯৮৩
	। শোলকভ ।	
দেবেশ রায়	শোলকভ।	জানুয়ারী, ১৯৮৪
	। বাংলা গদ্য - ইতিহাস ।	
উজ্জ্বল কুমার মজুমদার	বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের গতি প্রকৃতি (১৯৮০-৯০)	এপ্রিল-জুন, ১৯৯০
দেবেশ রায় (সঃ)	আঠার শতকের বাংলা গদ্য : নুতনতম প্রমাণ, চিঠির সংকলন।	মে-জুন, ১৯৮২
	।। ইতিহাস ।।	
	। ইতিহাস চর্চা।	
পার্থপ্রতীম বন্দোপাধ্যায়	পুস্তক পরিচয় : লুসিয়েন ফেব্রয়ের "এ নিউ কাইন্ড অফ্ হিস্ট্রি" বই এর আলোচনা।	ডিসেম্বর, ১৯৮১
বরুন দে	ইউরোপ কেন্দ্রীকতা ও তার বিকল্প।	আগষ্ট-অক্টোবর, ১৯৮৩
সুশোভন সরকার	টয়েনবির ইতিহাস : পুঃ পঃ আঃ পুঃ আর্নল্ড টয়েনবির' 'এ স্টাডি অফ্ হিস্ট্রি'।	জানুয়ারী-মার্চ, ১৯৮৩
	।। দেশ বিদেশের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন ।।	
	। এ্যাঙ্গোলা, নিকারাগুয়া, এলসালভাদার ।	
গৌতম চট্টোপাধ্যায়	বিপ্লবের নিরন্ত উৎস।	ফেব্রুয়ারী-এপ্রিল, ১৯৮৪
কুনাল চট্টোপাধ্যায়	বিপ্লব-প্রতিবিপ্লবের আবর্তে নিকারাগুয়া ও সংহতি আন্দোলন।	এপ্রিল, ১৯৮৬
	।। দক্ষিণ আফ্রিকা ।।	
গর্ডাইমার, নাদাইন	আশ্লেষা বেলায় ....।	ডিসেম্বর, ১৯৮২ এপ্রিল, ১৯৮৩
	।। ইউরোপ - ইতিহাস ।।	
সুশোভন সরকার	ইউরোপের ইতিহাস : পুঃ পঃ আঃ পুঃ এ হিস্ট্রি অফ ইউরোপ বই এইচ. এ এল ফিসার।	জানুয়ারী-মার্চ, ১৯৮৩
সুশোভন সরকার	ইউরোপীয় সভ্যতা। পুঃ পঃ আঃ পুঃ আয়ার, এডুয়ার : ইউরোপীয়ান সিভিলিজেশান ইটস অরিজিন এ্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট।	ঐ

সুশোভন সরকার	ইউরোপের গণতন্ত্র : পুঃ পঃ পুঃ মুঃ পুঃপুঃ ফ্রিডম অ্যান্ড আরগানিজেশন বাই বার্ট্রান্ড রাসেল ও অন্য দুটি বই।	জানুয়ারী-মার্চ, ১৯৮৩
ঐ	দেশ বিদেশ।	ঐ
	।। জার্মান ইতিহাস ।।	
ঐ	জার্মান গণতন্ত্র : পুঃ পঃ আঃ পুঃ রোজেনবার্গ এঃ এ হিস্ট্রি অফ্ দি জার্মান রিপাবলিক ক্লার্ক, আর. টি. দি ফল অফ দি জার্মান রিপাবলিক।	জানুয়ারী-মার্চ, ১৯৮৩
ঐ	জার্মানির দুরবস্থা।	ঐ
	।। স্পেন-ইতিহাস ।।	
ঐ	স্পেন ও ব্রিটিশ বৈদেশিক নীতি।	ঐ
ঐ	স্পেনের অন্তর্বিরোধ।	ঐ
	।। রাশিয়ার ইতিহাস ।।	
বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য্য	দেশকাল নিরপেক্ষ মহান অক্টোবর বিপ্লব।	নভেম্বর, ১৯৮৭
সুশোভন সরকার	রুশ বিপ্লবের ইতিবৃত্ত।	জানুয়ারী-মার্চ, ১৯৮৩
ঐ	রুশ বিপ্লবের পটভূমিকা	জানুয়ারী-মার্চ, ১৯৮৩
	।। এশিয়া - ইতিহাস ।।	
ঐ	এশিয়ার মুক্তি : পুঃ পঃ আঃ পুঃ রোমিও, জন : দি এশিয়ান সেঞ্চুরী : এ হিস্ট্রী অফ মর্ডান ন্যাশানিলিজম ইন এশিয়া।	ঐ
	।। ভিয়েতনাম - ইতিহাস ।।	
অজেরা সরকার	সমগ্রতার সাধনা : ভিয়েতনাম।	ফেব্রুয়ারী-এপ্রিল, ১৯৮৪
	।। চীন ইতিহাস ।।	
সুশোভন সরকার	চীন দেশের প্রগতি ও প্রতিক্রিয়া : পুঃ পঃ আঃ পুঃ মাও সেতুং লিখিত 'চাইনীস নিউ ডেমোক্রেসি ' ও অন্যান্য চার জনের লেখা বই।	জানুয়ারী-মার্চ, ১৯৮৩
	।। মাঞ্চুরিয়ান - ইতিহাস ।।	
ঐ	মাঞ্চু কুম্বো।	ঐ
	।। ভারত-ইতিহাস ।।	
ঐ	মার্কসের চোখে ভারতের ইতিহাস।	ঐ
	।। ভারত-ইতিহাস প্রাচীনযুগ ।।	
প্রণব চট্টোপাধ্যায়	হরপ্পীয় সভ্যতায় আমার প্রকৌশল।	এপ্রিল, ১৯৮১

	।আধুনিক যুগ।	
দামোদর ধর্মানন্দ কোসম্বী	ভারতে বুর্জোয়া শ্রেণীর ক্ষমতাপ্রাপ্তি : পুঃ পঃ অনুঃ তরুণ বসু। আঃ পুঃ নেহেরুর 'ডিসকভারি অব ইন্ডিয়া'।	নভেম্বর, ১৯৮৯
	।।ভারতের জাতীয় আন্দোলন।।	
নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত	নিম্নবর্গের বিদ্রোহ ও মধ্যবিত্তের নেতৃত্ব। পুঃ পঃ। আঃ পুঃ সুমিত সরকার : পপুলার মুভমেন্ট এ্যান্ড মিডল ক্লাস লিডারশিপ ইন লেট কলোনিয়াল ইন্ডিয়া।	ডিসেম্বর, ১৯৮৩
পার্থপ্রতিম বন্দোপাধ্যায়	জাতীয়তাবাদের শিকড় সন্ধান : পুঃ পঃ আঃ পুঃ রজত রায়ের : আরবান রুটস্ অব ইন্ডিয়ান ন্যাশানালিজম।	মার্চ, ১৯৮১
	।।বাংলা-ইতিহাস।।	
তরুণদেব ভট্টাচার্য	রায়পুরের দুর্জন সিংহ।	ঐ
নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত	চোয়াড় বিদ্রোহ।	জুলাই-সেপ্টেম্বর, ১৯৮২
	।।বাংলা রেনেসাঁস।।	
অভ্র ঘোষ	রেনেসাঁস জিজ্ঞাসা : পুঃ পঃ আঃপুঃ অরবিন্দ পোদ্দার : রেনেসাঁস ও সমাজ মানস।	জুন-জুলাই, ১৯৮৪
	।।বাংলা-ইতিহাস বিপ্লবী যুগ।।	
ঈশিতা চট্টোপাধ্যায়	ব্রহ্মবান্ধব—হোম ও আহুতি।	এপ্রিল, জুন, ১৯৯০
রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য	ব্রহ্মবান্ধবের প্রায়শ্চিত্ত।	আগস্ট-অক্টোবর, ১৯৮৮
কমলা মুখোপাধ্যায়	অগ্নিকন্যা বীনা দাস	ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৭
চিন্মোহন সেহানবিশ	চার প্রাচীন বিপ্লবী	মে-জুন, ১৯৮৮
সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়	ক্ষুদিরাম-কানাইলাল : সেদিনের চোখে।	ডিসেম্বর, ১৯৮৯
	।।বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলন।।	
	।দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগ।	
গৌতম চট্টোপাধ্যায়	গুলিবেঁধা বুকে, উদ্ধত তবু মাথা।	ডিসেম্বর, ১৯৮৭
প্রবীর কুমার সাহা	সংগ্রামের দিন ১৯৪৬ : রশীদ আলী দিবস।	জানুয়ারী, ১৯৯০
	।বাংলার কৃষক আন্দোলন।	
তারাপদ সাঁতরা	এক ঐতিহাসিক কৃষক সম্মেলন।	আগস্ট-অক্টোবর, ১৯৮৭
রণজিৎ দাশগুপ্ত	কৃষক ও রাজনীতি : জলপাইগুড়ি।	নভেম্বর, ১৯৮৩
সুনীল সেন	তেভাগার লড়াই : সংকলন ও সম্পাদনা সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়।	মার্চ, ১৯৮৯

। বাংলার কমিউনিষ্ট আন্দোলন ।

অমিতাভ চন্দ্র	দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও কমিউনিস্ট পার্টি: ১৯৩১-১৯৪৫	নভেম্বর, ১৯৯০
ঐ	যশোর খুলনা যুবসংঘ : জাতীয় বিপ্লববাদ থেকে কমিউনিজমে উত্তরন।	ফেব্রুয়ারী, ১৯৯০
বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য্য	ফ্যাসিবাদ বিরোধী সংগ্রামের ঐতিহ্য পুঃ পঃ আঃ পুঃ সুস্নাত দাস : ফ্যাসিবাদ বিরোধী সংগ্রামে অবিভক্ত বাংলো।	জানুয়ারী, ১৯৯০
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	বক্সা ক্যাম্পে শিল্পী সাহিত্যিক : পুঃ মুঃ	মে-জুলাই, ১৯৮১
সৌরি ঘটক	স্বপ্ন টুকু বেঁচে থাক।	ফেব্রুয়ারী, মার্চ, জুন নভেম্বর, ডিসেম্বর, ১৯৮৭ ফেব্রুয়ারী, মার্চ, এপ্রিল, ১৯৮৮

। কলিকাতা - স্থানিক ইতিহাস।

অমরেন্দ্র প্রসাদ মিত্র	ভারতের শহর কলকাতা।	মার্চ, ১৯৮২
দেবেশ রায়	পুস্তক পরিচয় : রাধারমন মিত্রের কলকাতা দর্পণ।	ডিসেম্বর, ১৯৮১
হীরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়	আবার কলকাতা নিয়ে	আগষ্ট-অক্টোবর, ১৯৮১

। দিনাজপুর-স্থানিক ইতিহাস ।

ধনঞ্জয় রায়	স্থানীয় ইতিহাস : দিনাজপুরের রাজবংশী সমাজে সংস্কার আন্দোলন।	আগষ্ট, ১৯৮৫

। দিল্লী - স্থানিক ইতিহাস ।

কমলা মুখোপাধ্যায়	দিল্লীর স্বাধীনতা সংগ্রাম : পুঃ পঃ আঃ পুঃ সঙ্গত সিং : দিল্লী ইন দি ফ্রীডম স্ট্রাগল। ১৮৫৮-১৯১৯।	নভেম্বর, ১৯৮২
শ্যামলেন্দু সেনগুপ্ত	পুস্তক পরিচয় : নারায়নী দাশগুপ্তের দিল্লী বিটুইন টু এম্পায়ারস্, ১৮০৩-১৯৩১	ঐ

। মহিষ বাথান - স্থানিক ইতিহাস ।

হিতেশ রঞ্জন সান্যাল	স্বাধীনতা সংগ্রামের স্থানিক মাত্রা : মহিষবাথানের দৃষ্টান্ত।	আগষ্ট-অক্টোবর, ১৯৮৩

। বাংলাদেশ - ইতিহাস ।

অরূপ পাইন	একই মাটি জল একই নিলাকাশ।	এপ্রিল, ১৯৮৮
মুনতাসীর মামুন	১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ : ঢাকায়।	জুলাই-সেপ্টেম্বর, ১৯৮২
সালাহউদ্দীন আহমদ	উনিশ শতকে বাংলাদেশ: মুসলীম মানসে রেনেসাঁ ভাবনা।	নভেম্বর, ১৯৮৮

হাসান মামুন	একুশে উদ্‌যাপনের ইতিহাস।	ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৬
	।। জীবনী ।।	
	। মানবতাবাদী ।	
	। পিয়ার্সন, উইলিয়ম উইনস্টানলী।	
প্রশান্ত কুমার দাশগুপ্ত	'আমার একমাত্র ভালোবাসা ভারতবর্ষ : পুঃ পঃ আঃ পুঃ প্রণতি মুখোপাধ্যায় : উইলিয়ম উইনস্ট্যানলি পিয়ারসন।	জুন-জুলাই ১৯৮৪
	। মোর, টমাস ।	
সুশোভন সরকার	টমাস মোর। পুঃ পঃ আঃ পুঃ আর. ডব্লিউ. চেম্বারস এর টমাস মোর।	জানুয়ারী-মার্চ, ১৯৮৩
	।। বাঙালী মণীষী, সমাজ সংস্কারক ।।	
	। আব্দুল হোসেন।	
ধূর্যটি প্রসাদ দে	বাংলার চিন্তানায়ক আবুল হোসেন ও মুসলিম সংস্কৃতি।	ডিসেম্বর, ১৯৮২
	। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।	
দেবেশ রায়	দিক চিহ্নের মায়া ? পুঃ পঃ আঃ পুঃ আশোক সেন : ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর এ্যান্ড হিজ এলুসিভ মাইনস্টোন	মার্চ, ১৯৮২
	। রামমোহন রায় ।	
অরুণকুমার রায়চৌধুরী	উনিশ শতকীয় : পুঃ পঃ আঃ পুঃ প্রদীপ রায় : রামমোহন রায়, একটি ঐতিহাসিক জিজ্ঞাসা।	নভেম্বর, ১৯৮২
ক্ষিতীশ রায়	চিরস্মরণীয় রামমোহনঃ পুঃ পঃ আঃ পুঃ রামমোহন স্মরণ : শতবার্ষিকী সংকলন।	নভেম্বর, ১৯৮৯
	। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।	
দেবদাস জোয়ারদার	সত্যেন্দ্রনাথ : জীবন ও সৃষ্টি : পুঃ পঃ আঃ পুঃ অমিতা ভট্টাচার্য্য : সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর : জীবনও সৃষ্টি।	এপ্রিল-মে, ১৯৮৭
	।। স্বাধীনতা সংগ্রামী।।	
	। বিনয় কুমার সরকার ।	
অভ্র ঘোষ	বিনয় কুমার সরকারের একটি প্রামানিক জীবনী : পুঃ পঃ আঃ পুঃ প্রমথ নাথ পাল : মহা মণীষী বিনয় কুমার সরকার।	ডিসেম্বর, ১৯৮৪
হিমাচল চক্রবর্ত্তী	বিনয় কুমার সরকারের রাজনৈতিক চিন্তা।	জানুয়ারী, ১৯৮৭
	।।ভূপেন্দ্রনাথদত্ত।।	
রবীন্দ্রসমাজদার	ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত : জীবন ও স্মৃতি, ১৮৮০-১৯৬২	মার্চ, ১৯৮১

।। মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবি ।।

। অনিল কাঞ্জিলাল ।

ধনঞ্জয় দাশ	অনিল কাঞ্জিলাল স্মরণে।	জুলাই, ১৯৮৬

। চিন্মোহন সেহানবিশ।

অনুরাধা রায়	চিনুদা।	মে-জুন, ১৯৮৮
অবনী লাহিড়ী	করাবাসে তিন বছর।	ঐ
অমলেন্দু সেনগুপ্ত	চিন্মোহন সেহানবিশ : ইতিহাসের আলো আঁধারে।	ঐ
গৌতম চট্টোপাধ্যায়	চিনুদা।	জুন, ১৯৮৭
ঐ	মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে অসামান্য রূপকার।	মে-জুন, ১৯৮৮
গোলাম কুদ্দুস	চিনুদার বাড়ীতে এক রাত্রি।	ঐ
দেবেশ রায়	আত্মজীবনীর গোপন পাঠ।	ঐ
বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য্য	বৈশাখের দাবদাহ থেকে আষাঢ়ের অকৃপণ দাক্ষিন্য।	ঐ
ভানুদেব দত্ত	অপুরণীয় ক্ষতি।	ঐ
বমেন্দ্র নাথ মিত্র	চিন্মোহন : ছেলেবেলার স্মৃতি।	ঐ
সিদ্ধেশ্বর সেন	চিনুদা ও প্রগতির কাল।	ঐ

। গোপাল হালদার।

গোপাল হালদার	রূপনারায়ণের কূলে।	জুলাই-সেপ্টেম্বর ,নভেঃ, ১৯৮২ এপ্রিল, আগষ্ট, অক্টোবর ১৯৮৩ জানুয়ারী, ডিসেম্বর, ১৯৮৪ ফেব্রুয়ারী, সেপ্টেঃ নভেঃ ১৯৮৫
দেবীপদ ভট্টাচার্য্য	গোপাল হালদার পঁচাশি পেরোলেন	ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৭
বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য্য	গোপাল হালদারের রবীন্দ্র ভাবনা	আগষ্ট-অক্টোবর, ১৯৯০

। রাধারমন মিত্র ।

রাধারমন মিত্র	মহাত্মা গান্ধী, শবরমতী আশ্রম ও আমি অনু : মঞ্জু চট্টোপাধ্যায়।	আগষ্ট-অক্টোবর, ১৯৮৬

। লুকাচ, গেয়র্গ।

সিদ্ধার্থ রায়	লুকাচের আত্মজীবনী : পুঃ পঃ আঃ পুঃ লুকাচ, গেয়র্গ : রেকর্ড অফ লাইফ।	জুন-জুলাই, ১৯৮৪

	। সুশোভন সরকার ।	
গোপাল হালদার	অধ্যাপক সুশোভন সরকার ঃ ভূমিকা।	জানুয়ারী-মার্চ, ১৯৮৩
	সুশোভন সরকার স্মরণ সংখ্যা।	
	।। সাম্যবাদী নেতা ও কর্মী ।।	
	। চন্দ্রশেখর ভট্টাচার্য্য ।	
ঈশিতা চট্টোপাধ্যায়	স্মরণীয় মানুষ ঃ বিস্মৃত নাম — চন্দ্রশেখর ভট্টাচার্য্য	আগষ্ট-অক্টোবর, ১৯৯০
	।। কমিউনিষ্ট নেতা ও কর্মী ।।	
	। ধরণী গোস্বামী ।	
রনেন সেন	বিপ্লবী কমরেড ধরণী গোস্বামী স্মরণে।	ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৮
	। মণি সিংহ ।	
রঞ্জন ধর	চল্লিশের দশকের একজন কর্মির চোখে মণি সিংহ।	ডিসেম্বর, ১৯৯০
	। সত্যেন সেন ।	
প্রতিভা সেন	সত্যেন ও আমরা।	মে, ১৯৮৪
	।। সোমনাথ লাহিড়ী ।।	
অমলেন্দু সেনগুপ্ত	সোমনাথ লাহিড়ীর সঙ্গে।	আগষ্ট-অক্টোবর, ১৯৮৮
সোমনাথ লাহিড়ী	আত্মজীবনীর খসড়া।	ডিসেম্বর, ১৯৮৪
	। সোমেন চন্দ ।	
কৃষ্ণ ধর	সোমেন চন্দ ঃ এক শিল্পীর জীবন ও সংগ্রাম	জানুয়ারী, ১৯৮৭
	। হাজরা বেগম ।	
সত্যেন সেন	হাজরা বেগম।	জানুয়ারী-ফেব্রুঃ, ১৯৮১
	।। ভাষাতত্ত্ববিদ ।।	
	। মহম্মদ শহীদউল্লাহ ।	
আজাহারউদ্দিন খান	আচার্য শহীদুল্লাহ।	সেপ্টেম্বর-নভেঃ, ১৯৮৫
	। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ।	
গোপাল হালদার ও দেবেশ রায়	সুনীতিকুমার সম্পর্কিত বিতর্কের উত্তর ঃ পাঠক গোষ্ঠী।	অক্টোবর, ১৯৮২
	আরও দেখুন --	
	জগন্নাথ ঘোষ লিখিত "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আলোচনার অধীন" রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সুনীতি কুমার।	জানুয়ারী, ১৯৯০
	।। বৈজ্ঞানিক ।।	
	। আইনস্টাইন ।	
সত্যেন্দ্রনাথ বসু	অ্যালবার্ট আইনস্টাইনঃ পুঃ মুঃ।	মে-জুলাই, ১৯৮১

। মেঘনাথ সাহা ।

চিন্মোহন সেহানবিশ	মেঘনাথ সাহা।	মে-জুন, ১৯৮৮

।। শিল্পী ।।

। চিত্তপ্রসাদ ।

চিত্ত প্রসাদ	চিত্তপ্রসাদের চিঠি : সংকলন।	আগষ্ট-অক্টোবর, ১৯৮১

।। ভারত তত্ত্ববিদ ।।

। মোড়ে, আইনৎস্।

অনিমেষ কান্তি পাল	আইনৎস্ মোড়ে।	জুলাই, ১৯৮৮

। হেস্টিংস, ওয়ারেন ।

তাপস কুমার গঙ্গোপাধ্যায়	ভারতে প্রাচ্যবিদ্যার পৃষ্ঠপোষকতা—ওয়ারেন হেস্টিংস।	

।। ইতিহাসবিদ ।।

শিশির মজুমদার	শতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি : নলিনী কান্ত ভট্টশালী।	ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৯

।। পুরাতত্ত্ববিদ ।।

। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ।

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়	রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ।	এপ্রিল, ১৯৮২

।। রবীন্দ্রচর্চা ।।

অমরেশ দাস	তীর্থের সঞ্চয়।	ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৭
অমিত বন্দ্যোপাধ্যায়	রবীন্দ্রনাথ ও নরেশচন্দ্রের সহিত্য বির্তক	মার্চ, ১৯৮২
অরুণ সেন	রাবীন্দ্রিক উত্তরাধিকার : শঙ্খ ঘোষের "নির্মাণ আর সৃষ্টি" বই-এর উপর আলোচনা।	সমালোচনা সং জুন-জুলাই, ১৯৮৪
অরুণা হালদার	উৎস সন্ধানে : পুস্তক পরিচয় : কেতকী কুশারী ডাইসনের "রবীন্দ্রনাথ ও ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর সন্ধানে" গ্রন্থের আলোচনা।	জুলাই, ১৯৮৭
উদয়ন ঘোষ	পাড়ায় পাড়ায় ক্ষেপিয়ে বেড়ায়।	মে-জুন, ১৯৮৬
জগন্নাথ ঘোষ	রবীন্দ্রনাথ ও সুনীতি কুমার	জানুয়ারী, ১৯৯০
জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়	রবীন্দ্রনাথের চিন্তাভাবনায় শিশু কিশোর।	মে-জুন, ১৯৮৬
দেবদাস জোয়ারদার	একটি প্রত্ন প্রতিমার ব্যবহারে ইতিহাস: রবীন্দ্রনাথ ও আকবর	মে, ১৯৮৫
পবিত্রকুমার সরকার	সাময়িকপত্র সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ ও সাংবাদিকতা।	মে-জুন, ১৯৮৬

পূর্ণেন্দু পত্রী	রবীন্দ্রনাথ,নাররবীন্দ্রনাথ।	মে, ১৯৮৫
প্রশান্ত কুমার দাশগুপ্ত	রবীন্দ্রকাব্য আস্বাদনের নূতন পথ : পুস্তক পরিচয়।	এপ্রিল-মে, ১৯৮৭
বিজিত কুমার দত্ত	রবীন্দ্ররচনার অনুবাদ চর্চা : রবীন্দ্রনাথ এবং অজিত চক্রবর্তী।	ডিসেম্বর, ১৯৮৩
রাম বসু	বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি — সে আমার নয়।	মে-জুন, ১৯৮৬
শকুন্তলা দেবী	রবীন্দ্রনাথের প্রতি; জীবনানন্দ ও বুদ্ধদেব।	মে-জুন, ১৯৮৬
সমীর রায় চৌধুরী	রবীন্দ্রনাথ : হেমেন্দ্র প্রসাদের চোখে	এপ্রিল, ১৯৮৩
সরোজ বন্দোপাধ্যায়	আঁধার রাতে একলা পাগল।	আগষ্ট-অক্টোবর, ১৯৮৬
সিদ্ধার্থ রায়	রবীন্দ্রনাথ : প্রকাশনা ও বিক্রয়।	মে-জুন, ১৯৮৩
সুশোভন সরকার	রবীন্দ্রনাথ ও অগ্রগতি।	জানুয়ারী-মার্চ, ১৯৮৩
হীরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়	কোনখানে রাখবো প্রণাম।	মে, জুন, ১৯৮৬

। রবীন্দ্র দর্শন ।

গুনময় মান্না	রবীন্দ্ররচনার দর্শনভূমি।	নভেম্বর, ১৯৮৯ জানুয়ারী-জুলাই, ১৯৯০
দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	রবীন্দ্রনাথ ও ভারতের দার্শনিক ঐতিহ্য।	আগষ্ট-অক্টোবর, ১৯৮৬
ভবতোষ দত্ত	পুস্তক পরিচয় : আঃ পুঃ সত্যেন্দ্রনাথ রায়ের লেখা রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাসের জগৎ।	ডিসেম্বর, ১৯৮১

।। রবীন্দ্রনাথের সমাজচিন্তা ।।

সুধীরকুমার করণ	গ্রামজীবন : লোকসংস্কৃতি ও রবীন্দ্রনাথ।	মে-জুন, ১৯৮৬

। রবীন্দ্রনাথের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চিন্তা ।

অভ্র ঘোষ	জীবেন্দ্র রায়ের লেখা "রবীন্দ্রনাথের ভারতবর্ষ": পুস্তক পরিচয়।	নভেম্বর,১৯৮৬
আশীষ মজুমদার	রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বচৈতন্য : পুস্তক পরিচয়। চিন্মোহন সেহানবীশের "রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিক চিন্তা" বই-এর আলোচনা।	আগষ্ট-অক্টোবর, ১৯৮৪
গোপাল হালদার	হিজলীবন্দী শিবিরে পুলিশের তান্ডব ও রবীন্দ্রনাথ : সাক্ষাৎকার,গ্রাহক গৌতম চট্টোপাধ্যায়।	মে-জুন, ১৯৮৬
চিন্মোহন সেহানবীশ	রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব।	জুলাই-সেপ্টেম্বর, ১৯৮২
পার্থপ্রতিম	রবীন্দ্রনাথ ও বিপ্লবী সমাজ : পুঃ পঃ	এপ্রিল-মে, ১৯৮৭

বন্দোপাধ্যায়	চিন্মোহন সেহানবীশের লেখা। "রবীন্দ্রনাথও বিপ্লবী সমাজ" এর আলোচনা।	
রণেন বসু	স্বাদেশিক রবীন্দ্রনাথ। পুঃ পঃ। শ্রীমন্ত কুমার জানা রচিত "রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচিন্তা" বইএর আলোচনা।	জুলাই, ১৯৮৬
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	সৃষ্টির আত্মগ্লানি। পুঃ মুঃ (পরিচয়ে প্রকাশিত রচনার সংকলন, ১৯৩১-১৯৮১)	মে-জুন, ১৯৮১

।। রবীন্দ্রনাথের ভাষাতত্ত্ব ।।

পবিত্র সরকার	রবীন্দ্রনাথ ও বাংলাভাষার ব্যাকরণ; চিন্তা ও চর্চা।	আগস্ট-অক্টোবর, ১৯৮৭
বীকন্তা, ইগিয়েনিয়া মিহাইলোচনা	ভাষাতত্ত্ববিদ রবীন্দ্রনাথ; অনুঃ প্রদীপ বক্সী।	জুন, ১৯৮৭

।। রবীন্দ্রনাথ চিত্রকলা ।।

জ্ঞানেন্দ্র নাথ জানা	রবীন্দ্র চিত্রভাবনার স্বরূপ সন্ধানে।	এপ্রিল, ১৯৮৮
শোভন সোম	রীবন্দ্র চিত্রকলার পরিপ্রেক্ষিত।	মে-জুন, ১৯৮৬
সিদ্ধেশ্বর সেন	আর আছে আমার ছবি।	জুলাই, ১৯৮৬
সোমনাথ হোর	রবীন্দ্রনাথের ছবি : সাক্ষাৎকার।	মে-জুন, ১৯৮১

।। রবীন্দ্র সংগীত ।।

অজিত কুমার চক্রবর্তী	"তুমি কোন ভাঙনের পথে এলে।"	নভেম্বর, ১৯৮৬
অনন্ত কুমার চক্রবর্তী	রবীন্দ্রনাথের গানে অধুনিকতা।	মে-জুন, ১৯৮৬
ওয়াহিদুল হক	রবীন্দ্র সংগীতের অনুশীলন, অধ্যাপনা ও মুক্তি।	মে-জুন, ১৯৮১
সনজীদা খাতুন	"তবু মনে রেখো"- আশ্রয়ের সন্ধানে।	মে-জুন, ১৯৮৬
সমীর দাসগুপ্ত	'পূর্ব রাগ পাবেনা ক্লান্তি'।	ঐ

। রবীন্দ্র সংগীত ।

সরোজ বন্দোপাধ্যায়	গনের ভাষার আড়াল।	জুলাই-সেপ্টেম্বর, ১৯৮২
ঐ	"তুমি কেমন করে গান কর হে গুণী" পুস্তক পরিচয়। আঃ পুঃ অনন্ত চক্রবর্তী 'সে অগ্নিতে দীপ্ত গীতে'।	মে, ১৯৮৫
সাধন দাশগুপ্ত	আবহ সৃষ্টিতে রবীন্দ্রসংগীতের ভূমিকা।	মে-জুন, ১৯৮৬
সুভাষ ভট্টাচার্য্য	সৃষ্টি করি স্বপ্নের ভুবন।	ঐ

।রবীন্দ্র চলচ্চিত্র ভবনা।

তপন কুমার ঘোষ	রূপের সজ্জিত অভিমান : রবীন্দ্রনাথের চলচ্চিত্র।	মে-জুন, ১৯৮৬

।রবীন্দ্রকাব্য।

দেবদাস জোয়ারদার	রবীন্দ্রনাথ থেকে সুধীন্দ্রনাথ : কবিতায় গ্রহণ বর্জন।	এপ্রিল, ১৯৮৩
পূর্ণেন্দু পত্রী	কথার ছবি, ছবির নেপথ্যে : সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলো আঁধারের সেতু রবীন্দ্র চিত্র কল্পনা বই এর সমালোচনা।	জুন-জুলাই, ১৯৮৪
জীবেন্দ্রনাথ রক্ষিত	শব্দ বিপর্যাস চর্যা।	মে-জুন, ১৯৮৬

। রবীন্দ্র নাটক ।

কার্ত্তিক লাহিড়ী	রথযাত্রা; একটি জননাটিকা।	ঐ
কুমার রায়	'সাদা মোটা গোছের চেহারা, ওজনে ভারী'।	মে-জুন, ১৯৮৬
চিত্তরঞ্জন ঘোষ	নাটকীয়।	মে-জুন, ১৯৮৬
সুপ্রিয় ভট্টাচার্য্য	আর এক মুক্তির রক্তকরবী।	জুলাই, ১৯৮৬
সৌমিত্র বসু	আমার হাতের প্রথম নাটক।	এপ্রিল, ১৯৮৩

। রবীন্দ্র গল্প উপন্যাস ।

তপোব্রত ঘোষ	গল্পগুচ্ছের নিশীথে।	মে-জুন, ১৯৮৬
পার্থ প্রতীম বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯১৪-র একটি গল্প হালদার গোষ্ঠী।	আগষ্ট-অক্টোবর,১৯৮১
পূর্ণেন্দু পত্রী	চতুরঙ্গ, নতুন আলোয়।	ডিসেম্বর, ১৯৮৫
বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য্য	ছায়া দীর্ঘতর হয়। রবীন্দ্র উপন্যাস 'ঘরে-বাইরের' আলোচনা।	মে-জুন, ১৯৮৬
রূশতী সেন	কোথায় স্বর্গের রাস্তা। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প আলোচনা।	ডিসেম্বর, ১৯৮১

। রবীন্দ্রজীবনী ।

অচিন্ত্য ভট্টাচার্য্য	রবীন্দ্রনাথের জীবন কথা : পুস্তক পরিচয়। প্রশান্ত কুমার পালের 'রবিজীবনী' ১ম খন্ড বই এর আলোচনা।	জানুয়ারী, ১৯৮৪
অরুণকুমার রায় চৌধুরী	কবি : তাঁর নিঃস্ব প্রহর।	ডিসেম্বর, ১৯৮২
পূর্ণেন্দু পত্রী	রবীন্দ্রনাথ : রক্তহীন স্মৃতি।	জুলাই-সেপ্টেম্বর, ১৯৮২
বার্ণাল, জেডি	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। অনুবাদ : শুভ বসু	মে-জুন, ১৯৮৬
বিষ্ণু দে	"রবীন্দ্রনাথের জীবন ও রচনার ভাষ্য, পুস্তক পরিচয়। নীহার রঞ্জন রায়ের ইংরেজিতে লেখা 'এ্যান আর্টিষ্ট ইন্ লাইফ্' গ্রন্থের সমালোচনা।	মে, ১৯৮৫

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	'জনগণ মন অধিনায়ক' সঙ্গীত প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ, পুলিন বিহারী সেনকে লেখা চিঠি।	মে-জুন, ১৯৮৬
রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য	যাবার দিনে এই কথাটি — উইলফ্রেড ওয়েন এর জীবন সম্ভাষ রবীন্দ্রনাথ।	মে-জুন, ১৯৮৬
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত	রবীন্দ্রনাথ : পুস্তক পরিচয়। পরিচয়ে রবীন্দ্রনাথের শোক লেখন। (পরিচয়ে প্রকাশিত বচনার সংকলন, ১৯৩১-৮১)	

।। শান্তিনিকেতন -ইতিহাস ।।

বুদ্ধদেব আচার্য	মহর্ষির শান্তিনিকেতন ও শ্রীকণ্ঠ সিংহ।	এপ্রিল, ১৯৮৩

সন্ধ্যা দে

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে

প্রশ্ন : নাটকে অভিনয় করবার প্রেরণা আপনি কার কাছে পেয়েছেন?

উত্তর : ছোটবেলা থেকেই অভিনয়ের সঙ্গে সম্পর্ক আমার গড়ে উঠেছে। আসলে তখন থেকেই এ সব কাজগুলো করছি। আমাদের বাড়ীতে গানবাজনা, নাটক প্রভৃতি চর্চা ছিল—সেখান থেকেই মুলতঃ নাটক করবার প্রেরণা আমি পাই। বাড়ীতে প্রায়ই পর্দা টাঙিয়ে অভিনয় করতাম এবং তা বাড়ীর প্রত্যেকের ভালবাসায়, উৎসাহে। এ ছাড়া মূলজীবনে সরস্বতী পূজো এবং দুর্গা পূজোতেও বছরে দু'তিন বার অভিনয়ে অংশগ্রহণ কববার সুযোগ আমি পেয়েছি। ছোটবেলাতেই অভিনয়ের জন্য আমি মেডেল পেয়েছি যখন মাত্র ক্লাস ফাইভে পড়ি কৃষ্ণনগরে সি.এম.এস. সেন্ট জন্স স্কুলে। এরপর থেকেই নাটক বা অভিনয় করাটা আমার নেশায় পরিণত হয়ে উঠল। আমারও জীবনে স্থান পরির্বতন ঘটল। এলাম কৃষ্ণনগর থেকে হাওড়ায়। হাওড়ায় এসে নাটকের দল তৈরী হল, অভিনয় করতে লাগলাম পাড়ার অনুষ্ঠানেই। এ সময় সাধারণত ঐতিহাসিক নাটকই বেশী হতো। তবে মাঝে মাঝে সামাজিক নাটকও হয়েছে। 'মহারাজা নন্দকুমার'-এ ক্লেভারিং, 'টিপু সুলতান'-এ মহাশিয়েলাজি, 'প্রতাপাদিত্য'-তে প্রতাপ চরিত্রে আমি অভিনয় করেছি। এভাবে দিন এগিয়ে চলার সাথে সাথেই আমার অভিনয়ের নেশা পাকাপাকি দানা বেঁধে উঠতে লাগল আমার সত্ত্বায়, আমার চেতনায়, আমার মনে। এরপর শুরু হল আমার কলেজ জীবন। এলাম কলকাতায়। ১৯৫১-তে মির্জাপুর স্ট্রিটে আমার বাড়ীতে। আর এখানে থেকেই যথার্থ শুরু হল আমার অভিনয় করার পালা। কলকাতার থিয়েটার চিনলাম এবং সেই সঙ্গে দেখলাম নাট্যগুরু শিশির ভাদুড়ীকে। তাঁর অভিনয় দেখে মুগ্ধ হলাম এবং বি.এ. ক্লাসের যখন আমি ছাত্র তখনই স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি যে, অভিনয়ই হবে আমার জীবনে মূলমন্ত্র। ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয় শিশির ভাদুড়ীর সঙ্গে আমার, যখন তাঁর থিয়েটার উঠে যাচ্ছে এবং আমি এম.এ. ক্লাসের ছাত্র। তবু ঐ সময়ই ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে পড়ি অভিনয় জীবনে। তাই শিশিরবাবুর কাছে যে প্রেরণা পেয়েছি, পরবর্তী জীবনে তা বহুভাবে প্রভাবিত হয়ে চলেছে আমার জীবনে।

প্রশ্ন : বাংলা সাহিত্যের কৃতী ছাত্র হয়েও শেষ পর্যন্ত লেখাপড়া স্থগিত করে আপনি অভিনয়ে এলেন কেন?

উত্তর : আমি শুরুতেই বলেছি আমাদের বাড়ির পরিবেশই ছিল সংস্কৃতি চর্চার উপযুক্ত স্থান। তাই শৈশব থেকেই লেখা এবং অভিনয়-এ দুয়ের প্রেরণা আমি আমার সত্ত্বায় অনুভব করে চলেছি। শিল্প-সাহিত্যের চর্চা তো বাড়িতেই ছিল, তাই তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আর্কষণও ঘটেছিল ছোটবেলাতেই। কবিতা লিখতে শুরু করেছি বেশিরভাগ বাঙালির ছেলে যে সময়ে সংস্কৃতিতে প্রভাবিত হয়, স্কুলেই ক্লাস টেনে যখন পড়ি। লেখা, আবৃত্তি

এগুলো ছিল আমার সাহিত্য চর্চার অন্যতম দিক। আব অভিনয়ের নেশা আমাকে পেয়ে বসেছে জীবনের গোড়াতেই। অভিনয়কে ভালবেসেছি, অভিনয়ের ভালবাসা ও সাহিত্যের ভালবাসা পাশাপাশি একই সঙ্গে গড়ে উঠেছিল। তাই কলেজ জীবনে এসে পুরোপুরি নিজেকে নিয়োজিত করলাম অভিনয়ের সঙ্গে। নাটকে অভিনয় করতে গিয়েই লেখাটা অবহেলিত হয়েছে অনেক সময়, এমন কি বন্ধ থেকেছে। কিন্তু এটা সত্য যে, আমার সাহিত্যকে ভালবাসা আর নাটককে ভালবাসা-এ দুটোর মধ্যে গাঢ়তর যোগসূত্র রয়েছে, এ দুটোকে পৃথক করে কখনো ভাবতে পারিনি। বাংলা নিয়ে বি.এ. পড়েছি এবং এম.এ.-ও পড়েছি, এটা তো সাহিত্যেরই অংশ। সেই সাহিত্যের মাটিতে দাঁড়িয়েই আমি থিয়েটার দেখেছি, সাহিত্যের থেকে আলাদা বা বিচ্ছিন্নভাবে কখনো বুঝতে বা দেখতে শিখিনি। কলেজ জীবনে ভীষণভাবে নাট্যপ্রেমী ছিলাম। শুধু তাই নয়, নিজস্ব নাট্যগোষ্ঠীও ছিল। অভিনয়ের প্রেরণা, শিক্ষা এবং উৎসাহ এ সবই আমি পেয়েছি শ্রদ্ধেয় শিশির ভাদুড়ী মহাশয়ের কাছ থেকেই। অভিনয়েব জগতে যখন পুরোপুরি নিজেকে সঁপে দিলাম এবং চলচ্চিত্র জগতে যখন প্রবেশ করলাম অভিনেতা হিসেবে তখনই, ছেড়ে দিলাম 'অল ইন্ডিয়া রেডিও'র সরকারী চাকরী। সত্যজিৎবাবু আমাকে চাকরী ছাড়ার আগে একটু ভেবে দেখতে বলেছিলেন—কিন্তু নিজেকে পুরোপুরি অভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত করব বলে এবং সম্পূর্ণ মনোযোগ অভিনয়ে দেব বলেই চাকরী ছেড়েছিলাম।

প্রশ্ন : শিশির ভাদুড়ীকে আপনি সার্বিক নাট্যব্যক্তিত্ব হিসেবে কোথায় স্থান দেন? তাঁর কাছে আপনার কি নাট্যশিক্ষার প্রকৃত সুযোগ হয়েছিল?

উত্তর : শিশির ভাদুড়ী মহাশয় ছিলেন আমার আইডল। বস্তুতঃ আমার পরিণত অভিনয় জীবনের সূচনাই হয়েছিল শিশিব ভাদুড়ীর অভিনয় দেখে এবং তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে। শিশির ভাদুড়ী ছিলেন আমার অভিনয় জীবনের প্রেরণা এবং তাঁর উৎসাহে আমি বিশেষ ভাবে উৎসাহিত হয়েছি, অভিনয়ের শিক্ষালাভ করেছি তাঁর কাছ থেকেই, তাই শিশির ভাদুড়ীকে নাট্যব্যক্তিত্ব হিসাবে শ্রেষ্ঠত্বের স্থান আমি দিই। অবশ্যই দিই। শুধু আমার নন, উনি নাট্যজগতের সমস্ত মানুষের পথিকৃৎ। শিশির ভাদুড়ীর কাছে আমার নাট্য শিক্ষার দিক উন্মোচিত হয়েছিল, যদিও তার আগে ও পরে অন্যান্য বড় মাপের অভিনেতাব অভিনয় আমাকে আকৃষ্ট ও মুগ্ধ করেছে, অনুপ্রাণিত করেছে কিন্তু নাট্য প্রারম্ভে মঞ্চে অভিনয় করবার সফল চেষ্টা যখন চালিয়েছি মনে প্রাণে তখন শিশির ভাদুড়ী মহাশয়ই আমার প্রেরণাস্থল ছিলেন।

প্রশ্ন : নাটক ও চলচ্চিত্রের লোক হয়েও আপনি কবিতা লিখতে, কবিতা ও কাব্যনাট্য পাঠ করতে গভীরভাবে আগ্রহী। আপনার কি মনে হয় এতে আপনার নাট্যচর্চা সমৃদ্ধ হয়?

উত্তর : নাটক ও চলচ্চিত্রের লোক হয়েও আমি কবিতা লিখতে, কবিতা ও কাব্যনাট্য পাঠ করতে, আবৃত্তি করতে ভীষণভাবে আগ্রহী। আমি কবিতা আবৃত্তি করি বাড়ির পরিবেশেই একেবারে ছোট বেলাতে। আগেই বলেছি, সাহিত্য, সঙ্গীত, নাটক, আবৃত্তি প্রভৃতির চর্চা আমার শুরু হয়েছিল আমার বাড়িতেই যেখানে সংস্কৃতির একটা বিশেষ

পরিমন্ডল রচিত ছিল আর সেখান থেকেই এসবের বীজমন্ত্র আমার জীবনে অজান্তে ঢুকে পড়েছিল। তাই আমি মনে করি এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস নিজের মাতৃভাষাকে ভালবাসা খুবই জরুরী, তাকে সঠিকভাবে জানা, উচ্চারণভঙ্গী নিখুঁত ও সাবলীল হলে, বাচনভঙ্গীকে সুদৃঢ় করলে তবেই অভিনয়ের সফলতা আসে এবং মাধুর্য মন্ডিত হয়ে ওঠে। এমনিতেই আমাদের বাড়িতে ছোটবেলা থেকেই ছিল আবৃত্তির চর্চা। আর অভিনয়, আবৃত্তি একসঙ্গেই হত। আমার বাবা, দাদু প্রত্যেকেই ভাল আবৃত্তি করতেন। তাই আমি দৃঢ়ভাবেই বিশ্বাস করি যে, সাহিত্যচর্চা কবিতা লেখা, আবৃত্তি করা এগুলো নাট্যচর্চাকে সুন্দরভাবে লালিত করতে ও সমৃদ্ধ করতে পারে।

প্রশ্ন : চলচ্চিত্রে অভিনয়ের কাজে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও আপনি বারবার নাটকের কাছে ফিরে আসেন কেন?

উত্তর : ১৯৫৮ সালে পেশাদার অভিনেতা হিসাবে আমি সত্যজিৎবাবুর 'অপুর সংসার'-এ অভিনয় করি। অন্যভাবে বলতে গেলে চিত্রজগতে হঠাৎ এসে পড়ি। তবে চলচ্চিত্রে অভিনয় করব এরকম কোনও প্রবল ইচ্ছা আমার ছিল না। বরঞ্চ সিনেমা সম্বন্ধে একটা অনীহাই প্রকাশ করতাম বার বার। আমি বরাবরই থিয়েটার-পাগল। আমার নিজস্ব নাট্যগোষ্ঠীও ছিল। আর নাটকের গুরু হিসাবে তো শিশির ভাদুড়ী মহাশয় ছিলেন পথ প্রদর্শক। তবু সিনেমার প্রতি একদিন শ্রদ্ধা বাড়ল আমার সত্যজিৎবাবুর 'পথের পাঁচালী' দেখে। বছরে দু'চারটে ভাল সিনেমা করেই যে আমি থেমে থেকেছি তা নয়, নাটক করেছি এরই ফাঁকে ফাঁকে, নাটক নিয়ে ভেবেছি। শিশির ভাদুড়ীর অভিনয় আমার ভেতরে বিদ্যুতের শিহরণ এনে দিত।

প্রশ্ন : আপনি একসময় প্রগতিশীল ও বামপন্থী ছাত্র-আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। প্রগতিবাদী সাংস্কৃতিক চিন্তা আপনার নাট্য চেতনাকে কোন গভীরতর মাত্রা দিয়েছে কি?

উত্তর : হ্যাঁ, কলেজ জীবনে আমি সরাসরি বামপন্থী ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে ছিলাম নিজেকে। কিন্তু এর আগে আমি বলেছি যে শিল্প-চেতনাটা একেবারে শৈশবেই আমার বাড়িতে পরিবেশের মধ্যেই পেয়েছিলাম। ভাললাগা শুধু নয়, ভালবাসার গভীর সম্পর্কও গড়ে উঠতে শুরু করে নাটকের ক্ষেত্রে আমার। এককথায় নাট্যপ্রেমী নাটক পাগলও বলতে পারো। যে কোন শিল্পরই নিজস্ব ভাল লাগা তাঁর ব্যক্তিগত ধারণা, চেতনা এগুলো অতি সহজভাবেই তাঁর অভিনয়ের মধ্যে ফুটে ওঠে, তা প্রত্যক্ষ ভাবেই হোক বা পরোক্ষভাবেই হোক। অর্থাৎ ব্যক্তি মানুষটার সাথে অভিনেতা মানুষটার কোথাও একটা গাঢ় সংযোগ থাকে। তবে যৌবনের উন্মাদনা আর প্রৌঢত্বের সঞ্চয় তো এক বস্তু নয়।

প্রশ্ন : গত চার দশকের শ্রেষ্ঠ কয়েকজন নাট্য ব্যক্তিত্ব যেমন, শম্ভু মিত্র, বিজন ভট্টাচার্য, তৃপ্তি মিত্র, উৎপল দত্ত ও অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবদান সম্পর্কে আপনার ধারণা কি? এঁদের প্রত্যেকের নিজস্ব বৈশিষ্ট কলতে আপনি কি মনে করেন?

উত্তর : প্রত্যেক বড় মাপের অভিনেতারই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকে। থাকে তার নিজস্ব শিল্পবোধ, আর জ্ঞানের প্রখরতা। সমস্ত বড় অভিনেতাই কিন্তু গোড়ায় থাকেন সাহিত্যসেবী।

সাহিত্যের প্রেরণা, মননশীল জীবনবোধ তার চেতনাকে যতখানি সমৃদ্ধ করে ততখানিই দৃপ্ত হয় তাঁর অভিনয় শৈলী। শিশিরবাবুও তাঁর সাহিত্যবোধের আলোকে নিজেকে অভিনেতা হিসেবে দক্ষতা ও ঔজ্জ্বল্যের শীর্ষে তুলতে পেরেছিলেন। তাই, যাঁরা নিজস্ব আলোয় ভাস্বরিত, সেইসব গুণীজন, যাঁরা নাট্য নির্দেশনায় উত্তরসূরীদের জন্য নিজেদের অবদান রেখে গেছেন নিঃসন্দেহে তাঁরা নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের ফলস্বরূপ নিজেদের মহিমায় মহিমান্বিত হয়ে উঠেছেন। শম্ভুদার 'গ্যালিলিও', একাজের দৃষ্টান্ত তো কিংবদন্তী স্বরূপ। এঁদের অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে ভেসে ওঠে সূক্ষ্মতা, আর্টের সার্বজনীনতা, মননশীল দৃপ্ত জীবনবোধ। তৃপ্তি মিত্রের অভিনয়ের মধ্যে ছিল সুন্দর একটা ব্যঞ্জনা, এ তাঁর নিজস্ব প্রতিভার স্বাক্ষর। জ্ঞান ও বুদ্ধির নিটোল প্রকাশ। জীবনবোধের দলিল বিজন ভট্টাচার্যের নবান্ন। অভিনয়ের প্রতি গভীর অনুরাগ, শ্রদ্ধা, সর্বোপরি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করা, অভিনেতার জীবনের একটা বড় ও গুরুত্বপূর্ণ দিক। রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র এবং আর যেসব বড় বড় অভিনেতা ছিলেন এঁরা কিন্তু সকলে মহান সাহিত্যিক মানুষ। সাহিত্যের, কাব্যের কতখানি বোধ তাঁদের ছিল তা আমরা সকলে নিশ্চয়ই জানি। উৎপলদা, শম্ভুদা এঁদের প্রত্যেকেরই সাহিত্যের এবং কাব্যের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ এবং দখল ছিল। সাহিত্য এবং কাব্যবোধ এঁদের অভিনয়কে প্রখর এবং জীবনমুখী করে তুলেছে। অজিতেশের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। যে কোনও সময়, যে কোনদিন, যে কোন মুহূর্তে তার অভিনয়ের বিশেষ দিকগুলোকে মূর্ত এবং চলমান করে তুলেছিল তার নিজস্ব প্যাশন, নিজস্ব অভিনয় শৈলী। কতকগুলো টেকনিক্যাল আসপেক্ট নিশ্চয়ই এঁদের মধ্যে কাজ করেছিল। এছাড়া এঁদের সাহিত্যচেতনা, ভাষা ও ছন্দকে বোঝবার, জানবার প্রেরণা, সর্বোপরি শিল্প ও সৌন্দর্যবোধই এঁদের সূক্ষ্ম অভিনয় শেখবার এবং করবার পথে সক্রিয় অংশ নিয়েছে। সবশেষে বলি, নিজস্ব প্রতিভা তো এঁদের দীপ্ত সূর্যের মহিমা দান করেছেই। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলি : অজিতেশের সঙ্গে নাটক করাটা আমার খুবই সুন্দর একটা অভিজ্ঞতা। ১৯৬৮ সালে অভিনেতৃ সংঘের 'অন্ধযুগ' নাটকটি করার সময় আমি অজিতেশকে ডাকি। সেই সময় থেকে আমাদের বন্ধুত্বের সূত্রপাত। অজিতেশ্ এই নাটকের পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন। খুব সাধারণ স্তরের অভিনেতাদের দিয়ে অজিতেশ অসাধারণ অভিনয় করিয়ে নিয়েছিলেন। ঐ নাটকেই আমিও প্রথম তাঁর পরিচালনায় অভিনয় করার সুযোগ পাই।

প্রশ্ন : যে স্বপ্নের থিয়েটার আপনাকে হাতছানি দেয়, তা এখন না গড়ে ওঠার কারণ সম্পর্কে আপনার মতামত কি ?

উত্তর : থিয়েটারের সঙ্গে আমার আবাল্য-সখ্যতা। তাই থিয়েটারে প্রতি সক্রিয় সচেতনতা আমার মধ্যে ছিলই। নিজের মাতৃভাষাকে ভালবাসা, তার প্রতি শ্রদ্ধা ও মর্যাদা অটুট রাখা, সাহিত্যকে মনে প্রাণে গ্রহণ ও লালিত করা—এগুলো শৈল্পিক অনুভূতিরই অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে আমি মনে করি। আমি নিজের থিয়েটারের দলও তৈরী করেছিলাম। তাই সে সম্পর্কে ভাবনা-চিন্তারও একটা গভীরতম দিক আছে বলে মনে করি। একটা কথাকে কোথায় ওজন দেব, কোথায় দম রাখব, কোথায় মচকাবো—এছাড়া একটা কথার কতরকম মানে হতে পারে, শব্দের ব্যবহার সম্বন্ধে সচেতনতা এগুলো অভিনেতা ও অভিনয়ের ক্ষেত্রে কতখানি জরুরী নিশ্চয়ই উপলব্ধি করছে। তাছাড়া সাহিত্যচর্চা, মননশীলতা,

নিষ্ঠা ও আবেগ এগুলো তো অপরিহার্য। বাহ্যিক অনুষঙ্গ ছাড়া প্রত্যেক অভিনেতার নিজস্ব দায়বোধ তার নিজেকে সফল অভিনেতা হিসেবে গড়ে তোলবার বা ফুটিয়ে তোলবার।

আমি মনে করি ভাল এবং খারাপ, এই দু-রকমের থিয়েটার আছে। ভাল থিয়েটার করতে হলে অবশ্যই নিষ্ঠার সঙ্গে প্রত্যেক কর্মীর দায়িত্ব পালন করা একান্ত জরুরী। গ্রুপ থিয়েটার এবং পাবলিক থিয়েটার এরা উভয়েই যে যার জায়গায় দাঁড়িয়ে মনে করে আমি যেটা করছি সেটাই শ্রেষ্ঠ। গ্রুপ থিয়েটারের আদি জনক আই.পি.টি.এ.। এর মূল উৎস একটা ঐতিহাসিক তথা রাজনৈতিক প্রয়োজন থেকে। এখন যে সব গ্রুপ থিয়েটার করছে, তা আমার পক্ষে পুরোপুরি দেখা সম্ভব হয়ে ওঠে না। তবে যেটুকু দেখি তাতে বলা যায় যে গ্রুপ থিয়েটার হিসেবে সবাই যে ভাল কাজ করছে তা নয়। আমার মনে হয় গ্রুপ থিয়েটারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, পর্যবেক্ষণের সুযোগ সুবিধা যথেষ্ট। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আজ এটা অনুপস্থিত। দর্শকদের সামনে দিনের পর দিন পরিবেশিত হচ্ছে থিয়েটার, যা নিঃসন্দেহে ভাল থিয়েটার নয়, তা হল পাবলিক থিয়েটার। তাই গ্রুপ থিয়েটারের, শিক্ষিত মানুষজনের একটা দায়বোধ তো থাকবেই, একটা অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই তা অনুপস্থিত। এটা হচ্ছে কেন? আসলে আমরা সকলেই একটা ফাঁদে জড়িয়ে পড়েছি, আর সেখানেই থিয়েটার, অভিনেতা, অভিনয়ের একটা লিমিটেশন ঘটে যাচ্ছে, বাঁধাগতের জগৎ থেকে নড়বার উপায় কম। আর সেখানেই জনমুখী চেতনা, শৈল্পিক ব্যঞ্জনা, নান্দনিক কুশলতা গভীর গুহায় কেঁদে মরছে। এজন্যই এ প্রজন্ম বোধহয় যথার্থ নাট্য শিল্পকে স্বাগত জানাতে পারছে না।

প্রশ্ন : 'বিধি ও ব্যতিক্রম', 'রাজকুমার', 'নামজীবন', 'ফেরা' ও 'নীলকণ্ঠ'—এই নাটকগুলি মঞ্চস্থ করার ব্যাপারে আপনাকে কি ধরনের সাংগঠনিক অভিজ্ঞতার সামনে দাঁড়াতে হয়েছে?

উত্তর : প্রোপাগান্ডা আর আর্ট-এ দুয়ের তফাৎ ও তাৎপর্য অনেকখানি। আমি যখন নাটকগুলো করি, আমার মধ্যে যে বোধটা কাজ করেছিল তা এই যে, নাটকগুলো মর‍্যালিটির দিক থেকে অন্য ধরনের হবে। স্বার্থের খাতিরে আর্টকে প্রোপাগান্ডায় পরিণত করার চেষ্টা হয়ত আমি অনুভব করিনি। রাজনৈতিক, সামাজিক বিশ্বাস আমার ছিল। বিশ্বাসের পরিপন্থি কোনও নাটকের পরিচালনা আমি করিনি। তাই আমার বোধ অনুযায়ী, আমার কোনও জিনিসই দায়িত্বের বাইরে চলে যায় নি। সিরিয়াস নাটক হিসেবে নামজীবন, রাজকুমার, নীলকণ্ঠ এবং ফেরা—এগুলো কিছুটা সার্থকতা তো পেয়েছেই এবং দর্শকের আনুকূল্যও পেয়েছে অথচ বিষয়বস্তুর দিক থেকে এ নাটকগুলো ছিল একেবারে স্বতন্ত্র।

প্রশ্ন : নাট্য-পরিচালক হিসাবে আপনার অভিজ্ঞতার কথা কিছু বলুন।

উত্তর : দীর্ঘদিন ধরে অভিনয় করতে করতে এবং বড় শিল্পীদের, নাট্যকারদের অভিনয়ের অভিনয় থেকে নাট্য পরিচালনা করবার প্রেরণা আমি অনুভব করি। শম্ভুদা, উৎপলবাবু এঁদের অভিনয়ের উৎকর্ষতা আমাকে মুগ্ধ করেছে, প্রেরণা পেয়েছি। একটা ইমেজ তৈরী হয়েছে ভাল নাটকের প্রতি আমার। অজিতেশের সঙ্গে নাটক করে আমি বিশেষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। ওর মধ্যে এমন একটা প্যাশন ছিল, সাবলীলতা ছিল

যা থেকে প্রচুর উপকরণ আমি পেয়েছি। পরবর্তী জীবনে নাটক পরিচালনায় হেল্প করেছে। কোন্ ছবিটা, কোন্ প্লটটা কোথায় কিভাবে উপস্থাপনা করা যাবে এমনকি টোটাল প্রোডাক্শনটার জন্য প্রতিটি জিনিসের প্রতি নিখুঁত লক্ষ্য ও নিষ্ঠা কতখানি জরুরী এগুলো তো পেয়েছি আমার পূর্বসূরীদের কাছ থেকে। নাট্য জগতে শ্রেষ্ঠ গুরু আমার শিশির ভাদুড়ী, তাঁর সাহিত্যে অগাধ জ্ঞান, তাঁর পাণ্ডিত্য আমার চোখের সামনে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। শৈল্পিক ব্যঞ্জনা, এমন কি কোথায় কোন্ সেট-এর কোন জিনিষটা কীভাবে উপস্থাপনা করা যাবে তাই নিয়ে গভীর ভাবনা দেখেছি অহিতেশের মুখে। শিশির ভাদুড়ীর 'ষোড়শী' নাটকের কোনও এক অংশে তার অভিনয়ের সূক্ষ্মতা আজও স্মরণে আছে আমার, যে দৃশ্যে ষোড়শীর ঘরে গিয়ে ষোড়শীর সঙ্গে জীবানন্দের বৈরীতা অনেক কেটে যায় এবং ষোড়শী জীবানন্দের জন্য আহারের ব্যবস্থা করতে যায়—সেখানে হঠাৎ নির্মলের চিঠি ষোড়শীর ঘরে দেখতে পেয়ে শৈল্পিক দ্যোতনায় তাঁর মুখ কীরকম সাদাটে আর ফ্যাকাশে হয়ে উঠল। সে আক্রান্ত হতে পারে ভেবে হাতের চাবি দিয়ে পকেটের ওপর আঘাত করে, তাতে পকেটের ভেতরে রাখা পিস্তলের একটা ঠং করে আওয়াজ হয়। অন্য অভিনেতা হলে এখানে হয়তো পকেটের পিস্তল বার করে দেখাতো। কিন্তু শুধুমাত্র চাবি দিয়ে আওয়াজ করার মধ্যে যে ব্যঞ্জনা ও শিল্পদৃষ্টি প্রকাশ পায় তা একমাত্র খুব মহৎ অভিনেতার মধ্যেই দেখা যায়। এই যে ব্যঞ্জনা, এই যে শিল্পবোধ এগুলো পরবর্তী জীবনে যখন আমি নিজে নাটক পরিচালনা করেছি তখন প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে আমাকে প্রভাবিত করেছে ও সাহায্য করেছে নাট্য-পরিচালক হয়ে উঠতে।

প্রশ্ন : আপনি কি বিশ্বাস করেন পেশাদারী মঞ্চের বাণিজ্যিক পরিবেশেও গণমুখী নাটক করা সম্ভব?

উত্তর : হ্যাঁ, আমি মনে করি পেশাদারী মঞ্চের বাণিজ্যিক পরিবেশেও গণমুখী নাটক করা সম্ভব। যেমন, যে কোন পরিচালকের ক্ষেত্রেই নাটক, থিয়েটারে কাজ করার সময় তাঁর স্বাধীনতা কিছুটা বৃদ্ধি পায়, যেটাকে খানিকটা স্বকীয়তার পর্যায়ে ফেলা যায়। সেটা করতে গিয়ে একজন পরিচালককে সবসময়ই মাথায় রাখতে হবে যে-দর্শকের সামনে আমি যা কমিউনিকেট করতে চাইছি বা দর্শকের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে চাইছি তার সাথে নিজের প্রোডাকশন-এর সমন্বয় এবং সমঝোতা (আন্ডারস্ট্যানডিং) করবার চেষ্টা করা। দর্শক যদি তা গ্রহণযোগ্য মনে না করে তবে তা আমি যত ভাল ভাবগাম্ভীরই করে তুলি না কেন—তার মূল্য থাকে না। আর এখনকার দর্শকরা তো খুব সচেতন দর্শক, তাদের প্রতি আমার বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা অটুট—কারণ বিগত কয়েক দশকের সুস্থ ও উন্নত শিল্পের পৃষ্টপোষকতা তারা করে আসছেন। তাই যে কোনও রকম নাটকই করি না, যে কোনও রকম পরিবেশে, সেটা দর্শকের বোধগম্যতার মধ্যে রেখেই করতে হবে। যেমন—আমার বিশ্বাসের পরিপন্থী—কোনও নাটকের পরিচলনা আমি করিনি। রাজনৈতিক, সামাজিক বিশ্বাসকে সামনে রেখে, নিজের অভীষ্ট লক্ষ্যের মধ্যে দাঁড়িয়েও একটা কথা মনে রাখতে হবে—মানুষের জীবন, মানুষের অবস্থান এই নিয়েই শিল্প। নাটক— শুধু প্রপাগাণ্ডা নয়, বলা যেতে পারে ওটা একটা আলাদা রসায়ন। আমার কোনও জিনিষই আমার দায়িত্বের বাইরে চলে যাচ্ছে না—তাই আর্ট আর প্রপাগাণ্ডার এক সম্মিলিত রূপ—মানুষের চেতনার

মধ্যে সঞ্চারিত করে দিতে পারে যে নাটক তা বাণিজ্যিক বা অবাণিজ্যিক যে কোন মঞ্চেই উপস্থাপন করা সম্ভব। তবে বিশেষ ধরনের নাটকের ক্ষেত্রে বিশেষ ধরনের মঞ্চ বা পরিবেশ অবশ্যই একটা বিশেষ দাবী রাখে।

প্রশ্ন : গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনে অসংখ্য নিঃস্বার্থ তরুণ-তরুণীর প্রবল আবেগ ও নিষ্ঠা সত্ত্বেও তা পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হওয়ার পথে কি কি বাধা সক্রিয় বলে আপনার মনে হয়?

উত্তর : সময়ের সীমায় এক একভাবে, এক এক সময়, নাটক, নাট্যশালা, নাট্যকলা এবং নাট্যচেতনার পরিবর্তন ঘটেছে। যাঁরা যে সময়ে দাঁড়িয়ে নাটক করছেন ও নাটক সম্বন্ধে ভাবছেন—তাঁদের নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের ফসলও সেইভাবে কালের নৌকায় উঠে এসেছে। গিরিশ ঘোষ, শিশির ভাদুড়ীর যুগে নাটকের ফর্ম ছিল এবং কিলাভঙ্গি যা ছিল, পরবর্তীকালে নবান্নের যুগে এসে নিশ্চয়ই তার রূপরেখার একটা নতুন দিগন্ত গড়ে উঠেছে, যুক্তি, বুদ্ধি ও সামাজিক দায়বদ্ধতা প্রেরণায় আরও সচেতনতায় পুষ্ট হয়েছে নাট্যকলা।

কিন্তু আজকের নাটকের ক্ষেত্রে বিশেষ করে যে প্রশ্নটা, তুলছে গ্রুপ থিয়েটার সম্পর্কে, সেই গ্রুপ থিয়েটারে কিন্তু নানাভাবে এক্সপেরিমেন্ট-এর কাজ চলতে পারে। ভাল প্রোডাকশন হতে পারে, অথচ এসব সত্ত্বেও কিছুজনের একনিষ্ঠ প্রেরণা বা নিষ্ঠা থাকা সত্ত্বেও টোটাল প্রোডাকশন-এর ক্ষেত্রে সর্বত্র সুফল পাওয়া যাচ্ছে না। অন্ততঃ আমার পক্ষে আজকের দিনে যে সব গ্রুপ থিয়েটারগুলো হচ্ছে, সেই নাটক সম্পূর্ণভাবে বসে দেখা এবং মনে স্থান দেওয়া দু'টোর কোনটাই করতে পারি না। তবুও কোনও কোনও গ্রুপ থিয়েটার আশাতীত ভাল কাজ করছে। এমন কিছু নাট্যকর্মী আছেন যাঁদের উদ্দেশ্য ভাল নাটক, ভালভাবে পরিবেশিত করার এবং নাট্যচেতনাকে একটা অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো।

রাজনৈতিক, সামাজিক যে কোন ক্ষেত্রেই বলো নাটকের অভীষ্ট লক্ষ্যে আজকে পৌঁছতে না পারার ফল মনে হয় গতানুগতিকতা। এটা আমার ধারণা, ত্রিশ বছর ধরে পথ চলার পর গ্রুপ থিয়েটার একটা আবর্তে এসে ঠেকে গিয়েছে। যেভাবে 'চাকভাঙা মধু'-র চরিত্রগুলো জীবন্ত হয়ে উঠেছিল এবং তারও আগের 'নীলদর্পন' ও 'ছেঁড়াতার'-এর সপ্রতিভ কাজ হয়েছিল, আজকের গ্রুপ থিয়েটারে তা কি পাওয়া যাচ্ছে?

প্রশ্ন : আগামী দিনে নতুনভাবে নাটক করার চিন্তা আপনাকে অধিকার করে আছে কি?

উত্তর : আগামী দিনে নতুনভাবে নাটক করার কথা খুবই ভাবছি, ভাবছি তো নিশ্চয়ই। তবে আমি নাটকে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করতে পারব এমন কথা একেবারে জোর দিয়ে বলতে পারি না। কোনও বিশেষ একজনের পক্ষে হয়ত ভাবাও সম্ভব নয়। তবে—পাবলিক থিয়েটারে গত দশ, পনের, কুড়ি, বছর ধরে যেভাবে নাটক হচ্ছে সেখানে আমি যেভাবে কাজ করি সেটা একটা বড় পরিবর্তন। এটা যে একেবারেই অন্য ধরনের নাটক—কোনও রকমভাবে বিনয় না করেই এ কথা দৃঢ়তার সঙ্গে আমি বলতে পারি। এটা আমি করতে পারছি পরিচালক হিসাবে হয়তো এবং তার প্রধানতম কারণ হল—অভিনেতা হিসাবে সেখানে আমি নিজে আছি বলে অভিনেতা হিসেবে আমার নিজের

জনপ্রিয়তাকে ক্যাশ করতে পারছি। স্টার হিসাবে আমার ইমেজটা আছে বলেই আমি প্রথার বাইরে গিয়ে নাটক করার সুযোগ, সুবিধা পাচ্ছি। তাই বক্স অফিস ইমেজটাকে খারাপ কাজে না লাগিয়ে যদি ভাল কাজে লাগাই তাতে অন্যায় কিছু আছে বলে আমি মনে করি না। তাই আমি নাটকের কথা ভাবব, ভাবব ভাল নাটক করার কথাও।

প্রশ্ন ঃ বিগত যুগের নাট্যকর্মীদের সঙ্গে একালের নাট্যকর্মীদের আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও অধ্যাবসায়ের মধ্যে কোন পার্থক্য আপনার কাছে ধরা পড়ে কি?

উত্তর ঃ বিগতযুগের নাট্যকর্মীদের সঙ্গে একালের নাট্যকর্মীদের আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের মধ্যে পার্থক্য একটু তলিয়ে দেখলে অনেকখানিই। যেমন আমার মনে হব যে, বিগতযুগের নাটকের পিছনে এতগুলো প্রতিভাবান মানুষের একসঙ্গে সমাবেশ হয়েছিল সেভাবে আর কোন সময়েই হয়ে উঠতে পারে নি। বোধহয় আর কখনো হয় নি। যেমন গিরিশ ঘোষ, অর্দ্ধেন্দুশেখর, অমৃতলাল বসু, ধর্মদাস সুর, ক্ষেত্রমোহন নিয়োগী, বিনোদিনী, তারাসুন্দরী, অমৃতলাল মিত্র প্রমুখদের চেষ্টায় বা বাংলার থিয়েটার 'থিয়েটার' হয়ে উঠতে পেরেছিল। থিয়েটার ভিত্তিটা জনসাধারণের জন্য এঁরাই যথার্থ অর্থে স্থাপিত করেন। এঁদের পরে যাঁর কথা স্মরণ করব—তিনি হলেন অমর দত্ত। থিয়েটারকে কমার্শিয়ালি ভায়াবল করার জন্য যেসব আন্দোলন হয়েছে—সেটাও তো এক ধরনের আন্দোলন। নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা সেখানেও তো কাজ করে। এরপর বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণরূপে নতুন দিগন্ত যিনি উন্মোচন করলেন তিনি নাট্যাচার্য শিশির ভাদুড়ী মহাশয়। কমপ্লিট এবং টোটাল থিয়েটার-এর যে কনসেপ্ট যেখানে পরিচালকই সব থেকে বড়, যিনি নিজেকে পরিচালকের চেয়ে প্রয়োগকর্তা বলতে ভালবাসতেন—আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে—সর্বোপরি তাঁর কালজয়ী প্রতিভার স্বাক্ষর স্বরূপ. তিনি বাংলা নাটককে সবদিক থেকে সাবালকত্ব প্রদান করলেন—তিনিই নাট্যগুরু শিশির ভাদুড়ী। এরপর অভিনেতা আর নাটকে শুধুমাত্র নয়, সমগ্র দেশে নেমে এলো অবস্থা পরিবর্তনের অন্য হাওয়া। দেশের মধ্যে অস্থিরতা, দেশবিভাগ, বিশ্বযুদ্ধের দরুন দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা—এসবের ফলে নাটক ভয়ংকর সংকটের মধ্যে চলে গিয়েছিল, অনেকেই নাটক ভাল চালাতে পারছিলেন না—সবক্ষেত্রেই একটা সংকট কাজ করছিল। যার ফলে নাটকের ক্ষেত্রেও নেমে এলো দৈন্যতা এবং নাটকও হারাতে লাগল তার উৎকর্ষতা। এরকম অবস্থার মাঝে দাঁড়িয়েও যাঁরা নাটককে আরও ভিন্ন পর্যায়ের উন্নীত করার চেষ্টা করেছিলেন সেই আই.পি.টি.-এর প্রচেষ্টার কথা মানুষ কোনদিন ভুলবে না। পাবলিক থিয়েটারগুলোর জনপ্রিয়তা আস্তে আস্তে একসময় আবার ফিরে এসেছিল—স্বাধীনতার উত্তরযুগে—'৪৭ এর পরে। কিন্তু তার উৎকর্ষ অনেক সময় নষ্ট হয়ে গিয়েছিল বা গিয়েছে। অতিরিক্ত ব্যবসাধারী মনোভাবের জন্য। সেই সঙ্গে এটাও দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে থিয়েটারে ব্যবসা যে সুরুচিসম্পন্ন এবং উঁচুদরের নাটক করেও সফল হতে পারে, তা আজকের ব্যবসাদাররা জানেন না। বড় অভিনেতাদের জীবন থেকে জানতে পারি, তাঁদের চাবিকাঠিই হলো তাঁর সাহিত্যবোধ, সাহিত্যের অসামান্য প্রখর বোধ এবং তাঁর সেই সাহিত্যবোধের আলোকে তিনি সবকিছু উজ্জ্বল করে তুলতে চান। সেই জন্যই তাঁর এমন অসামান্য অভিনয়। এবং দেখা যাচ্ছে এই জিনিসটাই কাজ করছে। একটা কথাকে কোথায় ওজন দেবো, কোথায় দম রাখবো,

কোথায় মচকাবো এবং একটা কথার কতরকম মানে হতে পারে। শব্দের এতখানি সচেতনতা হয়ত কবি ছাড়া আর কারো বোঝা সম্ভব নয়, এমনকি অন্য সাহিত্যিকদেরও নয়। যদি একটা শব্দের জন্য একটা শব্দকে পাবেন বলে ঘন্টার পর ঘন্টা এমন কি মাসের পর মাস অপেক্ষা করতে হয়, একটা, তিনটে, চারটে শব্দের সমষ্টি তাকে এমনভাবে তাড়া করে নিয়ে যেতে পারে যে, সেটা বছরের পর বছর তার মাথায় থাকাব কথা, তারপর সে সেটা দূর করে। কিন্তু শব্দই হচ্ছে তার আশ্রয়। সেই জন্যই অভিনেতার যদি এইভাবে কার্যেরও সচেতনতা থাকে তাহলে সে শব্দ সম্বন্ধেও সচেতন থাকবে এবং সেটা তাকে অভিনয়ের ক্ষেত্রেও সাহায্য করবে। কিন্তু আজকের দিনে instinctively কেউ সেখানে পৌঁছতে পারে না, নিশ্চয়ই পারে না। অভিনেতার এই বোধটা হওয়া দরকার যে, তার বোধের মাধ্যম হিসেবে তাকে কাব্য এবং সাহিত্য এ-দুটোকেই সর্বাঙ্গীনভাবে বুঝতে হবে। উৎপলদা, শম্ভুদা তো তাই করেছেন। কিন্তু এখন তো যে সব নাটক হচ্ছে তার অধিকাংশই না-ভাল হওয়ার দিকে। এককথায় খারাপ নাটকই হচ্ছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে। আমার মনে হয় ত্রিশ বছর ধরে নাটক যে পথে চলেছিল এখন বোধহয় তা একটা আবর্তে এসে ঠেকে গেছে। বিশেষ করে নাটকেব কনটেন্ট এর কথাই ধরা যাক, এর ধরনের বাঁধা গৎ-ফরমূলা তৈরী হয়ে গেছে। পাবলিক নাটকের ক্ষেত্রে যে অভিযোগ ছিল এখন গ্রুপ থিয়েটারের ক্ষেত্রেও তাই এসে গেছে। দু'একটি ক্ষেত্র ছাড়া সর্বত্রই তো গতানুগতিকতার ছড়াছড়ি। এরই মধ্যে হয়ত দু'একজন প্রথমে ব্রেকথ্রু করবার চেষ্টা করেছিলেন—তারপর থেকে সেই ফরমূলাটাই বাকিরা চালিয়ে নিচ্ছেন। তাই বিগত দিনের নাট্যকর্মীদের অধ্যবসায়, আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা একালের নাট্যকর্মীদের মধ্যে অবশ্যই অনুপস্থিত মনে হতে পারে।

প্রশ্ন : আগামী দিনে চলচ্চিত্র বা নাটক-এর কোনও একটিকে যদি আপনাকে বেছে নিতে বলা হয়, তবে, আপনার নির্বাচন কি হবে?

উত্তর : আমি মূলতঃ অভিনেতা। এটা শৈশব থেকেই নেশা আমার, পরে সর্বতোভাবে তা দাঁড়িয়েছে পেশায়। ছোটবেলা থেকেই নাটক করতে আমি ভালবাসি। নাটকেই প্রথম কাজ করতে শুরু করি। তারপর চলচ্চিত্র জগতে এসে পড়ে নাটক করার নিয়মিত সুযোগ আর হত না বলে আমাদের অভিনেতৃ সংঘ থেকে নাটক প্রযোজনার ব্যবস্থা কবা হয় এবং সেখানেই অভিনয় করতাম। এর আগে ১৯৬১ সালে অভিনয় করেছি, তবে সে নাটক নিজের পছন্দমত ছিল না এবং নিজের মনের মত পরিবেশও সেখানে পাই নি, সেখানে শুধু পেশাদারী মঞ্চে অভিনয় করবার জন্যই করেছি—স্টার থিয়েটারে, নাটকটার নাম ছিল 'তাপসী'। তারপর 'নামজীবন' নাটক নিয়ে আমি থিয়েটাবে আবার ফিরে এলাম। সিনেমা এবং নাটক—এ দুটোর মাঝে 'নামজীবন' করবার সময়ও অসুবিধা হত কিছুটা এবং দুটো কাজের জন্য সময় পাওয়া মুশকিল হত বলে মাঝে মাঝে সরেও যেতে হত। তারপর করলাম 'রাজকুমার' এবং এই নাটকটা আবারও করবার ইচ্ছা আছে। 'ফেরা', 'নীলকণ্ঠ' তো করেছি, এখন করছি 'টিকটিকি'। এগুলোতো নাটককে ভালবাসি বলেই করেছি। তবে আমার ক্ষেত্রে এই ভালবাসাটা একবারে শুদ্ধ ভালবাসা নয়, নাটককে ছোটবেলা থেকে ভালবেসেছি এবং নাটক শিখেছি, নাটক করেছি—এটাই আমার কাজ, আমার পেশা, এটা আমার জীবন এবং শিল্পসাধনাও বটে, তবে আমি চলচ্চিত্রেরও লোক,

তাই মঞ্চ এবং চলচ্চিত্র দুটোই আমার কাছে সমান প্রিয়। এর মধ্যে কোন একটিকে বিশেষভাবে নির্বাচন করতে সক্ষম নই, যতখানি সক্ষম একজন অভিনেতা হিসাবে নিজেকে নিয়োজিত করতে।

প্রশ্ন : ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক নাটককে আমাদের কালের নতুন তাৎপর্যে উন্নিত করে তার মঞ্চ রূপ দেওয়া সম্পর্কে আপনি কিছু ভেবেছেন কি?

উত্তর : ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক নাটককে আমাদের কালের নতুন তাৎপর্যে অন্বিত করে। তার মঞ্চরূপ দেওয়া সম্পর্কে যে ভাবনা তা শুধু আমি কেন অনেকেই ভেবেছেন এবং এ ধরনের নাটক সংখ্যায় অত্যল্প হলেও হয়েছে। তবে আমি এ ধরনের নাটক করার কথা ভাবি।

প্রশ্ন : এখন আপনি অভিনয় জীবনের পরমার্থ বলে কি মনে করেন?

উত্তর : জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এভাবেই (কাজের মধ্যে) বাঁচতে চাই।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : ৬ই জুলাই, ১৯৯৬

নীরদ রায়

ভালোলাগা

তার কিন্তু নিজস্ব কোন ভাষা নেই,
যখন যেখানে সেটাই তার জন্মভূমির ভালোবাসা,
তবু থাকে, অনেকটা জায়গা জুড়ে পড়ে থাকে তার হাত-পা,
জেলা সদর থেকে যে রাস্তাটি কাশতে কাশতে
দু একটা চৈত্র মাস, আর দুতিনটে ন্যাংটো গ্রামকে চিমটি কেটে
চলে গেছে কোনো এক গঞ্জের হাটতলায় শনি কিংবা রবিবার—
তার মাথার কাছেও তো পা ছড়িয়ে বসে থাকে সে,
তার নিজস্ব কোনো জন্মদিন নেই, নেই শারদ উৎসব,
বৃষ্টিতে ভিজলে, ঠান্ডা লাগলে সর্দিকাশি গলাব্যথা নেই,
নেই বড় রাস্তার পাশে দু'তিন কাঠা জমি নিয়ে দোতলা বাড়ি—
কিন্তু আছে, সবখানে হাত তুলে আছে,
ভালো ও মন্দের মাঝখানে কখনো তালগাছ হয়ে আছে।

উপাসক কর্মকার

পড়শীর ঈর্ষা

আপনি যখন সাইকেল চড়ে বাজার থেকে ফেরেন
তখন আপনাকে ভীষণ স্মার্ট লাগে
আপনি যখন রোদ বাঁচানোর জন্য টুপি পরে বের হন
তখন বিশ্বাসই হয় না ওটা অন্য কাউকে পরানো যায়

আপনার করিডোরে সতীশ গুজরালের পুরনো একটা ছবি ঝোলে
তখন মনে হয় না চুরি করা যায় কোনো গৃহীর রুচি
আপনার বাগানে এখন নানা রঙের বাহারি ফুল আর ক্যাক্টাস
আপনার স্ত্রী মগ্ন থাকেন অবসর দিনান্তের জন্য
আপনাকে তখন মনে হয় পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষ তখন
আপনার গৃহকোণে শোভে গ্রামাফোন গাইছেন ফৈয়াজ খাঁ
আপনি কি এখন অন্য কিছুর কথা ভাবছেন
ভাবছেন কি কোনো পুরনো বন্ধুর কথা তাঁর ফোন এলে ভাল লাগত
আপনার কি মনে পড়ে আমআঁটির ভেঁপু নাগরদোলার ঘূর্ণি
আপনি কি কখনো বর-বৌ খেলেছেন অথবা হা ডু ডু

এখন কিন্তু আপনি অনন্ত যৌবন নিয়ে বেঁচে থাকতে চান
স্বাস্থ্যের জন্য প্রতিদিন নিয়ম করে হাঁটেন
হাঁটুন হাঁটুন হাঁটাপথে আসে আরও হেঁটে যাওয়ার ইঙ্গিত
আমরা আপনার পড়শী বিশ্বাস করি না আপনাকে হিংসে করা যায়

শামীমুল হক শামীম

যাত্রা

ক্রমশ নিভে আসছে আলো ...

ঐ দূর মেঘখণ্ড অশনি-সংকেত আমাদের জীবনে
তখন হায়। কিছুই থাকে না, সিসিফাস
নিষ্ফল বীজ শূন্যগর্ভ রাশি রাশি তুষ
কোথায় যাচ্ছে সময় নিরুদ্দেশ ঠিকানায়
বার্তাবহক ফিরে যায় শাদা পৃষ্ঠা সম্বল তার
বন্ধ্যা সময়ের সাথে সখ্য গড়ে
লোকাল ট্রেনে ওঠে ভালোবাসা
এইসব অন্তহীন যাত্রায় ঘুরপাক খেতে খেতে
জাগবে কী চর, মিলবে কি ঠাঁই
কুয়াশা ছিন্ন করে ভোরের আলো কি দেবে না ওম ভালোবাসার চিলেকোঠায়?

কড়া হুইসেল বাজিয়ে শুরু করা যাক তবে ...

অনিমা মিত্র

কুশণ্ডিকা শেষ হলে

কুশণ্ডিকাশেষে বিবাহ বাসি হলে
হ্যাভারস্যাকের চেইন টেনে দিই।
প্রতিবেশি জানু ভেঙে হামলে পড়ে
মানচিত্রের গোপন গুঞ্জনে
আমিও বিলাসপুরের আবহাওয়া দপ্তরের
উল্কি আঁকা হাতের তর্জমা চিরে ফেলি
ব্লেড দিয়ে।

দীর্ঘরাত্রির করিডোরে, নিষিদ্ধতারের বেড়া
ডিঙিয়ে তারাসকলের ফসফরাস স্বরে
কাঁপে। জলচরী কাঁদে মৌসুমীবায়ুর চাপে।

চোখ বন্ধ রাখি। অতীতের ছায়াবিথি
ফিরে যাও সমাহিত রাত্রির কাছে।

সৌভিক জানা

একা দোকা বৃষ্টিভেজা ঘাসবীজ

১. টানা শূন্য মাঠের মধ্যে; টাঙানো কুয়াশার জামা পরে বসেছিল
যে রূপসুন্দরী, তাকে আবার চেনা গেলো গোলদিঘির পাড়ে
ভারী ডল্ম হাতে রৌদ্র ; অথবা রৌদ্রেরই কোন বিশেষ; সম্ভবত
আলটা-ভায়োলেট রশ্মি; তাকে অবৈধ সঙ্গম দিয়ে গেলো
সোনালী জ্যোৎস্নায় যেমন দিয়ে গেছে দৃষ্টান্ত সুশ্রী কিশোর দাস

আমাদের কেউ কেউ সেই কিশোর দাস হয়ে আসে; ইবনবতুতা বলে :
অদ্ভুত পিপাসায় দক্ষিণ বাতাসে; অন্যতর প্রতিভায়

২. চারিদিক বৃক্ষ বড় নগ্ন হয়েই থাকে, তাই সুন্দর; অবুঝ
দেহ-পীঠ আশ্রয় হলে সহস্র চাঁড়ালী
মাংস মেদ মদ সব ছেড়ে-ছুঁড়ে দিয়ে ঘাসের ভক্ষনে
চলে যায়; চলে যেতে হয় যত্রতত্র—যেখানে নৈরাত্মক দেবী কণ্ঠ
ডাকে; উপবাসী শঙ্খের ধ্বনি জাগ্রত হয়, ফলত চর্যার ধ্যানে
শ্রবণ ফেলে যায় ভিক্ষাপাত্র জলে; জলে ফ্ল্যাট-নারীর সাবান কণা
যদিচ ভেসে থাকে, চোখের উপর নুয়ে পড়া তাহার গন্ধময় বাথরুম
তথাপি শ্রমণের এই ক্লান্তিহীন জলপথে নামা; প্রক্ষালন জলে নামা
চারিদিক বড় নগ্ন হয়েই থাকে—এসো আমরা নগ্ন হয়ে থাকি
নৈরাত্মক দেবী পূজা করি।

দুলাল ঘোষ

শিরদাঁড়া

অফিসে বেরুবার আগে
শিরদাঁড়া খুলে রাখি ঘরে
তারপর—
ইয়েস্ স্যার, জী হুজুরে
যা পাই—কফ্ থুতু
কিংবা
তোবড়ানো গালে
চোখের জৌলুসে
মলমূত্র চুরি করে
নিয়ে আসি ঘরে
পুনরায় শিরদাঁড়া পরে
টানটান করি দেহ
বাচ্চাদের বলি :
মানুষ হও বাবা
বৌকে ধমকাই—
ঘর নোংরা রেখেছে বলে...।

সৌগত চট্টোপাধ্যায়

ছেলেবেলা

ধোঁয়ার মত মিলিয়ে যাচ্ছে আমার ছেলেবেলা
কে জানে কোন বনের মোহ লেগেছে দুই চোখে
ঠোঁটে ধরেছে আগুন
আর বুকের মধ্যে চাপা
ধোঁয়াটে এক স্মৃতির মত গান গাইছে পাখি

সত্যি যদি ভুলে যেতাম বুকে পাহাড় তুলে
দাঁড়িয়ে আছে ছেলেবেলার মৃত সঙ্গীসাথী
তাদের জন্য শুভেচ্ছার পাহাড় গড়ে দিয়ে
ইচ্ছে করে হেঁটে বেড়াই মরা নদীর বাঁকে

এখন নীতি-নীতিহীনতা যতই কাছে ডাকুক
পাখির মত আমার স্মৃতি বুকেই জেগে থাকুক
ধোঁয়ার মত মিলিয়ে যাচ্ছে আমার ছেলেবেলা
কে জানে কোন বনের মোহ লেগেছে দুই চোখে।

বিশ্বজিৎ রায়

অপেক্ষা

ঘুমিয়ে পড়া উনুনে তোর
একটু নাড়াচাড়া
উস্কানি দেয় ছাইয়ের ভিতর
খোঁজে আগুন যারা
অপেক্ষাতে সূর্য ডোবে
একটুখানি দাঁড়া
ফুলগুলো সব শুকিয়ে গেছে
উনিশ বসন্তে
টাট্‌কা হৃদয় হাতের মুঠোয়
কখন অজান্তে
তোমার পানে ছুঁড়ে দিলাম
অসীম অনন্তে।

ভাস্কর চিন্তামণি করের রেখাচিত্র

আলোচ্য বইটি প্রখ্যাত প্রবীণ ভাস্কর চিন্তামণি করের আঁকা ৩৮টি ড্রয়িং-এর সংকলন। ড্রয়িংগুলি ১৯৩৫ থেকে ১৯৯৫ এর দীর্ঘ ৬০ বছর সময়ের মধ্যে করা এবং কালানুক্রমিকভাবে গ্রন্থিত। ১৯৯৫-তে শ্রী কর ৮০ বছর বয়স অতিক্রম করেছেন। সেই ৮০-তম জন্মবার্ষিকীতে তাঁর দুই সুযোগ্য ছাত্রের, বিষ্ণু দাস ও শিবানন্দ মন্ডলের শ্রদ্ধাঞ্জলি এই বই। বইটির পাঠ্য-অংশ সামান্য। দুদিকের ব্লার্বে রয়েছে এই সংকলনের উদ্দেশ্যে এবং শিল্পীর জীবন ও জীবনপঞ্জির সংক্ষিপ্ত বিবরণ। প্রাক-কথায় মাত্র ১২-১৩ লাইনে প্রকাশকের প্রাসঙ্গিক বক্তব্য। এবং দেড় পৃষ্ঠার সুলিখিত কিন্তু অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ভূমিকা। লিখেছেন এই সংকলনের সম্পাদক শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়। এতে খুবই বিদগ্ধভাবে তিনি আলোচনা করেছেন শিল্পীর প্রকাশের মূল বৈশিষ্ট্য এবং সংকলিত প্রতিটি কালের নান্দনিক তাৎপর্য। শুধু খেদ থেকে যায়, যদি আরও একটু বিস্তৃতভাবে উপস্থাপিত হত এই আলোচনা যাতে শিল্পীর সমগ্র সৃষ্টির পরিমন্ডলটি উঠে আসতো, উঠে আসতো তাঁর ব্যক্তিত্বের ব্যাপ্ত আলোছায়া, আর সেই পরিপ্রেক্ষিতে এই ড্রয়িংগুলির উপর আলোকপাতের চেষ্টা হত, তাহলে শিল্পীর প্রকাশের ভুবনটি হয়তো আরও সামগ্রিকতায়, আরও স্বচ্ছভাবে পরিস্ফুট হতে পারত। তাতে উপকৃত হতেন সাধারণ পাঠক ও দর্শক।

বইয়ের বাকি পুরোটা অংশেই শুধু দেখবার। অথবা দেখার ভিতর দিয়েই আর একভাবে পড়ে নেওয়া শিল্পীর রৈখিক রূপের বৈশিষ্ট্য, এর ক্রমবিবর্তন। অর্থাৎ তাঁর আঙ্গিক বা রূপভাবনা এবং এসবের ভিতর প্রতিফলিত তাঁর যে তত্ত্ববিশ্ব সেটাকেই আমরা অনুধাবন করে নিতে পারি এই দেখার মধ্য দিয়ে। আমরা শিল্পীর নিজস্ব ভুবনে প্রবেশ করতে পারি। বইটি এদিক থেকেই বিশেষ মূল্যবান।

একজন শিল্পীর নিজস্ব ভুবনে প্রবেশের পক্ষে তাঁর ড্রয়িং বা রৈখিক রূপ সম্ভবত অনেক বেশি সহায়ক তাঁর পূর্ণাঙ্গ চিত্র বা ভাস্কর্যের থেকেও, কেন না রৈখিক রূপ অনেকটা আত্মকথনের মতো। শিল্পীর রূপচিন্তা বীজ-স্বরূপ প্রাথমিক উৎসের পরিচয় থাকে তাতে। পূর্ণাঙ্গ চিত্রে তিনি হয়তো তাঁর প্রকাশকে অনেক পরিশীলিত করে তোলেন। কিন্তু তাঁর মনের বা চেতনার প্রত্যক্ষ উত্তাপ অনেক স্বচ্ছতরে ধরা থাকে তাঁর ড্রয়িং-এ। এজন্যই রেখাচিত্র, ব্যক্তিগত প্রকাশের এই অন্যতম নির্দর্শন, তাই অনেক অন্তরঙ্গ বা নিবিষ্টভাবে তুলে ধরে শিল্পীর আত্মস্বরূপের আলোছায়া। আলোচ্য বইটির প্রকাশ এদিক থেকেও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

কাকে বলে ড্রয়িং বা রেখাচিত্র? কোন বৈশিষ্ট্য তা পূর্ণাঙ্গ চিত্র থেকে? রেখাই ভিত্তি যে চিত্রের সেটাই রেখাচিত্র, এই হতে পারে প্রাথমিক এক সংজ্ঞা। রেখা সৃষ্টির মূলে থাকে এক গতিপ্রবাহ। বিন্দু হল রেখার আদিতম একক। বিন্দুর ক্রমিক সঞ্চরণে গড়ে ওঠে রেখা। তাই রেখা এক চলমানতা বা গতিপ্রবাহের স্বতস্ফূর্ত প্রকাশ। তাই রেখা গড়ে তোলে যে রূপাবয়ব, তার মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই এসে যায় জঙ্গমতা। এজন্য জঙ্গমতা রেখাচিত্রের অবিচ্ছেদ্য বৈশিষ্ট্য। আবার রেখার সঞ্চলনের পেছনে থাকে যে হাত বা যে

মনের সক্রিয়তা, তার নিহিত ইচ্ছাশক্তিই রেখারও চালকশক্তি। তাই রেখার গতিপ্রবাহ শিল্পীর ইচ্ছা বা মননেরই গতিপ্রবাহ। শিল্পীর ব্যক্তিত্বই স্বতঃস্ফূর্তভাবে উৎসারিত হয় রেখার চলমানতায়। বোধের বা ভাবনায় নিহিত যে ছন্দ, সেই ছন্দকে দৃশ্যতার ভাষায় রূপান্তরিত করে রেখা।

রেখা এভাবে ছবিতে ছন্দের কাঠামোটিকে গড়ে তোলে। এই কাঠামোই যখন হয়ে ওঠে স্বয়ংসম্পূর্ণ এক রূপের প্রকাশ, তখনই তা ড্রয়িং বা রেখাচিত্রের সম্পূর্ণতায় ভাস্কর হতে থাকে। রূপের তথাকথিত পূর্ণতা ধরা নাও পড়তে পারে। থাকতে পারে আভাসটুকু মাত্র। বা গড়ে উঠতে উঠতে ভেঙে যেতে পারে রূপ। সেই ভাঙনেই তখন হতে পারে ছন্দের মাধুর্য। তবু কাঠামোই তখন পরিপূর্ণ সুন্দরের মর্যাদা পায়। আবার সেই কাঠামো শুধু কাঠামো নাও থাকতে পারে। রক্ত-মাংসের নানা প্রলেপ লেগে তাতে মাধুর্যের নানা শাখা-প্রশাখা পল্লবিত হতে পারে। বর্তনা যুক্ত হয়ে স্বাভাবিকের বিভ্রম জাগাতে পারে। ছায়াতপ আরও সঞ্জীবিত করতে পারে সেই বিভ্রমকে। বস্তুত সাদা-কালো বা এক রঙের বিন্যাসের ক্ষেত্রে ছায়াতপ অনেক সময় হয়ে ওঠে বর্ণান্তরের বিকল্প। রং যেমন রচনার সমগ্র পরিমণ্ডলটিকে আলোয়-ছায়ায়, প্রকৃতির নানা নিকটতর সাযুজ্যে উদ্ভাসিত করে তোলে, ড্রয়িং-এর ক্ষেত্রে ছায়াতপ সেই কাজটিই করতে চায়। ছায়াতপ আবার পুঞ্জীভূত রেখাই নামান্তর মাত্র। তাই রেখার এক রূপান্তরিত চরিত্র তার মধ্যে থাকে। এক গতিপ্রবাহ থাকে। সেই গতি-প্রবাহের নানা ভিন্নধর্মী প্রকাশের ভাস্কর হয়ে ওঠে রেখাচিত্র।

তাহলে পূর্ণাঙ্গ চিত্রের সঙ্গে রেখাচিত্রের পার্থক্যের কোনও বিশেষ ক্ষেত্র কি আছে? একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রকে রেখা, রং আর রূপাবয়বের ভারসাম্যে সংস্থিত করার দায় থাকে পূর্ণাঙ্গ চিত্রের। কেমন করে সেই ভারসাম্য দিকে নিয়ে যাওয়া যাচ্ছে তাকে, রূপবিন্যাসের কোন অভিনবত্বে ভাস্কর করে তোলা যাচ্ছে, সেই সন্ধানই পূর্ণাঙ্গ চিত্রকে বিশেষ চরিত্র দেয়। রেখাচিত্রে রূপবিন্যাসের কোনও দায় নাও থাকতে পারে। কেননা একটি নির্দিষ্ট কাঠামো বা একক রূপকল্পই প্রাধান্য পায় সেখানে। চারপাশের সে ক্ষেত্র, যাকে বলে চিত্রক্ষেত্র, তার সঙ্গে উক্ত রূপকল্পের সম্পর্ক অন্বিত করার দায়িত্ব গ্রহণ নাও করতে পারেন রেখাচিত্রের শিল্পী। রঙে গড়া পূর্ণাঙ্গ চিত্রে বর্ণের ভূমিকা থাকে প্রগাঢ়। তা প্রকৃতির বা স্বাভাবিকের বিভ্রম যেমন আনে, তেমনি অনুভবের নানা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যঞ্জনাকেও পরিস্ফুট করতে সাহায্য করে। রেখাচিত্রে বর্ণের এই মোহিনী আড়াল থাকে না। কাঠামোতেই প্রাণ সঞ্চার করা রেখাচিত্রের শিল্পীর অনিবার্য দায়।

চিন্তামণি করের আলোচ্য ড্রয়িংগুলি ড্রয়িং-এর উপরোক্ত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সম্পূর্ণ ড্রয়িং। একমাত্র রেখাই তাদের অবলম্বন। রেখার জালের মধ্যে দিয়ে অনেক সময় ফুটেছে আলোছায়ার রহস্য। ছায়াতপও এসেছে। তাতে বর্তুলতার মধ্যে দিয়ে ভর বা ওজন সঞ্চারিত হয়েছে শরীরে। স্বাভাবিকতা-আশ্রিত এক বা একাধিক অবয়বের সমাহার যেমন এসেছে, তেমনি অবয়ব ভেঙে কল্পরূপের দিকে গেছে, বিমূর্তায়িতও হয়েছে। রেখার বিচিত্র চরিত্রের মধ্য দিয়ে শিল্পীর ব্যক্তিত্বের নানা বৈভব পরিস্ফুট হয়েছে। চিন্তামণি কর একাধারে ভাস্কর ও চিত্রশিল্পী। ভাস্কর্যের পাশাপাশি তিনি ছবিও এঁকে গেছেন নিয়মিত। আঙ্গিক ও মূল্যবোধের দিক থেকে তার ভাস্কর্য ও ছবি পরস্পরের পরিপূরক হলেও প্রকাশভঙ্গির দিক থেকে একটা পার্থক্যও থেকে গেছে উভয়ের মধ্যে। তাঁর জন্ম ১৯১৫-তে। ১৯৩১-

এ তিনি অবনীন্দ্রনাথের 'ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্টসে' ভর্তি হয়েছিলেন শিল্প শিক্ষার জন্য। ওরিয়েন্টাল আর্টসে ভর্তি হওয়াও একটি আপতিক ঘটনা। ইচ্ছে ছিল গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলেই ভর্তি হওয়ার। কিন্তু তখন সেখানে ছাত্র-ধর্মঘট চলছিল। ফলে তাঁকে শেষ পর্যন্ত ভর্তি হতে হয়েছিল ওরিয়েন্টাল আর্টসে। আপতিক হলেও এই ঘটনা তাঁর পরবর্তী বিকাশকে অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করেছে।

তখন দুটি ধারায় প্রবাহিত আমাদের চিত্রচর্চা। একটি ধারা অবনীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত স্বদেশ চেতনার চিত্ররীতি। অন্যটি ব্রিটিশ অ্যাকাডেমিক রীতি-প্রভাবিত পাশ্চাত্য আঙ্গিক আশ্রিত শৈলীর বিস্তার। ভাস্কর্যে তখনও সঠিক অর্থে ভারতীয় আধুনিকতার সূত্রপাত হয় নি। পরম্পরাগত রীতির কাজ চলছে একদিকে। অন্যদিকে চলছে পাশ্চাত্য স্বাভাবিকতার রীতির চর্চা। গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে ভর্তি হলে কী হত অনুমান করার কোনও যুক্তি নেই এখন, তবে ওরিয়েন্টাল আর্টসে ভর্তি হওয়ার ফলে ছাত্র-জীবনের গোড়া থেকেই প্রাচ্য-চেতনার একটি ভিত্তি তৈরী হয়ে গিয়েছিল তাঁর প্রকাশে। ভাস্কর্য শেখারই ইচ্ছা ছিল তাঁর। শুরুও করেছিলেন উড়িষ্যার পরম্পরাগত শিল্পী গিরিধারি মহাপাত্রের কাছে তালিম নেওয়া থেকে। কিন্তু একটু এগিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন এপথে অগ্রসর হয়ে আধুনিক ভাস্কর্যের দোরগোড়ায় পৌঁছানো তাঁর পক্ষে খুবই দুরূহ হবে। তাই তখন সাময়িকভাবে ভাস্কর্য ছেড়ে চিত্রকলার দিকে গিয়েছিলেন। শিখতে শুরু করেছিলেন ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদারের কাছে। ক্ষিতীন্দ্রনাথ তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিলেন। অগাধ শ্রদ্ধা ছিল তাঁর প্রতি।

এই যে চিত্রচর্চায় প্রথম থেকেই প্রাচ্যচেতনায় অভিষিক্ত হলেন তিনি, এটা তাঁর সৃষ্টিকে আজীবন নিয়ন্ত্রণ করেছে। ছবির আঙ্গিকে প্রাচ্যচেতনাকেই নিজের মতো করে বিকশিত করেছেন তিনি। কিন্তু ভাস্কর্যের ক্ষেত্রটি একটু স্বতন্ত্র। ভাস্কর্যে তাঁর গভীর অনুশীলন শুরু হয়েছিল পাশ্চাত্যে। ১৯৩৮-এ তিনি লন্ডনে পৌঁছেছিলেন। সেখান থেকে প্যারিসে পৌঁছন ওই বছরেরই ১ অক্টোবর তারিখে। সেখানে প্রথম ভাস্কর্য শিখতে শুরু করেন 'অ্যাকাডেমি দ্য ল্য গ্রাঁদ শমিয়ের'-এ অধ্যাপক ভেলরিক-এর অধীনে। ভেলরিক ছিলেন বুর্দেলের শিষ্য। আর বুর্দেল রদাঁর। ভাস্কর্যে পাশ্চাত্য আধুনিকতার যে ভিত্তি তৈরী করেছিলেন রদাঁ ও বুর্দেল, সেই ধারার সঙ্গে এভাবেই যুক্ত হলেন চিন্তামণি কর তাঁর শিক্ষানবিশির প্রথম পর্যায় থেকে। কিন্তু ভেলরিক তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছেন ভারতীয় ধ্রুপদী ভাস্কর্যের মহত্ত্বকে অনুধাবনের দিকে। বলেছেন—'শিব, বুদ্ধ, নটরাজ-স্রষ্টাদের ছেড়ে শিখতে এসেছ আমাদের কাছে?'

এ দিকে স্বাধীনতা আন্দোলন ও নব্য-বঙ্গীয় চিত্ররীতির সঙ্গে সংযোগ, অন্যদিকে ইওরোপীয় শিল্পীদের ভারতীয় ভাস্কর্যের মহত্ত্ব সম্পর্কে স্বীকৃতি তাঁর মধ্যে শিল্পের স্বদেশ সম্পর্কে যে চেতনা জাগিয়েছিল, সেই বোধই সারাজীবন তাঁর ভাস্কর্যের মধ্যে দিয়ে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। সাধারণত তিনটি বৈশিষ্ট্য আমরা দেখতে পাই তাঁর ভাস্কর্যের বিকাশে। প্রথমটি ধ্রুপদী বা লৌকিক ভারতীয়তাকে আধুনিকতার মূল্যমানে অভিষিক্ত করার চেষ্টা, যেমন তাঁর বুদ্ধমূর্তিতে দেখা যায়।

দ্বিতীয়টি পাশ্চাত্য ধ্রুপদী রীতি অনুযায়ী অনুপুঙ্খ স্বাভাবিকতার রূপায়ণ যেমন পরিস্ফুট হয় তাঁর ধাতু-ভাস্কর্যগুলিতে। এই স্বাভাবিকতাই রূপান্তরিত হয়ে এক বিমূর্ত রূপকল্পের দিকে যায়, যেখানে পাশ্চাত্য আধুনিকতার সংশ্লেষণ যেমন থাকে, তেমনি থাকে লৌকিক

ভারতীয়তার রূপান্তরণও। এই বিমূর্তায়িত অবয়বী প্রকাশকে বলা যায় তাঁর ভাস্কর্যের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য। এই ত্রিমুখী বৈচিত্র্যের মধ্যেও যে সাধারণ ঐক্যে বিশিষ্ট তাঁর ভাস্কর্য, তা হল সুস্থিত এক ধ্রুপদী বোধের বিস্তার, যেখানে বাস্তবের সংঘাত বা আলোড়ন তেমন নেই। একদিকে ধ্রুপদী ভারতীয়তা, আর একদিকে পাশ্চাত্য আধুনিকতা, এই দুইয়ের মধ্যে টানাপোড়েন তাঁর ভাস্কর্যে প্রায় সব সময়ই চলেছে। এই দ্বন্দ্বের সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে নিজস্ব এক রূপকল্পের অন্বেষণ তাঁর ছিল। কিন্তু সব ক্ষেত্রে এই দ্বন্দ্ব সমন্বিত হয়ে ওঠে নি। এই অসমন্বিত দ্বন্দ্ব অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর ভাস্কর্যের একটা সমস্যা। তাঁর পূর্ণাঙ্গ চিত্রে এই সমস্যা তত প্রগাঢ় নয়, কেননা সেখানে তিনি কেবল প্রাচ্য-চেতনাতেই সংস্থিত থাকতে পেরেছেন।

তাঁর ড্রয়িং যেহেতু তাঁর সামগ্রিক রূপচিন্তারই প্রথম অঙ্কুর, তাই পূর্বোক্ত দ্বন্দ্বের নানা প্রতিফলন সেখানেও থেকে যায়। তাঁর ড্রয়িংগুলি এই আলোকেই বিচার্য। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এই বইতে অনেক ক্ষেত্রেই ছবির প্রকৃষ্ট প্রতিলিপি পাই না। মুদ্রণের প্রক্রিয়ার নান্দনিক সৌষ্ঠব খানিকটা ব্যাহত হয়েছে। প্রতিমাকল্পের উপস্থাপনার তীক্ষ্ণতা সাদা-কালোর বৈপরীত্যে নিষ্প্রভ হয়েছে। এই অভাবটুকুকে মেনে নিয়ে এ বই দেখলে অন্তত তাঁর ড্রয়িং-এর ক্রমবিকাশ সম্পর্কে একটা ধারণা পেতে পারবেন পাঠক বা দর্শক।

এ বইতে প্রথম যে ড্রয়িংটি দেখি, তার শিরোনাম 'অনিমা', পেনসিলে আঁকা, ১৯৩৫-এর কাজ। এখন তাঁর বয়স কুড়ি। ছবিটিতে আমরা উপবিষ্ট এক তরুণীর সামনে থেকে দেখা প্রতিমাকল্পের রূপায়ণ দেখতে পাই। সম্পূর্ণই স্বাভাবিকতা-আশ্রিত উপস্থাপনা। রেখার সঙ্গে সাফল্য ছায়াতপের ব্যবহারে অবয়বে সুন্দর বর্তনা আনা হয়েছে, যা শরীরের ত্রিমাত্রিক আয়তনকে প্রকৃষ্টভাবে পরিস্ফুট করেছে। দ্বিতীয় ড্রয়িংটিও পেনসিল আঁকা ১৯৩৬-এর কাজ। শিরোনাম 'বাঙালী মেয়ে'। এটিও যথাযথ রূপায়ণে এক তরুণীর মুখাবয়ব। এই দুই অঙ্কনে সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্টসে শিক্ষা শেষ করার পরে এবং বিদেশে যাওয়ার আগে তাঁর কাজের ধরনের খানিকটা আভাস পাই। তাঁর রচনায় আয়তনময়তা আছে, যা অনেকটা ভাস্কর্যসুলভ। প্রশান্ত স্নিগ্ধতা আছে, যার মধ্যে দিয়ে এক ধ্রুপদী অনুভবের অনুরণন পাই। 'ওরিয়েন্টাল আর্টস' অনুসৃত স্বদেশচেতনার সঙ্গে এইখানে তাঁর যোগ। শিল্পী জীবনের একেবারে গোড়াতেই দৃশ্যতার এই এক দর্শনকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন, যেটা তাঁর সারা জীবনের শিল্পকর্মের উপর একটা নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছে। এই ভিত্তির উপরেই তিনি পাশ্চাত্য চেতনাকে আত্তীকৃত করেছেন।

এই দুটি কাজ থেকে এও আমরা বুঝতে পারি যে তাঁর শিল্পে বিনম্র অথচ স্পষ্ট দিবালোকই প্রাধান্য পায়। আলোছায়ার আলাদা অজানা নিভৃত কোনও রহস্য খুব একটা প্রশ্রয় পায় না। ওটা তাঁর ড্রয়িং-এর পরবর্তী বিকাশেও আমরা দেখতে পাব। এই দুটি কাজ যে সময়ের তখন তাঁর বয়স ২০-২১। আমরা যদি অবনীন্দ্রনাথের এই একই বয়সের কিছু ড্রয়িং-এর দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাই এই স্বচ্ছ আলোর বিপরীতে রহস্যময় আলো-ছায়ার পরিমণ্ডলের স্বরূপ কেমন। অবনীন্দ্রনাথের তিনটি ড্রয়িংকে বেছে নেওয়া যায় দৃষ্টান্ত হিসেবে। তিনটি কালি-কলমের কাজ প্রথমটি ১৮৯০এর 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ধর্মোপদেশ দিচ্ছেন', দ্বিতীয়টি ১৮৯২-এর 'জোড়াসাঁকোর বাড়িতে কথকতা', তৃতীয়টি ১৮৯৩-এর 'নদীর পথে'—কলসি কাঁখে এক নারীর হেঁটে যাওয়ার দৃশ্য, পেছন থেকে

দেখা। তিনটি কাজেই কালি-কলমের সরু রেখার সূক্ষ্ম কারুকাজে আলোছায়ার দ্যোতনা এনে স্বাভাবিকতার মধ্যেও এক দৃশ্যাতীতের ব্যঞ্জনা আনা হয়েছে। শিল্পের মধ্য দিয়ে জীবনের গভীরতর নিভৃত এক রহস্যের উন্মোচন প্রয়াস অবনীন্দ্রনাথের প্রধানতম এক বৈশিষ্ট্য। আবহমানের শিল্পের একরকম এটি ধারা প্রবহমান।

রামের ১৯ বছর বয়সে (১৮৫৯) আঁকা একটি আত্মপ্রতিকৃতি যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে দেখি পরিপূর্ণ স্বাভাবিকতার মধ্যেও ছায়াতপের হাল্কা বুননে বিনম্র এক গহনতা আনা হয়েছে অভিব্যক্তিতে। ইম্প্রেশনিস্ট-সুলভ এই গহনতা বা এক ধরনের রোমান্টিক অনুভব তাঁর সারা জীবনের কাজে, ড্রয়িং ও ভাস্কর্যে উভয়তই, পরিব্যাপ্ত হয়েছে। হেনরি মুরের ড্রয়িং-এ পাই তীব্র প্রতিবাদী অভিব্যক্তি, যা তাঁর ভাস্কর্যেরও প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। আমাদের রামকিঙ্করের ড্রয়িং-এর বৈচিত্র্য বহু-ব্যাপ্ত। তাতে সুবেগে ছন্দিত প্রকাশ যেমন আছে, তেমনি আছে আদিমতা-সম্পৃক্ত অভিব্যক্তির তীব্রতা। তাঁর রেখার জঙ্গমতা অসামান্য প্রাণচঞ্চল। আবার আলোছায়ার মধ্য দিয়ে এক রহস্যেরও উন্মোচন আছে তাঁর। চিন্তামণি করের ড্রয়িং-এ এরকম ব্যাপ্তি নেই। এরকম প্রতিবাদী চেতনা নেই। এরকম রহস্যময়তা নেই। স্বাভাবিকতা-আশ্রিত প্রশান্ত এক ধ্রুপদী বোধ তাঁকে প্রায় আজীবন চালিত করেছে।

এ বইয়ের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম কাজ ১৯৩৮-৩৯ এর। পেনসিলে আঁকা নগ্নিকার রূপায়ণ। শিল্পী তখন প্যারিসে। তৃতীয়টিতে দুটির তুলনায় হঠাৎই যেন এক বিজাতীয়, অত্যন্ত পরিশীলিত প্রথম রূপবিন্যাস দেখতে পাই। নারী এমন এক ছন্দিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে হাঁটু মুড়ে দাঁড়িয়ে আছে যে তার হাত ও পায়ের বিন্যাস কয়েকটি জ্যামিতিক শূন্য ক্ষেত্রের সৃষ্টি করেছে। এই শরীর সম্পূর্ণ পার্থিব। খানিকটা গ্রিসিয় বা হেলেনিয় পার্থিবতা, আদর্শায়িত স্বাভাবিকতা যার মূল সুর, যেন সহসা তিনি আরম্ভ করলেন তাঁর ইওরোপ প্রবাসের সূত্রে, চতুর্থ ও পঞ্চম ড্রয়িং দুটিতে রয়েছে দুজন এবং একজন শায়িতা নারীর রূপায়ণ। ইন্দ্রিয়ময়, স্বাভাবিকতা-আশ্রিত রূপারোপ। রেখার জঙ্গমতা শায়িত স্থির শরীরেও এক গতিপ্রবাহ এনেছে। ৬ থেকে ১০ নং কাজও প্যারিসে ১৯৩৯-এ করা। সবই নারীর মুখাবয়ব বা নগ্নিকার রূপায়ণ। হেলেনিয় আদর্শায়িত স্বাভাবিকতারই প্রসারণ দেখি এখানে।

এতগুলি কাজের পরে ১২নং ড্রয়িংটিতে এসে আমরা একটু ভিন্ন স্বাদ পাই। প্যারিস থেকে ফেরার পর ১৯৪৫-এ দিল্লীতে অবস্থান কালে এটি করা—শিরোনাম : 'ক্লান্ত খাটুরে', দু হাঁটুর উপর মাথা গুঁজে প্রায় ঘুমন্ত অবস্থায় বসে আছে ক্লান্ত এক কর্মী মানুষ। রেখার সঙ্গে ছায়াতপের মিশেলে করা, আলোছায়ার দ্যোতনায় স্বাভাবিকতা প্রগাঢ়তর হয়েছে। কিন্তু পার্থিবতাকে ছাপিয়ে তা আদর্শায়িত হয়ে ওঠে নি। এই কাজটি শিল্পীর রেখারূপের বলিষ্ঠতার এক অসামান্য দৃষ্টান্ত।

এ পর্যন্ত যে কাজগুলো দেখলাম, তাতে ভাস্কর্যসুলভ আয়তনময়তা থাকলেও তারা মূলত চিত্রধর্মী। এর পর থেকে যে কাজগুলো পাচ্ছি তাদের অধিকাংশই অনেকটা ভাস্কর্যের খশড়ামূলক। ১৩ থেকে ১৭ পর্যন্ত কাজগুলি ১৯৫০ থেকে ১৯৫৫-র মধ্যে লন্ডন ও প্যারিসে বসে করা। কিছু কিছু বিমূর্ততার আভাস আসছে। শরীরের গতির ছন্দটিই বিমূর্তায়িত হয়ে রূপ পাচ্ছে এখানে। বিমূর্তায়িত শরীরের এই ছন্দই ক্রমান্বয়ে তাঁর ভাস্কর্যের মূল উপজীব্য হয়ে উঠবে। কেমন করে শরীর থেকে ছন্দটিকে বের করে এনে

তাকে ভাস্কর্যের দিকে নিয়ে গেছেন তিনি, তার এক সুন্দর দৃষ্টান্ত ১৮ নং কাজটি, ১৯৬৫-তে পাথর স্তুপে করা 'স্কেচেজ ফর স্কাল্পচার'। এক নগ্নিকাই এখানে নানাভাবে রূপায়িত ও রূপান্তরিত হয়েছে। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত এই শরীরাংশগুলি সম্পূর্ণ শরীর হয়ে উঠতে চাইছে। ছায়াতপ ও রেখার ভাসের দক্ষ প্রয়োগে শরীরের ইন্দ্রিয়ময়তা বাঙময় হয়ে উঠেছে। তারপর সেই শরীরের নিহিত ছন্দটি ভাস্কর্যের দিকে চলে যাচ্ছে। নারীর শরীরের ছন্দ ও গতিভঙ্গিকে কতরকমভাবে ভাস্কর্যে রূপান্তরিত করা যায় তার দৃষ্টান্ত রয়েছে ১৯৬৫-র ১৯নং পাথরস্তুপটিতে, যার শিরোনাম 'অনডাইসন'। হেলেনীয় ধ্রুপদীচেতনা রদাঁ, বুর্দেল, মাইঅল হয়ে ব্রাঁকুসিতে যেভাবে আধুনিকতায় রূপান্তরিত হচ্ছিল, এবকম কাজে আমরা তারই প্রতিফলন দেখতে পাই।

২০ নং কাজটির শিরোনাম 'ইকারাস' ('Icurus')। ১৯৬৫-র এই ড্রয়িংয়ে গ্রিক পুরাণকল্পের সেই আকাশে উড্ডীন পুরুষকে এখানে অনেকটাই স্বাভাবিক দেখতে পাই। 'ইকারাসে'র এই প্রত্যয়টিকে নিয়ে শিল্পী অনেক ভেবেছেন এবং কাজও করেছেন। ১৯৯৫-এর দুটি ড্রয়িং-এ দেখতে পাই কেমন করে এই ভাবনাকে এবং এই ভাবনা-আশ্রিত রূপকল্পকে বিমূর্তের দিকে নিয়ে গেছেন। ৩৭ নং কাজটিতে তবু যুবকের শরীরের আভাস কিছু পাওয়া যায়। ৩৮ নং, বা এই বইয়ের শেষ কাজটির শরীর সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে উড্ডীয়মানতার ছন্দটিই শুধু রয়েছে। এই বিশুদ্ধ রূপে পৌঁছনোর জন্যই যেন ৬০ বছর ব্যাপী শিল্পীর পরিক্রমা।

এই দুই 'ইকারাস'-এর বা 'আইকারাস'-এর মাঝখানে শিল্পী রূপভাবনার আরও অনেকটা পথ পরিভ্রমণ করেছেন। সেখানে আমরা বাংলার লৌকিক রূপের সারল্যের প্রতিফলন যেমন দেখতে পাই, তেমনি পাই কল্পরূপাত্মক ও কিম্ভূত ও গ্রটেস্ক নানা রূপকল্পও। ২৮ ও ৩০নং পাথরস্তুপ দুটির বিষয় 'নৃত্য' দুটিই ১৯৭৯-র কাজ। প্রথম থেকে যে আয়তনময়তা দেখে এসেছি তাঁর কাজে এখানে সেটা একেবারেই দ্রবীভূত হয়ে বায়বীয় বা etherial রূপ পরিগ্রহ করল। ৩০নং কাজটিতে নৃত্যরতা নারীর রূপায়ণে এর রাবীন্দ্রিক রহস্যময়তার স্পর্শও যেন পাওয়া যায়। এ সমস্তকে ছাপিয়ে এক প্রজ্ঞাদীপ্ত লাবণ্যই যেন তাঁর রূপের মুক্তি ঘটায়, যার অনবদ্য দৃষ্টান্ত ১৯৯৫-তে কালি-কলমে আঁকা মা ও শিশুর প্রতিমাকল্প। অসামান্য পরিমিতি বোধের মধ্যে দিয়ে কয়েকটি রেখা সঞ্চালিত হয়ে গড়ে তুলেছে প্রশান্ত, দীপ্ত এক প্রতিমাকল্প—চিরন্তন মা, চিরন্তন সন্তানকে কোলে নিয়ে বসে আছেন। এই প্রতিমাকল্পে গ্রিসির খ্রিস্টিয় এবং ভারতীয় ঐতিহ্য এক আধারে মিলে গেছে।

চিন্তামণি করের শিল্পীজীবনের প্রস্তুতি পর্বের খানিকটা কেটেছে চল্লিশের দশকে। চল্লিশের দশকের শিল্পীদের মধ্যে দুটি প্রধান প্রবণতা দেখা যায়। একটি সমাজচেতনা ও প্রতিবাদী চেতনা। দ্বিতীয়টি স্বদেশ চেতনাকে আন্তর্জাতিকতায় অভিষিক্ত করার চেষ্টা। চিন্তামণি কর এই দুটি প্রবণতারই বাইরে থেকেছেন। স্বদেশচেতনার ভিতর দিয়েই শুরু হয়েছিল তাঁর শিল্পীজীবন, কিন্তু ইওরোপ যাওয়ার পরে যে পাশ্চাত্য ধ্রুপদী বোধ তাঁকে প্রকাশকে আকৃষ্ট করে, সেটাই তাঁকে সারা জীবনই নিয়ন্ত্রণ করেছে। সেটাকেই তিনি দেশীয় ঐতিহ্যের দিকে নিয়ে আসতে চেষ্টা করেছেন। ফলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের একটা দ্বন্দ্ব তাঁর মধ্যে থেকে গেছে। সব সময় তা সমন্বিত হয় নি। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এই অসমন্বিত

দ্বন্দ্বই তাঁর কাজের অন্যতম এক বৈশিষ্ট্য। যেখানে তা সমন্বিত হয়েছে সেখানেই আমরা পেয়েছি তাঁর শ্রেষ্ঠ কাজ, যেমন পূর্বোক্ত মা ও শিশুর রূপারোপটি (৩৫নং)।

এই বই তাঁর ড্রয়িং-এর ক্রমবিকাশের মধ্যে দিয়ে তাঁর সামগ্রিক কাজের ক্রমবিকাশকেও বুঝে নিতে সাহায্য করে।

মৃণাল ঘোষ

'চিন্তামণি কর : সিলেক্টেড ড্রয়িংস'। সম্পাদনা : সমীক বন্দ্যোপাধ্যায়/আর্ট ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল, কলকাতা। ২৫০.০০ টাকা

চলচ্চিত্রে উপেক্ষিত হীরালাল সেন

ভারতীয় চলচ্চিত্রের পুরোধা পুরুষরূপে হীরালাল সেন আজও তাঁর ঐ ঐতিহাসিক স্বীকৃতি থেকে বঞ্চিত হয়ে আছেন। হীরালাল সেনের উল্লেখ ও অবদান নিয়ে কিছু রচনার পরিচয় পাওয়া গেলেও কোন সুবাদে তাঁর প্রাথমিক কৃতিত্বকে অস্বীকার করে দাদা সাহেব ফালকে-কে সেই আসন দেওয়া হয় তার সন্তোষজনক তথ্য ও যুক্তি নেই। ইতিহাসের চেয়ে আবেগ কিম্বা দলচক্রের সোচ্চার কীর্তনের কলরোল হীরালালের ঐতিহাসিক কৃতিত্বকে দাবিয়ে রাখে হয়তো। হীরালাল তাই ঐতিহাসিক পুরুষ হয়েও ইতিহাসে অনাদৃত; বিকৃত তথ্যের শিকার। এমন কি ভারতীয় চলচ্চিত্রের শতবর্ষ পালিত হয় হীরালাল সেনকে উপেক্ষা করে। এই ঐতিহাসিক পুরুষ হীরালাল সেনকে নিয়ে তথ্যভিত্তিক আলোচনা গ্রন্থ 'আর রেখোনা আঁধারে।' লেখক ডাঃ সজল চট্টোপাধ্যায় এই গ্রন্থে হীরালাল সেনকে উন্মোচিত করেছেন ভারতীয় চলচ্চিত্রের ও বঙ্গরঙ্গমঞ্চের পটভূমিতে সমান্তরাল ভারতীয় ধারায়। কেননা এদেশে চলচ্চিত্র বিকাশলাভ করেছে মূলত রঙ্গমঞ্চের আনুকূল্যে। তার জনপ্রিয়তাও পরিচিত নাট্যাভিনয়ের সুবাদে।

উনিশ শতকের শেষ দশকের অন্তিম পর্বে ভারতের রাজধানী কলকাতায় চৌরঙ্গীর রয়াল থিয়েটার এ ১৮৯৭ এর ২০শে জানুয়ারী প্রথম চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। স্বল্পদৈর্ঘ্যের টুকরো টুকরো বিষয় নিয়ে এইসব চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছিলেন মিঃ হাডসন। দেশী-বিদেশী অনেক আকর্ষণীয় বিষয় নিয়ে এই-সব খণ্ড চিত্র নির্মাণ করা হতো। হীরালাল সেন প্রথম ভারতীয় চলচ্চিত্র-গ্রাহক রূপে সেকালের সেই ব্যবস্থার শরিক হয়েছিলেন। এ ব্যাপারে প্রখ্যাত অভিনেতা অমরেন্দ্রনাথ দত্তের সহযোগিতা তিনি পেয়েছিলেন। অমরেন্দ্রনাথ ক্লাসিক থিয়েটারে অভিনয়ের ফাঁকে বায়স্কোপ প্রদর্শনের ব্যবস্থা করে দর্শকদের আকৃষ্ট করতেন। সম্ভবত ১৯শে মার্চ ১৯৯৮ এ প্রথম প্রদর্শনী হয়। তারও আগে ১৮৯৭ এর ৩১শে জানুয়ারী মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম প্রদর্শন। এরপর স্টার ও বেঙ্গল থিয়েটারে বায়স্কোপ দেখানো শুরু হয়।

ডাঃ সজল চট্টোপাধ্যায় এদেশে চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর ধারাবাহিক ইতিহাসের সঙ্গে হীরালাল সেনকে যুক্ত করে তাঁর কৃতিত্ব ও ভারতীয় চলচ্চিত্রকার রূপে তাঁর ঐতিহাসিক

ভূমিকা নির্ণয় করেছেন। ধারকরা যন্ত্র নিয়ে তিনি প্রথম ছবি তোলেন এবং তা দেখান। হীরালালের প্রথম প্রদর্শন ক্লাসিক থিয়েটারে ৪ঠা এপ্রিল ১৯৯৮। কলকাতা ও 'অন্যান্য বিষয়' নিয়ে তিনি প্রথমে কয়েকটি খণ্ড চিত্র তৈরী করেন। এরপর ধারাবাহিকভাবে তাঁর চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হতে থাকে। হীরালাল নাটকের যে সব খণ্ডচিত্র তুলতেন সেই কাজে তাঁর সহায়ক ছিলেন ক্লাসিক থিয়েটারের অমর দত্ত। এই প্রসঙ্গ গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। রঙ্গালয় প্রসঙ্গে লেখক অমরেন্দ্রনাথ দত্তকে নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। গ্রন্থটি স্থান বিশেষে তাই বাংলা রঙ্গালয় ও নাট্যাভিনয়ের ইতিহাসের রূপ পেয়েছে। প্রাসঙ্গিক আলোচনার পরিমিতিবোধ সীমারেখা অতিক্রম করায় গ্রন্থনায় সংহতির অভাব উপলব্ধ হয়। কেননা, হীরালালকে কেন্দ্র করে যেখানে বক্তব্যের আবর্তন, সেখানে রঙ্গালয় ও নাট্যাভিনয়ের ইতিহাসের ঘূর্ণিপাকে হীরালাল প্রায়শই হারিয়ে গেছেন। তথাপি তিনি নিঃসন্দেহে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছেন তখন যখনই বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চের নাট্যাভিনয়ের তালিকার উল্লেখ এসেছে এবং বায়োস্কোপের প্রসঙ্গ বাদ পড়েনি। 'ক্লাসিক' এ অভিনীত আলিবাবার খণ্ড চিত্র হীরালাল তুলে প্রদর্শন করতেন। ১৯০৩-এ হীরালালের একমাত্র পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্র 'আলিবাবা' মুক্তি পায়। এটি ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা। এডুইনএস পোর্টারের 'দি গ্রেট ট্রেন রবারি'-র ও মুক্তির আগে এটি ঘটে। পোর্টারের ছবিটিকে, বিশ্বের প্রথম কাহিনী চিত্র বলা হয়। যদিও হীরালালের 'আলিবাবা'র মুক্তির তারিখ ২৩শে জানুয়ারী ১৯০৩। সেই হিসাবে তিনি পোর্টারের পূর্ববর্তী এবং তাঁর পূর্ণদৈর্ঘ্যের 'আলিবাবা' সময় বিচারে বিশ্বের প্রথম পূর্ণাঙ্গ কাহিনী চিত্র।

দাদাসাহেব ফালকের 'রাজা হরিশ্চন্দ্র' বাণিজ্যিকভাবে মুক্তি পায় ১৯১৩-র ১৩মে বোম্বাই এর করোনেশন-এ-দৈর্ঘ্য ছিল ৩৭০০ ফুট। চিত্রটি পুনঃ সম্পাদিত হয়ে যখন প্রদর্শিত হয় তখন দৈর্ঘ্য কমে দাঁড়ায় ২৯৪৪ ফুট। কলকাতায় ম্যাডান কোম্পানী এ্যালফ্রেড থিয়েটারে ২রা জুলাই ১৯২৩-এ তিন রিলের রামায়ণ প্রদর্শন করেন। এভাবেই ভারতে চলচ্চিত্র নির্মাণের ইতিহাস গড়ে ওঠে। হীরালাল মূলত রঙ্গমঞ্চে অভিনীত অংশ খণ্ড খণ্ড করে চলচ্চিত্রে ধরে রাখতেন। ১৮৯৯ থেকে ১৯০৩-৪ পর্যন্ত তিনি এ ধরনের কাজ করেছেন। 'আলিবাবা' ও এভাবেই তোলা হয়েছিল। পরে খণ্ড অংশগুলি যুক্ত হযে অখণ্ড তথা পূর্ণাঙ্গ রূপ পায় এবং মুক্তি পায় দাদাসাহেব ফালকের পূর্ণ দৈর্ঘ্যের কাহিনী চিত্রের দশ বছরও আগে! তথাপি দাদাসাহেব ফালকে father of Indian Feature film এর ঐতিহাসিক মর্যাদা দেওয়া হয়। এর কারণ রহস্যজনক। এ বিষয়ে চলচ্চিত্রের ঐতিহাসিকেরা কেউ নীরব, কেউ বা হীরালালের 'আলিবাবা'র উল্লেখ করেও তাঁকে সেই মর্যাদা দানে কুণ্ঠিত! দাদাসাহেবের দাবির যৌক্তিকতা কোন অর্থে হীরালালের তুলনায় বেশী তা সুস্পষ্ট নয় পূর্ববর্তীদের রচনায়।

গ্রন্থটি হীরালাল সেনকে অবলম্বন করে বাংলা রঙ্গমঞ্চ ও চলচ্চিত্র শিল্পের একটি সাময়িক ও খণ্ড ইতিহাস। হীরালালের কর্মকাণ্ডের সবিস্তার বর্ণনা থাকলেও সেটাই একমাত্র বিষয় হয়ে ওঠেনি। হীরালাল 'আলিবাবা'-র পরে আর কোন পূর্ণাঙ্গ চিত্র সৃষ্টি করেননি। হাত দিয়েছিলেন নানা ধরনের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যচিত্র নির্মাণে। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন, কলেজ স্কোয়ারে জমায়েত ও শোভাযাত্রা টাউন হলের জনসভা, ১৯৩০-এ

সপ্তম এডোয়ার্ডের কলকাতায় অনুষ্ঠিত করোনেশন উৎসব প্রভৃতির ছবি ছাড়াও অনেক সংবাদ-চিত্র ও বিজ্ঞাপন-চিত্র তিনি তুলেছিলেন। আবার মঞ্চে অভিনীত বহু নাটকের খণ্ডচিত্রও তিনি তুলেছিলেন, যে গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভ্রমর, আলিবাবা, হরিরাজ, দোললীলা, বুদ্ধ, সীতারাম, সরলা প্রভৃতি। রয়াল বায়স্কোপ কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করে হীরালাল তাঁর কর্মকীর্তি-কে চিহ্নিত করে গেছেন। লেখক হীরালাল নির্মিত চলচ্চিত্রাবলীর প্রদর্শনী তালিকাও উদ্ধার করেছেন।

লেখক গ্রন্থে অনেক তথ্য দিয়েছেন। সেগুলির মধ্যে কালীশ মুখোপাধ্যায় সংগৃহীত তথ্যাবলীই সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়েছে। আবার খণ্ডিতও হয়েছে। তবে তথ্য সংগ্রহে লেখক নিরলস পরিশ্রমের স্বাক্ষর রেখেছেন এবং সেগুলির বিন্যাসের যুক্তি ও বিশ্লেষণ তাঁর বক্তব্য প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। হীরালাল সেনের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের প্রসঙ্গ এ গ্রন্থে অনেকটা জায়গা জুড়ে আছে। লেখক আসলে বঙ্গরঙ্গমঞ্চ ও চলচ্চিত্রের একটি পর্বের ইতিহাসে লিখেছেন, যা অবশ্যই এই ধারায় এটি নতুন সংযোজন। তথ্য-সমৃদ্ধ গ্রন্থটি ক্ষেত্র বিশেষে বিষয়-বিমুখ হয়ে পড়ায় সর্বত্র এর ভারসাম্য রক্ষা পায়নি। রঙ্গমঞ্চ ও অমর দত্তের বিস্তারিত বিবরণের প্রাবল্যে মাঝে মাঝে খেই হারিয়ে গেছে। তবে হীরালাল সেনকে লেখক স্বমহিমায় উন্মোচিত করতে পেরেছেন এবং তিনি কেন এবং কোন অর্থে ভারতীয় চলচ্চিত্রের জনক তা যুক্তি তথ্য সহযোগে প্রতিষ্ঠায় সফল হয়েছেন। গ্রন্থটিতে একটি সূচীপত্রের প্রয়োজন ছিল। সুমুদ্রিত ও সুশোভিত গ্রন্থটি দৃষ্টি নন্দনও বটে। গৌরাঙ্গ প্রসাদ ঘোষের ভূমিকাটি উচ্ছ্বাস পূর্ণ হলেও গ্রন্থের মূল সুরটি ধরিয়ে দেয়।

রামদুলাল বসু

আর রেখো না আঁধারে/সজল চট্টোপাধ্যায়/যোগমায়া প্রকাশনী কলকাতা- ৯।

মাটির কাছাকাছি মানুষের আখ্যান

কথাসাহিত্যিক হিসাবে সমীর রক্ষিত এখন যথেষ্ট পরিচিত। লেখার গুণেই তিনি বাংলা সাহিত্যে একটা স্থান করে নিয়েছেন। এখন পর্যন্ত তাঁর আটটি উপন্যাস বই হিসাবে প্রকাশিত হয়েছে এবং দু-টি গল্প গ্রন্থ। ইতিমধ্যে সমীর রক্ষিত স্বীকৃতি লাভ করেছেন, ত্রিবৃত্ত পুরস্কার লাভ তার মধ্যে অন্যতম। আলোচ্য উপন্যাস 'দুখের আখ্যান' যতদূর মনে হয় গ্রন্থ হিসাবে প্রকাশিত তাঁর নবম উপন্যাস।

উপন্যাসের নাম থেকে বোঝা যায়—এটি দুখের জীবন কাহিনী, তার জন্ম থেকে প্রাজ্ঞ হবার বিবরণ,-কিন্তু এ প্রাজ্ঞতা বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে লাভের প্রাজ্ঞতা নয়, জীবনের নানা ঘাত প্রতিঘাত দুঃখ কষ্টের মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত এক দৃঢ়তা, যা তাকে দাঁড় করিয়ে দেয় নিজস্ব এক-জায়গায়, এই রকম দাঁড়ানোকেই আমরা প্রাজ্ঞতা বলতে চাইছি।

উপন্যাসের শুরুতে জানিয়ে দেওয়া হল—দুখের বাবা কি ভাবে হয়ে গেল ভূমিচাষি, আবার কোন্ বিপাকে পড়ে সে কলকাতায় চলে আসে— "দুখের তখন বছর পাঁচেকের,

গঙ্গা তাকে বুকের কাছে নিয়ে শোনায় তার জন্মের কথা। সেই ঝড়ো রাত, তাল গাছের ডগায় আগুন, ডোরা কাটা বাঘ আর যুবতী কন্যা।" সেই গল্প দুখের জীবনে মিশে যায় রক্তমাংসের মত—এসব তার কাছে কিংবদন্তীর কাহিনী জীবনেরই কাহিনী। তাই পঞ্চানন যখন ছেলেকে ঠাট্টা করে বলে "বড় মিঁয়ারে বইল্যা দিও আমারি খাবার যেন মারে। ...., দুখের ছেলে দুখে বলে—আমি বনবিবিরে ধইর্যা নে আসবো।" তার জীবনের সঙ্গে মিশে গেছে ধোনাই মনাই-এর গল্প, বনবিবি, জঙ্গলী শা। কলকাতায় এসেও তা ভুলতে পারে না সে, তাই রায়চৌধুরী বাড়ি দেখে "দুখে ভাবে এটাকি সেই ধোনাইয়ের বাড়ি?" এ রকম বিভ্রম তার মনে পরেও জেগেছে। কিন্তু একে কি বিভ্রম বলা চলে? এতো বাস্তবের আরেক প্রকাশ। দুখের মনেই শুধু নয়, উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্রেও বাস্তব ও বিভ্রম একাকার হতে দেখা যায়। যে মানুষ মাটির কাছাকাছি থাকে, তার জীবন এখন সব সংস্কার দিয়ে গড়া, সেই সংস্কার তাদের জীবনেরই এক অঙ্গ অংশই বটে, তাই এসব সত্য বলেই মনে হয় তাদের।

অথচ, কলকাতার জীবনের নিষ্ঠুর বাস্তব তাকে ছিন্নমূল করে দিতে চায়। আর বাস্তবে তার মুখোমুখি কাজ করতে করতে দুখে অভিজ্ঞ হয়ে ওঠে নানাভাবে। কেষ্টচন্দ্র খুদে স্বৈরাচারী, তার পীড়ন ও শোষণ যেমন বাস্তবের নির্মম রূপ মোচন করে দেয়, তেমনি জন্ম দিতে থাকে প্রতিরোধ শক্তি। এই শক্তির উৎস যেমন বঞ্চনা পীড়ন, তেমনি এতে সক্রিয় ভূমিকা নেয় কালু। কালুর সঙ্গে পরিচয় না হলে পায়ের তলায় মাটি খুঁজে পেতে দুখেকে আরও কঠিন লড়াই চালিয়ে যেতে হতো, এজন্য হয়ত অপেক্ষাও করতে হতো তাকে।

তবু দুখের জীবন মসৃণ হয় না কখনো—একের পর এক দুর্ঘটনা-তাকে পঙ্গু করে দিতে থাকে, কিন্তু বিপদের দিনে কালু তাকে ছেড়ে যায় না তবু। নানা টানাপোড়েন দ্বিধা দ্বন্দ্ব শলাপরামর্শ-র পর কালু-দুখের প্রতিরোধ প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পথ বেছে নেয়—"সরাসরি তাকিয়ে বলে—গায় হাত তুলাবেনি। মায়না দেন, নয়তো ব্যাগ ধরবুনি।" কাজ করার বিনিময় মাইনে—হক-পাওনা, সে পাওনা-ও দিতে চায় না মালিক। ছোট দোকানের মালিক ও শিশু শ্রমিকের কাহিনী হয়ে ওঠে বঞ্চনার শোষণের চিরন্তন কাহিনী।

কিন্তু কাহিনীর একেবারে শেষে অধর-কে এনে লেখক সুলভ মীমাংসার পথে এগিয়ে গেলেন যেন। দু-পক্ষের সমস্যা মীমাংসার জন্য তৃতীয় পক্ষের দরকার হয় অনেক সময়, কিন্তু সেই তৃতীয় পক্ষের উপস্থিতি বা ভূমিকা অনিবার্য করা দরকার হয়—অধরের উপস্থিতি তেমন জরুরি করা দরকার ছিল। স্পষ্ট ভাবে দেখানো উচিত ছিল কেন কেষ্টচন্দ্র অধরকে দেখে নরম হয়ে যায়। আমাদের মনে হয় যে, আখ্যানের কেন্দ্রে দুখে কলকাতা এসেও ভুলতে পারে না বনবিবি জঙ্গলী শা ইত্যাদির কথা, সেই কাহিনীর পরিণতি এমন বৃত্তাকার ইচ্ছাপূরণের কাহিনী হয়ে ওঠা উচিত ছিল না—বিভ্রম ও বাস্তবের একাকারে যে-আখ্যান হয়ে উঠতে পারতো এক অশেষ কাহিনী—হয় দুখে কলকাতাতেই আবিস্কার করে নিত সুন্দরবনকে তার অন্যমাত্রায়।

কার্তিক লাহিড়ী

দুখের আখ্যান/সমীর রক্ষিত/ দীপপ্রকাশন/ ৪০ টাকা।

কলকাতা, ফিরে দেখা

বেশ কিছুকাল ধরে কলকাতাকে নিয়ে অনেক স্বনামধন্য ব্যক্তি লেখালিখি শুরু করে দিয়েছেন। রাধারমণ মিত্র, বিনয় ঘোষ, প্রাণকৃষ্ণ দত্ত, ডেসমন্ড ডয়গ, রথীন মৈত্র, পি.টি নায়ার প্রমুখ তাঁদের লেখায় ও রেখায় কলকাতাকে নানাভাবে দেখার চেষ্টা করেছেন। ভূগোলের প্রবীণতম অধ্যাপকদের অন্যতম, ছাত্র ও যুব আন্দোলনের নেতা অধ্যাপক সুনীল মুন্সীর 'ঠিকানা ঃ কলকাতা' প্রথমে 'সপ্তাহ' পত্রিকায় ও পরে গ্রন্থাকারে ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত হবার পরে সুধীসমাজে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছিল। সপ্তাহ সম্পাদক নিরঞ্জন সেনগুপ্ত প্রথম সংস্করণের সুলিখিত ভূমিকায় এই গ্রন্থের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।

যে সময়ে এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়, তার বেশ কিছুকাল আগে থেকেই কলকাতা শহর সম্বন্ধে অনেকেই নানা কটূক্তি করে চলেছিলেন। কলকাতা মিছিল নগরী, কলকাতা মৃত শহর প্রভৃতি অপভাষণ অনেকেরই মনে পড়বে। স্বয়ং পণ্ডিত নেহরুই কলকাতার বিরুদ্ধে তাঁর খেদ প্রকাশ করেছিলেন। এই প্রেক্ষাপটে সুনীল মুন্সীর 'ঠিকানা ঃ কলকাতা' বহুজনের মনে আনন্দের হিল্লোল বইয়ে দিয়েছিল। কারণ এই গ্রন্থটি ছিল ভিন্ন গোত্রের-ভিন্ন ধরণের। পাঠক সন্ধান পেলেন অনেক অজানা কাহিনীর—অনেক অজানা ঘটনার আর সাক্ষাৎ পেলেন সেই সব নেতা, বিজ্ঞানী ও সাহিত্যিকদের যাঁদের কাছে দেশসেবাই ছিল মূল মন্ত্র।

১৯৭৪ সালে গ্রন্থটি প্রকাশের পর কিছুকালের মধ্যেই সকল কপি বিক্রী হয়ে যায়। অবশেষে দীর্ঘ পঁচিশ বছর পরে গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ আমরা হাতে পেলাম। প্রথম সংস্করণে প্রকাশিত ৩১টি বাড়ির বিবরণের সঙ্গে চলতি সংস্করণে ৬টি বাড়ির বিবরণ সংযোজিত হয়েছে। এই ৩৭টি বাড়ির ঠিকানা হলো ৮/২, ভবানী দত্ত লেন/ ১, গার্স্টিন প্লেস/ ২৪৯, বহুবাজার স্ট্রিট/ ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট/ ৫৬-বি, কৈলাস বোস স্ট্রিট/ ৭২, হ্যারিসন রোড/ ৪৬, ধর্মতলা স্ট্রিট/ ১১০, কলেজ স্ট্রিট/ ৩, গৌর মোহন মুখার্জী স্ট্রিট/ ৮-ই, ডেকার্স লেন/ ১৮, মির্জাপুর স্ট্রিট/ ৭৭, ধর্মতলা স্ট্রিট/ ৯১, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড/ ৬২, রাজাবাজার স্ট্রিট/ ৪, এসপ্ল্যানেড রো ওয়েস্ট/ ইউনিভার্সিটি লেন/ ২৪৩/১, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড/ ১৮৮/২, বহুবাজার স্ট্রিট/ ৩-৪ আজাদ হিন্দ বাগ/ ৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট/ ৪৯, কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট/ ৪৮, কৈলাস বোস স্ট্রিট/ ২৩, শিবনারায়ণ দাস লেন/ ৭, প্রতাপ চ্যাটার্জি লেন/ মল্লিক বাড়ি, চিৎপুর রোড/ ৬, প্রতাপ চ্যাটার্জী লেন/ মুরারি পুকুরের বাগান বাড়ি/ প্রেসিডেন্সি কলেজ/ ৬ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন/ ৯০/৭এ, হ্যারিসন রোড/ ৯৫ এ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ/ ৩৭, হ্যারিসন রোড/ ৭ নং মৌলবী লেন/ ২৫ নং পার্ক লেন/ ২/১, ইউরোপীয়ান অ্যাসাইলাম লেন/ ৮৪ নং মেছুয়া বাজার স্ট্রিট/ ৪১ নং ক্যানেরিয়া স্ট্রিট।

প্রতিটি বাড়িই নানা দিক দিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে রয়েছে। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন, সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন ছাত্র-যুব আন্দোলন, শ্রমিক-কৃষক আন্দোলন, মহিলা আন্দোলন, বহুব্যাপ্ত সাংস্কৃতিক আন্দোলন এবং কমিউনিস্ট আন্দোলনের সূতিকাগার ছিল এইসব বাড়ি। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে কংগ্রেস শাসনে নিপীড়িত কমিউনিস্ট পার্টি

ও পার্টি পত্রিকা স্বাধীনতার বাড়ির কথাও এখানে আছে। সর্বোপরি, বাঙলার তিন বরেণ্য সন্তান, স্বামী বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের বাড়ির কথাও লেখক সুনিপুণ ভাবে বর্ণনা করেছেন।

ভাষা এই গ্রন্থের বিশেষ সম্পদ বলে গণ্য হবে। সুন্দর বাঙলায় লেখা প্রতিটি বাড়ির বিবরণ এবং সঙ্গে লেখকের নিজের হাতে করা স্কেচ প্রতিটি বিষয়কে প্রাণবন্ত করে তুলেছে।

এই গ্রন্থটি নানা দিক দিয়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কলকাতার সমাজ, কলকাতার ইতিহাস, কলকাতার সংস্কৃতির এক অন্যতর পরিচয় এখানে পাওয়া যাবে। কলকাতার সামাজিক ইতিহাস যাঁরা রচনা করতে চান, তাদের কাছে গ্রন্থটি অপরিহার্য বলেই গণ্য হবে।

স্বামী বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের বাসগৃহের বর্ণনা লেখক দিয়েছেন। এরই সাথে সাথে রামমোহনের বাড়ি, বাদুর-বাগানে বিদ্যাসাগরের বাড়ি, নিবেদিতা লেনে ভগিনী নিবেদিতার বাড়ির বিবরণ থাকলে ভাল হত। বিশপস্ কলেজ স্থান পেলে মধুসূদন-কেও সীমাবদ্ধভাবে স্থান দেয়া যেত।

বোস ইনষ্টিটিউট, ড. মহেন্দ্রলাল সরকার প্রতিষ্ঠিত ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অফ সায়েন্সের বহু বাজারের পুরোনো বাড়ি ও ইউনির্ভাসিটি ইনষ্টিটিউটের কথাও এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে।

এছাড়া, বাগবাজারের নন্দলাল বসুর বাড়ি ও শোভাবাজারের রাজবাড়ির কথাও গ্রন্থে স্থান দেয়া যেত।

প্রথম সংস্করণ প্রকাশ কালে লেখক যে সব কথা লিখেছিলেন, ২৫ বছর পরে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণে তা-ই অবিকল প্রকাশ করায় বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে ভাষায় অসংহতি রয়ে গেছে। ছাপায় ভুল ও একেবারে কম নয়। আশা করি আগামী দিনে নতুন সংস্করণ প্রকাশ কালে পরম শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকারের নজর এই সকল বিষয়ে এড়িয়ে যাবে না।

অজয় গুপ্তের প্রচ্ছদ সুন্দর। এমন সুশোভন গ্রন্থ প্রকাশের জন্য প্রকাশক মনীষা গ্রন্থালয় সকলেরই প্রশংসা পাবেন। আমরা এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

কমল সমাজদ্বার

ঠিকানা : কলকাতা/সুনীল মুনসী। মনীষা গ্রন্থালয়। কলকাতা-৭৩/মূল্য ৫০ টাকা

সংগ্রামী নারীর কাহিনী

'সংগ্রামী নারী যুগে যুগে'—বইটি প্রকাশ করেছেন ঢাকা থেকে বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ। পরাধীন ভারতবর্ষের এই শতকের প্রায় প্রথম থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত যে সব বাঙালী নারী স্বাধীনতা, শান্তি, প্রগতি, সাম্য ও মানুষের অধিকার নিয়ে সংগ্রাম করেছেন, তাঁদের মধ্যে একশো জনের সংক্ষিপ্ত জীবন ও কর্মের বিবরণ বইটির বিষয়। মাত্র ২৬৭ পৃষ্ঠার মধ্যে এতোগুলি মূল্যবান সংগ্রামী জীবনকে বিধৃত করা সহজ নয়, সেই কঠিন কাজটি

সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন করেছেন সম্পাদকমণ্ডলী। সুন্দর কাগজে, ঝকঝকে ছাপায়, ছবি সহ বইটির আকৃতি খুবই আকর্ষণীয়।

বিশিষ্ট চিন্তাবিদ, সাম্যবাদী প্রবন্ধিক রণেশ দাশগুপ্তের ভাষায় এঁরা সকলেই 'নয়, এ মধুর খেলার' রচয়িত্রী। বলা যায় এঁরা সকলেই যা করেছেন, মধুর তো নয়ই, কঠিন সংগ্রাম, কবির ভাষায় 'খেলা'—আবার তা মধুরও নিশ্চয়—কারণ এঁরা সকলেই যে খেলায় নেমেছিলেন, যে সংগ্রাম সাধন করেছিলেন, তার উদ্দেশ্যটা 'মধুর'—মহান,—সমাজটা পালটে দেবার সংগ্রাম, অন্যায়-অবিচার শোষণ পরিশেষ করার সংগ্রাম। সুন্দর, মধুর জীবনের জন্য সংগ্রাম।

এইসব কথা মনে হলো 'সংগ্রামী নারী যুগে যুগে' বইখানি পড়ে।

মুক্তির সংগ্রামে উৎসর্গীকৃত একশো জন নারী জীবনকাহিনী নিয়ে রচিত হয়েছে এটি। সম্পাদনায় রয়েছে যাঁদের নাম, তাঁরা সকলেই বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব,—সেলিনা হোসেন, অজয় দাশগুপ্ত ও রোকেয়া কবির।

বইটিতে বিন্যস্ত হয়েছে বাংলার জাতীয় জীবনে মেয়েদের বিশিষ্ট ভূমিকার কথা, তাঁদের অংশগ্রহণ—তাঁদের আত্মবলিদানের কথা। স্বাধীনতা-পূর্বে যুক্ত বাংলা, পূর্ব পাকিস্তান এবং স্বাধীন বাংলাদেশ—সবটা মিলিয়েই,—এই তিনটি ভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষাপটে মেয়েদের সংগ্রাম, তাঁদের চেতনা ও শিক্ষা, জীবনদর্শন, তাঁদের বৈচিত্র্যময় কাজকর্মের কথা এবং এখনও বাংলাদেশের চলমান জীবনে মেয়েদের সক্রিয় অংশগ্রহণের বিস্তারিত বিবরণ জানা যায়।

ব্রিটিশ বিরোধী, জাতীয়তাবাদী আন্দোলন থেকে শুরু করে নানা স্তর পেরিয়ে ৬৯ সালের গণ অভ্যুত্থান, মুক্তিযুদ্ধের সংগ্রাম পর্যন্ত সর্বদা মেয়েরা এগিয়ে এসেছেন, প্রাণ দিয়েছেন। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে সক্রিয় নারীরা অনেকেই শিক্ষার সুযোগ পেয়েছিলেন, তাঁরা অনেকেই এসেছিলেন মধ্যবিত্ত ও সচ্ছল পরিবার থেকে। এই সময়কার আন্দোলনে অহিংস দিক, সশস্ত্র সংগ্রাম, যুগান্তর ও অনুশীলন সমিতি, কমিউনিষ্ট আন্দোলন,—ইত্যাদি নানা বৈশিষ্ট্যই চোখে পড়ে নারীদের জীবনবৃত্তান্তের ভেতরে।

ব্রিটিশ শাসনের শেষে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরে আন্দোলন প্রকৃতি স্বভাবতই পালটে যায়। কৃষক আন্দোলনে মেয়েদের ভূমিকা, বিশেষতঃ গ্রামীণ মেয়েদের অংশগ্রহণ তখন উল্লেখ করার মতো ঘটনা। তেভাগা, নানাকার, টংক, হাজং প্রভৃতি আন্দোলনে মেয়েদের জঙ্গী ও সশস্ত্র আন্দোলন, সাঁওতাল মেয়েদের এগিয়ে আসা, ইলা মিত্র'র কিংবদন্তী হয়ে যাওয়া এ সবই কৃষক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে। তাছাড়াও উল্লেখ করতে হয় বামপন্থী আন্দোলন, কমিউনিষ্টদের ভূমিকা, প্রগতি সাহিত্য আন্দোলন।

স্বাধীনতার পরে পূর্ব-পাকিস্তান মহিলা সমিতি গড়ে ওঠে ১৯৪৮ সালে। প্রগতি আন্দোলনের পথিক মেয়েরা প্রয়োজন অনুযায়ী তাঁদের ভূমিকাও পালটিয়ে নিয়েছেন। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী হিসাবে ১৪ জন মহিলা মুসলিম লীগকে পরাজিত করে পূর্ব-পাকিস্তানে প্রাদেশিক আইন পরিষদে নির্বাচিত হন। এই সময়ই প্রকাশ্য রাজনীতিতে হাতেখড়ি হয় মেয়েদের।

মেয়েদের অগ্রগতি তো সহজে মেনে নেওয়া সম্ভব নয় প্রতিক্রিয়াশীল পুরোনো সংস্কারপন্থীদের পক্ষে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই নারী শিক্ষা সঙ্কোচনের নীতি গ্রহণ করে মুসলিম লীগ সরকার।

প্রতিবাদে এগিয়ে আসে মেয়েরাও। ছাত্র আন্দোলনেই মেয়েদের সেই প্রতিবাদের প্রকাশ ঘটে। ৬০-এর দশকে আয়ুব খানের সামরিক শাসন-বিরোধী আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সারা দেশের বিপুল পরিমাণ ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে। ৬২ থেকে ৬৯ সালের মধ্যে বিভিন্ন ইস্যুতে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী রাজপথে নামে। রাজবন্দীদের মুক্তি চাই শ্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে বাংলাদেশে গ্রাম-শহরের আকাশ বাতাস। অগ্নিকন্যা রূপে প্রতিভাত হয়ে ওঠেন মতিয়া চৌধুরী। এই সময়কার ছাত্র আন্দোলনকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রস্তুতিপর্ব বলা যায়।

৭০-এর স্বাধীনতা আন্দোলন—সে এক বিরাট বীরত্ব, আত্মত্যাগ ও জয়ের কাহিনী, সেখানেও রয়েছে মেয়েদের বিশেষ সক্রিয় ভূমিকা। যদিও স্বাধীনতা সম্ভব হয়েছে নারী পুরুষের মিলিত সংগ্রামেই।

স্বাধীন বাংলাদেশের নারী আন্দোলন বিকাশের পর্য্যায়ে রয়েছে এখনও, গড়ে ওঠা, বেড়ে ওঠা চলেছে চলতে থাকবেও। মেয়েদের সমস্যা অসংখ্য। বিজ্ঞানের অগ্রগতি, ভোগবাদ, বিশ্বায়ন সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে অনাচার, অবিচার, নারী নির্যাতন, যৌন নিপীড়ন, শোষণ—কর্মক্ষেত্রে, গৃহে। তার ওপর আছে মৌলবাদের আক্রমণাত্মক ভূমিকা, যা সর্বদা মেয়েদের ঘরের মধ্যে পর্দার আড়ালে, অশিক্ষার আঁধারে রেখে দিতে চেষ্টা করে। উদার, ধর্মনিরপেক্ষ সাহিত্য সংস্কৃতিকে দমন করে রাখে। তসলিমার মতো বিদ্রোহী নারীকে নির্বাসনে যেতে হয়।

এই অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য যে চেতনা, যে শিক্ষা, জাগরণ, ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম দরকার, মেয়েদের মধ্যে তার প্রস্তুতি চলছেই, রাজনৈতিক কাজকর্ম, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মাধ্যমে চলেছে তা।

আলোচ্য পুস্তকে বর্ণিত একশত সংগ্রামী নারীর জীবনালেখ্য থেকেই খুঁজে পাওয়া যায় মেয়েদের জীবনের উদ্দেশ্য—বিশেষত বর্তমান বাংলাদেশে মহিলাদের সামনে মেয়েদের করণীয় কাজের তালিকা। শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার দরকার বিশেষ করে মাদ্রাসা শিক্ষার। দেশের বিভিন্ন তাৎক্ষণিক ইস্যুকে কেন্দ্র করে দীর্ঘমেয়াদী ও গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুর আন্দোলন গড়ে তোলাও প্রয়োজন। তাছাড়া রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ও প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে মেয়েদের অংশগ্রহণও গুরুত্বপূর্ণ এক পন্থা।

যে সব নারীর স্মরণীয় জীবনকাহিনী সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, তা যেমন আকর্ষণীয়, তেমনই শিক্ষণীয়। সেই যুগে মেয়েদের পালকি চড়ার বিরোধিতা করে, সমাজ পরিত্যক্তা মেয়েদের মাতৃমন্দির আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে, বা দুর্ভিক্ষের ত্রাণ ব্যবস্থা আর শিশুদের মিলন-খেলাঘর স্থাপনের মতো অসংখ্য সামাজিক কল্যাণের কাজ করে কিংবদন্তী হয়ে আছেন বরিশালের মনোরমা-মাসীমা, বা তারও আগে বিক্রমপুর সংঘ, গেণ্ডারিয়া মহিলা সমিতি গড়ে ছিলেন আশালতা সেন (জন্ম ১৮৯৪ খ্রীঃ)। তাঁদের থেকে শুরু করে নবীনতমা রোকেয়া কবীর (জন্ম ১৯৫১ খ্রীঃ) আছেন এখানে, যিনি বর্তমানের বাংলাদেশের

নারী আন্দোলনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দৃঢ়তার সঙ্গে কাজ করে চলেছেন—এ পুস্তকের অন্যতম সম্পাদিকাও তিনি। নানা বর্ণের, কর্মের ধারাও বৃত্তির মহিলাদের কথা নিয়ে সমৃদ্ধ হয়েছে বইটি।

চট্টগ্রামে সংগ্রামের নায়িকা প্রীতিলতা, কল্পনা দত্ত—তাঁদের সংগ্রাম, সেই সঙ্গে, আমরা পাই বিপ্লবী লীলা নাগকে,— তাঁর শ্রী সংঘ, জয়শ্রী পত্রিকা ইত্যাদি সম্পর্কে নানা তথ্য। লীলা নাগের অনুসারী হেলেনা দত্ত, সাগরিকা ঘোষ— তাঁদের বর্তমান কাজ—সে সবেরও স্থান হয়েছে বইটিতে।

আছেন ফুলরেণু গুহ, আছেন কমলা মুখোপাধ্যায়, তাছাড়াও রয়েছেন কমিউনিষ্ট হিসাবে পরিচিত নিবেদিতা নাগ, ইলা মিত্র, জামালপুরের রাজিয়া খাতুন, বা হেনা দাস, যিনি সিলেটের চা-শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে কাজ করেছেন। অবাক হয়ে জানতে পারি অনিমা সিংহের কথা,—সিলেটের পাহাড়ের নেত্রী, মুক্তি যুদ্ধে তাঁর ভূমিকা, —মণি সিংকে বিবাহ করে তাঁর যোগ্য সহধর্মিনী হয়ে ওঠা। মুগ্ধ হয়ে পড়ি জ্যোৎস্না নিয়োগীর কথা— যাঁর গড়ে তোলা নারী সমিতির জেল খাটা, গারো মেয়েদের মধ্যে কাজ, সাংস্কৃতিক সংগঠন—যাঁকে নিয়ে বিখ্যাত সাহিত্যিক সত্যেন সেন গল্প লেখেন 'আশ্চর্য মেয়ে' নামে।

সুফিয়া কামাল, মালেকা বেগম থেকে আয়েশা খানম বা বেলা নবীর কাজকর্ম প্রধানত ওখানকার মহিলা সংগঠন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদকে ঘিরেই—তার প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে বর্তমান অবস্থান, সবটাই জানা যায়। তেভাগা আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন এমন অনেক সংগ্রামী নারীর কথা অপরিহার্যভাবেই আছে এখানে—রয়েছে বাণী দাশগুপ্তর কথা। টংক প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করে সুসং জমিদারদের সঙ্গে যুদ্ধে জঙ্গী বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন যাদুমণি হাজং।

সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বিশিষ্ট নেত্রী ও কর্মীদের কথাও যুক্ত হয়েছে এখানে। বিখ্যাত শিল্পী ও গবেষক সনজিদা খাতুন, কিংবা উদীচী সাংস্কৃতিক সংঘ গড়েছেন, নৃত্য শিল্পচর্চা করেছেন প্রগতি আন্দোলনের সঙ্গে এমন অনেকে কথাও জানতে পাবি আমরা।

বর্তমানে বাংলাদেশের মন্ত্রীসভার সদস্যা—এমনি দু-চার জন নেত্রী, প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং শেখ হাসিনা ওয়াজেদ—তাঁদের জীবনের সংগ্রাম ও কর্মকান্ডের নানা তথ্য পাওযা যায়। সকলের কথাই আলাদা করে বলবার মতো, কিন্তু স্থানাভাবে তা সম্ভব হলো না, এই আক্ষেপ রয়ে গেল। সম্পাদনা যাঁরা করেছেন, তাঁরা ধন্যবাদাই আমাদের। অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে, পরিশ্রম করে,—সাক্ষাৎকার নিয়ে পুরনো নথীপত্র চর্চা করে এই সুন্দর বইটি আমাদের উপহার দিয়েছেন। ঘরে রাখবার মতো, রেখে পড়বার মতো বই। শুধু দু-একজন বিশিষ্ট মহিলার অনুপস্থিতির কথা উল্লেখ না করে পারছি না। মণিকুন্তলা সেন বা জুঁইফুল রায়কে বাদ দিয়ে কি সংগ্রামী নারীদের তালিকা সম্পূর্ণ হয়? পরবর্তী খণ্ডের জন্য অপেক্ষা করতে হবে?

এই বইয়ের বহুল প্রচার শুধু বাঞ্ছনীয় নয়, খুবই প্রয়োজনীয়। দুঃখের বিষয় বাংলাদেশের সব বই এখানে পাওয়া যায় না। বইমেলার প্রধান বিষয় 'বাংলাদেশ' হওয়া সত্ত্বেও এটা ঘটনা।

মালবিকা চট্টোপাধ্যায়

সংগ্রামী নারী যুগে যুগে/বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ/ঢাকা, বাংলাদেশ

তিরিশ-চল্লিশের বাংলায় আন্দোলন ও রাজনীতি

পেশাদার ইতিহাসচর্চাবিদ এবং মৌখিক ইতিহাসের উজ্জ্বল উদাহরণ সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে বিগত পঁচিশ বছরের মধ্যে যে নূতন বিষয়টি গবেষণার উপকরণ হিসেবে বিশেষ মান্যতা পেয়েছে, তা হলো মৌখিক ইতিহাস বা মুখের কথায় ইতিহাস, ইংরাজিতে যাকে বলে Oral History. তাই, History Workshop পত্রিকায় ৩৯-তম (বসন্ত '৯৯) সংখ্যায় হুপা মার্সিডেস ভিলানোভার যে বক্তৃতা মুদ্রিত হয়েছে তার শিরোনাম International Oral History এই ভাষাটি ১৯৯৪-এর নভেম্বর মাসে নিউইয়র্ক শহরে অনুষ্ঠিত ওরাল হিস্ট্রি সম্মেলনে দেওয়া তাঁর প্রারম্ভিক বক্তৃতা। সেখানে লেখিকার স্বীকারোক্তি।

The Oral history movement started, more or less everywhere during the sixties and with greater strength, during the seventies. In those days that almost everybody wanted was to guile voice to the "Voiceless'— evidently all our interviewes have also had voice but we remained so deaf and with so little sensitivily that we were unable to listen to them.

এর থেকে মৌখিক ইতিহাসের একটি সংজ্ঞা বেরিয়ে আসতে পারে। তথাকথিত লিখিত উপাদান বা পাথুরে প্রমাণ অর্থাৎ প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান যেমন বিশেষ ক্ষেত্রে ইতিহাস-গবেষণায় অপরিহার্য, তেমনি দলিল-দস্তাবেজ-নথি-সরকারি/বেসরকারী কাগজপত্র, মহাফেজখানায় বা অন্যান্য স্থানে রক্ষিত উপকরণ ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে যদি মৌখিক তথ্য ব্যবহার না করি তাহলে ইতিহাসের ফাঁক থেকে যায়। এখানে মৌখিক তথ্য বলতে কোনও বিশেষ যুগের, বিশেষ কালের কোনও ঘটনার বা আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত আপামর মানুষজনের সাক্ষ্য। এই সাক্ষ্য পাওয়া যাবে যদি তাদের সাক্ষাৎকার নেওয়া যায়। সুতরাং ঐতিহাসিক তাই তার প্রতি উপেক্ষা করতে পারেন না। লেখিকা তাই আরও জানাচ্ছেন

From the eighties on we started to realize our deafness and therefore we began to be worried by the silences the spoken works language— During the nineteen oral History regions the dimesion of the initial movement because oral sources are crucial precisely when they touch the rims or limits of human expression and therefore unfront as with those realities that we do not know and that often we stero-type.

আমাদের দেশের বিংশশতকের ইতিহাসের ক্ষেত্রে কথাগুলি সত্য। কোনও সন্দেহ নেই সেই মুখের কথায় ইতিহাস সমসাময়িক বা প্রায়-সমসাময়িক (near contemporary) আমল ছাড়া হয় না ; কেননা জীবিত লোকেদের সাক্ষাৎকার নিয়েই মুখের কথা তথা নিজের অভিজ্ঞতা তুলে আনতে হয়। তা আমাদের দেশে অনেকেই সার্থকভাবে করেছেন। যেমন সত্যজিৎ দাশগুপ্ত 'তৃণমূলে সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মীদের বিচিত্র অভিজ্ঞতার জীবনীমূলক ইতিবৃত্ত ('Narrative') কাজে লাগিয়েছেন বামপন্থী আন্দোলনের প্রচার বুঝতে। পশ্চিমবঙ্গ পেশাদার ইতিহাসচর্চাবিদদের প্রধান সংগঠন পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ ১৯৯৫-এর মে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙ্গা হলে যে আলোচনা সভার আয়োজন করেছিলেন, তার বিষয়বস্তু ছিল স্মৃতি, মুখের কথা ও লিখিত উপাদানে ইতিহাস রচনার সমস্যা। সত্যজিৎ দাশগুপ্তের সুযোগ্য সম্পাদনায় সেই আলোচনাচক্রের কার্যবিবরণী 'মুখের কথায় ইতিহাস' নামে প্রকাশিত হয়েছে।

মুখের কথায় ইতিহাস ব্যাপারটি কি? একটা উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। ধরুন আমাদের দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন কিংবা স্বাধীনতা আন্দোলনের কোনও বিশেষ পর্ব, বিশেষ ধারার সংগ্রামে যুক্ত ছিলেন অনেক মানুষ—নেতৃবৃন্দ থেকে সাধারণ সক্রিয় কর্মী বা আমজনতা। এখন, সেই আন্দোলনের বা ধারার ইতিহাস লিখতে গেলে যে-সব উপাদান ব্যবহার করতে হবে বা করা দরকার বলে ইতিহাসবিদরা মনে করছেন তার মধ্যে শুধু লিখিত উপাদান—বইপত্র, চিঠিপত্র, ডায়রী, সাংগঠনিক কাগজপত্র, ইশতেহার, সংবাদপত্র, ইত্যাদি ব্যবহার করলেই চলবে না। শুধুমাত্র সরকারী দলিল দেখার জন্য মহাফেজখানা বা আর্কাইভস্ এবং পুলিশ রেকর্ড ঘাঁটলেই চলবে না, পূর্ণাঙ্গ চিত্র-চৈতন্য-এর কর্মের রূপ স্পষ্ট করে তুলতে গেলে আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী মানুষজনের সাথে সাক্ষাৎ মারফৎ তুলে আনতে হবে। এই সূত্রসমেত প্রতিটি সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যের যথার্থ্য পরে বিচার করে নেওয়া যাবে কিন্তু আগে তথ্য সংগ্রহ করা চাই। এই আলাপচারিতার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের সময় শুধু নেতাদের নয়, বরং নিচের তলার সক্রিয় কর্মী বা সাধারণ নিম্নবর্গীয় মানুষজনের দিকে তাকাতে হবে। এইভাবে প্রাপ্ত উপাদান হলো মৌখিক ইতিহাস। তা সে অসহযোগ-আইন-অমান্য-ভারত ছাড়ো আন্দোলনই হোক বামপন্থী আন্দোলনের ধারাই হোক, বা বিশেষ কোনও ধর্মঘট বা লড়াইয়ের ব্যাপারই হোক বা আঞ্চলিক ইতিহাসের কাজে কোনও বিশেষ অঞ্চলের প্রসঙ্গেই হোক। উদাহরণ বাড়িয়ে স্থান নষ্ট না করেও বলা যায় এমন দৃষ্টান্ত অনেক আছে যেখানে গবেষকগণ তাঁদের কাজে এই ধরণের সূত্রাদি থেকে প্রাপ্ত তথ্য ব্যবহার করেছেন।

John Tosh-লিখিত The Pursuit of History (লংম্যান, লণ্ডন, ১৯৯১) গ্রন্থের 'History by word of Mouth' শীর্ষক দশম অধ্যায়ে (পৃ. ২০৬-২২৭) লেখক দেখিয়েছেন যে শুধু ঐতিহাসিক নয়, রাজনীতি-বিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের গবেষকগণও এই ধরণের মৌখিক ইতিহাসের সূত্র ব্যবহার কাজে লাভবান হন। বস্তুতপক্ষে দলিল থেকে প্রাপ্ত উপাদান যে আখ্যান রচনায় সাহায্য করে তার রূপ রস মেজাজ সবই বদলে যেতে পারে সার্থক মৌখিক উপাদানের ব্যবহারে (দ্র. পিটার বার্ক সম্পা), নিউ পারস্পেকটিভ্স্ অন হিস্টোরিকাল রাইটিং, পলিটি প্রেস, অক্সফোর্ড, ১৯৯২ গ্রন্থে Guryn Preiss লিখিত ওরাল হিস্ট্রি সংক্রান্ত দশম প্রবন্ধ, (পৃ. ১১৪-১৩৯)। যাঁরা মৌখিক ইতিহাসের সংজ্ঞা, তার দায় ও পরিধি, বৈচিত্র্য ও প্রাসঙ্গিকতা ইত্যাদি বিশদ জানতে চান, সেই জিজ্ঞাসু পাঠকদের প্রতি বর্তমান লেখকের বিনম্র পরামর্শ জর্জ এওয়ার্ট ইভান্স লিখিত স্পোক্‌ন হিস্ট্রি (ফেবার অ্যাণ্ড ফেবার, লণ্ডন, ১৯৮৭), মাইকেল স্ট্যানফোর্ড লিখিত 'আ কম্পোজিশন টু দ্য স্টাডি অফ হিস্ট্রি (ব্ল্যাকওয়েল, অক্সফোর্ড, ১৯৯৪) বইয়ের ষষ্ঠ অধ্যায় (Another Relevant Topic Oral History' পৃ. ৬৩-৬৫ কিংবা গ্রেগর ম্যাকলেশান এর 'মার্ক্সিজম অ্যাণ্ড দ্য মেথডলজি অফ হিস্ট্রি (এন. এল. বি, লণ্ডন, ১৯৮১) বইয়ের, 'Oral History' শীর্ষক অধ্যায়ে, (পৃ. ১১৮-১১৯) অথবা সবচেয়ে সহজ, সত্যজিৎ দাশগুপ্ত-সম্পাদিত পূর্বোক্ত বাংলা বইয়ের সম্পাদকীয়টি পড়ে নিতে পারেন।

* * *

আমাদের দেশে মৌখিক ইতিহাসের চর্চা যে কতখানি ব্যাপ্তি ও প্রসার লাভ করেছে গবেষকদের মধ্যে তার এক সার্থক ও উজ্জ্বল উদাহরণ সম্প্রতি আমাদের হাতে এসেছে

বয়স, আন্দোলনের অভিজ্ঞতা এবং রাজনৈতিক মাপে প্রবীণ অবনী লাহিড়ী, যিনি তেভাগা সমেত বাংলার কৃষক সংগ্রাম এবং বামপন্থী আন্দোলনে ছিলেন প্রথম সারিতে, তাঁর সঙ্গে কথা বলে প্রয়াত গবেষক ও বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ রণজিৎ দাশগুপ্ত তুলে এনে লিখেছেন রাজনীতি ও আন্দোলনের অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে 'তিরিশ চল্লিশের বাংলা।'

অত্যন্ত শোক ও পরিতাপের বিষয় এই যে গ্রন্থটির মূল পাঠক এবং রূপকার যিনি সেই রণজিৎ দাশগুপ্ত গ্রন্থটি প্রকাশের প্রাক্‌মুহূর্তে আকস্মিকভাবে প্রয়াত হন। ফলে গ্রন্থটিতে মুখবন্ধ লিখতে হয়েছে তাঁর সুহৃদ অগ্রজ প্রতিম এবং সহযোগী আরেক অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক নৃপেন বন্দ্যোপাধ্যায়কে। এছাড়া নেপথ্যে আরেক শুভানুধ্যায়ী, বিশিষ্ট গল্পপাঠক অরুণ ঘোষ, সম্পাদনা ও গ্রন্থটি প্রকাশের ব্যাপারে উদ্যোগ নেন।

গ্রন্থটির বিষয়ে বলার আগে দু'টি বিষয় উল্লেখ করে নিলে সুবিধে হবে। মৌখিক ইতিহাস তো এখন এক স্বীকৃত পদ্ধতি ; তার থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি অন্যান্য সূত্রের সঙ্গে যাচাই করে, গবেষক যখন ইতিহাস 'রচনা' করেন তখন অ শিক্ষিত ইতিবৃত্তের রূপ পায়। দীর্ঘদিন ধরে পরিমার্জন ও সম্পাদনার শ্রমনিবিড় প্রক্রিয়ার কালে এই গ্রন্থের উপস্থাপনা মৌখিক রূপ থেকে লিখিত রূপে চলে যেতে পারত। কিন্তু দৃষ্টান্তমূলকভাবেই একে মূলানুগ রেখে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ গোটা বইটি হাজির করানো হয়েছে প্রশ্নোত্তরের ভিত্তিতে ; প্রশ্নকর্তা রণজিৎ দাশগুপ্ত, উত্তরদাতা অবনী লাহিড়ী, অর্থাৎ প্রশ্নকর্তার প্রশ্নের উত্তরে উত্তরদাতা যা বললেন, তা ঠিক কি ভুল বিচার প্রশ্নকর্তা করেন নি। কিংবা সামান্য সূত্রের সঙ্গে মিলিয়ে রণজিৎ দাশগুপ্ত ও অবনী লাহিড়ীর সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করে নিজের ভাষায় ইতিহাস লেখেনি। কেউ একে ত্রুটি বলতে পারেন, কেউ বা গবেষকের হঠাৎ প্রয়াণের কথা ভেবে ত্রুটি ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখতে পারেন। আমাদের মতে এই মূলানুগ রেখে দেওয়াই বরং খুব ভালো কাজ হয়েছে। কেননা এর ফলে উত্তরকালে অন্যান্য গবেষকরা হাতের কাছে মূল বক্তব্য পেয়ে যাবেন, তারপর তাঁরা নিজেরা প্রয়োজন মতন বিবেচনা সাপেক্ষে ব্যবহার করবেন।

তাছাড়া আরও বলা দরকার যে প্রয়াত রণজিৎ দাশগুপ্তকে আমি জানতাম ১৯৬১ থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত। সিটি কলেজ থেকে ইণ্ডিয়ান ইনস্টিট্যুট পর্ব পর্যন্ত আর তাঁর নানা কাজের সঙ্গেও পরিচয় থাকতে জানতাম যে তিনি সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোসাল সায়েন্সে যুক্ত থাকার সময় শ্রমিক-ইতিহাস নিয়ে শুধু গবেষণাই করেননি, তার পদ্ধতি বিষয়ে প্রশ্ন তুলে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। শুধু তাই নয়, জলপাইগুড়ি বিষয়ে আঞ্চলিক ইতিহাসের উচ্চতর গ্রন্থে তিনি মৌখিক ইতিহাসের সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যের সার্থক ব্যবহার করেছিলেন।

দ্বিতীয় যে কথা বলার, তা হলো উত্তরদাতা অবনী লাহিড়ী ভারতের ইতিহাসের এক ক্রান্তিকালে অর্থাৎ ঔপনিবেশিক শাসনের একেবারে শেষ বা চূড়ান্ত পর্বে সংঘটিত হওয়া তেভাগার মতন ব্যাপক কৃষি সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

সুতরাং তাঁর সাক্ষ্য মূল্যবান। তিনি কতকগুলি সঙ্গত প্রশ্নও উত্তর দেওয়ার সময় উপস্থাপন করেছেন। তেভাগা সংগ্রাম সম্পর্কে নানা ধরণের বিবরণ ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে এবং হচ্ছে, যার মধ্যে কিছু মূল্যবান। এগুলির মধ্যে সুনীল সেনের 'অ্যাগ্রারিয়ান

স্ট্রাগল ইন বেঙ্গল', অ্যাড্রিয়ান কুপারের 'শেয়ার ক্রপিং অ্যাণ্ড শেয়ার ক্রপার্স স্টাগল ইন বেঙ্গল', পার্থ চ্যাটার্জীর 'বেঙ্গল ১৯২০-১৯৪৭; দ্য ল্যাণ্ড কোয়েশ্চেন' এবং 'প্রেজেন্ট হিস্ট্রি অফ ওয়েষ্ট বেঙ্গল, অশোক মজুমদারের 'পেজান্ট প্রেটেস্ট ইন ইন্ডিয়ান পলিটিকস্' রণজিৎ দাশগুপ্তের 'ইকনমি, সোসাইটি অ্যাণ্ড পলিটিক্স ইন বেঙ্গল; জলপাইগুড়ি (১৮৬৯-১৯৪৭), সুগত বসুর 'পেজান্ট, লেবার অ্যান্ড কলোনিয়াল ক্যাপিটাল : রুরাল বেঙ্গল সিন্স ১৯৭০', ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পত্রিকার প্রকাশিত ড. মেসবাহ কামালের সমীক্ষা 'বর্তিকা' প্রত্রিকার কাকদ্বীপ তেভাগা আন্দোলন বিষয়ের দুটি সংখ্যা ইত্যাদি। বাংলাতেও কুনাল চট্টোপাধ্যায, জয়ন্ত ভট্টাচার্য প্রমুখের বই আছে। তবু মুখের কথায় অবনী লাহিড়ীর বক্তব্য উপকরণ হিসেবে মূল্যবান। এমন কাজ কংসারী হালদারকে দিয়েও হতে পারত। অবনী লাহিড়ীকে এই সূত্রে কৃতজ্ঞতা জানাই।

গ্রন্থটিতে প্রকাশকের কথা, নৃপেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখবন্ধ, অবনী লাহিড়ীর লেখা ভূমিকা, রণজিৎ দাশগুপ্তের সঙ্গে অবনী লাহিড়ীর প্রশ্নোত্তর, তথ্যপঞ্জি, পরিশিষ্ট হিসেবে বঙ্গীয় প্রদোশিক ছাত্র ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদকের বিবরণ হিসেবে সমসাময়িক 'ছাত্রঅভিযান' এক পাতায় ফ্যাকাসিমিল, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার এপ্রিল ১৯৪৮-এ প্রকাশিত ইস্তেহার, অবনী লাহিড়ীকে লেখা গনেশ ঘোষের ও সুধীন মুখার্জীর চিঠি উল্লিখিত ব্যক্তি পবিচয় ইত্যাদি দেওয়া হয়েছে।

এর মধ্যে প্রশ্নোত্তর পর্বটি সবচেয়ে মূল্যবান। একেবারে বাল্যকাল থেকে প্রবীণ বয়স পর্যন্ত এক ব্যক্তিকে সামনে রেখে যুগের বিবর্তন ধরে রাখাব প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। বিশেষত গ্রন্থের শিরোনামেই স্পষ্ট, লেখক প্রস্তুতি পর্ব হিসেবে বিশ শতকের তিরিশের দশকের এবং অন্দোলনের মূল পর্ব হিসেবে চল্লিশের দশক দিয়ে মন খুলে নানা মত ও মন্তব্য তুলে ধরেছেন। সেই চল্লিশের দশক, যা ছিল অমলেন্দু সেনগুপ্তের ভাষায় 'উত্তাল চল্লিশ'। মূল্যের দিক থেকে এই প্রশ্নোত্তব পর্বের পরেই মনে আছে অবনী লাহিড়ীর ভূমিকাটির কথা।

নৃপেন বন্দ্যোপাধ্যাব লিখেছেন, "ইতিহাস গবেষক হিসেবে রণজিতের বৈশিষ্ট ও অন্যতম কঠিন শারীরিক বাধাকে তুচ্ছ করে গবেষণার টেবিলে নিরলস পরিশ্রমের পাশাপাশিসমসাময়িক সংগ্রামগুলির ময়দান থেকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সংগ্রহ এবং বর্তমান ও প্রাক্তন সংগ্রামীদের অভিজ্ঞতার বিবরণ সংগ্রহে নিষ্ঠা।" আমি সম্পূর্ণ একমত ছাত্রজীবন থেকেই মার্ক্সবাদ আর কমিউনিষ্ট আন্দোলনে আকৃষ্ট রণজিৎ উত্তরকালে যে সব গবেষণামুলক কাজ করেছেন তার মধ্যে নিষ্ঠা ও প্রাথমিক উপকরণ সংগ্রহে ঐকান্তিক আগ্রহ আমরা দেখেছি। অবনী লাহিড়ীর মতন একজন সংগঠক ও নেতার জবানবন্দীও তিনি বার করতে পেরেছেন, কৌতুহল উস্কে দিয়ে, স্মৃতির গহনে ডুবে যেতে সাহায্য করে। এই জন্য রণজিৎ দাশগুপ্ত যে পরিশ্রম করে গেলেন তা ভাবলে বিনম্র শ্রদ্ধায় মন ভরে ওঠে। জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের চূড়ান্ত পর্বে সংঘটিত হওয়া সত্ত্বেও তেভাগার মতন ব্যাপক কৃষক অভ্যুত্থান কেন জাতীয় আন্দোলনের মূলধারার সঙ্গে যুক্ত হতে পারল না, সেই প্রশ্নটি অবনী লাহিড়ীর মাথায় এসেছে। তাঁর বিশ্বাস, যুদ্ধোত্তর নবজাগরণে ছাত্র-শ্রমিক শহরের

জনতা ও নানা দলের সামগ্রিক বিক্ষোভের সঙ্গে কৃষি সংগ্রাম যুক্ত হলে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া অন্যরকম হতে পারত। কবি গোলাম কুদ্দুসের কথা মনে পড়ে। "নেতৃত্বের উৎসাহ ও অনুমতি পেলে আগ্নেয়াস্ত্র হাতে নিয়ে কৃষক কর্মীরা বেশ গোটাকয়েক ইয়েনান সৃষ্টি করতে পারত। এটা সত্যি ছিল কি না আমার সন্দেহ, তবে আন্দোলন যে ব্যাপকতর মাত্রা পেত, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

অবনী লাহিড়ী যে উত্তর দিয়েছেন রণজিৎ দাশগুপ্তের প্রশ্নের জবাবে তার মধ্যে পাঠকেরা দেখেছেন, পাঁচটি প্রশ্ন উঠে এসেছে। সেগুলি এরকম : (১) ভাগচাষী আর গ্রামের মধ্যে গরীবদের শতাব্দীর এই স্মরণীয় সংগ্রামে অন্যান্য দেশপ্রেমিক শক্তিগুলির দু'চারটি ব্যতিক্রম ছাড়া, প্রত্যক্ষ সহযোগিতা পাওয়া গেল না কেন? কেন শহর ও গ্রামের শিক্ষিত অকৃষক মধ্যবিত্তরাও সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে দিল না? (২) তেভাগার সংগ্রাম বাঙালীর জাতীয় চেতনার সাথে যুক্ত হয়নি কেন? (৩) দরিদ্র কৃষক ও ক্ষেত মজুরদের একটা বড় অংশ কেন দেরীতে তেভাগা আন্দোলনে যোগ দিল, আবার সরকারের সশস্ত্র আক্রমণের মুখে কেনই বা আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল? (৪) তেভাগা আন্দোলন কি সম্পন্ন মধ্যকৃষকদের সাথে গরীব ভাগচাষীর একটা বৈরী সম্পর্ক গড়ে তুলবে না? (৫) সেদিনের তেভাগা সংগ্রাম কি নেহাতই একটি স্থানীয় অথবা আংশিক সংগ্রাম?

কৃষক সংগ্রাম উপলক্ষ মাত্র। আমার কাছে বইটি পড়তে পড়তে যা আশ্চর্যরকম শিক্ষণীয় মনে হয়েছে, তা হলো এক অশীতিপর সংগ্রামী বিপ্লবীর আদ্যোপান্ত স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়ে একটা যুগ পর্ব থেকে পর্বান্তরে বিবর্তনের কাহিনী। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'যা হারিয়ে যায় তা আগলে বসে রইব কত আর?' তবু আমরা বসে থাকি। যাঁরা পুরোনো সেই দিনের কথা স্মৃতির দর্পনে দেখে উপহার দেন, তাঁরা গৌরবময় দিনগুলি ভোলেন না বলেই। আর আমরা যারা ইতিহাসের কারবারী-অরা মৌখিক ইতিহাসের সূত্র ধরে পেয়ে যাই ভাবনার অনেক খোরাক, ব্যবহার করার মতন অনেক উপাদান-উপকরণ। আর উপরি হিসাবে পেয়ে যাই বানপ্রস্থ-উত্তর বয়সে, যখন মানুষ সত্যি কথা বলতে ভয় পায়, তখন এক আশি উত্তীর্ণ যুবকের বিশ্লেষণ আর অতীতচারণ। হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো এসে পড়ে তেলেঙ্গানার সঙ্গে তেভাগার তুলনা। এসে পড়ে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা। দেশ বিভাগের পর পরিস্থিতি। কোন শ্রেণী সংগ্রাম নিজের উত্তরণ ঘটিয়ে গণতান্ত্রিক অধিকারের সংগ্রাম হয়ে উঠতে পারে কিনা সেই প্রশ্নেও অবনী লাহিড়ী আলোচনা করেছেন। সব মিলে তিরিশ-চল্লিশের বাংলা বিষয়ে এক অসাধারণ স্মৃতি পড়ার সুখকর অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হলাম।

গৌতম নিয়োগী

তিরিশের চল্লিশের বাংলা/ অবনী লাহিড়ী/সেরিবান/ বাখরহাট/দক্ষিণ ২৪ পরগণা/১৯৯৯/৬০ টাকা।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও মুসলিম পত্রপত্রিকার ভূমিকা

হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক সমস্যা যেন এক দুরারোগ্য ব্যাধি। এই ব্যাধির প্রকোপে একদিন উদ্ভাবিত হয়েছিল 'দ্বিজাতিতত্ত্ব' যার কুফলশ্রুতি ভারতবিভাগ। সেদিন ধরে নেওয়া হয়েছিল এটাই ব্যাধির আসল দাওয়াই। পাকিস্তান ক্রমান্বয়ে প্রায় হিন্দুশূন্য হলেও 'সিকিউলার' ভারতের সংবিধান সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষকে সমান মর্যাদার আশ্রয় দিয়েছে। কিন্তু তাতে কি আসল প্রশ্নের মীমাংসা হয়েছে? হয়নি যে তার প্রমাণ স্বাধীনতা লাভের পর আজ অবধি ভারতে বহুবার সংঘটিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় যত সংখ্যক মানুষ প্রাণ দিয়েছে ও যত রক্তপাত হয়েছে, সে-সব লজ্জাস্কর বর্বরতার ইতিহাস হয়ে থাকবে। 'জাতীয় সংহতি' কার্যত একটা স্লোগানে পর্যবসিত হয়েছে। বাস্তবের দিকে তাকালে আজ কোন্ চিত্র চোখের সামনে দেখতেপাই? অতীতের মত আজও ধর্মীয় গোঁড়ামি অস্পৃশ্যতা বর্ণবৈষম্য জাতপাতের দ্বন্দ্ব রিজিয়নিলিজিম দলিত ও উপজাতিগুলির বঞ্চনাজাত ক্ষোভ থেকে বিচ্ছিন্নতার মানসিকতার ইত্যাদি নানা উপসর্গ মাথা চাড়া দিচ্ছে। কাশ্মীর ও 'উত্তর-পূর্ব ভারত' তো বারুদের স্তূপ হয়েই রয়েছে। এ সব সমস্যা একদিনে গজিয়ে উঠেনি, অনেক বছর ধরে বাড়তে-বাড়তে আজ বিস্ফোরক অবস্থায় পৌঁছেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে মনে প্রশ্ন জাগে, এই পরিস্থিতির জন্য কে বা কারা দায়ী? রাষ্ট্র সরকার রাজনৈতিক দল সমাজবিজ্ঞানী শিক্ষাবিদ প্রমুখ নানা বর্গের মানুষরা কি তাঁদের উপর নিয়োজিত দায়িত্ব পালন করেছেন? একটা জাতির সুস্থ চরিত্র বলতে যা বোঝায় তা কি আপনা থেকে গড়ে ওঠে? বিশেষত ভারতের মত সর্ববিষয়ে পশ্চাৎপদ দেশে? সাম্প্রদায়িকতা এবং বর্ণবৈষম্যজাত অস্পৃশ্যতা ও অবজ্ঞার বিরুদ্ধে শতাব্দীর শুরুতে মহাত্মা গান্ধী যে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন, জাতীয় নেতৃত্ব ও অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দলগুলির দূরদৃষ্টির অভাব ছিল বলেই তাঁরা উপরোক্ত সমস্যাগুলি যে একদিন বর্তমানের বিস্ফোরক চেহারা নেবে সেটা ভাবতে পারেননি। তাঁদের অযোগ্যতা ও দায়িত্বহীনতার মাশুল আজ দেশকে দিতে হচ্ছে। ফলে এখন ভারতীয় রাজনীতি সমস্ত মূল্যবোধ হারিয়ে এমন নিম্নপর্যায়ে নেমে এসেছে যে, সাম্প্রদায়িকতা ও জাতপাতের বৈষম্য ও বিরোধ চিরতরে দূর করা নয়, বরং এ জাতীয় সর্বনাশা বিস্ফোরক বস্তুগুলোকে প্রয়োজন মত কাজে লাগিয়ে রাজনৈতিক প্রতিপত্তি বাড়ানো বা ক্ষমতা লাভের বিবরটাই তাঁদের কাছে বেশি প্রাধান্য পায়। তাই প্রয়োজনে নানা অজুহাত দেখিয়েও দোহাই পেরে সাম্প্রদায়িক দলের সঙ্গে গলাগালি করতে তাঁদের বাঁধে না।

এই ভয়াবহ অবক্ষয় ও মূল্যবোধহীন সময়ে প্রবীন সাংবাদিক কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়-এর "মোসলেম পত্র-পত্রিকায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি" শীর্ষক একটি পুস্তক পড়ার সুযোগ হল। পুস্তকটিতে শতকের প্রথমার্দ্ধের মুসলিম পরিচালিত কিছু সংখ্যক পত্র-পত্রিকায় হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি বিষয়ক লেখা পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। যেহেতু আমাদের দেশে পুরনো পত্র-পত্রিকা সংরক্ষণের ভাল ব্যবস্থা নেই, তাই একান্ত নিষ্ঠা ও শ্রমের উপর নির্ভর করে তাঁকে নানা জায়গায় ঘুরে সেই সব পত্রিকা থেকে লেখাগুলো সংগ্রহ করতে হয়েছে। লেখাগুলোর মধ্যে দুটি প্রধান সম্প্রদায়ের মধ্যেকার বিরোধ ও ব্যবধানের কারণগুলি নানা দিক থেকে

অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে। মনে রাখা দরকার, লেখকদের প্রায় সবাই সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী। অন্যদিকে মুসলিম জনসাধারণের ক্ষুদ্র অংশ এই শতাব্দীর তিন দশক পর্যন্ত মাত্র অক্ষর পরিচয় লাভ করেছে। তাদের কাছে এই সব লেখা পৌঁছেছে কিনা বলা শক্ত।

প্রকৃত বুদ্ধিজীবী মানুষের অগ্রবর্তী চিন্তাধারা অশিক্ষিত ও ধর্মীয় অন্ধ আচারসর্বস্ব সাধারণ মানুষের গ্রহণ ক্ষমতার বাইরে—এটা উভয় সম্প্রদায় সম্পর্কে সমান প্রযোজ্য। তবুও সাধারণ মানুষজন তাঁদের ব্যবহারিক জীবনের অভিজ্ঞতায় দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি রক্ষা করে এসেছে, বিশেষত গ্রামের দিকে, ত্রিশের দশক পর্যন্ত। এটা তারা করেছে তাঁদের সহজ সরল গ্রাম্যজীবনের নৈতিকতাবোধ থেকে। দুই সম্প্রদায়ের আচরণগত বৈষম্যগুলির সঙ্গে তারা পরস্পর মানিয়ে নিয়েছে। বরং তুলনামূলকভাবে শহরের জীবনে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈসম্যের অভাব ছিল না। ত্রিশের দশক থেকে মুসলিম লীগের সাম্প্রদায় ভিত্তিক রাজনীতি দুই সাম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যবধান বাড়িয়ে তুলেছে। মুসলিম লীগ শক্তিশালী হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম জনসাধারণ ইংরেজ-বিরোধী স্বাধীনতার সংগ্রাম ও দেশের জনসমষ্টির মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে লাগল। এর জন্য দেশকে যথেষ্ট মূল্য দিতে হয়েছে।

আলোচ্য পুস্তকের লেখাগুলির সময়কাল ১৮৯৮ থেকে ১৯৩৮ সাল। এই সব লেখায় মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের একটি অংশের সুস্থ চিন্তাভাবনা প্রতিফলিত হয়েছে এবং তাঁদের চিন্তাভাবনা দ্বারা সমগ্র জনসাধারণ প্রভাবিত হলে দেশের ইতিহাস নিশ্চয় অন্যরকম হাতে পাবত। কিন্তু দুর্ভাগ্য, তাদের উপর সুস্থচিন্তর বুদ্ধিজীবীদের চেয়ে কুটচিন্তর রাজনীতিবিদদের প্রভাব বেশী খাটে। চিন্তাগত ও নীতিগত কারণে উপরোক্তদের পরিচালিত পত্র-পত্রিকা গুণগত প্রাধান্যের দাবীদার হতে পারে, কিন্তু প্রভাবের দিক থেকে মৌলনা আক্রম খাঁর দৈনিক আজাদ অনেক শক্তিসালী ছিল। ত্রিশ ও চল্লিশের দশকের মানুষ এর পক্ষে সাক্ষ্য দেবেন।

আলোচ্য পুস্তকে উল্লিখিত পত্র-পত্রিকাগুলির মধ্যে রয়েছে কোহিনুর (১৮৯৯), নবনূর (১৯৩০), বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা (১৯১৮), সওগাত (১৯১৮), বঙ্গনূর (১৯১৯), মোসলেম ভারত (১৯২০), সহচর (১৯২১), সাম্যবাদ (১৯২২), ধূমকেতু (১৯২২), আহমদী (১৯২৫), গণবাণী (১৯২৭), মাসিক মোহাম্মদী (১৯২৭), চতুরঙ্গ (১৯৩৮), ইত্যাদি আরও কিছু সময়িক পত্রিকা। পত্রিকাগুলির প্রচার ছিল স্বল্প, তেমনি আবির্ভূত হয়েছিল খুবই স্বল্পায়ু নিয়ে। তবু তাদের ভূমিকা ছিল উজ্জ্বল ও বলিষ্ঠ। তারা বিচ্ছিন্নতার কথা ভাবেনি। তারা চেয়েছিল সামঞ্জস্য ও ঐক্য। কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরার প্রয়োজন বোধ করছি।

'কোহিনূর'-এর লক্ষ্য—"হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি, জাতীয় উন্নতি, মাতৃভাষার সেবা।" কোহিনুর বিশ্বাস করে—"হিন্দু ও মুসলমান এই উভয় জাতিই ভারত মাতার সন্তান। মুসলমান ভ্রাতৃগণ এতদ্দিন সাহিত্যচর্চা বিষয়ে হিন্দু ভ্রাতৃগণের সমকক্ষ হইতে যথেষ্ট চেষ্টা করেন নাই।" এই পত্রিকা চায় দুই সম্প্রদায় আরও বেশি করে পরস্পরকে জানতে ও বুঝতে চেষ্টা করুক। পরস্পরের ধর্ম সম্পর্কে তাদের অনেক বেশী উদার ও সহনশীল হওয়া দরকার। হিন্দু সম্পর্কে মুসলমানের ক্ষোভের প্রধান কারণ, হিন্দুর কাছে মুসলমান

অস্পৃশ্য। এই অবজ্ঞা তাদের দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। তার উপর শিক্ষার দিক থেকে পিছিয়ে থাকার ফলে সাধারণভাবে মুসলমানদের মধ্যে এক রকমের হীনমন্যতাবোধ উভয়ের সম্পর্কের মধ্যে জটিলতা সৃষ্টি করছে। যারা মানসিক ও শারীরিকভাবে অবজ্ঞাত ও অপমানিত, মনের সেই সব গ্লানি রেখে কখনই তারা আন্তরিকভাবে মিলিত হতে পারবে না।

"মিলনের একমাত্র অন্তরায় এই অবজ্ঞার ভাব।" একি শুধু মুসলমানের ক্ষেত্রে ঘটেছে? বর্ণবৈষম্যের কারণে তথাকথিত নিম্ন বর্ণের হিন্দুরা উচ্চবর্ণের নিকট অস্পৃশ্য ও অবজ্ঞাত। এই অবজ্ঞার ভয়াবহ পরিণতি উত্তর ভারতের নানা স্থানে নগ্নভাবে আজ প্রকট হয়ে উঠেছে। তবে সৈয়দ এমদাদ আলীর দৃঢ় ধারণা—"আমরা বিদ্যায়, বৈভবে, সাহিত্যে, দর্শনে বড় হইতে পারিলে কখনই অবজ্ঞাত থাকিব না, থাকিতে পারি না।" এ কথা সমস্ত ধর্মের ও বর্ণের পশ্চাৎপদ মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ভারতের সংবিধানের নির্দেশ আছে, সকলের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা। কিন্তু রাষ্ট্রের পরিচালকগণ আরও বহু বিষয়ে ব্যর্থতার মত সর্বজনীন বাধ্যতামূলক শিক্ষার ক্ষেত্রেও ব্যর্থ। কিন্তু এই ব্যর্থতার জন্য জাতিকে যে কি নিদারুণ মূল্য দিতে হচ্ছে, এই চেতনা তাঁদের আছে বলে মনে হয় না।

'নবনূর'-এর মতে বঙ্গভাষার সেবা করা 'পুণ্যব্রত'। এই সঙ্গে নবনূর-এর প্রার্থনা—"আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ইহাই আশা করি যে, যে সমুদয় পূজনীয় হিন্দু লেখক মুসলমান জাতির প্রতি সহানুভূতিশীল, এবং একত্রে বাস নিবন্ধন তাহাদের সহিত সৌহার্দ্দসূত্রে আবদ্ধ, তাঁহারা নবনূরকে, যথোচিত সাহায্য করিয়া মুসলমানপ্রীতির পরিচয় প্রদান করিবেন। ভারতবর্ষের অদৃষ্টফলকে হিন্দু-মুসলমানের সুখ-দুঃখ এখন একই বর্ণে চিত্রিত; বিজয়দৃপ্ত মুসলমান এখন হিন্দুর ন্যায়ই বিজীত; এই দুই মহাজাতির সম্মিলনের উপরেই ভারতের শুভাশুভ নির্ভর করে।" পরিশেষে আবেদন—"ভাই হিন্দু-মুসলমান! তোমরা পার্থক্যের অন্ধ ও নিরর্থক সংস্কারে মুগ্ধ ও আত্মহারা হইয়া আত্মহননে প্রবৃত্ত হইও না ....।"

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা-র মতামত ছিল আরও অনেক বেশি উদার ও প্রগতিশীল। মনে রাখা দরকার এই পত্রিকার সর্বক্ষণের কর্মী ছিলেন মুজফ্‌ফর আহমেদ, যিনি পরে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে একজন হিসেবে গণ্য হন। কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম কবিতা মুদ্রিত হয় এই পত্রিকায়। এই পত্রিকার দৃঢ় অভিমত—"আমার স্বজাতীয় ভাইয়েরা কেবল এই কথাই মনে রাখিবেন যে বর্তমান বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃত মূলকই হউক কি আর যাহাই হউক, উহা আমাদেরই মাতৃভাষা। আমরা উহাতে নিজেদের জাতীয় ভাব ও আদর্শ বিকশিত করিয়া তুলিব।" এই পত্রিকা মনে করে, "বঙ্গ সাহিত্য হইতে দূরে পড়িয়া থাকার ফলে মুসলমানগণ আজও শিক্ষায় অনুন্নত রহিয়াছে। এই দূরে থাকার দোষ আর একটা দাঁড়াইছে যে, হিন্দু মুসলমান হইতে এবং মুসলমানগণ হিন্দু হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছেন।"

ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজের মুখপত্র 'শিখা' মতামতের দিক থেকে আধুনিক। পত্রিকা মনেকার হিন্দুসমাজের ভিতরে মধ্যযুগীয় ও আধুনিক যুগীয় চিন্তা-চেতনার সংঘাতের ভিতর দিয়ে আধুনিক মানসিকতার বিকাশ ঘটছে, কিন্তু মুসলমান সমাজ সম্পর্কে আক্ষেপ করে বলা হয়েছে—"এতদিন ধরে পরিবর্ত্তিত অবস্থায় বাস করেও তন্দ্রার ঘোরে দুই একটি প্যান-ইসলামী বোলচাল দেওয়া ভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্বন্ধে কোনরূপ জাগ্রত-চিত্ততার

পরিচয় দেয়নি আজ পর্যন্ত। .... এই মনের বন্ধন সহজভাবে চুকিয়ে দিয়ে মুসলমান নব মানব চেতনার ধ্বজা বহন করবার যোগ্য হবে কিনা, অথবা কতদিনে হবে, জানি না। যদি হয়, তবে বাংলার কর্ম ও চিন্তার ক্ষেত্রে তার দান কম হবে না। তা হলে স্বাপ্নিক হিন্দু ও বস্তুতন্ত্রী মুসলমান এ দু'এর মিলনে বাংলার যে অভিনব জাতীয় জীবন গঠিত হবে—তার কীর্ত্তি-কথা বর্ণনা করার ভার ভবিষ্যৎ সাহিত্যিকদের উপর থাকুক।"

না, "মনের বন্ধন সহজভাবে চুকিয়ে দেওয়া" যায়নি। উভয় সম্প্রদায় সম্পর্কে কথাগুলি কম-বেশী সত্যি। এও সত্যি, বাইরের দিক থেকে আধুনিক দেখালেও মনের দিক থেকে আমাদের মধ্যে মধ্যযুগীয় ধর্মাচার ও কুসংস্কার এখনও বিরাজ করছে।

আলোচনায় উদ্ধৃতির লোভ সংবরণ করা কঠিন। কিন্তু স্থানাভাবে তার সুযোগ নেই। পুস্তকটি পড়ে এই বিশ্বাসে উপনীত হওয়া গেল যে, বাস্তবে সাধারণ মানুষের হৃদয়গ্রাহ্য যেহোক না হোক, সময়ের আহ্বান যাঁদের হৃদয়কে স্পর্শ করেছে, তাঁরা কথা বলবেন, সাহসের সঙ্গে উন্মুক্ত করবেন তাঁদের চিন্তা ভাবনা। আজকের চিন্তা হয়ত কাল মানুষকে উদ্বেলিত করবে। পরিশেষে কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ তাঁর অনুসন্ধান বিষয়বস্তুর জন্য। যাঁরা মুসলিম সমাজ সম্পর্কে অনেক মনগড়া অভিযোগ পোষণ করেন, এই পুস্তক অন্তত কিছু পরিমানে তাঁদের বুঝতে সাহায্য করবে নিজের প্রতিবেশীকে। হয়ত উভয়ের মাঝখানের ব্যবধানও কিছু কমবে।

রঞ্জন ধর

মোসলেম পত্র-পত্রিকায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি। কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়। পুঁথিপত্র (ক্যালকাটা) প্রাইভেট লিমিটেড, পঞ্চাশ টাকা।

গল্পে তেভাগার কাহিনী

১৯৪৬-এর সেপ্টেম্বর মাস থেকে উত্তরবঙ্গে তেভাগা আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ের সূচনা। এই ঐতিহাসিক কৃষকআন্দোলন ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ে বাংলার উনিশটি প্রধান জেলায়। ৪৭-এর মার্চ পর্যন্ত এই পর্বের বিস্তৃতি। ১৯৪৮-৪৯ সালে পশ্চিমবঙ্গে হাসনাবাদ, সন্দেশখালি এবং কাকদ্বীপ অঞ্চলে তেভাগার দাবীতে কৃষক-সংগ্রাম এই আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়। ভাগচাষীদের উৎপন্ন ফসলের দুভাগের দাবীই হল তেভাগা। এই আন্দোলনের পটভূমিকা অথবা ফলাফল সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, শতাব্দীব্যাপী শোষণ এবং লুণ্ঠনে সর্বস্বান্ত বাঙালী কৃষকের এ ছিল অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম। কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বাধীন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষকসভাই ছিল এই আন্দোলনের পুরোভাগে। এই সংগঠিত কৃষকআন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িয়ে পড়েছিলেন তৎকালীন বামপন্থী শিল্পী সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক কর্মীরা। এদের মধ্যে কেউ কেউ মাঠে ফসলকাটার সাক্ষী ছিলেন, কেউ হয়ে পড়েছিলেন এর অংশীদার, আর অনেকেরই শ্রেণীচেতনা ও রাজনৈতিক বিশ্বাস তাঁদের এই আন্দোলনের সহযাত্রী করে

তুলেছিল। তাই তেভাগা নিয়ে সোমনাথ হোরের মত মতো শিল্পী মাঠে বসে স্কেচ এঁকেছেন, গোলাম-কুদ্দুসের মতো কেউ কেউ 'স্বাধীনতা' পত্রিকায় রিপোর্টাজ পাঠিয়েছেন, আর আমাদের শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিকে অনেকেই আন্দোলনের কথা জেনে বা প্রত্যক্ষদ্রষ্টা হয়ে তাকে গল্পের বিষয় করেছেন। এরকম কয়েকটি গল্পকে নিয়েই সুস্নাত দাশের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'তেভাগার গল্প'।

কেবল রাজনীতি নিয়ে গল্প হয় না, গল্প হয় রাজনীতির মধ্যে থাকা মানুষগুলিকে নিয়ে। আর মানুষ মানেই তার সুখ-দুঃখ, আশার আনন্দ ও ব্যর্থতার বেদনা। তেভাগার গল্প যাঁরা লিখেছিলেন নিজেদের বিশ্বাসের কারণেই তাঁরা হতাশার বা ব্যর্থতার দিকটি তুলে ধরেন নি। আন্দোলনের মানুষগুলির সঙ্গে একাত্মতাবোধে তাঁদের কোনো অসুবিধে ঘটে থাকলেও সেটা অনেকেই সযত্নে এড়িয়ে গেছেন। বিপ্লবকে দূর থেকে দেখলে আবেগ প্রাধান্য পায়, তখন নিজেকেও একজন সংগ্রামী বলে মনে হয়, কিন্তু কঠোর বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়ালে নিজের সীমাবদ্ধতাও ধরা পড়ে। এর সমর্থনে দুটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। একটি আছে সংকলনের বাইরে, অপরটি ভিতরে। সোমনাথ হোর তাঁর বিখ্যাত তেভাগার ডায়েরি-র ভূমিকায় আক্ষেপ করে বলেছিলেন, আমরা শহরের লোক, দীনদয়াল শকরুদ্দিনরা জীবনব্যাপী সংগ্রামে রক্ত ঢেলেছেন, 'আমরা আরাম কিনেছি। আশা করব তারা নিজেরাই একদিন নিজেদের ইতিহাস লিখবেন; ইতিহাসের বিষয় হয়ে উঠবেন না। দীনদয়াল শকরুদ্দিন তোমাদের দুঃখ আমরা বুঝি, কিন্তু প্রতিদিনের সেই দুঃখ ভোগ করি না। এই দুইয়ের ফারাক খুব বেশি।' যিনি এই পংক্তি কটি লিখেছেন সোমনাথ লাহিড়ী এবং নৃপেন চক্রবর্তীরা তাঁকে তেভাগা দেখতে উত্তরবঙ্গে পাঠিয়েছিলেন। তাই তাঁর অভিজ্ঞতায় কোন ফাঁক নেই।

দ্বিতীয় স্বীকারোক্তিটি পাওয়া যাবে আলোচ্য সংকলনের অন্তর্গত গোলাম কুদ্দুসের 'লাখে না মিলয়ে এক' রচনায়। 'স্বাধীনতার' সাংবাদিক হিসেবে তেভাগা আন্দোলনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সাহায্য নিয়ে তিনি কয়েকটি অসাধারণ রিপোর্টাজ লিখেছিলেন। এটি তার অন্যতম। তারই একটি জায়গায় তিনিও সোমনাথ হোর কথিত ওই ফারাকটি দেখিয়ে দেন 'মাটির সানকীতে ডাল-ভাত খেয়ে আমি ওভারকোট গায়ে জড়িয়ে গরম খড়ের বিছানায় শুয়ে শীতে কাঁপতাম, আর পাহারারত ভলান্টিয়ারদের নৈশ বিচরণের জামাকাপড়ের অবস্থার কথা ভেবে লজ্জা পেতাম। সকালে তারা অনেকে এসে আমাকে ঘিরে বসত, আর শীতে কাঁপতে কাঁপতে আমার ওভারকোটের ওপর সন্তর্পণে হাত বুলিয়ে বলত—কমরেট, এটা গায়ে দিলে শীত লাগে না, না? মানুষের সঙ্গে একাত্ম হওয়া কি সোজা কথা?' একে কি কেবল মামুলি স্বীকারোক্তি বলা চলে? এটাই বোধ হয় তেভাগার আসল গল্প। এখানেই তো তেভাগার মানুষগুলিকে সঠিকভাবে চেনা যায়, তাদের দারিদ্র্যের কথা জানা হয়ে যায়, আন্দোলনের কারণটিও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পাশাপাশি পাওয়া যাবে সেই সরল মনের খোলা মানুষগুলিকে যাদের মধ্যে নাগরিক কৃত্রিমতা জন্মায়নি।

সংকলনে ষোলটি রচনা রয়েছে। এদের মধ্যে তেরোটি গল্প, দুটি রিপোর্টাজ, একটি স্মৃতিচিত্রণ রয়েছে সবগুলিই তেভাগার। পটভূমিকায় রচিত। এদের মধ্যে পাওয়া যাবে লড়াকু কৃষকদের পারস্পরিক মৈত্রী, আত্মপ্রত্যয়, তাদের জীবন থেকে সামন্ততান্ত্রিক গোঁড়ামির অবসান, কৃষক রমণীদের তেভাগায় অংশে নেওয়া, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের রক্তাক্ত চেহারা,

সংগ্রামে জনজাতিদের ব্যাপক অংশগ্রহণ এবং সাম্প্রদায়িক মৈত্রীর উজ্জ্বল চিত্র। অবশ্য এত সূক্ষ্মবিভাগ অনেক গল্পের ক্ষেত্রেই বজায় থাকেনি, থাকা সম্ভবও নয়। সবকিছুকে মিলিয়েই তো তেভাগার একটি পূর্ণাঙ্গ চেহারা ফুটে ওঠার কথা। গল্প বাছাইয়ে সম্পাদকের মুন্সিয়ানা স্বীকার করতেই হয়। তিনি শুধু লেখকই বাছেন নি, লেখাও বেছেছেন। ফলে একটি গোটা সময়কেই আমরা খুঁজে পাই।

এই ধরনের গল্পের ভালোমন্দ বিচারের মাপকাঠি কিছুটা আলাদা। গতানুগতিক পদ্ধতিতে এদের শিল্পমূল্য বিচার করা যাবে না। কেবল আন্দোলনের কথা বলাই নয়, তার সম্বন্ধে লেখকের মনোভাবটিও এ সমস্ত ক্ষেত্রে বেরিয়ে আসে। এই কাঠামোটি বজায় রেখে গল্পটি উৎরে দেওয়া কঠিন কাজ। যাঁরা তা পেরেছিলেন তাঁদের কারো কারো লেখা এখানে আছে। আবার কেবল দায়বদ্ধতার কারণে তেভাগার ওপর গল্প লিখতে হয় বলে গল্প লেখা-এমন উদাহরণ যে নেই তা নয়।

এই প্রসঙ্গে একটি আলোচনা বোধ হয় সেরে নেওয়াই ভাল। আন্দোলনের কেন্দ্রস্থলে অবস্থানকেই শ্রেষ্ঠগল্প রচনার আবশ্যিকসর্ত বলে অনেকে একদা মনে করতেন। কিন্তু অভিজ্ঞতায় তা সবসময় মেলে না। হাতের কাছেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হারাণের নাত জামাই' গল্পটি রয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগণার তেভাগা আন্দোলনের কাহিনী অবলম্বনে রচিত এটি একটি অসামান্য রচনা। এই গল্পের সংগ্রামী কৃষক নায়ক ভুবন মণ্ডলকে পুলিশের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য কৃষক রমনী ময়নার মা তাকে মিথ্যে জামাই সাজিয়ে মেয়ের সঙ্গে এক ঘরে রাতকাটানোর ব্যবস্থা করে। এই সব চরিত্র আঁকার জন্য মানিকবাবুকে আন্দোলনের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াতে হয় নি, অথচ এদের তিনি চোখের সামনে দেখতে পেয়েছেন। সুপ্রাত সঠিকভাবেই জানিয়েছেন যে, এই গল্পটি রচনার (মাঘ, ১৩৫৩) অনেক পরে তেভাগা আন্দোলনের কৃষকনেতা হেমন্ত ঘোষালের অভিজ্ঞতা ভুবন মণ্ডলের মতোই হয়েছিল। মহৎ স্রষ্টারা বোধ হয় অনেক আগে থেকেই দেখতে পান। 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী'-র মতো গল্প রচনার সময়েও বড়াকমলাপুরের তেভাগা আন্দোলন দেখতে যাবার প্রয়োজন মানিকবাবুর যে হয়নি চিন্মোহন সেহানবীশের সাক্ষ্যে (৪৬ নং একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন প্রসঙ্গে, পৃ. ১৯৬) তাও জানা যায়। সুপ্রাতও এই তথ্যটির উল্লেখ করেছেন। আবার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় কি অসাধারণ সৃষ্টি হয় গোলাম কুদ্দুসের 'সাথে না মিলয়ে এক' থেকে তার উদাহরণ আগেই দেওয়া হয়েছে।

এই প্রসঙ্গেই আবু ইসহাকের 'জোঁক' গল্পটির কথা একটু বলা দরকার। একমাত্র এই গল্পটিতেই দৈনন্দিন কৃষক-জীবনের অথবা তার ফসল কাটার একক পরিশ্রমের বিবরণ আছে। অন্য গল্পগুলিতে কৃষকের ব্যক্তিসত্তা থেকে তার শ্রেণীগত সত্তাটি গুরুত্ব পেয়েছে বেশি। 'জোঁক' গল্পের ওসমানের ব্যক্তিসত্তার ক্রমশ শ্রেণীসত্তায় রূপান্তর তাই অনেক বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে। গুরুত্বের বিচারে ননী ভৌমিকের গল্প দুটির কথা এর পরেই আসে। বিশেষ করে 'সলিমের মা' গল্পটি অবশ্যই আলাদা গুরুত্ব পাবে। মইনুদ্দিন প্রধানের মতো সম্পন্ন কৃষকেরা কিভাবে এক-দু পুরুষের মধ্যেই আধিয়ারে পরিণত হয়েছিল তা এই গল্পটি আমাদের জানিয়ে দেয়। দশ হাজার বিঘে জমির মালিক জোতদার করম আলির সঙ্গে মামলায় মইনুদ্দিন ক্রমশ সর্বস্বান্ত হচ্ছিল, অথচ কৃষকের জেদ ও মর্যাদাবোধ তাকে আত্মসমর্পণ করতে দেয় না। পাশাপাশি বনেদী মুসলমান পরিবারের অন্তঃপুরের আব্রুরক্ষার

দিকেও তার সতর্ক দৃষ্টি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ধর্মীয় গোঁড়ামি বা পারিবারিক রক্ষণশীলতা ছাড়িয়ে শ্রেণীসত্তাই প্রাধান্য পায়। আইনের লড়াই-এর বদলে মইনুদ্দিনেরা সশস্ত্র প্রতিরোধে নেমে পড়ে। আর 'ধানকানা' গল্পের আঁধার নিজের বন্ধক দেওয়া পাঁচ বিঘে জমি আর উদ্ধার করতে না পেরে রাস্তাখোঁড়াব মজুর হয়ে পড়ে। ধানকানা-র বদলে আগন্তুক-গল্পটি সংকলনে রাখলেই বোধহয় হয় ভালো হত। গল্পটি সম্পর্কে সুস্নাতকেও ভূমিকায় আলোচনা করতে হয়েছে। তিনি ঠিকই লক্ষ্য করেছেন যে তেভাগার শহুরে নেতা মুরারির আত্মসমালোচনার মধ্যেই আন্দোলনের সীমাবদ্ধতার দিকটি ধরা আছে।

সমাজের সর্বস্তরের অংশ গ্রহণের মধ্যে দিয়েই একটি আন্দোলন পূর্ণতা পায়। তেভাগার ক্ষেত্রে তাই নারীচরিত্রের ভূমিকা গুরুত্ব পায়। 'হারাণের নাতজামাই'-এর ময়নার মা যে কল্পিত চরিত্র ছিল না তার নিদর্শন রয়েছে সুশীল জানা (বউ), সমরেশ বসু (প্রতিরোধ), সৌরি ঘটক (কমরেড, অরণ্যের স্বপ্ন)-প্রভৃতির গল্পে। কোনো কোনা গল্প পড়ে পাঠকের হয়তো মনে হতে পারে যে সব দাম্পত্য সমস্যার সমাধান বোধ হয় এত সহজে হয় না। তবে পরিপ্রেক্ষিতটি এমনই ছিল এবং হাতের কাছে এমন সমস্ত উদাহরণও ছিল যে ঘটনাগুলি বিশ্বাস না করে উপায়ও নেই। এই আন্দোলনের জেরেই সিঁধেল চোর রসুলের স্ত্রী আমিনার দৈবমন্ত্র সংগ্রামজয়ের মন্ত্রে পরিবর্তিত হয়ে যায় (স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, মন্ত্রশক্তি), মিহির আচার্যের 'দালাল' গল্পের দালাল দ্বীপচাঁদের শ্রেণীচেতনা জাগ্রত হয়, পুলিশ-জোতদারের পক্ষ ছেড়ে সে সংগ্রামী কৃষকদের গোপন খবর যোগান দিতে থাকে। আবার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পে পেশাদার ঘাতক বন্দুকবাজ রঘুরাম কৃষকনেতা রহমানকে মারবার বদলে জোতদারের সব বন্দুক তার হাতেই তুলে দেয় (বন্দুক)। কিংবা মিহির সেনের 'হাউষ' গল্পের ভাগচাষী সন্তান পোহান্দুর শহরদর্শনের সাধ মেটে বটে, শহরে সে ঢোকে শহীদ হিসেবে কিন্তু প্রবীণ কৃষক নেতা বিভূতি গুহের ধানক্ষেতের কাহিনী' পূর্ণেন্দু পত্রীর রিপোর্টাজ 'অন্যগ্রাম অন্যপ্রাণ' অথবা অরুণ চক্রবর্তীর 'তেভাগার বুধুয়া প্রভৃতিতে ইতিহাসের কাহিনী ক্রমশ গল্পের উপাদানে পরিণত হয়।

আসলে এই জাতীয় সংকলনে গল্প ধরে ধরে আলোচনা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক। সমস্ত গল্পই আসলে একটি গল্প, তেভাগার গল্প। সমস্ত গল্পেরই আসলে একটি চরিত্র, তা হল তেভাগার সংগ্রামী কৃষক। সব লেখকেরই এক লক্ষ্য, সংগ্রামী কৃষকদের পাশে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দাঁড়ানো। এমন কি, এই গল্পগুলিকে যিনি একজায়গায় জড়ো করেছেন তাঁরও একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল, 'আজকের তরুণ প্রজন্ম যারা আমাদের সংগ্রামী সাহিত্য সম্পর্কে যথার্থ অবহিত নন তারা সে বিষয়ে এবং বাঙলার একটি মহান গণসংগ্রাম সম্বন্ধে এই গল্পগুলি পাঠ করে হয়তো সচেতন হয়ে উঠবেন।' যে দায়িত্ব প্রবীণদের কারো পালন করার কথা সুস্নাত তা পালন করে আমাদের ধন্যবাদভাজন হয়েছেন। তেভাগা সংগ্রামের হারানো দিনগুলির কথা অনেকদিন বাদে যেন আমাদের মনে পড়ে যায়।

বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য

তেভাগার গল্প/সম্পাদনা/সুস্নাত দাশ/নক্ষত্র প্রকাশন/ দাম : ষাট টাকা

ভারতের প্রথম ইংরিজি গ্রন্থকার

"ইণ্ডিয়ান ইংলিশ" লেখকদের বাজার এখন সরগরম। এই ধারার উৎসমুখ ও পরম্পরা সন্ধান করতে করতে দু'শ বছরের ওপর পেছিয়ে পৌঁছতে হয় ১৭৯৪ সালের আয়ারল্যাণ্ড। সেই দেশের কর্ক নামক বন্দরে এই বছর ১৫ই জানুয়ারী প্রকাশিত " THE TRAVELS OF DEAN MAHOMET.... A native of Patna in Bengal".

ঐতিহাসিক ডাঃ মাইকেল (ওবার্লিন কলেজ, ওহাইও) বিস্মৃত এই ছোট বইটি পুনঃ প্রকাশিত করেছিলেন ১৯৯৬ সালে, তাঁর লেখা "The First Indinan Author in English" পুস্তকের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ হিসেবে। বইটি "The Oxford Themes in Indian History" গ্রন্থমালার অর্ন্তগত।

সেকালের প্রচলিত দীন মহম্মদ এক কাল্পনিক বন্ধুকে উদ্দেশ্য করে আটত্রিশটি চিঠির আকারে দু'খণ্ডে তাঁর "Travels" নিজেস প্রকাশ করেছিলেন। শত খানেক পাতার মূল বইয়ের সঙ্গে ফিশার সাহেব সংযোজন করেছেন আরও আড়াইশ পাতা জুড়ে দুই মহাদেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিবৃত্ত, বহু চিত্র ও একটি মানচিত্র। ফিশার সাহেবের লেখা, দীন মহম্মদের বর্ণময় ও ঘটনাবহুল জীবন ও তার প্রেক্ষাপটের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা কেবল মাত্র বিশেষজ্ঞদের জন্য নয়, আমাদের মত সাধারণ পাঠকদের কাছেও অত্যন্ত মনোগ্রাহী।

পাটনা শহর সেকালের সুবে বাংলা বা বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির অর্ন্তগত ছিল। বর্তমানে পাটনা বিহার প্রদেশের মধ্যে পড়লেও বাঙালীরা দীন মহম্মদের সঙ্গে কয়েকটি কারণে বিশেষ আত্মীয়তা বোধ করতে পারেন। দীন মহম্মদ নিজে অবশ্য দাবী করতেন তাঁর পূর্বপুরুষরা ইরাণ তুরাণ থেকে বহিরাগত। কিন্তু ফিশার সাহেব পাঁচটি নজির খাড়া করে বলেছেন, আসলে দীন মহম্মদ খুব সম্ভবত পাতি বাঙালী! প্রথম নজির তাঁর চেহারা। তা মোটেই দীর্ঘকায় গৌরবর্ণ পাঠান ছিল না। তিনি ছিলেন মাথায় ফুট পাঁচেক ও কৃষ্ণবর্ণ। (কি করে জানা গেল? ছবি আর সাময়িক পত্র পত্রিকা থেকে।) দ্বিতীয়, দীন মহম্মদ নিজের বইয়ে সুন্নত, নিকা, ইন্তেকাল ইত্যাদি বিষয়ক সামাজিক অনুষ্ঠানের যে সমস্ত বর্ণনা দিয়েছেন তা ঠিক খানদানি কেতার সঙ্গে খাপ খায় না। বরং হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির সংমিশ্রনে যে দেশজ আচার আচরণ সৃষ্টি হচ্ছিল তার সঙ্গেই বেশী মিলে যায়। দীন মহম্মদ মুর্শিদাবাদ সফরকালে এক আত্মীয় বাড়ি সুন্নত অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। সেই অনুষ্ঠানের বিবরণ দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন, মুসলমানদের নামি চারবার "ব্যাপ্টিজম" হয়। (বিজাতীয়দের কাছে সুন্নত বোঝতে ব্যাপ্টিজম শব্দ ব্যবহৃত করেছেন।) প্রথম অনুষ্ঠানটিতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এসে নবজাতকের কোষ্ঠি বিচার করতেন। এ ধরনের আচার প্রাচ্ছন্ন দেশজ আচারেই পুনারাবৃত্তি। আরব দেশে নিশ্চয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সুলভ ছিল না।

নবাব মির জাফর এক দেশীয় নর্তকিকে নিকা করেন। রাণী হিসেবে অনেক কনিষ্ঠ হওয়া সত্বেও সেই বেগম নিজ ব্যক্তিত্ব ও বুদ্ধিবলে নাবালক সতীন-পুত্রের অভিভাবিকা হয়ে রাজ্য পরিচালনা করতে শুরু করেন। দীন মহম্মদ, আত্মীয়তা সুবাদে, মুর্শিদাবাদ নবাব বাড়ির যে পৃষ্ঠপোষকের বিষয়ে উল্লেখ করেছেন—খুব সম্ভবত তিনি এই মনি বেগম।

ভবিষ্যত জীবনে দীন মহম্মদ নিজের নামের আগে এক খেতাব জুড়ে দিয়ে নিজেকে জাহির করেন, "Sake Dean Mohhamed" হিশেবে। Sake অর্থাৎ শেখ খেতাবটি

ধর্মান্তরিত মুসলমানদেরই গ্রহণ করার রেয়াজ ছিল। অন্তত ফিশার সাহেব সেরকম কথাই বলেছেন।

সব শেষে তিনি আরও বলেছেন "His grandson reported seeing a book in Dean Mohomed's library with his name inscribed in a language a thing of dots and cresents ... .." নাতি মনে করেছিলেন ভাষাটি সংস্কৃত। কিন্তু দেবনাগরী বর্ণমালায় ওই ধরণের কোনও হরফ নেই। অক্ষরটি বরং আমাদের চন্দ্রবিন্দুর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ।

তৎকালিন পূর্ব-পাকিস্তানের বাঙালী আমলা উমরাওরা বাড়িতে উর্দু বলতেন ও ইরানী তুরানী পদবী অধিগ্রহণ করতেন। ভাষা আন্দোলনের পর বাংলাদেশে সে সব কেতা বর্জিত হয়েছে। "পাক্কা সাহেব" আখ্যা দিলে গর্বিত করে না এমন বান্দা হিন্দুস্তান, পাকিস্তান, বাংলাদেশের তথা তাবৎ কালা আদমিদের মধ্যে আজও বিরল। তেমনি দীন মহম্মদ হয়তো নিজের পূর্বপুরুষদের বহিরাগত ভেবে গর্ববোধ করতেন। দেশকাল নির্বিশেষে রাজার কেতা রপ্ত করাই উন্নতির প্রশস্ত সোপান। রাজার জাত হলে ত কথাই নেই। দীন মহম্মদের ক্ষেত্রে নিজ কৌম বা বংশ গৌরব ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখা একটা সাধারণ মানবীয় দুর্বলতা বলা চলে। এই যেমন আমরা দীন মহম্মদকে বাঙালী প্রমান করবার জন্য এত সূক্ষ্ম যুক্তির জাল বিস্তার করছি।

আর একটি তথ্যও বাঙালীদের কাছে ঔৎসুক্যজনক। সারা পৃথিবীতে দীন মহম্মদের বইয়ের মাত্র দুইটি সম্পূর্ণ কপির নাকি সন্ধান পাওয়া যায়। তার একটি রক্ষিত আছে শান্তিনিকেতনে। সত্যেন্দ্র ঠাকুরের পরিবার ব্রাইটনে কিছুকাল বাস করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথও প্রথম যৌবনে তাঁদের আতিথ্য গ্রহণ করেন। অনুমান করা যায়, এই সময়েই শহরের একজন নামজাদা লোকের লেখা বইটি সংগৃহিত হয়েছিল।

১৭৫৭ সালে পলাশী-যুদ্ধের দুবছর পরে দীন মহম্মদের জন্ম হয়। তাঁর বাল্যকাল কেটেছিল সাম্রাজ্যের দ্রুত অবলুপ্তি ও ইংরাজ আধিপত্যের দ্রুততর বিস্তারের টালমাটাল যুগসন্ধিক্ষণে। মুঘলদের অধীনস্থ সমস্ত রাজার রেয়াজ ছিল ছোট ছোট সেনানী প্রতিপালন করা। সে সমস্ত সৈন্যদল সময় সময়ে নিযুক্ত হত সামন্ত রাজাদের নিজেদের মধ্য যুদ্ধ বিগ্রহে বা বাদশার হয়ে বিদ্রোহ দমন অথবা সম্রাটের হয়ে দমন, অথবা সম্রাটের সৈন্যদলের সংগে যুক্ত হয়ে যুদ্ধ করতে। কিন্তু তাদের আসল চাকরি ছিল প্রজাদের কাছে কর আদায় করা। দীন মহম্মদের পূর্ব-পুরুষরা এই ধরনের সামন্ত প্রভুদের বেতনভুক্ত সেনাপতি হয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন। ভূ-সম্পত্তির অধিকারী হলেও এই শ্রেণীর যুদ্ধজীবিরা ভিটে মাটির সঙ্গে তেমন নাড়ীর টান অনুভব করতেন না। তাঁদের যোগাযোগ ও বিচরণ ক্ষেত্র ছিল মূলত রাজ দরবার ও বড় বড় শহর।

নবাবী শাসন ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার জন্য সেই সময়ে একাধিক ইউরোপিয় জাতি সার্থবাহরা, (যেমন, পর্তুগীজ, ওলন্দাজ দিনেমার এবং ইংরেজ) সকলেই সাম্রাজ্য দখলের আখড়ায় নেমে পড়েছিল। দীন মহম্মদের পিতার মত পেশাদার সৈনিকরা অনেকে সে সময়ে, আমরা যেমন বলি বিদেশীদের 'নৌকরি' নিয়েছিলেন। ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি তাদের বেতনভূক এই সমস্ত আধা সামরিক সৈন্যদলকে "পরগণা সেপাই" আখ্যা দিয়ে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখতেন। ওয়ারেন হেস্টিংস এই পরগণা সেপাইগুলির

বিষয়ে মন্তব্য করেছিলেন, "........ a rascally corps.....our own plunderers. ..withouth control and employed in the most unsoldierly of all services" অর্থাৎ কিনা বলপ্রয়োগ করে কর আদায় করা ছিল তাদের প্রধান কাজ। সন্ন্যাসী বিদ্রোহ দমন করবার সময়ে বৃটিশরা যে সমস্ত বিপর্যযের সম্মুখিন হয়েছিল তার সমস্ত দায় ইংরেজ কর্তাব্যক্তিরা "পরগণা সেপাইদের" ঘাড়ের ওপর চাপিয়ে দেন। তারপর সেই একই অছিলায় বাহিনী গুলি ভেঙে দেওয়া হয়।

উপরোক্ত কর আদায়ের এক কারোয়াহিতেই দীন মহম্মদের পিতা মারা পড়েন। দীন মহম্মদের বয়স তখন বছর দশেক। তার ষোল বছরের দাদাকে পিতার সুবেদারির পদটি দেওয়া হয় এবং দীন মহম্মদ ও তাঁর বিধবা মা পাটনায় এসে বাসবাস করতে আরম্ভ করেন। পিতৃহীন হলেও তাঁদের অবস্থা সচ্ছল ছিল।

পাটনা অঞ্চলে ইংরেজদের হয়ে কর আদায় করতেন এক নবাবী মেজাজের হিন্দু শিতাব রায়। 'রাজা' শিতাব রায় নবাবী ঢঙেই ইংরেজ প্রভুদের খাতিরে অপ্যায়ন করে খুশি রাখার জন্য যারপরনাই যত্ন নিতেন। তখনকার দিনে কোম্পানি বাহাদুর প্রশাসন ও বানিজ্য সৈনিকদের বলা হত "ক্যাডেট" ও শিক্ষাবিশ কেরানিদের "রাইটার"। এই নবাগতরাই রাজা শিতাব রায়ের খানা-পিনা ও বাই-নাচের মজলিস জমজমাট রাখতেন।

শিতাব রায়ের দরবারে মৃত পিতার পদমর্যাদা ও সুনামের খাতিরে বালক দীন মহম্মদের অবাধ গতিবিধি ছিল। আর ছিল পিতাকে অনুসরণ করে সৈনিক জীবন অবলম্বন করার অদম্য আকাঙ্ক্ষা। শিতাব রায়ের 'ক্যাডেট' গড্ডে ইভান বেকারের সংস্পর্শে আসে বালক মহম্মদ।

প্রথম শাক্ষাৎ থেকে উভয়ত এক নিবিড় বন্ধনের সৃষ্টি হয়। বেকারকে মুরুব্বি পাকড়ে তাঁর ইউরোপিয়ান ব্যাটেলিয়ান-এর লেজুর হিসেবে বছর দশ এগার বছর বয়সের ছেলে দীন মহম্মদ গৃহত্যাগ করে ১৯৬৯ সালে। বিধবা মাকে সান্ত্বনা হিশেবে চারশ টাকা ধরে দেন ছোকরা কাপ্তান বেকার সাহেব। তখনকার দিনে পক্ষে টাকার অঙ্কটা নেহাৎ কম নয়।

বেকার সাহেব ও পল্টনের অন্যান্য ইংরেজদের সঙ্গে দীন মহম্মদের সম্পর্কটা ঠিক কি রকম ছিল? সম্পর্কটি সাধারণ ভাবে কালা আদমিদের সঙ্গে শেতাঙ্গদের মত অসম হলেও নিশ্চয় প্রভু ভৃত্যের মতন ছিল না। ব্যক্তিগত ভাবে বেকার-এর সঙ্গে এবং তার অকাল মৃত্যুর পর আয়ারল্যাণ্ডে বেকারের পরিবারবর্গের সঙ্গে দীন মহম্মদের আজীবন সম্পর্ক যতদূর জানা যায় সম্প্রীতিপূর্ণই ছিল।

নজির আছে যে বেকার সাহেব ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করে স্নেহধন্য পার্শ্বচরটির প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছিলেন। নিজে কমিশন পাওয়ার পর পরই সৈন্যদলের অন্যদের সঙ্গত দাবী অগ্রাহ্য করে বেকার দীন মহম্মদকে 'বাজার সরকার' নিযুক্ত করেন। আরও পরে নিজে ক্যাপ্টেন পদ লাভ করার সঙ্গে সঙ্গেই পেয়ারের লোকটিকে 'সুবেদার' পদের অভিসিক্ত করেন।

হেস্টিংস বেকারের বিরুদ্ধে শোষণ ও অত্যাচারের অভিযোগ এনে তাকে সৈন্যদল থেকে বরখাস্ত করে ছিলেন। ভাগ্যের পরিহাসে এই একই অভিযোগের দায়ে শেষ পর্যন্ত হেস্টিংস নিজেই অভিযুক্ত হন। সে মামলা গড়ায় তাঁর ইম্পিচমেন্ট পর্যন্ত বেকার কিন্তু

বিচারে নির্দোষ বলে বেকসুর খালাস পেয়ে ছিলেন। তারপর তিনি আর সৈনিক জীবনে ফিরে যাননি। ১৭৮৪ সালে বেকার দেশে ফিরে যাবার জন্য যাত্রা করেন। সেই সময়ে দীন মহম্মদও ফৌজের চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে বেকারের অনুগামী হন। পনের বছর ধরে তিনি বেকারের শেতাঙ্গ বাহিনীর সঙ্গে বদ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর বিচরণের পরিধি ছিল দিল্লী থেকে ঢাকা পর্যন্ত। দীন মহম্মদের বই সেই বিচিত্র অভিজ্ঞতার বিবরণ।

বেকার সাহেবের আত্মীয় পরিজন কর্ক বন্দরের গন্যমান্য ও সুপ্রতিষ্ঠিত নাগরিক ছিলেন। দীন মহম্মদকে তাঁরা নিজেদের মধ্য সাদরে গ্রহণ করেন। স্বদেশে ফেরার পরে পরেই গডফ্রে বেকার এক সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় বিবাহের কিছুদিনের গডফ্রে মারা যন। প্রধান পৃষ্টপোষককে হারাবার এই সংকটের পর বিদেশ বিভূঁয়ে দীন মহম্মদের সঙ্গে সাহেবদের ঠিক কি রকম সম্পর্ক ছিল জানতে আমাদের স্বাভাবিক কৌতূহল জাগে। সৌভাগ্যবশত ১৭৯৯ সালে আবু তালিব নামে জনৈক ভারতবাসী কর্ক পৌছেছিলেন এবং বেকার গোষ্ঠীভূক্ত দীন মহম্মদের সংগে তাঁর দেখা হয়। ফার্সী ভাষায় লেখা স্মৃতিচারণায় আবু আলিব এই সাক্ষাৎকারর একটি বিবরণ রেখে গেছেন। আবু তালিব লেখেন, দীন মহম্মদকে গডফ্রে বেকার বালক বয়স থেকে লাল পালন করেছিলেন এবং দেশে ফিরে তাঁকে 'মকতব' বা ইস্কুলে পাঠান। কয়েক বছর সেখানে পড়াশোনা করার পর দীন মহম্মদ জীন ড্যালি বলে জনৈক উচ্চবংশীয়া সহপাঠিনীর সঙ্গে নিরুদ্দেশ হন। পরে অবশ্য তাঁরা কর্কে ফিরে এসে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। অবু তালিব আরও বলেছেন দীন মহম্মদ ইংরিজি ভাষা খুব ভালভাবে আয়ত্ব করেছিলেন এবং সেই ভাষায় নিজের সৈনিক জীবন ভারতবাসীদের জীবনধারা ও আচার অনুষ্ঠান একটি 'কিতাব' লেখেন। দীন মহম্মদ ও জীন ড্যালির করেকটি ফুটফুটে ছেলে-মেয়ের প্রশংসা করতেও আবু ভোলেননি। আবু তালিবের সঙ্গে সাক্ষাতকালে দীন মহম্মদ স্বগৃহে স্বাধীন ভাবে বাস করতেন।

কর্ক পৌছবার বছর দশেক পর অর্থাৎ ১৭৯৪ সালে দীন মহম্মদ তাঁর বইটি প্রকাশ করেন। বই লিখে ছাপানো তখনকার দিনে আজকের মত এমন কোটি কোটি টাকার আগাম ব্যবসা ছিল না। ব্যাপারে নিশ্চয় লোকসান হত। কর্কের অভিজাত সমাজে দীন মহম্মদ যেরকম ভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তার থেকে তাঁর লোকের সঙ্গে মেশার অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। মধ্য বয়সে কর্ক তাঁর আয়ারল্যাণ্ড-এর বাস তুলে দিয়ে দীন মহম্মদ কেন যে সহসা সপরিবারে লণ্ডন চলে যান পরিস্কার ভাবে বোঝা যায়না। তবে সেই বালক বয়স থেকেই আমরা তাঁর সাহসিকতা ও ঝুঁকি নেবার প্রবণতা লক্ষ্য করেছি। যাকে ইরিজিতে বলে spirit of adventure and entrepreneurship তাঁর স্বভাবে প্রচুর পরিমাণে ছিল।

লণ্ডনে তখন কোকর‍্যান নামে এক প্রত্যুৎপন্নমতি ইংরেজ হাল ফ্যাশনের স্নানাগারের ব্যবসা বা Bath House ও Turkish Bath-কে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। দীন মহম্মদ তাঁর উদ্যোগে সামিল হন। কিছুদিন যেতে না যেতেই অবশ্য চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে নিজস্ব একটি অভিনব ব্যবসা ফেঁদে বসেন। তিনি খুলে বসলেন লণ্ডন শহরের প্রথম ভারতীয় রেস্তরাঁ। সে এক এলাহী বন্দোবস্ত। সেখানে নবাবী কাদায় মোগলাই খানাপিনায় উপভোগ করতে আসতেন অভিজাত ইংরেজরা। আজ সারা পৃথিবীর শহরে শহরে

ভারতীয় রেস্তোরাঁর ছড়াছড়ি। ethnic eating একটি জগৎজোড়া ফ্যাড। ভাবতে অবাক লাগে প্রায় দু'শ বছর আগে এই ব্যাপারেও দীন মহম্মদ প্রথম পথিকৃৎ। দুঃখের বিষয় অল্প কাল পরেই তাঁর মূলধনের টান পড়ে। বিদেশ বিভূঁয়ে একজন বহিরাগত কালা আদমিকে অর্থ সাহায্য করতে কেউ এগিয়ে আসেনি। দীন মহম্মদকে তাঁর ব্যবসা গুটিয়ে নিতে হয়।

প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়সে দীন মহম্মদ আবার ঠাঁই বদল করে চলে যান নতুন জীবনের সন্ধানে সমুদ্রতীরবর্তী ফ্যাশনেবল ব্রাইটন শহরে। সেখানে গিয়ে পত্তন করে Mahomed's Bathhouse নামে নিজস্ব স্নানাগার ব্যবসা। আধুনিক ব্যবসাদারদের মত বিজ্ঞাপনের ব্যাপারে দীন মহম্মদের অসাধারণ দক্ষতা লক্ষ্য করা যায়। খবর কাগজের মাধ্যমে নিজের স্নানাগারটিকে তিনি জনসমক্ষে তুলে ধরেছিলেন একেবারে আদি এবং অকৃত্রিম জিনিস বা the real thing বলে।

এবার সফল ব্যবসায়ী শেখ দীন মহম্মদ নিজের নামের সঙ্গে আর একটি খেতাব জুড়ে দেন। 'Shampoo Surgeon' তিনি আমাদের য়ুনানী কবিরাজ চিকিৎসা পদ্ধতির মালিশ, তেল, জড়ি-বুটি ও বনৌষধীর সাহায্যে বাত হাঁপানি ও চর্মরোগ ইত্যাদির নিরাময় করে একজন Medical practioner ও ধন্বন্তরী হিসেবে তাঁর জীবনে খ্যাতির সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে যান। ইংলন্ডের তৃতীয় জর্জ দীন মহম্মদের স্নানাগারের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বলা বাহুল্য সেই খাতিরে তখনকার ধনী ও অভিজাত সমাজ ভীড় করে সেখানে উপস্থিত হত। Mahomed's Bathhouse-এ খ্যাতি ইউরোপেও ছড়িয়ে পড়ে। ব্রাইটন শহরের ইতিবৃত্তিগুলিতে তাঁর জন্য একটি বিশিষ্ট স্থান নির্ধারিত আছে। আজকাল 'হার্বাল' বা ভেষজভিত্তিক প্রসাধন ও চিকিৎসার যে 'ক্রেজ' বা ধুয়ো উঠেছে তারও বাজারিকরণের একজন পথিকৃৎ হিসেবে দীন মহম্মদকে চিহ্নিত করা যায়।

তৃতীয় জর্জের পর রাণী ভিক্টোরিয়ার আমলে দীন মহম্মদ সাম্রাজ্ঞীর অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হন। খ্যাতির শিখরে পৌঁছে গেলেও তিনি তেমন অর্থ কৌলিন্য অর্জন করতে সমর্থ হননি। যে বাড়িটি তিনি ব্যবসা পত্তন করেছিলেন সেটি তাঁর নিজের ছিল না। দৈন্য ও অবহেলার মধ্যে শেষ জীবন অতিবাহিত করে বিরানব্বই বছরে দীন মহম্মদ মারা যান ১৮৫১ সালে।

ব্রাইটন শহরের ইতিবৃত্তিগুলিতে দীন মহম্মদের সবচাইতে বড় পরিচয় হচ্ছে সম্রাটের মালিশওলা হিসেবে। ব্যাপারটিকে ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গীর একদেশদর্শিকতা বা বিকার বলা যেতে পারে। সৌভাগ্যের বিষয় এই সাহসী, প্রত্যুৎপন্নমতি অসাধারণ ব্যক্তিত্বটির পূর্ণাঙ্গ পরিচয় ডঃ মাইকেল ফিশার তাঁর গবেষনার দ্বারা পুনরুদ্ধার করে আমাদের কাছে দীন মহম্মদের সবচাইতে তাৎপর্যপূর্ণ অবদানটি যথাযথ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। দীন মহম্মদ দু'শ বছর আগে ভারতীয় সাহিত্যের একটি নতুন ধারার যুগপত্তন করেছিলেন। তাঁর সেই প্রথম পদক্ষেপ আজ সাফল্যের সুউচ্চ শিখরে প্রতিষ্ঠিত।

যে কোনও বিষয়ের প্রথম নিদর্শনটির সম্বন্ধে মানুষের অদম্য কৌতূহল থাকে। উপমন্যু চ্যাটার্জি, অমিতাভ ঘোষ, অরুন্ধতী রায়, রোহিন্টন মিস্ত্রী, শশী থারুর প্রমুখদের প্রথম বইয়ের সঙ্গে দুই শতাব্দি আগের লেখকের এই প্রথম বইটি পাশাপাশি রেখে দেখতে ইচ্ছে করে। দীন মহম্মদের সঙ্গে বর্তমান প্রজন্মের যেমন কতকগুলি আশ্চর্য মিল আছে

তেমনি অমিলের অভাব নেই। প্রধান মিল হল বিষয়বস্তু নির্বাচনে। দু'শ বছরের ব্যবধান সত্ত্বেও সকলেই লিখেছেন তাঁদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সমকালীন ভারতবর্ষ বিষয়ে। তফাৎ হচ্ছে যে দীন মহম্মদ কলম ধরেছিলেন তাঁর পৃষ্ঠপোষকদের স্বীকৃতি পাবার জন্য সাহেবদের মুখ চেয়ে। সেই উদ্দেশ্য তিনি অষ্টাদশ শতকের travelogue গোত্রিয় লেখার প্রচলিত ভাষা ও শৈলী অভিনিবেশ সহকারে আয়ত্ত করেছিলেন অন্যের বই থেকে অল্প সল্প মাল মশলা নিজের বইয়ের মধ্যে বেমালুম চালান করতে দ্বিধা করেন নি। কিন্তু তৎসত্ত্বেও বলার কথাগুলি সর্বত্র একান্ত ভাবেই তাঁর নিজস্ব।

দেশের মধ্যই একালের লেখকদের ইংরিজি বইয়ের একটি বড় সড় বাজার আছে। তার ওপর সারা বিশ্বের বইয়ের বাজার তাদের কাছে খোলা। তবু একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায় দীন মহম্মদের মত একান্ত নির্ভরশীল না হলেও তাঁরা পশ্চিমা পাঠক সমালোচকদের জন্য একটি কান ও একটি চোখ খুবই সজাগ রাখেন। ভাষা প্রয়োগের বিষয়ে কিন্তু দীন মহম্মদের সঙ্গে আজকের লেখকদের দুস্তর ব্যবধান। ইংরিজি ভাষাকে এক শ্রেণীর ভারতবাসী এতদূর আত্মসাৎকরে নিয়েছিলেন যে বিশ্বসাহিত্যের হালফ্যাশনের রীতিগুলি অনুধাবণ করলেও ভাষার বিষয় তাঁরা ইন্ডিয়ান-ইংলিশ যথেচ্ছ ব্যবহার করতে পিছপা হন না। ভারতীয় জীবন ও চিন্তাকে দেশী ইংরিজিতে রূপায়িত করার স্বাধিকার তাঁরা অর্জন করতে পেরেছেন।

সাহিত্য বিষয়ে কৌতূহল ছাড়াও দীন মহম্মদের বইয়েব কিছু বিশিষ্ট ঐতিহাসিক মূল্য আছে। যে যুগেব ইতিহাস পুনর্নির্মাণ করার জন্য আমাদের প্রায় পুরোপুরি ভাবে সাম্রাজ্য বিজেতাদের সাক্ষ্য প্রমাণের ওপর নির্ভর করতে হয়। ছবিটা একপেশে হয়ে যায়। দীন মহম্মদের বইটি তার একটি ব্যতিক্রম। আমরা তাঁর Travels of Dean Mohamed-এর মধ্যে বিজিত জাতির একজন প্রতিভূর বিরল কন্ঠস্বর শোনবার সুযোগ পাই।

একটি উদাহরণ তুলে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীব বৈপরিত্য বোঝবার চেষ্টা করা যাক। সেই সময়ে এক শ্রেণীর পাশ্চাত্য শিল্পী দেশ বিদেশ ভ্রমণ করে ছবি এঁকে বেড়াতেন। তারপর স্বদেশে গ্রাফিক টেকনিকে সেগুলি ছাপিয়ে ধনবান ক্রেতাদের জন্য স্বল্প সংখ্যক এ্যালবাম তৈরী করতেন। ক্যামেরা আবিস্কৃত হবার আগে এই ছবিগুলিই আজকের দিনের ফোটোগ্রফির স্থান অধিকার করে ছিল। ভারতবর্ষ যে সমস্ত শিল্পি এসেছিলেন তার মধ্যে সম্ভবত উইলিয়াম হজেস শ্রেষ্ঠ ছিলেন। রাজা চৈত সিং-এর বিরুদ্ধে ওয়ারেন হেস্টিংস যে কারোয়াহি চালিয়েছিলেন তাতে ঘটনাক্রমে দীন মহম্মদ ও উইলিয়াম হজেস দুজনেই জড়িয়ে পড়েছিলেন। হজেস দেশে ফিরে ছবির এ্যালবাম ছাড়াও Travels in India নামে ১৭৯৯ সালে একটি ভ্রমন কাহিনী বার করেন। দেশ ও কালের পরিধীতে হজেস-এর বই এবং দীন মহম্মদের নামে ১৭৯৪ সালে প্রকাশিত বৃত্তান্ত খানিকটা সমান্তরাল। দুজনেই গঙ্গা বক্ষে Janghira নামক দ্বীপে অবস্থিত এক সাধুর আশ্রমের বর্ণনা রেখে গেছেন। বিবরণ দুটি তুলনা করলে বিজিত ও বিজেতাদের দৃষ্টিভঙ্গীর বিষয়ে যা উল্লেখ করেছিলাম তা বেশ স্পষ্ট ধরা পড়ে। হজেস সাহেবের নজর কেড়েছিল আস্তানাটির মনোরম সুউচ্চ অবস্থান। জায়গাটি কিরকম ঠান্ডা ও সেখান থেকে কত দূরদূরান্তের দৃশ্য চোখে পড়ে ইত্যাদি। মুসলমান দীন মহম্মদ কিন্তু আশ্রমের হিন্দু সাধুটির সৌজন্য, তার অনাড়ম্বর পবিত্র জীবনধারার সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দেবার ব্যাপারেই বেশী মনোযোগী। কৌতূহলী

পাঠক Janghira আশ্রমটির ছবি টমাস ও উইলিয়ম ড্যানিয়েলদের এ্যালবাম Antiquities of India-তে দেখে নিতে পারেন।

হব্বেস সাহেবের কাহিনীর উচ্ছ্বসিত সমালোচনা তাবৎ নামি দামী পত্রপত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। ড্যানিয়েলরা প্রচুর প্রসংশা কুড়িয়েছিলেন। দীন মহম্মদের বই যে লণ্ডন শহরে একেবারে সমসাময়িক অপরিচিত ছিল না এমন নয়। কিন্তু সমালোচকরা তাঁকে উপেক্ষা করেছেন।

জয়ন্ত ঘোষ

The Travels of Dean Mahomet/ A native of Patna in Bangal

বাঙালী মুসলমান, আধুনিকতার সন্ধানে

আধুনিকতার সন্ধানে বাঙালী মুসলমান, কোন আলোচনায় বিষয় গৌরবেই বিদগ্ধজনের দৃষ্টি আর্কষণ করার পক্ষে যথেষ্ট। তার কালপর্ব যদি ১৯২১-৪৭ হয়, তাহলে বিষয়টি এক স্বতন্ত্র মাত্রা পায়। কিন্তু তথ্য-সমাবেশ ঘটিয়ে কালানুক্রমিক আলোচনা রীতি এখন যথেষ্ট পুরানো হয়ে গেছে। দরকার এখন মুসলিম মানসের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার বিশেষতঃ মিথস্ক্রিয়ার বিশ্লেষণ। সে কাজ গতানুগতিক ইতিহাস চর্চায় সম্ভব নয়। তার জন্যে দরকার সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণের নিপুণ প্রয়োগ। সৌমিত্র সিংহের আলোচ্য গ্রন্থটি সেই দিকে একটা উল্লেখযোগ্য অবদান বলেই চিহ্নিত হবে।

সৌমিত্র ভূমিকাতেই আধুনিকতার একটা সংজ্ঞা দিয়েছেন, যেখানে তার নির্যাস হিসেবে সেকুলার ভাবনা, যুক্তিবাদ ও মানবতাবাদকে মাপকাঠি রূপে ধরা হয়েছে। তার বিপরীতে রয়েছে একান্ত ঐতিহ্যমুখিনতা, রক্ষণশীলতা ও সাম্প্রদায়িক চেতনা। আধুনিকতার উপাদানগুলি মানুষকে মুক্তবুদ্ধি করে, জগৎ, জীবন, সমাজ-সংস্কৃতি, জনগোষ্ঠী, নানা মত ও পথ দেখতে শেখায়। তার বিচার, মূল্যবোধ স্বতন্ত্র। এর যা কিছু বিপরীত তা কেবল অনাধুনিক নয়, তা ঘরের মধ্যে ঘর তোলে, ভেদবুদ্ধির প্রশ্রয় দেয়, নিজের চেতনার মান অনুসারে একটা ছোট সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে কার্যত বৃত্তাবদ্ধ ভাবনায় মনকে আচ্ছন্ন করে। জাতীয় বিশেষত বাঙালী জীবনের যে সন্ধিক্ষণ এই আলোচনার মধ্যে পড়ে তার মধ্যে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক, বিশেষত সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রশ্ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সম্প্রীতির ধারণা কি একটা মিথ, যা উদ্দেশ্যপূর্ণ ভাবে এক শ্রেণীর মানুষ, মূলত হিন্দুনেতারা তুলে ধরেছিল, তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতালাভের পথ প্রশস্ত করতে।

সৌমিত্র সিংহ এই সব দিক ও আরো নানা দিকের আলোচনা করেছেন সবিস্তারে, যেখানে প্রয়োজনীয় নানা তথ্যের বিচার করা হয়েছে পূর্বসূরী গবেষকদের, সেই সময়কার ঘটনাবলীর কুশীলবদের নানা রচনা, মতামত কিম্বা বক্তৃতা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে। সেই দিক থেকে এই গ্রন্থ নতুন গবেষকদের অনেকের কাছেই কিছুটা আকরগ্রন্থ হিসেবে সাহায্য করবে।

একথা সুবিদিত ভারতে হিন্দুরা, এই প্রদেশে বাঙালী হিন্দুরা, বিশেষত হিন্দু সমাজের উচ্চবর্ণ ইংরাজ শাসনের সংস্পর্শে এসে যতোটা আগে এবং যতোটা দ্রুতগতিতে নিজেকে রূপান্তরিত করতে পেরেছিল, বাঙালী মুসলমানের জীবনে সেইটুকু করতেই প্রায় একশ' বছর কেটে যায়। এখানে বাঙালী মুসলমান বলতে মূলত বলা হচ্ছে আত্রফদের কথা, আশরফদের কথা নয়। কারণ মুসলমান আশরফরা হিন্দু উচ্চবর্ণের তুলনায় কিছুটা পিছিয়ে থাকলেও উনিশ শতক শেষ হওয়ার আগেই তাদের একাংশ ধনে, মনে, শিক্ষায়, প্রভাব প্রতিপত্তিতে প্রাগ্রসর হিন্দুদের প্রায় সমকক্ষ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সেই সমাজে যারা আত্রফ অর্থাৎ হিন্দু সমাজের নিম্নবর্ণের থেকে আসা ধর্মান্তরিত মুসলমান, তারা নিম্নবর্ণের হিন্দুদের মতোই ছিল নিতান্ত পিছিয়ে পড়া। এই নিম্নবর্গের মুসলমান, যারা বাংলার সংখ্যা গরিষ্ঠ মুসলমান সমাজের মধ্যে গরিষ্ঠতম অংশ, তাদের মধ্যে আধুনিকতার চেতনার বিস্তার ঘটেছিল কিনা, অথবা কেন ঘটেনি সৌমিত্র তাঁর আলোচনায় সেই দিকেই পাঠকের দৃষ্টি আর্কষণ করেছেন।

মানুষ নিজের ব্যক্তিসত্তা সচেতন না হয়ে উঠলে আধুনিক, মুক্তবুদ্ধি যুক্তিবাদী হয় না, সেটা আজ আর কোন তর্ক সাপেক্ষ বিষয় নয়। অনগ্রসর সমাজে মানুষ ব্যক্তি হয়ে ওঠে না বলেই সেখানে যূথবদ্ধ, সাম্প্রদায়িক, গোষ্ঠী চেতনার বাড়বাড়ন্ত হয়ে থাকে। ব্যক্তি হয়ে ওঠার অবশ্য একটা বিপদের দিক আছে, যার লক্ষণ ভোগবাদী হয়ে ওঠা। পশ্চিমের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসে এদেশে সমাজ জীবনের বহিরঙ্গে এবং উচ্চকোটির মানুষদের জীবনচর্যায় তার যে অভিঘাত ঘটেছে, সমাজের নীচুতলায় সেই অভিঘাতের চুঁইয়ে ঢোকা প্রতিক্রিয়া সদর্থকের তুলনায় নঙর্থক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে বেশী। যেমন গণতন্ত্র, ভোটাধিকার রাজনৈতিক ক্ষমতা ব্যবহারের যে সক্ষমতা দেয় গোষ্ঠী কিম্বা সাম্প্রদায়িক জীবন চেতনায় অভ্যস্ত মানুষ তাকে সমাজের সামগ্রিক কল্যাণে ব্যবহার না করে, সাম্প্রদায়িক স্বার্থেই কাজে লাগাতে চায়। বাঙালী সমাজে হিন্দু মুসলমানের দ্বন্দ্ব রাজনৈতিক ক্ষমতা ব্যবহারের সুযোগ ও সম্ভবনাকে কেন্দ্র করেই তীব্র হয়ে উঠেছিল প্রাব স্বাধীনতা পর্বে। তখন মুসলমানরা নিজেদের অর্থনৈতিক দুর্গতি, শোষণ, সামাজিক পশ্চাদ্‌পদতা, এবং রাজনৈতিক অসমতার কারণ খুঁজতে হিন্দুদেরই একমাত্র দায়ী করে। উপনিবেশিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সমগ্র পরাধীন জাতির সংগ্রাম লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক বিরোধে পরিণত হয়। যা হতে পারতো জাতধর্ম নির্বিশেষে সব শোষিতের মুক্তি সংগ্রাম, তাই হয়ে পড়ে খণ্ডিত, সুপ্রতিষ্ঠিত হিন্দু সমাজের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠাকামী মুসলমান সমাজের সাম্প্রদায়িক সংগ্রাম।

মুসলমান সমাজে আধুনিকতার চেতনা দানা বাঁধতে পারলে এমনটি ঘটতে পারতো না। সৌমিত্র সেটাই তাঁর আলোচনায় দেখাতে চেয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে এটাও তথ্যের সমাহারে দেখাতে চেয়েছেন মুসলমান সমাজ বাংলার বিশ শতকের গোড়া থেকে কোন একশিলা ধারণায় আলোড়িত হয় নি। সেখানেও প্রতিবাদী, প্রতিরোধী চেতনার বিচ্ছুরণ ঘটেছিল, কিন্তু পরিস্থিতি ও পরিবেশের প্রতিকূলতায় সেটা দুর্বল হতে হতে শেষ পর্যন্ত কিছু ব্যক্তি বিশেষের উদ্যোগের মধ্যে সীমিত হয়ে পড়ে। গণজীবনকে প্রভাবিত করার শক্তি তখন তার নিঃশেষিত।

প্রাক্-স্বাধীনতাপর্বে বাঙালি মুসলমান সমাজ যে হিন্দুদের তুলনায় অনগ্রসর ছিল, তার উল্লেখ করেও সৌমিত্র দেখাতে চেষ্টা করেছেন স্বদেশি যুগের হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদী চিন্তাধারার বিপরীতে সমগ্র বাঙালী সমাজের জাগরণের প্রশ্নটিকে নিজেদের সীমিত সাধ্যে তুলে ধরার চেষ্টা বাঙালী মুসলমান সমাজের একটা ভগ্নাংশ করেছিল নিষ্ঠার সঙ্গে। 'কল্লোল', 'আল-এসলাম', 'সওগাৎ' প্রভৃতি পত্রিকার পাতায় তার প্রভূত দৃষ্টান্ত রয়েছে। বলা বাহুল্য জাতীয়তাবাদের হিন্দুত্ববাদী ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সংগঠিত করা এদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাদের চেষ্টা ছিল এই হিন্দুত্ববাদী চেতনা পাছে অনগ্রসর মুসলিম চেতনায় গোঁড়ামি, সাম্প্রদায়িকতাবাদের প্রসার ঘটায়, যথাসাধ্য সেই সম্ভাবনা রুখে দিতে।

'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমাজ' এবং 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা' এই দুয়ের বিস্তারিত আলোচনা করে সৌমিত্র দেখাতে চেয়েছেন, এই প্রদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ আগে বাঙালী, পরে মুসলমান এই চেতনাটুকু গড়তে পারলেই বাঙালি সমাজ ও সংস্কৃতির মিলিত সাধনার ধারাকে জোরালো করা যাবে। বিশের দশকে প্রতিষ্ঠিত 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ ঢাকা' এবং তার মুখপত্র 'শিখা'র বিস্তৃতভাবে আলোচনা করে সৌমিত্র দেখাতে চেয়েছেন বাঙালী চেতনাকে একটা শক্তভূমির উপর স্থাপন করতে শিক্ষিত বাঙালী মুসলমানের একাংশ বিশেষভাবে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। বিশের দশকে ঢাকায় 'মুক্তবুদ্ধির আন্দোলন' তারই পথিকৃৎ। 'জ্ঞানের রাজ্যে অসহযোগ মৃত্যু' রবীন্দ্রনাথের এই বাণীকে সামনে রেখে এর প্রবক্তাদের উদ্যোগ গোড়ার দিকে ব্যাপক সাড়া জাগালেও তিরিশের দশকে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের সুযোগে সাম্প্রদায়িক শক্তি সমস্ত শক্তি নিয়ে তার বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তখন বাঙালি মুসলমান, বাঙালী হিন্দুদের দ্বিজাতি তত্ত্বের চশমার মধ্যে দিয়ে দেখতে শুরু করে, যার পরিণতি দেশভাগ।

আসলে উনিশ শতকে বাঙালি হিন্দুদের 'বাবু কালচারের' জবাবে বাঙালি মুসলমানের 'মিয়া কালচার' বেশ যুতসই বিকল্প মনে হয়। বাঙালি হিন্দুরা যে ভুল করেছিল, বাঙালি মুসলমান সমাজ তার থেকে শিক্ষা গ্রহণ না করে তাকেই সত্য বলে গ্রহণ করে। সৌমিত্র বাঙালি সংস্কৃতির যে সব লক্ষণগুলি প্রসঙ্গত আলোচনার বৃত্তে টেনে এনেছেন, তাদের অনেকগুলি এখনও বিশেষত দুই বাংলার বিকাশমান সাংস্কৃতিক সম্পর্কের প্রেক্ষিতে বিচার বিবেচনার দাবি রাখে। সেখানেই এই গ্রন্থের সার্থকতা। তবে একটা কথা বোধহয় বলা দরকার থিসিসে যতো উদ্ধৃতি দিয়ে একটা বক্তব্যের যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হয়, কোন গ্রন্থে সেগুলি বহুলাংশে বর্জনীয়। এইগ্রন্থের পরবর্তী সংস্করণে আশা করা যায় সৌমিত্র সেই দিকে দৃষ্টি দেবেন।

বাসব সরকার

দি কোয়েস্ট ফর মডার্নিটি অ্যান্ড দি বেঙ্গলি মুসলিম্‌স : ১৯২১-৪৭; সৌমিত্র সিংহ, মিনার্ভা অ্যাসোসিয়েট্‌স; দাম ২০০ টাকা।

বাংলার নমঃশূদ্র সম্প্রদায়

বাঙালি জনগোষ্ঠীর একটা সুবৃহৎ অংশ নমঃশূদ্র সম্প্রদায়। বিভাগ-পূর্ব এবং বিভাগ-উত্তর, দুই পর্বের বাংলার জনজীবন সম্পর্কে কথাটি প্রযোজ্য। তারা জীবনচর্যার বিচারে হিন্দু, যদিও বর্ণহিন্দু সম্প্রদায় উনিশ শতকের প্রায় শেষ পর্যন্ত সাধারণভাবে এই সম্প্রদায়ের বড়ো একটা অংশকে 'চণ্ডাল' আখ্যা দিয়ে কার্যত সমাজের অন্ত্যেবাসীর পর্যায়ে ঠেলে দিয়েছিল। সেই চণ্ডাল পরিচয় দূর করতে বর্ণ হিন্দুরা অগ্রসর হয়নি। সেকাজ করতে হয়েছে নমঃশূদ্রদের। তার সঙ্গেই যুক্ত হয়ে রয়েছে বাংলার ইতিহাসের এক মর্মান্তিক বাস্তবতা।

স্বদেশি আন্দোলন অর্থাৎ বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন নিয়ে একালের গবেষণায় যতোই নানা অনালোকিত দিকে মানুষের নজর পড়ছে, ততোই দেখা যাচ্ছে পূর্ববঙ্গের বাঙালি মুসলমানদের গরিষ্ঠ অংশ কেবল নয়, বাঙালি হিন্দুদের নিম্নবর্গ অর্থাৎ নমঃশূদ্ররাও তাতে সোচ্চারে সাড়া দেয়নি। বরং দেশভাগ হয়ে স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠিত হওয়ার পর তারা তাদের সংখ্যাগত প্রাধান্য কাজে লাগিয়ে সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা এবং সরকারি চাকরি পাওয়ার পথ সুগম করতে উদ্যোগী হয়েছিল। মূলত তাদেরই আবেদনক্রমে উপনিবেশিক শাসকরা ১৯১১ সালের সুমারিতে সমাজের এই নিম্নবর্গকে চিহ্নিত করার সময় 'চণ্ডাল' নামটি বাদ দিয়ে 'নমঃশুদ্র' নামটি চালু করে। বলা বাহুল্য নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের মানুষদের স্বদেশি নেতাদের প্রভাবমুক্ত করে বঙ্গভঙ্গ ব্যবস্থা বহাল রাখার এটা ছিল একটা বিশেষ কৌশল। সেই কৌশল বর্ণ হিন্দু সম্প্রদায় অর্থাৎ পূর্ববঙ্গের হিন্দু জমিদার জোতদার, শিক্ষিত সম্প্রদায় যে সাধারণ হিন্দুদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে না, সেটা বোঝাতে একটা মোক্ষম অস্ত্র ছিল।

দেশভাগের আগে কিম্বা পরে যদি মধ্য বাংলায় বসবাসকারী বাঙালী জনগোষ্ঠীকে নিয়ে একটা বৃত্ত আঁকা যায়, তাহলে এই সমগ্র অঞ্চলকে নমঃশূদ্র প্রধান অঞ্চল বলতেই হবে। বাঙালি জনগোষ্ঠীর মধ্যে দু'কোটির বেশি মানুষ নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের। বর্তমান বাংলাদেশে এই নমঃশূদ্রদের বেশির ভাগ এখনও বাস করে, যাদের পাওয়া যাবে যশোর, খুলনা, বরিশাল, ফরিদপুর, ঢাকা, ময়মনসিং ও পাবনা কুমিল্লা জেলায়। আর পশ্চিম বাংলায় মেদিনীপুর, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা, নদিয়া, হাওড়া হুগলি জেলায় নমঃশূদ্রদের বিপুল বসতি আছে। পেশাগত ভাবে তাদের বেশির ভাগই কৃষিজীবী, মুলতঃ পাট ও ধানের চাষ করে, সূত্রধরের কাজ করে, নৌকানির্মাণ করে, বাদ্যযন্ত্র প্রস্তুত করে, নয়তো ফড়ে হিসেবে কাঁচামালের যোগান দেয়। এই সম্প্রদায়ে চাকরিজীবীর সংখ্যা আগে নগণ্য ছিল, এখন কিছু বাড়ছে। উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত নমঃশূদ্রদের বেশির ভাগই ছিল নিরক্ষর। তবে চাঁদসী চিকিৎসা ব্যবস্থা চালু করে এই সম্প্রদায়ের মধ্যে ছোট হলেও একটা বুদ্ধিজীবী অংশের উদ্ভব ঘটে।

বঙ্গদেশে নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটেছে বল্লালী বালাই থেকে। তখন থেকেই তাদের সামাজিক অবনয়নের সূচনা। যদিও সামরিক প্রতিভার জন্যে বাংলার রাজন্যবর্গের কাছে তাদের বিশেষ কদর। মুলতঃ ঢালী সৈন্যদের সংগ্রহ করা হতো এই সম্প্রদায় থেকে।

বারোভূঁইএঁদের অন্যতম যশোররাজ প্রতাপাদিত্যের 'বাহান্ন হাজার ঢালী' বাহিনীর কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, যাদের বীরত্বে মোগল সেনাপতি মানসিংহকেও একাধিক বার পিছু হটতে হয়েছিল। জমিদারদের প্রাধান্যের যুগে পাইক, লাঠিয়াল বরকন্দাজ প্রভৃতিদের এই সম্প্রদায় থেকেই নিযুক্ত করা হতো।

বাঙালি হিন্দুর বারো মাসে তেরো পার্বণের ধারা নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের কৃষিজীবী অংশ গভীর নিষ্ঠায় বজায় রেখেছে। তবে নমঃশূদ্রদের বেশির ভাগ মানুষ 'মতুয়া ধর্ম' অনুসরণ করে, যার প্রবর্তক ছিলেন হরিচাঁদ এবং তাঁর সুযোগ্যপুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুর। এরই পাশাপাশি শ্রীচৈতন্যের ভক্ত হিসেবে এই গোষ্ঠীতে বৈষ্ণবদের আচরণীয় বহু ধর্মানুষ্ঠান হতে দেখা যায়। এই সম্প্রদায়ের বেশ কিছু মানুষ মানব সেবা, স্ব-সম্প্রদায়ের উন্নয়ন, সমাজ কল্যাণের নানা কর্মসূচিতে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। বস্তুতঃ মতুয়া ধর্ম ছিল কৃষিজীবী এক বিরাট জনগোষ্ঠীর নৈতিকতা বোধ জাগিয়ে তুলে পরহিতে গার্হস্থ্য ধর্ম পালনের আদর্শে উদ্বুদ্ধ। তন্ত্র, মন্ত্র চেয়ে ঈশ্বরের নামগান, সংকীর্তনের মধ্য দিয়ে মানুষ সাধনার পথে অগ্রসর হতে পারে। নিরক্ষর কোন জনগোষ্ঠীর কাছে একথার আবেদন ব্রাহ্মণ্য প্রভাব কাটিয়ে তোলার ক্ষেত্রে বিশেষ উপযোগী। মতুয়া ধর্মের জনপ্রিয়তা ও সার্থকতার এটা একটা বিশেষ কারণ।

বাঙালি জীবনে বিকাশের বহুমুখিতায় আচার্য ক্ষিতিমোহন, বিনয় সরকার, দীনেশচন্দ্র, সুনীতি কুমার থেকে নীহার রঞ্জন পর্যন্ত বহু বিদগ্ধজন নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের অবদানের সপ্রসংশ উল্লেখ ও আলোচনা করেছেন। লোক সংস্কৃতি, লোকশিল্প প্রভৃতি পল্লীবাংলার নিজস্ব ঘটনায় তাদের অবদান মানুষের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। সাহিত্যের বিশিষ্ট অঙ্গনে বিশেষতঃ বাংলার আধুনিক কবিকুলে বিনয় মজুমদার যে বিশিষ্ট ধারার কবি রূপে খ্যাতিমান, তিনিও এই সম্প্রদায়ের সন্তান।

অধ্যাপক নরেশচন্দ্র দাস 'নমঃশূদ্র সম্প্রদায় ও বাঙ্গালা দেশ' গ্রন্থে এই সম্প্রদায়ের উদ্ভব থেকে শুরু করে, তার পতন-উত্থানের এক তথ্যবহুল চিত্র তুলে ধরেছেন। একটা বিশিষ্ট জনগোষ্ঠীর জীবনচর্যা থেকে জাগরণের নানা স্তর পরম্পরায় তিনি এই সম্প্রদায়ের বহু কীর্তিমান মানুষের কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। বহু তথ্যের সমাবেশ ঘটিয়েছেন তাঁর আলোচনায়, যা এই সম্প্রদায়ের একটা অন্তরঙ্গ চিত্র তুলে ধরতে চেষ্টা করেছে। বাঙালি সমাজের বিভিন্ন অংশের যাপিত জীবনের কথা যদি এই ভাবে তুলে ধরা হয়, তাহলে বাঙালি সমাজের বর্ণাঢ্য রূপটি সব মানুষের চোখে ধরা পড়বে। সামাজিক ইতিহাস রচনায় তার বিশেষ মূল্য আছে।

সবশেষে অবশ্য দু'একটি কথা সমালোচনা হিসেবে বলা দরকার। প্রথমত লেখক স্বয়ং এই সম্প্রদায়ের মানুষ বলে তাঁর আলোচনায় সাব্জেক্টিভ্ চিন্তার প্রাধান্য বেশি। দ্বিতীয়তঃ গোড়া থেকেই সমগ্র গ্রন্থটি পরিকল্পনা অনুযায়ী রচনা করা হলে পাঠকের মনে যে গভীর প্রভাব থাকতো এক্ষেত্রে তার ঘাটতি আছে। তৃতীয়ত গ্রন্থটির প্রায় আগাগোড়া পরিমার্জনা দরকার, পুনরুক্তি এড়াতে এবং রচনা শৈলীর উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করতে। তবু স্বীকার্য বাঙালি জনগোষ্ঠীর একটা বিশিষ্ট অংশের ইতিহাস লেখক যেভাবে তুলে ধরেছেন, তার মূল্য যথেষ্ট।

বাসব সরকার

নমঃশূদ্র সম্প্রদায় ও বাঙ্গালাদেশ অধ্যাপক নরেশচন্দ্র দাস, দীপালী বুক হাউস, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, দাম : ৭০ টাকা।

মাননীয় সম্পাদক সমীপে

'পরিচয়' পত্রিকার একজন গ্রাহক এবং দীন পাঠক হিসেবে পত্রিকার নভেম্বর ১৯৯৭-জানুয়ারী ১৯৯৮ সংখ্যায় শোভন সোম লিখিত "পঞ্চাশ বছরের শিল্পকলা : শতাব্দী শেষের খতিয়ান" প্রবন্ধটি পড়ে তার বেশ কিছু মন্তব্য সম্পর্কে একমত হতে পারছি না। এক আগে 'অনুষ্টুপ' পত্রিকায় (১৩৯০ পুজো সংখ্যা) তিনি চল্লিশ পৃষ্ঠার যে প্রবন্ধটি লিখেছিলেন তাতেও অনেক বিতর্কিত মন্তব্য ছিল এবং শিল্পী প্রদোষ দাশগুপ্ত তার যা উত্তর দিয়ে গেছেন সেটা প্রদোষ দাশগুপ্ত রচিত 'স্মৃতি শিল্পকথা' বইতে (প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৬) মুদ্রিত আছে। শোভন সোম নিশ্চয়ই তা পড়ে থাকবেন। প্রদোষ দাশগুপ্ত-র উত্তর যে যথাযোগ্য এবং সন্তোষজনক সে ব্যাপারে বর্তমান পত্রলেখকও একমত। তবুও শ্রীসোম বিবেকানন্দ সম্বন্ধে সেই একই মন্তব্য পনেরো বছর পরে আবার 'পরিচয়'-এ করেছেন। মনে হয় তিনি তাঁর মত ও পথ বদলাতে চাইছেন না; যুক্তিনিষ্ঠ তথ্যভিত্তিক বক্তব্যকেও কোনো গুরুত্ব দিতে চাইছেন না। নীচে বন্ধনীমধ্যে-'স্মৃতিকথা শিল্পকথা' থেকে সোম এবং দাশগুপ্তের বক্তব্য তুলে দিলাম।

[অনুষ্টুপ পত্রিকায় শোভন সোম লিখেছিলেন, — "বহুক্ষেত্রেই শাসিত প্রজার বৃহদংশ স্বাধীন চিন্তার ক্ষমতা হারায়, আত্মশক্তি উদ্বোধনের কথা ভাবে না, নিজেকে হীন জ্ঞান করে এবং তার কর্মপ্রবণতা ঐসব কল্পিত আদর্শের সড়ক ধরে চলে। বলা বাহুল্য, একে প্রগতি বলা যায় না। ভয়াবহ ব্যাপার এই যে, রাজনৈতিক পরাধীনতার কাল শেষ হলেও, চেতনা জাগ্রত না হলে মানসিক পরাধীনতা সহজে ঘোচে না। এই শতকের প্রথম বছর যখন য়ুরোপ সফরের অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ লিখেছিলেন, 'ওদের মত চিত্র বা ভাস্কর্য বিদ্যা হতে আমাদের এখনও ঢের দেরি। ও দুটো কার্যে আমরা চিরকাল অপটু।' তখন তাঁর সামনে শাসক বা শাসকশ্রেণীর শিল্পসংস্কৃতিকে শিল্প সংস্কৃতির চূড়ান্ত পরাকাষ্ঠা বলেই মনে হয়েছিল ; এই উক্তিতে নিজের পরম্পরার প্রতি অনাস্থা ও হীনমন্যতাই প্রকাশ পেয়েছিল, যদিও আমরা ভেবে অবাক হই যে, এর আগে পরিব্রাজক হিসাবে ভারত পরিক্রমার সময় কি আমাদের পাঁচ হাজার বছরের শিল্প পরম্পরার দিকে তাঁর দৃষ্টি পড়ে নি?" অকাট্য যুক্তি। কিন্তু বেচারা স্বামী বিবেকানন্দ একবারও ভাবেন নি যে ওঁর এই 'হীন' উক্তি নিয়ে তাঁর মৃত্যুর ৮৩ বছর পর একজন স্বাধীনচেতা বিদ্যোৎসাহী অধ্যাপক এতটা বাড়াবাড়ি করবেন এবং তাঁকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাবেন তাঁর একটা আক্ষেপোক্তির জন্য। আমি বিবেকানন্দের একজন বিশেষ ভক্ত, তাই পাঠকের কাছে মাফ্ চেয়ে এবং শ্রীশোভন সোমের অনুমতি নিয়ে এই সওয়াল জবাব দিচ্ছি—আমরা জানি স্বামী বিবেকানন্দের প্রগাঢ় বিশ্বাস এবং আত্মচেতনা ছিল আমাদের জাতীয় ঐতিহ্যাশ্রিত শিল্পকলা সম্বন্ধে। এই কথা প্রমাণ হবে ডাঃ পঞ্চানন মণ্ডলের লেখা—'শিল্পী নন্দলাল' এই বই থেকে (পৃ.২২৫)। লেখক লিখেছেন—"ভারত শিল্পের ওপর গ্রীক প্রভাব সম্পর্কে য়ুরোপে যখন প্রচার চলছিল, সেই সময়ে তার তীব্র প্রতিবাদ করেন স্বামী বিবেকানন্দ প্যারিসে ধর্মেতিহাস-কংগ্রেস-এ ১৯০০ সালের অক্টোবর মাসে। তিনি ভারতীয় বুদ্ধমূর্তির স্বরূপ বিশ্লেষণ করে ফরাসী অধ্যাপক মঁসিয়ে ফুসের তথাকথিত ইন্দো-গ্রীক শিল্পবাদের সিদ্ধান্তকে বৈজ্ঞানিক

যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করেছিলেন। সমগ্র ভারত পর্যটন করে আর শিল্পতীর্থ সম্পর্কে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা স্বামীজীর ভারত-শিল্পের অপ্রমেয়-উপলব্ধি করার ফলেই এমন অসাধ্য সম্ভবপর হয়েছিল। ভারত-শিল্পের মূল বৈশিষ্ট্য স্বামীজীর আলোচনা ও নির্দেশদান নব্য শিল্প-সমালোচনার ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম যুগ বিপ্লব ঘটিয়েছিল।

তাঁর সতীর্থ শিল্পবন্ধু প্রিয়নাথ সিংহ, প্রিয় শিষ্যা সিষ্টার নিবেদিতা, জাপানী মনীষী ওকাকুরা কাকুজো তাঁর কাছ থেকেই ভারত শিল্পের স্বরূপ উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

'পাশ্চাত্য শিল্পের নকল করে প্রাচ্য শিল্প দাঁড়াতে পারবে না'—একথা স্বামীজী তখনই বলেছিলেন তাঁর নিজস্ব বলার ভঙ্গিতে —'ওদের নকল করে একটা আধটা রবি বর্মা দাঁড়ায়। তাদের চেয়ে দিশি চাল-চিত্রি করা পটো ভাল। তাদের কাজে তবু Centre রঙ আছে। ওসব বর্মা-ফর্মা চিত্রি দেখলে লজ্জায় মাথা কাটা যায়।'

আমাদেরও লজ্জায় মাথা কাটা যায় অধ্যাপক শ্রীশোভন সোমের অশোভন সব লেখা পড়ে স্বামীজীকে হীনচেতা প্রতিপন্ন করার চেষ্টায়। আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ অধ্যাপক মহাশয় যেন অসংযত এবং গর্হিত এইসব উক্তি পরিবেশনের পূর্বে ভাল করে ভেবে-চিন্তে নেন। এইরকম হাস্যকর ও ভ্রান্তিকর সব কথা পরিবেশন করার সমূহ বিপদ আছে। বিশেষ করে আমাদের দেশের সর্বজনবন্দিত স্বামী বিবেকানন্দের মত মহাপুরুষের বিরুদ্ধে। কিন্তু আমাদের অধ্যাপক মহাশয় নাছোড়বান্দা. স্বামীজীকে শেষ পর্যন্ত রেহাই দেন নি। তিনি তাঁর দীর্ঘ প্রবন্ধের উপসংহারে স্বামীজীকে সংহার করেছেন এই বলে,—"এবং এদেশে, বিবেকানন্দেরই অনুসরণে আবার নতুন করে লণ্ডন-পারি-ন্যু ইয়র্কে শিল্পকেই অনুকরণীয় মনে করার প্রবণতা দেখা দেয়। হোয়াইট মেনস সুপ্রিমেসির ভূত আমাদের ঘাড়ে আরও চেপে বসে।" এ বিষয়ে আমার বক্তব্য—শিল্প সমালোচনার কিম্ভূত কিম্মাকার মামদো ভূতও আমাদের ঘাড়ে চেপে বসেছে, কবে রেহাই পাব জানি না!!]

পরিচয়-এর উল্লিখিত সংখ্যার ৬ পৃষ্ঠায় শ্রীসোম লিখেছেন—"একই কারণে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' বইতে স্বামী বিবেকানন্দ লিখেছেন যে, ইয়োরোপের মত চিত্রকলা ও মূর্তিকলা হতে এদেশে ঢের ঢের দেরি।"—প্রবোধ দাশগুপ্ত প্রদত্ত উত্তরের পরে আমি আর ও বিষয়ে কিছু বলছি না।

'পরিচয়'-এর প্রবন্ধে তিনি রামমোহনকেও জড়িয়েছেন। লিখেছেন,—"ইয়োরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে শ্রেষ্ঠতম হিসেবে মেনে নেবার আগে এদেশে শিক্ষিত মানুষেরা এই সত্যের দিকে আদৌ দৃকপাত করেননি। ইংল্যাণ্ড তার রাজত্বকালের সূচনা থেকেই নিজেকে ইউরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতিভূ হিসাবে জাহির করেছে। ভারত যেমন কখনই নিজেকে সম্পূর্ণ এশীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির নির্ব্যূঢ দাবিদার বলতে পারে না, তেমনি ইংল্যাণ্ড—বিশেষ করে দ্বৈপায়ন ইংরেজ নিজেকে ইউরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির দাবিদার বলতে পারে না, এই ঐতিহাসিক হেত্বাভাসের দিকে রামমোহন রায় থেকে কেউই তাকিয়ে দেখেন নি।"

না, ইউরোপীয় সভ্যতা এবং সংস্কৃতিকে রামমোহন এই ভাবাও অধিকার দেন নি যে ইংরেজরাই সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতিভূ। সুশোভন সরকার লিখিত On the Bengal

Renaissance (বর্তমানে পত্রলেখকের মতে প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবেই চিহ্নিত) গ্রন্থে আছে :

"In this Brahmanical Magazine, (1821-23), he displayed his deep love for the best traditions of India, and on behalf of his country protested against 'encroachment upon the rights of her poor, timid and humble inhabitants' by proselytising Christen missionaries who instead of relying on reasonable arguments fell back on ridiculing and on holding out worldly inducements to converts."

"... in 1830 he even gave material support to the young Scottish missionary Duff in his crusade against 'godless education But his rational modern refused to put up with the metaphysical subtleties of missionary preachings and the unfairness in their propaganda. His deep learning and intellect made him one of the pioneers in the modern humanistic trend within even a foreign religious movement, Christianity".

কি আশ্চর্য! কী অসম্ভব হেলায় রামমোহনের এহেন কার্যকলাপ ফুৎকার উড়িয়ে দিয়েছেন শোভন সোম। প্রসঙ্গক্রমে 'পরিচয়'-এর পাঠককুলকে নির্মাল্য বাগচী কৃত "রামমোহন চর্চা, ইতিহাসে বঞ্চনা ও অবহেলা" ('সুবর্ণরেখা' প্রকাশিত) বইখানি পড়ে দেখতে অনুরোধ জানাই।

শ্রীসোম আরও লিখেছেন (৬ পৃ.) "এই ডিকালচারেশনের কারণেই রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের চোখে ওড়িশার সুরসুন্দরীদের মূর্তির চেয়েও রোম্যান নির্মিত কিউপিডের মূর্তি সুন্দর মনে হয়েছিল।"—জিজ্ঞাসা, সবই কি ডিকালচারেশনের কারণে? তাহলে আর রাজেন্দ্রলাল মিত্র 'অ্যান্টিকুইটিস অব ওড়িশা' নিয়ে এত মাথা ঘামালেন কেন?

"It should be mentioned that during the time of Loeke several students were also sent to Bhubaneswar of preparing casts for architectural and sculpture works at Government expense for the book Antinquities of Orissa by Dr Rajendra Lal Mitra" (Country Volume, Govt College of Art of Craft, Calcutta, Page 33)

প্রসঙ্গে আরও এক উদ্ধৃতি দিই—"অন্নদাপ্রসাদের প্রাথমিক খ্যাতি রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বিখ্যাত দুই গ্রন্থ 'অ্যান্টিকুইটিস অব ওড়িশা' ও 'বুদ্ধগয়ার'-র ছবির জন্য।" (বাংলার চিত্রকলা : অশোক ভট্টাচার্য, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি : পৃ. ১১৩) 'বিখ্যাত' কথাটির ওপরে স্বভাবতই বেশী নজর পড়ে।

৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেন—"দেশের পথ বলতে অবনীন্দ্রনাথ গুপ্ত যুগ থেকে কোম্পানি যুগ অবধি শিল্পকলা হয়েছিল তার কোনও একটিকে বোঝেন নি। দেশের পথ বলতে তিনি বুঝেছিলেন নিজের মতে স্বাধীনভাবে চলা।"

অতি-ভক্তির একথা বলা হয়ত ভাবালুতার প্রকাশ। তিনি (অবনীন্দ্রনাথ) একটা নতুন পথ খুঁজেছিলেন ঠিকই, কিন্তু —"ঘটনাচক্রে সেই সময়েই তাঁর হাতে আসে 'আইরিশ ইল্যুমিনেশান' আর 'মুঘল মিনিয়েচার'-এর কিছু নির্দশন। অবনীন্দ্র অনুভব করলেন তাঁর প্রকৃত আত্মপ্রকাশ ঘটতে পারে না এই ক্ষুদ্রায়তন মিনিয়েচার ছবিতে। কী নিয়ে ছবি আঁকবেন—এই যখন তাঁর চিন্তা, তখন তাঁর কাকা রবীন্দ্রনাথ উপদেশ দিলেন বৈষ্ণব

পদাবলীকে অবলম্বন করতে।" (বাংলা চিত্রকলা : অশোক ভট্টাচার্য পৃঃ ১২১) অথবা এ প্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথেরই এক শিষ্য মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত রচিত 'শিল্পে ভারত ও বহির্ভারত'-বইয়ে লিখেছেন—"অবনীন্দ্রনাথ যে ভারতীয় চিত্রকলা শুরু করিয়াছিলেন তাহা এক আকস্মিক ব্যাপার। যখন তিনি পাশ্চাত্য গুরুর নিকট (গিলার্ডি ও চার্লস পামার) ইউরোপীয় পদ্ধতিতে চিত্রাঙ্কন শিক্ষা করিতেছিলেন তখন তিনি কল্পনাও করেন নাই যে ভারতীয় চিত্রকলা তিনি সৃষ্টি করিবেন এবং একদিন সর্বভারতীয় শিল্পের এবং নব্যচিন্তার কর্ণধার হইবেন। কারণ, তখন তিনি প্রাচীন ভারতীয় চিত্র দেখেন নাই বা এ বিষয়ে কিছু জানিতেন না। তাঁহার স্বপ্ন ছিল, তিনি একদিন ভারতের টিশিয়ান হইবেন—সেই স্বপ্ন একদা ভাঙিল। এক ইন্দো-পারশিয়ান চিত্রিত পুথি তাঁহার হাতে পড়িয়াছিল। ভারতীয় চিত্রকলার নৈপুণ্য দেখিয়া তিনি অবাক হইলেন, তাঁহার সম্মুখে এক নূতন জগৎ খুলিয়া গেল।" যে অবনীন্দ্রনাথ ব্রিটিশরীতির স্বচ্ছ জলরঙের শিক্ষা, জাপানি ওয়াশ পদ্ধতি আর নিজস্ব অভিজ্ঞতার সমন্বয়ের ভিত্তিতে তাঁর 'ধৌত চিত্ররীতি' প্রবর্তন করে প্রাচ্য চিত্রশিল্পের ধর্মগুরু তাঁকে এতটুকুও অসম্মান না করেই উপরি-উক্ত কথাগুলো জানা যায় প্রকৃত তথ্যের নিরিখে। তাহলে 'নিজের মতে স্বাধীনভাবে'—এভাবে বলাটাই কি ঠিক?

ঐ একই গ্রন্থে আরও লিখেছেন—"উনিশশো পনেরোতে অবনীন্দ্র আর্ট স্কুল থেকে পদত্যাগ করেন। তাঁর পদত্যাগের পর অধ্যক্ষ পার্সি ব্রাউন তাঁর ভারতীয় সহযোগী যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় চিত্রকলাশিক্ষাকে ফাইন আর্টের পাশাপাশি ইণ্ডিয়ান স্টাইল অব পেইটিং নামের বিভাগ তৈরী করে দ্বিখণ্ডিত করেন। সেদিন এদেশের দেশাভিমানী মানুষেরা পার্সি ব্রাউনের এমন সিদ্ধান্ত দেখে উর্ধ্ববাহু হয়ে নৃত্য করেছিলেন। তাঁদের সেদিন মনে হয়েছিল যে এমন নামের একটি বিভাগ খুলে বুঝি সরকার জাতীয় শিল্পকে স্বীকৃতি জানালেন, বুঝি এদেশের একটি জাতীয় আকাঙ্ক্ষা সরকার পূরণ করলেন। সেদিন তাঁরা বুঝতে পারেননি যে এর পেছনে ছিল ডিভাইড অ্যাণ্ড রুল নীতি এবং বিশ্বের সামনে এই কথাকে সত্যের প্রতিষ্ঠা দেওয়া যে, ভারতীয় শিল্পকলা ফাইন আর্ট পদবাচ্য নয়।

গত শতকের শেষ থেকে এক নাগাড়ে কয়েক দশক অবনীন্দ্রনাথকে লড়তে হয়েছিল, প্রথম, এই নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে যে, উপনিবেশবাদী প্রচারকরা যা-ই বলে থাকুন না কেন, ভারতের শিল্পকলার পরম্পরা বিশ্বের মধ্যে প্রাচীনতম, যা এখনও সমানভাবে প্রবহমান। বিশ্বের বহু প্রাচীন সমৃদ্ধ শিল্পকলা বর্তমানে মৃত হলেও ভারতের শিল্পপরম্পরা একটি সচল পরম্পরা। সেই পরম্পরা যে সচল সে-কথা হ্যাভেল ছাড়াও পার্সি ব্রাউনও তাঁর 'দি ইণ্ডিয়ান পেইটিং' বইতে বলে গেছেন।"—প্রথমত একথা স্ববিরোধী। কেননা পার্সি ব্রাউন যদি ভারতীয় পরম্পরা অস্বীকার করে তাকে 'ফাইন আর্ট পদবাচ্য নয়'—বলতে আগ্রহী হয়ে চিত্রশিক্ষাকে দ্বিখণ্ডিত করে থাকেন তাহলে আর তাঁর 'দি ইণ্ডিয়ান পেইটিং' বই লেখার দরকার কী ছিল ? ইংরেজ অধ্যক্ষ কত খারাপ করে গেছেন ওটা পাঠককুলকে বোঝাতে শোভন সোম একটা সোজা রাস্তা ধরে নিজস্ব মতামত দিয়ে গেছেন যার কোন ভিত্তি নেই। সেন্টেনারি সংখ্যায় যোগেশ চন্দ্র বাগল গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজের (প্রথমাবস্থায় স্কুল) যে ইতিহাস লিখেছেন তাতে পাই :

"As much as we know from records Principal Brown did not interfere with the ideal and method of teaching pursued by Abanindranath. This

time too, it appears that Principal Brown depended more or less on his Vice-Principal Jamini Prakash so far teaching was concerned Jamini Prakash reintroduced the Western form and technique in the carriculum to be followed by the students It was perhaps through his initiative and by the approval of the Principal Brown that the Fine Art Department was divided into two sections of classes very much distinct form each other, viz (I) Fine Art and (II) Indian Painting" (Page 40).

তাহলে এই ভাগ করার ব্যাপারটা সম্ভবত যামিনীপ্রকাশের চেষ্টারই ফলশ্রুতি। প্রিন্সিপাল ব্রাউনকে কাঠগড়ায় তুলতে হলে বলতে হয় তিনি যামিনীপ্রকাশের কথায় সায় দিলেন কেন? ঐটিই অপরাধ এবং আর এক অপরাধ তিনি ইংরেজ অধ্যক্ষ। শোভন সোম অন্নাশঙ্কর রায়-এর সেই ছড়ার লাইনেই চিন্তা করেছেন, সেই যে—

'মুর্শিদাবাদে হল না বৃষ্টি
তার মূলে কে কে কম্যুনিষ্টি,

দোষ ধরতে হবে বলেই দোষ ধরা—

তার কোনো ভিত্তি থাকুক বা না থাকুক। অবনীন্দ্রনাথ পদত্যাগ করলেন কেন? তাও স্পষ্টভাবেই যোগেশ চন্দ্র বাগল জানিয়েছেন—

" Abanindranath nurtured in the love of our ancient traditions hold his students as disciples and guided their activities form, and angle very much different of that of Principal Brown. The former alowed the stuents to work themselves even outside the classrooms and beyond presicent of the school. They in their way very often did not confirm to the code of rubs usually expectecd to be followed by the students. Principal Brown had a very different outlook on dicipline form that of Abnindranath and objected to this sort of conduct from time to time. These differences between Brown and Abanindranath, it is said, took an acute form and the latter was complelled to take long leave on Medical grounds, Abanindranath ultimately resigned in the middle of 1915 (Page 37-38)

বর্তমানে পত্র লেখক মোটেই ইংরেজভক্ত নয় কিন্তু তাবলে ডেভিড হেয়ার, উইলিয়াম কেরী, হ্যালহেড, মার্শম্যান, হ্যাভেল, আর্চার, ক্রামবিশ বা অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ডেরোজিওর মতো ব্যক্তিত্বকে খাটো চোখেও দেখতে চায় না, উল্লিখিত মনীষীবৃন্দ বাঙালি বা ভারতীয় নয় বলে।

ঠিক একারণেই পার্সি ব্রাউন, সম্বন্ধে শোভন সোমের মন্তব্য মেনে নেওয়াও মুশকিল। দেশাভিমানী মানুষেরা কজন উর্দ্ধ বাহু হয়ে নৃত্য করেছিলেন—তা কেবল বোধ হয় শোভন সোমই জানেন।

যোগেশ চন্দ্র বাগলের লেখা এই ইতিহাস তো আর টড-এর লেখা "অ্যানালস অ্যাণ্ড অ্যান্টিকুইটিস অব রাজস্থান" নয় যে তার বিশ্বাসযোগ্যতা নেই বরং তিনি লিখেই দিয়েছেন—

'As much as we know from records.'

পার্সি ব্রাউন সম্পর্কে শ্রীবাগলের শেষ অভিমতটুকু জানাই ;

'The services of Principal Brown to the cause of Indian art however lay also in other fields His love for Moghul art led him the research in Mogul, and mediaeval systems of Printings His book, on the subject are considered authoritative even today. We may for example cite his trea-

tises on the Indian Printing under the Moghuls, Picturesque Nepal and Indian Architecture in 2 volumes (1924) The Government of Art will even be proud of this Scholar-Principal.

শ্রীসোম একজায়গায় (পৃ. ১২) লিখেছেন—"সেই গ্রুপের (ক্যালকাটা গ্রুপ) প্রদর্শনী গণনাট্য সঙ্ঘের উদ্যোগে নিয়ে যাওয়া হল বোম্বেতে।"—এ নিয়েও ভিন্নমত পোষণ করে প্রদোষ দাশগুপ্ত-এর উত্তর দিয়ে গেছেন ঐ 'স্মৃতি শিল্পকথা' বইতে। তিনি লিখেছেন—"বোম্বেতে এই প্রদর্শনী নিয়ে যাওয়া বাবদ আমরা আমাদের গ্রুপের তরফ থেকে প্রত্যেক সভ্যের কাছ থেকে ৬৫ টাকা করে চাঁদা তুলে রথীনের কাছে দিয়েছিলাম এও আমার স্পষ্ট মনে আছে। তা সত্ত্বেও গণনাট্য সঙ্ঘের আওতায় ঐ প্রদর্শনী কি করে আয়োজিত হলো সেটা নিয়ে আমরা অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করেছিলাম।" আমার প্রশ্ন, গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের অন্যতম প্রদোষ দাশগুপ্তের মতামত না শোভন সোম-এর মত,—কোনটা গ্রহণীয় মনে করব?

পরিচয়-এর ১৭পৃষ্ঠায় শোভন সোম লিখেছেন—"আগে শিল্পীরা ছবি আঁকতেন প্রদর্শনীর জন্য পত্র-পত্রিকায় ছাপাবার জন্যে। কালেভদ্রে পঁচিশ পঞ্চাশ টাকায় সে ছবি বিক্রি হলে শিল্পী বর্তে যেতেন।" এতো সাঙ্ঘাতিক কথাবার্তা। তেঁতুল পাতার ঝোল খেয়ে আর স্ত্রীর হাতে শাঁখার বদলে লাল-সুতো বেঁধে বুনো রামনাথ হয়ে শিল্পকর্তা করার কথা যাঁরা এখনও বলেন, শ্রীসোম তো সে দলেরই।

সদ্‌বির নিলামঘরের ছবি বিক্রি প্রসঙ্গে যা বলেছেন তা সত্যি, কিন্তু তাতে শিল্পীর তো কিছু করার নেই। এখানেই তো শিল্পীর সমস্যা।

প্রসঙ্গক্রমে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (মানিক গ্রন্থাবলী, দ্বাদশ খণ্ড), 'লেখকের সমস্যা' থেকে উদ্ধৃতি দিই।—"যে সমাজে যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, সাহিত্যিক তার আওতার বাইরে যেতে পারেন না, —এই নির্ভুল সিদ্ধান্ত আসে মালিকানা স্বার্থের সমাজে সাহিত্যিক মজুরি নিয়েই শ্রম বিক্রয় করেন। যুক্তি থেকে নির্ভুল সাহিত্যিক মালিক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার উপযোগী সাহিত্য রচনা না করলে মালিকশ্রেণী তাকে বাঁচার মতো মজুরি দেবে না। কাজেই সাহিত্য করে বাঁচতে চাইলে মালিকশ্রেণীর স্বার্থের পক্ষে প্রচার করতেই হবে। কি অপরূপ ছেলেমানুষি যুক্তি!" ঐ লেখাতেই কিছু পরে দেখি,—"সমসাময়িক অবস্থার সুযোগ নিয়ে জুয়াড়ীর মরি-বাঁচি প্রাণান্তকর চেষ্টায় একটা যুদ্ধ বাধিয়ে মুনাফা বেলুনের মতো ফাঁপিয়ে যেমন একটা সর্বগ্রাসী সামরিক বাস্তবতা হয়ে ওঠে।" ঐ 'জুয়াড়ী' তো শিল্পসামগ্রীর ওপরও খবরদারী করবে এবং করছেও। কেবল বদলেছে যুদ্ধকালীন লগ্নির মাধ্যম। সেটা শ্রীসোম ঠিকই লিখেছেন এবং সাবেক লগ্নি (সোনায় লগ্নি এবং জমিতে লগ্নি) যে নিরাপদ নয় এটা বুঝেই তাদের লগ্নি শিল্পবস্তুতে। তাহলে শ্রীসোম 'জুয়ারী'দের বিরুদ্ধে বলুন। অযথা শিল্পীদের বিরুদ্ধে বলছেন কেন। "স্বাধীন দেশের একদল তরুণ শিল্পী ভাবলেন,—জাতীয়তায় এখন আর কুলোচ্ছে না, এখন হতে হবে আন্তর্জাতিক।"

জীবনের সব ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকতার ছোঁয়া লাগবে—এটাই তো কাম্য হওয়া উচিত সব দেশের সব লোকের। 'আমার দেশ'—নামক ভূখণ্ডটুকু নিয়ে, 'আমর ধর্ম'—নামক নামাবলি গায়ে দিয়ে 'আমার পুত্র-কলত্র'—নিয়ে থাকব—বিশ্বে কোথায় কি হচ্ছে নজর দেব না, একথা কি বলা যায়?

চার পৃষ্ঠায় লিখেছেন,—"সেই শিল্পীকে হয়তো যাবে দেখা গরিব ভারতবাসীর দুঃখে কাতর হয়ে নগ্নপদে বিচরণ করতে, লিভাইজ্ জিন্‌সে তাপ্পি মেরে পরতে এবং বিড়ি খেতে। কারণ এগুলো তাঁর কাল্ট তৈরির জন্য প্রয়োজন"—এম, এফ, হুসেন-এর নাম না করলেও বোঝা যায় শ্রীসোমের অঙ্গুলীসংকেত তাঁর দিকেই। আমি হুসেনভক্ত নই। এমন কি বিশ পৃষ্ঠায় শ্রীসোম যে বলেছেন—" জরুরি অবস্থায় আমরা মকবুল ফিদা হুসেনের মতো চিত্রকর দেখেছি। কিন্তু ব্যতিক্রম ব্যতিক্রমই।" তাঁর একথার সঙ্গে একমত নই। তবু বলতে চাই শিল্প-সমালোচক বা কলারসিক হিসেবে শিল্পীসৃষ্ট চিত্র বা ভাস্কর্যের শিল্পনৈপুণ্য নিয়েই আলোচনা কাম্য—শিল্পীর জীবনযাত্রাপ্রণালী নিয়ে নয়। এই কাল্ট তৈরীর উপাদান নিয়ে বলতে গেলে তো রবীন্দ্রনাথও বাদ পড়েন না।

"এমন কি জনচেতনা উদ্বোধন লক্ষ্যে রামকিঙ্কর বা চিত্তপ্রসাদের মতো পোষ্টার আঁকেন?" (২০ পৃ.) —শোভন সোম এত খোঁজ রাখেন, এখনকার শিল্পীদের পোষ্টার আঁকা সম্বন্ধে খোঁজ রাখেন না জেনে অবাকই লাগল। (মনু পারেখ এবং সোমনাথ হোরের নাম অন্তত করেছেন যাহোক) বন্যাত্রাণে, যুদ্ধের ভয়াবহতা রুখতে, শিক্ষাব্যবস্থার প্রচারে, যে কোনও প্রতিবাদী আন্দোলনে এত পোষ্টার এখন আঁকা হয় (শিল্পীদের অনেকেই এখনও অনামী হয়তো) যে তা আগে কখনও হয়েছে বলে মনে হয় না।

পরিশেষে বলতে চাই—এত বিতর্কিত এবং আলটপকা ধরণের মন্তব্য সহকারে 'সিগনেচার সম্বলিত সমালোচকের' লেখা ("আজকের ছবি হল সিগনেচার পেইন্টিং"—শ্রীসোমের মন্তব্যের অনুকরণেই লিখছি একথা) 'পরিচয়'-এ বড্ডো বেমানান।

অমরেশ বিশ্বাস

মাননীয় সম্পাদক সমীপে

পরিচয়ে নভেম্বর '৮৯ এর জানুয়ারী '৯৯ সংখ্যার অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামীর উপর কমল সমাজদারের লেখায় একটা মারাত্মক ভুল ছাপা হয়েছে—ভৌগোলিক দিকে থেকে ১৮ পৃ. দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফে লেখা হয়েছে "১৯৩৮ সালে কুমিল্লার নেত্রকোণায় .....। কুমিল্লার জায়গায় ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোণায় ইত্যাদি হবে।

পূর্ণাঙ্গ পাঠ হবে—

১৯৩৮ সালে ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোনায় সারা ভারত কিষান সভার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

আমি নিজে উক্ত সম্মেলনে উপস্থিত ছিলাম। এবং তার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন হাজং এলাকার কিংবদন্তী নায়ক কমরেড মণি সিংহ।

নীতিশ শেঠ

PARICHAY May-July 1999 Reg. No. 13273 WB/EC-265

বর্ধিত কলেবরে

শারদীয় পরিচয়

প্রকাশের পথে

অবিলম্বে গ্রাহক নবীকরণ করুন

গ্রাহক চাঁদা : ৬০ টাকা

সডাক : ৭৫ টাকা

সম্পাদনা দপ্তর : ৮৯, মহাত্মাগান্ধী রোড, কলকাতা- ৭০০ ০০৭

ব্যবস্থাপনা দপ্তর : ৩০/৬ ঝাউতলা রোড, কলকাতা- ৭০০ ০১৭

পরিচয় দাম : কুড়ি টাকা